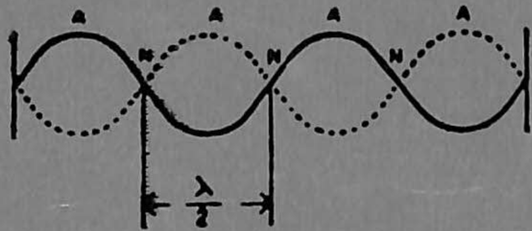
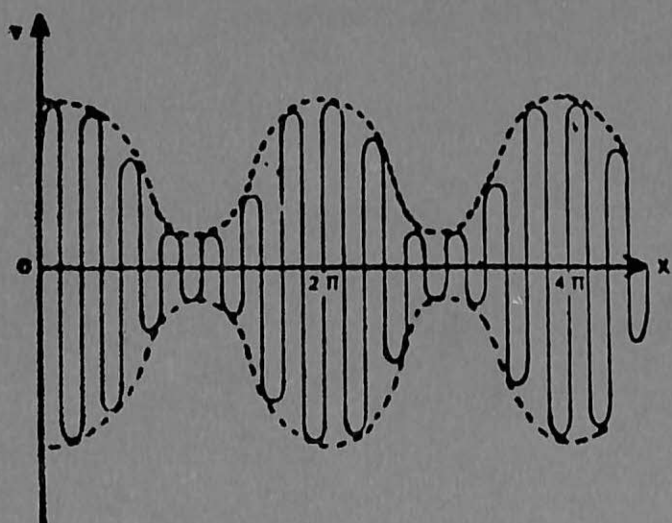
অনিল বিশ্বাস

বাঙলা



ছন্দোবিজ্ঞান



ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

কাব্য কালচারী ধ্বনিমালার এক কলাবিদ্যা। বিশেষ উদ্দেশ্যে ধ্বনিকে বিভিন্ন এককে বিশ্লেষ করা যায়, যেমন ক্ষুদ্রতম বাক্‌ধ্বনির একক স্বনে (phone), বা বাঙলা ভাষার অক্ষরে (Syllable)। বাঙলা কাব্যের ছন্দো-কাঠামো অক্ষর-ভিত্তিক। এখানে রয়েচে এমন এক পরিস্থিতি যেখানে ধ্বনিমালা হাজির হয় পারম্পর্যে। লিখিত বা উচ্চারিত অক্ষরগুলি যখন এগোয় তখন তারা সৃষ্টি করতে থাকে ভাব ও চিত্রকল্প যাতে আমরা সাড়া দি। সঙ্গে-সঙ্গে আমরা সাড়া দি ধ্বনিমালা ও তাদের চলন বৈশিষ্ট্যে অর্থাৎ তাদের আপেক্ষিক দ্রুতি বা মন্থরতা এবং তাদের সৃষ্ট নিয়ামকের ছাঁদে। কাব্য তাই সংগীতের মতোই মুখ্যত এক-কালিক কলা—ভাস্কর্য বা চিত্রকলার মতো এ স্থানুকলা নয়। কবিতার কন্দরে অস্তিমান ধ্বনি, তার চলন ও নক্‌সা। শব্দার্থের মতোই কল্পনা ও আবেগের সাড়াও এখানে জরুরী। কাজেই কবির ছন্দোপ্রকরণ অর্থাৎ তাঁর ধ্বনি প্রবাহের নিয়ন্ত্রণ হ'লো ভাষার ভিতর তাঁর ভাষা।

বাঙলা ছন্দ নিয়ে একাধিক আলোচনা হ'য়েচে এর আগে, কিন্তু তারা বৈজ্ঞানিক হ'য়ে উঠতে পারেনি। "বাঙলা ছন্দো-বিজ্ঞান"ই বাঙলা ছন্দো-প্রকরণের প্রথম বই যা 'বৈজ্ঞানিক' বলে দাবি করতে পারে। আর অধ্যয়ন হ'য়ে ওঠে 'বৈজ্ঞানিক' যখন এর ভিত্তি হয় সত্যবীক্ষণ। এ কোন নির্দিষ্ট নান্দনিক বা নৈতিক সূত্রের তথ্য নির্বাচন নয়। তাই এই ছন্দোবিজ্ঞান গ'ড়ে উঠেচে ধ্বনিকে ভিত্তি ক'রে তিনটি পর্বে—ধ্বনিতত্ত্ব; বাঙলা ছন্দ; ও ছন্দোসমীক্ষায়। সঙ্গে-সঙ্গে রয়েচে এখানে প্রযোজ্য বিজ্ঞানের সূত্রাবলীও। ফলে বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞানে বইখানি হ'য়ে উঠেচে পথিকৃৎ। এ এক যুগান্তকারী ঘটনা। এতদিনে বাঙলা ভাষায় এলো ছন্দোজগতের এক প্রামাণ্য পরিচিতি।

বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান

ডঃ অনিল বিশ্বাস, এম. এ, এল্‌. এল্‌. এম্‌, পি. এইচ. ডি.
অনাথনাথ দেব পুরস্কার ও স্বর্ণপদক প্রাপক
আনন্দরাম বড়ুয়া পদক প্রাপক
ও
গ্রিফিথ স্মারক পারিতোষিক গ্রহীতা

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড
কলিকাতা * * * ১৯৯২

Bangala Chhando-Bijnan

Bengali Prosody

By

Dr. Oneil Biswas

1984

প্রকাশক ঃ

ফার্মা কেএলএম প্রাইভেট লিমিটেড

২৫৭-বি, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০১২

প্রথম প্রকাশ ঃ কলিকাতা, ১৯৯২

মূল্য ঃ ৩২৫·০০

মুদ্রাকর ঃ

শ্রীশঙ্কর প্রসাদ নায়ক

নায়ক প্রিন্টার্স

৮১/১ই, রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

প্রবীন ছান্দসিক
শ্রীযুক্ত প্রবোধ চন্দ্র সেন
করকমলেষু ঃ

ছন্দোব্রতী ব্রত করে মাত্রা-উদ্‌যাপনে—
শ্রুতি ব্রহ্ম দূরে থাকে দেয় না হদিশ ;
ছান্দসিক দেখে কিন্তু ধ্বনি-উচ্চারণে
স্বর, স্বন, বল এসে জানায় কুর্নিশ ঃ
পদ, পর্ব, মেল আসে, আর গতিযানে
বায়ুর তরঙ্গ, সঙ্গে দৈর্ঘ্য বিচলন।
শুধু তত্ত্ব মূল্যহীন যদি না সেখানে
বাস্তব স্বীকৃতি পায়। দেখো বিজ্ঞানন
বিশুদ্ধ, ফলিত নয়, বলেন পাস্তুর—
প্রয়োগে বিজ্ঞান ধরে তার নিজরূপ।
দল, কলা, মিশ্রতায় বাজে কি সে-সুর ?
ফোটে কি পর্বাঙ্গ-পর্বে শ্রুতির স্বরূপ ?
স্পন্দের খেলায় ছন্দ বিজ্ঞানীকে ডাকে,
ধ্বনি-বাক্-এ গাঁটছড়া বাঁধে বাঁকে-বাঁকে।

গ্রন্থকারের অন্যান্য বই ঃ

I. বাংলা

কাব্য ঝর্ণা—বি, সরকার এ্যাণ্ড কোম্পানী, ১৯৪৩
বিদায় গোধূলি—ঐ
গৈরিক—কবিতা ভবন, ১৯৪৪
পদধ্বনি—জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৩৫৮
বাঁকাজল—সবিতা প্রকাশ ভবন, ১৩৬৯
ঘণ্টাবাজে গন্ধে যার—প্রভাত কার্যালয়,—১৩৭৮
কালী-কলি-কলিকাতা—ঐ, ১৩৮০
উদ্বেগ উপকূলে—দে বুক ষ্টোর, ১৩৮৭

অনুবাদ শেক্‌স্‌পীয়রের সনেট—পূর্বাশা প্রকাশন, ১৩৭৩
পোড়ো জমি—চ্যাটার্জি পাবলিশিং কনসার্ন, ১৩৮১

প্রবন্ধ বিশশতকের বাংলা সাহিত্য—জেনারেল প্রিন্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স লিমিটেড, ১৯৫২
আশুতোষের শিক্ষা চিন্তা—ঐ, ১৯৬৮
এ্যারিস্ততল ও তাঁর কাব্যকলা—চ্যাটার্জি পাবলিশিং কনসার্ন, ১৯৮৪
রঙ বেরঙের দিনগুলি—দেকাস সাহিত্য সংসদ, ১৯৯২

II. English

Prose A spiritual calculus—Probhat Karyalaya,1977.
From Justice to welfare—Intellectual Publishing House, 1985.
History of India's Freedom Movement— Do. 1990.
Calcutta and Calcuttans—Firma KLM (P) Ltd. 1992.

Poetry Squaring the Circle—Chatterjee Publishing Concern, 1985.
A Book of Bengali Verse—Writers Workshop, 1990.
Continuum becomes Calcutta—Firma KLM (P) Ltd. 1991.

Law The metrics of legal philosophy—Do. 1970.
Encyclopaedic Law Dictionary—De Books, 1979.

III. গ্রন্থকার সম্পর্কে

কবিমনীষী অনিল বিশ্বাস—সম্পাদক, জ্ঞান প্রকাশ মণ্ডল ঃ
দেকাস সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৪।

বিষয়ক্রম

দ্বিতীয় পর্ব ঃ বাঙ্‌লা ছন্দ

ক ঃ চিত্রসূচী

খ ঃ সারণী

গ ঃ সূত্রাবলী

ভূমিকা

বিজ্ঞান এ-যুগের সিদ্ধিদাতা গণেশ। অথচ আজও এ রয়েচে কাব্য তথা সাহিত্যের উপেক্ষিত। তত্ত্বের দিক থেকে যে-কোন বিষয় কাব্যের উপাদান হতে পারে। তাসত্ত্বেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিতা সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবিকুল নতুন বিজয়ে চেষ্টিত নন—তাঁরা বংশগত সম্পত্তি রক্ষার্থেই যত্নবান। নীতিগতভাবে সমগ্র বিশ্বই তাঁদের, তবুও তাঁরা এর দখল নিতে চান না। প্রশ্ন জাগে ঃ এর কারণ কি ? আধুনিক কবিরা কাব্যমুক্তির দাবি জানালেও বিষয় বৈচিত্র্যে তাঁরা কোন নতুনত্বের সন্ধান দিতে পারেন নি। এ'রা রয়ে গেচেন পুরনো ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক, কেননা মন তাঁদের আর বাড়েনি। ফলে বিজ্ঞান যে নতুন-নতুন ভাবের আমদানি করেচে তা উপেক্ষিতই রয়ে গেচে। তবে পুরনো যুগে সাক্ষাৎ মেলে দু'একজনের, যাঁরা বিজ্ঞানের উপাদানে রচনা করেচেন তাঁদের কাব্য, যেমন লুক্রেসিয়াস (৯৫-৫৫ খ্রীঃ পূঃ)-এর "বস্তুর প্রকৃতি বিষয়ক" কাব্য। এখানে বিজ্ঞান কাব্যায়িত হ'য়ে উঠেচে—পরমাণু ও দর্শন হাত মিলিয়েচে। এরপরে দান্তে (১২৬৫-১৩২১) উল্লেখ্য—তিনি খ্রীষ্টীয় দর্শনকে তেরজা-রিমা ছন্দে রূপায়িত করেচেন তাঁর "দিব্য হর্সান্তিকায়"। পরে নাম কর্তে হয় গ্যয়টের (১৭৪৯-১৮৩২), যিনি জ্ঞান ও ভাবের বিস্তার ঘটিয়েচেন তাঁর রসোত্তীর্ণ রচনায়। এর পরে বিজ্ঞানানুভূতি তেমন চোখে পড়েনা। ঐটাই যে প্রগতির পথ তা প্রগামীরা বুঝতে পারেন না। এ-প্রসঙ্গে বাঙলা কাব্য তথা সাহিত্যের কথাই ওঠে না। প্রগতির ঢাক-ঢোল পিটানো শুনেও বলতে হয় যে তথাকথিত প্রগতিবাদিদের না আছে প্রগামী জ্ঞান, না আছে সামর্থ্য। ইদানীং 'উদ্বেগ উপকূলে'র (১৩৮৭) কবি তাঁর 'দেকাসের চোখে' ও 'মাত্রাযায়ী ভগবান'—এ যে অপেক্ষবাদ ও তরঙ্গ বলবিদ্যার কাব্যায়ন করেচেন তা রয়ে গেচে আজও উপেক্ষিত। কাজেই তাঁকে ভবিষ্যতের দিকে তাকাতে হবে ভবভূতির আশা নিয়ে ঃ

উৎপৎস্যতে হস্তি মম কোঽপি সমান ধর্মা
কালোহ্যয়ং নিরবধি র্বিপূলা চ পৃথ্বী।

এ-পরিপ্রেক্ষিতে ছন্দের কথা ওঠে। ছন্দালোচনায় ধ্বনিতত্ত্ববিদ্‌রা কেউ আসেননি। কবিরা এককভাবে এগিয়েচেন তাঁদের স্বাভাবিক শ্রুতিজ্ঞান নিয়ে ; আবার অকবি পাঠকরাও এদিকে ঝুঁকেচেন তাঁদের স্বভাবী উচ্চারণ-জ্ঞান নিয়ে। ফলে বিজ্ঞান রয়ে গেচে উপেক্ষিত। ইউরোপ ও আমেরিকায়

ধ্বনিতত্ত্বের হয়েচে ব্যাপক আলোচনা এবং ছন্দ ও মিলেরও। ভারতেও গবেষণা হয়েচে পুণাস্থ দাক্ষিণাত্য কলেজে। কিন্তু ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি ভাষাবিদ্‌ থাকা সত্ত্বেও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে আজও স্থাপিত হয়নি তরঙ্গলেখ, বাক্‌বীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি। ফলে ছন্দোতত্ত্ব বিজ্ঞানের পর্যায়ে উন্নীত হওয়ার কোন সুযোগ পায়নি। এদিকে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ কচ্চি। এমতাবস্থায় ছন্দো-আলোচনায় যাঁরা চেষ্টা করেচেন ও কচ্চেন সাধুবাদ তাঁদের প্রাপ্য। ছন্দোরাজ্যে পঞ্চ গৌড়জনের নাম কর্তে হয়—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবোধ চন্দ্র সেন, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়, মোহিত লাল মজুমদার ও সুধীভূষণ ভট্টাচার্য। এঁদের প্রচেষ্টায় ছন্দ জিজ্ঞাসা বর্তমান পরিণতি পেয়েচে। রবীন্দ্রনাথ কবি হওয়ার জন্যে উপলব্ধি কর্তে পেরেচেন ছন্দের মৌল প্রকৃতি। বাঙলার সাধু ও প্রাকৃত ভাষায় ছন্দ যে আলাদা তা তিনি বুঝতে পেরেচেন। এ-ব্যাপারে মোহিতলাল আরো এগিয়েচেন্‌ তাঁর 'পদভূমক' ও 'পর্বভূমক' আলোচনায়। রবীন্দ্রনাথের আরেকটি মৌলিক আবিষ্কার ছড়ার ছন্দের অর্থাৎ বলবৃত্তের প্রকৃতি ও মাত্রাবিচার। এরি সমর্থন মিলেচে রাজশেখর বসুর প্রস্বন (accent) ও গুরু অক্ষরের অভেদ-স্থাপনায়। শ্রীঅরবিন্দও মাত্রাবৃদ্ধির জন্যে দায়ী করেচেন খাঁড়া ছন্দাঘাত ও ব্যঞ্জনভারকে। প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয় অনলস সাধনায় আজও ব্যাপৃত। তবে রচনার আয়তনের তুলনায় আবিষ্কার অল্পই। অমূল্যধন চেষ্টা করেচেন তাঁর 'পর্ব-পর্বাঙ্গ' বাদে বাঙলা ছন্দের ব্যাখ্যা। কিন্তু এতে তিনি কৃতকার্য হন নি, বিশেষত বলবৃত্তের আলোচনায়। এখানে সুধীভূষণের নাম কর্তে হয়। তিনিই বলবৃত্তের স্বরূপ খানিকটা বুঝতে পেরেচেন। তবে পঞ্চগৌড়ের সিদ্ধান্ত অনেক ক্ষেত্রেই বৈজ্ঞানিক ধ্বনিবাদের সমর্থন পুষ্ট নয়। অর্থাৎ দেশ-বিদেশের ধ্বনি-তত্ত্ববাদে এদেরকে যাচাই করা হয়নি ; কাজেই এ অবৈজ্ঞানিক। অন্যদের কথাই ওঠেনা, কেননা তাঁরা এঁদেরই অনুসরণ করেচেন এবং কোন নতুন আবিষ্কারে সমর্থ হয়নি।

'বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞান' বৈজ্ঞানিক প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ তিনটি পর্বে বিভক্ত—ধ্বনিতত্ত্ব ; বাঙলা ছন্দ ; ও ছন্দ-সমীক্ষা। ধ্বনিতত্ত্বের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভাষাকে চিহ্নিত করা হয় তিনটি বৈশিষ্ট্যে—স্বর ; স্বন ; ও বল। এই ত্রিধা ব্যবহারে প্রকাশ পায় স্বনমান (pitcheme), যেমন চীনা ও পাঞ্জাবীতে ; কালমান (chroneme) বা স্বনমান (soneme) যেমন, সংস্কৃত ও ফরাসীতে ; আর বলমান (stroneme) যেমন ইংরেজি ও স্পেনিশ্‌-এ। এতিনের মূলে রয়েচে প্রত্যঙ্গের বিচলন। প্রাচীন ভারতেও ছন্দোবদ্ধ রচনায় এই তিন ধরনের সঙ্গীত দেখা যায়—স্বর-সঙ্গীত বা স্বরমড়ুলনের সঙ্গীত ; বর্ণসঙ্গীত বা ধ্বনিপরিবর্তনের সঙ্গীত; ও তাল সঙ্গীত বা কালনিয়ন্ত্রিত

স্বরন্যাসের সঙ্গীত। প্রথমটির উদাহরণ বৈদিক ছন্দ, যেখানে প্রস্বরণ অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিতের প্রাধান্য। দ্বিতীয়ের আবির্ভাব ঘটল হ্রস্ব-দীর্ঘ ধ্বনির পরিবৃত্তিতে এবং সংহিতা কালের শেষ নাগাদ। হ্রস্ব-দীর্ঘবর্ণের পার্থক্য সূচিত হলো তিনটি বিষয়ে, যথা ধ্বনি-গুণ, অক্ষর মাত্রা ও উক্তির কালদৈর্ঘ্যে। এরি-পরবর্তী ধাপে এলো তৃতীয়টি অর্থাৎ তাল সঙ্গীত। এ উৎপন্ন হয় স্বর বা ধ্বনির উপর চাপ দিয়ে আর এঘটে নির্দিষ্ট কালান্তরে ঘা দিয়ে-দিয়ে। কালান্তর অবশ্য নির্ধারিত হয় কালমাত্রায়। স্থূলভাবে এই স্বরসঙ্গীত, বর্ণসঙ্গীত ও তালসঙ্গীত ধ্বনি বিজ্ঞানের স্বনন (phonation), উচ্চারণ (articulation) ও উদ্বোধনের (initiation) সগোত্রীয়। বাঙলায় এরা রূপান্তরিত হয়েচে স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্তে। বাঙলা ছন্দ ত্রিধা হয়েচে এই ত্রিধা স্পন্দের জন্যে। দ্বিতীয় পর্বে এই আলোচনা হয়েচে সম্প্রসারিত এবং বাঙলা ছন্দের স্বরূপ উদ্ঘাটিত। এ-ছাড়াও স্পন্দমিতির (metre) সূত্রাবলী নির্দিষ্ট হয়েচে। তৃতীয় পর্বে চলেচে বাঙলা ছন্দের মীমাংসা ও ব্যাকরণ বিষয়ক আলোচনা। বৈদেশিক ছন্দের বাঙলা রূপান্তরও এসেচে এরি মধ্যে। পরিশেষে গ্রন্থনির্দেশ ও পরিভাষা দেওয়া হয়েচে। এ-ভাবে ছন্দোবিজ্ঞান মোটামুটিভাবে পরিপূর্ণতা লাভ করেচে। এরই পথিকৃৎ এই অর্থে যে এর আগে এরকম বৈজ্ঞানিক আলোচনা আর হয় নি।

তবে বৈজ্ঞানিক বই সম্পর্কে হুঁশিয়ারির প্রয়োজন। বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তকাবলী অতৃপ্তিকর সাধিত্র—যদিও তারা জ্ঞান-প্রগতির পিছনে থাকে, তবুও পাঠকেরা তাদেরকে নিষ্ঠার সঙ্গে গ্রহণ করে এক মতবাদ বা অন্যটির সঠিক ধারক হিসেবে। এবং এই নিষ্ঠা স্বতঃই বিজ্ঞানের অগ্রগতির পরিপন্থী। বাক্-সম্পর্কে মনে রাখতে হবে যে এ স্থূল ইঙ্গিত শ্রেণী ছাড়া বেশি কিছু নয়, যা শুনে শ্রোতা ব্যাখ্যা করে বক্তার অভিপ্রেত। শব্দাবলী চতুর উদ্ভাবন হলেও অত্যন্ত প্রাথমিক ধারণা ছাড়া অন্য কিছুর প্রতীক দ্যোতনায় সম্পূর্ণ অসমর্থ মাধ্যম। অধিকাংশ শব্দেরই আছে একাধিক অর্থ, অর্থবৈচিত্র্য ও গূঢ়ার্থ। কাজেই তারা অনেক সময় ব্যবহৃত হয় আল্গাভাবে ক্লেশকর বাক্য বর্জ্জনে। এখানে আরেকটি কথা স্মর্তব্য। অন্যান্য বিজ্ঞানের মতো ধ্বনিবিজ্ঞানেও কিছু-কিছু মৌল প্রত্যয় আছে যা সংজ্ঞিত হ'তে চায় না। কোন বিজ্ঞানেরই দৃঢ় ভিত্তি নেই—এরা অপ্রমাণিত এই অঙ্গীকারে প্রতিষ্ঠিত যে কিছু-সংখ্যক ভিত্তিক একক অস্তিমান এবং তারা কি তা লোকজন জানে ব্যাখ্যা ব্যতিরেকে। মূলকে প্রত্যেকে একই ভাবে দেখে থাকে। তবে আমরা ভুলে যাই যে এক জনের কাছে যা স্পষ্ট সত্য বলে প্রতিভাত হয় অন্যের কাছে অবশ্য তা নাও হ'তে পারে। এ-পরিপ্রেক্ষিতে ডেনিয়েল জোন্সের কথায় বল্‌তে পারি ঃ "কোন পাঠকই

এ-বইকে যেন মনে না করেন যে এ চরম বা অপরিবর্তনীয় ব্যাখ্যান ; এতে যে মতামত প্রকাশ করা হয়েচে তাকে যেন তাঁরা অনড় ঘোষণা বলে বিবেচনা না করেন ; বরং একে তাঁরা মনে করেন এক অসমাপ্ত উপাদান-সংগ্রহ, যাতে তাঁরা উৎসাহিত হবেন, প্রগতির অবদান যোগাতে অনুসন্ধিৎসার হিতকর ধারায় অবগাহন ক'রে"।

এখানে পরিভাষা সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন। বাঙলা ত্রিধা ছন্দের নাম করণে নানাবিধ পরিভাষা ব্যবহৃত হয়েচে। কিন্তু কেউ-ই তাদের প্রকৃতি অনুসারে নামকরণ করেননি। বর্তমান গ্রন্থে এ-কাজ করা হয়েচে এবং এ স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্ত রূপ ধরেচে। এ-ছাড়া অক্ষর (syllable) ও মাত্রা (mora)-রও কোন পরিবর্ত্তন হয়নি, কেননা এরা প্রাতিশাখ্যের যুগ থেকে প্রচলিত। তাই 'দল' বা 'কলা' আমদানি করার হেতু নেই। অনেক ইংরেজি শব্দের বাঙলা পরিভাষা কর্তে হয়েচে ঃ এদের মধ্যে কিছুর পরিভাষা আগে থেকেই প্রচলিত আছে ; তবে একাধিক নতুন পরিভাষা কর্তে হয়েচে। ফলে পরিভাষার একটি তালিকা গ্রন্থ শেষে উপস্থাপিত হয়েচে। এ পাঠকের সহায়ক হবে বৈজ্ঞানিক অনুধাবনে। প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয়ের "আধুনিক বাংলা ছন্দ সাহিত্য" (১৩৮৭) দেখলে মনে হতে পারে যে এঁরা সবাই ছান্দসিক, কিন্তু তা নয়। এদের অধিকাংশই ছন্দোব্রতী, কিন্তু ছান্দসিক বা ছন্দোবিজ্ঞানী নন। বস্তুত 'ছন্দোব্রতী' ও 'ছান্দসিকে'র মধ্যে পার্থক্য আছে। ছান্দসিক ছন্দোব্রতী, কিন্তু ছন্দোব্রতী ছান্দসিক না হ'তেও পারেন। ছন্দোব্রতীরা যে ছান্দসিক হননি তার কারণ তাঁরা শুধু ছন্দোব্রত বা অনুষ্ঠান পালন করে চলেচেন। এতে ব্রতপালনের যতটা আগ্রহ আছে, ততটা নেই ছন্দোজ্ঞান আহরণের প্রচেষ্টা। আর ছন্দোজ্ঞানই ছান্দসিকের উপজীব্য। এবং 'ছান্দসিক' শব্দটিও সাধিত হয়েচে ছন্দ+ষ্ণিক (ইক্) থেকে—'ইক্' এসেচে 'বেত্তা' বুঝাতে। অর্থাৎ ছান্দসিক হলেন ছন্দোজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি, ছন্দো-বেত্তা। অন্যদিকে ছন্দোব্রতীরা আপ্তবাক্যে বিশ্বাসী, বৈজ্ঞানিক আলোচনা থেকে দূরে থাকেন। এঁরা ধ্বনিতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক তথ্য উপেক্ষা করে এগোন ছন্দের আলোচনা ও বিশ্লেষণে। আর ধ্বনিতত্ত্ব ছাড়া ছন্দালোচনা রামশূন্য রামায়ণের মতোই—হ্যামলেটের নাটকে হ্যামলেট-ই স্বয়ং অনুপস্থিত।

কথা শেষে উল্লেখ করি যে প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয় আমার শিক্ষক—জীবনের গোড়ার দিকে তাঁর কাছ থেকে ছন্দো-বিষয়ক যে কথা শুনেছি তাই হয়েচে আমার পরবর্তী জীবনের অনুপ্রেরণা—সাধনার ধুনি জ্বালতে তিনিই হয়েচেন আমার সহায়ক। আজ কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করি তাঁর দান। তাসত্ত্বেও তাঁকে সমালোচনা কর্তে হয়েচে বৈজ্ঞানিক প্রয়োজনে। এ-ব্যাপারে আমার আদর্শ

এ্যারিস্ততলের মতোই, যখন তিনি সমালোচনা করেচেন তাঁর গুরু প্লেতোকে : Amicus Plato, sad magis amica veritas, অর্থাৎ প্লেতো প্রিয়, সত্য প্রিয়তর। প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয়ও আমার কাছে প্রিয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক সত্য প্রিয়তর। সর্বশেষে স্মরণ করি কালিদাস-কে : 'আপরিতোষাদ্বিদুষাং ন সাধু মন্যে প্রয়োগ বিজ্ঞানম্' অর্থাৎ

উৎকৃষ্ট করিনা মনে আপনার প্রয়োগ বিজ্ঞান,
যাবৎনা পরিতৃপ্ত হয় এতে সুধী জন মান।

অনিল বিশ্বাস

গৈরিক, কলিকাতা-৭০০০৭০
'দোলপূর্ণিমা'
৩ চৈত্র, ১৩৯০। ১৭ মার্চ, ১৯৮৪

প্রথম পর্ব : ধ্বনিতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায় ঃ ভাষা ও ছন্দ

মানবের জীর্ণবাক্যে মোর ছন্দ দিবে নব সুর,
অর্থের বন্ধন হতে নিয়ে তারে যাবে কিছু দূর
ভাবের স্বাধীন লোকে, পক্ষবান্ অশ্বরাজসম
উদ্দাম-সুন্দর-গতি—সে আশ্বাসে ভাসে চিত্ত মম।
—রবীন্দ্রনাথ[১]

১.১ বাক্

ঋক্‌বেদে (I. ১৬৪.৪৫) বাক্-সম্পর্কে বলা হয়েচে যে এর চারটি রূপের মধ্যে তিনটি-ই মানুষের কাছে বোধগম্য নয় ; কিন্তু একটি শুধু মানুষ বলতে পারে ঃ "গুহা ত্রীণি নিহিতা নেঙ্গয়ন্তি, তুরীয়ং বাচো মনুষ্যা বদন্তি।" যোহন-লিখিত সুসমাচারে (I. ১) উক্ত হয়েচে ঃ "বাক্ ছিল আদ্যিকালে। বাক্ ছিল ঈশ্বরে লীন, আর বাক্-ই ছিল ঈশ্বর।" আধুনিক বিজ্ঞানীর কাছে ধরা পড়েচে বাক্-এর শ্রুতি-সীমাও। সুষ্ঠু শ্রবণযুক্ত যুবক-যুবতীর কাছে শ্রাব্য (audible) ধ্বনির কম্পাংক পরিসর (frequency range) হ'লো সেকেন্ডপ্রতি ২০ থেকে ২০,০০০ চক্র। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এর তারতম্য ঘটে। তাই ষাট বছর বয়স্কের কাছে এ হ'য়ে দাঁড়ায় ১২,০০০ চক্র। তবে চরম সুবেদিতা দেখা দেয় ৩,০০০ চক্রীয় ধ্বনির কাছাকাছি। বাগ্‌দেবী তাঁর মহিমা ঘোষণা করেচেন ঋক্‌বেদে (X. ১২৫. ৩-৫) এ-ভাবে ঃ

"আমি রাজ্ঞী। আমি স্বয়ং যা বলে থাকি তা দেবতা এবং মানুষের দ্বারা সেবিত। আমি যাকে কামনা করি তাকে বলবান করি, সৃষ্টিকর্তা করি, ঋষি করি, প্রজ্ঞাবান করি।"[২]

১.২ ভাষা

ভাষার তুলনা হ'তে পারে রামধনুর সঙ্গে। একটি নির্দিষ্ট পরিবেশেই এর উদ্ভব। রামধনুর বেলায় এ-পরিস্থিতি গড়ে ওঠে বৃষ্টিবিন্দু, সূর্যালোক, আলো প্রতিসরণের ক্রান্তিকোণ, দর্শক প্রভৃতি নিয়ে। কথ্যভাষা জন্ম নেয়

এক ষড়ঙ্গ পরিবেশে, যথা, (১) বাগ্‌ধ্বনির উচ্চারণ, (২) কর্ণ মারফতে শ্রাবণ অনুভূতিগ্রহণ, (৩) বোধ, (৪) পড়ন ভঙ্গি, (৫) বাগ্‌ধ্বনির অর্থকর সংযোজন, ও (৬) সমমর্মী বক্তা ও শ্রোতার উপস্থিতি। ভাষা তাই সামাজিক বৃত্তি ও সমাজ সম্পর্কের প্রথম ধাপ। এখানে ধরা পড়ে চলন ও বলনের পার্থক্য। মানুষের সহজাত বৃত্তি চলন, কিন্তু বলনের জন্যে প্রয়োজন সমাজের। তাই ভাষায় দুটি জিনিস লক্ষণীয়। প্রথমত, এ হলো বাক্‌-শক্তির সামাজিক ফল; দ্বিতীয়ত, বাক্‌-শক্তির ব্যক্তিগত প্রয়োগের জন্যে আছে প্রথা-সংহিতা। ফলে ভাষা হয়েচে ব্যক্তি-নিরপেক্ষ এক "সামাজিক চুক্তি"। এর বাক্‌-বর্তনীতে শাব্দিক প্রতিরূপ গড়ে ওঠে ভাব, ধারণা ও অর্থের দ্যোতনায়। অর্থাৎ প্রতীকে সম্পৃক্ত হয়ে ওঠে বোধ বা ব্যঞ্জনা।[৩]

বাক্‌ ও মননের যৌথ ফসলই ভাষা, যা বিধৃত হয়েচে গ্রীক শব্দ logos-এ। এই logos হলো বাক্‌ ও মননের যৌথ রূপ। পক্ষান্তরে মনুষ্যেতর প্রাণীদের ভাষা হলো aloga। বস্তুত 'মানুষ' শব্দেই আছে logos এর রূপটি। এ সাধিত হয়েচে মনু+ষ+অ হ'তে; আর মনু এসেচে মন্‌-ধাতু থেকে (মন্‌+উ), যার অর্থ হলো মনন। ঋক্‌বেদের (I. ৭২.৮) "যেনানুকং মানুষী ভোজতে বিট" এর 'মানুষী' শব্দের অর্থ হলো মনন। এর 'মানুষী' শব্দের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য বলেন "মনঃ সম্বন্ধিনী"। তাইতো ভাব প্রকাশের জন্যে মানুষ বাক্‌ যন্ত্র দিয়ে যে ধ্বনি সৃষ্টি করে তাকেই বলে ভাষা। এতে আছে দুটি জিনিস—একটির স্থিতি শারীরিক যন্ত্রের উপর; অন্যটি মনন-শায়ী। প্রথমটির নাম বাক্‌ বা ধ্বনি, অন্যটি ভাব। অর্থাৎ বাগর্থই হলো ভাষার উদ্দেশ্য।

১.৩ প্রভেদ

বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সোস্যুরে (Saussure) ভাষা ও বাক্‌-এর অদ্বৈতবাদকে বাতিল করে দিয়েচেন। তাঁর মতে ভাষা (Fr. Langue) হলো সমসত্ত্ব এক অখণ্ড বস্তু; অন্যদিকে বাক্‌ (Fr. Langage) বিষমসত্ত্ব এবং যুগপৎ ভৌত, শারীরবৃত্তীয় ও মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে দণ্ডায়মান। দ্বিতীয়ত, ভাষা হলো বিজ্ঞান আর বাক্‌ তারই সক্রিয় প্রয়োগ। তৃতীয়ত, শব্দই ভাষার একক, কিন্তু বাক্য বাক্‌-এর। শারীরিক অবস্থার বাহ্য প্রকাশ ধ্বনিতে, যেমনটি দেখা যায় ইতর জীবদের মধ্যে। কিন্তু মানুষের চিন্তায় ধ্বনি মেলে ধাতু বা মূল শব্দে। অর্থাৎ কিনা এককেটি ভাবের মূর্তিতে। পরে শব্দগুলি বাক্যে গ্রথিত হয়। ধ্বনি বদলায়, বদলায় ধাতু ও প্রত্যয়। কিন্তু অটুট থাকে চিন্তাপ্রণালীটি; কেননা এই হলো জাতির নিজস্ব জিনিস—একান্তভাবেই এ তার মননের ফসল। এককথায় বাক্যরীতি (syntax) ঠিক থাকে।

ভাষা বলতে বুঝায় মানুষী কণ্ঠস্বরের ধ্বনি মিলিয়ে শব্দসৃষ্টি, যাতে মনের ভাবপ্রকাশ ঘটে। এতে আছে এক দিকে ধ্বনি, অন্যদিকে ভাব। একটির স্থিতি শারীরিক যন্ত্রের উপর, অন্যটির উদ্ভব চিন্তা থেকে। তবে বাক্য ও অর্থ পরস্পর-জড়িত। বাক্ (speech) তাই গ্রীক logos এর সগোত্র। মানুষের আছে ভাষা ও চিন্তা এবং তাই সে অন্য প্রাণিদের চেয়ে স্বতন্ত্র। ভাষায় পেঁছাতে তিনটি স্তর পেরোতে হয়—ধ্বনি, শব্দ ও বাক্য। প্রথমটি উচ্চারিত হয় কণ্ঠ, মুখবিবর, ও নাসিকার অভ্যন্তরে অবস্থিত বাক্‌যন্ত্রের সহায়তায়। দ্বিতীয়টি জন্ম নেয় এক বা একাধিক ধ্বনির সমবায়ে। তৃতীয়টির আবির্ভাব ঘটে শব্দের সমবায়ে। তাই 'ভাষায়' বুঝায় অর্থবোধক শব্দময় বাক্য। 'শব্দ' ভাষা নয়, কিন্তু ভাষারূপ দেহের অঙ্গ। পক্ষান্তরে বাক্-এর উপজীব্য বাক্য ঃ এই চিন্তা-ধারাটি মস্তিষ্কের জিনিস। ধ্বনি বা শব্দের মতো সহজে অনুকরণীয় নয়।[৪]

১.৪ বাগ্ বর্তনী

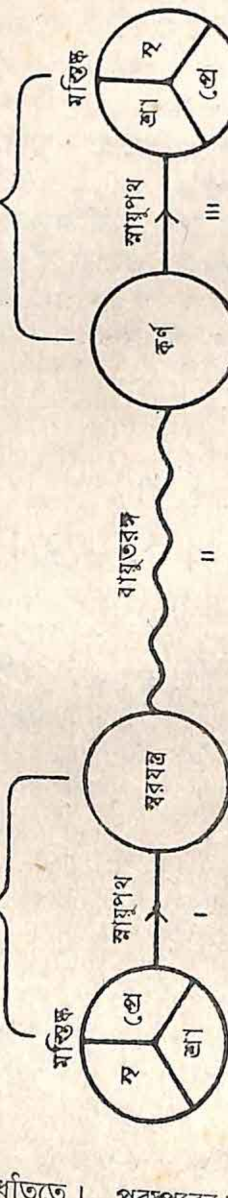
বাক্-ক্রিয়া ও ব্যবহারিক ঘটনার মধ্যে রয়েচে যোগসূত্র। ধরা যাক রাম ও শ্যাম রাস্তায় বেরিয়েচে এবং শ্যামের জলতেষ্টা পেয়েচে। শ্যাম একটি রব করে তার স্বরযন্ত্র, জিভ ও ঠোঁট দিয়ে এবং দোকানের একটি ডাব দেখায়। এতে রাম একটি কাটা ডাব এনে শ্যামের হাতে দেয় এবং শ্যাম জলপান করে। এ-সব ঘটনাপঞ্জীকে কালানুসারে সাজানো যেতে পারে এ-ভাবে ঃ

ক. বাক্-ক্রিয়া-পূর্ব ব্যবহারিক ঘটনাপুঞ্জ ;
খ. বাক্ ;
গ. বাক্-ক্রিয়া-উত্তর ব্যবহারিক ঘটনাপুঞ্জ।

এখানে ব্যবহারিক ঘটনা ক ও গ, আর খ বাক্। শ্যাম বক্তা এবং ক তার সম্পর্কে। তৃষ্ণার্ত বলেই তার জিভ ও কণ্ঠ শুষ্ক হয়েচে। রামের সঙ্গে তার সম্পর্কও এখানে কাজে লেগেচে। এ সবই শ্যামের বাক্-স্ফূর্তির পূর্বাবস্থা। গ প্রধানত শ্রোতা সম্পর্কীয়। রাম কাটা ডাব এনে শ্যামকে দিচ্ছে। এ হলো শ্রোতার প্রতিক্রিয়া বা সাড়া (hearer's response), যেমন শ্যাম সম্পর্কীয় ঘটনা বক্তার উদ্দীপনা (speaker's stimulus)। যখন একজনের থাকে উদ্দীপনা (stimulus) তখন অন্যজনের প্রতিক্রিয়ার (response) সহায়ক হলো ভাষা। এখানে খ-ই মুখ্য। প্রথমত বক্তা শ্যাম তার স্বরতন্ত্রী, নীচের হনু, জিভ প্রভৃতির চালনা এমনভাবে করেচে যে বায়ু ধ্বনি-তরঙ্গে রূপ নিয়েচে। এসব বিচলন উদ্দীপনার (S) প্রতিক্রিয়া হিসেবে। ব্যবহারিক প্রতিক্রিয়া (R) র পরিবর্তে অর্থাৎ নিজেই ডাব না ধরে, শ্যাম করেচে কণ্ঠ্য বিচলন অর্থাৎ বাক্ বা অনুকল্প (substitute) প্রতিক্রিয়া যাকে প্রকাশ করা যায় r-বর্ণ দিয়ে। কাজেই শ্যামের

প্রতিক্রিয়া দু'রকমের : ব্যবহারিক প্রতিক্রিয়া, যথা, S→R ; আর ভাষাতাত্ত্বিক অনুকল্প প্রতিক্রিয়া, s→r।

দ্বিতীয়ত, শ্যামের মুখবিবরস্থ বায়ুর ধ্বনি-তরঙ্গ পার্শ্ববর্তী বায়ুকে অনুরূপ তরঙ্গীয় গতিতে রূপান্তরিত করে। তৃতীয়ত, বায়ুর এই ধ্বনি-তরঙ্গ রামের কর্ণপটহে আঘাত হেনে করেচে তাকে স্পন্দমান এবং এরই প্রভাবে সে শুনেচে বাক্। এখানে রাম দু'রকমের উদ্দীপনায় সাড়া দিয়েচে : ব্যবহারিক উদ্দীপনা S-জাতীয়, যেমন—তৃষ্ণা ও ডাব-দেখা ; বাক্-অনুকল্পনীয় উদ্দীপনা, যেমন কর্ণপটহের স্পন্দন, যার প্রকাশ s-বর্ণ দিয়ে। কাজেই রামের কাজের দুটি অনুপ্রেরণা আছে—ব্যবহারিক উদ্দীপনা : S→R ; ভাষাতাত্ত্বিক অনুকল্প উদ্দীপনা : s→R লক্ষণীয় যে খ-এর তিনটি রূপকে চিহ্নিত করা যায় $খ_১$, $খ_২$, $খ_৩$ এভাবে। $খ_১$ হলো কণ্ঠ্য বিচলন ; $খ_২$ শ্রবণ ; ও $খ_৩$ ধ্বনি-তরঙ্গ। কাজেই বাক্‌হীন প্রতিক্রিয়া : S→R ; আর বাক্‌যুক্ত প্রতিক্রিয়া : S→r……s→R. বাক্-উচ্চারণের (খ) মানে আছে : এর অর্থ গুরুত্বপূর্ণ বস্তুসমগ্র যার সঙ্গে বাক্-উচ্চারণ (খ) সম্পৃক্ত অর্থাৎ ব্যবহারিক ঘটনাপুঞ্জ (ক ও গ)।[৫] তাইতো জনসমাজে একজন আরেকজনকে অবিরত বলে চলেচে : 'আবিরাবীর্ম এধি' অর্থাৎ হে স্বপ্রকাশ, তুমি আমার কাছে প্রকাশিত হও।



চিত্র : ১—বাগবর্তনী (speech circuit)

স্র = সৃজনবৃত্তি (creative function) ; প্রে = প্রেরকবৃত্তি (forwarding function) ;
শ্রা = শ্রাবণবৃত্তি (hearing function)

বাক্-সমাজ গড়ে ওঠে একই বাক্-চিহ্ন পদ্ধতিতে। পরস্পরের মধ্যে বাণী বিনিময়ের সেতুবন্ধ হলো বাগ্‌ধ্বনি। অবশ্য বিনিময়ের আছে একাধিক বাহন, যেমন ঢাক, পতাকা অঙ্গভঙ্গি ও লেখন। মাধ্যমের তারতম্য থাকলেও বাণীর নেই কোন নড়চড়। বক্তা সর্বদাই শ্রোতার কাছে প্রেরণ করে চলেচে তার

বার্তা, বাক্ নয়। বাক্ বা বার্তার এই গতিবিধিকে বাগ্‌বর্তনী বলে এবং এ এক নম্বর চিত্রে দেখান হয়েছে।

উপরের চিত্র থেকে এটা সুস্পষ্ট যে বাক্-এর আছে তিনটি পর্ব। প্রথম পর্বে আছে বক্তার মস্তিষ্ক ও স্বরযন্ত্র (I) ; দ্বিতীয় পর্বে বায়ুতরঙ্গ (II) ; তৃতীয় পর্বে শ্রোতার কর্ণ ও মস্তিষ্ক (III)। বাগ্‌বর্তনী এক মস্তিষ্ক থেকে অন্য মস্তিষ্কে বিস্তৃত। মস্তিষ্কের আছে দুটি বৃত্তি—সৃজনী ও প্রেরক। একটি বাগ্‌ধ্বনির স্রষ্টা ; অন্যটি এর প্রেরক।[৬]

১.৫ সৃজনী বৃত্তি

বাগ্‌ধ্বনির জন্মলগ্নে আছে গায়ত্রীর ব্যাহৃতি—"ওঁ ভূর্ভুবঃ স্বঃ", অর্থাৎ ভূর্লোক ভুবর্লোক ও স্বর্লোক। এই ব্যাহৃতিতে বিধৃত আছে বিশ্ব ভুবন এবং তারই অধিবাসী হিসেবেই একজন পাঠায় অন্যজনকে তার বাক্ বা বাণী বা বার্তা। এ বাণী ধ্বনিময়, তাই এর নাম বাগ্‌ধ্বনি অর্থাৎ এ সেই ধ্বনি যাতে প্রকাশিত হয় বাক্। "পাণিনীয় শিক্ষায়" তাই উক্ত হয়েছে—

আত্মা বুদ্ধ্যা সমেত্যার্থান্ মনো যুঙ্‌ক্তে বিবক্ষয়া।
মনঃ কায়াগ্নিমাহন্তি স প্রেরয়তি মারুতম্ ॥৬॥

অর্থাৎ আত্মা বুদ্ধির সঙ্গে বস্তু দেখে আর মনকে বলনের ইচ্ছায় অনুপ্রাণিত করে ; (তার পরে) মন দেহের আগুনকে উদ্দীপ্ত করে, যাতে বায়ু প্রেরিত হয়।[৭] সৃজনীবৃত্তি-ই এখানে মুখ্য আর এ বাক্-এর স্রষ্টা। বাগ্‌ব্যাহৃতিতে ভূর্লোকে আছে বক্তা, ভুবর্লোকে বায়ু এবং স্বর্লোকে শ্রোতা—এরা I, II ও III পর্বের প্রতীক।

১.৬ প্রেরকবৃত্তি

সৃষ্টির পরে শুরু হয় প্রেরণের কাজ। মস্তিষ্কের যে-অংশ পেশীয় গতির নিয়ামক তা এখন নির্দেশনামা পাঠায় এবং এ স্নায়বিক তাড়নায় রূপ নেয়। এখন মস্তিষ্ক যুক্ত হয় বাগ্‌ধ্বনীয় পেশীযন্ত্রের সঙ্গে অর্থাৎ ফুসফুস, স্বরযন্ত্র, জিভ প্রভৃতির সঙ্গে। আর নির্দেশনামা হলো সংশ্লিষ্ট পেশীতন্ত্রের প্রতি হুকুমজারি —এ হলো গতিপথের বিভিন্ন যোগাযোগ ও ক্রমের আদেশলিপি। এরই ফলে ধ্বনি ঠিক-ঠিক ক্রমে উৎসারিত হতে পারে।

১.৭ স্বরযন্ত্র

মস্তিষ্কে ও স্নায়ুপথে যা ঘটেছে তা এবার এলো পেশীতে। ফুসফুস হয় সংকুচিত, শুরু হয় স্বরযন্ত্রের স্পন্দন—জিভ নড়তে থাকে, হনুর ওঠা-নামা

চলে, আর ঠোঁট কখনো খোলে, কখনো বা বন্ধ হয় প্রভৃতি। এ-সবের একটাই উদ্দেশ্য এবং তা হলো বায়ুকে চলাচলের উপযোগী করা। ফলে ফুসফুস-নিষ্কাশিত বায়ুর উপর কাজ করে স্বরযন্ত্র—কখনো তাকে বাধা দেয়, কখনো বা তাকে ছেড়ে দেয়। চাপ-তরঙ্গের জটিল প্রবাহে এ মুখ থেকে নির্গত হয়। এ হলো পেশী-প্রবাহ থেকে বায়ু-প্রবাহে রূপান্তর। ফুসফুসস্থ বায়ু এখন বহির্বায়ুর সঙ্গে মিশে যায় এবং চারিদিকে ছড়াতে থাকে বায়ুচাপের বিভিন্ন তরঙ্গ। শেষকালে শ্রোতার কাছাকাছি এসে এই চলিষ্ণুবায়ু তার কর্ণে ঘা দেয় ও সাড়া জাগায়।

১.৮ কর্ণ

মানুষের কর্ণপটহ যথেষ্ট সংবেদনশীল নয়। বায়ুর চাপতরঙ্গেই ঘটে এর আন্তর ও বাহ্যগতি—বায়ুর গতির মতোই এই গতি। কর্ণপটহে ঘটে বায়বীয় গতির যান্ত্রিক গতিতে রূপান্তর। আর অন্তঃকর্ণেই ঘটে শেষ পরিণতি ঃ যান্ত্রিক স্পন্দ স্নায়বিক ক্রিয়ায় রূপ নেয় এবং স্নায়ুপথে যুক্ত হয় শ্রোতার কর্ণ ও মস্তিষ্ক। এখানেও আছে মস্তিষ্কের দু'টো কাজ—শ্রাবণবৃত্তি ও সৃজনীবৃত্তি।

১.৯ শ্রাবণ বৃত্তি

কর্ণাগত প্রেরণাগুলি গৃহীত হয় সদা-পরিবর্তনশীল গুণ ও দৈর্ঘ্যের, মীড় ও প্রাবল্যের ধ্বনিক পরিণাম হিসেবে। শ্রোতা বাক্ শোনে বটে, কিন্তু বুঝতে পারেনা, যেমন বিদেশী ভাষা। শ্রুতধ্বনির বোধগম্যতার জন্যে প্রয়োজন ব্যাখ্যার। এখানে মস্তিষ্কে-সঞ্চিত জ্ঞান শ্রোতার কাজে লাগে। অর্থাৎ কিনা মস্তিষ্কই সাংকেতিক ভাষার অনুবাদ ও ব্যাখ্যা ক'রে শ্রোতাকে সাহায্য করে।

১.১০ উচ্চার্য ধ্বনিবিজ্ঞান

চিত্র ঃ ১-এ ফেরা যাক। এর তিনটি এলাকা অর্থাৎ I, II ও III ধ্বনিবিজ্ঞানীর কাছে গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমেই তাঁর কাছে জরুরী হ'য়ে ওঠে কি করে বায়ু সচল হয়ে ঘটায় বাগ্‌যন্ত্রের স্পন্দন আর জন্ম দেয় এককধ্বনি ও ধ্বনিগুচ্ছ। এর জন্যে প্রয়োজন শারীরস্থান (Anatomy) ও শারীরবৃত্তের (Physiology) জ্ঞান। এখানে সহায়ক হলো রঞ্জন-রশ্মি (x-ray) আলোকচিত্র, যার অভিলেখনে

বিধৃত হয় জিহ্বা, কোমলতালু ও স্বরতন্ত্রীর (vocal cord) অবস্থান ও গতি। দ্বিতীয় সহায়ক হলো স্বরযন্ত্রদর্পণ (laryngoscope)। আর তৃতীয় সহায়ক হলো তাড়িৎ-পেশী-লেখ (electromyography)—এ স্বরপথে পেশী সংকোচনের সঙ্গে যুক্ত বৈদ্যুত বিভবের পরিমাপক। এরা চিত্রের I-চিহ্নিত অংশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ঃ এ উচ্চার্যধ্বনি বিজ্ঞান (Articulatory Phonetics).

১.১১ শাব্দ ধ্বনি বিজ্ঞান

ধ্বনি বিজ্ঞানীর কাছে দ্বিতীয় বিষয়টি হলো কি-ভাবে বক্তার মুখ থেকে বায়ুকম্পন শ্রোতার কর্ণে সাড়া জাগায়। এখানে ধ্বনি-বিজ্ঞানী পদার্থবিদের সগোত্র। পদার্থ বিদ্যার নিরিখে বায়ু-গতির বিশ্লেষণ ও পরিমাপ হলো ধ্বনি বিজ্ঞানীর কাজ। এখানে সহায়তা করে মাইক্রোফোন (microphone) বা মাইক (mike), যেখানে বায়বীয় গতি বৈদ্যুত ক্রিয়ায় রূপান্তরিত হয় শব্দে এবং ফল প্রকাশিত হয় কালিক কম্পন ও বিস্তারে। এ চিত্রের II-চিহ্নিত অংশের শাব্দ ধ্বনি বিজ্ঞানের (Acoustic Phonetics) পরিচায়ক।

১.১২ শ্রৌত ধ্বনি বিজ্ঞান

তৃতীয় বিষয়টি শ্রাবণ প্রক্রিয়া। এ মস্তিষ্ক-শায়ী শ্রাবণ সুবেদিতা। ধ্বনি বিজ্ঞানী এখানে কর্ণের শারীরতত্ত্বীয় কিংবা কর্ণ ও মস্তিষ্কের মধ্যস্থ স্নায়বিক ক্রিয়ায় উৎসাহী নন। কেমনে ধ্বনির পৃথকীকরণ ঘটে ও তার সীমারেখা নির্ধারিত হয় তাই তাঁর কাম্য। এরই সঙ্গে যুক্ত আছে অবশ্য মীড়, প্রাবল্য, দৈর্ঘ্য ও ধ্বনিগুণের সংবেদন। তাই যে রীতিতে এদের অন্বেষা চলে তাকে বলে পরীক্ষা-নির্ভর মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি। এ চিত্রের III-চিহ্নিত অংশের শ্রৌত ধ্বনি বিজ্ঞান (Auditory Phonetics)।[৮]

১.১৩ ছন্দোগুণ

ফার্দিনান্দ দ্য সোস্যুরে (Ferdinand de Saussure)—সুইজারল্যাণ্ডের পণ্ডিত-ভাষাতাত্ত্বিক—বিশ্লেষণে দুটি মাত্রার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন—বাক্প্রবাহিক ও পদপ্রকরণিক (Syntagmatic and Paradigmatic)। গড়ন ও তদ্ভব সবই ভাষার উক্তি-বিস্তারের সমান্তরে বাক্প্রবাহিক খণ্ড ও সম্পর্কের নির্দেশ করে। পক্ষান্তরে পদ্ধতি ও তদ্ভব সবই গড়নের বিভিন্ন স্থানের উপযোগী

তুলনীয় বিসদৃশ উপাদানের পদপ্রকরণকে সূচিত করে। তাই অক্ষর, শব্দ ও বাক্যে তৈরি হয় গড়ন এবং পারস্পরিক ও আভ্যন্তরীণ সম্পর্ক গড়ন-জাত। অন্যদিকে ভাষার পরিচিত স্বরত্রিভুজ ও চতুর্ভুজ এবং অক্ষর বা শব্দের নির্দিষ্ট স্থানের উপযোগী ব্যঞ্জন প্রস্ত বা গুচ্ছ ধ্বনিতাত্ত্বিক পদ্ধতির উদাহরণ। এ-ছাড়া ভাষায় শ্রেণীশব্দ (বাক্যগতপদ) ও তার বিভক্তি শ্রেণী হলো ব্যাকরণ পদ্ধতি।

এখানে ধ্বনি-বিজ্ঞান (Phonetics) ও ধ্বনিতত্ত্বের (Phonology) পার্থক্য নির্ণয়ের প্রয়োজন। ব্যাপকতর অর্থে এদের মধ্যে কোন ভেদ নেই; তবে সূক্ষ্মতর অর্থে আছে। ধ্বনির গড়ন, উচ্চারণ, শ্রুতি পড়ে প্রথমটির মধ্যে। এরই সহায়তায় স্বনমানের (phoneme) আবিষ্কার ও অবস্থান বর্ণনা দ্বিতীয়টির অন্তর্ভুক্ত। অবশ্য মার্কিন ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা ফোনোলোজির (phonology) জায়গায় আনতে চান phonemics বা স্বনমানশাস্ত্র। তবে দুয়ের পার্থক্যও আছে। স্বনমানশাস্ত্র ধ্বনির সম্ভাব্য উচ্চারণ-পার্থক্য বিশ্লেষণ করে এবং পরে পরীক্ষা-নিরীক্ষায় নির্ণয় করে মূলধ্বনি ও তাদের লেখন-পদ্ধতি—এ হলো মার্কিন ধ্বনি বিজ্ঞানীদের মত। কিন্তু ইউরোপীয় পন্ডিতেরা ফোনোলোজির সীমা আরো ব্যাপকতর বলে মনে করেন—সমগ্রভাষায় ধ্বনিটির অবস্থান, রকমারি পরিবর্তন ও বাক্‌স্রোতে গৌণ (secondary) স্বনমান আবিষ্কারও এরই আওতায় পড়ে। স্বনমান সম্পর্কে তিনটি মতবাদ আছে—বাস্তববাদ; ধারণাবাদ; ও নামবাদ। জোনস (Jones) প্রভৃতি বাস্তবাদীদের মতে স্বনমানের যথার্থ অস্তিত্ব আছে—এ "কায়াহীন বা বিমূর্তধ্বনি" হিসেবে অস্তিমান অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট ভাষায় আছে এর গঠন-সমগ্র। ত্রুবেৎসকয় (Trubetskoy) মনে করেন যে স্বনমান একটি মানসসমগ্র অর্থাৎ কিনা দেহ-ও-শব্দ-পায়ী ধ্বনির প্রতিরূপ ধারণা। অপর পক্ষে নামবাদী মনে করেন যে স্বনমান বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের অন্যান্য উপাদানের মতোই এক সংকারক কল্পনা (operational fiction)। এ সম্পর্কে ফার্থ বলেন, "আমরা ভাষার অনুশীলন করি সামাজিক প্রক্রিয়া হিসেবে। যাকে আমরা ধ্বনি-বিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব, বৈয়াকরণ বিন্যাস অথবা শব্দার্থ বিজ্ঞানের রীতিবদ্ধতা (systematics) বলি তারা সব ঘটনা বিচারের সুবিন্যস্ত পরিকল্পনীয় অঙ্কন মাত্র, একটি নির্দেশতন্ত্র বা মঞ্চ। এ-সব গড়নের কোন তত্ত্ববিদ্যক (ontological) মর্যাদা নেই এবং আমরা এদেরকে সত্তাবান বা অস্তিমান হিসেবে উপস্থাপিত করি না। এরা বিশ্বানুগও নয়, আবার বিশ্বাতিগও নয়, কিন্তু যেন ভাষা স্বভূমিতে প্রত্যাগত।"[৯]

বস্তুত ছান্দসিক বিশ্লেষণ হলো বিশ্লেষণের সংক্ষিপ্ত নাম, যাতে ব্যবহৃত হয় দুটি উপাদান—একটি ছন্দসমগ্র; অন্যটি স্বনমানিক (phonematic) একক। শেষোক্তটি অবশ্য স্বনমান বা স্বনমানী (phonemic) একক নয়ঃ বিশ্লেষণ চলতে থাকে স্বনমান থেকে স্বতন্ত্র পরিভাষায়। স্বনমানিক একক তৈরি করে স্বর ও ব্যঞ্জন উপাদান অর্থাৎ ভাষাতাত্ত্বিক গড়নের C বা V একক।

স্বনিক উপাদানের সিংহভাগই ছন্দসমগ্রের নির্দেশ দেয় ঃ আর ছন্দসমগ্র একাধিক খণ্ডে তৈরি এবং এর দৈর্ঘ্য সাধারণত বাক্যের চেয়ে দীর্ঘতর হয়না। কাজেই খণ্ড বা বিভাজন অনুসারে এর নামকরণ হতে পারে, যথা, অক্ষরের ছন্দসমগ্র, অক্ষরসমষ্টির ছন্দসমগ্র, বাক্যাংশের ছন্দসমগ্র ও বাক্যের ছন্দসমগ্র ; এমন কি শব্দের বা রূপমানের ছন্দসমগ্রও।[১০] ভাষা কথা হয়ে ফুটে উঠলে সে নিজেকে প্রকাশ করে রেখায়। ধ্বনি স্রোতের দীর্ঘতম একক বাক্য, আর নিম্নতম একক একেকটি ধ্বনি—এরাই এক একটি স্বর বা ব্যঞ্জন ধ্বনি। বাক্প্রবাহে নিঃশ্বাসের এক-প্রয়াসে উচ্চারিত হয় একটি অক্ষর এবং নিঃশ্বাস-নিষিক্ত যাবতীয় গুণই অক্ষরে বর্তায়। অক্ষর উচ্চারণের এই সামগ্রিক বৈশিষ্ট্যই ছন্দসমগ্র ফার্থের মতে। এই ছন্দসমগ্র অক্ষরকে অতিক্রম করে শব্দে আর শব্দকে অতিক্রম করে বাক্যে। অক্ষরের ঘোষতা, মহাপ্রাণতা, অনুনাসিকতা প্রভৃতি বিস্তৃত হয় শব্দে ও বাক্যে, যদি নাকি বাধা না পায়। এহেন গুণজাত ধ্বনিব্যঞ্জনা বাক্যটির ছন্দসমগ্র। তাই শব্দকুটের বাক্প্রবাহ পদ্ধতিতে রয়েচে আক্ষরিক গড়ন অর্থাৎ অক্ষরের সংখ্যা ও প্রকৃতি, মাত্রা, চাপ, সুর প্রভৃতি। এ তুলিত হতে পারে সংগীতের সুতান (melody) ও স্পন্দের (rhythm) সঙ্গে। বস্তুত স্পন্দ ছাড়া সুতান আসতে পারে না। তাই স্পন্দের সাংগীতিক বর্ণনায় এ হলো "মাপ-বিন্যাস" (grouping of measure) ; আর মাপ হলো "চাপ ও চাপহীনতার বিন্যাস" (grouping of stress and non-stress)। অধিকন্তু এই মাপ বা মান হলো এক দণ্ড-দৈর্ঘ্য যাতে বিধৃত হয় স্পন্দ বিন্যাস অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও শক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক। এ-ছাড়া স্বরতীক্ষ্নতা ও ধ্বনিগুণের পারস্পরিক সম্পর্ক বিন্যস্ত হয় চাপবোধ ও মান-সংঘের সঙ্গে। কাজেই ফার্থ মনে করেন যে সংগীততত্ত্বকে ছন্দতত্ত্ব নির্ণয়ে ব্যবহার করা যেতে পারে। এখানে অক্ষর হবে একেকটি স্পন্দ আর শব্দ দণ্ডদৈর্ঘ্য বা স্পন্দবিন্যাস এবং এ-বিন্যাসে বিধৃত হবে দৈর্ঘ্য, চাপ, সুর, গুণ, আনুনাসিকতা ও কণ্ঠধ্বনি। এর সূত্র হলো অক্ষরের পারস্পরিক সম্পর্ক যার আরেক নাম বাক্প্রবাহিক সম্পর্ক। স্বভাবতই এ পদক্রমিক বা বিভেদক সম্পর্ক থেকে স্বতন্ত্র।[১১]

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলায় অক্ষর, শব্দ ও বাক্যে উচ্চারণগত ছন্দসমগ্র ছ' রকমের যথা—

(১) ওষ্ঠ্যীভবন বা W-prosody—এ হলো ওষ্ঠ্য—জিহ্বায়ণ (labio-velarisation) যাতে ঠোঁটের বর্তুলাকৃতি রক্ষিত হয়। বিভিন্ন অক্ষর ও সমগ্র শব্দে ঠোঁটের বর্তুল রূপই W-prosody বা W-ছন্দসমগ্র। 'ও' এবং 'উ' উচ্চারণে ঠোঁট গোল হয়, তাই এর আরেক নাম ও-উ বর্তুলন, যথা ওপর, পুকুর।

(২) তালব্যীভবন বা Y-prosody—এ তালব্যীভবন (palatisation) নামে খ্যাত। তাই 'ই' 'এ' 'এ্যা' স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় জিভের সম্মুখভাগ সামনের তালুর দিকে উঁচু করে। আর 'আ' উচ্চারিত হয় সম্মুখ ও পশ্চাৎ

জিভের মিলনস্থানকে তালুর মূর্ধার দিকে উঁচু করে। এতে ঠোঁট হয় নির্লিপ্ত অথবা প্রসৃত। এই সম্মুখীভবনকে বলে Y-prosody যথা 'মা-আমার'> 'মায়ামার'।

(৩) ঘোষীভবন বা V-prosody—বাঙলায় প্রত্যেক স্বরধ্বনি-ই ঘোষধ্বনি। ঘোষধ্বনি উচ্চারণে স্বরতন্ত্রীগুলোতে কাঁপন লাগে আর অনুরণন হয়ে ওঠে সংগীতময়। ব্যঞ্জনধ্বনি ঘোষ ও মুক্ত হলে তার স্বরধ্বনি সংশ্লিষ্ট হয়ে একটি অক্ষর গড়ে তোলে। ঘোষতা তখন সমগ্র অক্ষর ঘিরেই উচ্চারিত হয়। অক্ষরের এই সামগ্রিক ঘোষীভবনকে voicing prosody বলে। যেমন 'আগে' শব্দটির 'আ' এবং 'গে' দুটি অক্ষরই ঘোষ এবং সামগ্রিক উচ্চারণেও শব্দটি ঘোষময়। তরঙ্গলেখী অনুরেখে (Kymograph tracing) ধরা পড়ে বাক্যে স্বরতন্ত্রী প্রকম্পনজাত একটানা তরঙ্গভঙ্গ (wave form)।

(৪) মহাপ্রাণীভবন বা H-prosody—এ হলো স্বরধ্বনির উপরে ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শ (Contact assimilation)। মহাপ্রাণ স্পর্শ ব্যঞ্জনধ্বনি 'খ', 'ছ', 'ঠ', 'থ', 'ফ', 'ঘ', 'ঝ', 'ঢ', 'ধ', 'ভ' কিংবা গলনালীয় স্পর্শহীন ঘোষ মহাপ্রাণ উষ্মধ্বনি 'হ', কিংবা 'হল',—'হ্ন', 'হ্র' প্রভৃতি মহাপ্রাণ ধ্বনি উচ্চারণে তাদের বিপরীত অর্থাৎ অল্পপ্রাণ ধ্বনিগুলোর তুলনায় এক ঝলক বেশি বাতাস বের হয়ে যায়। উদাহরণ হলো 'কাল' 'বুদ্ধি' প্রভৃতি।

(৫) নাসিক্যীভবন বা N-prosody—'ঙ', 'ন', 'ম'—এই তিনটি নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণে উচ্চারকেরা স্বস্থান স্পর্শ করতে না করতেই নরম তালু ঝুলে পড়ে এবং ফুস্‌ফুস্‌-নির্গত বায়ু নাসাপথে বের হতে গিয়ে তাদের পরবর্তী স্বরধ্বনির উপরেও প্রভাব বিস্তার করে। আর পরবর্তী স্বরধ্বনিতেও এ-নাসিক্য অনুসরণ সংক্রামিত হয়। এ নাসিক্যতা ব্যঞ্জনধ্বনির সংস্পর্শজাত। এ স্বনমানিক না হয়ে, হয়ে ওঠে ছান্দাসিক গুণান্বিত, যেমন 'মন, মামা, জননী' প্রভৃতি।

(৬) মূর্ধণ্যীভবন বা R-prosody—বাঙলার ট-বর্গীয় 'ট', 'ঠ', 'ড', 'ঢ' এবং তাড়ননাত 'ড়' ও 'ঢ়' ধ্বনি খাঁটি মূর্ধণ্য ধ্বনি নয়। বাঙলায় এদের উচ্চারণস্থল দন্তমূলেই। তবু এদের উচ্চারণে জিভের ডগা দুমড়ে যায় বলে পরবর্তী স্বরধ্বনিটিও একটি গাঢ় ব্যঞ্জনা লাভ করে। আর এ-স্বাদ R-prosody বা R ছন্দসমগ্রের অন্তর্গত, যেমন—'টাক, কাঠ,' প্রভৃতি।

এদের সমন্বয়ও দেখা যায় বাঙলা শব্দাক্ষরে, যেমন,

(১) V+H prosody—ঘর, রঘু;
(২) H+N prosody—খাঁটি, হাঁড়ি;
(৩) R+H prosody—ঠাকুর, মেঠো;
(৪) R+V prosody—ঢাকা, গাঢ়ো;
(৫) V+H+N+R prosody—ভাঁড়, ঘন্টা।[১২]

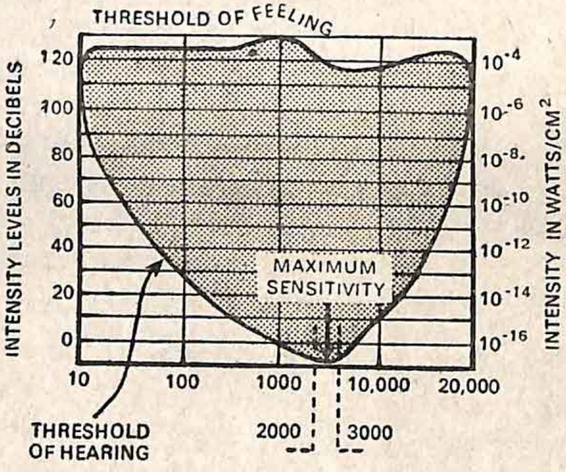
১.১৪ ভাষার ধ্বনি বৈশিষ্ট্য

ধ্বনি সম্পর্কে তিনটি জিনিষ জরুরী, যা দেখান হয়েচে চিত্র-১ এঃ উৎপত্তি ; সঞ্চারণ ; ও শ্রবণ। অনবচ্ছেদ উক্তিতে সদা-পরিবর্তনশীল ধ্বনিছাঁদ (pattern) দেখা যায়। এই পরিবর্তনশীল ছাঁদ-এ দ্রষ্টব্য যথাক্রমে (১) ধ্বনিগুণ অর্থাৎ স্বর ও ব্যঞ্জন বিচিত্রা ; (২) প্রস্বর অর্থাৎ উক্তির সুতান বা স্বরভঙ্গি ; (৩) প্রাবল্য অর্থাৎ কোন-কোন ধ্বনি বা অক্ষর অন্যের তুলনায় প্রবলতর ; আর (৪) দৈর্ঘ্য অর্থাৎ কানের কাছে কোন-কোন ধ্বনি দীর্ঘতর। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে সেতুবন্ধ স্থাপন করে সঞ্চারণ। ধ্বনির গুণ আছে এবং ভাষায় এর ভূমিকাও স্মর্তব্য ; এ-ছাড়াও রয়েচে দৈর্ঘ্য, প্রস্বর ও প্রচাপ। এ-সব বৈশিষ্ট্য স্বনমানসীমা পেরিয়ে যায় কাল দৈর্ঘ্যে এবং উক্তির উচ্চতর একক গ্রহণ করে। স্বরভঙ্গি (intonation) ছাঁদের প্রস্বরপরিবৃত্তির বেলায় বিশ্লেষণে স্থান পায় গোটা দীঘল উক্তি। এই অর্থে এ-সব বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় ছান্দসিক অর্থাৎ খণ্ডাতিগ (supra-segmental)। এই তিনটি বৈশিষ্ট্যই মাপা যায় শারীরবৃত্তীয় বা শ্রৌতভাবে—দৈর্ঘ্য কালব্যাপ্তি হিসেবে ; প্রস্বর মূল কম্পাংক হিসেবে ; আর প্রচাপ তীব্রতা, পেশীয় ক্রিয়া বা বায়ুচাপের মাপ হিসেবে।[১৩]

এখানে কর্ণই প্রধান শ্রোতার দিক থেকে। কর্ণ একটি সুবেদী ধ্বনি-গ্রহীতা, যা তরঙ্গরূপ, তীক্ষ্নতা ও দূরপাল্লার কম্পাঙ্কের সংনম্য তরঙ্গ মালায় সাড়া দেয়। এ প্রধানত একটি যান্ত্রিক-বৈদ্যুততন্ত্র যা চাপ স্পন্দকে ছোটখাটো বৈদ্যুত প্রবাহে রূপান্তরিত করে অনেকটা পিজো-বিদ্যুৎ কেলাসের (peizo-electric crystal) মতো ঃ সংনমিত বা দীর্ঘায়িত হলে এতে তৈরি হয় একটি ক্ষুদ্র তড়িচ্চালক বল। শ্রৌতস্নায়ুতে উৎপন্ন প্রবাহ মস্তিষ্কে নীত হয় আর অবশেষে এ হয়ে ওঠে শ্রৌত সংবেদনের পীঠ (seat) বা কোষ (repository)। প্রস্বর প্রত্যক্ষণের জন্য প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট কালপর্যায়ের, সাধারণত এক সেকেন্ডের ১/৫০ ভাগ।

নিম্নতম শ্রৌত কম্পাংক হলো ২০ চক্কর প্রতি সেকেন্ডে—নিম্নতর কম্পাংকের সুর অবছিন্ন স্পন্দ হিসেবেই অনুভূত হয়। আবার সেকেন্ড প্রতি ২০,০০০ চক্কর এর বেশি স্পন্দহার প্রস্বর সংবেদন জাগাতে পারে না ; কাজেই আমরা বলি কর্ণ এ প্রত্যক্ষ করতে পারে না। তীক্ষ্নতা পরিবর্তনের চেয়ে কান বেশি সুবেদী কম্পাংক পরিবর্তনে। তবে কোন-কোন ক্ষেত্রে সেকেন্ড প্রতি ২ চক্কর কম্পাংক পরিবৃত্তিও শিক্ষিত কান ধরতে পারে। শ্রাব্যতা সীমার উচ্চতর ও নিম্নতর সীমার কাছাকাছি কান হারায় তার প্রস্বর বিনিশ্চয়ের (discrimination) শক্তি। কুকুরের শ্রৌত সাড়া সেকেন্ডপ্রতি ৪০,০০০ চক্কর পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে এবং বাদুড় সাড়া দেয় সেকেন্ড প্রতি ৫০,০০০ চক্করের শব্দোত্তর (ultra-sonic) স্পন্দনে (cps)।

বেল টেলিফোন ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষায় দেখা গেছে যে মূল কম্পাংক মিশ্র ধ্বনিতরঙ্গ থেকে অপনীত হলেও প্রস্বর-সংবেদনের কোন হেরফের হয় না। আরেকটি আশ্চর্যের কথা এই যে অতি-নিম্ন ও অতি-উচ্চ শ্রৌত কম্পাংকে আপাত প্রস্বর সার্থকভাবে তীক্ষ্ণতা দ্বারা প্রভাবিত হয়। প্রাবল্যের সংবেদন ও সুর কম্পাংকে প্রভাবিত হয়। তাই বলা যায় যে ধ্বনি বর্ণালির মধ্যভাগে কম্পাংক বৃদ্ধিতে ঘটে প্রস্বরবৃদ্ধি। অবশ্য প্রস্বর (pitch) কোনক্রমেই কম্পাংকের আনুপাতিক নয়। কম্পাংক একটি মাপযোগ্য ভৌতরাশি; প্রস্বর হলো কিয়ৎ পরিমাণে কম্পাংকের অনির্দিষ্ট মন্ময় প্রতিরূপ (counterpart)ঃ তীক্ষ্ণতা ভৌত ও মাপযোগ্য দুই-ই; আর প্রাবল্য নিছক মনস্তাত্ত্বিক, তাই মাপযোগ্য নয়। স্বাভাবিক কান ১০০০ সিপিএস (cps) এর মানক (standard) কম্পাংক ১০$^{-১৬}$ ওয়াটস/সিএম^{২} (watts/cm^{২}) এর নিম্নতীক্ষ্ণতায় সাড়া দেয়; এবং ২০০০ ও ৩০০০ সিপিএস মধ্যস্থিত কম্পাকের ক্ষীণতর ধ্বনিতেও সক্রিয় হয়। কানের পক্ষে সবচেয়ে প্রবল ধ্বনি হলো ১০$^{-৪}$ ওয়াটস/সিএম^{২} (watt/cm^2) এর তীক্ষ্ণতা। কাজেই অবেক্ষণীয় কম্পাংকের ২০ঃ ২০,০০০ পাল্লায় সক্রিয় কানের তীক্ষ্ণতা পাল্লা হলো ১০$^{-১৬}$ ঃ ১০$^{-৪}$ বা ১ঃ ১০^{১২}।



চিত্র : ২—অবম (শ্রবণসীমা) ও চরম (অনুভূতিসীমা) এর মধ্যস্থ শ্রৌতাঞ্চল

প্রস্বর ও প্রাবল্যের পারস্পরিক নির্ভরতা দেখান হলো চিত্র ঃ ২ এ। চিত্রটি কার্যকর শ্রবণাঞ্চল প্রদর্শন করে। এতে আছে দু'টি বক্র (curve)—নীচেরটি শ্রবণ সীমা (threshold of hearing); উপরেরটি অনুভূতি সীমা (threshold of feeling)। প্রতিটি বক্রই অংকিত হয়েচে ডেসিবেলে প্রকাশিত (db)

তীক্ষ্ণতান্তরকে কোটি এবং সেকেণ্ড প্রতি চক্কর (cps) এ প্রকাশিত কম্পাংককে ভুজ ধ'রে। দু'টিই—কম্পাংক ও তীক্ষ্ণতা—লগারিদমীয় স্কেলে অংকিত। এ থেকে জানা যায় যে ২০০০ সিপিএস ও ৩০০০ সিপিএস এর মধ্যবর্তী কম্পাংকে কাল অতিমাত্রায় সুবেদী হয়। নিম্নতর কম্পাংকে শ্রবণসীমা তীক্ষ্ণভাবে বাড়তে থাকে ঃ তাই ১০০ সিপিএস-এ ৩০ ডিবি-এর অবম তীক্ষ্ণতার প্রয়োজন শুধুমাত্র ধ্বনিশ্রবণের জন্যে। ৩০০০ সিপিএস-এর উপরে শ্রবণসীমা আবার বাড়ে; ফলে শ্রাব্যতার উচ্চতর সীমায়—২০,০০০ সিপিএস—১২০ ডিবি-এর প্রয়োজন অবমশ্রবণের জন্যে যা লাগে বেদনার উৎপত্তিতে। এ-ছাড়া আরও জানা যায় যে তীক্ষ্ণতান্তর প্রকৃতপক্ষে শ্রাব্যতার পাল্লা সীমিত করে। তাই ৫০ ডিবি-এর তীক্ষ্ণতান্তরে সুর সীমিত হলে তা শোনার জন্যে দরকার হবে ৫০ সিপিএস ও ১৮,০০০ সিপিএস-এর মধ্যগ কম্পাংক। বিপরীতভাবে, ১০০ সিপিএস কম্পাংকে কানের তীক্ষ্ণতান্তরের পাল্লা হবে ৩০ ডিবি থেকে ১২০ ডিবি; কিন্তু ২০০ সিপিএস কম্পাংকে পাল্লা হবে ২০ ডিবি থেকে ১২০ ডিবি।[১৪]

১.১৫ স্বনমান ও স্ফোটবাদ

ভাষা অন্ততপক্ষে দু'টি স্তরে কাজ করে—একটি ধ্বনি; অন্যটি ভাব বা অর্থ। ভাষাতাত্ত্বিকের কাছে এরা অভিব্যক্তি (expression) ও আধেয় (content) নামে পরিচিত। এ ব্যবহৃত হয় পৃথিবীর ৩,০০০ ভাষা সম্পর্কে। ভাষার তিনটি প্রধান উপাদান হলো—(১) অভিব্যক্তির গড়ন; (২) আধেয়ের গড়ন; এবং (৩) শব্দকোষ। শেষেরটিতে বিধৃত আছে অভিব্যক্তি ও আধেয়ের নির্দিষ্ট সম্পর্ক অর্থাৎ শব্দ ও তার অর্থ। অভিব্যক্তিতন্ত্রের ভিত্তিক উপাদান হলো স্বনমান (phoneme)। এগুলি হলো কোন বিশিষ্ট বাক্-রূপের বক্তাদের মধ্যেকার অভিন্ন ধ্বনিবৈশিষ্ট্য, যা ঠিক-ঠিক পুনরাবৃত্ত হয়। যে কোন ভাষায় নির্দিষ্ট সংখ্যক স্বনমান দেখা যায়। ইংরেজিতে এদের সংখ্যা ৪৬। কাজেই স্বনমান-এর সংজ্ঞা হলো—এ কথ্য ভাষার অভিব্যক্তিতন্ত্রের একটি অবম বৈশিষ্ট্য, যাতে উক্ত বিষয় বক্তব্যবিষয় থেকে আলাদা করা হয়। লেখ্য ভাষার ভিত্তিক একক হলো লেখমান (grapheme), অবশ্য লেখ্যভাষা সাধারণত কথ্যভাষার প্রতিফলন এবং সীমিতভাবে স্বতন্ত্র। অভিব্যক্তি তন্ত্রের দ্বিতীয় ভিত্তিক একক রূপমান (morpheme)। এ হলো ভাষার অভিব্যক্তি দিকের একক যা আধেয় দিকের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। কাজেই অভিব্যক্তির গড়ন এই দু'টি ভিত্তীয় এককের বিন্যাস-ছাঁদের যোগফল। আধেয়ের তুলনায় অভিব্যক্তির প্রগতি হয়েছে অধিকতর। এরই মধ্যে দু'টির পরিশুদ্ধির অগ্রগতি ভাষাতত্ত্বের পক্ষে

বিশেষ সহায়ক হয়েচে—একটি উচ্চার্য ধ্বনিবিজ্ঞান ; অন্যটি শাব্দিক ধ্বনি বিজ্ঞান।[১৫]

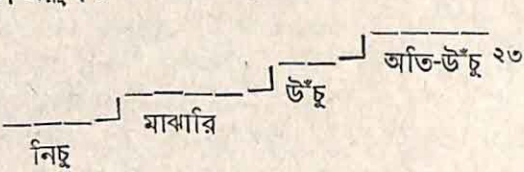
ভাষা হলো যোগাযোগের যন্ত্র, যার সাহায্যে মানুষী অভিজ্ঞতা প্রত্যেক সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিশ্লেষিত হয় এককে (unit) ঃ এরা একমান (moneme) অর্থাৎ প্রত্যেকের আছে একটি অর্থগত আধেয় ও ধ্বনিগত অভিব্যক্তি। এদের মধ্যে ধ্বনিক অভিব্যক্তি উচ্চারিত হয় স্বতন্ত্র ও ক্রমিক এককে, যাদের বলা হয় স্বনমান। এর অর্থ এই যে যোগাযোগের যন্ত্র হিসেবে ভাষার আছে (১) দ্বিধা উচ্চারণ ও (২) কণ্ঠ্য প্রকাশ। এইটুকুই শুধু অভিন্ন ভিত্তি—এ ছাড়া আর সবই ভাষায়-ভাষায় বিভিন্ন। প্রতিটি ভাষাই রৈখিকরূপ ও কণ্ঠ্যচরিত্রে অস্তিমান। কথ্যভাষার রৈখিকরূপ অবশ্য তার কণ্ঠ্য চরিত্র সঞ্জাত, কেননা এ কণ্ঠোক্তি কালে উৎপন্ন হয় এবং ক্রমিকভাবে কান তাকে প্রত্যক্ষ করে। ভাষায় আছে দ্বিধা উচ্চারণ অর্থাৎ এ প্রকাশিত হয় দু'টি স্তরে। প্রাথমিক উচ্চারণে অভিজ্ঞতার তথ্য বিশ্লেষিত হয় একক পারম্পর্যে, যার প্রত্যেকের থাকে একটি কণ্ঠ্যরূপ ও অর্থ। এখানে একটি ভাষাতাত্ত্বিক সম্প্রদায়ের অভিন্ন অভিজ্ঞতা সংগঠিত হয় এবং ব্যক্তিক বৈশিষ্ট্য বুঝাতে জুড়ে দেয়া হয় বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণকে, বিশেষণের সঙ্গে ক্রিয়া বিশেষণকে এইভাবে। যেমন 'বাক্'-এ বুঝায় একটি অর্থ ও একটি ধ্বনিরূপ। একে 'বা' ও 'ক'-এ ভাগ করে ও বিভিন্ন অর্থ দিয়ে 'বাক্'-এর অর্থ পাওয়া যাবে না। তবে ধ্বনিরূপ একক শ্রেণীতে বিভাজিত হতে পারে, যাতে 'বাক' 'তাক' বা 'থাকে' থেকে পৃথকীকৃত হয়ে যায়। একেই বলা হয় দ্বিতীয় উচ্চারণ। এরই ফলে অল্পসংখ্যক স্বতন্ত্র ধ্বনিগুচ্ছের সমবায়ে প্রাথমিক উচ্চারণের এককগুলির কণ্ঠ্যরূপ পাওয়া যায়, যেমন, 'বাক্'-এর দুটি ধ্বনিক একক 'বা' ও 'ক'। দ্বিধা উচ্চারণে আসে পরিমিতি। দ্বিতীয় উচ্চারণে পাওয়া যায় অতিরিক্ত পরিমিতি ; এবং এ-ছাড়াও রূপকে অর্থ থেকে মুক্ত করে। যেমন, 'ভালো'তে আছে 'ভা' ও 'লো' এবং এ উত্তম অর্থে ব্যবহৃত নয়—প্রতিটি উপাদান অন্যান্য চিহ্ন-এর সঙ্গে যুক্ত যথা 'কালোর 'লো', ও 'ভা'-এর 'ভা'। এজন্যেই একমান সীমাহীন হলেও স্বনমান সীমাবদ্ধ এবং শেষোক্তের সংখ্যা কাস্তিলীয়-তে ২৪ ; মার্কিন স্পেনীয়-তে ২২ ; ফরাসীতে ৩৫। স্বনমান বিবিক্ত, কিন্তু স্বরভঙ্গি অবিবিক্ত (discrete), স্বরের উঁচু-নিচুতার উপর নির্ভর করে বাক্যার্থ। সুতান বক্রই (melodic curve) অনবচ্ছেদের কারক ঃ এ স্বনমান থেকে আলাদা। কাজেই সুতান বক্রেই আছে ছান্দসিকতা, যা নেই নিছক স্বনমানে।[১৬]

এখানে স্মর্তব্য ভারতীয় স্ফোটবাদ। গ্রীকদের logos-ও যা, ভারতীয়দের 'স্ফোট'ও তাই। ফলে বলা হয়েছে ঃ "লোগোস ভাব ও শব্দের প্রতীক বলেই এ-তথ্য আশ্চর্যভাবে স্ফোট-ধারণার কাছাকাছি এসে যায়।"[১৭] কথ্যধ্বনি বা মুদ্রিতবর্ণ স্ফোট থেকে স্বতন্ত্র এই অর্থে যে প্রথমের মারফতে দ্বিতীয়টি প্রকাশ

পায়। গ্রীক logos-এ বুঝায় শব্দ, বাক্, যুক্তি ও আলোচনা। ইংরেজিতে চালু হয় ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে—শব্দটি হেলেনীয় ও নয়া—প্লেতবাদীরা নির্দিষ্ট অর্থে ব্যবহার করতেন। বাইবেলের নয়া সমাচারে এর অর্থ হলো 'শব্দ' এবং যীশুখ্রীষ্ট বুঝাতে ব্যবহৃত হতে লাগল।[১৮] "স্ফোটবাদে" নাগেশভট্ট স্ফোট-কে দুভাবে বর্ণনা করেন—(১) এমন কিছু যা থেকে অর্থ বেরোয় বা চক্‌চক্ করতে থাকে ; ও (২) এমন একটি সত্তা যা কথ্যধ্বনিতে প্রকাশ পায়।[১৯] কাজেই স্ফোট একটি দুপাশ্বীয় মুদ্রা—একদিকে ধ্বনি, অন্যদিকে অর্থ। নাগেশ ভট্ট অবশ্য এই স্ফোটবাদকে ঋষি স্ফোটায়ণের মতবাদের সঙ্গে সংযুক্ত করেচেন। ভর্তৃহরি মনে করেন তাঁর "বাক্যপদীয়"—এ যে স্ফোট একটি অখণ্ড ও পরিবর্তনহীন ঐক্য। শব্দধ্বনি ও শব্দার্থ মিলে গড়ে তোলে স্ফোট। অবশ্য মনে রাখতে হবে যে স্ফোটবাদে শব্দধ্বনি শুধুমাত্র ভাব প্রকাশ করে, কিন্তু তাকে সৃষ্টি করে না। এ প্রসঙ্গে বাক্যস্ফোট অখণ্ড একক এবং স্ফোটবাদের একমাত্র বাস্তব উপাদান। স্ফোট-শব্দটি তৈরি হয়েচে স্ফুট্+অচ্ কর্তৃবাচ্যে—এতে বুঝায় পরপর উচ্চারিত বর্ণ দ্বারা অভিব্যক্ত শব্দ। ভর্তৃহরি মনে করেন যে যোগাযোগ সাধিত হয় বাক্যে, একক শব্দে নয়। আর যোগাযোগে বুঝায় বক্তা তার মনের কথা শ্রোতাকে জানায়। এই মনের কথা ঐক্যে অস্তিমান, আর ঐক্য হলো বাক্য। শ্রোতাও যখন এই ঐক্য ধরতে পারে অর্থাৎ শব্দার্থ, তখনি যোগাযোগ ঘটে।[২০]

এবার স্বনমানের কথা। Daniel Jones-এর অনুসরণে বলা যায় যে, "স্বনমান হলো কোন ভাষায় ধ্বনিগুচ্ছের একটি গোষ্ঠী, যারা চরিত্রের দিক থেকে পরস্পর সম্পর্কিত এবং এমনভাবে ব্যবহৃত হয় যে কোন সদস্যই কখনো অন্যজনের মতো একই ধ্বনি পরিবেশে থাকে না"।[২১] অর্থাৎ ভাষায় ব্যবহৃত ধ্বনি সমরূপতা দেখে তাদের গোষ্ঠীভুক্ত করা চলে, যদি এদের ব্যবহার বৈচিত্র্য ধ্বনি পরিবেশের উপর নির্ভরশীল হয়। এবং এই গোষ্ঠীর নামই হবে স্বনমান (phoneme) ; ধ্বনির সাধারণ নাম phone বা স্বন। একই স্বনমানের মধ্যে পাওয়া যায় যে সব সমরূপ ধ্বনি ব্যবহারের দিক থেকে তাদের পারস্পরিক বিভিন্নতা বিচার করে নাম দেওয়া যায় উপধ্বনি (allophone)। বাঙলায় ।ড। এবং ।ড়। একই স্বনমানের অন্তর্গত এবং ঐ দুটি উপধ্বনি।[২২] এখানে উল্লেখ্য যে ইংরেজিতে ৪৬টি phoneme বা স্বনমানের উল্লেখ করেছেন Gleason এভাবে, ব্যঞ্জন—২৪ ; স্বর—৯ ; অর্ধস্বর—৩ (y,w,h-এর মধ্যে ওয়াই. ডবল্যু ব্যঞ্জনের সঙ্গেও) ; মুক্ত ক্রান্তি (open transition)—১ (+) ; প্রচাপ—৪ (/ ∧ ∖ ∨) ; প্রস্বর —৪ (১ ২ ৩ ৪) ; এবং বাক্যাংশে ছেদ (clause terminal)—৩ (↗ ↘ →) night rate ও nitrate তুলনা করলেই পাওয়া যাবে মুক্ত ক্রান্তির দেখা—প্রথমে আছে ছেদ (break), night ও rate-এর মধ্যে, কিন্তু দ্বিতীয়ে তা নেই। দ্বিতীয়ত, প্রচাপ চাররকমের—প্রাথমিক /, দ্বিতীয় ∧, তৃতীয় ∖ এবং দুর্বল

V । প্রস্বর ।১। নিম্ন, প্রস্বর ।২। মধ্য, প্রস্বর ।৩। উচ্চ, এবং প্রস্বর ।৪। অত্যুচ্চ। আর বাক্যাংশ ছেদ তিন প্রকারের ঃ (১) ম্লায়মান (fading)—স্বর দ্রুত নৈশব্দ্যে লীন হচ্ছে এবং এতে প্রস্বর ও আয়তনের দ্রুত হ্রাস ঘটে ; (২) বর্ধমান (rising) —প্রস্বরের আকস্মিক, দ্রুত ও স্বল্প বৃদ্ধি, তবে আয়তন দৃশ্যত ততটা নড়চড় হয় না, কিন্তু তৌলনভাবে বিচ্ছিন্ন হয় ; (৩) পোষিত (sustained)—প্রস্বর-পোষণ ঘটে বাক্যাংশের অন্ত্যাক্ষরের দীর্ঘীকরণে ও আয়তন হ্রাসে। লিপিতন্ত্রে এদের প্রকাশ এরূপ ঃ



প্রশ্ন জাগে বাঙলার অবস্থা কি ? এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। তাঁর মতে মোট স্বনমান ৪০—৩৫টি মুখ্য ও ৫টি গৌণ। মোফজ্জল হায়দার চৌধুরীর মতে এ সংখ্যা ৩৭—ব্যঞ্জনমূলক ৩০ ; স্বরমূলক ৭। আবদুল হাই মনে করেন মোট স্বনমানের সংখ্যা হলো ৬০—স্বর ৮ ; অর্ধস্বর ৪ ; দ্বৈতস্বর ১৯ ; ব্যঞ্জন ২৯। এ ছাড়া আছে অনুনাসিক একটি ँ এবং স্বনমান না হয়েও বাঙলা ভাষায় তৎসম শব্দের ধ্বনি-স্বাতন্ত্র্য পাঁচটি, তথা, হৃ, হ্ব, হ্ন, হ্ম ও ঃ। এঁরা কেউই Gleason এর মুক্ত ক্রান্তি, প্রস্বর, প্রচাপ ও বাক্যাংশ যতির উল্লেখ করেন নি স্বনমান বর্ণনায়।[২৪] ছন্দনির্ণয়ে এরাই মুখ্যভূমিকা গ্রহণ করে। তাই এদের কথাই এখন বলা হবে।

প্রথমেই মুক্ত ক্রান্তির কথা (+)। এ হলো বিভাজনের অতিরিক্ত স্বনমান বা গৌণ স্বনমান যা শব্দের সীমানা চিনিয়ে দেয়। একে সন্ধি (juncture)ও বলে। টানা কথায় অনেক সময় শব্দগুলো জুড়ে-জুড়ে উচ্চারিত হয়। (+) তার পূর্বেই ধ্বনিগুলোর পুরোপুরি উচ্চারণ করে, একটু বিরাম দিয়ে পরের শব্দটির উচ্চারণ করে, যেমন 'জলপাই' নয়, জল (+) পাই কোথায় বল। এ রকম আরো উদাহরণ—চুপ (+) সে ঃ চুপসে ; কার (+) খানা ঃ কারখানা।

দ্বিতীয়ত, প্রচাপ। সাধারণত এ ব্যবহৃত হয় কখনো বক্তার বিবক্ষার গুরুত্ব দিতে, যথা, /যতই বলনা কেন…/ কখনো বা ক্রোধে বা বিরক্তি প্রকাশে, যেমন, /যত বলছি আমি জানিনা/ তবে শব্দের অর্থ-গুরুত্ব থাকার দরকার, যথা, /কাজ/, /কাজল/ প্রভৃতি। উপসর্গ বা লঘু অর্থযুক্ত পদাংশ থাকলে কিন্তু প্রচাপ পড়ে না, যেমন, /প্র'ধান/, /উপ'কার/ ইত্যাদি। প্রচাপের গুরুত্ব অনুসারে তার বহু ক্রমভেদ দেখা যায়। তবে তিনটিই সাধারণত দ্রষ্টব্য—প্রবল ; গৌণ ; ও দুর্বল। তিনের অধিক অক্ষরের পদে বিশেষত সমাসবদ্ধ পদে একটি প্রবল ও একটি গৌণ প্রচাপ দেখা যায়, যথা, 'আলু-ভা`জা ; 'রেল-গা`ড়ি ইত্যাদি।

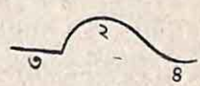
অনেক সময় স্বতন্ত্রপদের প্রচাপ পদসংযোগে খর্ব হ'য়ে যায় এবং তখন শ্বাস-পর্বের (breath group) প্রধানপদে প্রবল প্রচাপ পড়ে আর অপ্রধান শব্দে গৌণ প্রচাপ বা দুর্বল প্রচাপ, যেমন ˊবাংলা ˋআমাদের ˊমাতৃ-ˋভাষা। প্রচাপের ফলে অনেক সময় ঐ অক্ষর ছাড়া অন্য অক্ষরের স্বর দুর্বল হয়ে লুপ্ত বা হ্রস্ব হ'য়ে যায়। যেমন আচ্ছা>চ্ছা, গামোছা>গাম্‌ছা। প্রচাপের জন্যে ঐ অক্ষরের স্বরও দীর্ঘ বা ব্যঞ্জনদ্বিত্ব হয়, যথা। ˊভী-ষণ।,। ˊকক্‌খনো-না।।

তৃতীয়ত, আছে প্রস্বর। ভাষায় দেখা যায় প্রচাপ-প্রস্বন (stress accent) ও প্রস্বর-প্রস্বন (pitch accent)। স্বরতন্ত্রীর কম্পনের দ্রুততার উপর স্বরের বা সুরের (tone) পার্থক্য নির্ভর করে। বৈদিক ভাষায় 'উদাত্ত' (উঁচু), 'অনুদাত্ত' (নিচু) এবং 'স্বরিত' (উঁচু ও নিচুর মিশ্র) স্বর বা সুরে উচ্চারণ চলতো। প্রচাপের চেয়ে প্রস্বরই তখনকার বৈশিষ্ট্য ছিল। ইংরেজিতে যেমন প্রচাপ-পরিবর্তনে অর্থ পরিবর্তন ঘটে, তেমনি বৈদিক ভাষাতেও ও সুরের স্থান পরিবর্তনে অর্থ পরিবর্তিত হতো। তাই ইংরেজিতে dˊesert=মরুভূমি (বিশেষ্য); desˊert ত্যাগকরা (ক্রিয়া); বৈদিক ভাষায় ˊরাজপুত্র=রাজা পুত্র যার (বহুব্রীহি); রাজপুˊত্র=রাজারপুত্র (তৎপুরুষ)। শেষের দিকে সুরারোপ চলে গেল। আর প্রচাপ-প্রবণতা দেখা দিল। বাঙলায় সুরারোপ (প্রস্বর) প্রচাপের সঙ্গে কিছু শব্দে যুক্ত থাকলেও তেমন উল্লেখ্য নয়। তবে বাক্যের মধ্যে সুরের ওঠানামা লক্ষণীয়। এখানের প্রস্বর ও বাক্যাংশছেদ মিলে যায় আর এর নাম দেওয়া যায় "সুরতরঙ্গ" বা স্বরভঙ্গি (intonation)। এ হলো স্বনমানাতিগ (suprasegmental phoneme) রেখভঙ্গি (contour)। এ অবশ্য নির্ভর করে বাক্যের প্রকৃতির উপর—বিবৃতিমূলক বাক্যে (statement)এ উঁচু থেকে নিচে নামে; প্রশ্নসূচক পদের উপর উঁচু সুর; প্রশ্নসূচক পদ না থাকলে স্বরতরঙ্গ শেষের দিকে উঁচু হয়; বিস্ময়সূচক বাক্যে চলতে থাকে সুরের ওঠানামা।[২৫]

এরই পটে রেখভঙ্গি চারটি স্বরগ্রামের মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে, যথা—

১। উদাত্ত—আপেক্ষিকভাবে সর্বোচ্চ
২। নিম্ন-উদাত্ত—সর্বোচ্চের তুলনায় নিচু } মধ্য বা স্বরিত
৩। উচ্চ-অনুদাত্ত—সর্বনিম্নের তুলনায় আপেক্ষিক উচ্চ }
৪। অনুদাত্ত—আপেক্ষিকভাবে সর্বনিম্ন।

তাই "ওখানে একটা বাঘ ছিল"—এর রেখভঙ্গি হবে:



এবং "তুমি কখন এলে?"—এর রেখভঙ্গি দেখাবে:



[২৬]

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সঞ্চালক ধ্বনিবিদ্যা

ধ্বনিগুলি করেচি হনন,
শব ব্যবচ্ছেদ ক'রে চালিয়েচি তাদের উপর
বীজ গণিতের সাথে সঙ্গীত-পরীক্ষা অগনন……

—পুশ্‌কিন[১]

২.১ ভাষার ভাষ্যকার

সুস্বরের জন্যে প্রয়োজন দু'রকমের অধিসুর (overtone) বা প্রস্বরাবয়বের (format)। একটি নিচু প্রস্বরাবয়ব যার কম্পাংক ৫০০ চক্করের কাছাকাছি ; অন্যটি ২,৪০০ থেকে ৩,২০০ চক্করের মধ্যবর্তী উঁচু প্রস্বরাবয়ব। প্রথমটি স্বরকে দেয় অনুনাদ (resonance) বা অনুরননশীলতা (sonority) ; দ্বিতীয়টি দেয় ঘন্টাধ্বনি (ring) বা ঝিকিমিকি (shimmer)। তবে স্বর সম্পর্কে মোদ্দা-কথা হলো এর বহনক্ষমতা ঃ গায়কেরা সাধারণত বহন (carry) শব্দটি ব্যবহার করেন দীঘল পথে পোঁছানোর স্বরসামর্থ্য বুঝাতে। একটি যন্ত্র আছে, নাম তার স্পন্দজ্ঞাতা (rhythmicon)। এ হলো এমন একটি কৌশল যাতে সংগীত স্পন্দের অনুশীলন ও বিশ্লেষণ চলে। বিজ্ঞান প্রয়োগে সংগীতের হয়েচে সম্প্রসারণ। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে জারিপভ পরিগণক (computer) থেকে সংগীত সৃষ্টি করেচেন ঃ এ হলো প্রথম সংখ্যা নির্ণায়ক প্রক্রিয়া (algorithm) অর্থাৎ সুতান সৃষ্টির এক প্রস্ত গণিতীয় নিয়মাবলী। এই সংগীত যন্ত্রে-পরিবেশিত জ্ঞান-সঞ্জাত, কিন্তু মানুষী অনুপ্রেরণাজাত নয়। পরে জারিপভ 'জ্ঞান-ই শক্তি' নামীয় একটি বিজ্ঞান পত্রিকায় তাঁর সংগীতের নাম দেন 'উরাল সুর' (the Urals tune)।

এ ছাড়াও আছে স্বতশ্চল কল ও দূরনিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠানের (Automation and Telecontrol Institute) আবিষ্কার, নাম যার আলো-শব্দ-বিদ্যুৎ রূপান্তরিত্র (electro-acoustical-optical converter)। এটি তৈরি করেচেন কনস্তান্তিন লিওন্তিয়েভ ও এ. ইয়. লার্নার। যন্ত্রটি মানুষকে দেয় এক আপাত বিরোধী (paradoxical) শক্তি—'চোখ দিয়ে শোনা'। যন্ত্রটি দৃষ্টি ও শ্রবণ সম্পর্কীয় এক পরিছিন্ন প্রকল্পের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং চোখের মাধ্যমে মস্তিষ্কে পাঠায় ধ্বনিক তথ্য। এ মাইক্রোফোনে সংগীত শোনে, তক্ষুনি বিশ্লেষণ

করে, রঙের উপযোগী নাটক তৈরি করে আর শ্রোতৃমণ্ডলীর দর্শনের জন্যে তাকে উপস্থাপিত করে। কাজেই বলা চলে যে ভবিষ্য গায়ক হবেন একাধারে পদার্থবিদ ও কবি আর শুভমিলন ঘটাবেন জ্ঞান ও অনুপ্রেরণার।[২] বিজ্ঞান তাই একদিকে যেমন ভাষার ভাষ্যকার ; অন্যদিকে তেমনি নবসৃষ্টির উৎস।

২.২ শ্বসন-ক্রিয়া

অবম স্থিতিস্থাপকতা (elasticity) থাকা সত্ত্বেও ফুসফুস দু'টি স্বকীয় শক্তিতে বিচলন (movement) ঘটাতে অপারগ, যদিও তাদেরকে একসঙ্গে নিষ্পিষ্ট (squeezed) ক'রে যথেষ্টভাবে সম্প্রসারিত করা হয় দন্তমূলগুলিকে বায়ু প্রবেশের জন্যে খুলে দিয়ে। ফুসফুসের উৎসার (inflation) ঘটে বহিস্তলীয় চাপের হ্রাসে এবং বহির্বায়ুর প্রবেশোন্মুখতায় ; আর অবসার (deflation) ঘটে বহিস্তলীয় চাপের বৃদ্ধিতে এবং অন্তর্বায়ুর বহির্গমনের বাধ্য-বাধকতায়। এ চাপকে অপরা (negative) বলে যখন এ বহির্বায়ু থেকে কমে যায় ঃ আর একে পরা (positive) বলে যখনি এ থেকে বেড়ে যায়। এ কাজ দেখা যায় "লৌহফুসফুস" বা ড্রিঙ্কার শ্বাসযন্ত্রে (Drinker Respirator)—গোটাবক্ষকে বায়ুরোধী প্রকোষ্ঠে পুরে দিয়ে পাম্প প্রক্রিয়ায় বায়ুচাপের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো হয়। প্রকৃতিও একই কাজ করে—এ ফুসফুসকে বায়ুরোধী প্রকোষ্ঠে অর্থাৎ প্লুরায় (pleura) পুরে দিয়ে ঘটায় প্রয়োজনীয় পরা ও অপরা চাপ বক্ষ-বিচলনে। প্লুরা ফুটো হলে অপরা চাপ অসম্ভব হ'য়ে যায়। যে বক্ষবিবরে (thoracic cavity) ফুসফুস দু'টি অবস্থান করে তা উপরে ও পাশে পাঁজর-পিঞ্জরে বদ্ধ। নিম্নতর সীমানা হলো একটি বৃহৎ পেশীয় তন্তু-কলার আস্তরণ (sheet)—আকৃতি উঁচু গম্বুজের মতো, তবে অবতল (concave) দিকটা নিচের দিকে। একেই বলে মধ্যচ্ছদা (diaphragm)—সামনের দিকে এ উরঃফলক (sternum) বা বুকাস্থি (breast bone)-র এবং প্রতিপার্শ্বেই নিম্নতর ছ'খানি পশুকার (rib) কোমলাস্থির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পিছন দিকে এ যুক্ত হয়েচে কশেরুকার (lumbar vertebrae) সঙ্গে। মধ্যচ্ছদাই হলো শ্বসনের প্রধান পেশী। পেশীতন্তুর সংকোচনে মধ্যচ্ছদার খিলান নিম্নগামী হতে থাকে যে পর্যন্ত না নিম্নগতি প্রতিহত হয় কুক্ষি-দেয়াল-সমর্থিত অন্ত্রাবরোধী নিচ-তলাকার চাপে। আর শিগ্গিরই এ-বিন্দু এসে যায়।

মধ্যচ্ছদার কেন্দ্র অন্তশায়ী হলে এ আরো সংকুচিত হয় এবং সম্মুখ ও পার্শ্বস্থ গড়নকে উপরে তুলে ধরে অর্থাৎ নিচের পাঁজর ও উরঃফলককে। এসব বিচলন বক্ষবিবর সম্প্রসারিত করে এবং ফুসফুসের বহিস্তলীয় চাপ কমায়। বহির্বায়ুর প্রবেশ পথ যদি শ্বাসনালী পর্যন্ত মুক্ত থাকে তবে ফুসফুসের অন্তস্তলীয় চাপ ও বহির্বায়ুর চাপ তুল্য মূল্য হবে। যখনি ফুসফুসের

বহিস্তলীয় চাপ মধ্যচ্ছদা ও পাঁজর পিঞ্জরের বিচলনে হ্রাস পায় এমনভাবে যে অন্তস্তলীয় চাপের নিচে নেমে যায়, তখনি বায়ু ফুস্‌ফুসে ঢুকতে শুরু করবে এবং প্রশ্বাস বইবে। বক্ষপ্রকোষ্ঠের চাপ কম্‌লে ফুস্‌ফুসগামী বায়ু বক্ষবিবরে এই সবগড়নের স্ফীতি ঘটাবে যে পর্যন্ত না বহিস্তলীয় চাপ অন্তস্তলীয় চাপের সমান হয়। মধ্যচ্ছদার পেশী শিথিল হলে বক্ষদেয়ালের উত্তোলিত অংশের ওজন, অন্ত্র ও কুক্ষিদেয়ালের স্থিতিস্থাপক ধাক্কায় মধ্যচ্ছদা উপরে উঠবে। এতে বক্ষবিবরের পরিমান কমাবে এবং ফুস্‌ফুসের বহিস্তলীয় চাপ বাড়াবে প্রতি এককক্ষেত্রে। ফলে ফুস্‌ফুস্‌ থেকে বায়ু নির্গত হতে থাকবে যে পর্যন্ত না অন্তস্তলীয় ও বহিস্তলীয় চাপ সমান হয়। কোন কারণে মধ্যচ্ছদার বিচলন সীমিত হলে, প্রয়োজনীয় অপরা চাপ সৃষ্টি হতে পারে প্লুরাতে বক্ষ দেয়ালের উত্তোলনে। বস্তুত এ সব দেয়াল সাধারণত মধ্যচ্ছদার অবনতির সঙ্গে সঙ্গে কিছুটা উত্তোলিত হয় অতীব শান্তভাবে অন্য সবরকম শ্বসনে।

মনে রাখতে হবে যে দু'রকমের শ্বসন পেয়েচে স্বীকৃতি। একটি কুক্ষীয়, যেখানে মধ্যচ্ছদা প্রধান চালক ; অন্যটা বক্ষীয়, যেখানের মধ্যচ্ছদার বিচলন স্বল্পতম, কিন্তু উপরের পাঁজর পিঞ্জরের বিচলন আরো ব্যাপক। এখানে অঙ্গবিন্যাস, পরিচ্ছদ বা প্রথা একটি বা অন্যটির পরিপোষক।[৩]

২.৩ বিরাম বা বাক্‌শ্বসন

দেহের বিশ্রামকালে শ্বসনের হার নির্ধারিত হয় রক্তপ্রবাহের প্রয়োজনে। রক্তের কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রান্তিবিন্দুতে পেঁছালে, মধ্যচ্ছদা সংকোচনের কারক স্নায়ুগুলি আপনা-আপনি উত্তেজিত হয়ে ওঠে আর নতুন বায়ু প্রশ্বসিত হয়। সামগ্রিকভাবে বিরাম শ্বসনের স্বাভাবিক হার হলো মিনিট প্রতি ১০ থেকে ২০টি প্রশ্বাস (inhalation)। বিরাম শ্বসনের ঘটনা পরম্পরা হলো প্রশ্বাস, নিঃশ্বাস ও বিরাম। তবে বিরাম একেবারে লোপ পেতে পারে, যদি শ্বসনের হার বাড়ে অথবা নিঃশ্বাসের আপেক্ষিক বেগ কমে। বিরাম ও একটি দশা, যখন আপেক্ষিক—চরম নয়—নিষ্ক্রিয়তা দেখা যায়। প্রশ্বাসের বিচলনে যে সব দেহাবয়ব স্থানচ্যুত হয় তারা আবার প্রায় প্রাথমিক অবস্থানে ফিরে আসে নিঃশ্বাসকালে স্বকীয় ওজন ও স্থিতিস্থাপকতা গুণে। নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের কাল দৈর্ঘ্য প্রায় সমান—এদের অনুপাত প্রায় ১ঃ১.১। তাই প্রশ্বাস বিচলন শুরু হওয়ার পূর্বেই এইসব দৈহ্যগড়ন প্লুরাস্থিত ফুস্‌ফুস্‌কে আরো সংনমিত করে, তবে অতিহ্রাস-করা হারে। মাঝে মাঝে বিরাম শ্বসন আবর্তনে পূর্ণ ভারসাম্য আসে, কিন্তু এসব ঘটনা বিরল। প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাস

দশার চেয়েও আরো স্পষ্টভাবে এইসব আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তা বা বিরাম পর্যায় বিভিন্ন ব্যক্তির শ্বসনে ভিন্নতর। বিরামকে নিঃশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করলে দুটি দশাই লক্ষণীয় হ'য়ে ওঠে—প্রশ্বাস বনাম প্রশ্বাসহীনতা—এবং প্রথমটি ও দ্বিতীয়টির ব্যাপ্তিকালের অনুপাত দাঁড়ায় ১ঃ২। এ অবস্থা দেখা যায় যখন শ্বাসগ্রহণকারী উপবিষ্ট হয়ে বিশ্রাম নেয়। বিশ্রাম-শ্বসনের বিচলন মন্থরতম হয় যখন সে থাকে হেলান অবস্থায়; আর দ্রুততম হয়, যখন সে খাড়া দাঁড়িয়ে থাকে।

উক্তির প্রকৃতির উপর নির্ভর করে বাক্-শ্বসনের হার। আমরা ঘোষবর্গে (breath group) কথা বলি অর্থাৎ ন্যূনাধিক ঘন-সমাকলিত ধ্বনিক্রমে এবং এদের প্রত্যেক দুটির মধ্যে আমাদের নতুন প্রশ্বসনে। কাজেই বাক্-শ্বসনের হার বাক্-প্রকারের সঙ্গে বদলায়। প্রায়ই এই হার বিরাম-শ্বসনের চেয়ে মন্থরতর; আরও বেশি এ দ্রুততর। বাক্-শ্বসনে অবশ্য বিরাম-শ্বসনের আপেক্ষিক নিষ্ক্রিয়তা বা বিরতির কোন দশা নেই। প্রশ্বাস বিচলন অতিমাত্রায় ত্বরান্বিত হয় এবং এ ঘটে বিরাম-শ্বসনের এক-দ্বিতীয়াংশ থেকে এক-তৃতীয়াংশ কালে। নিঃশ্বাসের দশাকে সাতিশয় দীর্ঘায়িত করা চলে। স্বাভাবিক সংলাপে আগম ও নিগমের হার দাঁড়ায় ১ঃ৩ থেকে ১ঃ১০; তবে মাঝে মাঝে এ পৌঁছায় ১ঃ৩০এ যখন বক্তার অনেক কিছু বলবার থাকে। এই বৈসাদৃশ্যের মূলে কাজ করে ধ্বনিবিজ্ঞানের একটি প্রাথমিক তথ্য: উচ্চারিত বাক্-এর অধিকাংশ ধ্বনির জন্যে দায়ী ফুস্‌ফুস্-নির্গত বায়ুর বহির্গমনে বাধা বা প্রতিবন্ধক।

বিরাম-শ্বসনে প্রশ্বাসের পেশীয় ক্রিয়ায় স্থানচ্যুত গড়নের ওজন ও স্থিতিস্থাপকতাজাত চাপে নিষ্কাশিত হয় বায়ু ফুস্‌ফুস্ থেকে। সজোর নিঃশ্বাস সম্ভব এবং এ ঘটে প্রধানত কুক্ষিদেয়ালের বৃহৎ পেশীপুঞ্জের সংকোচনে।[৩] Stetson ও Hudgins দেখেছেন যে বাক্ শ্বসনে উক্তির হার সেকেন্ড প্রতি ২.৫ থেকে ৪ অক্ষরে দাঁড়ালে কুক্ষীয় পেশীপুঞ্জ এমনভাবে দৃঢ়ীভূত হয় যে তারা পাঁজর পিঞ্জরের নিম্নতর ধারগুলিকে শক্তভাবে ধরে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় তারা আভ্যন্তরীণ আন্তরপাঁজরীয় পেশীতে যে সূক্ষ্ম পেশীয় স্পন্দ সৃষ্টি করে তারই প্রতিরোধী ভিত্তি তৈরি করে। এই স্পন্দপুঞ্জ ক্রমিক অক্ষরের উপর শক্তি বন্টনের অনুরূপ—সাধারণত একটি অক্ষরে থাকে একটি স্পন্দ।[৪] এককথায়, এ হলো অক্ষরভিত্তিক স্পন্দ। আর এ অতি মূল্যবান আবিষ্কার।[৫]

২.৪ আঙ্গিক বিচলন

বাগুৎপত্তির ঘটনাক্রম সাতটি পর্বে বিভক্ত—স্নায়ু-ভাষাতাত্ত্বিক কার্যক্রম; স্নায়ু-পেশীয়; জৈব; বায়ু-সচল; শ্রাব্দিক; স্নায়ু-গ্রাহী; ও স্নায়ু-ভাষাতাত্ত্বিক

অভেদ। প্রতি পর্বের কাল যথাক্রমে ৫০, ১০, ৩০, ২০, ৬, ১০ ও ৫০ এম এস (ms) বা মিলি সেকেন্ড। বাক্‌-এর কালগতি দ্বিমাত্রিক—অনুকালিক (microchronic) ও দীর্ঘকালিক (macrochronic)। প্রথমটি বাক্‌ প্রক্রিয়ার স্বতন্ত্র পর্ব বা দশার (phase) অনুক্রম ; দ্বিতীয়টি উক্তি-তৈরি বাক্‌-ধ্বনির অনুক্রম। সাতটি দশা কালানুক্রমে একটির পরে আরেকটি আসে কয়েক মিলি সেকেন্ডের ব্যবধানে। এ ছাড়াও আছে প্রত্যেক পর্বের অভ্যন্তরে পরিবর্তনশীল অবস্থার অনবচ্ছেদ কাল-পরিবর্তী (time-varying) অভিবাহ (flux); প্রথমটি অনুকালিক আর দ্বিতীয়টি দীর্ঘকালিক। অর্থাৎ বাক্‌ হলো নিস্পন্দ বিন্দুর (nodal points) অনুক্রম অর্থাৎ দীর্ঘকালিক বাক্‌প্রবাহে খন্ডানুক্রম (sequence of segments); পক্ষান্তরে অনুকালিক মাত্রায় প্রকাশ পায় পরিবর্তী দশার অনুক্রম।[৬]

মস্তিষ্কের বহিঃস্তরে স্নায়বিক কর্মবৃত্তির সঙ্গে শুরু হয় মানুষের কন্ঠাঞ্চলে বাগ্‌ধ্বনির উৎপত্তি। এসব কর্মবৃত্তি থেকে বৈদ্যুদ্‌-রাসায়নিক ঘাতগুচ্ছপ্রবাহ নিম্নতর মস্তিষ্কের বিভিন্ন পথে স্নায়ু মারফতে পৌঁছায় কণ্ঠযন্ত্রনিয়ামক পেশীপুঞ্জে। জটিলতা অবশ্য দেশকাল অনুযায়ী। এই পেশীয় ও জৈব কর্মবৃত্তির তিনটি কাজ। প্রথমটি হ'লো কন্ঠাঞ্চলে বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি ; দ্বিতীয়টি এই বায়ুপ্রবাহের গতীয় বা স্থিতীয় শক্তির কিছুটার শব্দশক্তিতে রূপান্তরণ ধ্বনিতরঙ্গরূপে ; তৃতীয়টি এসব ধ্বনিতরঙ্গের বহির্বায়ুতে অনুনাদী উত্তরণ (resonatory transmission) নিয়ন্ত্রণ—পরিশ্রাবণ (filtering)—যা ঘটে শ্বাসরন্ধ্র, ওষ্ঠ ও নাসিকার মধ্যস্থ বিভিন্ন বিবরের ভৌত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তনে।[৭]

২.৫ বাক্‌ছন্দ

বাক্‌ শ্বসন নির্ভর—ফুস্‌ফুস্‌—নির্গত বায়ুপ্রবাহে বাগ্‌ধ্বনির উৎপত্তি হয়। এই বায়ুপ্রবাহ ফুস্‌ফুস্‌-নিষ্কাশিত অনবচ্ছেদ প্রবাহ নয়। প্রবাহ স্পন্দসদৃশ ঃ শ্বসন পেশীর একান্তর সংকোচন ও শ্লথনে জন্ম নেয় যে বায়ু-চাপ এ হলো তারই দ্রুত ও অবিচ্ছিন্ন উচ্চাবচন (fluctuation)। প্রতিটি পেশীয় সংকোচন ও আনুষঙ্গিক বায়ু-চাপবৃদ্ধি হ'লো একটি বক্ষস্পন্দ (chest pulse)—এর তাৎপর্য এই যে বক্ষস্থ আন্তর পাঁজরীয় পেশীপুঞ্জই এর জন্যে দায়ী। আর প্রতিটি বক্ষস্পন্দই তৈরি করে এক-একটি অক্ষর (syllable)। এই অক্ষর উৎপাদক প্রক্রিয়া—বক্ষ-স্পন্দ-তন্ত্র—হ'লো মানুষী বাক্‌-এর ভিত্তি। এ ছাড়া আছে দ্বিতীয় একটি স্পন্দ সদৃশ পেশীবিচলন-তন্ত্র, যার উপর বায়ু-প্রবাহ আংশিকভাবে নির্ভরশীল। এই পদ্ধতি তৈরি হয় শ্বসন পেশীর কম-পৌনঃপুনিক, কিন্তু প্রবলতর সংকোচনমালায়, যা মধ্যে মধ্যে বক্ষস্পন্দের সঙ্গে

মিলে তাকে বলবত্তর করে এবং বায়ুচাপের গুরুতর ও আকস্মিকতর বৃদ্ধি ঘটায়। এইসব বলবৎ-কারক বিচলনে তৈরি হয় চাপস্পন্দ (stress pulse) তন্ত্র, যা বাক্-এ সংযুক্ত হয় বক্ষস্পন্দতন্ত্রের সঙ্গে। বাক্স্পন্দ হলো স্পন্দপুঞ্জের এই দুই পদ্ধতির স্পন্দ—সংলাপের প্রয়োজনে বায়ুস্রোত উৎপাদনে তাদের সমন্বয় পদ্ধতির এ হলো গুণফল। বস্তুত বায়ুস্রোতে আগেভাগেই স্পন্দ অস্তিমান, শব্দ-তৈরি প্রকৃত স্বর ও ব্যঞ্জন-এর উপর উপস্থাপিত হবার আগেই।

সব ভাষার কথনেই এই দ্বি-স্পন্দ পদ্ধতি বর্তমান, তবে বিভিন্ন ভাষা ভিন্ন-ভিন্নভাবে তাদের সমন্বয় করে। তাদের সংগঠন থেকে দু'টি স্বতন্ত্র পর্যাবৃত্তি (periodicity) জন্ম নিতে পারে। দু'টি পদ্ধতির একটিতে অথবা অন্যটিতে স্পন্দপুঞ্জকে সমান কালান্তরে পৌনঃপৌনিক বা আবর্তক (recurrent) করা যেতে পারে। হয় চাপ-উৎপাদনীস্পন্দপুঞ্জ নতুবা অক্ষর-উৎপাদনী স্পন্দপুঞ্জ অনুক্রমে সমকালীন হতে পারে—প্রথম ক্ষেত্রে আমরা পাই প্রচাপকালিত স্পন্দ (stress-timed rhythm) ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অক্ষরকালিত স্পন্দ (syllable-timed rhythm)। পৃথিবীর ভাষা গোষ্ঠী এদিক থেকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত —একটি প্রচাপকালিত, অন্যটি অক্ষরকালিত। ইংরেজি প্রথম শ্রেণীর ; ফরাসী দ্বিতীয় শ্রেণীর।

অবিলম্বে এটা সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে না যে সমকালীন ক্রমে একটি স্পন্দ শ্রেণী থাকার আবশ্যক পরিণাম এই যে অন্য শ্রেণীটি সমকালীন ক্রমে থাকতে পারে না ; কিন্তু সে থাকতে পারে। যেমন ইংরেজিতে সমকালীন স্পন্দপুঞ্জ প্রচাপ-স্পন্দই ; কাজেই সিদ্ধান্ত নেয়া যায় যে বক্ষস্পন্দপুঞ্জও আসবে অসমান কালান্তরে। একটি দৃষ্টান্ত দেয়া যাক ঃ

Thiś is the housé that Jacḱ built́.

এখানে চারটি প্রচাপ স্পন্দ আছে চারটি অক্ষরের উপর—This ; house ; Jack ; ও built। প্রতিটি প্রচাপ-স্পন্দের সঙ্গে সঙ্গে যদি টেবিলের উপরে পেন্সিলে টোকা দেয়া হয় তবে টোকাগুলি হবে সমকালীন এবং প্রচাপিত অক্ষরগুলিও। কিন্তু বাক্যটিতে আছে সাতটি অক্ষর। প্রত্যেকটি অক্ষরে টোকা দিলে দেখা যাবে এরা সমকালীন নয় অর্থাৎ এরা অসমান কালান্তরে বিস্তৃত। আরও লক্ষণীয় যে অচাপিত অক্ষরগুলো প্রচাপিত অক্ষরগুলোর মধ্যে অসমানভাবে বণ্টিত হয়েচে এবং তারই ফলে তারা পরিবর্তী বেগে উচ্চারিত হবে ঃ কখনো তারা হবে সংনমিত, কখনো বা সম্প্রসারিত এবং ক্রমিক হারের অনবরত পরিবর্তনে। ইংরেজিতে গদ্য ও পদ্যের স্পন্দীয় ভিত্তি একই। বস্তুত পদ্য থেকে নেওয়া ছোট একটি শব্দানুক্রম সংলাপের টুকরো হতে পারে, আবার সংলাপের ছোট উদ্ধৃতি ও পদ্যাংশ হতে পারে। এতেই সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে কেন কবি হওয়ার জন্যে প্রয়োজন হয় না ছন্দতত্ত্বের ; কেন

পদ্য উপলব্ধির জন্যে পাঠক ও শ্রোতার দরকার বিশিষ্ট জ্ঞানের। তাঁরা যা চান তা আগেভাগে নেই, আছে সেখানে, ভাষার স্বাভাবিক অভিজ্ঞতায়।[৮]

২.৬ ধ্বনি, অক্ষর ও শ্বাসমেল

ভাষা দ্বিরূপা—লেখ্য ও শ্রাব্য। লেখ্যরূপ দৃশ্যরূপের নামান্তর। লেখ্যরূপ চোখের ভাষা, শ্রাব্যরূপ কানের ভাষা। ভাষা মানুষের মুখে কথা হ'য়ে ফুঠে উঠলে সে বিচ্ছিন্ন ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারণ করে না, কিন্তু কথা ক'য়ে ওঠে ছোট বড়ো অগ্রন্থিত বাক্যে। মুখের ভাষা চিত্রায়িত হলে—হরফে প্রকাশ পেলে—দেখা যায় আন্তঃ-শাব্দিক ফাঁক (inter-word gap), কিন্তু পঠনে বা বক্তৃতায়, আবৃত্তি বা সংলাপে শ্বাস বা সার্থ পর্বের বিরাম ছাড়া দুই শব্দের মাঝখানে আর কোন ফাঁক থাকে না। একটি মনোভাব সম্পূর্ণ প্রকাশ না করে সে থামে না। তাই একটি গোটা বাক্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাক্যাংশ ভাষার একক হ'য়ে দাঁড়ায়। এদিক থেকে বাক্যই ভাষার বৃহত্তম একক, আর অক্ষর (syllable) নিম্নতম একক। বাঙলা ধ্বনির প্রকৃতি একটি স্বরধ্বনি বা ব্যঞ্জনধ্বনি শ্বসনের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত হয় বলে—যেমন অ, যা প্রভৃতি—এরাই গঠন করে ভাষার নিম্নতম একক। আর এই নিম্নতম এককটি অক্ষর নামে কথিত।

ভাষার মতো ধ্বনির দু'টো দিক লক্ষণীয়—একটি শারীরবৃত্তীয় (physiological), অন্যটি শ্রৌত (acoustic)। ধ্বনি নিজেও শোনা যায়, আবার অপরকেও শোনানো যায়। ফুসফুসই ধ্বনি উৎপাদনের প্রাথমিক যন্ত্র। ফুস্‌ফুস্‌-নিঃসৃত এক একটি ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছই ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে এক একটি অক্ষর। অক্ষরের সঙ্গে ধ্বনির (sound বা phone) পার্থক্য আছে। ধ্বনি স্বয়ং সম্পূর্ণ অবিভাজ্য একটি ছোট্ট একক ঃ অক্ষর এক বা একাধিক ধ্বনি সমন্বয়ে গঠিত ও বিভাজ্য। যেমন এ, ক ধ্বনি ; কিন্তু 'বাক্‌' অক্ষর, কেননা এখানে ব্‌+আ+ক্‌ ধ্বনি মিলে গড়েচে ধ্বনিটিকে। গঠনগত দিক থেকে শ্বসনের স্বল্পতম প্রয়াসে একবারে উচ্চারিত ধ্বনি-ই অক্ষর ; আবার শ্রুতিগতভাবে যেসব ধ্বনিগুচ্ছ শ্রোতার কানে এক একটি তরঙ্গাভিঘাতের সৃষ্টি করে তারাই অক্ষর। বাক্‌ প্রবাহে শ্বসনজাত অসংখ্য ধ্বনিতরঙ্গ শ্রোতার কানের পর্দায় আঘাত হানে। এই সব তরঙ্গভঙ্গের ছোট ছোট অভিঘাতই শ্রোতার মনে এক একটি অক্ষরের আভাস দেয়।[৯]

ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক থেকে বাক্‌ সর্বদাই ধ্বনির রৈখিক অনুক্রম ছাড়াও বেশি কিছু। যেহেতু এরা ফুস্‌ফুস্‌-নিঃসৃত বায়ুতে তৈরি, তাই বক্ষস্থ শ্বাসযন্ত্র আবশ্যিক ভাবেই এই ক্রমকে অঙ্গে অঙ্গে ভাগ করে। এদের মধ্যে সবচেয়ে সুস্পষ্টটি হলো শ্বাসমেল (breath group)—একই শ্বসনে উচ্চারিত

এই ধ্বনি শৃংখল। এর গরিষ্ঠ ব্যাপ্তিকাল নিয়ন্ত্রিত হয় পর্যাবৃত্ত প্রশ্বাসের প্রয়োজনে। অবশ্য এই শ্বাসমেল ফুস্‌ফুসীয় বায়ুর অস্তিত্ব অনুযায়ী স্থায়ী হয়না। বায়ুর আগম ও নিগম নিয়ন্ত্রণের জন্যে আছে দুটি অংশত স্বতন্ত্র যন্ত্রকৌশল (mechanism)। প্রথমটি মধ্যচ্ছদা ও কুক্ষীয় পেশীপুঞ্জে তৈরি। এরা বক্ষবিবরের আয়তন পরিবর্তিত করে এর নিচের দেয়ালের (মধ্যচ্ছদার) এদিক-ওদিক বিচলন ঘটিয়ে। প্রতিটি শ্বাসমেলেই তাদের বিচলন ন্যূনাধিক অপরিবর্তিত থাকে ; তবে সাধারণত শ্বাসমেলের মাঝে মাঝে প্রশ্বাসের জন্যে তাদের ক্রিয়ার ব্যত্যয় ঘটে। কাজেই এ হলো শ্বাসমেলের শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি।

দ্বিতীয় শ্বসন যন্ত্র কৌশলটি আন্তঃপাঁজরীয় পেশীপুঞ্জে তৈরি। পাঁজর-পুঞ্জের ক্রমিক যুগলের মধ্যে মধ্যে এরা বিস্তৃত এবং পার্শ্বদেয়ালের অর্থাৎ পাঁজরাপিঞ্জরের বিচলন ঘটিয়ে বক্ষবিবরের আয়তন বাড়ায় বা কমায়। বাক্‌-উচ্চারণে আন্তঃপাঁজরীয় পেশীপুঞ্জের ক্রিয়া শ্বাসমেলে অপরিবর্তিত থাকে না ; কিন্তু দ্রুততর পরিবৃত্তির অধীন হয়। সরলতম ক্ষেত্রে এ গাঁটছড়া বাঁধে বেশি বায়ু-ভুক স্বরধ্বনি ও কম বায়ু-ভুক ব্যঞ্জনধ্বনির একান্তরণের সঙ্গে। বাক্‌ তাই আন্তঃপাঁজরীয় পেশীপুঞ্জের এই গতি-সঞ্জাত ছোট ছোট স্পন্দ শ্রেণী দ্বারা চিহ্নিত হয়। এ সব স্পন্দপুঞ্জ হলো ধ্বনিক অক্ষরমালা। জাতিগতভাবে অক্ষরের কেন্দ্র হলো কোন স্বরধ্বনি বা অনুনাদক এবং এর শুরু ও শেষ হয় এমন কোন ধ্বনিতে, আপেক্ষিকভাবে আছে যার বন্ধ উচ্চারণ। সব বাক্‌ই অক্ষর ও শ্বাসমেলের অনুক্রমে গঠিত এবং এরাই ধ্বনিবিজ্ঞানের দিক থেকে বাক্‌-এর ভিত্তিক কাঠামো আর অতি স্পষ্ট নিরূপণীয় বিভাজন। অবশ্য স্বনমানিক মর্যাদা অন্য ব্যাপার। অনেক ভাষায় অক্ষরের নেই কোন স্বনমানিক মর্যাদা। তারা শুধুমাত্র ধ্বনিক যন্ত্রকৌশলের অংশ, যাতে উচ্চারণ সম্পন্ন হয়। অন্য ভাষায় ধ্বনির সঙ্গে এই অক্ষর স্পন্দের সম্পর্ক স্বনমানের দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ ; কাজেই অক্ষর-বিভাজন সেখানে বিবেচ্য। এক্ষেত্রেও মনে রাখতে হবে যে ধ্বনিক ও স্বনমানিক অক্ষর এক নয়। কাজেই ধ্বনিবিজ্ঞান ও স্বনমান শাস্ত্রকে আলাদা রাখতে হবে।[১০]

অক্ষর সম্বন্ধে Stetson বলেন ঃ "অক্ষর (হ'লো) ক্ষুদ্রতম ও অবিভাজ্য ধ্বনিক একক। আদৌ অক্ষর হলো আন্তঃপাঁজরীয় পেশীপুঞ্জের সংনমন ধাক্কায় কণ্ঠনালী পথে সজোরে ঊর্ধ্বে উত্থিত এক প্রস্ত দমকা হাওয়া। সাধারণত এ কণ্ঠতন্ত্রীর ক্রিয়ায় মণ্ডলিত। সঙ্গে চলে অনুষঙ্গী বিচলন (অক্ষর উপাদান) যাতে এ বিশিষ্ট হ'য়ে ওঠে। এরা হ'লো মোচন (মোচক ব্যঞ্জন বা বক্ষপেশীয় ক্রিয়াজাত), স্বরতন্ত্রীর স্বর-তৈরি বিচলন এবং অবরোধ (অবরোধী ব্যঞ্জন বা বক্ষপেশীয় ক্রিয়াজাত)। চারটি মৌল অক্ষর-জাতি সম্ভব—(১) বক্ষ-মুক্ত, বক্ষ অবরুদ্ধ, আঃ, ওঃ ; (২) বক্ষ-মুক্ত, ব্যঞ্জন অবরুদ্ধ, ব্র্যাট, আপ ; (৩) ব্যঞ্জন মুক্ত, বক্ষ অবরুদ্ধ, ফর, টু ; (৪) ব্যঞ্জন মুক্ত, ব্যঞ্জন অবরুদ্ধ, টপ, কুক।"[১১]

২.৭ বিচলন বিশ্লেষণ

আগেই বলা হয়েছে বাক্ বিচলন-নির্ভর। এখানে তিন প্রকারের বিচলন লক্ষণীয়—(১) সংবন্ধ বিচলন (movement of fixation); (২) নিয়ন্ত্রিত বিচলন (controlled movement); ও (৩) ক্ষেপক বিচলন (ballistic movement)। এখানে প্রাথমিক বৃত্তির কথা স্মর্তব্য। ফুস্‌ফুস্ শ্বাস গ্রহণে প্রসারিত হয় আর শ্বাস ত্যাগে সংকুচিত হয়—প্রথমটি প্রশ্বাস; দ্বিতীয়টি নিঃশ্বাস। ফুস্‌ফুসীয় পেশীতে এমন কিছু নেই যাতে আয়তনের হ্রাস, বৃদ্ধি ঘটতে পারে। এই সম্প্রসারণ বা সংকোচন সবই পাঁজরপিঞ্জরের পেশীয় ক্রিয়ার দান—ফুস্‌ফুস্ স্ফীত বা সংকুচিত হয় পাঁজরপিঞ্জরের স্ফীতি বা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে আর পাঁজরপিঞ্জরের স্ফীতি ঘটে এভাবে—

ক) মধ্যচ্ছদার সংকোচনে পাঁজরপিঞ্জর উপর থেকে নিচের দিকে সম্প্রসারিত হয়।

খ) বহিস্থ আন্তর-পাঁজরপুঞ্জের সংকোচনে পাঁজরপিঞ্জরের সম্প্রসারণ ঘটে সম্মুখ থেকে পশ্চাতে এবং এ সংকোচনের কারণ অবশ্য পাঁজরের কোনও আকৃতির জন্যে।

গ) পাঁজরপিঞ্জরের পার্শ্বিক সম্প্রসারণ ঘটে। পক্ষান্তরে পাঁজরপিঞ্জর আয়তনে সংকুচিত হয় এ ভাবে—

   ১) ঋজু-কুক্ষীয় পেশীপুঞ্জের সংকোচনে পাঁজরপিঞ্জরের আয়তন হ্রাস পায় উপর থেকে নিচের দিকে।

   ২) বহিস্থ আন্তর-পাঁজরপুঞ্জের সংকোচনে পাঁজরপিঞ্জরের আয়তন কমে যায় সম্মুখ থেকে পশ্চাতে।

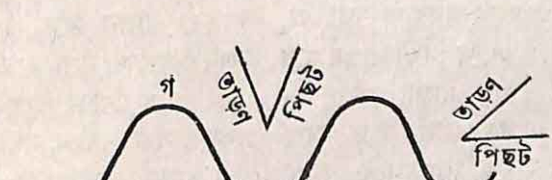
   ৩) পাঁজরের কোনও আকৃতিজনিত সংকোচনে পাঁজরপিঞ্জরের পার্শ্বিক আয়তনের হ্রাস ঘটে।

এবার তিনটি বিচলনের কথা। প্রথমেই আছে সংবন্ধ বিচলন। এ ঘটে যখন কোন দেহের উপর সক্রিয় বল দু'টি সমান ও বিপরীত হয়। এর উদাহরণ বিরতি বা যতি, যখন পাঁজরপিঞ্জর সংবদ্ধ বিচলনের অন্তর্ভুক্ত হয়। দ্বিতীয়টি নিয়ন্ত্রিত বিচলন, যখন কার্যকর বল দু'টি দেহে অসমান ও বিপরীত হয়ে ওঠে; এতে দেহ বৃহত্তর বলের দিকে এগোয়। এ দেখা যায় মধ্যচ্ছদা—ঋজু-কুক্ষীয় পেশীতন্ত্রে—অক্ষর মেলসঞ্জাত বাক্-এর সময় এ নিয়ন্ত্রিত বিচলনে অস্তিমান। তবে দ্রুত বাক্ কালে গোটা পাঁজরপিঞ্জরই থাকে নিয়ন্ত্রিত বিচলনে এবং এ ফুস্‌ফুস্ সংকোচনে যোগায় বাক্ উপাদান। তৃতীয়ত, ক্ষেপক বিচলন—এতে পরা (positive) পেশীপুঞ্জ সংকুচিত হয়ে দেহকে গতিশীল করে। কিছু সময় দেহ এগোয় মুক্তভাবে। পরে অপরা পেশীপুঞ্জ সংকুচিত হ'য়ে দেহকে বিরামে নিয়ে যায়। এর উদাহরণ দ্রুত-গতি অক্ষর ও ব্যঞ্জন বিচলন—এরা

সবাই ক্ষেপক বিচলনের ফল। এরই সঙ্গে তুলনীয় মুদ্রাক্ষর লিখন (typing), পিয়ানো বাজানো প্রভৃতি ক্ষেপক বিচলন। চিত্রাঙ্কনে আছে নিয়ন্ত্রিত বিচলন।

সাধারণ শ্বসনে শ্বাসত্যাগী পেশীপুঞ্জ একযোগে কাজ করে; আবার শ্বাসগ্রাহী পেশীপুঞ্জও। এরই ফলে সব দিকেই পাঁজরপিঞ্জরের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটে। Stetson ও Hudgings মনে করেন যে বাক্ কালে ক্ষুদ্রতর অক্ষর স্পন্দের কারক হলো আন্তর-পাঁজরীয় পেশীপুঞ্জের বিপরীতমুখী ক্ষেপক বিচলন। অনুরূপভাবে পর্ব, দশা বা শ্বাসমেল হ'লো বিপরীতমুখী মধ্যচ্ছদা-ঋজু-কুক্ষীয় পেশীপুঞ্জের ক্রিয়া। সম্ভবত বৃহত্তর পেশীপুঞ্জের সংকোচনে আছে নিয়ন্ত্রিত বিচলন এবং কিছু সংখ্যক অক্ষর স্পন্দের জন্যে আছে কার্যকর শ্বাসমেল সৃষ্টিকারী মধ্যচ্ছদা-কুক্ষীয় পেশীতন্ত্রের একটি বিচলন। এতে দেখা যায় যে শ্বসন পেশীপুঞ্জের সমন্বয় সাধারণ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের চেয়ে বাক্ শ্বসনে ভিন্নতর। প্রথমত, একটিতে শ্বাসত্যাগী বা শ্বাসগ্রাহী পেশীপুঞ্জ একত্রে কাজ করে, অন্যটিতে নয়। দ্বিতীয়ত, সাধারণ শ্বসনে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস একই সময় নেয় এবং বিচলনের প্রতি চক্করে আছে একটি করে যতি বা বিরতি। পক্ষান্তরে বাক্ শ্বসনে নিঃশ্বাসের তুলনায় প্রশ্বাসে কম সময় লাগে এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজনে যতির ঘটে ব্যাপক বণ্টন।

এ প্রসঙ্গে ব্যঞ্জনবৃত্তি উল্লেখ্য বিশেষত অক্ষরস্পন্দে। চিত্র ৩-এ এরই পরিচিতি দেওয়া হলো।



চিত্র : ৩—অক্ষর স্পন্দে ব্যঞ্জন

অক্ষরস্পন্দে কখ ও কগ হলো অক্ষর তাড়ন; আর গখ অক্ষর পিছট। অর্থাৎ একটি তাড়ন ঘাত, অন্যটি পিছট ঘাত। তাড়নে আছে আদি ব্যঞ্জন আর

পিছটে অন্ত্য ব্যঞ্জন। প্রতিটি ব্যঞ্জনে আছে দু'টি বিচলন—একটি পৃষ্ঠানুগ, অন্যটি পৃষ্ঠাতিগ; প্রথমটি ব্যঞ্জন তাড়ন, দ্বিতীয়টি ব্যঞ্জন পিছট। আদি ব্যঞ্জনে শুরু হয় অক্ষর স্পন্দ এবং অন্ত্য ব্যঞ্জনে শেষ হয় অক্ষর স্পন্দ। অক্ষর আত্মমুক্ত ও আত্ম-অবরুদ্ধ এই দুই-ই হতে পারে। স্বরধ্বনি পক্ষান্তরে অনুষঙ্গী বিচলন—অক্ষর স্পন্দে এর কোন ভূমিকা নেই।

ব্যঞ্জনে আছে দুটি বিচলন—তাড়ন ঘাত ও পিছট ঘাত। এদের সহযাত্রী হ'লো বিহার (excursion)। তাড়ন বিহার উচ্চারক প্রত্যঙ্গের পৃষ্ঠানুগ বিচলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, আর পিছট বিহার উচ্চারক প্রত্যঙ্গের পৃষ্ঠাতিগ বিচলনের সঙ্গে যুক্ত। প্রতিটি ব্যঞ্জন বিচলন-বিরোধী পেশীপুঞ্জের তাড়ন ও পিছট ঘাতের সঙ্গে যুক্ত; কিন্তু বিহার বাদ পড়তে পারে অথবা ঘনীভূত হতে পারে। স্বাভাবিক মন্থর হারে মোচক ব্যঞ্জনের পিছট বিহার মুখবিবর (buccal cavity) খুলে দেয়, আর তাড়ন বিহার বা অন্ত্য ব্যঞ্জন একে বন্ধ করে। উচ্চহারে শ্বাস গ্রহণ কালে পাঁজরপিঞ্জর যে ভূমিকা নেয় সংবারের (closure) ও সেই একই বৃত্তি। উক্তির উচ্চহারে ব্যঞ্জন বিহার দু'টিকে ধরে রাখা হয়। এখানে পৃষ্ঠানুগ বিচলনে অক্ষরমালা বিভাজিত হয় এবং পৃষ্ঠাতিগ বিচলনে পরবর্তী অক্ষরের সূচনা করে।

ব্যঞ্জন সম্পর্কে হক্ কথা এই যে এ অক্ষর থেকে অক্ষরে স্থান পরিবর্তন করে না—এ শুধু মাত্র একটি অক্ষরে কাজ করে এবং বৃত্তি অনুসারে এ কখনো বা আদ্য, কখনো বা অন্ত্য ব্যঞ্জন হয়ে ওঠে। উচ্চ গতিতে এর একমাত্র কাজ মোচক (releasing) ব্যঞ্জনের। তাই অক্ষর হলো শ্বাসের একক স্পন্দ; এ শ্বসন সীমিত হয় শ্বাসত্যাগী ও শ্বাসগ্রাহী পেশীজটে অথবা শ্বাসত্যাগী পেশীতন্ত্র ও আনুষঙ্গিক উপাদানে। নিম্নগতি অক্ষরমালার বিভিন্ন শ্রেণী আছে—(১) স্বয়ং মুক্ত ও স্বয়ং অবরুদ্ধ যথা অ, অ; (২) ব্যঞ্জন মুক্ত, কিন্তু স্বয়ং অবরুদ্ধ, যেমন, ট, ল, শ; (৩) ব্যঞ্জন মুক্ত, ব্যঞ্জন অবরুদ্ধ, যথা, হ্যাট, ম্যাট; ও (৪) স্বয়ংমুক্ত, কিন্তু ব্যঞ্জন অবরুদ্ধ। এরই পটে বিচার্য অক্ষরে ব্যঞ্জনের ভূমিকা। এ সবরকমের ব্যঞ্জন হতে পারে—প্রথমত, সরল ব্যঞ্জন, যথা ব, প, স। দ্বিতীয়ত, সংযোজক (linking) ব্যঞ্জন। এ আবার দু'শ্রেণীর—(ক) যৌগ, যেখানে একাধিক ব্যঞ্জন অক্ষর স্পন্দে কাজ করে কখনো আদ্য, কখনো বা অন্ত্য ব্যঞ্জনরূপে, যথা স্প, আর্ট; (খ) প্রান্তযোজক (abutting) যখন অক্ষরমালায় উক্তি দ্রুতির সঙ্গে সঙ্গে প্রথম অক্ষরের অন্ত্য ব্যঞ্জন যুক্ত হয় পরবর্তী অক্ষরের আদি ব্যঞ্জনের সঙ্গে। এখানে অন্ত্য ব্যঞ্জনের পিছট বিহার ঘনীভূত—প্রান্তযুগলের উচ্চারণকাল দু'টি আদি ব্যঞ্জনের কালের সমান। বাঙলায় দেখা যায় কয়েকটি দেশীভূত (naturalised) প্রান্তযুগল (abutting pair)—(১) একটি সদস্যের যুক্তক, যথা, অন্ন; (২) দু'টি সদস্যের যুক্তক, যথা, আফ্‌টার; (৩) একটি সদস্যের স্পর্শবিন্দু, যথা, এ্যাট্‌লাস; (৪) একটি সদস্যের ভিন্ন স্পর্শ-

বিন্দু, যথা, উল্কা ; (৫) দুটি সদস্যের ভিন্ন স্পর্শবিন্দু, যথা, আবগারী। তৃতীয়ত, দ্বিত্বব্যঞ্জন, যথা, পাট্টা, বাট্টা।[১২]

২.৮ বর্ণ ও অক্ষর

গণিত ও রসায়ন যে অর্থে যথাযথ (exact) সে অর্থে ভাষাতত্ত্ব যথাযথ বিজ্ঞান নয়। এর কারণ অবশ্য এতে সক্রিয় মানুষী উপাদান। বস্তুত এ দুটি বিরোধী উপাদানে গঠিত—ভৌত বা যান্ত্রিক ; মানস বা মনস্তাত্ত্বিক। ভাষা ভাব-সঞ্চারণের বাহন ছাড়াও আরো বেশি কিছু। কোন একটি ধ্বনি উচ্চারিত বা শোনার আগেই শারীরবৃত্ত ও ভৌত বিদ্যা সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। শ্রবণ (কর্ণ) ও বাগ্‌প্রতঙ্গের জটিল যন্ত্র কৌশল (শ্বাসরন্ধ্র থেকে মুখ ও নাসিকা বিবর পর্যন্ত) এতদঞ্চলীয় শরীরস্থানের (anatomy) সঙ্গে পরিচিতির দাবি রাখে। শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া সতত ব্যবহারের জন্যে আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়, কিন্তু রঞ্জনরশ্মি (X-ray) বা স্বরযন্ত্রীয় পেরিস্কোপে (laryngo-periscope) দেখায় অতি জটিলভাবে। ভৌত দৃষ্টিকোণ থেকে ভাবের যোগাযোগের আছে দু'টি অংশ—স্বনন (phonation) বা বক্তার ধ্বনি উচ্চারণ ও শ্রবণ (audition) বা শ্রোতা কর্তৃক এ ধ্বনি শোনা। স্বনন ভাষার অর্ধেকটা —বক্তা চায় শ্রোতাকে ; শ্রবণ বাক্-এর মতোই প্রয়োজনীয়। দু'য়ের সম্পর্ক পারস্পরিক এবং একটি আরেকটির অনুপূরক। এই পটভূমিকায় ভাষার আছে ত্রিধা সংজ্ঞা—

(১) **সাধারণ ও ব্যাপক অর্থে** ভাষা হলো এক প্রাণীর আবেগপ্রবণ বা মানবিক ধারণা অন্য প্রাণীতে সঞ্চারণের মাধ্যম।

(২) **নির্দিষ্ট ও প্রচলিত অর্থে** ভাষা হলো বাক্ ও শ্রুতি মারফতে এক মানুষের অন্য মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ—উচ্চারিত বা শ্রুত ধ্বনিমালা এমন একটি তন্ত্রে সমন্বিত যা মানবজাতির ইতিহাসের একটি বিশেষ কালে কোন একটি সম্প্রদায়ের মধ্যে স্বীকৃত হয়ে ব্যবহারে পারস্পরিক বোধগম্যতা অর্জন করেচে।

(৩) **বিশেষ ও ব্যুৎপন্ন অর্থে** মানুষের মধ্যে এ প্রযুক্ত হতে পারে যোগাযোগ ও প্রকাশের অন্য বাহন হিসেবে, যেমন, অঙ্গভঙ্গি, সংকেত (signal), লিখিত প্রতীক প্রভৃতি।

এক হিসেবে ভাষা মূলত প্রতীক-ধর্মী (symbolic)। অর্থাৎ, এ অপ্রাকৃত (আবেগপ্রবণ, মানবিক ও আধ্যাত্মিক) ও আভ্যন্তরীণ অবস্থার ভৌত ও বহিঃপ্রকাশ—এ আদৌ অবাস্তবের বাস্তব রূপায়ণ প্রচেষ্টা। 'ভাষা' শব্দটিও বহু-অর্থক এই অর্থে যে এতে ন্যূনপক্ষে তিনটি স্বতন্ত্র দিক বিধৃত আছে এবং ফরাসী পরিভাষায় তারা চিহ্নিত হতে পারে, যথা, Langage (ভাষা),

langue (জিভ্-ভাষা) ও parole (বাক্)। প্রথমে বিধৃত আছে শিশুর অস্ফুট ধ্বনি যেমন, তেমনি মানুষের উক্তির উন্নত রূপাবলীও। এ একাধারে ব্যক্তি ও সমাজের সঙ্গে সম্পৃক্ত—এরই সঙ্গে সম্পর্কিত শারীরবৃত্ত, মনস্তত্ত্ব, ইতিহাস প্রভৃতি। দ্বিতীয়টিতে প্রকাশ পায় উপরের দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি। এই অর্থে আমরা বলি ইংরেজি, ফরাসী, বাঙলা ভাষা। ভাষা যদি মূলত প্রতীক-ধর্মী হয়, তবে এ স্বীকার্য হয়ে ওঠে যে Langage ও Langue স্বনন ও শ্রবণ মাধ্যমে ভাব প্রদর্শন। বক্তার মনে একটি ধারণা জন্মালে সে তা শ্রোতাকে জানাতে চায়। এ ধারণাকে বলে, 'সংকেতিত' (signified)—এ বক্তার মনে একটি বাচনিক প্রতিরূপ স্থাপন করে আর এর কণ্ঠ্যপ্রকাশ ঘটে ধ্বনিজটে, যেমন, গাছ, রাম প্রভৃতিতে। এই ধ্বনিজটকে বলা হয় 'সংকেতক' বা সার্থক (significant)। সংকেতক উচ্চারণে 'শব্দ' তৈরি হয়, যাকে বলে 'সংকেতিতে'র চিহ্ন। এ চিহ্ন যদি শ্রোতার মনে জাগিয়ে তোলে অনুরূপ 'শব্দ' প্রতিরূপ, তবে শ্রোতা বুঝতে পারে বক্তার বক্তব্য। এদিক থেকে ভাষা হলো মূলত 'সংকেতিত' ও 'চিহ্নের' প্রতিষঙ্গ (correspondence)। বাক্ হলো (speech বা parole) প্রধানত ভাষার ব্যক্তিক দিক—বস্তুত এ ভাষার ব্যক্তিক দিক, যেমন জিভ্‌ভাষা সামাজিক দিক। তাই ভাষার তৃতীয় সংজ্ঞাটি ভাষা নিয়ে কারবার করে, কিন্তু জিভ্‌ভাষা ও বাক্-এর প্রবেশ এখানে এক প্রকারে নিষিদ্ধ।[১৩]

মানুষ তার মনের ভাব কথায় প্রকাশ করে। কণ্ঠ, নাসিকা, জিহ্বা প্রভৃতি তার বাগ্‌যন্ত্র অর্থাৎ কথা বলার যন্ত্র। বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে ধ্বনি (sound) উচ্চারিত হয়—এ ধ্বনি সুস্পষ্ট অর্থবাহক। অর্থযুক্ত ধ্বনিকেই শব্দ (word) বলে। সাধারণত মানুষ এই অর্থযুক্ত শব্দে কথা বলে। শব্দ একটি বা একাধিক ধ্বনিতে তৈরি হয়, যেমন, 'এ' অর্থাৎ 'ইহা' একটি ধ্বনির শব্দ। কিন্তু 'এই' দুটি ধ্বনির যোগে নিষ্পন্ন শব্দ—'এ' এবং 'ই'। মানুষ কথা বলে এবং কথা লেখে। কাছের মানুষের জন্য প্রথমটি, দূরের মানুষের জন্য দ্বিতীয়টি। লিখনে কানে-শোনা ধ্বনিকে প্রত্যক্ষ বস্তুর নির্দিষ্টরূপে চোখের সম্মুখে তুলে ধরা হয়। আর যে সমস্ত চিহ্ন দিয়ে উচ্চারিত ধ্বনিগুলির নির্দেশ করা হয় সেই চিহ্নগুলিকে বর্ণ (letter) বলে। যথা 'অ', 'ক', 'খ' প্রভৃতি। বর্ণ ধ্বনির লিখিত রূপ অর্থাৎ ধ্বনি নির্দেশক চিহ্ন বা ধ্বনির প্রতীক। কিন্তু এক বা একাধিক ধ্বনিতে অক্ষর (syllable) হয়। তাই 'বর্ণ' ও 'অক্ষর' স্বতন্ত্র। কোন শব্দের অন্তর্গত যতটুকু ধ্বনি সহজে একেবারে উচ্চারিত হয় তাকে 'অক্ষর' বলে। যথা, 'বাগান', শব্দের বা (ব্+আ)+গান্—প্রথমটি স্বরান্ত অক্ষর (open syllable); আর দ্বিতীয়টি ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর (closed syllable)।[১৪]

এ প্রসঙ্গে বর্ণমালা (alphabet)-র কথা এসে পড়ে। ব্রাহ্মীলিপি ভারতের সর্বপ্রাচীন লিপি। এর প্রতিষ্ঠাকাল খ্রীঃ ১০০০-এর কাছাকাছি। বর্ণের ছাঁদ

গ্রীক বা রোমান 'Capital' বা বড় হাতের বর্ণের মতো, যথা, + =ক, 7=খ প্রভৃতি। স্বরবর্ণের জন্যে আ-কার, ই-কার প্রভৃতি বিশেষ চিহ্ন ব্যঞ্জনবর্ণের গায়ে, মাথায় ও পায়ে লাগান হতো। এর সরলতা কালক্রমে জটিলতায় রূপান্তরিত হলো। এ রূপবদলের মূলে ছিল ভূর্জপত্র বা তালপত্রের উপর লিখন। এরই ফলে বর্ণগুলি কুন্ডলাকার হতে লাগলো। উত্তর পশ্চিম ভারতে এ পরিণত হলো 'শারদা' রূপে; মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানে 'নাগর' রূপে; আর পূর্বভারতে 'কুটিল' রূপে। এই শেষোক্ত রূপই বাঙলা বর্ণমালা। এর মূল কথা হলো এ অক্ষরাত্মক (syllabic); কিন্তু ইউরোপীয় রোমান লিপির মতো বর্ণনাত্মক (alphabetic) নয়। উদাহরণ হিসেবে 'অত্যুক্তি' শব্দটি নেয়া যেতে পারে। ধ্বনি বিশ্লেষণ করলে সাতটি ধ্বনি পাওয়া যায়—অ+ত্+য্+উ+ক্+ত্+ই। রোমান লিপিতে প্রতিটি ধ্বনিকে পৃথকভাবে দেখান হয়, যথা, a-t-y-u-k-t-i; কিন্তু ভারতীয় লিপিতে শব্দ বিভক্ত হয়েছে অক্ষরে; তাই প্রতিটি অক্ষরের মধ্যে নিহিত আছে একটি করে স্বরধ্বনি এবং শব্দ বা অক্ষরের আদিতে না থাকলে স্বরবর্ণ কখনো প্রকটভাবে লিখিত হয় না। এই স্বরবর্ণ কখনো অপ্রকটভাবে, কখনো বা সংক্ষিপ্তরূপে লিখিত হয়, কিন্তু রোমান লিপির মতো সম্পূর্ণ প্রকটরূপে নয়, যেমন, 'অত্যুক্তি' > $a-\frac{ty}{u}-\frac{k}{t}-i$। কাজেই ভারতীয় বর্ণমালার রীতি অনুসারে শব্দের অভ্যন্তরে বা শেষে ব্যঞ্জনের পরে স্বরবর্ণ এলে স্বরবর্ণের পূর্ণরূপকে সংক্ষিপ্ত করে আশ্রিত ব্যঞ্জনের অঙ্গে মিলিয়ে দেয়া হয়—কখনো তার পদতলে, কখনো শীর্ষদেশে, কখনো বা পার্শ্বদেশে। ব্যঞ্জনের পরে ব্যঞ্জন এলে সেগুলিকে জুড়ে ও তাদের অংশবিশেষ নিয়ে নতুন 'সংযুক্ত ব্যঞ্জন' বর্ণের সৃষ্টি হয়।[১৫]

সেমীয় (semitic) বর্ণমালার ছিল ২২টি বর্ণ বা চিহ্ন এবং এর প্রত্যেকটি একটি ব্যঞ্জনের দ্যোতক। লিখন পদ্ধতি ছিলো দক্ষিণ থেকে বামে; আর কোন স্বর ছিল না। ভারতীয় নাগরীলিপি, আরবীয়, হিব্রু ও গ্রীক বর্ণমালা এরই রকমফের। সিন্ধুলিপির লিখন ধারা সাধারণত ডাইনে থেকে বাঁয়ে ছিল এবং কখনো কখনো ডাইনে-বাঁ ও বাঁ-ডাইনের একান্তর। এক অর্থে ভারতীয় বর্ণমালা প্রকৃত লিপিমালা নয়, কিন্তু অক্ষরমালারই পরিবর্তিত রূপ—গ্রীকদের স্বর চিহ্নের অভাবে বর্ণের ইতিহাস কি হতে পারতো এতে প্রকাশ পায় তাই। গ্রীকরা স্বর চিহ্নের আবিষ্কারে এ থেকে মুক্তি পেয়েচেন। এরই পরিবর্তে ভারতীয়রা প্রতিটি ব্যঞ্জন চিহ্নকে ব্যবহার করেচেন 'অ'-যুক্ত ব্যঞ্জন হিসেবে। অন্যান্য স্বর দেখান হয়েচে ব্যঞ্জনের সঙ্গে চিহ্ন যুক্ত করে এবং এই পরি-স্থিতিতে লিখনের আক্ষরিক প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়েচে। সর্বশেষে সমস্যা হলো অনুবর্তী স্বরবিহীন ব্যঞ্জনের অর্থাৎ শব্দান্ত্য ব্যঞ্জনের। অক্ষরমালার স্বাভাবিক নিয়ম হলো একে এমনভাবে লেখা যাতে মনে হয় যে একে অনুবর্তন

করচে একটি স্বর ঃ সিপ্রীয় (Cyprian) পদ্ধতিতে যুক্ত হয়েছে 'এ'। ভারতীয় সমাধান হলো ব্যঞ্জন চিহ্নকে পরবর্তী চিহ্নের সঙ্গে যুক্ত করা। আর এ ঘটে শব্দান্তেও, কেননা বাক্যস্থ শব্দাবলীর মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয়না। অন্ত্য ব্যঞ্জনে বাক্য শেষ হলে একটি বিশেষ চিহ্ন স্থাপিত হয়, যাতে বোঝায় যে কোন স্বর পড়ার প্রয়োজন নেই।[১৬]

২.৯ অক্ষর, অনাক্ষরিক ও ধ্বনিমান

স্বরধ্বনিই বাংলা অক্ষর গঠন করে। তাই বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যে (1.৯৯) উক্ত হয়েছে 'স্বরোঽক্ষরম্' অর্থাৎ স্বরই অক্ষর। আর ব্যঞ্জন স্বরের অঙ্গ। তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (XXI.১) তাই বলা হয়েচে ঃ 'ব্যঞ্জন * স্বরাঙ্গম্', অর্থাৎ ব্যঞ্জন স্বরের অঙ্গ। বাঙলা প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনি লিপিতে লুকান আছে একটি স্বরধ্বনি। এবং এই স্বরধ্বনিটি হলো 'অ'। কোন একটি ব্যঞ্জনবর্ণকে শব্দের বাইরে উচ্চারণ করতে গেলেই তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি 'অ' আপনা থেকেই উচ্চারিত হয় এবং ঐ লিপি একটি পূর্ণাক্ষরের মর্যাদা পায়। বাঙলা লিখন পদ্ধতিতে এটা সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, যথা, ক=ক্+অ, প=প্+অ। ফলে বাঙলা বর্ণমালা আক্ষরিক অর্থাৎ এগুলো বর্ণ ও অক্ষর দুই-ই। একদিকে যেমন বর্ণমালা (alphabet), অন্যদিকে তেমনি অক্ষরমালা (syllabary)।[১৭]

এখানে উল্লেখ্য যে নাগরী লেখন পদ্ধতি অক্ষরমালিক, কিন্তু এর বিশ্লেষণ, —যা আছে পাণিনির "বর্ণসমাম্নায়" বা "বর্ণমালায়"—ধরা পড়ে আধুনিক স্বনমানবিদের পদ্ধতিতে আর এ তিনি তৈরি করেন শব্দস্বাতন্ত্র্যের বিকল্প ও বণ্টন বিশ্লেষণে।[১৮] তবে বর্ণের তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হতে পারে লাতিন লিপিবাদের ভিত্তিতে। চিরাচরিত এই লিপিবাদ গ্রীক থেকে উদ্ভূত—লাতিন littera হলো এ মতবাদের পরিভাষা। এই মতানুসারে মানুষী বাক্ ক্রমাগত ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর এককে বিভক্ত হতে পারে ঃ বাক্য, শব্দ, অক্ষর ও লিপি। এদের প্রত্যেকের সমস্যা সমাধানে আছে ব্যঞ্জনের এক একটি শাখা ঃ বাক্যবিন্যাস, শব্দতত্ত্ব, ছন্দপ্রকরণ ও বর্ণবিন্যাস। আর littera-এর আছে তিনটি গুণ—শক্তি (potestas) ; চিত্র (figure) ; ও নাম (nomen)। প্রথমটি হলো যা উচ্চারিত ; দ্বিতীয়টি যা লিখিত বা লিপি ; তৃতীয়টি যা সনাক্ত করে। লিপি বা letter বাদ দেয়া হয় আজকাল—ভাষাতাত্ত্বিকেরা ব্যবহার করেন বাগ্ধ্বনি (speech sound), প্রতীক (symbol) ও স্বনমান (phoneme)।[১৯] সংস্কৃতে শক্তি বা বাগ্ধ্বনির উপলব্ধি ঘটে 'অ' স্বরকে অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত করে—ক—চিত্র পাওয়া যায় ক্+অ থেকে, আর নামকরণ হয় এই অক্ষর অর্থাৎ 'ক' দিয়ে অথবা —'কার' প্রত্যয় যোগে, যেমন 'ক—কার' এ। স্বরের ক্ষেত্রে অবশ্য 'অ' যোগের প্রয়োজন নেই, যথা, i ধ্বনি, ই-চিত্র, i বা i-কার নাম। বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যে

(I.৩৪) বলা হয়েচে : "উপদিষ্টা বর্ণাঃ" অর্থাৎ বর্ণসমাম্নায়ে যা কথিত হয়েচে তা হলো 'বর্ণ'। কাজেই বর্ণে বুঝায় সাধারণভাবে ধ্বনি-একক ; কিন্তু এ 'কার'-পথে কখনো নাম (nomen) বুঝায় না। হ্রস্ব স্বর বুঝাতে ই-কার ব্যবহৃত হয়, কিন্তু 'ই'-বর্ণ নয়। আদৌ বর্ণে বুঝাত ধ্বনি-গুণ এবং সর্বদাই স্বরগুণ, কিন্তু ধ্বনি-একক নয়। পতঞ্জলি তাই বলেচেন তাঁর মহাভাষ্যে (I. i. ১) : 'অবর্ণা কৃতির উপদিষ্টা সর্বম অ-বর্ণকুলম গ্রহীষ্যতি'। অর্থাৎ বর্ণ একটি জাতীয় পরিভাষা, যাতে বুঝায় গোটা ধ্বনি-পরিবার বা বর্ণকুল। বস্তুত অন্য প্রসঙ্গেও অর্থাৎ 'রঙ'-এ এর অর্থ হলো 'স্বর-বর্ণালি ব্যান্ড' (band of vocalic spectrum)। এখন বর্ণের ইংরেজি অনুবাদ নিয়ে আলোচনা। আগেই বলা হয়েচে যে ই-গুণে এর পরিচিতি মেলে। বলতে বাধা নেই যে এরই সঙ্গে আধুনিক 'স্বনমানের' (phoneme) অনেকটা সাদৃশ্য আছে, যদিও স্বনমানীয় কোন মতবাত এতে বুঝায় না। কাজেই বর্ণের অনুবাদ phoneme নয়। আবার sound-unit বললে বর্ণ বুঝায় না, এতে বুঝায় পারিভাষিক ব্যবহার। কাজেই লাতিন letter বর্ণের প্রতিশব্দ : এরা phonemeই বটে, যদিও আত্ম-সচেতন নয়।[২০] তবে লাতিনের তিনটি গুণের মধ্যে অবশ্য চিত্র (figura) গুণ নেই এখানে। তা সত্ত্বেও বর্ণ = letter সমীকরণটি সমর্থনযোগ্য এই অর্থে যে ভাষা লিখিত হলে 'শক্তি' ও 'নাম' নিশ্চয়ই চিত্রগুণান্বিত হবে।[২১]

এ-প্রসঙ্গে phoneme বিবেচ্য। ফার্থ মনে করেন যে phoneme (স্বনমান) phone (ধ্বনি) থেকে আলাদা। পোলান্ডের ভাষাতাত্ত্বিক Baudouin de Courtenay-র ছাত্র Kruszewiski নামীয় এক ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিত ১৮৭৯ খ্রীঃ phoneme আবিষ্কার করেন। ফরাসী phonème অবশ্য আবিস্কার করেন L. Havet ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে আর এর অর্থ "বাগ্ধ্বনি"।[২২] স্বনমানের ধারণা সুপ্রাচীন। চিত্র পদ্ধতি ত্যাগ করে মানুষ যখন বর্ণ পদ্ধতি গ্রহণ করলো ভাষা লিখতে তখনি দেখা দিল স্বনমান। এর কারণ Edward Sapir-এর মতে 'স্বনমানিক স্বজ্ঞা' (phonemic intuition)। সহজ প্রবৃত্তিবশে লোকে জানে ভাষায় শব্দ-পৃথকীকরণে কোন কোন বাগ্ধ্বনির প্রভেদ সক্রিয়। কাজেই এটা স্বাভাবিক যে মানুষ বর্ণমাধ্যমে তার ভাষা প্রকাশ লিখেচে স্বনমানীয়ভাবে। স্বনমান সম্পর্কে তিনটি মতবাদ প্রচলিত—মানসিক (mentalistic) ; ইমারতী (structural) ; ও ভৌত (physical)। প্রথমের প্রতিষ্ঠাতা হলেন অধ্যাপক Baudouin de Courtenay—এ হলো স্বনমানের মানসিক ব্যাখ্যা। স্বনমান হলো একটি একক বিমূর্তধ্বনি বা ধ্বনি-প্রতিরূপ (sound image)—বক্তা ইচ্ছামতো একে তার মানসপটে আনতে পারে এবং বলার সময়ে অবচেতনভাবে সে তার মূর্ত প্রকাশের চেষ্টা করে। স্বনমান 'মানস প্রতিরূপ' (mental image) বলেই ধ্বনিবিজ্ঞান দুভাগে বিভক্ত—ভৌত ধ্বনিবিজ্ঞান (physio-phonetics) ও মানস ধ্বনিবিজ্ঞান (psycho-phonetics)। বাস্তব উচ্চারিত

ধ্বনির অনুশীলনে ব্যবহৃত হয় প্রথমটি ; আর ধ্বনির মানস প্রতিরূপের অনুশীলনে দ্বিতীয়টি। ইমারতী বা বৃত্তীয় (functional) দিক থেকে Bloomfield স্বনমানের সংজ্ঞা নির্দেশ করেছেন এভাবেঃ স্বনমান হলো "স্বতন্ত্র ধ্বনি বৈশিষ্ট্যের লঘিষ্ঠ একক যাতে অর্থবিভেদ ঘটায়।"[২৩] মনে রাখতে হবে যে স্বনমান ধ্বনি নয়, কিন্তু ধ্বনিবৈশিষ্ট্য যার অস্তিত্ব বাস্তব বাগ্‌-ধ্বনিতে স্বীকৃত। ভৌত মতবাদের প্রবর্তক Daniel Jones বলেনঃ ভাষা ও ধ্বনিবিজ্ঞান প্রসঙ্গে স্বনমান হলো একটি পরিবার। তাই বলা যায় যে স্বনমান কোন ভাষার একটি ধ্বনি পরিবার, চরিত্রের দিক থেকে যার ধ্বনিমালা পরস্পর সম্পর্কিত এবং এমনভাবে ব্যবহৃত যে এর যে কোন সদস্য আরেকটির মতো শব্দে একই ধ্বনি প্রসঙ্গে প্রযুক্ত হয় না।[২৪]

এখানে স্মর্তব্য যে বাগ্‌ধ্বনি (speech-sound) ও স্বনমানকে (phoneme) পৃথক করা হয় এ ভাবেঃ বাগ্‌ধ্বনি হলো বাক্‌-প্রত্যঙ্গ-উৎপন্ন নির্দিষ্ট শ্রৌত গুণের একটি ধ্বনি—এ পরিবর্তনে অপারগ। অধিকাংশ ভাষায় থাকে বহু সংখ্যক স্বতন্ত্র বাগ্‌ধ্বনি। পক্ষান্তরে স্বনমান সাংজ্ঞিত হয় এ ভাবে—এ যে-কোন ভাষার সম্পর্কিত ধ্বনিগুচ্ছ, যা যোজিত (connected) বাক্‌-এ এমনভাবে প্রযুক্ত হয় যে তাদের একটি অন্যটির জায়গা কখনো দখল করে না। একটি স্বনমানের বাগ্‌ধ্বনিমালা একটি শব্দকে অন্য শব্দ থেকে পৃথক করতে পারে না।[২৫] এই বাগ্‌ধ্বনি দু'ভাবে শ্রেণীবিন্যস্ত হতে পারে—এক, Stetson-এর মতে অক্ষর-বিচলনে তাদের কাজ অনুসারে ; দুই, Jespersen-এর মতে তাদের আপেক্ষিক সুনাদের (sonority) ভিত্তিতে। প্রথমটির নাম আক্ষরিকমালা (syllabics)ঃ অক্ষর বিচলনের শ্বাস স্পন্দকালে যেসব ধ্বনিগুচ্ছ অক্ষরমালার সর্বাধিক সুনাদী উপাদান হিসেবে সচরাচর দেখা দেয়, আক্ষরিকমালা তা দিয়ে গড়ে ওঠে। যেমন র‍্যাট (rat) অক্ষরের সবচেয়ে সুনাদী অংশ হলো (ae) বা 'এ্যা'। অক্ষর বিচলন (r) বা 'র'-তে মুক্ত হয়, (ae) বা এ্যা—উচ্চারণে শ্বাস স্পন্দের প্রবাহ চলে এবং অক্ষর বিচলন (t) বা ট-তে অবরুদ্ধ হয়। বাগ্‌ধ্বনি বৃত্তি অনুসারে দ্বিধা বিভক্ত হয়—আক্ষরিকমালা (syllabics) ও অনাক্ষরিক মালা (non-syllabics)। এ বিভাগ অক্ষরের অস্তিত্ব স্বীকার করে। নির্বিবাদ ঘটনা এ যে শ্রৌত অভিলেখকের (acoustic recorder) ডেসিবেল (microwatt, i.e. 10^{-6} watt) মাপকে দেখা যায় শ্রৌতশক্তির (acoustic energy) নির্দিষ্ট চূড়ামালায় (peaks), যা যথাযথভাবে খাপ খায় সংখ্যায় ও ক্রমে আক্ষরিক (syllabics) মালা নামীয় ধ্বনিগুচ্ছের সঙ্গে। উক্তির প্রতিটি অংশের জন্যে আছে এরূপ একটি চূড়া, যাকে বলা হয় অক্ষর (syllable)। R. H. Stetson তাঁর Motor Phonetics (1951)-এ বলেছেন যে "অক্ষরই সঞ্চালক একক।" অর্থাৎ প্রতিটি অক্ষরই মূলত একটি বিচলন জট (movement complex) যেখানে বৃহত্তর অন্তর্নিহিত বিচলন হলো শ্বাস স্পন্দ বা উরস পেশীতন্ত্রের

অভিঘাত যা ফুসফুসে বায়ুর সংনমন (compression) ঘটায়। পরে উচ্চারণ প্রত্যঙ্গের বিচলনে বায়ু-নিঃসারণ শুরু, নিয়ন্ত্রিত, অথবা বন্ধ হয়। Stetson-এর মতে অনাক্ষরিকরা (non-syllabics) অধিকাংশ আক্ষরিক বিচলনের চরিত্র নির্ধারণ করে ; আক্ষরিক তাই গৌণ উপাদান। তাঁর মতে অক্ষর বাস্তব সত্য. শুধু মাত্র কল্পনা নয়।

তবে ব্যবহারিক দিক থেকে সুনাদ হয়ে দাঁড়ায় পথপ্রদর্শক। আপাত পূর্ণতা বা দরাজভাবের ভিত্তিতে ধ্বনিতে আরোপিত গুণই হলো সুনাদ এবং বাগ্‌ধ্বনির বেলায় সুনাদ প্রধানত স্বরের শ্রাব্যতা-মাত্রার অনুষঙ্গী হয়। স্বর ব্যতিরেকে উৎপন্ন অর্থাৎ অঘোষ যে কোন দু'টি বাগ্‌ধ্বনির মধ্যে খুব অল্পই লক্ষণীয় বিভেদ থাকে। এ জন্যে ন্যূনাধিক সঠিকভাবে শ্রোতশক্তির সঙ্গে সুনাদের সমীকরণ চলে ; আর ইলেক্‌ট্রনীয় পদ্ধতিতে এর পরিমাণ যথাযথ নির্ধারিত হতে পারে। এ কাজ হয়েচে বেল টেলিফোন পরীক্ষাগারে। আসলে ফলাফল অবশ্য Sievers ও Jespersen প্রদর্শিত শ্রৌত প্রত্যক্ষণের থেকে স্বতন্ত্র নয়। আপেক্ষিক সুনাদের অনুক্রম এরূপ—

(১) অবম সুনাদের পরিচায়ক অঘোষ (voiceless) ধ্বনি যেমন, প, ট, ক, অথবা ফ, স, হ।
(২) অধিকতর সুনাদী ঘোষ ধ্বনি, যথা, ব, ড, গ অথবা ভ, য, জ।
(৩) অধিকতর সুনাদী নাসিক্য ধ্বনি যেমন, ম, ন, ঙ ও পার্শ্বিক বা 'ল' —ধ্বনি। এ ছাড়া 'শ'—ধ্বনি।
(৪) এদের চেয়ে প্রবলতর "র"—ধ্বনি।
(৫) পরবর্তী ধ্বনিগুচ্ছ হলো 'উ' বা 'ই' এবং 'ও', 'এ'।
(৬) এদের পরে সুনাদের পরিচায়ক হলো 'ও', 'এ্যা', 'অ'—এদের মধ্যে (আ) সবচেয়ে বেশি সুনাদী।[২৬]

ইংরেজি syllabic শব্দটি বিশেষণ এবং এ syllable জাত। তবে syllabics হিসেবে এ বিশেষ্যও। এবং এ হলো বিশেষণের অনুক্ত (elliptical) ব্যবহার। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে এর অর্থ ছিলো আক্ষরিক ধ্বনি—এমন একটি কণ্ঠ্যধ্বনি যা নিজেই একটি অক্ষর গঠনে অথবা অক্ষরের মূল উপাদান সৃষ্টিতে সক্ষম।[২৭] এ ভাবে বাঙলায় এরই প্রতিশব্দ হবে আক্ষরিক ও তার বিপরীত অনাক্ষরিক। এখানে মনে রাখতে হবে যে বাগ্‌ধ্বনি বিচলনজাত হ'য়ে শ্রাব্য হয়। তাই দু'টি জিনিস লক্ষণীয়—ধ্বনি উৎপাদক বিচলন ও ধ্বনিগুচ্ছ। প্রথমটি উৎপত্তি-মার্গীয়, দ্বিতীয়টি ফল-মার্গীয়। একটি বাক্-প্রত্যঙ্গের বিচলনের পরীক্ষা করে, অন্যটি শ্রৌত প্রপঞ্চের। কাজেই উৎপত্তির দিক থেকে আক্ষরিক হলো অক্ষরের নির্গত শ্বাসস্পন্দের প্রধান বাহক, আবার শ্রুতির দিক থেকে এ হলো অক্ষরের প্রধান সুনাদী উপাদান। ফলে অতিসুনাদী উপাদান হলো স্বর। তবে সন্তোষজনক এমন কোন পদ্ধতি নেই যাতে স্বর ও ব্যঞ্জনের পার্থক্য

ধরা যেতে পারে। বেল টেলিফোন পরীক্ষাগারে দু'টি যন্ত্রকৌশল আছে—ভোকোদার (Vocoder) ও ভোদার (Voder)। প্রথমটি Vo(ice) Coder থেকে উৎপন্ন—এ এক ইলেকট্রনিক যন্ত্রকৌশল যা বাক্‌-সংকেতকে পরিবর্তী (varying) সংকেতে রূপান্তর করে সীমিত কম্পাংক ব্যান্ডের প্রসার-যুক্ত যোগাযোগতন্ত্রের উপর দিয়ে প্রেরণ করে। দ্বিতীয়টি এসেচে Vo(ice) o (peration) de (monstrato) r থেকে—এ এমন একটি ইলেকট্রনিক যন্ত্রকৌশল যা বাক্‌-এর স্বীকার্য সন্নিকর্ষ সৃষ্টিতে পারঙ্গম।[২৮] এ থেকে Homer Dudl y বাক্‌-এর শ্রৌত প্রপঞ্চের এক ব্যাখ্যা দিয়েচেন। তাঁর তত্ত্বটি প্রসার মডুলন ভিত্তিক বেতার টেলিফোনিবাদের প্রতিরূপ (analogue)। শেষোক্ত প্রক্রিয়ায় প্রয়োজন হয় প্রেরক-নির্গত এক নিয়ত তরঙ্গমালার। এই নিয়ত তরঙ্গমালা বা বাহক তরঙ্গের উপর প্রযুক্ত হয় বার্তাবহ তরঙ্গরূপ বাহনের ব্যতিকরণে (interference) অথবা মডুলেশনে। ফলে উপরি প্রযুক্ত বিন্যাসে স্থান পায় বাহক তরঙ্গমালা এবং এ বিন্যাসই গৃহীত হ'য়ে ব্যাখ্যাত হয়। মানুষী বাক্‌-এর ব্যাখ্যায় Dudley দু'টি স্বতন্ত্র বাহক উৎসের অবস্থান স্বীকার করেন—(১) কণ্ঠপটির কম্পমান গুণগুণানি (buzz) ; ও (২) শ্বাস প্রবাহের বহির্গমন জাত বিভিন্ন অবরোধে উৎপন্ন ফোঁসফোঁসানি বা অনিয়মিত (random) অপস্বর (noise)। ঘোষ ব্যঞ্জনে দু'টি বাহক উৎস একই সঙ্গে সক্রিয়। জিভ, কোমল তালু (velum), হনু (jaw) ও ঠোঁটের বিচলন শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনে এত মন্থর যে তা কম্পাংক বিচলনের মতো শ্রুতিগ্রাহ্য নয়। আমরা যা শুনি তা হলো ধ্বনির স্থির উৎস বা বাক্‌-এর বাহক কম্পাংকের উপর এইসব বিচলনের মডুলক অভিক্রিয়া (effect)। তাই Stetson এ-ব্যাখ্যার কাছাকাছি এসে যান যখন তিনি বলেন ঃ "বাক্‌ বরং বিচলন প্রসূত এক প্রস্ত ধ্বনির চেয়ে এক প্রস্ত শ্রাব্য বিচলন।"[২৯]

২.১০ স্বর ও ব্যঞ্জন

বাগ্‌ধ্বনির উৎস হলো স্থির বায়ুপ্রবাহ, যা ফুস্‌ফুস্‌ থেকে নির্গত হয়ে সজোরে চালিত হয় কণ্ঠরন্ধ্রের ভিতর দিয়ে এবং বিভিন্ন মুখ ও নাসিকা বিবরের শ্রৌত জালকের (network) উপর দিয়ে। এই বায়ুপ্রবাহই শক্তির বাহক। এর বেগ ও চাপ মডুলিত হয় শ্রাব্য ধ্বনির উৎপাদনে। আর এ ঘটে দু'ভাবে—কণ্ঠতন্ত্রীর সহায়তায় এবং কণ্ঠতন্ত্রী ব্যতিরেকে। প্রথমে উৎপন্ন হয় ঘোষ (voiced) ধ্বনি, দ্বিতীয়ে অঘোষ (unvoiced) বা শ্বাস ধ্বনি (breath sound)। ঘোষ ধ্বনির বেলায় কণ্ঠতন্ত্রীদ্বয় স্পন্দমান হয় বায়ুপ্রবাহে অবরোধ সৃষ্টির জন্যে এবং এদের কম্পাংক নারী-পুরুষ ভেদ, স্বরভঙ্গি ও স্বরগুণ অনুসারে সেকেন্ড প্রতি ৭৫ থেকে ৫০০ হতে পারে। অঘোষ ধ্বনি বা ফিসফিসানিতে

বাসকে কণ্ঠাঞ্চল দিয়ে বের করে দেওয়া হয়। এতে পলায়নী ভাপের মতো এক ধরনের ফোঁস-ফোঁস ধ্বনি উৎপন্ন হয়—অনিয়মিত বিভিন্ন কণ্ঠাঞ্চল অতিক্রম কালে বায়ুপ্রবাহের যে বিক্ষোভ (turbulence) সৃষ্টি হয় এ ধ্বনি তারই ফল। এই বায়ুপ্রবাহ ওষ্ঠ, দন্ত বা জিহ্বা দ্বারা মডুলিত হলে আমরা পাই ফ, স, প, ট, ক-এর মতো ব্যঞ্জন ধ্বনি। সকল স্বরই ঘোষধ্বনি ; ব্যঞ্জন ঘোষ বা অঘোষ দুই হতে পারে। স্বর ও ব্যঞ্জন মিশ্রিত প্রকৃত বাক্-এ ঘোষ ও অঘোষ ধ্বনি বাহক ব্যবহৃত হয় একান্তরণে (alternately) অথবা যুগপত্তায় (simultaneously)। ফিস্‌ফিসানিতে অঘোষ ধ্বনিই একমাত্র বাহক। এ সব বাহকের উপর আরোপিত মডুলন-এ তৈরি হয় বাক্ তথ্য। অধিকাংশ ধ্বনিতে বিস্তার মডুলিত হয়, তবে কম্পাংক মডুলনেরও ভূমিকা আছে কোন কোন ধ্বনিতে, যেমন বিভক্তিতে (inflexion)।[৩০]

স্বরগুণ-প্রস্বরাবয়ব

সব স্বরধ্বনির শ্বাসরন্ধ্রীয় স্পন্দ সমান থাকে যদি একই প্রস্বরে উচ্চারিত হয়। শ্বাসরন্ধ্রের উপরিস্থ অনুনাদী বিবরে ঘটায় বিভিন্ন স্বরধ্বনির বিভেদ, যেমন, (i:), (ɒ) ও (u:) দেখা যায় Sheet, shot ও shoot-এ। এখানে যা ঘটে তা হ'লো এই যে কণ্ঠতন্ত্রী (vocal cords) শুধু যে ভিত্তি-স্পন্দ অর্থাৎ মূল কম্পাংক (fundamental frequency) সৃষ্টি করে তা নয়, কিন্তু কিছু সংখ্যক অধিসুর বা সুর গুণিতকও, যাদের কম্পাংক স্পন্দের মূল কম্পাংকের গুণিতক। উদাহরণ নেয়া যাক—মূল কম্পাংক ১০০ সিপিএস (cps) হলে উচ্চতর সুর-গুণিতক হবে ২০০, ৩০০, ৪০০ সিপিএস (cps) প্রভৃতি। প্রস্বর (pitch) অবশ্য নির্ধারিত হয় মূল কম্পাংকে, যা বর্ত্তমান সব কম্পাংকের গ, সা, গু। বিভিন্ন স্বরগুণের জন্যে দায়ী গলনালী, মুখ ও নাসিকার অনুনাদী বিবরের আকৃতি। এ-সব আকৃতির প্রত্যেকের আছে স্পন্দের একটি নিজস্ব স্বাভাবিক কম্পাংক। শ্বাসরন্ধ্রীয় সুরের সুরগুণিতক অনুনাদী প্রকোষ্ঠের স্বাভাবিক কম্পাংকের সঙ্গে মিলে গেলে তারা হ'য়ে ওঠে প্রবলতর। Car-এর (a :) তে যে-সব সুরগুণিতক বলবত্তর হয় তারা ৮০০ ও ১১০০ সিপিএস-এর কাছাকাছি; আবার see-এর (i ঃ) হবে ২৮০ ও ২,৫০০ সিপিএস। প্রবলিত (reinforced) কম্পাংকের এ-সব ব্যান্ড একটি বিশেষ ধ্বনিগুণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এরা প্রস্বরাবয়ব (formant) নামে পরিচিত। বিভিন্ন কম্পাংকের মধ্যে শক্তিবন্টন জানার জন্যে ব্যবহৃত হয় বর্ণালিলেখী (spectrograph) যাতে ধরা পড়ে শব্দ বর্ণালি।

স্বরধ্বনির প্রথম প্রস্বরাবয়ব নিচু, যখন মুখের ভিতর জিভ থাকে উঁচুতে, যথা see-তে (i ঃ) এবং do-এর (u ঃ)তে। প্রথম প্রস্বরাবয়বের পাল্লা হবে ২৮০—

৩০০ সিপিএস ; তবে car-এ (a) এবং hot-এর (ɒ) ৬০০—৮০০ সিপিএস এ বর্ত্তমান। দ্বিতীয় প্রস্বরাবয়ব সম্মুখ বিবর দৈর্ঘ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন (i ঃ) এর দ্বিতীয় প্রস্বরাবয়ব হবে ২,৫০০ সিপিএস, কিন্তু (u ঃ)-এর দ্বিতীয় প্রস্বরাবয়ব হবে ৯০০ সিপিএস।[৩১] বর্ণালি চিত্রে (spectrogram) দেখা যায় যে কিছু-কিছু সুরগুণিতক অথবা সন্নিহিত সুরগুণিতক গোষ্ঠী প্রবল, অন্যেরা দুর্বল। প্রস্বরের দ্রুত ওঠা-নামায় দেখা যায় যে এই শক্তি বিশেষ সুর-গুণিতকের ধর্ম নয়, যেমন এ বর্ণালি-অঞ্চলের। তাই যদি কোন স্বরধ্বনি বর্ধিষ্ণু ভঙ্গিতে উচ্চারিত হয় তবে বর্ণালিচিত্র প্রবল সুরগুণিতক যুক্ত কিছু-সংখ্যক অঞ্চল দেখায়। প্রতিটি সুরগুণিতকই প্রস্বর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বেড়ে যায়। এবং এ-সব অঞ্চলে প্রবেশের সঙ্গেই এ হয়ে ওঠে প্রবলতর। এর বাইরে চলে গেলে এ-আবার হবে দুর্বলতর। বর্ণালিচিত্রে এরকম অঞ্চল কেই বলা হয় প্রস্বরাবয়ব। একই প্রস্বরাবয়বের মধ্যে শুধুমাত্র একটি সুর গুণিতক থাকতে পারে অথবা বেশিও। আর সুরগুণিতকের প্রবেশ বা নিষ্ক্রমন ঘটে প্রস্বর-পরিবর্তনে অথবা প্রস্বরাবয়বের স্থানান্তরে।[৩২] বাঙলায় প্রস্বরাবয়বের অঞ্চলগুলি এ-ভাবে চিহ্নিত হয়েচে নারীকণ্ঠের বেলায়—'ই', ৪০০, ২,৭০০, ৪,৫০০ সিপিএস ; 'এ্যা' ৭৫০, ১৮৫০, ২,৭৫০ সিপিএস ; 'আ' ৮০০, ১,৭০০, ৩,০০০ সিপিএস ; 'অ' ৪০০, ১,০০০, ৩,০০০ সিপিএস ; 'ও' ৪০০, ৮০০, ৩,০০০ সিপিএস ; 'এ' ৩৫০, ২৫০০, ৩,০০০ সিপিএস ; এবং 'উ' ৪০০, ও ৮০০ সিপিএস।[৩৩]

অক্ষর—স্বর ও ব্যঞ্জন

বাক্‌-বিশ্লেষণে অক্ষরই একক হিসেবে গৃহীত—এ সংজ্ঞিত হ'তে পারে ফুসফুসীয় বায়ু-প্রবাহের যন্ত্রকৌশলে। এই যন্ত্রকৌশলে ফুসফুস থেকে বায়ু নিয়মিত ও অবিরত প্রবাহে নিঃসৃত হয় না। বক্ষস্থ পেশীপুঞ্জ একান্তর-ভাবে সংকুচিত ও প্রসারিত হয় এবং তাই বায়ুকে ঠেলে দেয়া হয় ছোট-ছোট দমকায় মোটামুটি সেকেন্ড প্রতি ৫ গুণ হারে। পেশীর এ রকম বিচলনকে বলে বক্ষস্পন্দ, যা অক্ষরের সামিল। কখনো-কখনো পেশীয় ক্রিয়া প্রবলতর হয়—এতে উৎপন্ন হয় প্রচলিত বক্ষস্পন্দ এবং প্রবলতর বায়ুর দমকা। এ-ভাবে উৎপন্ন অক্ষরের নাম প্রচাপিত অক্ষর এবং পেশীয় বিচলনের নাম প্রচাপ-স্পন্দ। কাজেই অক্ষর বিভাজিত হয় দুই খণ্ডে বা বাক্‌-ধ্বনিতে—স্বর ও ব্যঞ্জন। এদের পার্থক্য আক্ষরিক গড়নে এদের বৃত্তির উপর নির্ভরশীল। অক্ষরের জন্যে যে বক্ষস্পন্দের প্রয়োজন তারি বাহক হ'লো স্বর এবং এ বায়ু নির্গমের অবাধ পথ করে দেয়। কাজেই স্বর হ'লো অক্ষরের কেন্দ্রক (nucleus)। পক্ষান্তরে ব্যঞ্জন উপান্তিক (marginal)—এরা বক্ষস্পন্দজাত বায়ু-বিচলনের

শুরু বা শেষ করে। যেমন দীপ (di : p) এ, স্বর (i :) অক্ষরের জন্যে বায়ু মুক্ত করে দেয়, কিন্তু ব্যঞ্জন (দ=d) বায়ুপ্রবাহের অবরোধ ঘটায় এবং পরে হঠাৎ তাকে ছেড়ে দেয় এবং এ মোচক ব্যঞ্জন। আর ব্যঞ্জন (প=p) অক্ষর শেষে বায়ুপ্রবাহকে বন্ধ করে দেয় এবং এ অবরোধক ব্যঞ্জন।

অধিকাংশ ব্যঞ্জন উৎপন্ন হয় ফুসফুসের বহির্গামী বায়ু-প্রবাহে। কণ্ঠতন্ত্রী-দ্বয় পৃথক থাকে অঘোষ ধ্বনিতে আর একত্রে স্পন্দশীল হয় ঘোষধ্বনির বেলায়। সাধারণত অঘোষ ব্যঞ্জনের তুলনায় ঘোষ ব্যঞ্জনের শ্বাসশক্তি দুর্বলতর। তাই ব্যঞ্জন উচ্চারণে শ্বাসশক্তি ও পেশীয় আয়াসের মাত্রা (effect) বুঝাতে ব্যবহৃত হয় দৃঢ় (fortis) ও কোমল (lenis) শব্দ দু'টি। যে-সব বাক্-প্রত্যঙ্গ (organs of speech) ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি উৎপাদনে বিভিন্ন স্থানেও বিভিন্নভাবে বায়ু-প্রবাহে বাধানিষেধ আরোপ করে তাদের বলা হয় উচ্চারক (articulator)। সক্রিয় উচ্চারক নিষ্ক্রিয় উচ্চারকের দিকে ধাবিত হয়। অধিকাংশ উচ্চারণীয় বিচলন সক্রিয় উচ্চারকের ঊর্ধ্বমুখী বিচলন অর্থাৎ অধর, জিভের অগ্র, পাতা (blade), সম্মুখ ও পশ্চাদভাগের বিচলন। এ-বিচলন নিষ্ক্রিয় উচ্চারকের দিকে অর্থাৎ ওষ্ঠ, উপরের দাঁত, দন্তমূল, কঠিন তালু ও কোমল তালু বা ঝিল্লী (velum)-র দিকে ধাবিত হয়। পক্ষান্তরে স্বর হ'লো ঘোষধ্বনি, যা উচ্চারকদের খোলা সন্নিকর্ষে (approximation) উৎপন্ন হয় অর্থাৎ শ্রাব্য উষ্মতা (friction) কারক কোন সংবার (closure) বা সংকীর্ণন (narrowing) ব্যতিরেকেই। স্বরগুণ নির্ভর করে গলনালী, মুখ ও নাসিকার বিবরীয় আকৃতির উপর, যা আবার কোমল তালু, জিহ্বা ও ওষ্ঠাধরের উপর নির্ভরশীল। কোমল তালু উত্তোলিত হয় মৌখিক স্বরধ্বনির বেলায় আর অবনমিত হয় নাসিক্য স্বরের ক্ষেত্রে।[৩১]

বাক্ প্রত্যঙ্গ তিন রকমের—(১) শ্বসন প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ ফুসফুস ও শ্বাসনালী; (২) বাক্যন্ত্রী (larynx); ও (৩) অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় (super-glottal) প্রত্যঙ্গ অর্থাৎ গলবিল (pharynx) মুখ ও নাসিকা। প্রথমটি সরবরাহ করে বাক্-উপাদান অর্থাৎ বহির্গামী শ্বাস। দ্বিতীয়টি একে স্বরধ্বনিতে রূপান্তরিত করে। আর তৃতীয়টি ব্যবহৃত হয় শ্বাস বা বাগ্যন্ত্রে উৎপন্ন স্বরধ্বনির পরিবর্তনে। এরা অনুনাদ-প্রকোষ্ঠের কাজ করে এবং এদের আকৃতি ও আয়তনের পরিবর্তন ঘটে জিভ, কোমল তালু ও ওষ্ঠাধর মাধ্যমে; এ-ছাড়াও বাগ্যন্ত্রের স্থানান্তরণে। তাই বাগ্যন্ত্র যতই ঊর্ধ্বে উত্তোলিত হয়, গলবিল ততই হ্রস্বতর হয়। স্বর মূলত শীতল ধ্বনি, ব্যঞ্জন মূলত অপস্বর। স্বরের বেলায় মৌল ধ্বনি উৎপন্ন হয় বাগ্যন্ত্রে আর অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় প্রত্যঙ্গে এ পরিবর্তিত হয়। ব্যঞ্জন বর্ণের ক্ষেত্রে, বাগযন্ত্রের ক্রিয়া অত্যাবশ্যক নয়; বায়ু-প্রবাহকে গলবিলে নিয়ে যাওয়া ছাড়া এর আর কোন কাজ নেই; ব্যঞ্জনের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় প্রত্যঙ্গগুলি। কাজেই বাগ্ধ্বনি

স্বর হবে যখন তারা এমনভাবে উৎপন্ন হয় যে বায়ু প্রবাহ মুখের ভিতর দিয়ে অবাধভাবে সঞ্চারিত হয়। আর বাগ্‌ধ্বনি ব্যঞ্জন হয় যখন তারা এমনভাবে উৎপন্ন হয় যে মুখের আভ্যন্তরীণ বায়ু-প্রবাহ হয় কোথাও মুহূর্তের জন্য অবরুদ্ধ, নতুবা এমন সংকীর্ণ পথে চালিত হয় যে আমরা উষ্মতা বা ঘর্ষণ (friction) শুনতে পাই। স্বর ও ব্যঞ্জন ছাড়াও আছে আরো দু'টি ধ্বনি। প্রথমটি অর্ধস্বর (semi-vowel) ধ্বনি, যা স্বননের দিক থেকে (acoustically) ব্যঞ্জন, যদিও স্বরের আঙ্গিক গড়ন (organic formation) আছে তার। দ্বিতীয়টি স্বরকল্প (vowellike), যা স্বননের দিক থেকে বরং ব্যঞ্জনের চেয়ে স্বরের কাছাকাছি, যদিও আঙ্গিক গড়নে সে ব্যঞ্জন সদৃশ। এখানে উল্লেখ্য যে স্বরকল্পের ইংরেজি vowellike, sonant নয়[৩৪] —sonant হল ঘোষ, আর অঘোষ surd। যেমন ক অঘোষ (surd), খ ঘোষ (sonant) ; খ অঘোষ হলে ঘ ঘোষ।

অক্ষর-গড়নে সুনাদ (sonority) জরুরী। যে জোর বা বলের (force) সঙ্গে অক্ষরের অনুক্রমিক ধ্বনি গুচ্ছ আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়কে আঘাত করে তাকে বলে সুনাদ। এবার সুনাদের ঊর্ধ্বক্রমে ধ্বনিগুচ্ছকে এ-ভাবে সাজান যেতে পারে ঃ (১) ব্যঞ্জন—(ক) স্পর্শধ্বনি (যথা প, ট, ক, ; ব, দ, গ) ; ও (খ) বিবৃত ব্যঞ্জন (যথা, ফ, স ; ভ, জ) ; (২) স্বরকল্প—ল, ম, ন, র ; এবং (৩) স্বর—ই, উ, এ, আ। অক্ষর-বিভাজনই বাক্‌-এর সব চেয়ে স্বাভাবিক বিভাজন ঃ এরা ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ যাতে বাক্যকে আমাদের কান স্বভাবত ভাগ করে। অক্ষরের সবচেয়ে সুনাদী ধ্বনি অর্থাৎ কেন্দ্র যাকে ঘিরে অন্যান্য ধ্বনিগুচ্ছ দানা বাঁধে তাকে বলে ঐ অক্ষরের আক্ষরিক ধ্বনি। কাজেই আক্ষরিকধ্বনি সচরাচর স্বর। আর স্বরের সবচেয়ে বিশিষ্ট কাজ হলো অক্ষর গঠন ; তবে স্বরকল্পে অক্ষর গঠন হ'তেও পারে, নাও পারে। সুনাদের ছ'টি স্বাভাবিক মাত্রা এ-রকম —(১) ব্যঞ্জন ; (২) নাসিক্য ধ্বনি ; (৩) পার্শ্বিক ধ্বনি ; (৪) কম্পিত 'র' ; (৫) উচ্চস্বর যথা 'ই' বা 'উ' ; (৬) নিম্নস্বর যথা 'অ' বা 'ও'। অক্ষর বিভাজনে তিনটি জিনিস লক্ষণীয়। এক, দু'টি আক্ষরিক ধ্বনির মধ্যে দুই বা ততোধিক ধ্বনি বর্তমান ; দুই, দু'টি আক্ষরিক ধ্বনির মধ্যে শুধুমাত্র একটি ধ্বনিই অস্তিমান ; তিন, মধ্যবর্তী কোন ধ্বনি ব্যতিরেকেই আক্ষরিক ধ্বনি দু'টির একটি অন্যটির অনুসরণ করে।

স্বরের দৈর্ঘ্য প্রধানত নির্ভর করে তিনটি জিনিষের উপর ঃ—(১) জিহ্বা-পেশীয় টান—সংহত (tense) স্বরের তুলনায় শিথিল (lax) স্বর হ্রস্বতর ; (২) জিভের উচ্চতা—স্বর যতই উঁচু হবে ততই হবে এ হ্রস্বতর ; আর (৩) অনুবর্তী অন্ত্যব্যঞ্জনের প্রকৃতি। অনুক্রমিক অক্ষরের প্রাবল্য পরিবৃত্তির নামই প্রচাপ (stress)—এ তিনরকমের ঃ প্রবল, মধ্যম, দুর্বল। কতক শব্দের প্রচাপ নির্দিষ্ট নয় ; তবুও এ বাক্যস্থ শব্দবৃত্তির উপর নির্ভর করে না, কিন্তু পরিবৃত্ত শব্দাবলীর প্রচাপন-নির্ভর। আর একেই বলা হয় স্পন্দীয়

প্রচাপ (rhythmical stress)। পক্ষান্তরে প্রস্বর (pitch of the voice) স্বরতন্ত্রীর দৈর্ঘ্য ও তাদের টানের উপর নির্ভরশীল। নরের তুলনায় নারীর কণ্ঠতন্ত্রী সাধারণত হ্রস্বতর বলেই, নারী উচ্চতর প্রস্বরে কথা বলে। প্রস্বর পরিবর্তির নামই স্বরভঙ্গি (intonation)।[৩৫] কাজেই প্রস্বর (pitch) ও প্রচাপ (stress) দু'টি আলাদা জিনিস—এদেরকে একজাতীয় মনে করা ভুল, যেমন গীতিপ্রস্বর ও বলপ্রস্বর। আর accent বুঝাতে প্রস্বনই প্রযুক্ত হয়। তাই এ-উক্তি বিচার সহ নয় ঃ "বাংলা ছন্দে গীতিপ্রস্বরের কোনো ক্রিয়া দেখা যায় না, কিন্তু (বল বা) ঘাতপ্রস্বরের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়।[৩৬] বাঙলায় সুরেলা আবৃত্তিই এ উক্তির ব্যতিক্রম। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবি কঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন কাব্য গানের সুরে কীর্তিত হইত। এই-জন্য শব্দের মধ্যে যাহা কিছু ক্ষীণতা ও ছন্দের মধ্যে যাহা—কিছু ফাঁক ছিল সমস্তই গানের সুরে ভরিয়া উঠিত ; সঙ্গে সঙ্গে চামর দুলিত, করতাল চলিত এবং মৃদঙ্গ বাজিতে থাকিত। সুর হইতে বিযুক্ত করিয়া পড়িতে গেলে ছন্দগুলি একেবারে বিধবার মত হইয়া পড়ে। এইজন্য আজ পর্যন্ত বাংলা কবিতা পড়িতে হইলে আমরা সুর করিয়া পড়ি। এমন কি, আমাদের গদ্য-আবৃত্তিতেও যথেষ্ট পরিমানের সুর লাগে। আমাদের ভাষার প্রকৃতি-অনুসারেই এরূপ ঘটিয়াছে।"[৩৭] বস্তুত প্রস্বর ব্যতিরেকে ধ্বনি হ'য়ে যায় অপ্রস্বরিত (unpitched) অর্থাৎ অপস্বর (noise)। আর এই'লো অতিমাত্রায় বিভিন্ন কম্পাংকের বহুসংখ্যক ধ্বনি-উৎসের সম্মিলিত ধ্বনি-উৎপাদ-সঞ্জাত। ফলে এই অপস্বর নিয়ে কাব্য রচিত হ'তে পারে না। গীতি ও বল প্রস্বরীয় উক্তিটি তাই অজ্ঞতা-প্রসূত।

এটা সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে সুনাদের ভিত্তিতে আক্ষরিক রচিত হয় এবং ছন্দও। এতে স্বরধ্বনির গড় ব্যাপ্তি হলো ০'৩ সেকেন্ড—এর মধ্যে গড়ে-ওঠায় লাগে ০'০৪ সেকেন্ড ; আর অবক্ষয়ে ০'০৮৫ সেকেন্ড। পক্ষান্তরে ব্যঞ্জন ধ্বনির পরিব্যাপ্তির পাল্লা (range) এরূপ—স্পর্শ ব্যঞ্জনে (প, ট, ক) ০'০৫ সেকেন্ড-এর কম সময় ; ব, দ, গ গোষ্ঠীর মধ্যে ০'১ সে. ; শিস্ ধ্বনি (স, শ) ও উষ্মধ্বনিতে (ফ, থ) ০'২ সে.। এ সম্পর্কে গণিতীয় সূত্র দেয়া যায় এ-ভাবে ঃ

$$N^4 - N^2(N_1^2 - N_2^2) + N_1^2 N_2^2 \left(1 - \frac{C_2}{(C_1 - C_2)} \cdot \frac{C_2}{(C_2 - C_3)} \right) = 0 \quad ..(1)$$

যেখানে N = দুনী অনুনাদকের কম্পাংক ; N_1 = পশ্চাদ্বিবরের কম্পাংক ; N_2 = সম্মুখ বিবরের কম্পাংক ; C_1 = বাগযন্ত্র পথের পরিবাহিতা ; C_2 = দু'টি অনুনাদকের সংযোগ ; ও C_3 = দু'টি অনুনাদকের মুখে সন্ধি। 'উ'-স্বর সম্বন্ধে এ বিশেষভাবে প্রযোজ্য।[৩৮] এ-প্রসঙ্গে স্বরাকৃতি ও স্বর দৈর্ঘ্যের উপর ব্যঞ্জনের অভিক্রিয়া (effect) ধরা পড়ে। অক্ষরস্পন্দ শুরু ও বন্ধ কর্তে স্বর-বিচলনের কোন কাজ নেই। অতিশ্বাসরুদ্ধীয় অনুনাদ প্রকোষ্ঠেই জন্ম নেয়

স্বরগুণ। কণ্ঠতন্ত্রীর কম্পনে আসে মৌল প্রস্বর—এর স্বরগুণিতকগুলি বলবত্তর হ'য়ে ওঠে স্বর প্রকোষ্ঠর দৌলতে।

স্বরের উপর ব্যঞ্জনের অভিক্রিয়া

ব্যঞ্জনের অভিক্রিয়া স্বরের উপর প্রতিফলিত হয় দু'ভাবে—এক স্বরাকৃতির উপরে; দুই, স্বর দৈর্ঘ্যের পরে। এবার প্রথমের কথা। গীত ও কথিত স্বরের পার্থক্য আছে—এর আদি ও অন্ত্য দশা মধ্য দশা থেকে স্বতন্ত্র। মুখের বহিঃস্থ বায়ুচাপের অনুরেখ (A. O tracings) থেকে জানা যায় যে অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের অনুবর্তী স্বরের আকৃতি নির্দিষ্ট শঙ্কুর মতোই। অল্পপ্রাণ স্পর্শবর্ণ (occlusives) মুক্ত স্বর মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে চরম বিস্তারে শুরু করে এবং শেষে শুণ্ডায়মান হ'য়ে ওঠে। কিন্তু মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনমুক্ত স্বরের আছে টাকু (spindle)-রূপী আচ্ছাদন (envelope)। দ্বিতীয়ত, স্বরদৈর্ঘ্যের কথা। বর্ণবিন্যাসে (orthography) আছে দু রকমের স্বরদৈর্ঘ্য উচ্চতম পশ্চাৎ ও সম্মুখস্থ স্বরের জন্যে—ই ঃ ঈ এবং উ ঃ ঊ। আর রেওয়াজ হলো কতক স্বরকে দীর্ঘতর এবং কতক স্বরকে হ্রস্বতর মনে করা। সুনীতিকুমার মনে করেন যে তিন রকমের দৈর্ঘ্য আছে—দীর্ঘ, যেমন 'আ'; আধাদীর্ঘ, যেমন 'অ'; হ্রস্ব, যথা 'অ'।[৩৯] সংবৃত (closed) স্বরের তুলনায় বিবৃত (open) স্বর দীর্ঘতর। তবে আটপৌরে সংলাপে স্বর দৈর্ঘ্যের কোন প্রভেদ নেই-এর কারণ বিবৃত স্বরের বন্টনমাত্রা অত্যধিক। এবার ব্যঞ্জনের অভিক্রিয়ার কথা। সমান প্রচাপিত অক্ষরের স্বরদৈর্ঘ্য মোচক ব্যঞ্জনের উপর নির্ভরশীল। ঘোষ ব্যঞ্জনের সঙ্গে এরা বৃহত্তম, কিন্তু মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের সঙ্গে হ্রস্বতম। অল্পপ্রাণ ব্যঞ্জনের অভিক্রিয়া পড়ে মাঝামাঝি। কাজেই বলা চলে ঃ স্বর দৈর্ঘ্য স্পর্শব্যঞ্জনের পশ্চাদ্বর্তী বায়ুচাপের ব্যস্তানুপাতিক (inversely proportional)। গণিতের ভাষায়

$$L=\frac{K}{P} \quad \cdots\cdots(2)$$

যেখানে P=স্পর্শ ব্যঞ্জনের পশ্চাদ্বর্তী বায়ুচাপ; L=স্বরদৈর্ঘ্য; ও K=ধ্রুবক। বাঙলায় সাধারণ স্বর এগুলি—ই ঃ ঈ, উ ঃ ঊ; এ ও; এ্যা অ; আ। এ-ছাড়া আছে দ্বিস্বরিকা (diphthong) যেমন ঐ, ঔ (বৈতালিক, ঔষধ) এবং ত্রিস্বরিকা (triphthong)। এরা পূর্ব বাঙলায় বেশি দেখা যায়—পশ্চিম বাঙলায় কম। একটি অক্ষর স্পন্দের মধ্যে কণ্ঠ-প্রত্যঙ্গ জন্মায় একটি বিচলন শ্রেণী। এরি ফল হলো দ্বিস্বরিকা বা ত্রিস্বরিকা অর্থাৎ দুটি বা তিনটি স্বরধ্বনির বিচলন। এরা তৈরি করে সংবৃত, বিবৃত, স্বতঃ-মুক্ত বা স্বতঃবন্ধ অক্ষর, যেমন যাইব (আই), খাইয়া (আইয়া), আইও (আইও)।[৪০]

২.১১ কণ্ঠ্যানুনাদক ও ক্ষেপক বিচলন

ইংরেজির syllable হ'লো সংস্কৃত তথা বাঙলার 'অক্ষর'। অক্ষর স্বরূপত, অবয়বত, গুণত ও ধর্মত অক্ষয় অর্থাৎ যার ক্ষয় (ক্ষরণ) নেই ঃ যা স্বয়ং সম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল। আর স্বরই হচ্চে অক্ষরের জীবন। স্বর শব্দটি এসেচে 'স্বৃ' ধাতু থেকে, যার অর্থ শব্দ করা। তাই উবট ঋক্ প্রাতিশাখ্যের (I. ৬) টীকায় বলেছেন ঃ "স্বর্যন্তে শব্দ্যন্তে ইতি স্বরা" ঃ অর্থাৎ যা উচ্চারিত হয় তাই স্বর। অন্যত্র (I. ৬) বলেচেন ঃ "ব্যঞ্জয়ন্তি প্রকটীকুর্বন্ত্যার্থান ইতি ব্যঞ্জনানি" অর্থাৎ কিনা ব্যঞ্জন অর্থের বিশদ করে। পতঞ্জলির মহাভাষ্যে আছে (I. ২.২৯—৩০) ঃ "স্বয়ং রাজন্তে স্বরা অন্বগ্ ভবতি ব্যঞ্জনমিতি।" স্বর স্বয়ং উচ্চারিত হয়, ব্যঞ্জন তার অনুগমন করে অর্থাৎ স্বরের সাহায্যে উচ্চারিত হয়। যেমন 'আম'-এ পূর্বে স্বর ধ্বনি 'আ' যোগ, 'ম'-তে পরে স্বরধ্বনি 'অ' যোগ (ম্+অ)। কাজেই 'ম্'-এর উচ্চারণে স্বরই প্রধান ভূমিকা নিয়েচে। পরবর্তী বৈয়াকরণগণ এই সংজ্ঞাই গ্রহণ করেচেন। এতে প্রকাশ পায় মোটামুটি ধারণা—এতে নেই আধুনিক গবেষণার স্বীকৃতি। সম্পূর্ণভাবে মুক্ত না হ'য়েও স্বর ছাড়া ব্যঞ্জন গঠিত, এমন কি পূর্ণভাবে রূপায়িত হ'তে পারে। এর সমর্থন মেলে নাসিক্য ব্যঞ্জন ধ্বনি 'ন্' 'ম্' এবং 'ঙ'-তে, তরল ধ্বনির কম্পনজাত 'র', এবং পার্শ্বিক ধ্বনি 'ল'-এ। অ'র গঠনে সুনাদ (sonority)-ই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নয় ; এর আছে বহনক্ষমতা (carrying power)ও। এ-ছাড়াও আছে গুরুত্ব (prominence), যা ধ্বনিগুণ, ধ্বনিদৈর্ঘ্য, প্রচাপ ও স্বরভঙ্গির উপর নির্ভরশীল। তাই কোন-কোন ভাষায় 'ম্', 'ন্', 'ল্' 'স্' প্রভৃতি প্রলম্বিত ব্যঞ্জনগুলোকে অক্ষর গড়নের কেন্দ্রক (nucleus) হ'তে দেখা যায়, যেমন জাপানী ভাষায় ska (হরিণ অর্থে) শব্দে s এবং ma (ঘর অর্থে) শব্দে m-কে স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন করতে দেখা যায়। ইংরেজিতে funnel শব্দে l, mutton শব্দে n এবং বাঙালায় 'তুমি একথা বলচো! 'ম্'!' এ-ধরনের পরিবেশে 'ম্' স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন করেচে। তবুও এ-কথা সত্য যে প্রলম্বিত ব্যঞ্জনের তুলনায় স্বরের সুনাদ, বহমান ক্ষমতা ও অনুনাদী ব্যঞ্জনা অনেক বেশি।[৪১] ফলে সংস্কৃত বৈয়াকরণবৃন্দ অক্ষর নির্মাণে ব্যঞ্জনগুলোকে একটি মালার মুক্তার সঙ্গে এবং স্বরগুলোকে সে-মালার সূত্রের সঙ্গে তুলনা করেচেন।[৪২] Meillet ও বলেন ঃ "স্বর সম্পূর্ণভাবে অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত, যেহেতু এ তার কেন্দ্র"।[৪৩]

স্বরের স্পন্দমান শ্বাসপ্রবাহ গলবিলে প্রবেশ করে ; এবং শ্বাসরন্ধ্রীয় স্তরও ওষ্ঠাধরের বহির্ভাগের মধ্যে তন্ত্রসুরের কিছু স্বরাংশ প্রবলিত (reinforced) হয়, আবার কিছু নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যায়। অবমন্দন (damping) ঘটে দু'ভাবে—এক, মৃদু-গ্রথন (soft-textured) তলগুলিকে যখন স্পন্দমান বায়ু আঘাত হানে তখন কিছু উপস্বরীয় সুরের শক্তি-শোষণে ; দুই, শ্বাসপ্রবাহের স্থানান্তরণ-

জাত অন্যান্য বিচলন কর্তৃক এই সব স্পন্দমান বিচলনের প্রশমনে (neutralisation)। প্রচলন ঘটে যখন স্বরের স্পন্দমান শ্বাসপ্রবাহের অঞ্চলে-অঞ্চলে সঞ্চারমান বায়ু স্পন্দশীল হ'য়ে ওঠে এক বা একাধিক উপস্বরীয় সুরের সঙ্গে। এ-সব অঞ্চলগুলি তখন হ'য়ে ওঠে অনুনাদক এবং তৌলনভাবে প্রশস্ততর সুরে বাঁধা (tuned) অর্থাৎ এরা যে-কোন স্পন্দনে সাড়া দেবে যখন তার কম্পাংক এদের নিজেদের লাক্ষণিক (characteristic) পর্যায়কালের কাছাকাছি যাবে। অনুনাদী বিবরের সন্ধান স্থির সংকল্পের সঙ্গে চললেও এ এখনো চূড়ান্ত হ'য়ে ওঠেনি। একক ছিদ্র ও হ্রস্ব গ্রীবাযুক্ত একটি সরল অনুনাদকের সম্পর্কগুলি এরূপ—

$$f=\frac{Vs}{2\pi}\sqrt{\frac{A}{LVo}} \qquad \cdots\cdots(3)$$

যেখানে f=কম্পাংক ; Vs=ধ্বনির বেগ ; A—ছিদ্রের ক্ষেত্র ; L=গ্রীবাদৈর্ঘ্য ; এবং V_0=অনুনাদকের আয়তন।

Stetson-এর সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে বলা যায় যে অধিকাংশ ব্যঞ্জন বিচলনই ক্ষেপক বিচলন (ballistic movement) এবং এর প্রত্যেকের উদ্দেশ্য হ'লো কণ্ঠনালীর লাক্ষণিক সংকীর্ণন বা অন্তর্ধৃতি ঘটানো। ক্ষেপক বিচলনের তাড়ন ঘাতে (beat stroke) বাক্‌প্রত্যঙ্গগুলি সংকীর্ণন বা অন্তর্ধৃতির লাক্ষণিক অবস্থানে নিক্ষিপ্ত হলে সেখান থেকে প্রত্যাহৃত হ'তে পারে বিপরীত টানের পেশীপুঞ্জ বা পেশীতন্তুর সংকোচনে। বিরোধী পেশীপুঞ্জের এই টান-সঞ্জাত যে বিচলন তাকে বলে পিছট ঘাত (back stroke)। তাড়নঘাত-উৎপাদক পেশীপুঞ্জের শ্লথনে পিছট ঘাত লোপ পায় এবং প্রত্যঙ্গগুলি স্থিতিতে ফিরে যায়। অথবা প্রত্যঙ্গগুলি তাদের সংকীর্ণন বা অন্তর্ধৃতির অবস্থানে বিধৃত হতে পারে নিয়ামক বিচলনে, আর এ হলো যুগপৎ সক্রিয় বিরোধী পেশীপুঞ্জের দুই বা ততোধিক প্রস্তের টান। প্রতিটি বাক্‌বিচলনের জন্যে দায়ী উচ্চতর স্নায়ুকেন্দ্রজাত স্নায়বিক আবেগ পুঞ্জের জটিল ছাঁচের সক্রিয়তা। বিভিন্ন সঞ্চালক প্রসঙ্গে যে বিচলন পরিবৃত্তি দেখা যায় তার প্রধান কারক হলো স্বয়ংক্রিয় অবরোধ এবং স্নায়ুগুটিকা (ganglion)-স্থিত, স্নায়বিক তন্তুপুঞ্জ ও আবেগগুচ্ছের অন্যোন্য ব্যতিচার। আর এ ঘটে যখন অনুবর্তী ছাঁচটির ক্রমিক হার আগেরটির তুলনায় এত বেড়ে যায় যে ক্ষেপক বিচলনের শ্লথন দশা বা পিছট ঘাতকে ধরে ফেলে পরবর্তী বিচলনের তাড়নঘাত। প্রতিটি সম্পাদনই ছাঁচের পরিবর্তন ঘটায় হয় প্রবলনে, না হয় পরিবৃত্তিতে। কাজেই বাগ্‌ধ্বনি মেলের বৃহত্তর এককে রূপান্তরণে গোটা ছাঁচ বা সজজাটাই পরিবর্তিত হয় এবং বাক্‌-এর উদ্দীপন প্রতিবেদন (stimulus-response) বৃত্তিতে সমগ্ররূপে দেখা দেয়। একথা খাটে বাক্‌-রূপের নিয়ামক শ্রাব্য ছাঁচ সম্পর্কে যেমন, তেমনি সঞ্চালক ছাঁচ সম্পর্কেও ; আর এই দু'টি স্নায়বিক ছাঁচের মিথস্ক্রিয়া নিত্য বা ধ্রুব।[৪৪]

মনে রাখতে হবে যে ধ্বনিগুচ্ছের লঘিষ্ঠ ধ্বনিবিদ্যক প্রসঙ্গের নাম রূপমান (morpheme)। প্রকাশতন্ত্রের দুটি ভিত্তিক এককের এ হলো দ্বিতীয়টি—প্রথমটি স্বনমান (phoneme) যার সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। সাধারণত স্বনমান গুচ্ছের হ্রস্ব ক্রমাবলীই রূপমান বলে খ্যাত। অক্ষর ও রূপমান এক নয়। Goes-এ |gow| ও |z| দুটি রূপমান, যদিও তারা একটি অক্ষর গঠন করে। মোটামুটি রূপমান একটি ক্ষুদ্রতম অর্থবহ একক ঃ একে ভাঙতে গেলে অর্থেরও পরিবর্তন ঘটবে।[৪৫] বক্ষপেশীপুঞ্জের একক ক্ষেপক বিচলনে জন্ম নেয় প্রত্যেক অক্ষরের শ্বাসপ্রবাহ। যে কোন ক্ষেত্রে শ্বাসপ্রবাহ-উৎপাদনী চাপের ফলশ্রুতি হলো শ্বাসপ্রবাহ শক্তির ক্ষেপক স্পন্দ, যা উক্তির প্রারম্ভিক উপাদানে মুক্ত হয়। এই স্পন্দের আচরণ তিন প্রকারের হয়। এক, শক্তি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এ চলতে থাকে। দুই, বায়ুপ্রবাহ পথে উচ্চারণীয় সংকীর্ণন বা অন্তর্ধৃতিতেও প্রতিহত হতে পারে। তিন, এ অবরুদ্ধ হতে পারে পাঁজর-পিঞ্জরীয় যন্ত্রকৌশলের কোন বিরোধী বিচলনে। এ ভাবে উৎসারিত শ্বাস প্রবাহে ন্যূনাধিক রোধক (brake) চাপায় প্রত্যেকটি বাক্-উচ্চারণ; কিন্তু প্রায়ই স্পন্দের শ্বাসপ্রবাহশক্তি নিঃশেষ হওয়ার আগেই উক্তির অন্তিম উচ্চারণটি সম্পূর্ণ হয়। তিনটি জিনিস তাই সম্ভবপর—(১) অঘোষ মুক্তি (breathed release), যেখানে উদ্বৃত্তশ্বাসকে ছেড়ে দেওয়া হয় মুখ বা নাসিকা দিয়ে নির্গমনের জন্যে, আর এদিকে প্রত্যঙ্গগুলি স্থিতি অবস্থানে ফিরে আসে; (২) সমমুক্তি (even release) যেখানে শ্বাসপ্রবাহ ও উচ্চারণ একই সঙ্গে শেষ হয় শ্বাসরোধী ও পাঁজর-পিঞ্জর আটকান বিচলনে; অথবা (৩) স্পৃষ্টমুক্তি (stopped release), যেখানে কণ্ঠপটির সংবারে শ্বাসপ্রবাহ প্রতিহত হয়—উচ্চারণীয় অবস্থান হ্রাস পায় এবং বায়ুকে ছেড়ে দেয়া হয় মুখ বা নাসিক্য বিবরের মধ্য দিয়ে বেরিয়ে যেতে।[৪৪]

২.১২ বাগেকক ও ভাষারূপ

যে-কোন ভাষার রূপামানগুলি ঐ ভাষার ধ্বনি ও অর্থের যৌথরূপ। সাধারণত উক্তিতে তৈরি হয় নির্দিষ্ট সংখ্যক রূপমান, যা মিশে যায় আকৃতি বিন্যাসে (configuration) বা ভাষারূপে। বিভিন্ন ভাষায় রূপমান ও শব্দের আদি, অন্ত বা উভয়ই ভিন্ন ভিন্ন প্রণালীতে চিহ্নিত হয়। ভৌতভাবে উক্তিমালা রূপের শ্বাসমেলে বিভক্ত অর্থাৎ বৃহত্তর এককে, যার যেকোন দুটির মাঝখানে শ্বাস নেয়া যায় বা যেতে পারে। বোধগম্যতার জন্যে প্রতিটি শ্বাসমেলের বাগ্‌বিধিবদ্ধ (phrased) হওয়ার প্রয়োজন। অর্থাৎ অঙ্গীভূত (constituent) ভাষারূপাবলী স্পষ্টভাবে পৃথকীকৃত হয় বাগ্‌বিচলন প্রবাহের ছোটখাটো বাধা

বিপত্তিতে। এরকম একক-কে, যার যে-কোন দু'টির মাঝখানে বক্তা খুশিমতো (ad libitum) বা বিবেচনাপূর্বক থামতে পারে উক্তির স্বাতন্ত্র্য না হারিয়ে, বলা হয় বাক্-মাপনী (speech measure), বাগ্বিধিমেল বা অর্থমেল (sense group)। তাই উক্তি শ্বাসমেল ও অর্থমেলের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। শ্বাসের বিরতিকে যতি বলে, আর অর্থের বিরতিকে ছেদ। প্রথমটিও দ্বিতীয়টিকে বুঝাতে একটি ও দু'টি দাড়ি দিলে, নিচের অনুচ্ছেদটি এ-ভাবে বিভক্ত হবে—

সত্য সেলুকস্। কি বিচিত্র। এই দেশ ॥ দিনে প্রচণ্ড সূর্য্য। এর গাঢ়-নীল আকাশ। পুড়িয়ে দিয়ে যায় ॥ আর রাত্রিকালে। শুভ্র চন্দ্রমা এসে। তাকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় ॥ স্নান করিয়ে দেয় ॥

এতে সুস্পষ্ট যে প্রতিটি বাক্মাপনী বা বাগেকক (phrase unit)-এ আছে ক'টি নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষর। কথান্তরে প্রত্যেক বাক্মাপনীর মধ্যে আছে শ্বাস প্রবাহশক্তির কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যক অনুক্রমিক ঘাত, যাদের প্রত্যকের আছে নিজস্ব মুক্তি ও অবরোধ। একটি বাক্ধ্বনি থেকে অন্যটির ক্রান্তি কৌশলে-এ যোগায় এক গতীয় উপাদান, আর এতে সংশ্লিষ্ট আছে দ্রুতি (tempo) বা হারের উপাদান। উক্তি কালশায়ী বলেই ব্যাপ্তিকাল (duration) বাগ্রূপের একটি মাত্রা। দ্রুতি ও ব্যাপ্তির মধ্যে রয়েচে একটি অন্যোন্য সম্পর্ক। রূপমান food যদি উচ্চারিত হয় ০.৫ সেকেন্ড-এ, তবে এ উচ্চারিত হয় ১÷০.৫ বা ২ প্রতিসেকেণ্ড হারে। এর দু'টি প্রকার আছে—জলদি (allegro), মন্থর (lento)। প্রথমটি রূপমানের এমন একটি প্রকার যেখানে উক্তির হার স্বাভাবিক-এর চেয়ে বেশি; আর দ্বিতীয়টিতে আছে সবচেয়ে বেশি ব্যাপ্তি। ইংরেজিতে বাক্-দ্রুতির পাল্লা সেকেন্ড প্রতি ২.০ অক্ষর ও ৫টি বাগ্ধ্বনি থেকে ৮ অক্ষর ও ২১ বাগ্ধ্বনিতে বিস্তৃত; মাঝখানে পড়ে জোরাল (animated) সংলাপ, যার দ্রুতি ৪-৫ অক্ষর ও ১০-১২ বাগ্ধ্বনি।[৪৬] বাঙলা গদ্য থেকে একটি অনুচ্ছেদ লিখে দেখা যায় যে তরঙ্গলেখ (kymograph)-এর অভিলেখে উচ্চারণের হার প্রতি সেকেণ্ডে হয় ৪.৪৫ অক্ষর।[৪৭]

প্রত্যেক ভাষারই প্রাণ কয়েকটি স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনিতে গঠিত, যাকে বলে স্বনমান বা ধ্বনিতাত্ত্বিক একক। তবে সমাজ-শায়ী মানুষ তার জীবন চালু রাখার জন্য ব্যবহার করে শুধুমাত্র 'অ' 'আ', 'ক' 'খ' নয় বরং ধ্বনির স্রোততরঙ্গ। এই তরঙ্গের একেকটি অর্থবোধক ভাগ হ'লো বাক্য, যা এর বৃহত্তম একক। বাক্য যেমন ভাষার বৃহত্তম একক, তেমনি অক্ষর তার নিম্নতম একক। এ দু'য়ের মাঝখানে রয়েচে শব্দ। একটি অক্ষর শব্দ হ'তে পারে; আবার বাক্যও। ধ্বনি অক্ষর, শব্দ ও বাক্যে ব্যবহৃত হলে তার পূর্ব ও পরবর্তী ধ্বনির কিছু না কিছু গুণ তাতে সংক্রামিত হয়। ফলে ধ্বনি-পরিবর্তন ঘটে। গবেষণাগারে এর বিশ্লেষণ হয়েচে তরঙ্গলেখ (kymography), তালুলেখ, (palatograhy), বর্ণালিলেখ (spectography) প্রভৃতি যন্ত্রে। আর এতে

ধরা পড়েছে গলন প্রপঞ্চের (phenomenon of fusion) কয়েকটি বিশিষ্ট ধারা বা পদ্ধতি।[8৮] এরা প্রধানত চার প্রকারের—(১) বিবর্তমূলক (evolutionary) ; (২) সংযোগমূলক (combinatory) ; (৩) সাদৃশ্যমূলক (analogical) ; ও (৪) বিভ্রান্তিমূলক (confusional)। স্তরে-স্তরে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যে-সব ধ্বনি পরিবর্তন দেখা যায় তা প্রথম শ্রেণীর, যথা, (সং) হস্ত > (প্রা) হত্থ > (বাং) হাথ/হাত। এক বা একাধিক ধ্বনির প্রভাবে যে পরিবর্তন ঘটে তা পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে, যথা, এতদিন > অ্যাদ্দিন। একটি শব্দ সাদৃশ্য যদি অন্যটির ধ্বনি-পরিবর্তনের কারণ হয়, তবে তা হবে তৃতীয় শ্রেণীর, যেমন (সং) সর্ব > সব। চতুর্থ শ্রেণীর ধ্বনি পরিবর্তন ঘটে বিভ্রান্তিবশত, যথা, বি-স্ফোটক > বিষ্ ফোড়া। এই চারটি পদ্ধতিকে মোটামুটি দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম দু'টি মিলে নাম নেয় বিবর্ত-সংযোগীয় ধারা ; শেষের দু'টি নাম ধরে বিভ্রান্তি-সাদৃশ্যীয় ধারা। এবার এদের পরিচিতি নিচে দেয়া হলো।[8৯]

I. বিবর্ত-সংযোগীয় ধারা

এ প্রধানত তিন প্রকারের : (১) ধ্বনিলোপ ; (২) ধ্বন্যাগম ; ও (৩) ধ্বনি রূপান্তর। প্রথম শ্রেণীতে বিলোপ ঘটতে পারে আদি, মধ্য ও অন্ত্য স্বরের। যেমন, আছিল > ছিল ; (সং) শিরস্থান > (প্রা) > শিরআন > শির্থান = শিথান ; গোরূপ—(গোরুঅ) > গোরু। এখানে স্মর্তব্য যে অন্ত্য ও মধ্যস্বর লোপে আছে দ্বিমাত্রিকতা (bimorism), যথা, 'বাদল' শব্দের অন্ত্যস্বর লোপে এ হয় 'বাদল্', মধ্যস্বর লোপে 'বাদ্লা' অর্থাৎ 'বাদল + আ'। ব্যঞ্জনলোপও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়, বিশেষত 'হ'-ধ্বনির লোপ, যেমন 'ফলাহার' > ফলার। তারপরে আছে সমাক্ষর লোপ—দুটি সমানধ্বনি পাশাপাশি থাকলে একটির লোপ হয়, যেমন 'বৌদিদি' > 'বৌদি'।

ধ্বন্যাগমে প্রথমেই শ্রুতি (glide)-র কথা। বাঙলায় প্রধান দু'টি শ্রুতি হলো 'য়'-শ্রুতি ও 'ব'-শ্রুতি, যেমন মা + এর = মায়ের, খা + আ = খাওয়া। দ্বিতীয়ত আছে 'হ'-শ্রুতি, যেমন, (পো) > viola > ব্যায়লা > বেহালা ; রাজকুল > রাআউল > রাউল > রাহুল। তৃতীয়ত 'ব'—ও 'দ'—শ্রুতি, যথা, বানর > বান্দর > বাঁদর। চতুর্থত আছে ব্যঞ্জনশ্রুতি, যেমন (সং) সুখম্-এব > সুহংএব > (প্রা) সুহংমেব। আদি, মধ্য ও অন্তস্বরাগম হয়, যেমন, স্পর্ধা > আস্পদ্দা ; চক্র > চক্কর ; (ইং) bench > বেঞ্চি। ব্যঞ্জনাগমও ঘটে, যথা, ঋজু > উজু > রুজু। এ-ছাড়া আছে অপিনিহিতি, (epenthesis), যথা, (সং) কল্য > কালি > কাইল।

ধ্বনিরূপান্তরের প্রথমেই আছে অভিশ্রুতি (umlaut), যথা করিছ > কইরছ > কোর্ছো। দ্বিতীয়ত, স্বরসঙ্গতি (vowel harmony), যেমন, পিছন = পেছন

(ই—অ=এ<অ) ; মেলা=ম্যালা (এ—আ=অ্যা<আ)। এখানে পরবর্তী স্বর পূর্ববর্তী স্বরকে প্রভাবিত করেচে বলে একে বলা হয় পরাগত (Regressive) স্বরসঙ্গতি। পূর্ববর্তীস্বরের প্রভাবে পরবর্তী স্বরেব স্রসঙ্গতিকে বলে প্রগত (progressive) স্বরসঙ্গতি, যথা, বিলাত>বিলেত—(ই>এ)। এ ছাড়া আছে দ্বিবৃত্ত স্বরসঙ্গীত, যেমন মাদল+(ক্ষুদ্রার্থক)-ই=মাদুলি; এবং অন্যান্য স্বরসঙ্গতি, যেমন, বিলাত+ঈ>বিলেত (ই>এ)+ঈ—বিলিতি (ই<ই)। সমীভবনের চারটি রূপ—প্রগত, যথা, পদ্ম—পদ্দ ; পরাগত, যথা বড়ঠাকুর—বট্ঠাকুর ; অন্যোন্য, যথা উৎশ্বাস>উচ্শ্বাস>উচ্ছ্বাস ; ও স্বর সমীভবন, যেমন নিরাবিল>নিরিবিলি।

বিষমীভবন (dissimilation) সমীভবনের (assimilation) বিপরীত। যেমন (পোর্তুগীজ) আর্মারিও—(বাংলায়) আলমারি। এরপরে আছে বিপর্যাস (metathesis) যেমন, (ইং) রিক্‌শ—রিশ্‌কো। এ ছাড়া রয়েচে ছ'রকমের ছন্দো-সমগ্র যার কথা আগেই বলা হয়েচে। এখানে স্মর্তব্য ব্যঞ্জনদ্বিত্ব (gemination), (প্রা) পদাতিক>পাইক্ক এবং সংকোচন ও প্রসারণ, যথা, বৈবাহিক>বেয়াই, ব্যাই ; (পর্তুগীজ) পেরা>প্যায়রা>পেয়ারা।

II. বিভ্রান্তি—সাদৃশ্যীয় ধারা

প্রথমেই সাদৃশ্যের কথা, যেমন 'টাকার কুবীর' (অর্থাৎ কুবের) হয়েচে 'টাকার কুমীর', 'কুমীর'-শব্দের সঙ্গে সাদৃশ্য বশত। কালিদাসের সাদৃশ্যে চণ্ডিদাস। দ্বিতীয়ত মিশ্রণ (contamination), যেমন, ইংরেজি omelette ও marmalede-এর মিশ্রনে উৎপন্ন হয়েছে 'মামলেট'। তৃতীয়ত, জোড়কলম (portmanteau) শব্দ, যথা, ধোঁয়া+কুয়াশা—ধোঁয়াশা (ইং smoke+fog= smog)। চতুর্থত, লোকনিরুক্তি (folk etymology) যথা, উর্নবাভ—উর্ননাভ। পঞ্চমত, অন্যোন্য ধ্বনিবিপর্যাস (spoonerism), যেমন গদাহস্তে ভীমের প্রবেশ>ভীম হস্তে গদার প্রবেশ। ষষ্ঠত, শব্দ বিভ্রম (malapropism), যথা, গিরিশ ঘোষের 'প্রফুল্ল' নাটকের 'তোমার সহিত উদ্বন্ধনে আবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করি' ('উদ্বাহ বন্ধনে' স্থলে)। সপ্তমত, রয়েচে ভ্রান্তবিশ্লেষ (metanalysis)। এরি ফলে ভ্রান্তিতে নতুন শব্দ গঠিত হয়, যেমন 'অসুর' শব্দের অর্থ ছিল অসু (প্রাণ) দেন (রা-ধাতু) যিনি, কিন্তু পরে এ-শব্দের 'অ'-কে নঞ্‌বাচক ধ'রে 'সুর' শব্দ হলো 'দেবতা' এবং অসুর হয়েচে, দেবশত্রু 'দৈত্য'। অষ্টমত, রবীন্দ্রনাথ 'নিলাজ' শব্দের উদ্ভব করেছেন 'নিলজ্জ' থেকে ; শিমুল+ইয়া' থেকে 'শিমলে'র উদ্ভব, কিন্তু এর পূর্বস্তরীয় শব্দ গঠিত হয়, 'সিমলা' (back formation)।

২.১৩ প্রচাপ, প্রস্বর ও স্বরভঙ্গি

প্রতিটি বাগ্ধ্বনির উৎপত্তিতে কণ্ঠপটি কম্প্র হয়ে ওঠে; ফলে প্রতিটি ভ্যানভ্যানানি, গুণগুণানি অথবা সুরের থাকে একটি মৌল প্রস্বর (pitch)। তাই প্রস্বর বাগ্ধ্বনির একটি অন্যতম গুণ। ধ্বনির উচ্চারণ যেমন এগোতে থাকে তেমনি কণ্ঠপটি স্পন্দের প্রকৃত বাস্তব হারেরও পরিবর্তন হ'তে থাকে। কখনো কখনো বাগ্ধ্বনির অনুক্রমিক দুটি তরঙ্গের ঠিক ঠিক একই দৈর্ঘ্য বা পর্যায় থাকে না। প্রস্বর পরিবৃত্তি দু'রকমে ঘটতে পারে—এক, ন্যূনাধিক একটি স্থির গড় কম্পাংক ঘিরে এ ওঠানামা করে; দুই, এ একটি নির্দিষ্ট দিকে ক্রম বর্ধমান উত্থানে বা পতনে এগোতে পারে। মানুষের শ্রবণ যন্ত্রকৌশলটি স্পন্দ থেকে স্পন্দান্তরের ছোটখাটো পরিবর্তন চৌরস করতে বা শুনতে পায়না, যদি প্রস্বরের সাধারণ স্তর ধ্রুব থাকে; তবে উত্থানে বা পতনের যে-কোন প্রবণতা এ ত্বরায় প্রত্যক্ষ করতে সক্ষম। কোন ভাষায়ই বাগ্ধ্বনির চরম প্রস্বর কখনই তাৎপর্যবহ নয়; যদি হ'তো তাহলে মানুষ নারী ও শিশুর সঙ্গে সেই ভাষায় কথা বলতে পারতো না। বাগ্ধ্বনির আপেক্ষিক প্রস্বরই অর্থ পৃথকীকরণের ভাষাতাত্ত্বিক উপায়। ধ্বনিবিজ্ঞানীর কাছে প্রস্বরের আছে চারটি অত্যাবশ্যক বৈশিষ্ট্য—(১) আদি মৌল সুরের আপেক্ষিক প্রস্বর যাকে বলা হয় উচ্চ, মধ্য ও নিম্ন; (২) প্রস্বরের লাক্ষণিক পরিবর্তনের দিক (direction), যাকে বলে উত্থানশীল, পতনশীল, উত্থান-পতনশীল, পতন-উত্থানশীল অথবা চৌরস (level; (৩) পরিবর্তন পদ্ধতি যা হতে পারে আকস্মিক (বিচ্ছিন্ন) বা সংসর্পিত (slurred); (৪) পরিবর্তন মাত্রা যা সুরান্তরের ভাষায় বর্ণিত হতে পারে অথবা শুধুমাত্র ছোট বা বড়তে। দুটি স্বরভঙ্গীয় পরিবর্তনকে—পতন-উত্থানশীল/ উত্থান-পতনশীল—কখনো কখনো বলা হয় স্বরিত (circumflex)। প্রস্বর হ'লো কোন অর্থবহ এককের যেমন রূপমান, বাগ্মোপনী বা বাক্যাংশের অখন্ড অবয়ব। কোন বাগরূপে তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্বর বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় স্বরভঙ্গি (intonation) আর এ পরিভাষা ব্যবহৃত হয় লাক্ষণিক প্রস্বর ছাঁচ বুঝাতে। কিন্তু সুতান (melody) সীমাবদ্ধ বৃহত্তর প্রস্বর ছাঁচ বুঝাতে, যেমন পদ বা বাক্যাংশ।

বাক্-এর প্রচাপের সঙ্গে তুলনীয় তাপ এই অর্থে যে প্রত্যেকের মধ্যেই রয়েছে এর কিছু না কিছু। প্রচাপ ব্যবহৃত হয় সামূহিকভাবে বাক্-এর সেই সব প্রপঞ্চ বুঝাতে যা বাক-উৎপাদনে প্রয়োজনীয় পেশী বিচলনের সংবেদনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রতিটি উচ্চারণীয় বিচলনের যে-পরিমাণ পেশীয় শক্তি নিয়োজিত হয় তারি প্রতিফলন হলো প্রচাপ। এর সন্তোষজনক পরিমাপ এখনো আবিষ্কৃত হয়নি। বাক্-উচ্চারণের ধ্বনি-পরিমাণে প্রতিফলিত হয় প্রচাপ। তবে একটি ধ্বনির শাব্দ শক্তি ভিন্ন উচ্চারণের ধ্বনির সঙ্গে তুলনা করা যায় না, উচ্চারণ

দু'টির আপেক্ষিক প্রচাপের মাপনী হিসেবে। যেমন hit শব্দের স্বর (i) hot শব্দের স্বর (o)-এর তুলনায় অধিকতর প্রচাপের সঙ্গে উচ্চারিত হয়, যদিও শেষেরটির শাব্দশক্তি (acoustic energy) প্রথমটির চেয়ে বেশী। বাক্-উচ্চারণে দু'টি সীমা আছে। প্রথমত, শক্তিব্যয়ের একটি অবম সীমা আছে, যার কম হ'লে ধ্বনিকে আর চেনা যাবে না। দ্বিতীয়ত, শক্তিব্যয়ের চরম সীমা আছে, যার বেশি হ'লে ধ্বনিচরিত্রের পরিবর্তন ঘটবে। এই সীমাদ্বয়ের মধ্যে বক্তা জানতে পারে না যে বাগ্-ধ্বনি উৎপাদনে তার প্রচেষ্টা চলচে। কিন্তু সে শক্তিব্যয় করচে এবং তা বাগ্-বিচলনের সহচারী চেষ্টাবেদন (kinaesthesis) নথিভুক্ত করচে তার স্নায়ুতন্ত্রে। আমরা জানতে পারি বিচলনের ক্ষেপকঘাত প্রবল, সবল (moderate) বা দুর্বল কিনা। এখানে স্মর্তব্য যে বাক্-এর লঘিষ্ঠ একক হ'লো রূপমান, কিন্তু বাগ্ধ্বনি নয়; আবার লঘিষ্ঠ রূপমান হ'লো একাক্ষর; তাই প্রচাপের লঘিষ্ঠ একক হবে অক্ষর। আক্ষরিক বিচলনের প্রধানতম শক্তি-অবয়ব হ'লো অবশ্য শ্বাসস্পন্দ যাতে এ সংজ্ঞিত হয়। এ-জন্যে প্রচাপকে অক্ষরের গুণ হিসেবে ধরা হয়। প্রত্যেক অক্ষরের আছে কিছুটা প্রচাপ। ফলে অক্ষরে তিন প্রকারের প্রচাপ লক্ষণীয়—পূর্ণ-প্রচাপিত; অর্ধ-প্রচাপিত; ও অপ্রচাপিত। অপ্রচাপিত কথাটি শিথিল-ভাবে প্রযুক্ত হয় "লঘিষ্ঠভাবে প্রচাপিত" বুঝাতে। বাগ্-রূপ পারম্পর্যের প্রক্রিয়ায় কোন একটি অক্ষর পার্শ্ববর্তী অক্ষরের তুলনায় বেশি জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হলে তাকে বলে প্রস্বনন (accentuation)। এরকম জোরপ্রাপ্ত অক্ষরকে বলা হয় যে তার প্রস্বন আছে। ধ্বনিবিজ্ঞানীর মতে প্রস্বনন হলো প্রস্বনিত অক্ষর বা ধ্বনির গুণ, ব্যাপ্তি, প্রস্বর, গতীয় প্রচাপ পরিবৃত্তির ফলশ্রুতি। ইংরেজি প্রস্বননে থাকে সর্বদাই এ-সব উৎপাদকের অন্ত্যতপক্ষে দুটি এবং প্রায়ই তিনটি। বেদে ব্যবহৃত হতো তিন প্রকারের প্রস্বন—উদাত্ত (acute); অনুদাত্ত (grave); ও স্বরিত (circumflex)। অবশ্য অন্য পরিভাষাও ব্যবহৃত হয়, যেমন উত্থানশীল স্বরভঙ্গি, পতনশীল স্বরভঙ্গি, এবং উত্থান-পতনশীল বা পতন-উত্থানশীল স্বরভঙ্গি। চিহ্ন ব্যবহৃত হয় এভাবে—উদাত্ত (/) অনুদাত্ত (\) ও স্বরিত (Λ)। ইংরেজি accent শব্দটি উৎপন্ন হয়েচে ad ('to') ও cantus (singing, tone, melody) থেকে। cantus উদ্ভূত হয়েচে cantum হ'তে—শেষেরটি canere যার অর্থ 'to sing', তার অতীত ক্রিয়াবাচক বিশেষণ (past participle)। এই লাতিন accentum শব্দটি হুবহু গ্রীক prosoidia-র আক্ষরিক অনুবাদ ঃ এ তৈরি হয়েচে pros অর্থাৎ সংযোজিত এবং oide অর্থাৎ গান song থেকে। গ্রীক শব্দটির অর্থ হলো "একটি গান যা গীত হয় কোন যন্ত্র বা কণ্ঠের সঙ্গে"—এ তাই প্রযুক্ত হয় গীতল বা প্রস্বরীয় প্রস্বন বুঝাতে। গ্রীক ও লাতিনে আদৌ accent-এ বুঝাত শব্দের অক্ষর উচ্চারণে গীতল প্রস্বরবৈচিত্র্য, পরে অবশ্য শুধুমাত্র

প্রচাপ। ইংরেজি প্রস্বনের ব্যাকরণগত বৈচিত্র্যই হ'লো প্রচাপবৈচিত্র্য ; আর accent শব্দটি উদ্ভূত হয় ১৫৩৯ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রীক ও লাতিন আদর্শে এ আদৌ ছিল 'বাক্-এ প্রযুক্ত গান'। কিন্তু ১৫৮১ খ্রীষ্টাব্দে এর অর্থ দাঁড়ায় শব্দের বা বাগংশের একটি অক্ষরের গুরুত্ব।[৫০] কাজেই প্রস্বন (accent) সাধারণ নাম—এর দু'টি বিশিষ্ট ভাগ হ'লো প্রস্বর (pitch) ও প্রচাপ (stress)। এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে প্রস্বনের আছে দু'টি কারণ—(১) প্রাধান্যের জোর (emphasis of prominence) ও (২) তীক্ষ্ণতার জোর (emphasis of intensity)। প্রথমে সূচিত হয় যে প্রস্বনিত শব্দ বা বাগংশের গুরুত্ব তার প্রতিবেশীর তুলনায় বেশি। আর দ্বিতীয়ে প্রতিফলিত হয় উক্তির কোন অংশ বা খন্ডাবলীর আবেগপ্রবণ তীক্ষ্ণতা।[৫১]

কন্ঠতন্ত্রীদ্বয় মুখের অধরোষ্ঠের মতোই। যখন শ্বাসরন্ধ্র খোলা থাকে অর্থাৎ কন্ঠতন্ত্রীদ্বয় পৃথকীকৃত হয় এবং তাদের মধ্য দিয়ে বায়ু নির্গত হয়, তখন উৎপন্ন ধ্বনিকে বলা হয় 'শ্বাস' (breath)। এদেরকে যখন টেনে কাছাকাছি আনা হয় এবং বায়ুকে তাদের মধ্য দিয়ে সজোরে পাস করানো হয় তখনকার উৎপন্ন ধ্বনি 'স্বর' (voice) নামে পরিচিত। এ-ছাড়া আছে নকল কন্ঠ-তন্ত্রীদ্বয়—এরা কন্ঠতন্ত্রীদ্বয়ের সমান্তর এবং স্বরযন্ত্র এদের উপরে অবস্থিত। এদেরকে টেনে কাছাকাছি করলে মধ্যস্থ ফাঁক সংকুচিত হয় বায়ু বহির্গমনের জন্যে আর উদ্ভূত ধ্বনি হবে 'ফিস্‌ফিসানি' (whisper) জাতীয়। 'স্বর' তাই ঘোষধ্বনি, যার উৎপত্তিতে কোন বাধা নেই। ব্যঞ্জন এরই বিপরীত। এই পার্থক্যের মূলে কাজ করে শ্রৌত বিবেচনা অর্থাৎ ধ্বনিগুচ্ছের আপেক্ষিক সুনাদ বা বহন-ক্ষমতা। এককথায় এ-সব ধ্বনি দূর থেকেও শোনা যায়। এই সুনাদ (sonority) অন্তর্নিহিত ধ্বনিরূপের (tamber) উপর নির্ভরশীল। তাই এ-থেকে প্রাধান্য (prominence) ভিন্নতর—শেষেরটি নির্ভর করে গুণ, দৈর্ঘ্য, প্রচাপ ও স্বরভঙ্গির সমবায়ের উপর। এখানে মনে রাখতে হবে যে দৈর্ঘ্য বা প্রচাপ কমিয়ে অতি সুনাদী ধ্বনির প্রাধান্য হ্রাস করা যায় ; আবার দৈর্ঘ্য বা প্রচাপ বাড়িয়ে কম সুনাদী ধ্বনিকে করা যায় প্রধানতর।

এতে সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে যে স্বরের লাক্ষণিক গুণাবলী স্বরযন্ত্রের উপরিস্থ খোলাপথের আকৃতির উপর নির্ভর করে। এই পথই তৈরি করে অনুনাদ-প্রকোষ্ঠ, যাতে কন্ঠতন্ত্রী—কম্পনজাত ধ্বনিরূপ পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনে ভূমিকা নেয় জিভ্ ও অধরোষ্ঠ অর্থাৎ এরাই পরিবর্তন ঘটায় পথের আকৃতিতে। ধ্বনি-প্রাধান্যের জন্যে দায়ী অন্তর্নিহিত সুনাদ বা বহনক্ষমতা, দৈর্ঘ্য, প্রচাপ, বিশিষ্ট স্বরভঙ্গি অথবা এদের সমবায়। কাজেই প্রতিটি বাক্যেই শ্রোতা সহজেই প্রত্যক্ষ করে প্রাধান্য তরঙ্গ ঃ একে দেখা যায় একটি তরঙ্গিত রেখারূপে যেখানের চূড়া (peak) অর্থাৎ গরিষ্ঠ প্রাধান্য এবং খাদ (trough) অর্থাৎ লঘিষ্ঠ প্রাধান্য বর্তমান। কোন শব্দে বা বাগংশে চূড়ার সংখ্যা

গোনা যায়। প্রাধান্য-চূড়া তৈরি ধ্বনিকে বলা হয় আক্ষরিক, আর শব্দ বা বাগংশে স্থান পায় ততগুলি অক্ষর যতগুলি আছে সেখানের প্রাধান্য চূড়া। যেমন button-hook-এ আছে তিনটি প্রাধান্য চূড়া ও তিনটি অক্ষর, আর ধ্বনি হলো u, n ও oo। কিন্তু দ্বিস্বরিকা (diphthong) একটি স্বতন্ত্র স্বর-শ্রুতি (vowel-glide) যার মধ্যে নেই প্রাধান্যের চূড়া বা খাদ। এখানে বাগ্‌প্রত্যঙ্গ একটি স্বরে শুরু করে স্বরান্তরের দিকে যায়। প্রচাপই হলো জোরের মাত্রা যাতে উচ্চারিত হয় একটি ধ্বনি বা অক্ষর। এ মূলত মন্ময় ক্রিয়া! উক্তির প্রবল জোরে বুঝায় সমস্ত উচ্চারক প্রত্যঙ্গের তেজী ক্রিয়া—সাধারণত এর সহচরী হ'লো হাত, মাথা বা শরীরের অন্যপ্রত্যঙ্গের অঙ্গভঙ্গি (gesture)। এ মধ্যচ্ছদার প্রবল ধাক্‌কা-সঞ্জাত এবং তাই এতে সাধারণত প্রকাশ পায় প্রাবল্যের (loudness) তন্ময় ধারণা। এ হলো সজোর নিঃশ্বাসের ফল। উক্তির দুর্বলতার সঙ্গে যুক্ত আছে মধ্যচ্ছদার দুর্বল ক্রিয়া যার ফলে আসে নিঃশ্বাসের দুর্বলতা এবং এ দেয় কোমলতার (softness) তন্ময় শ্রৌত ধারণা। লক্ষণীয় যে প্রবল প্রচাপ অনেক সময় ধ্বনিকে যথেষ্ট বহনক্ষমতা দিতে অক্ষম এবং তাই বাস্তব প্রাধান্য দিতেও অপারগ। পক্ষান্তরে নৈঃশব্দ্যের বা মৌনে (silence) পড়তে পারে প্রবল প্রচাপ, যেমন অঘোষ স্পর্শ ধ্বনির শীর্ষে। কাজেই প্রচাপের সঙ্গে পার্থক্য আছে প্রাধান্যের। অক্ষরের প্রাধান্য হলো তার সাধারণ স্বাতন্ত্র্যের মাত্রা—এ আক্ষরিক ধ্বনির রূপ, দৈর্ঘ্য, প্রচাপ ও স্বরভঙ্গির সমবেত অভিক্রিয়া। কিন্তু প্রচাপে বুঝায় উক্তির বলমাত্রা—এ দৈর্ঘ্য—ও—স্বরভঙ্গি—নির্ভর নয়, যদিও মাঝে—মাঝে এদের সঙ্গে সংযুক্ত। প্রাধান্য থেকে প্রচাপ যেমন স্বতন্ত্র, তেমনি প্রচাপ থেকেও স্বরভঙ্গি আলাদা। অবিরত বাক্‌-এর প্রস্বর পরিবৃত্তি অর্থাৎ কণ্ঠতন্ত্রী কম্পনজাত গীতল সুরের প্রস্বর পরিবৃত্তির নামই স্বরভঙ্গি। সাধারণ বাক্‌-এ স্বরতীক্ষ্নতা (pitch) বা প্রস্বর সর্বদাই পরিবর্তনশীল। স্বরতীক্ষ্নতা বৃদ্ধিতে আসে উত্থানশীল (rising) স্বরভঙ্গি; এর পতনে পতনশীল (falling) স্বরভঙ্গি; আর একই সুরে লক্ষণীয় (appreciable) কাল স্থায়ী হলে একে বলা হয় চৌরস (level) স্বরভঙ্গি। এরপরে জোরের (emphasis) কথা। বাক্যস্থিত কোন শব্দকে জোর দিতে হলে চাই তার সাধারণের চেয়ে অধিকতর প্রাধান্য। বিশেষ প্রাধান্য দেয়া হতে পারে তিন প্রকারে—(১) এক বা একাধিক ধ্বনি দৈর্ঘ্যের সম্প্রসারণে; (২) এক বা একাধিক অক্ষরের প্রচাপবৃদ্ধিতে; এবং (৩) বিশেষ ধরনের স্বরভঙ্গি ব্যবহারে অথবা এ-সব কৌশলের সমবায়ে। জোর দু'রকমের—বৈসাদৃশ্য ও তীব্রতা (intensity)।[৫২]

ফরাসী timbre-এর ইংরেজীকরণ হ'লো tamber, যাতে বুঝায় ধ্বনিগুণ (রূপ) বা স্বনমান এবং এ-কাজ করেছেন রাজকবি R. Bridges। প্রতিটি বাগ্‌-ধ্বনিতে আছে ধ্বনিগুণ, ব্যাপ্তি, প্রচাপ এবং স্বরতীক্ষ্নতা বা প্রস্বর। এরা একটি

আরেকটি থেকে আলাদা ; কিন্তু ধ্বনিগুণে আছে ব্যাপ্তি প্রচাপ বা প্রস্বর উপাদান, যথা স্পর্শধ্বনির ধ্রুবক, অর্ধস্বর যেমন (w), (j), অঘোষধ্বনি ও ঘোষধ্বনি যেমন ড়, ঢ় প্রভৃতি। ধ্বনিগুণ ব্যবহৃত হয় শব্দের পৃথকীকরণে—অবশ্য দৈর্ঘ্য, প্রচাপ এবং প্রস্বরও। তবে শেষোক্ত তিনটির অন্যান্য বৃত্তিও আছে—কিন্তু ধ্বনিগুণের এসব নেই—যেমন, জোর, বৈসাদৃশ্য, আবেগ-প্রবণতা ও বিবক্ষা (implication)। কেউ কেউ পৃথকীকরণ উপাদানের নাম দেন "ছান্দসিক" উপাদান, যা স্বনমানিক বা গুণগত উপাদান থেকে স্বতন্ত্র। উক্তির জোর বাগ্ধ্বনির অন্যান্য গুণাবলী থেকে স্বতন্ত্র হলে তাকে বলা হয় প্রচাপ—এ হ'লো মূলত বক্তার মন্ময় বৃত্তি। কোন অক্ষর উচ্চারিত হতে পারে জোরের বিভিন্ন মাত্রায় (degree) যেমন, তেমনি জোরের বিভিন্ন প্রকারে (kind)। শ্রোতা প্রচাপ মাত্রাকে প্রত্যক্ষ করে প্রাবল্য মাত্রারূপে। অনেক সময় প্রবল প্রচাপ নির্ধারণ শ্রোতার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ে। এর দু'টি কারণ আছে। প্রথমত, ধ্বনির প্রাবল্য (loudness) বা বহনক্ষমতা অন্তর্নিহিত গুণের ব্যাপার এবং তাই প্রবল প্রচাপে উচ্চারিত ধ্বনি দুর্বল প্রচাপের ধ্বনির চেয়ে কম প্রবল হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত, ব্যবহারে দেখা যায় যে প্রবল প্রচাপের জুড়ি এক বা একাধিক বাক্গুণাবলী, যার ফলে অক্ষরটি আরো স্পষ্টভাবে শোনা যায়। তবে প্রাবল্য (loudness) বিদারণ (penetration) থেকে আলাদা। ধ্বনিকে বলা যায় ভেদী যখন অন্য ধ্বনি চলা কালে একে শোনা যায় অর্থাৎ এ অন্যধ্বনির ভেদক। ভেদ্যতা নিজে ধ্বনিগুণ নয়, কিন্তু এ অন্য ধ্বনির প্রকৃতি-নির্ভর, যার মধ্য দিয়ে এ শ্রুত হয়। অতি কোমল ধ্বনি প্রবল ধ্বনির ভেদক হ'তে পারে। অর্থাৎ এ স্বতন্ত্র ধ্বনি হিসেবে শ্রাব্য হ'য়ে ওঠে যখন প্রবল ধ্বনি চলতে থাকে। তাই বংশীবাদনের সঙ্গে-সঙ্গে দুর্বল 'স' শোনা যায়, যদিও এ সম্ভবত শোনা যাবে না কলনিঃসৃত বাষ্প-নির্গমনের সকাশে। বলমাত্রার রকমকের ধরা পড়ে প্রচাপে, যেমন, প্রবল, সবল, দুর্বল প্রভৃতি। J. W. Jeaffreson-এর মতে প্রচাপ মাত্রা নিম্নহনুর অবনতি মাত্রার সমানুপাতিক—অবনতির রীতি ও মাত্রা বিভিন্ন স্বরে বিভিন্ন। এখানে প্রাধান্যের কথা এসে পড়ে। প্রচাপ বক্তার মন্ময় বৃত্তি ; প্রাধান্য শ্রোতার তন্ময় প্রত্যক্ষণ অর্থাৎ অভিক্রিয়ার। প্রবল প্রচাপের জন্যে অক্ষরের প্রাধান্য আসে বটে, তবে এতে আছে উচ্চারণের অন্যান্য গুণাবলীও এবং বিশেষত ধ্বনির অন্তর্নিহিত গুণ, অক্ষরদৈর্ঘ্য বা স্বরভঙ্গি। কাজেই প্রাধান্য পাঁচ রকমের—(১) প্রচাপশায়ী ; (২) ধ্বনিগুণশায়ী ; (৩) দৈর্ঘ্যশায়ী ; (৪) স্বরভঙ্গীয় ; ও (৫) গুণসমবায়িক। প্রচাপ চার শ্রেণীতে বিভক্ত। প্রথমত, চৌরস প্রচাপ (level stress)—অক্ষর মধ্যে সমজোরের মাত্রা রক্ষিত হয় এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে। দ্বিতীয়ত, আছে উত্থানশীল (crescendo) প্রচাপ অর্থাৎ অক্ষর-উচ্চারণে জোর বৃদ্ধি পায়। তৃতীয়ত, পতনশীল (diminuendo) প্রচাপ, যেখানে জোর হ্রাস পেতে থাকে। চতুর্থত, আছে উত্থান-পতনশীল (crescendo-

diminuendo) প্রচাপ, যেখানে জোর বেড়ে-ওঠার পরে অক্ষর মধ্যে কম্‌তে থাকে।[৫৩]

২.১৪ বাক্‌-প্রবাহের চালচিত্র

এখানে বায়ু-সচল (aero-dynamic) দশা স্মর্তব্য। কন্ঠাঞ্চলে বায়ু যে-কোন গ্যাসের মতো একটি নির্দিষ্ট আয়তনে থাকে চাপের একটি সীমার মধ্যে। এ স্থৈতিক (static) হতে পারে, আবার গতিশীলও, একটি বিশেষ বেগে ও আয়তন বেগে; আর এর প্রবাহ দু'রকমের—স্তরিত (laminar) ও বিক্ষুব্ধ (turbulent)। আয়তনের প্রমান একক লিটার (litre) যা যুক্তরাজ্যে ·২২০ gallons, যুক্তরাষ্ট্রে ·২৬৪ gallons। এ আবার centilitre (cl) ও millilitre (ml) এ বিভক্ত। ঘন সেণ্টিমিটার (cm^3) ও মিলিলিটার (ml) ধ্বনিবিজ্ঞানে অভিন্ন। এখানে তিনটি জিনিস লক্ষণীয়—আয়তন, চাপ ও বেগ। প্রথমেই আয়তনের কথা। ফুস্‌ফুস্‌ থেকে ওষ্ঠাধর পর্যন্ত গোটা আয়তন ৬৫০০ cm^3 ক্রমের (of the order of) সীমার মধ্যে ওঠা-নামা করে—বায়ু—নিষ্কাশনের পরে অবিশষ্ট থাকে ফুস্‌ফুসে ১৫০০ cm^3। বাক্‌-এ ২০০০ হতে ৪৫০০ cm^3 আয়তনের কন্ঠাঞ্চল স্বাভাবিক এবং ৩০০০ cm^3 গড় হিসেবে। অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় (গলবিল ও মুখবিবর) আয়তন ১২০ থেকে ১৬০ cm^3 ক্রমের। শ্বাসরন্ধ্র ও মুখসংবারের মধ্যেকার আয়তন স্পর্শব্যঞ্জনের পক্ষে এরূপ : প/ব—১৪০ cm^3 ; ট/ড—৮৫ cm^3 ; ক/গ—৪০ cm^3। বলনে সর্বদাই আয়তনের পরিবর্তন ঘটচে। বাক্‌-প্রশ্বাসের মধ্যে এর মাত্রা ৫০০ থেকে ১০০০ cm^3 ; কন্ঠাঞ্চলীয় আয়তন পরিবর্তনে ঘটে ধৃতবায়ুর চাপ পরিবর্তন। কন্ঠাঞ্চল সম্পূর্ণ বন্ধ থাকলে চাপ-বদলই এর একমাত্র ফলশ্রুতি। বহির্বায়ুর সঙ্গে যোগাযোগ থাকলে আয়তন-বদল হবে কন্ঠাঞ্চল দিয়ে বায়ু-প্রবাহে।

প্রতি একক ক্ষেত্রের বলকে বলে চাপ এবং প্রতি বর্গ সেণ্টিমিটারে চাপের একক হ'লো dyne ($dyne/cm^2$)। $dyne/cm^2$-এর ধ্বনি চাপ হবে ৬৫ decibel-এর ধ্বনি তীক্ষ্ণতার সমান। ধ্বনিবিজ্ঞানে ব্যবহৃত হয় জলের সেণ্টিমিটার (cm H_2O)। Rahn প্রভৃতি[৫৪] পরীক্ষাগারে পেয়েচেন যে পুরুষের গরিষ্ঠ নিঃশ্বাস চাপ ১৩০ থেকে ১৮০.৮৮ cm H_2O, যার মধ্যক হ'লো ১৫৫। তাই ধ'রে নেয়া হয় যে স্বাভাবিক কণ্ঠাঞ্চলীয় নিঃশ্বাস চাপ ১৬০ cm H_2O। আবার গরিষ্ঠ প্রশ্বাস চাপেরও আছে দুটি মান—৮৮.৮ ও ১০৮.৮ cm H_2O, যার মধ্যক ৯৮.৫৩ অর্থাৎ ১০০। কাজেই এইসব উপাত্তের ভিত্তিতে বলা চলে যে চাপের সম্ভাব্য পাল্লা হলো—১০০ থেকে+১৬০ cm H_2O। তবে-এর অত্যন্ত অল্প অংশই বাক্‌-এ ব্যবহৃত হয়। মুখের আভ্যন্তরীণ চাপ সাধারণত ৩ থেকে ১৫ cm H_2O এবং স্বরোৎপত্তির জন্যে প্রয়োজন 2cm H_2O এর

শ্বাসরন্ধ্রীয় লঘিষ্ঠ চাপ-পার্থক্য। অর্থাৎ কণ্ঠ্যভাঁজগুলোকে স্পন্দশীল রাখতে যা জরুরী তা হ'লো এই যে অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় (supra-glottal) চাপের তুলনায় উপশ্বাসরন্ধ্রীয় (sub-glottal) চাপ হবে নিদেনপক্ষে 2cm H_2O বেশি। চেঁচানিতে এই উপশ্বাসরন্ধ্রীয় চাপ ওঠে 80 cm H_2O-তে। এবার চাপও আয়তনের সম্পর্কের কথা। এরা ব্যস্তানুপাতিক (inverse proportion)। Boyle-এর সূত্রটি এসে যায় এখানে ঃ "নির্দিষ্ট পরিমাণের গ্যাসের চাপ, তাপ অপরিবর্তিত থাকলে, হয় আয়তনের ব্যস্তানুপাতী"। যদি V_1=আদি আয়তন (আধারের) ; V_2=নতুন আয়তন ; p_1=আদি চাপ (আবহচাপ) ; ও p_2=নতুন চাপ হয়, তবে পাওয়া যায় নিচের সূত্রাবলী—

$$p_2=\frac{V_1 \times p_1}{V_2} \quad (4a) ; \qquad p_1=\frac{p_2 \times V_2}{V_1} \quad (4b) ;$$

$$V_1=\frac{p_2 \times V_2}{p_1} \quad (4c) ; \qquad V_2=\frac{p_1 \times V_1}{p_2} \quad (4d).$$

তারপরে প্রবাহবেগ। এ দু'রকমের—ঠিকবেগ বা কণাবেগ ; এবং আয়তন বেগ। কণাবেগ হ'লো অবস্থান পরিবর্তনের হার। Roos-এর মতে বায়ু যদি ৩৫°c তাপে থাকে এবং জলীয় বাষ্পে (কণ্ঠাঞ্চলীয় বায়ু) সম্পৃক্ত হয়, তবে

$$u=4.12 \sqrt{p} \cdots\cdots\cdots (5a)$$

যেখানে u=বেগ (metres per second), $p=p_1-p_2$ অর্থাৎ উজান বাড়তি (mm H_2O)। cm/s-এ সূত্রটি হবে

$$u=412 \sqrt{p}\ (\text{mm } H_2O) \cdots\cdots\cdots (5b)$$

$$p=\left(\frac{u\ (\text{cm/s})}{412}\right)^2 \qquad \cdots\cdots\cdots (5c)$$

গরিষ্ঠ নিঃশ্বাস চাপ ১৬০ cm H_2O ক্রমের ব'লে, বেগ হবে

$$u=412 \sqrt{1600}=412 \times 40=16480 \cdots\cdots (5d)$$

অর্থাৎ এ Mach ·৫ বা ধ্বনিবেগের অর্ধেক। Bernoulli-র উপপাদ্য হ'লো এই যে, যে-কোন প্রবাহ-রেখায় (streamline) চাপশির (pressure head) ও বেগশিরের (velocity head) যোগফল ধ্রুব। অর্থাৎ কিনা প্রবাহ-রেখায় বেগ ও চাপ ব্যস্তানুপাতিক। ধ্বনিবিজ্ঞানে বার্নৌলি অভিক্রিয়ার গুরুত্ব আছে স্বরোৎপাদনে এবং অন্যান্য পর্যাবৃত্ত 'কম্পনজাত' (trilled) ধ্বনি সৃষ্টিতে, যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে কণ্ঠাঞ্চলীয় নালীর স্পন্দশীল উন্মোচন ও অবরোধ। মনে রাখতে হবে স্বরোৎপাদনে বায়ু প্রবাহ ত্বরান্বিত হয় সংকীর্ণ শ্বাসরন্ধ্রীয় ছিদ্রে এবং শ্বাসরন্ধ্রে চাপ কমে যায় ৩ cm H_2O-তে মোটামুটি উঁচু স্বরতীক্ষ্নতা সমেত। এই বার্নৌলি ধরনের চাপ-হ্রাসই আংশিকভাবে দায়ী শ্বাসরন্ধ্রীয় চক্করের রোধক (closing) দশায় কণ্ঠভাঁজের ভেঙে বন্ধ হওয়া।

একক সময়ে কণ্ঠনালী দিয়ে চলা কালে বায়ুর যে আয়তন হয় তাকে

আয়তন বেগ বলে। একে সাধারণত সেকেন্ড প্রতিঘন সেন্টিমিটারে প্রকাশ করা হয় (cm^3/s)। শান্ত বাক্-এ আয়তন বেগ বেড়ে দাঁড়ায় ১০০ থেকে ২৫০ cm^3s এবং চড়া ১০০০ cm^3/s-তে, তবে আরো বেশি হয় 'হ'—উচ্চারণে ও মহাপ্রাণ অঘোষ স্পর্শধ্বনির মুক্তিতে, যেমন ইংরেজি প্রচাপিত p, t, k-তে। যদি $\bar{u}$= গড়কণাবেগ, V_v=আয়তন বেগ, a=নালীর অনুপ্রস্ত ক্ষেত্র হয়, তবে

$$V_v = \bar{u} \quad (6a); \quad \frac{V_v}{\bar{u}} = a \quad (6b); \quad a \times \bar{u} = V_v \quad (6c).$$

এখানে V_v প্রকাশিত হয়েচে cm^3/s—এ, $\bar{u}$ cm/s—এ এবং a cm^2—এ। উদ্বোধকবেগ (initiator velocity) হ'লো কন্ঠাঞ্চল দিয়ে সঞ্চরণশীল বায়ু-প্রবাহের বেগ, যা কণাবেগ ও আয়তন বেগ এই উভয়েই প্রকাশশীল। উদ্বোধক বিচলনের প্রভাবে কন্ঠাঞ্চলীয় আয়তনের পরিবর্তন ঘটে, যেমন স্বরধ্বনির বেলায় ফুস্‌ফুসের আয়তন হ্রাস পায় ১৫০ cm^3/s হারে। ফুস্‌ফুসের কাজ যেহেতু বায়ু-প্রবাহ ঘটানো, তাই আমরা বলি ১৫০ cm^3/s বেগ। অধিকাংশ ক্ষেত্রে উদ্বোধক বেগ বায়ুপ্রবাহের আয়তন বেগের সমান, অবশ্য স্পর্শ ব্যঞ্জন বাদে। অঘোষ স্পর্শ ব্যঞ্জনের মুক্তিকালে ৭·৫ cm H_2O চাপ সৃষ্টি হয় ১১ cs অর্থাৎ সেন্টি সেকেন্ডে। উদ্বোধক আয়তন বেগ হয় ১৯০ cm^3/s.

আগেই বলা হয়েচে প্রবাহ দু'রকমের—স্তরিত ও বিক্ষুব্ধ। যে-প্রবাহ প্রবাহী মিশ্রণ বা বেগের আকস্মিক উচ্চাবণ (fluctuation) না ঘটিয়ে স্তরে-স্তরে প্রবাহিত হয় তাকে বলে স্তরিত প্রবাহ। অন্যদিকে, যখন প্রবাহীর প্রধান গতির উপর ছোট-ছোট অনিয়মিত গতি আরোপিত হয় আকস্মিক ছোটবেগের পরিবর্তনে, যা ধাবিত হয় প্রধান প্রবাহের দিকে এবং এর সমকোণী দুই দিকে অর্থাৎ উঁচু-নিচু ও পাশাপাশি চলে তাকে বলে বিক্ষুব্ধ প্রবাহ। এরও আছে দু'টি শ্রেণী—নালিক (channel) ও জাগরী (wake)। নালিক বিক্ষোভে বুঝায় নলের মধ্য দিয়ে প্রবাহজাত বিক্ষোভ। আর জাগরী বিক্ষোভ হ'লো এমন বিক্ষোভ, যার অন্তর্ভুক্ত থাকে ন্যূনাধিক স্থান-নিয়মিত (regularly spaced) বা পর্যাবৃত্ত ঘূর্ণিমালা (vortices) এবং যা জন্মায় বাধার ভাটিতে। নালিক বিক্ষোভে ফোঁস-ফোঁসানির শ্রৌত তীক্ষ্ণতা ও প্রাবল্য নালিক প্রবাহ বেগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। জাগরী বিক্ষোভে শুধু তীক্ষ্ণতা নয়, কিন্তু কম্পাংক ও—যা প্রস্বর বলে প্রত্যক্ষীভূত হয়—বেগের আনুপাতিক। আমরা যদি নলের স্তরিত প্রবাহ দিয়ে শুরু করি বা বাধা অতিক্রম করি এবং ক্রমে-ক্রমে প্রবাহ বেগ বাড়াতে থাকি, তবে শেষে আমরা পেঁছাবো এক ক্রান্তিক (critical) বেগ-এ, যেখানে প্রবাহ হবে বিক্ষুব্ধ। অনুরূপভাবে আমরা যদি উঁচু বেগ অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ প্রবাহ নিয়ে শুরু করি এবং ক্রমে ক্রমে বেগ কমাতে থাকি, তবে আবার আমরা পেঁছাবো এক ক্রান্তিক বেগে, যেখানে প্রবাহ আর বিক্ষুব্ধ নয়। দু'টি ক্রান্তিক বেগের প্রথমটি দ্বিতীয়টির চেয়ে উচ্চতর। কাজেই বলা যায় যে স্তরিত

প্রবাহের বিক্ষুব্ধ রূপান্তরণে আছে উচ্চতর ক্রান্তিক বেগ, আর বিক্ষুব্ধ প্রবাহের স্তরিত রূপান্তরণে নিম্নতর ক্রান্তিক বেগ। এদের মধ্যে নিম্নতর ক্রান্তিক বেগই অধিকতর সুস্থিত (stable) এবং তাই প্রবাহ—গতিবিজ্ঞানে (fluid dynamics) একেই অভিহিত করা হয় ক্রান্তিক বেগ রূপে।

এখানে অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে Reynolds number—এ এক মাত্রাহীন সংখ্যা (R)। এ জড়ত্বীয় (inertial) বল (প্রবাহীর ঘনত্ব, নলাকৃতি বা বাধা ও প্রবাহ বেগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট) ও সান্দ্র (viscous) বলের (প্রবাহীর সান্দ্রতা) অনুপাত মাপক। অর্থাৎ $R=\frac{\text{দৈর্ঘ্য}\times\text{বেগ}\times\text{ঘনত্ব}}{\text{সান্দ্রতা}}$;

কিন্তু $\frac{\text{ঘনত্ব}}{\text{সান্দ্রতা}}$ = সৃতিবিদ্যক (kinematic) সান্দ্রতা = ·১৪। ফলে

$$R=\frac{\text{দৈর্ঘ্য}\times\text{বেগ}}{\text{সৃতিবিদ্যক সান্দ্রতা}}$$

এবার গণিতীয় সূত্র হবে ঃ

$$\text{Re বা } R=\frac{d\times\bar{u}}{\cdot 14}\quad(7a);\quad d=\frac{R\times\cdot 14}{\bar{u}}\quad(7b);\quad \bar{u}=\frac{R\times\cdot 14}{d}\quad(7c).$$

যেখানে d = কণ্ঠাঞ্চলের ব্যাস, ও $\bar{u}$ = প্রবাহ বেগ মধ্যক। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় R (crit) = 1700—এ বাক্-এর গড় হিসেবে স্বীকৃত। তবে উচ্চারক ও স্বনিক নালীর বিভিন্ন আকৃতির জন্যে বাক্-এর ক্রান্তিক রেনল্ড্স সংখ্যা ধরা হয় Re (crit) = 1700 ± 200। স্তরিত প্রবাহে $\text{Re}<1700\pm200$; আর বিক্ষুব্ধ প্রবাহে $\text{Re}>1700\pm200$। ধ্বনিবিজ্ঞানে ক্রান্তিক বেগের জায়গায় ধরা হয় ক্রান্তিক আয়তন বেগ। বিভিন্ন ধ্বনির হিসাব এরকম ঃ f···$47cm^3/s$; ʃ···$46cm^3/s$; s···$50cm^3/s$ ইত্যাদি।[৫৫]

২.১৫ ত্রিধা স্পন্দ

বাগুৎপত্তির ঘটনাক্রম এরূপ—

১। স্নায়ু-ভাষাতাত্ত্বিক কার্যক্রম (neurolinguistic programming)—পরবর্তী নির্বাচন ও কালক্রম নির্ধারণ।

২। স্নায়ু-পেশীয় দশা (neuromuscular phase)—বহির্মুখী (efferent) স্নায়বিক উত্তেজনা (impulses) সঞ্চারণ, সঞ্চালক একক বর্ষণ ও একক পেশীপুঞ্জের সংকোচন।

৩। সেন্দ্রিয় দশা (organic phase)—ইন্দ্রিয়গ্রামের বিচলন ও অঙ্গবিন্যাস (postures)।

৪। বায়ু-সচল দশা (aero-dynamic phase)—কণ্ঠাঞ্চলে ও তার মধ্য দিয়ে বায়ুর সম্প্রসারণ, সংকোচন ও প্রবাহ।

৫। শ্রৌত দশা (acoustic phase)—বক্তার কন্ঠাঞ্চল হতে ধ্বনিতরঙ্গ-বিস্তারণ (propagaion).

৬। স্নায়ু-গ্রাহী দশা (neuro-receptive phase)-প্রান্তস্থ (peripheral) শ্রাবণ উদ্দীপনা (stimulation) ও অন্তর্মুখী (afferent) স্নায়বিক উত্তেজনা-সঞ্চারণ।

৭। স্বায়ু-ভাষাতাত্ত্বিক শনাক্তকরণ (neuro-linguistic identification)—আগন্তুক (incoming) সংকেত (signal)—কে নির্দিষ্ট বাগ্‌ধ্বনিরূপে সম্ভাব্য বা প্রকৃত শনাক্তকরণ। এ ছাড়াও আছে (১) চেষ্টা-বেদনীয় পুনর্নিবেশ (kinaesthetic feedback); (২) শ্রাবণ পুনর্নিবেশ; ও (৩) সঞ্চালক সমানুভূতি (empathy)। বক্তা ও শ্রোতার মধ্যে অবস্থান ব্যবধান ছ'ফুটের হ'লে বাক্‌ প্রক্রিয়ার গড়পড়তা কালক্রমে হবে এরূপ—সাতটি দশার প্রতিটি দশায় যথাক্রমে সময় লাগবে ৫০, ১০, ৩০, ২০, ৬, ১০ ও ৫০ milli seconds; এবং এদের ক্রমযৌগিক (cumulative) রূপ হবে ৫০, ৬০, ৯০, ১১০, ১১৬, ১২৬ ও ১৭৬ milli seconds.

কন্ঠাঞ্চলকে একটি বায়ব কৌশলের (pneumatic device) সঙ্গে তুলনা করা যায়, যার চূড়ান্ত কাজ হলো স্নায়ুশক্তিকে শ্রৌতশক্তিতে রূপান্তরণ (conversion)। এ একজোড়া হাপর এবং বিভিন্ন নল ও কপাটিকায় (valve) তৈরি। হাপর অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্‌ স্ফীত হয়ে আধাগ্যালনের মতো বায়ু (২ বা ৩ litres) গ্রহণ করতে পারে এবং সংকুচিত হ'য়ে তা বের করে দিতে পারে। বাক্‌-এর বেলায় এ কাজ হয় অত্যন্ত মন্থরভাবে। প্রত্যেক হাপর থেকে বেরিয়েচে একটি করে নালিকা বা ক্লমশাখা (bronchus) এবং এই ক্ষুদ্রতর নালিকাগুলি মিলিত হ'য়ে গ'ড়ে তোলে একটি একক বৃহৎ নল [শ্বাস নালী (trachea) ও বাগ্‌যন্ত্র (larynx)], মোটামুটি যার দৈর্ঘ্য ৭ ইঞ্চি ও ব্যাস এক ইঞ্চি। এই নলের উপরিভাগে আছে একটি পিস্টন (বাগ্‌যন্ত্র) যা উপরে-নিচে এক ইঞ্চির মতো সরতে পারে (slide)। এ-পিষ্টনটি কিছুটা জটিল, কেননা এর ভিতরে আছে একটি কপাটিকা (শ্বাসরন্ধ্র) যা একাধিকভাবে কাজ করতে পারে। এ বন্ধ হলে পিস্টনের ঊর্ধ্বমুখী বা নিম্নমুখী বিচলনে এর উপরের বা নিচের বায়ুর সংনমন বা সম্প্রসারণ ঘটে। কপাটিকা খুলে দিলে পিস্টন দিয়ে বায়ু নির্গত হয়। বস্তুত এই শ্বাসরন্ধ্রীয় কপাটিকার কাজ দু'টি—শ্বাসরোধক (throttle) ও মাপক (metering) কপাটিকা হিসেবে। প্রথমটি দৃঢ় নিবন্ধ অবস্থা থেকে বিভিন্ন ছিদ্রশ্রেণীর মাধ্যমে সম্পূর্ণ মুক্ত অবস্থায় আসতে পারে এবং তাই হাপর কর্তৃক বর্জিত বা গৃহীত বায়ুপ্রবাহের নিয়ামক। দ্বিতীয়টি তালানুগতভাবে (rhythmically) খোলে ও বন্ধ হয় এবং তাই বায়ুকে বিভিন্ন হারে ছেড়ে দেয় প্রায়-মাপা (quasi-measured) ঝলকে, যা সেকেন্ড প্রতি ৫০ থেকে কয়েক শত ঝলক। কপাটিকা (শ্বাসরন্ধ্র) সমেত পিস্টনের (বাগ্‌যন্ত্র) উপরে আছে তিনটি

প্রকোষ্ঠ—গলবিল ; মুখবিবর ; ও নাসিকাবিবর, যাদেরকে পারস্পরিক যোগাযোগে নিয়োগ করা যেতে পারে অথবা এক থেকে অন্যের পৃথকীকরণও হ'তে পারে কোমলতালু ও জিভের কপাটিকায়। জিভ-কপাটিকা অতিশয় সচল (mobile) এবং এ মুখ বিবরে সঞ্চরমান বায়ু-প্রবাহকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে বিভিন্নস্থানে ও নানারকমে। অবশেষে, মুখবিবরের বহিপ্রান্তে আছে একটি দুনী কপাটিকা (ওষ্ঠাধর)।

সেন্দ্রিয় বায়ুসচল দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে দেখা যায় যে বাগধ্বনির উৎপত্তিমূলে রয়েচে তিনটি উপাদান—উদ্বোধন ; উচ্চারণ; স্বনন। প্রথম দু'টি ভিত্তিক, তৃতীয়টি তা নয়। উদ্বোধন হ'লো ইন্দ্রিয় বা প্রত্যঙ্গের হাপর বা পিস্টন-সদৃশ বিচলন, যা সন্নিহিত কণ্ঠাঞ্চলের আয়তন বদলায়, অন্তর্ভুক্ত বায়ুর সংকোচন বা প্রসারণ ঘটিয়ে এবং তাই বাস্তব বা সম্ভাব্য বায়ুপ্রবাহের সূত্রপাত করে। দ্বিতীয়টি উচ্চারণ, যা প্রত্যঙ্গের বিচলন বা অঙ্গবিন্যাস ঃ এ বায়ু-প্রবাহকে এমনভাবে বাধা দেয় বা তার পরিবর্তন ঘটায় যাতে একটি বিশিষ্ট ধ্বনি উৎপন্ন হয়। এ দু'টি ভিত্তিস্থানীয়, যেহেতু সব বাগধ্বনিতেই এরা বর্তমান। তা সত্ত্বেও আছে বাগুৎপত্তির তৃতীয় আরেকটি কার্মিক (functional) উপাদান। এ হ'লো স্বনন (phonation), যা আগের দুটির সমান না হলেও প্রায় ভিত্তিস্থানীয়। এতে বুঝায় বাগযন্ত্রীয় যে-কোন প্রাসঙ্গিক ক্রিয়াকলাপ, যদিও তা বৃত্তিতে উদ্বোধক বা উচ্চারণীয় নয়। স্বননীয় ক্রিয়া-কলাপ বর্ণিত হয় প্রধানত কন্ঠতন্ত্রীর বিচলন ও অঙ্গবিন্যাসের ভাষায়। বাগযন্ত্রের মধ্য দিয়ে বায়ুস্তম্ভের সঞ্চরণ কালে স্বননের আবির্ভাব ঘটে। আর এ পরিণাম সকল ফুসফুসীয় ধ্বনিরই। সর্বদাই ফুসফুসীয় ধ্বনির সঙ্গে স্বননের আবির্ভাব ঘটে বলেই এ "কম-ভিত্তিস্থানীয়", উদ্বোধন (initiation) ও উচ্চারণের (articulation) তুলনায়।[৫৬]

বাক্-এ তিনটি বিচলন লক্ষণীয়—(১) সংবন্ধ বিচলন; (২) নিয়ন্ত্রিত বিচলন ; ও (৩) ক্ষেপক বিচলন।[১২] এদের কথা আগেই বলা হয়েচে (২.৭)-এ অর্থাৎ "বিচলন বিশ্লেষণে"। এরা উপরের তিনটির সঙ্গে এ-ভাবে সাযুজ্যলাভ করে ঃ সংবন্ধ বিচলন⟷উচ্চারণ; নিয়ন্ত্রিত বিচলন⟷স্বনন; এবং ক্ষেপক বিচলন→উদ্বোধন। এখানে স্মর্তব্য যে ভাষা ধ্বনিক সম্পর্ক-নির্ভর। বস্তুত স্বনমানীয় ধ্বনিগুচ্ছের সম্পর্ক হ'তে পারে শ্রৌত (acoustic) বা সেন্দ্রিয় (organic)। এতে তিন প্রকারের ভাষা গড়ে ওঠে—(ক) কালভিত্তিক ভাষা; (খ) প্রচাপ-ভিত্তিক ভাষা; ও (গ) সুর-ভিত্তিক ভাষা। প্রথমের উদাহরণ সংস্কৃত, বাঙলা, ফরাসী প্রভৃতি; দ্বিতীয়ের ইংরেজি, স্পেনিস ইত্যাদি; আর তৃতীয়ের ক্যান্টনিজ, স্বনা (tswana) প্রভৃতি। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে উচ্চারণ, উদ্বোধন ও স্বননের রূপভেদ (modification) হ'লো ব্যাপ্তিকাল (duration) বা মাত্রা (quantity), প্রচাপ (stress)

পরিবৃত্তির সংগীত ; ও (৩) "তাল সঙ্গীত" বা কাল-নিয়ন্ত্রিত প্রস্বনের সংগীত। প্রথমটি মড়ুলন—নির্ভর অর্থাৎ বিভিন্ন সুরোৎপাদনে মানুষীস্বরকে ওঠায় ও নামায়। দ্বিতীয়টি তৈরি হয় হ্রস্ব-দীর্ঘ ধ্বনির পরিবৃত্তিতে (variation)। এখানে প্রথমটির তিনটি স্বর—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—বর্তমান আছে মৌলিকস্তরে (elementary stage) ; কিন্তু মুখ্য আনন্দ উদ্ভূত হয় হ্রস্ব-দীর্ঘ ধ্বনির বিন্যাসে ও তার সংগীতে। পক্ষান্তরে হ্রস্ব-দীর্ঘ অক্ষর প্রথমটিতে ও বর্তমান ; তবে তাদের অনুক্রম নির্দিষ্ট নয় এবং এ ঘটে খেয়ালখুশিমতো। নির্দিষ্ট অনুক্রম জাত বিশেষ সংবেদন প্রথমটিতে তাই অনুপস্থিত। এ-ছাড়া তৃতীয়টিতে আছে ধ্বনি বা স্বরের প্রচাপন, যা ঘটে মাত্রা বা কালমাত্রা নামে অভিহিত কাল-ক্ষণ-নির্ধারিত নির্দিষ্ট পর্যায়ক্রমে। গীতল অভিক্রিয়া সৃষ্টি করতে এই প্রচাপনের সঙ্গে থাকে করতালি অর্থাৎ এক করতলের উপর অন্য করতলের আঘাত, অথবা কালরক্ষক যন্ত্র, যেমন হাত ঢোলকের উপর হাতের তালু বা ছড়ির চাঁটি। এ-সব আঘাতের সংস্কৃত নাম হ'লো "তাল", যা সাধিত হয়েচে "তড়্" ধাতু থেকে এবং অর্থ আঘাত করা। এ-সংগীত মূলত সুনিয়ন্ত্রিত কাল-উপাদান-ভিত্তিক যা অন্য দু'টিতে নেই। এটি নিঃসন্দেহে জনপ্রিয় এবং জনগণ এর উদ্ভাবন করেচে নাচের সময়ে তাদের দেহ ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের নিয়মিত বিচলন থেকে। প্রথমটির উদাহরণ বৈদিক ছন্দ যথা গায়ত্রী-অনুষ্টুভ্, ত্রিষ্টুভ্ ও জগতী। এদের আছে যথাক্রমে ৮, ১১ ও ১২টি বর্ণ—হ্রস্ব-দীর্ঘ ধ্বনির কোন পার্থক্য নেই। প্রত্যেক কুলকে (stanza) আছে ৪টি পংক্তি তবে গায়ত্রীতে মাত্র ৩টি। অক্ষরই এ সব ছন্দের একক বলে এর নাম দেয়া হয় "অক্ষরবৃত্ত"। পরবর্তী ধ্রুপদী যুগে এলো ধ্বনি-পরিবৃত্তি অর্থাৎ বর্ণের হ্রস্ব-দীর্ঘতা হ'লো-এর ভিত্তি। তাই-এর নাম দেয়া হয় "বর্ণবৃত্ত"। বর্ণসঙ্গীতের আছে তিনটি বৈশিষ্ট্য—(১) ধ্বনিগুণ ; (২) আক্ষরিক মাত্রা ; ও (৩) উক্তির কাল। দীর্ঘবর্ণ হ্রস্বের দ্বিগুণ এবং সংগীত সৃষ্টি হয় এদের উপস্থিতিতে নয়, কিন্তু পর্যায়ক্রমে। পুরণো এককে বর্ণই ছিল প্রধান এবং পংক্তিগুলি নির্ধারিত হতো বর্ণসংখ্যার ভিত্তিতে ; হ্রস্ব-দীর্ঘতার প্রশ্নই ছিল না। কিন্তু "অক্ষরবৃত্তের" জায়গায় যখন "বর্ণবৃত্ত" এলো তখন একক হলো বর্ণের সংখ্যা ও অনুক্রম। 'ত্রিক' (triplet) হলো-এর ভিত্তি। পিঙ্গল তাই তাঁর "ছন্দঃসূত্রম্"—এ ৮ প্রকার 'ত্রিক'-এর উল্লেখ করেচেন—ম, য, র, স, ত, জ, ভ এবং ন। তিন তিনটি বর্ণ একত্র করেই ছন্দ ঠিক করতে হয়। একে 'গণ' বলে। বর্ণবৃত্তের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হ'লো 'যতি' বা ছান্দসিক বিরতি, যা পংক্তির মধ্যভাগে প্রযুক্ত হয়। অক্ষর বৃত্ত ও বর্ণবৃত্ত উভয়ই সংস্কৃত ছন্দ। দ্বিতীয়টি তালের সঙ্গে কিছুটা খাপখায়। তাই প্রাকৃত ও অপভ্রংশ কবিরা তালপন্থী আবর্তক ত্রিক-এর ব্যবহার করেচেন। এখানে মাত্রাবৃত্তের কথা এসে পড়ে—এ হ'লো নেতিবাচক বর্ণ সংগীত অর্থাৎ মাত্রাগণের সন্ধিস্থলে দীর্ঘবর্ণ বিসর্জিত হয়। মাত্রাগণ পৃথকীকৃত হয়, যেমন

'গাথা' ৭½ মাত্রাগণে বিভক্ত হ'য়ে পংক্তিতে দেখায় ৩০ মাত্রা। এর পরে তালবৃত্তের কথা—এ মাত্রাবৃত্তের তুলনায় অধিকতর গীতল। "তাল"-এর সংজ্ঞা হ'লো এই ঃ "ছান্দসিক পংক্তিতে অস্তিমান আবর্তক বিরামের নিয়ন্ত্রন কাল-উপাদানের সহায়তায় এবং প্রচাপ মারফতে।"[৫৯] বিরাম-নিয়ামক প্রচাপ নির্দেশিত হয় কণ্ঠপ্রস্বননে বটে ; তবে এ-ছাড়াও করতলে-করতলে বা করতালে-করতালে আঘাত অথবা হাতঢোলকের চাঁটিতে। এ-প্রচাপন আসে চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ বা সপ্তম কালমাত্রায় অথবা তাদের গুণিতকে। কথান্তরে চারটি বিভিন্ন তাল আছে, ৪, ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার। মাত্রাবৃত্তের মতো তালবৃত্তেও আছে তালগন।[৬০] মোটকথা এই ত্রিধা ছন্দ ধরা পড়ে শারীরবৃত্তীয় তিনটি বিচলনে এবং এদের সাযুজ্য এরূপ ঃ অক্ষরবৃত্তের স্বরসঙ্গীত↔স্বরণ বা স্বনন ; বর্ণবৃত্তের বর্ণ-সঙ্গীত↔উচ্চারণ ; তালবৃত্তের তালসঙ্গীত↔উদ্বোধন। এরা যথাক্রমে প্রস্বর, প্রস্বন ও প্রবলন সগোত্রীয়। অর্থাৎ এদের নিয়ামক সুর বা স্বর, দৈর্ঘ্য ও বল —এরাই ছন্দের একক।

এরি পটে বিচার্য বাঙ্‌লা ছন্দ। এখানেও তিনটি রূপ ধরা পড়ে, যাদের নাম দেয়া যায় স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্ত। প্রথমে আছে প্রস্বরণ, দ্বিতীয়ে প্রস্বনন, এবং তৃতীয়ে প্রচাপন। অর্থাৎ কিনা একটিতে সুর, আরকটিতে দৈর্ঘ্য, আর তৃতীয়টিতে বল। এদের উদাহরণ হ'লো যথাক্রমে রবীন্দ্রনাথের "শাজাহান", "পুরাতনভৃত্য" ও "সেকাল" (ক্ষণিকা)।

২.১৬ পরিমাত্রা ও ধ্বনিমান

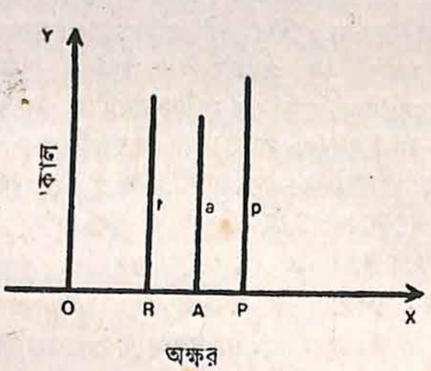
বাক্-দর্শনের দু'টি প্রবেশ পথ আছে—একটি পুরাতনী, অন্যটি আধুনিকী। স্বনমান—প্রধান দৃষ্টি কোণ থেকে বাক্-কে দেখা যায় কতকগুলি খণ্ডের (segment) সমষ্টি এবং প্রত্যেক খণ্ড এককেটি স্বনমান। এ হ'লো খণ্ড-সৃজনী (building-bloc) দৃষ্টিপথ। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় "অঙ্গবিন্যাস-ও-শ্রুতি" (posture-and-glide) পদ্ধতি। এতে প্রতিখণ্ডকে দেখা হয় কণ্ঠ্য প্রত্যঙ্গের ভঙ্গি-বিন্যাস হিসেবে এবং এসব অঙ্গবিন্যাস শ্রুতিতে গ্রথিত করে আমরা একখণ্ড বা অংশ থেকে অন্য খণ্ডে যেতে পারি। খণ্ড-সৃজনী পদ্ধতিতে কিন্তু বাক্-এর সমন্বয় সম্ভব নয়। এখানে পরিমাত্রিক প্রবেশ পথই (parametric approach) শ্রেষ্ঠতর। পরিমাত্রিক নকল কথক (Parametric Artificial Talker) নামক যন্ত্র তৈরি হয়েচে। একে সংক্ষেপে বলা হয় "পনক" (PAT)। এর প্রথম শব্দে অর্থাৎ 'পরিমাত্রিক'-এ আছে যন্ত্রটির কার্যকৌশলের সূত্র। 'পরিমাত্রিক' এসেচে 'পরিমাত্রা' (parameter) থেকে এবং যন্ত্রটির কাজ হলো একটির পরে আরেকটি পরিমাত্রা যোগ করা, তবে খণ্ডের যোগ নয়। অর্থাৎ খণ্ডের স্থলে এ আমদানি করেচে পরিমাত্রা। এই পরিমাত্রা একটি চল (variable), একটি উপাদান যা সতত বর্তমান আছে, অথচ যার মান পরিবর্তিত হচ্ছে। স্বনমান-রূপক খণ্ড বাক্-কে কালাক্ষের সমকোণে ভাগ করে ; অন্যদিকে

পরিমাত্রা একে বিভক্ত করে কালাক্ষের সমান্তরে। 'প-ন-ক'—এর পরিমাত্রাগুলি শ্রৌত পরিমাত্রা। বাক্-বিশ্লেষণে প্রয়োজন শারীরবৃত্তীয় পরিমাত্রার (physiological parameter): এরা মাধ্যম উৎপাদনের যন্ত্রকৌশল। নিচে এদের একটি তালিকা দেয়া হ'লো—

(১) শ্বাসতন্ত্রে—(ক) অক্ষরস্পন্দ প্রক্রিয়া;
(Respiratory
system)—(খ) স্পন্দ-প্রবলক (বলবৎকারক) বা প্রচাপ-প্রক্রিয়া;
(২) স্বনতন্ত্রে—(গ) স্বনন-জাতীয় নিয়ন্ত্রন;
(Phonatory (ঘ) ঘোষীভবণের আনিয়মিত পরিবর্তন;
system) (ঙ) স্বর-তীক্ষ্নতা বা প্রস্বর পরিবৃত্তি;
(৩) উচ্চারণতন্ত্রে—(চ) তালব্য কপাটক ক্রিয়া;
(Articulatory (ছ) জিভ্-দেহ বিচলন;
system) (জ) জিভাগ্র বিচলন;
(ঝ) ওষ্ঠ্য বিচলন; ও
(ঞ) হনু-বিচলন[৬১]।

কালাক্ষর

ধ্বনিবিজ্ঞান হ'লো "কথিত ভাষা মাধ্যমের সর্বাত্মক অনুশীলন।" কাজেই মাধ্যম উৎপাদনের জন্যে প্রয়োজন পরিমাত্রাগুচ্ছের যথাযথ সমন্বয়ন। এর অর্থ



চিত্র: ৪—কালাক্ষর

এই নয় যে আমরা স্বভাবত "পরিমাত্রায়" কর্ণপাত করি। আমরা "মাধ্যম"-ই শুনি ধ্বনিগুণের হ্রাসবৃদ্ধিতে দোদুল, একক, অবিশ্লেষিত অবিরাম অপস্বর

হিসেবে। সম্ভবত আমরা কান পাতি ত্রিধা প্রকাশতন্ত্রের তিনটি পরিমাত্রা মারফতেঃ (১) উচ্চার্য ছাঁচ ; (২) স্বরভঙ্গীয় ছাঁচ ; (৩) স্বরগুণীয় পরিবৃত্তি বা পাল্লা। এই তিনটি তন্ত্রই বাক্-এ স্বতন্ত্রভাবে সক্রিয় এবং এদের দিকে কান পাতা হয় চারিত্র, মেজাজ প্রভৃতির নির্দেশসহ ভাষা হিসেবে। তবে আমরা শারীরবৃত্তীয় পরিমাত্রায় কর্ণ-পাত শিখতে পারি এবং মাধ্যম আয়ত্ত করার ব্যর্থতা তাদের পরিভাষায় ব্যক্ত ও কর্তে পারি। এখানেই ধরা পড়ে স্বনমান-সূচক খণ্ডের ব্যর্থতা—এদের পরিভাষায় প্রকাশ করা চলে না শিশুর আধ-আধ কথা (babbling)। কিন্তু পরিমাত্রায় এ প্রকাশশীল। কাল ও অক্ষরের সম্পর্ক নিচের ৪-সংখ্যক চিত্রে তুলে ধরা হ'লো। অনুভূমিক অক্ষ (horizontal axis), OX, অক্ষর বুঝাতে ব্যবহৃত ; উল্লম্ব অক্ষে (vertical axis), OY, কাল বুঝায়। এখানে R=শ্বাসতন্ত্র ; A=উচ্চারণতন্ত্র ঃ P=স্বনতন্ত্র। এ-সব থেকে উদ্ভূত পরিমাত্রাগুলি হবে যথাক্রমে r, a, p, —এরা কালাক্ষের সমান্তরাল।

পরিমাত্রার বিবর্তন

এই পরিমাত্রার চারটি রূপান্তর লক্ষনীয়—(১) শারীরবৃত্তীয় ; (২) প্রক্রিয়াজাত ; (৩) ভাষাতাত্ত্বিক ; ও (৪) ছান্দসিক। উৎসমূলে আছে R, A, P যার শারীরবৃত্তীয় পরিমাত্রা হ'লো r, a, p। এ আবার প্রক্রিয়ার দিক থেকে ত্রিধা বিভক্ত—উদ্বোধক ; উচ্চার্য ; ও স্বননীয়, অর্থাৎ initiatory, articulatory ও phonatory। এরি রকমফের হ'লো ত্রিধা বিচলন—ক্ষেপক (ballistic) ; নিয়ন্ত্রিত (controlled) ; ও সংবন্ধ (relating to fixation), অর্থাৎ পরিমাত্রা হবে b_m, c_m, f_m। এরপরে ভাষাতাত্ত্বিক পরিমাত্রা হ'লো উচ্চার্য ছাঁচ (u), স্বরভঙ্গীয় ছাঁচ (i), ও স্বরগুণীয় পরিবৃত্তি (q)। এখানে মনে রাখতে হবে স্বরভঙ্গি ও স্বরগুণের পার্থক্য। স্বরভঙ্গি (intonation) হ'লো অবিরাম বাক্ প্রবাহে প্রস্বরণ পরিবৃত্তি, যা কণ্ঠতন্ত্রী কম্পনজাত। অন্যদিকে স্বরগুণ (voice quality) হ'লো জার্মাণ klangfarbe বা ফরাসী timbre। এতে দুটি সুরের পৃথকীকরণ সম্ভব হয়, তা সে—সুর বিভিন্ন যন্ত্রেই উৎপন্ন হোক বা একই ধরনের দুটি যন্ত্রেই উৎপন্ন হোক। যাতে একটি গায়কের বা কথকের স্বর অন্য জনের থেকে পৃথকীকৃত হয়, তাকেই বলে তার গুণ। তাই ভাষাতাত্ত্বিক পরিমাত্রা হবে u, i, q। এ থেকে পেঁছানো যায় ভাষার ছান্দসিকতায়। এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয় চাপমান (s) অর্থাৎ stroneme, কালমান (c) অর্থাৎ chroneme, এবং সুরমান (t)

অর্থাৎ toneme। এখানে s, c, t, নামীয় পরিমাত্রা দ্রষ্টব্য। বাক্‌প্রবাহ হ'লো অক্ষরের কালিকরূপ। তাই যদি V=বাক্‌প্রবাহ হয়, তবে তাঁর পরিমাত্রিক রূপ হবে—

$$V=r+a+p \cdots\cdots (8a)$$
$$V=b_m+c_m+f_m \cdots\cdots (8b)$$
$$V=u+i+q \quad \cdots\cdots (8c)$$
$$V=s+c+t \quad \cdots\cdots (8d)$$

এখানে লক্ষণীয় যে বাক্‌ একদিকে যেমন অক্ষরনির্ভর, অন্যদিকে তেমনি কাল নির্ভর। তাই এখানে বিন্দু ও রেখাই বিবেচ্য—অক্ষরের প্রতীক বিন্দু ; আর কালের প্রতীক রেখা। ক্ষেত্রীয় স্থানাঙ্কে (areal co-ordinates) এদের রূপায়ণ হ'তে পারে। এতে যে কোন বিন্দু—r, a, p, ; b_m, c_m, f_m ; u, i, q ; s, c, t—ক্ষেত্রীয় স্থানাঙ্কে সংজ্ঞিত হলে, এদের অভিন্ন সম্পর্ক (identical relation) হবে $r+a+p=1$; তেমনি অন্যান্যরাও। ছান্দসিক দিক থেকে বিন্দুস্থানাঙ্কের সমীকরণ হবে—

$$sr+ca+tp=o \cdots\cdots (9a)$$

অর্থাৎ এ-সমীকরণটি বিন্দুস্থানাঙ্কে (r, a, p) রেখার বিন্দুসমষ্টি ধারণ করে। আর ঐ রেখার রেখাস্থানাঙ্ক হলো (s, c, t,)। একে বলা হয় রেখার (বিন্দু) সমীকরণ। পক্ষান্তরে নিচের সমীকরণটি

$$su+ci+tq=o \cdots\cdots (9b)$$

রেখাস্থানাঙ্কে (u, i, q) ধারণ করে বিন্দুগামী রেখাপুঞ্জ এবং ঐ বিন্দুর রেখা-স্থানাঙ্ক হলো (s, c, t)। একে বলা হয় বিন্দুর (রেখা) স্থানাঙ্ক। মনে রাখতে হবে যে 'রেখা সমীকরণে' বুঝায় রেখার বিন্দুস্থানাঙ্ক সংযোজক সমীকরণকে।[৬২] (9a) ও (9b) সমীকরণে তিনটি দিক উদঘাটিত হয়েচে—শারীরবৃত্তীয় (physiological) ; ভাষাতাত্ত্বিক (linguistic) ; ও ছান্দসিক (metrical)। এরা তিনটি উপাদানের দ্যোতক, যথা, P, L, M। এরা যদি কালিক পরিমাত্রা t-এ প্রকাশক্ষম হয়, তবে P, L, M নির্ধারিত হবে p, l, m এর মানে। আবার t ও নতুন পরিমাত্রা v (বাক্‌) এর সম্বন্ধ সংজ্ঞিত হবে এ-ভাবে :

$$v=\frac{t-l}{t-m}\Big/\frac{p-l}{p-m} \cdots\cdots (10)$$

এ হ'লো t ও v অর্থাৎ কাল ও বাক্‌-এর (1, 1) বা একৈক প্রতিষঙ্গ (correspondence)। এখানে কালাক্ষর রূপ ধরে অভিক্ষেপ (projective) জ্যামিতি-তে। আর $p\equiv l$ (r, a, p), $l\equiv$(u, i, q,) ও $m\equiv$

(s, c, t)। কাল ও অক্ষরের দ্বিত্ব (duality) এতেই রূপায়িত হতে পারে। বস্তুত এই দ্বিত্ব সাদৃশ্য-নির্ভর অর্থাৎ রেখা সম্পর্কীয় বিন্দুবৃন্দীয় ধর্ম (অক্ষরমালা) ও বিন্দুসম্পর্কীয় রেখাপুঞ্জীয় ধর্মের সাদৃশ্যের উপর এই দ্বিত্ব প্রতিষ্ঠিত। এর বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে দু'টি বিবৃতিতে—এক, দু'টি বিন্দুতে একটি রেখা নির্ধারিত হয়; দুই, দু'টি রেখায় একটি বিন্দু নির্ধারিত হয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয়েছে (9a) ও (9b) সমীকরণ দু'টি। এখানে তিনটি যুগলই প্রতিষঙ্গ-নির্ধারক : p, 1 ; l, 0; m, ∞ ।

ছন্দের সমীকরণ

অভিক্ষেপ জ্যামিতি ছেড়ে আসা যাক দ্বিঘাত ফলনে (quadratic function)। পরিমাত্রিক বিভাগগুলি কালাক্ষের সমান্তরাল—ছন্দ কালনির্ভর বলে এ দ্বিঘাত ফলনে রূপধরে। যদি t=কাল হয়, তবে ϕ (t)=ছন্দ (metre); আর চাপমান (stroneme)=s, কালমান (chroneme)=c, ও স্বরমান (toneme) =t বা p অর্থাৎ স্বনন (phonation)। এরি পটে ছন্দ হবে—

$$\text{Metre (m)} = \phi\ (t) = st^2 + ct + p \cdots\cdots (11)$$

পরিমাত্রা বুঝতে এ সহায়ক। (11)-কে দু'টি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যেতে পারে। প্রথমত, s, c, p সংখ্যাকে নিশ্চিত (fixed) ধরে t ও m দু'টি চল-এর সম্পর্কের অনুসন্ধান হ'তে পারে। দ্বিতীয়ত, ফলনকে সমগ্র ধরা—এতে বিধৃত হয় বিশিষ্ট ফলনের গোটা প্রস্ত, যারা দ্বিঘাত হওয়ার সাধারণ ধর্মে একত্রিত। এবং সূত্রে বুঝায় দ্বিঘাতরূপী যে-কোন ফলন। কাজেই t ও m আর গুরুত্বপূর্ণ নয় এবং সমগ্র ফলনের পরিবৃত্তি ঘটান হয় s, c, p এর মান বদল করে। এই শেষোক্ত সংখ্যাগুলি—s, c, p—দ্বিঘাতজাতীয় একটি ফলনের মধ্যেই নির্দিষ্ট, কিন্তু একটি দ্বিঘাত ফলন থেকে অন্যটিতে **পরিবর্তনশীল**। তাই এই বর্ণগুলির—s, c, p—বৈশিষ্ট্য এই যে এরা দ্বৈত জীবন যাপন করে অর্থাৎ এরা "পরিবর্তনশীল ধ্রুবক।" এই প্রতীক বর্ণগুলিকে বলা হয় "পরিমাত্রিক ধ্রুবক।" যখন ফলনীয় চলের সম্পর্কের দিকে দৃষ্টি দেয়া হয়, তখন প্রতীকগুলোতে বুঝায় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যামালা এবং তাই এরা **ধ্রুবক**। যখন গোটা ফলন পরিবৃত্তিই গুরুত্বপূর্ণ হ'য়ে ওঠে, তখন ফলনের চলরাশি অদৃশ্য হয়ে যায় এবং প্রতীক হয়ে ওঠে **পরিমাত্রা**। ছন্দের ব্যাপারে এই দৃষ্টিকোণই প্রাধান্য পায়।

বিচরণ কলণের (calculus of variations) সাহায্যেও ব্যাপারটিকে দেখা যেতে পারে। (11) থেকে এটা সুস্পষ্ট যে পরিবর্তী ফলন (varia-

ble function) $m=\phi(t)$। সমাকলনের সীমা যদি t_0 থেকে t_1 হয়, এবং $v=F(\phi)$, যেখানে F সমাকল (integral), v-এ বুঝায় উচ্চারণ (articulation) তবে, ϕ (t) এর পরিবর্তনের সঙ্গে f(t)-এরও পরিবর্তন হয়। কাজেই লেখা যায়—

$$v=\int_{t_0}^{t_1} f(t)\ dt \cdots\cdots\cdots(12)$$

এখানে v এর মান নির্ভর করে ϕ (t) এর বিশেষ রূপের উপর এবং f (t) এর উপর। অর্থাৎ v হ'লো পরিবর্তী চর ϕ এর অপেক্ষকীয়। অপেক্ষকীয় $v=F(\phi)$ এর বিবক্ষা এই যে v নির্ভর করে অনন্ত মানে তৈরি $m=\phi(t)$ ফলনের উপর। কাজেই সমস্যা হ'লো ϕ—ফলনের এমন নির্ধারণ যাতে v হবে গরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠ। এক কথায় আমরা চাইচি

$$v=\int_{t_0}^{t_1} f(t)\ dt$$ এর প্রান্তীয় মান, যেখানে f (t) নির্ভর করে

পরিবর্তী ফলন $m=\phi(t)$ এর উপর। ফলে সমাকলিতব্য ব্যঞ্জক (expression) হ'য়ে ওঠে f (t ; s, c, p), যেখানে s, c, p পরিমাত্রা এবং f—ফলনের রূপ নিদ্দিষ্ট। v—সমাকলের মান নির্ভর করে শুধুমাত্র s, c, p এর উপর এবং তাও এর চরম বা অবম মানের উপর, পরিমাত্রা পরিবৃত্তি যতই হোক না কেন। f (t) ফলনটি সমাকলিত হলে পাওয়া যায় v চলটি ; তবে এ-ফলনটি নিদ্দিষ্টভাবে $m=\phi$ (t) পরিবর্তী ফলন এর উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরতার অন্তর্ভুক্ত কেবলমাত্র ϕ নয়, কিন্তু ϕ-র বিভিন্ন অবকলজ (derivative) ও। [৬৩]

স্পন্দ ও ছন্দ

(11) ও (12) সংখ্যক সমীকরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে ছন্দের আছে রূপবৈচিত্র্য আর এ উচ্চারণ-নির্ভর। এ-কথা বুঝেচেন Seymour Chatman: তিনি স্বীকার করেন যে ছন্দোবদ্ধ কবিতা পংক্তির প্রচাপের আদর্শ আবশ্যিকভাবে নিদ্দিষ্ট নয়, কিন্তু বিভিন্ন পঠনের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। তাঁর মতেঃ "যে-কোন কবিতার ছন্দকে সব অর্থবহ ছন্দোলিপির ধাত্র (matrix) বলায় হবে তার শ্রেষ্ঠ বর্ণনা।" প্রকৃত ঘটনা এই যে ছন্দোবদ্ধ কবিতার কোন পংক্তিকে প্রায়ই ভিন্ন-ভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে পড়া যেতে পারে ; এবং এ-ব্যাপারে পুরণো অর্থে ছন্দ চূড়ান্ত নয়, বিশেষত তাদের মধ্য থেকে একটির নির্বাচনে। কোনও

একটি পংক্তির সম্ভাব্য বিভিন্ন ব্যাখ্যায় প্রয়োজন নেই একই ছন্দের, যদিও তা থাকতে পারে। Chatman এর বক্তব্যের সার এই যে স্পন্দ (rhythm) যে-কোন কর্ণযুক্ত মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ (percept), কিন্তু ছন্দ (metre) ধারণা বা প্রত্যয় (concept)—"মন, ইন্দ্রিয়েরা নয়, ভাষাতাত্ত্বিক প্রপঞ্চের বৈষম্য হ্রাস করে সরল প্রভেদ রচনার কাজ সম্পাদন করে এবং প্রকৃত পক্ষে চরম ভৌত-স্বভাবের অতি-স্বতন্ত্র বস্তু সমূহের মাপ ও সমীকরণে প্রয়াস চালায়"।[৬৪] এর সরল অর্থ হ'লো এই যে ছন্দ কোন পংক্তির পঠন বা শ্রবণ রীতিকে প্রত্যক্ষভাবে ব্যাহত করে না। এতে অতিরিক্ত জ্ঞান এই হয় যে স্পন্দপুঞ্জকে অতি-বিমূর্ত কোন প্রকল্পের (scheme) সঙ্গে খাপ-খাওয়ানো যায়—এ প্রকল্প শুধুই অনুমেয়, প্রত্যক্ষীভূত নয় এবং পঠনের উপর এর কোন অভিক্রিয়া নেই। সম্প্রতি একে সমর্থন করেচেন Halle ও Keyser ঃ ছন্দ এক বিমূর্ত্তন।[৬৫] এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ "ছন্দ হচ্ছে কানের জিনিস। এক-এক জনের কান এক-এক রকম ধ্বনি পছন্দ করে। তাই আবৃত্তিভঙ্গির মধ্যে এতটা পার্থক্য ঘটে। কেউ কেউ খুব বেশি টেনেটেনে আবৃত্তি করে, আবার কেউকেউ আবৃত্তি করে খুব তাড়াতাড়ি। কানেরও একটা শিক্ষার প্রয়োজন আছে, আর আবৃত্তি করার ও অভ্যাস থাকা চাই। ছন্দের কোন অকাট্য নিয়ম নেই, একথাটা মনে রাখার দরকার। যে-ছন্দ কানকে খুশি করতে পারবে না সে-ছন্দ কেউ পড়বে না। যেখানটাতে কান খুশি হয় না সেখানটাতে ছন্দপতন হয়েছে একথাও বলা চলে।...প্রাকৃত বাংলায় যতিবিভাগ সকল সময় ঠিক কাটা কাটা সমানভাগে নয়। পাঠক এক জায়গায় মাত্রাহরণ করে আর এক যায়গায় ওজন রেখে তা পূরণ করে দিলে নালিশ চলে না। এই জন্যে একই কবিতা পাঠক আপন রুচি অনুসারে কিছু পরিমাণে ভিন্ন রকম করে পড়তে পারেন।"[৬৬]

ছন্দ যে অর্থবহ সব ছন্দোলিপির জননী এ-কথা অনেকের কাছেই অজ্ঞাত। তাই সুনীতি কুমার চটোপাধ্যায় বুঝতে পারেননি যে সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের

মুক্ত বেণীর। গঙ্গা যেথায়। মুক্তি বিতরে। রঙ্গে।
আমরা বাঙালী। বাস করি সেই। তীর্থে বরদ। বঙ্গে।
—কুহু ও কেকা ঃ "আমরা"

পঠনের রীতিতে দুই-ই হতে পারে অর্থাৎ বলবৃত্ত ও স্বনবৃত্ত। তিনি ১৯২৬ সালে একে বলেচেন 'বলবৃত্ত' আবার মত পরিবর্তন করে ১৯৭২ সালে বলেচেন 'স্বনবৃত্ত' এবং পূর্ববতী উক্তির ভুল স্বীকার করেচেন।[৬৭] এতে সায় দিয়েচেন এক প্রবীন ছান্দসিকও। "সুনীতিকুমার এর ধারণা সমগ্র কবিতাটি Stressed Metre এ রচিত আর সে-ভঙ্গিতে আবৃত্তি করেও শোনালেন।

আমি বললাম—Stress আছে বটে, কিন্তু তা কবিকর্তৃক আরোপিত। তিনি শিশির ভাদুড়ীকে দিয়ে আবৃত্তি করিয়ে সংশয় নিরসন করলেন। শিশির কুমার এটাকে আমার চেয়েও বেশি টেনে-টেনে আবৃত্তি করেছিলেন। সুনীতিকুমারের আবৃত্তি ছিল দ্রুতগতি। শিশির ভাদুড়ী বলেছিলেন এটা Stress—মূলক ছন্দ নয়। ODBL-এর তৃতীয় খণ্ডে (১৯৭২) এই ভুলটা সংশোধন করা হয়েছে।'' ৬৮ কিন্তু এ-উক্তি বিচার সহ-নয়, কেননা ছন্দটি দু'ভাবেই হতে পারে—বলবৃত্ত দ্রুত লয়ে, আর স্বনবৃত্ত ধীরলয়ে! দ্রুতলয়ে এ বলবৃত্ত, যেমন,

মুক্‌ত বেণীর। গঙ্‌গা যেথায়। মুক্‌তি বিতরে। রঙ্‌গে
আম্‌রা বাঙ্‌আলী। বাস্‌ করি সেই। বরদ তীর্‌থে। বঙ্‌গে

এখানে ঘটেচে ব্যঞ্জন বিস্ফোরণে স্বর-বিস্ফারণ এবং দুই বা ততোধিক বর্ণ উচ্চারণে এক হ'য়ে গেচে। এ যে হ'তে পারে তারি সূত্র দিয়েচেন প্রাকৃত-পৈঙ্গলকার—

জই দীহো বি অবন্নো লহু জীহা পঢ়ই হোই সোবিলহু।
বন্নো বিতুরি অপাড়িও, দোতিন্নিবি ঐকক জানেহু॥ ৬৯

অর্থাৎ জিভ যদি দীর্ঘ বর্ণকে লঘু করে পড়ে তবে এ লঘু হ'য়ে যায়। আবার দ্রুত পড়লে দুই-তিন বর্ণ এক হয়ে যায়। এখানেও হয়েচে তাই এবং সুনীতিকুমার ১৯২৬-এ দ্রুত গতিতে কবিতাটি পড়ে ছিলেন। প্রবোধ চন্দ্র সেন এই stress বা প্রচাপকে "কবি আরোপিত" বলেচেন এবং তাই একে অগ্রাহ্য করেচেন। এখানে হয়েচে তাঁর ভুল ছন্দের স্বরূপ নির্ধারণে। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ২৭ জুলাই ১৯১৮ তারিখে অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রখানি: "এই প্রচাপগুলি (stresses) নীচের পদক্ষেপের মতোই ছন্দস্পন্দজাত এবং তা শব্দাবলীর মধ্যে নেই। ছন্দে আছে হ্রস্ব-দীর্ঘ বিভাগ। দীর্ঘ বিভাগগুলি মুদ্রিত পংক্তিতে প্রকাশিত। কিন্তু এ-সব পংক্তির অন্তর্গত হ্রস্বতর (ক্ষুদ্রতর) বিভাগগুলি স্পন্দের জন্যে আরো গুরুত্বপূর্ণ। তাই এরা গানে যাকে বলে 'দণ্ড' (তাল, bar) তাই এবং তালি (beat) দিয়ে মাপা যায়—এই তালিগুলি (ঘাতগুলি) বিশেষ ছন্দের স্পন্দ অনুসারে নির্দিষ্ট পরিমাণের ধ্বনি—এককে তৈরি। এই তালিগুচ্ছ ছন্দশাস্ত্রের ভাষায় প্রচাপ নামে পরিচিত।" রবীন্দ্রনাথ আরো বলেচেন: "ছড়ার রীতি (বলবৃত্ত) এই যে, সে কিছু ধ্বনি জোগায় নিজে, কিছু আদায় করে কণ্ঠের কাছ থেকে, এদুয়ের মিলনে সে হয় পূর্ণ। প্রায়ই দেখা যায় মাত্রার ঘনতা কোথাও কম, কোথাও বেশি, আবৃত্তিকারের উপর ছন্দ মিলিয়ে নেবার বরাত দেওয়া আছে। ছন্দের নিজের মধ্যে যে ঝোঁক আছে তার

তাড়ায় কণ্ঠ আপনি প্রয়োজন মতো স্বর বাড়ায় কমায়।"[৭০] বিলম্বিত লয়ে সত্যেন্দ্রনাথের কবিতাটি হ'য়ে যায়, 'স্বনবৃত্ত' যথা

মুক্‌+ত বেণীর। গঙ্‌+গা যেথায়। মুক্‌+তি বিতরে। রঙ্‌+গে

আম্‌+রা বাঙালী। বাস করি সেই। বরদ তীর্‌+থে। বঙ্‌+গে।

এখানে উল্লেখ্য যে বলবৃত্ত ও স্বনবৃত্ত এই দুই ছন্দের মৌল পার্থক্য ধরা পড়ে ভাষার প্রকৃতিতে। প্রথমটিতে স্বর ব্যঞ্জনের শাসন মানে অর্থাৎ এখানে আছে স্বরারূঢ় ব্যঞ্জন; দ্বিতীয়টিতে ব্যঞ্জন স্বরের শাসন মানে অর্থাৎ এখানে আছে ব্যঞ্জনারূঢ় স্বর। তাই 'মুক্ত' বিলম্বিত উচ্চারণে দীর্ঘত্ব প্রাপ্ত হয়ঃ মাত্রা বেড়ে হ'য়ে ওঠে তিনের ঘরাণা! অন্যদিকে বলবৃত্তে 'মুক্ত'—এ পড়েচে খাড়া সংঘাতভার (vertical ictus weight) অর্থাৎ অক্ষরের উপর প্রচাপের (stress) হাতুড়ি ঘা (hammer stroke of stress)। ফলে হ্রস্ব-স্বরের অক্ষরও দীর্ঘ হয়েচে। তবে এ-ঘা'য়ে ঘটেচে 'স্বর বিস্ফোরণ' বা ব্যঞ্জন সংঘাত'—'মুক্ত,' হয়েচে 'মুক্‌ত' অর্থাৎ 'ক-এর 'অ' স্বর-বিস্ফোরণে উবে গেচে আর দু'টি ব্যঞ্জন—'ক্‌' ও 'ত্‌'—সংঘটিত হয়েচে সংঘাতে। এর ভেকপ্রলম্ফী (leap-frog) গতি লক্ষণীয়—ক্‌ থেকে একেবারে 'ত্‌'-এ, মধ্যেকার 'অ'কে একদম উপেক্ষা করে। কিন্তু এরি জায়গায় স্বনবৃত্তে এসেচে গজেন্দ্রগামী গতি, যথা মু+ক্‌+ত।[৭১]

বলবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত রীতির মৌল স্বরূপ না বোঝার জন্যে প্রবীন ছান্দসিকেরা মস্ত ভুল করেচেন ছন্দ নির্ণয়ে। এ সবের মূলে রয়েচে উচ্চারণ বিচলন যার কথা আগেই বলা হয়েচে। দ্বিতীয়ত, আছে চাপমান, কালমান ও স্বরমান। এ সম্বন্ধে ও বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েচে। তৃতীয়ত, এরা ব্যাপ্তিমাত্রায় প্রকাশশীল। মনে রাখতে হবে যে উচ্চার্য পরিবর্তন দু'রকমের—ব্যাপ্তিকাল ও কাঠিন্য। প্রত্যঙ্গীয় বায়ু-সচল দৃষ্টি কোণ থেকে দেখা গেচে যে বাগুৎপত্তির আছে তিনটি উপাদান—উদ্বোধন; উচ্চারণ; ও স্বনন। প্রথম দু'টি ভিত্তিস্থানীয়, আর তৃতীয়টি এদের কাছাকাছি। প্রথমের পরিবর্তন হ'লো প্রচাপ (stress); দ্বিতীয়ের প্রমাপ বা মাত্রা (quantity); ও তৃতীয়ের প্রস্বর (pitch বা tone)। আর এই তিনটি নিয়েই বাঙলায় তিনটি ছন্দ গড়ে উঠেচে। ধ্বনিতাত্ত্বিক এই জ্ঞানের অভাবে রচিত রয়েচে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য "গবেষণা পরিষদের" "বাংলা ছন্দ সমীক্ষা"। ফলে যেসব ছান্দসিক এ সংকলনের অংশভাগ তাঁরা কেউই ধ্বনিতাত্ত্বিক জ্ঞানে প্রবীন নন এবং এরি অনিবার্য পরিণাম এই ভুলের ফসল। বৈজ্ঞানিক তথ্য সমৃদ্ধ না হ'য়ে এ পর্যবসিত হয়েচে ব্যক্তিগত মতামতেঃ "রাজ্যহীন সিংহাসনে অত্যুক্তির রাজা,

বিধাতার সাজা।" গবেষণা তাই শোকান্তিকায় পাড়ি জমিয়েচে। দু'একটি উদ্ধৃতি এর পরিচায়ক যেমন, বলা হয়েচে (১) "অক্ষরবৃত্ত (স্বরবৃত্ত) বা দলবৃত্তের (বলবৃত্ত) তুলনায় মাত্রাবৃত্তেই (স্বনবৃত্ত) টান বা তান থাকে অনেক বেশি"; (২) "কোন বিশেষ ছন্দোরীতি শ্বাসাঘাত প্রধান (বলবৃত্ত) বলে চিহ্নিত হ'তে পারে না" (৩) "accent কোন বাংলা ছন্দেরই মূলনীতি নয়"[১২] এবং আরো অনেক। এসব উক্তি অজ্ঞতা—প্রসূত এবং পূর্ব্ববর্তী আলোচনায় তা প্রমাণিত হয়েচে।

তৃতীয় অধ্যায় ঃ শ্রুতি বিজ্ঞান

একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুই জনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেকজন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে তবে সে মর্মর ফুটে।

—রবীন্দ্রনাথ[১]

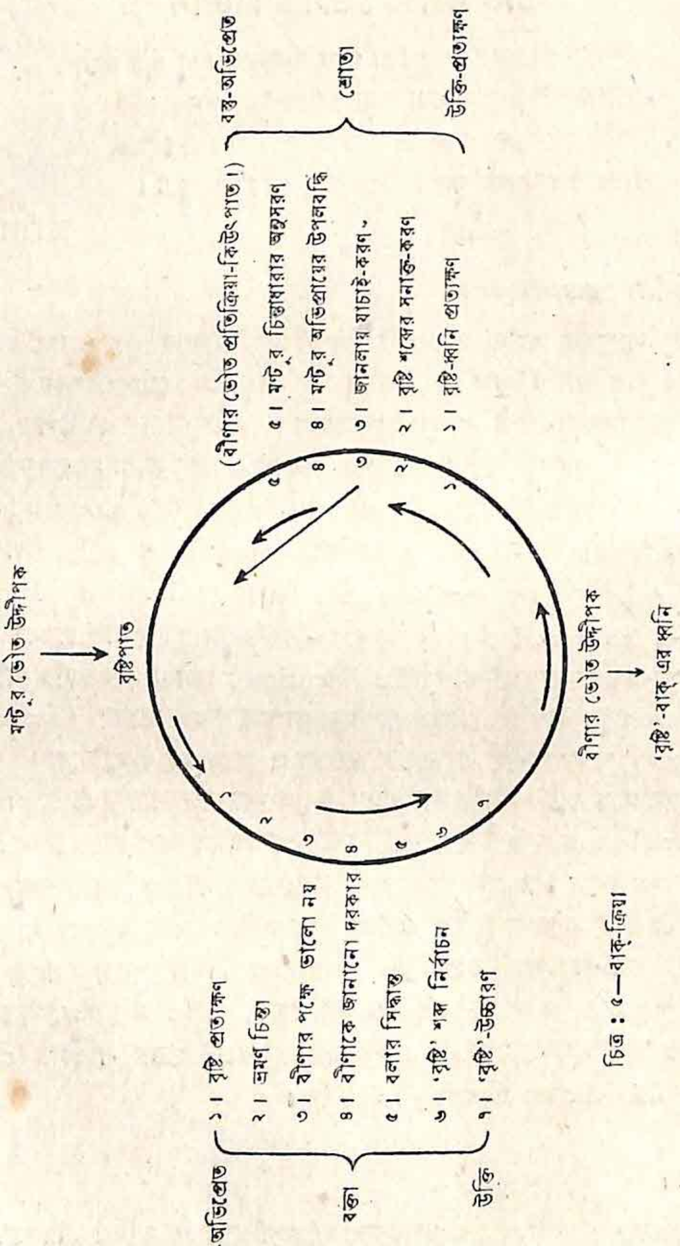
৩.১ ধ্বনির প্রেক্ষাপট

বাক্ শুধুমাত্র ধ্বনি ও অর্থের দ্বিপাক্ষিক ব্যাপার নয়; বরং এ একটি চতুর্ভুর্জ, যার চারটি ভুজ বা উপাদান হ'লো বক্তা, শ্রোতা, শব্দ ও বস্তু। ভাষা হ'লো বিজ্ঞান আর বাক্ তার প্রয়োগ। এবং ভাষার একক শব্দ, যেমন বাক্-এর একক বাক্য। অধিকাংশ সভ্য ভাষায়ই বাক্ ভাষা হতে পৃথকীকৃত হয়েচে। লাতিনে তাই আছে lingua ও sermo, গ্রীকে glossa ও logos, ফরাসীতে langue ও parole, জার্মাণিতে sprache ও rede, ওলন্দাজে taal ও rede, সুইডিশে sprak ও tal, আরবীতে lisan ও kalam এবং মিশরীয়-এ 'ro ও mudet'। বাক্ বাক্য-নির্ভর আর এই বাক্যরূপের আছে দু'টি রকম-একটি শব্দপায়ী বাক্‌রীতি (locution), অন্যটি স্বরভঙ্গীয় বাগ্মিতা (elocution)। জার্মান লেখকেরা বলে থাকেন "বাক্যতান" (sentence-melody)। শুধু বাক্যই নয়, একক শব্দের ও আছে এই বাগ্মীরূপ। বাক্-পরিবৃত্তিতে গড়ে ওঠে বাক্যীয় স্বরভঙ্গি। বস্তুত স্বরভঙ্গি শোনার চেয়ে আড়িপাতার (overhearing) জিনিস। তাই ফিনল্যাণ্ডবাসীরা বলে থাকে যে সুইডেন-বাসীরা কথা বলার সময় গান করে, আর সুইডেনবাসীরাও ফিনল্যাণ্ডবাসীদের বিরুদ্ধে ঐ একই অভিযোগ করে থাকে। স্বরভঙ্গির সহচরবৃন্দ হ'লো হাতের অঙ্গভঙ্গি, মৌখিক দ্যোতনা প্রভৃতি। স্বরভঙ্গির একটি প্রধান ব্যবহার হ'লো প্রচাপ (stress)—এ যুক্তি-নিষ্ঠ বিধেয়ের সূচক, যতিও স্বরভঙ্গির অন্তর্গত। এ ছাড়াও অন্যান্য সহচর হলো হাস্য, দাঁতের সঙ্গে জিভের শীৎকার (click), গলা-খাঁকারি (throat-clearing) ইত্যাদি।

বাক্‌ক্রিয়া

বাকক্রিয়ার প্রয়োগ পদ্ধতি উদাহরণে পরিস্ফুট হবে। মণ্টু ও তাঁর স্ত্রী বীণা পাঠাগারে পাঠ-নিরত আছেন। এক সময়ে মণ্টু টের পেলেন যে জানলা শার্শিতে

অবিরাম আঘাত হচ্চে এবং একে তিনি সনাক্ত করলেন বৃষ্টিপাতের শব্দের সঙ্গে।



চিত্র : ৫—বাক্-ক্রিয়া

বৃষ্টিপ্রত্যক্ষণে তাঁর মনে পড়লো যে তিনি ও তাঁর স্ত্রী ঠিক করেছিলেন যে তাঁরা দু'জনে নদীর ধারে যাবেন চা-পানের জন্যে যদি আবহাওয়া অনুকূল থাকে। আরেকবার দৃষ্টিপাত এ—মণ্টু নিঃসন্দেহ হলেন যে এ-বৃষ্টিতে বাইরে যাওয়া যাবে না, কেননা বীণার ভিজা পায়ে বসা ঠিক হবে না। মণ্টু তাই বীণার দৃষ্টি এ-দিকে আকর্ষণ করলেন হঠাৎ 'বৃষ্টি' উচ্চারণ করে।

এ শুনে বীণা তাকিয়ে দেখলেন যে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্চে এবং জবাব দিলেন: 'কি উৎপাত!' এখানকার বাক্‌ক্রিয়ার ঘটনা শ্রেণী পাঁচটি স্তরে বিন্যস্ত এবং এতে দু'টি নটের ভূমিকা ও নিছক বাহ্য ঘটনা একান্তর (alternate) অর্থাৎ প্রথমের পরে দ্বিতীয় এ-ভাবে অবস্থিত। পাঁচটিস্তর এরূপ—(১) বৃষ্টিপাত; (২) বক্তার প্রতিক্রিয়া; (৩) ভৌত ঘটনারূপে বাগ্‌ধ্বনি; (৪) শ্রোতার প্রতিক্রিয়া; ও (৫) জানলায় দৃষ্টিপাতে বৃষ্টির সত্যতা যাচাই—করণ (verification)। ৫—সংখ্যক চিত্রে এ দেখান হ'লো—মণ্টু বৃষ্টি সম্পর্কে বীণাকে বলচেন এবং বীণার প্রতিক্রিয়া।[২]

সংনমন ও তনুভবন

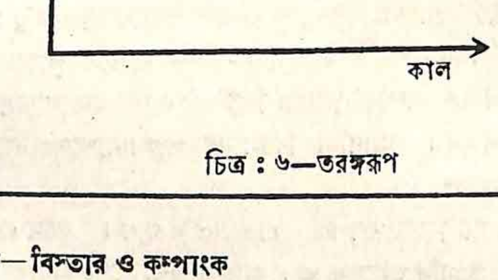
বাক্‌-ধ্বনির বাহন বায়ু—জল বা কাচের মতো এর অন্যবাহনও হ'তে পারে। বায়ু গ্যাসের মিশ্রণ; আর গ্যাসের একটি ধর্ম এই যে এ সংনমিত (compressed) বা তনুভূত (rarefied) হতে পারে। অর্থাৎ আণবিক উপাদান-গুলিকে পরস্পরের কাছাকাছি করা অথবা এককে অন্য থেকে সরান যেতে পারে: 'তদ্দূরে তদ্বন্তিকে'।[৩] কণ্ঠ প্রত্যঙ্গের চালনায় আমরা মুখের নিকটস্থ বায়বীয় অণুর স্থানচ্যুতি ঘটাই। এরা অনুরূপভাবে অন্যদের স্থানচ্যুত করে এবং এ-ভাবে শৃঙ্খল বিক্রিয়ায় (chain reaction) স্থানচ্যুতি ঘটতে থাকে যে পর্যন্ত না কণ্ঠপ্রত্যঙ্গীয় শক্তি বক্তা থেকে নিঃশেষিত হয়ে যায়। একটি অণু আরেকটির সঙ্গে সংঘর্ষে প্রারম্ভ বিন্দুতে ও তার পিছনে প্রতিক্ষিপ্ত (rebound) হয় এবং নিশ্চল না হওয়া পর্যন্ত এ এদিক-ওদিক দুলতে থাকে। যে-ধ্বনি আমরা শুনি তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েচে স্থিতিকেন্দ্রিক অনুগুচ্ছের লাক্ষণিক দোলন বা স্পন্দের সংগে। আণবিক বিচলনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে তৈরি হয় শ্রৌত ধ্বনিবিজ্ঞান।[৪]

বায়ুর আছে একটি স্থিতিস্থাপক (elastic) গুণ। ফলে এর অনুগুচ্ছ যেমন অবনমিত হয়, তেমনি তনুভূত ও। আর এ-দশা দু'টি একান্তর এবং একটি ধ্বনি-উৎস থেকে বিকিরিত হয়ে গড়ে তোলে ধ্বনিতরঙ্গ। এর গতি প্রায় ১১৩০ ফুট প্রতি সেকেণ্ডে বা ৭৭০ মাইল ঘণ্টা প্রতি—সাগরাংকে (seal evel) ও

৭০°F-এ। মনে রাখতে হবে যে ধ্বনি-উৎস থেকে এই বেগে বিকিরত (radiated) হয় তরঙ্গ বিক্ষোভ, কিন্তু বায়ু-মাধ্যম নয়। বায়ুবীয় অণুগুচ্ছ স্প্রিং-এর কুণ্ডলীর মতোই কেবলি দুলতে থাকে আগু-পিছু তরঙ্গগতির ফলন হিসেবে। দোলন (oscillation) ও স্পন্দনের (vibration) মধ্যে আছে পার্থক্য। দোলনের বিশেষ রূপই স্পন্দন। দোলনের ধর্ম এই যে কণা তার স্থিতি-অবস্থান থেকে যতদূরে স'রে যাবে তত বেশি দরকার হবে তাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে প্রত্যানয়ক (restoring) বলের। কিন্তু স্পন্দনে প্রত্যানয়িক বল কণার স্থিতি-অবস্থান থেকে দূরত্বের ঠিক-ঠিক আনুপাতিক। আর স্পন্দশক্তি বিস্তার (amplitude) বর্গের আনুপাতিক।[৫]

তরঙ্গরূপ

বিচলন যদি উল্লম্ব অক্ষ হয় এবং কাল অনুভূমিক অক্ষ, তবে তরঙ্গাকৃতি আঁকা যেতে পারে। একটি চলমান কণার সঙ্গে যদি একটি কলমকে যুক্ত ক'রে চলন্ত ঢাক—সংশ্লিষ্ট একখণ্ড কাগজের উপর লিখতে বাধ্য করা হয় তাহলে কাগজের উপর বক্র-সদৃশ একটি অনুরেখ পাওয়া যাবে। বক্রের এই রূপকে বলে তরঙ্গরূপ। এ হ'লো ধ্বনিতরঙ্গ বর্ণনার ভিত্তি। এই তরঙ্গরূপ (চিত্র ঃ ৬ দ্রঃ) দোলন লিখ্ (Oscillograph)-এ প্রদর্শিত ধ্বনি তরঙ্গের মতোই।



চিত্র ঃ ৬—তরঙ্গরূপ

দ্বিধা বিচলন—বিস্তার ও কম্পাংক

বিচলন পরিবৃত্তি দু'রকমে ঘটতে পারে—বলকেন্দ্রিক ও কালকেন্দ্রিক। প্রবল ধাক্কায় কণা স্থিতিস্থান থেকে সরে যাবে অনেকটা দূরে, কিন্তু মৃদু ধাক্কায়

ততটা নয়, যেমন শিশুর দোলনা। স্থিতিস্থান থেকে চরম বিচলনকে বলা হয় কম্প-বিস্তার (amplitude)। স্থিতিস্থান থেকে একদিকে চরম বা গরিষ্ঠ বিস্তারের পরে অন্যদিকে চরম বিস্তার এবং তার পরে স্থিতিস্থানে ফিরে আসাকে বলে একটি 'চক্কর, cycle, চক্র।' দ্বিতীয় বিচলন কালশায়ী—বিস্তার বাদে চক্কর সম্পূর্ণ হ'তে পারে কালের হ্রস্বতায় বা দীর্ঘতায় এবং কাল দৈর্ঘ্যকে বলে পর্যায় কাল (period)।

প্রতি সেকেণ্ডের পর্যায়সংখ্যা (cps) কম্পাংক (frequency) নামে পরিচিত। একে মাপা হয় Hertz অর্থাৎ cps-এ—এতে বুঝায় এক সেকেণ্ড কালে ভিত্তি তরঙ্গের পূর্ণ পুনরাবৃত্তি সংখ্যা—সংনমন ও তনুভবন। তাই নিম্নকম্পী (low frequency) তরঙ্গের আছে সেকেণ্ড প্রতি নিম্ন সংখ্যক চক্কর, যেমন উচ্চকম্পী (high frequency) তরঙ্গের উচ্চসংখ্যক চক্কর। অন্যদিকে গরিষ্ঠ স্থানচ্যুতির অনুরূপ হলো ধ্বনি তরঙ্গের বিস্তার। বিস্তার যত বেশি, তত বেশি হবে X-Y সন্ততিতে নিরূপিত তরঙ্গের খাদ ও চূড়ার দূরত্ব।

তরঙ্গ দৈর্ঘ্য

ধ্বনির অবিরাম বেগের (speed) জন্যে তরঙ্গাকৃতি অধিকতর সংনমিত হয়। আকৃতি ও কম্পাঙ্ক পরিবৃত্তি বর্ণনার একটি পদ্ধতি হলো এদেরকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের (wavelength) পরিভাষার প্রকাশ করা। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হ'লো একটি তরঙ্গের একটি বিন্দু থেকে পরবর্তী তরঙ্গের ঐ একই বিন্দু পর্যন্ত যে রৈখিক দূরত্ব তাই। যেমন, আমরা যদি ১০০০ চক্করের ধ্বনি শুনি, তাহ'লে তরঙ্গ মালার সাধারণ বিন্দু সমূহের মধ্যবর্তী দৈর্ঘ্য হবে প্রায় ১৪ ইঞ্চি; অথবা ১০০ চক্করের ধ্বনির তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হবে মোটামুটি ১১·৩ ফুট। কাজেই তরঙ্গ দৈর্ঘ্য (wavel ength, L), কম্পাংক (frequency, F) ও ধ্বনি বেগের (velocity, V) পারস্পরিক সম্পর্ক হবে এরূপ ঃ

$$L=\frac{V}{F}\ ;\ F=\frac{V}{L};\ \ V=F\cdot L\ \cdots\cdots\ (13)$$

অর্থাৎ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য বাড়লে, কম্পাংক কমে যাবে; আবার কম্পাংক বাড়লে তরঙ্গদৈর্ঘ্য কমবে।

ধ্বনির তীক্ষ্ণতা ও চাপ

ধ্বনি হ'লো শক্তির (energy) একটি রূপ, যা ক্ষমতা (power) মাপনের সঙ্গে খাপ খায়। ধ্বনি তরঙ্গের সমকোণে প্রতি বর্গক্ষেত্রের ক্ষমতার

যে পারগমন (transmission) ঘটে তাকেই বলে স্বন-তীক্ষ্ণতা (intensity)। আর তীক্ষ্ণতার মাপনী একক হলো বর্গ সেন্টিমিটার প্রতি ওয়াট বা watts (power) per square centimeter (area)। কেবলমাত্র শ্রাব্যধ্বনির তীক্ষ্ণতা হবে মোটামুটি—$১০^{-১৬}$ watts per sq. centimeter। ধ্বনি চাপ মাপা হয় প্রতি একক ক্ষেত্রের বল (force)-এ, অর্থাৎ প্রতি বর্গ সেন্টি-মিটারের dynes (force)-এ। এর পরিমাণ দাঁড়ায় স্থূলভাবে ·০০০২ dynes per sq. cm। তবে মাপের কাজে এসব একক অসুবিধাজনক বলে ব্যবহৃত হয় ডেসিবেল মাপনী (decibel scale,db)। তীক্ষ্ণতা নির্দেশস্তর (reference level) $১০^{-১৬}$ এবং চাপ নির্দেশস্তর ·০০০২। এখানে স্বনতীক্ষ্ণতা তীক্ষ্ণতা—অনুপাতের সাধারণ লগারিদমের দশগুণ; আর ধ্বনি-চাপ চাপ—অনুপাতের সাধারণ লগারিদমের বিশগুণ। মনে রাখতে হবে যে সাধারণ লগারিদম হ'লো সেই ক্ষমতা, যেখানে ১০ নিধানীয় সংখ্যাকে তুলতে হয় একটি নির্দিষ্ট সংখ্যাকে পেতে হলে। যেমন ১০০ এর সাধারণ লগারিদম হলো ২ বা $১০^{২}$,১,০০০ এর ৩ বা $১০^{৩}$। তাই সংলাপী বাক্ ৬০ db তীক্ষ্ণতা চাপের মাপে।

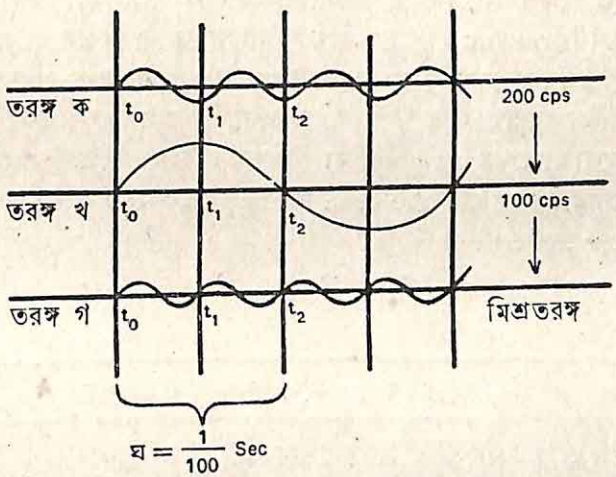
তীক্ষ্ণতা অনুপাতে দেখা যায় যে নির্দেশস্তরে আছে $১০^{-১৬}$ watts per cm^2; কিন্তু প্রকৃত তীক্ষ্ণতা (actual intensity) হ'লো এর চেয়ে ১,০০০, ০০০ বা $১০^{৬}$ গুণ বেশি। আর এই অণুপাতের সাধারণ লগারিদ্‌ম হলো ৬ এবং এর দশগুণে পাওয়া যাবে ৬০ db। অনুরূপভাবে ধ্বনিচাপ অনুপাতে নির্দেশস্তর হলো ·০০০২ dynes per cm^2 আর প্রকৃত চাপ (actual pressure) হ'লো এর চেয়ে ১০০০ ধা $১০^{৩}$ গুণ বেশি। এদের অনুপাতের সাধারণ লগারিদ্‌ম হলো ৩। ফলে এর ২০ গুণে হবে ৬০ db। কম্পাংক ও তীক্ষ্ণতা হ'লো ধ্বনির ভৌত লক্ষণ; কিন্তু এদের মনস্তাতাত্ত্বিক বা মন্ময় অনুবন্ধী (psychological correlates) ও আছে, যার নাম বিশুদ্ধ সুর (tone)। বিশুদ্ধ সুর ও অধিকাংশ ধ্বনি পরিবৃত্তিই কম্পাংক ও বিস্তারের মন্ময় অনুবন্ধী। কম্পাংক পরিবৃত্তি পরিলক্ষিত হয় ধ্বনি প্রস্বর (pitch) পরিবৃত্তিতে; আর বিস্তার পরিবৃত্তি (তীক্ষ্ণতা বা চাপ) প্রাবল্য (loudness) পরিবৃত্তিতে। এই অনুবন্ধীগুলি—প্রস্বর ও প্রাবল্য—সরল ধ্বনি তরঙ্গ বা বিশুদ্ধ সুর পরিবেশনে অত্যন্ত যথাযথ (exact)।[৬]

৩.২ পর্যাবৃত্ত ধ্বনি

প্রায় সব ধ্বনি-ই সরল তরঙ্গের মিশ্রণ। এই মিশ্রণাবলী বা জটিল তরঙ্গ-

মালাকে বলে পর্যাবৃত্ত (periodic) যখন তারা তরঙ্গ রূপের এমন সমবায়ে গড়ে ওঠে যে বারবার তাদের পুনরাবৃত্তি ঘটে। বস্তুত সব পর্যাবৃত্ত ধ্বনিকেই সরল ধ্বনি তরঙ্গের সমবায় বা যোগফল বলা যেতে পারে এবং প্রথমটি শেষেরটির উপাদানে তৈরি। বাগ্ধ্বনিতে এই পর্যাবৃত্ত তরঙ্গ দেখা যায়, যেমন স্বর, তরল (ল্, র্), শ্রুতি (য়, ব্) ও নাসিক্য (ম্, ন্) ধ্বনি বা অনুনাদী (sonorant) বাগ্ধ্বনি। তাই যে সব ধ্বনির পর্যাবৃত্ত কাল প্রতি চক্রে একই থাকে তাকেই বলে পর্যাবৃত্ত ধ্বনি। এর বৈশিষ্ট্য নিচে দেয়া হ'লো।

মূল কম্পাংক



চিত্র : ৭—সরল তরঙ্গ সমবায় (ক+খ=গ)

জটিল পর্যাবৃত্ততরঙ্গ আবৃত্ত (recurring) তরঙ্গ রূপের অংশ হিসেবে দেখা যায় বলে আমরা বলি যে জটিল তরঙ্গের কম্পাঙ্ক আর আবর্তক তরঙ্গ-রূপের অংশবিশেষের কম্পাংক অভেদ। এ রকম কম্পাঙ্কই জটিল তরঙ্গের মূল কম্পাংক বলে পরিচিত। ৭-সংখ্যক চিত্রে এ দেখান হ'য়েচে—

ক ও খ তরঙ্গ দুটির প্রারম্ভ হচ্ছে t_0 তে। t_1—তে তরঙ্গ ক প্রথম চক্কর শেষ করেচে, কিন্তু তরঙ্গ খ শুধুমাত্র আধা চক্কর। t_2-তে তরঙ্গ ক দ্বিতীয় চক্কর ও শেষ করেচে, কিন্তু তরঙ্গ খ কেবলমাত্র প্রথম চক্কর। এ-ভাবে

চলেচে। আমরা দেখতে পাই যে লব্ধ (resultant) তরঙ্গ গ-এর ঘ-অংশ তৈরি হতে সময় লাগে $\frac{১}{১০০}$ sec। জটিল তরঙ্গের প্রতিটি সরল তরঙ্গাবয়ব জানা থাক্‌লে, মূল কম্পাংক নির্ধারণ করা যায় সরল তরঙ্গ উপাদানের কম্পাঙ্ক গুলির গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়কে (গ, সা, গু)। যেমন বর্তমান ক্ষেত্রে ক তরঙ্গ ও খ তরঙ্গের কম্পাংক যথাক্রমে ২০০ cps ও ১০০ cps। কাজেই গ তরঙ্গের কম্পাংক হবে এদের গ, সা, গু অর্থাৎ ১০০ cps।

সুরগুণিতক

সরল তরঙ্গাবয়বের যে কোন সংখ্যায় গড়ে উঠতে পারে জটিল তরঙ্গ। আর পর্যাবৃত্ত জটিল তরঙ্গের প্রত্যেকটি উপাদানকে বলা হয় সুরগুণিতক বা উপসুর (harmonic)। ১—সংখ্যক সারণীতে এ দেখান হলো। সঘোষ বাক্‌ধ্বনিতে উপসুরগুলি কম্পাংকের উপর সমভাবে বিন্যস্ত সরলতরঙ্গ। আর লব্ধ জটিল তরঙ্গের মূল কম্পাংক হলো নিম্নতমতরঙ্গের কম্পাংকের সমান এবং একেই বলা হয় প্রথম harmonic বা উপসুর। যথা মূল কম্পাংক ১২০ cps হলে, প্রথম উপসুর হবে ১২০ cps ; দ্বিতীয় উপসুর ২৪০ cps ; তৃতীয় উপসুর ৩৬০ cps প্রভৃতি।

সারণী ঃ ১—মূল কম্পাংক ও উপসুর

মিশ্রধ্বনি	উপসুর				মূল
	ক	খ	গ	ঘ	
i	500	700	1000	1400	100 cps
ii	400	600	1200	1400	200 cps
iii	300	900	1500	1800	300 cps
iv	300	900	1500	1700	100 cps

তরঙ্গ—পর্যাবৃত্ত ও অপর্যাবৃত্ত

যে-সব ধ্বনির পর্যাবৃত্ত কাল চক্করের পর চক্করে একই থাকে তাকে বলা হয় 'পর্যাবৃত্ত' ধ্বনি ; আর যে-সব ধ্বনিতে অনুক্রমিক পর্যাবৃত্ত কাল বিভিন্ন তারা 'অপর্যাবৃত্ত' নামে পরিচিত। পর্যাবৃত্ত ধ্বনিতে আছে প্রস্বরের সুস্পষ্ট সংবেদন এবং এ-প্রস্বর (pitch) স্পন্দনের কম্পাংকের সঙ্গে সম্পর্কিত অর্থাৎ কম্পাংক উচ্চতর হলে, প্রস্বরও হবে উচ্চতর। কিন্তু সব পর্যাবৃত্ত ধ্বনির নেই কম্পনের এই সরল ও সুচারু (elegant) অর্থাৎ সাইনবক্রীয় (sinusoidal) রূপ। স্পষ্টত সাইন-বক্রীয় নয় এরূপ ঃ কিন্তু তবুও বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে একে বিশ্লেষণ করা যায় সাইনবক্রীয় দু'টি রূপের যোগফল হিসেবে। এ-কাজ করা হয় অনুভূমিক অক্ষের সমান কালান্তরে বিভিন্ন বিস্তারের মাপনে এবং স্থিতি-অবস্থানের একই দিকে থাকলে বিস্তারমানের যোগে ও বিপরীত দিকে থাকলে একটি থেকে অন্যটির বিয়োগে আর পরে যুক্ত মানের অংকনে (plotting)। এখানে উল্লেখ্য যে পর্যাবৃত্ত রূপ যত বেশি জটিল অর্থাৎ সাইনবক্রীয় রেখার বিসদৃশ হবে, তত বেশি প্রয়োজন হবে সাইনবক্রীয় উপাদানের। তবে পর্যাবৃত্ত হলে এ সর্বদাই সম্ভব। বাক্-এর পর্যাবৃত্ত ধ্বনি অবশ্য জটিলতর। জটিল পর্যাবৃত্ত ধ্বনির সাইনবক্রীয় উপাদানগুলি ঐ ধ্বনির সুরগুণিতক বা উপসুর (harmonics) নামে পরিচিত। মূল কম্পাংক বা মূলই নিম্নতম সুরগুণিতক। সর্বদাই এর সরল গুণিতকগুলি হ'লো উচ্চতর সুরগুণিতক। যদি ১০০, ২০০, ৪০০, ও ৬০০ cps এ গড়ে ওঠে জটিল তরঙ্গরূপ, তবে মূল হবে ১০০ cps এবং অন্যান্য উপাদানগুলি হবে দ্বিতীয়, চতুর্থ, ও ষষ্ঠ সুরগুণিতক। দুটি স্বতন্ত্র ধ্বনির একই মূল কম্পাংক থাক্‌তে পারে, যেমন একই স্বর (note) উৎসারিয়ে ওঠে বেহালা (violin) ও পিয়ানোয়। তবে এদের পার্থক্য সূচিত হয় গুণ-এর (quality) তারতম্যে—বেহালাগুণ ও পিয়ানোগুণ ধ্বনির সুরগুণিতক গড়নের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। পিয়ানো স্বরের জটিল তরঙ্গ গড়ে ওঠে বেহালার চেয়ে ভিন্নতর ও উচ্চতর সুরগুণিতকে। কাজেই পর্যাবৃত্ত ধ্বনি নির্দেশিত হয় মূল কম্পাংক ও বিস্তার এবং সুরগুণিতক (যদি থাকে) এর বর্ণনায়।

অপর্যাবৃত্ত ধ্বনি ছাঁচের (pattern) পুনরাবৃত্তি ঘটে না, যেমন দেখা যায় পর্যাবৃত্ত ধ্বনিতে। তবে অপর্যাবৃত্ত ধ্বনি তার বর্ণালি (spectrum)—ভাষায় ব্যক্ত হতে পারে। এ পরিচ্ছিন্ন (tidy) সুরগুণিক গড়ন নয় অর্থাৎ প্রত্যেকটি সুরগুণিতক মূলের সরল গুণিতক হয় না। অপর্যাবৃত্ত ধ্বনিতে নেই কোন মূল, কোন সুরগুণিতক ; পক্ষান্তরে অপস্বর (noise) চলেছে

প্রত্যেক কম্পাংককে এবং তাই এতে আমরা প্রত্যক্ষ কর্তে পারি না কোন সুস্পষ্ট প্রস্বর। কাজেই অপর্যাবৃত্ত ধ্বনির বর্ণালি বিভিন্ন সুরগুণিতকের কম্পাংক ও বিস্তার প্রদর্শক উল্লম্ব রেখার শ্রেণী নয়—এ হলো একটি সন্তত (continuous) রেখা, যাতে বিধৃত হয় প্রতি কম্পাংকের বিস্তার। যদিও সকল কম্পাংকই বর্তমান, তবুও কোন কম্পাংক অঞ্চলের বিস্তার অন্যের তুলনায় অধিকতর। আর একটি থেকে আরেকটি অপর্যাবৃত্ত ধ্বনির পৃথকীকরণে কম্পাংক সীমার উপরে বিস্তার-রূপের এই বিভেদই সহায়ক।[৭] এর উদাহরণ হলো জ, স, ড, ট, ভ, ফ, ব, প।

৩.৩ অনুনাদ

বাগ্‌ধ্বনি হলো জটিল তরঙ্গ এবং তার শ্রৌত (acoustic) লক্ষণ (যথা, স্বর, তরল, শ্রুতি ও নাসিক্যধ্বনি)—এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে সুরগুণিতক ছাঁচ। শ্রৌত ছাঁচ অবশ্য কোটরের (enclosure) দ্বারা পরিবর্তিত হয়, যেমন মৌখিক, গলবিলীয় (কণ্ঠ্য) ও নাসিক্য বিবর। বাগ্‌ধ্বনির বর্ণালি ছাঁচের ব্যাখ্যা এইসব বিবরের অনুনাদী লক্ষণেই হ'তে পারে। এক দেহ থেকে অন্যদেহে স্পন্দ সঞ্চারিত হতে পারে এবং কখনো-কখনো বর্দ্ধিত বিস্তারে। বেহালার তারকে যন্ত্রদেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি স্পন্দশীল করা যায়, তবে স্পন্দ হবে দুর্বল। আবার যদি দেহের সংস্পর্শে স্পন্দ সঞ্চারিত হয় তবে লব্ধি বিস্তার অনেকটা বেড়ে যাবে। দেহ থেকে দেহান্তরে স্পন্দের এই সঞ্চারণকে বলা হয় 'অনুনাদ' এবং যে-দেহে স্পন্দ সঞ্চারিত হয় তা **অনুনাদক** (resonator) বলে পরিচিত। এখানে বেহালা দেহ অনুনাদক। প্রত্যেক অনুনাদকের আছে একটি স্বাভাবিক অনুনাদী কম্পাংক (resonant frequency) অর্থাৎ একটি বিশেষ কম্পাংক যাতে এ সাড়া দেয়। ১০০ cps-এ স্পন্দমান একটি স্বনশূল (tuning fork) দ্বিতীয় শূলকে অনুনাদশীল করবে, যদি দ্বিতীয়টির থেকে স্বাভাবিক কম্পাংক ১০০ cps বা তার কাছাকাছি। অনুনাদকেরা তাদের স্বাভাবিক কম্পাংকের কাছাকাছি কম্পাংকে সাড়া দেয় এবং তাদের লক্ষণ এই যে স্পন্দ গড়ে উঠতে ও শেষ হতে কিছুটা সময় লাগে। অনুনাদকেরা এ কাজ চট্‌পট্‌ কর্তে পারে, যেমন বেহালাদেহ অনুনাদশীল হয় যতক্ষণ তারের উপরে ছড় (bow) টানা হয়। কিন্তু অনুনাদ থেমে যায় ছড়-টানা থামার সঙ্গে সঙ্গে। এ-রকম অনুনাদকদের বলে অবমন্দিত (damped) এবং তাদের লক্ষণ এই যে তারা বহিঃস্থ কম্পাংকের বিস্তীর্ণতর পাল্লায় সাড়া দেয়। তাই স্বর উঁচু বা নিচু যাই হোক না কেন বেহালাদেহ সাড়া দেবেই।

তরঙ্গের প্রতিফলন

ধরা যাক ধ্বনিতরঙ্গের কম্পমান কণাগুচ্ছ একটি দৃঢ় দেয়ালে আঘাত হান্‌চে আর দেয়ালও সমান জোরে বিপরীত দিকে। এর তাৎপর্য এই যে বায়ু যদি দেয়ালের সন্নিকটে পর্যাবৃত্ত শাব্দবিক্ষোভের অধীন হয়, তাহলে বায়ুচাপ পর্যাবৃত্ত ক্রমে পরিবর্তিত হ'তে থাকবে। তাই এ হবে বায়ুচাপযুক্ত—বারিক্ত তরঙ্গ সংনমনে যুক্ত আর তনুভবনে রিক্ত। দেয়ালে উৎপন্ন তরঙ্গ গতিকে বলা হয় প্রতিফলিত তরঙ্গ (reflected wave)। দেয়াল যদি নলের বন্ধ প্রান্তে অবস্থিত হয় এবং ধ্বনি-উৎস মুক্তপ্রান্তে থাকে, তবে উদ্বোধক (originating) ও প্রতিফলিত (reflected) তরঙ্গের ঘটে ব্যতিকরণ (interference)। দু'টি সমান হ'লে ঘটবে বিলোপন (cancellation), আর বিলোপন সূত্রটি হবে এরূপ ঃ নল দৈর্ঘ্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের ১/২, ১, ১১/২, ২, ২১/২ ইত্যাদি গুণ হলে, ঘটবে বিলোপন। পক্ষান্তরে নলের একপ্রান্ত বন্ধ থাকলে প্রতিফলিত তরঙ্গ উদ্বোধক তরঙ্গকে বলবত্তর (reinforced) কর্তে পারে। আর প্রবলন (reinforcement) —এর সূত্রটি হবে এরূপ ঃ প্রবলন ঘটবে যদি নল দৈর্ঘ্য তরঙ্গদৈর্ঘ্যের ১/৪, ৩/৪, ১১/৪, ১৩/৪ ইত্যাদি গুণ হয়।

অনুনাদ লক্ষণ

এবার অনুনাদ লক্ষণের কথা। এ নীচে দেয়া হলো—

(১) **ধরন**—l-দৈর্ঘ্যের একটি নল L তরঙ্গদৈর্ঘ্যের যে-কোন স্বরকে প্রবলিত কর্বে, যদি l হয় L এর ১/৪, ৩/৪, ৫/৪ ইত্যাদি গুণ। প্রায়ই 'ধরন' (mode) শব্দটি ব্যবহৃত হয় নল-জাতীয় অনুনাদ তরঙ্গের দ্বারা প্রবলিত কম্পাংকপুঞ্জ বুঝাতে। যে কম্পাংকের তরঙ্গদৈর্ঘ্য একপ্রান্ত বন্ধ নল দৈর্ঘ্যের চারগুণ তাকে বলে প্রথম ধরন (first mode) ; কম্পাংকের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নল দৈর্ঘ্যের চার-তৃতীয়াংশ হলে সে হবে দ্বিতীয় ধরন ; ইত্যাদি। বাতিল কম্পাংক পুঞ্জের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য নলদৈর্ঘ্যের দ্বিগুণ হবে ; অনুরূপভাবে আরো। অনেক সময় এগুলিকে বলা হয় অনুনাদ-বিরোধী (anti-resonance)।

(২) **পাত ও বলয়**—প্রথম ধরনে একটি বিন্দু আছে, যেখানে মৌলিক ও প্রতিফলিত তরঙ্গ পরস্পরকে বাতিল করে দেয়ালে এবং অন্য একটি বিন্দু যেখানে দু'টি তরঙ্গ সর্বদাই একটি আরেকটিকে প্রবলিত করে মুক্তপ্রান্তে। বিলোপন বিন্দুকে বলা হয় 'পাত' (node) আর প্রবলন বিন্দুকে 'বলয়' (loop).

(৩) **প্রস্বরাবয়ব**—অনুনাদকের উৎপাদ (output)—অর্থাৎ যে রীতিতে এ বাহিঃস্থ স্পন্দনে সাড়া দিয়ে নিজে স্পন্দশীল হয়ে ওঠে—প্রসম্ভার (input)

অর্থাৎ অনুনাদ-সৃজনী স্পন্দের তুলনায় স্বকীয় লক্ষণের দ্বারাই অধিকতর নির্ধারিত হয়। তাই প্রসম্ভার একই বিস্তারের বহুল সংখ্যক কম্পাংকে তৈরি হ'লেও উৎপাদ ঠিক থাকবে, কেননা অনুনাদী কম্পাংক থেকে যতই দূরে কম্পাংকগুচ্ছ সরে যাবে, ততই কম শক্তিতে অনুনাদকের প্রতিক্রিয়া হবে। গরিষ্ঠ বিস্তার থেকে যদি অনুনাদকের উৎপাদ বিস্তার খুব নিচু মানের হয়, তবে অনুনাদক-জাত ধ্বনিতে বিস্তার গুলির অবদান অতি সামান্যই হবে। প্রথামতো (conventionally) দেখা যায় যে অনুনাদক-জাত উৎপাদ নিষ্ক্রিয় হবে যদি এ গরিষ্ঠের অর্দ্ধেকেরও কম শক্তিশালী হয়। যদি ক-এ কম্পাংক ৭৫ cps, এবং খ-এ ১২৫ cps হয়, তবে কখ-রেখার উপরিস্হিত অনুনাদ বক্রাংশের কম্পাংক পাল্লা হবে ৫০ cps ; আর একেই বলে ব্যাণ্ডের প্রসার (bandwidth)। কাজেই অনুনাদকের অভিক্রিয়া নির্দেশিত হয় এর অনুনাদী কম্পাংক (১০০ cps) ও ব্যাণ্ডের প্রসারে। এর কারণ এই যে ৭৫ ও ১২৫ cps এর মধ্যে অনুনাদক যে-সব কম্পাংক পাঠায় তারা সক্রিয় অবদান যোগায় ধ্বনিতে আর এখানে গরিষ্ঠ হলো ১০০ cps। যে-সব উৎপাদে প্রবলন দেখা যায় তারা কম্পাংকপটি (band of frequency) তাদের অন্তর্ভুক্ত করে। এই প্রবলিত কম্পাংক ব্যাণ্ডগুলিকে বলা হয় প্রস্বরাবয়ব (formants)। প্রস্বরাবয়ব তৈরি হয় যখন অনুনাদী কম্পাংক ও তার নিকটস্হ কম্পাংকগুলি বলবত্তর করে নলের অনুনাদ গুণাবলী। যেমন sit এর i-উচ্চারণে যে শক্তিব্যাঙ্ক (bank of energy) আছে, তাকেই বলা হয় প্রস্বরাবয়ব। এরা সংখ্যিত হয় নিচের থেকে উপরে: F_1 (প্রস্বরাবয়ব ১) কেন্দ্রিত হয় ৫০০ cps-এ ; F_2 ১৭৮০ cps-এ ; এবং F_3 ২৫০০ cps-এ

(৪) **বাক্‌-এর নালিক অনুনাদ**—স্বর তার কম্পাংকেই পরিচিত। প্রত্যেক-স্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে জিভ, হনু, ওষ্ঠাধর ও কোমল তালুর এক অদ্বিতীয় আকৃতি-বিন্যাস (configuration) ; আর এ কণ্ঠাঞ্চলীয় কম্পাংকের ধরন নির্ধারণ করে। প্রস্বরাবয়বীয় কম্পাংকগুচ্ছই স্বর-নির্ধারক। অবশ্য কণ্ঠাঞ্চল যথাযথ বদ্ধ-প্রান্ত ঋজু দেয়াল নল নয়। তাহলেও এতে কিছু আসে যায় না [৮]

তাই শ্রুতির পরিভাষায় ধ্বনিবর্ণনায় নিচের উপাদানগুলি বিবেচ্য :

(ক) প্রস্বরাবয়বের গড়ন (formant structure)

এহ'লো বিভিন্ন কম্পাকের সুসংজ্ঞিত ব্যান্ডে শক্তির সমাহরণ (concentration) আর F_1, F_2 ও F_3-এর আছে বিশেষ গুরুত্ব। প্রস্বরাবয়ব নির্দেশিত হয় কম্পাংক ও আপেক্ষিক তীক্ষ্ণতায়।

(খ) অপস্বর উপাদান (noise component)

এহ'লো কম্পাংক পাল্লার মধ্যে শক্তির সন্তত বন্টন। এ নির্দেশিত হয় কার্যকর কম্পাংক পাল্লা, চূড়া-সমেত তীক্ষ্ণতার সাধারণস্তর এবং বিশেষ কম্পাংক জাত তীক্ষ্ণতার দ্রুতি (speed)-তে।

(গ) অবস্থান্তর (transition)

প্রস্বরাবয়ব কম্পাংকের লাক্ষণিক পরিবর্তন। এরি সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে কণ্ঠ বিবরে আকৃতি পরিবর্তন ও, যখন এক থেকে অন্য আকৃতি বিন্যাসে রূপান্তর ঘটে। এরা নির্দেশিত হয়—

(১) সংক্রমণের আদি ও অন্ত্য কম্পাংকে ;

(২) সংক্রমণের আদি ও অন্ত্য তীক্ষ্ণতায় ; ও

(৩) সংক্রমন ব্যাপ্তিতে, যার অতর্ভুক্ত আছে F_1, F_2, F_3-এর ভেদদর্শী ব্যাপ্তিও।

৩৪ বাক্‌স্বর ও স্বরমেল

আগেই বলা হয়েচে যে বাগ্‌ধ্বনির তিনটি স্তর আছে—উৎপাদন ; প্রেরণ ; ও গ্রহণ। গোটা ধ্বনির বর্ণনায় এই ত্রিস্তরীয় তথ্যের প্রয়োজন। বর্তমান আঙ্গিক নির্ভর করে উচ্চার্য নির্ণায়ক (articulatory criterion) বা শ্রৌত বিচার (auditory judgment) অথবা দু'য়ের সমবায়ের উপর। তাই ব্যঞ্জন বর্ণিত হয় উচ্চারণ-নিকষে এবং স্বরধ্বনিতে আছে শ্রৌত ধারণার প্রাধান্য। 'স্বর' ও 'ব্যঞ্জন' প্রচলিত আছে বহু শতাব্দী ধ'রে। ধ্বনিতাত্ত্বিক ও ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণে এদের প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি হয়। এর কারণ, ধ্বনি বিজ্ঞান মূর্ত ও মাপযোগ্য উপাদান নির্ভর ; কিন্তু ভাষাতত্ত্ব এই উপাদান-নিঃসৃত বিমূর্তণশায়ী। পূর্বে এই পার্থক্য ছিলনা এবং উভয়েই ছিল ভাষাতাত্ত্বিক স্তরে সঞ্চরণশীল। ফলে স্বরের ছিল কেন্দ্রীয় আক্ষরিক বৃত্তি আর ব্যঞ্জন অক্ষরে প্রান্তীয়। কিন্তু ধ্বনিবিজ্ঞানে দু'য়ের পার্থক্য সূচিত হয় কুঞ্চনে (stricture)। অর্থাৎ স্বর-উচ্চারণে কন্ঠাঞ্চলে থাকে না কোন সংবার বা সংকীর্ণণ যা মুখ দিয়ে বায়ুস্রোত নির্গমনে বাধা দেয় অথবা শ্রাব্য ঘর্ষণ (audible friction) সৃষ্টি করে ; এ-ছাড়া অন্যান্য ধ্বনিপুঞ্জ ব্যঞ্জন নামে অভিহিত। তাই ভাষাতাত্ত্বিক স্তরে স্বর ও ব্যঞ্জন ব্যবহৃত হ'তে পারে ; এবং ধ্বনি বিজ্ঞানে অন্য পরিভাষা। এ-কাজ করেচেন K. L. Pike —তিনি স্বর ও ব্যঞ্জনের জায়গায় ব্যবহার করেচেন vocoid ও concoid, যার বাঙ্‌লা প্রতিশব্দ হ'লো বাক্‌ স্বর ও স্বরমেল।[৯] কাজেই ব্যবহারিক ধ্বনি

বিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে অধিকাংশ ধ্বনিপুঞ্জকে দু'য়ের একটিতে বা অন্যটিতে শ্রেণীবদ্ধ করা যেতে পারে অর্থাৎ বাক্‌স্বর ও স্বরমেলে। স্পর্শ ও বিচলন নির্ভর উচ্চারণের পরিভাষায় বর্ণনীয় যে-সব ধ্বনি কণ্ঠতন্ত্রীয় স্পন্দন (স্বর) ব্যতিরেকে বা তার সঙ্গে উৎপন্ন হয় এবং একটি অপস্বর (noise) উপাদান থাকে তাদের বলে স্বরমেল অর্থাৎ প্রচলিত ব্যঞ্জনজাতীয়। পক্ষান্তরে যে-সব ধ্বনি জিভ অবস্থানের ঈষৎ পরিবৃত্তি-নির্ভর এবং শ্রৌত-সম্পর্কে প্রকাশশীল, কেননা এতে নেই স্পর্শ বা কুঞ্চনের অনুভূতি, তাদের বলে বাক্‌স্বর অর্থাৎ প্রচলিত স্বরজাতীয়। সাধারণত এরা সঘোষ তবে অপস্বর মুক্ত এবং স্বরাবয়বের লাক্ষণিক ছাঁচে ঢালা।[১০] এখানের উল্লেখ্য যে ব্যঞ্জন স্পর্শজ ও পেশীয় সংবেদনে গ্রাহ্য ; আর স্বর শ্রৌতধর্মী।

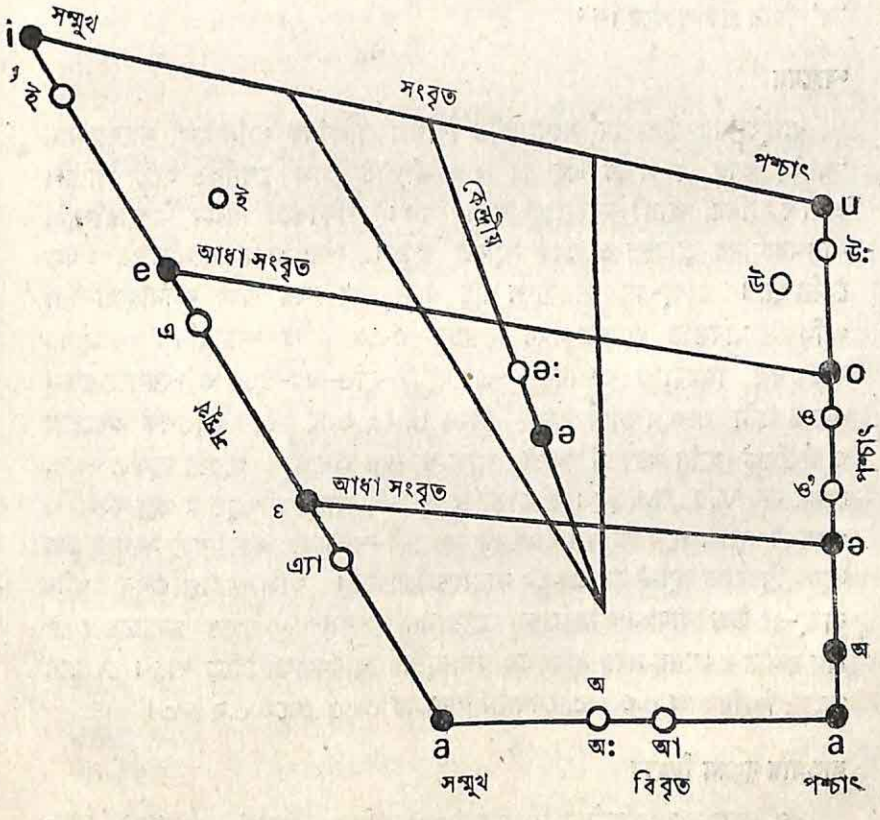
মৌল স্বর

স্বরযন্ত্রের (larynx) উপরিস্থ মুক্ত পথের আকৃতির উপর নির্ভর করে স্বরের লাক্ষণিক গুণাবলী। এই পথই তৈরি করে অনুনাদ প্রকোষ্ঠ, যাতে পরিবর্তিত হয় কণ্ঠতন্ত্রী স্পন্দন-জাত ধ্বনিগুণ (tamber)। পথের বিভিন্ন আকৃতি ভিন্ন-ভিন্নভাবে ধ্বনিগুণের পরিবর্তন ঘটায় এবং স্বতন্ত্র স্বরধ্বনি সৃষ্টি করে। পথাকৃতির পরিবর্তন ঘটায় জিভ্ ও ওষ্ঠাধর। ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজনে স্বর শ্রেণী বিন্যস্ত হয় জিভের অবস্থান অনুসারে। কতকস্বরের আছে স্পষ্ট ও সুসংজ্ঞিত গুণ ; অন্যান্যরা অস্পস্ট ধ্বনি। আর এই শেষোক্তরা তৈরি হয় জিভের মধ্যবর্তী স্বর-অবস্থানে অর্থাৎ জিভ-সম্মুখে বা পাশ্চাতে প্রকট-ভাবে উত্তোলিত হয় না এবং মুখাভ্যন্তরে অত্যন্ত নিচুও নয়। মধ্যবর্ত্তী অবস্থানে সৃষ্ট হয় উদাসীন (neutral) স্বর, যার ধ্বনিক প্রতীক হলো 'এ্যা' ∂ অর্থাৎ about এর a-ধ্বনি। মৌল স্বরের জিভ-অবস্থান উদাসীন অবস্থান হতে দূরে থাকে। স্বভাবী (normal) স্বরধ্বনি উচ্চারণে জিভের সম্মুখ বা পশ্চাৎ বা কেন্দ্র (সম্মুখের পশ্চাদ্ভাগ ও পশ্চাতের অগ্রভাগ) হ'য়ে ওঠে উচ্চতম। জিভ তালুর (palate) সন্নিকটে উন্নীত হতে পারে যেমন beat (সম্মুখ), about (কেন্দ্র) ও boot (পশ্চাৎ)-এ। আবার তালু থেকে দূরে যেমন bat (সম্মুখ), but (কেন্দ্র) ও calm (পশ্চাৎ)-এ। এ-ছাড়া এ মধ্যবর্তী উচ্চতায় থাকতে পারে, যেমন bet (সম্মুখ), learn (কেন্দ্র) ও brought (পশ্চাৎ)-এ। কাজেই একটি দ্বিমাত্রিক পরিকল্প দেখা যায় অর্থাৎ স্বরের জিভ-অবস্থান শ্রেণীবিন্যস্ত হতে পারে ভূগোলের দ্রাঘিমা ও অক্ষাংশের সূত্রে। এই শ্রেণীবিন্যাস ঘটে (১) উন্নীত জিভের উচ্চতা ও (২) তার উচ্চতম অংশ

অনুসারে। এখানে তাই লক্ষণীয় সংবৃত (close), বিবৃত (open) ও মধ্যস্থ (intermediate) যথা—

	সম্মুখ	কেন্দ্রীয়	পশ্চাৎ
সংবৃত	beat	about	boot
মধ্যস্থ	bet	learn	brought
বিবৃত	bat	but	calm

জিভের উচ্চতা অনুসারে চারিটি শ্রেণী পাওয়া যায়—সংবৃত ; বিবৃত ; আধা-সংবৃত ; আধা-বিবৃত ; ও বিবৃত। এদের মধ্যে প্রথম ও চতুর্থটি জিভের উচ্চতম ও নিম্নতম অবস্থান। দ্বিতীয়টি অবস্থিত সংবৃত ও বিবৃত-এর মধ্যকার দূরত্বের এক-তৃতীয়াংশে এবং তৃতীয়টি এর দুই-তৃতীয়াংশে। ৮-সংখ্যকচিত্রে এরা যথাক্রমে i-u, e-o, ϵ-ɘ, a-α রেখায় অবস্থিত। আবার উত্তোলিত



চিত্র : ৮—মৌল স্বর চতুর্ভুজ

জিভের অংশ অনুযায়ী তিনটি শ্রেণী পাওয়া যায়—সম্মুখ ; পশ্চাৎ ; ও কেন্দ্রীয়। শেষেরটি ত্রিভুজাকৃতির নির্দেশ দেয়। আর প্রথমটি i-a ও দ্বিতীয়টি a-u রেখায় অবস্থিত। চিত্র ৮-এ এই স্বরচতুর্ভুজ দেখান হ'লো। বাঙলা মৌল স্বরধ্বনি ৮-সংখ্যক চিত্রে পাওয়া যাবে। 'ই' ধ্বনিটি i: ও i এর মাঝামাঝি যেমন 'চিল'-এ ; 'এ' ইংরেজি bed-এর মতো 'যেমন 'তেল-এ ; 'এ্যা' ইংরাজী cat এর মতো যথা 'খেলা'। 'আ' ʌ ও a: এর মাঝামাঝি, যেমন 'মাঠ' এ ; 'অ' ইংরেজি hot এর কাছাকাছি ; 'ও' o-র মতো, যেমন 'গোল'-এ ; আর 'উ' u. ও u এর মাঝামাঝি যেমন 'টুল'-এ। তাই বাঙলায় আছে ৭টি সরল স্বর i:, e, ae, a̅, ɔ, ȯ, u̇-অর্থাৎ ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও, উ। দুটি ক্ষেত্রে ইংরেজি ও বাঙলা ধ্বনি এক-এ (e) ও এ্যা (ae)-তে। বাঙালী বক্তা ইংরেজি চারটি ধ্বনিকে অর্থাৎ a:, ʌ, ə:, ə কে 'অ' দিয়ে প্রকাশ করে।[১১]

স্বরমেল

বাগ্‌ধ্বনির উপাদান সংখ্যাতীত বিভিন্ন লাক্ষণিক ধ্বনিপুঞ্জ, যাদের নাম 'স্বর' ; আর এ লক্ষণ এই যে এ অনির্দিষ্ট কাল পোষিত হতে পারে। অর্থাৎ ধ্বনির স্থায়ী অবস্থাকে বলে স্বর। পক্ষান্তরে ব্যঞ্জন অস্থায়ীধ্বনি যা স্বরধ্বনির প্রারম্ভ ও শেষ সূচিত করে। স্বর ও ব্যঞ্জন সমবায়ে অক্ষর তৈরি হয়। বাক্‌-এর অধিকাংশ শক্তি বহন করে স্বর এবং ধ্বনিবিজ্ঞানীরা পৃথিবীর যাবতীয় ভাষায় লক্ষ্য করেচেন ৭০-এর উপর স্বরধ্বনি। ব্যঞ্জনের কারক দন্ত, জিহ্বা ও ওষ্ঠাধর।—এর দু'টি বৃত্তি-স্বর-সূচক ও স্বরসংহারক। কতকে ধ্বনি সম্পূর্ণভাবে বন্ধ, যেমন B, D, ও K কতকে আংশিক অবরোধ ও অবশিষ্ট ধ্বনি পরবর্তী স্বরের আভাস দেয় অনুরূপ গুণের দুর্বল স্বরে, যেমন F, V, L, M, N। এ-ছাড়া R ও S-এ আছে তীক্ষ্ণতার ক্ষুদ্রপতন ও পরবর্তী স্বরের পূর্বাভাস। ব্যঞ্জনের অস্থায়ী স্বভাবের জন্যে বহু সংখ্যক উচ্চ সুরগুণিতকের সৃষ্টি হয় উচ্চতর স্বরাংশ হিসেবে। ফলে পর্যাপ্ত জনন অর্থাৎ বাক্‌-এর উচ্চ বোধগম্যতার জন্যে প্রয়োজন কম্পাংক ব্যাণ্ডের প্রসারের।[১২] এক কথায় ব্যঞ্জনের সযত্ন ব্যবহারে কথ্যধ্বনির বোধগম্যতা বেড়ে যায়। যেখানে স্বরের স্থিতিকাল ০.৩ sec, সেখানে ব্যঞ্জনের ০.০৫ থেকে ০.২ sec।

বাঙলায় ব্যঞ্জন বিহার

বর্ণবিন্যাসে স্পর্শধ্বনির (occlusives) তালিকা এরূপ—অল্পপ্রাণ ; মহাপ্রাণ ; ও নাসিক্য। প্রথমটি দ্বিধাবিভক্ত—অঘোষ, যথা—ক, চ, ট, ত, প ;

ঘোষ, যথা—গ, জ, ড, দ, ব। দ্বিতীয়টিও ঐরূপ—খ, ছ, ঠ, থ, ফ অঘোষ ; ঘ, ঝ, ঢ, ধ, ভ ঘোষ। নাসিক্য ধ্বনি হলো ঙ, ঞ, ণ, ন, ম। মুখের বহিঃস্থ বায়ুচাপ অনুরেখে দেখা গেচে যে ব্যঞ্জন বিভাজন ও স্বর স্পন্দনের মাঝখানে আছে অঘোষ দশা। উক্তির দ্রুতিতে এই দশা ও গোটা অক্ষরটি অনেকটা হ্রাস পেলেও অঘোষ দশা চলতে থাকে। এর আয়ুষ্কাল .০৪ ও .০৮ sec এর মধ্যে পরিবর্তিত হয়। ওষ্ঠ্য মহাপ্রাণে দ্রুতির সঙ্গে-সঙ্গে ব্যঞ্জন সংবার দুর্বলতর হ'তে থাকে আর স্বরের আকৃতি হ'য়ে যায় টাকুর মতো। স্পন্দ-মান গোষ্ঠীতে 'প'-এ অঘোষ দশা নেই, ব্যঞ্জন সংবার স্থায়ী এবং স্বরের আকৃতি শংকুর মতো। 'ব'-এর পৌণঃপুনিকতায় অক্ষরের স্থিতিকাল ·২৮ sec। তবে 'ব', 'ভ'-এর সঙ্গে পুণরাবৃত্ত হলে ব্যঞ্জন বিভাজন ও স্বরের মাঝখানে আসে স্পন্দদশা—সজোরে উচ্চারিত হ'লে এ হ'য়ে ওঠে অংশত অঘোষ ও স্পন্দশীল। স্বরযন্ত্রী স্পন্দন অক্ষর দৈর্ঘ্যের চেয়ে একটু বেশি হয়। 'দ' ও 'ধ' সম্পর্কেও ঐ একই কথা।

ঘোষ ও অঘোষের পার্থক্য ধরা পড়ে মুখের অন্তঃস্থ চাপ এবং স্বরযন্ত্র ও গলবিলের বিচলনীয় অভিলেখে। ঘোষ উচ্চারণে ঘটে স্বরযন্ত্র ও গলবিলের নিম্নগামী বিচলন এবং ব্যঞ্জন বিভাজনের আগে বা সঙ্গে ঊর্ধ্বগামী বিচলন শুরু হয়। এরি জন্যে ব্যঞ্জন বিভাজনের আগেই আসে স্পন্দন, যা ঘোষ ধ্বনির বৈশিষ্ট্য, যেমন, গ, দ, ব। লক্ষণীয় যে অঘোষ মহাপ্রাণ বা অল্পপ্রাণে নেই এ নিম্নগামী বিচলন। বস্তুত মহাপ্রাণ ও অল্পপ্রাণের পার্থক্য ভারিক্কি অক্ষর-স্পন্দ-নির্ভর নয়, যদিও মহাপ্রাণ ধ্বনিতে এ বর্তমান। এ নির্ভর করে ব্যঞ্জন বিভাজন ও অক্ষর স্পন্দের সহসম্পর্কের উপর। অঘোষ অল্পপ্রাণে ব্যঞ্জন বিভাজন ও আক্ষরিক বায়ুচাপ গরিষ্ঠতা মিলে যায়, কিন্তু অঘোষ মহাপ্রাণে আক্ষরিক গরিষ্ঠতা ব্যঞ্জন বিভাজনের বহু পরে ঘটে এবং তাই অঘোষ দশা এসে পড়ে ও এ ·০৮ sec স্থায়ী হয় কখনো কখনো। এখানে স্মর্তব্য যে দু'শ্রেণীর পেশী নিয়ন্ত্রণ করে স্বরযন্ত্রের উল্লম্ব বিচলন—অতি ও অব u-আকৃতি (hyoid) পেশীপুঞ্জ। অতি u-আকৃতি পেশীর সংকোচনে স্বরযন্ত্রীয় u-আকৃতি একটি, ঊর্ধ্বে উত্থিত হয় এবং অব-u-আকৃতি পেশীর সংকোচনে এ নিম্নগামী হয়। ঘোষ স্পর্শধ্বনির উচ্চারণে অব-u-আকৃতি পেশীপুঞ্জ সক্রিয় হয়। স্পর্শ ধ্বনি ছাড়াও আছে অন্যান্য ধ্বনি। এদের মধ্যে 'য়' ও 'ব' অস্থায়ী ধ্বনি। 'ঃ' অপ্রচলিত ; 'ৎ' ও 'ত' অভিন্ন যেমন 'ং' ও 'ঙ'। 'র' কম্পনজাত, 'ল' পার্শ্বিক, 'হ' কণ্ঠনালীয় আর 'শ' 'ষ' ও 'স' তালব্য, মূর্ধণ্য ও দন্তমূলীয়। চন্দ্র-বিন্দুর (ঁ) সংস্পর্শে স্বর নাসিক্য হ'য়ে যায়।[১৩]

স্বনকৌশল

ভাষায় স্বনমানের প্রয়োগ বিধি স্বনকৌশল (phonotactics) নামে খ্যাত। মনে রাখতে হবে যে বাক্‌ স্পন্দ মালায় একক কণ্ঠবিচলন শ্রেণী ; তাই এই একক বিচলনগুলোকে যে-ধ্বনিগুচ্ছ শ্রাব্য করে তারা স্পন্দ-মান ধ্বনি-ছাঁচের একক। ফলে ধ্বনির একক হ'য়ে পড়ে স্বনমান বিচলনের প্রতিরূপ। এই পরিপ্রেক্ষিতে স্বনমানের নিয়মাবলী হ'য়ে যায় অক্ষর গড়নের সূত্রাবলী। যদি V= স্বর, C=ব্যঞ্জন, j=ই, Y=য়, W= ব্‌ (ও) এবং উ হয়, তবে দেখা যায় বাঙ্‌লায় V, VC, CV, CVC, Vj, CVY এবং CVW কাঠামোর অক্ষরই বহুল প্রচলিত ; কিন্তু CVCC বা CCVCC জাতীয় অক্ষর-কাঠামো নেই। এবার বিভিন্ন কাঠামোর অক্ষর দেখানো হ'লো—(১) V—ইতি, ও ; (২) VC—আজ্‌ ও ওর ; (৩) CV—পা, দা ; (৪) CVC—কাজ্‌, চোখ ; (৫) CCV—ক্ষি, প্রমাণ ; (৬) CCCV—স্ত্রী ; (৭) CCVC—প্রাণ, ত্রাণ ; (৮) Vj—এই, ওই ; (৯) CVj—দিই, দই ; (১০) VY—আয়্‌ ; (১১) CVY—ন্যায়্‌ ; (১২) CCVY—প্রায় ; (১৩) VW—ঔষধ্‌ ; (১৪) VWC—ঔৎসুক্য ; (১৫) CVW—দাও্‌ ; (১৬) CVYV—নুয়ে ; (১৭) WV—ওয়ারিশ ; (১৮) YV—মেয়ে ; (১৯) WVW—খাওয়াও ; (২০) WVY—নেওয়ায় ; (২১) YVC—প্রয়োগ। ইংরেজির অক্ষর গড়ন (CCC) V (CCCC) জাতীয় ; রুশ ভাষায় (CCCC) V (CCCC) জাতীয় ; পার্শি-ভাষায় CV (CC) ; আর ক্যাটনীয় ভাষায় (C) V (C)। মোটামুটিভাবে (C) V হ'লো সরলতম গড়ন।[১৪]

৩.৫ শ্রুতিতত্ত্ব

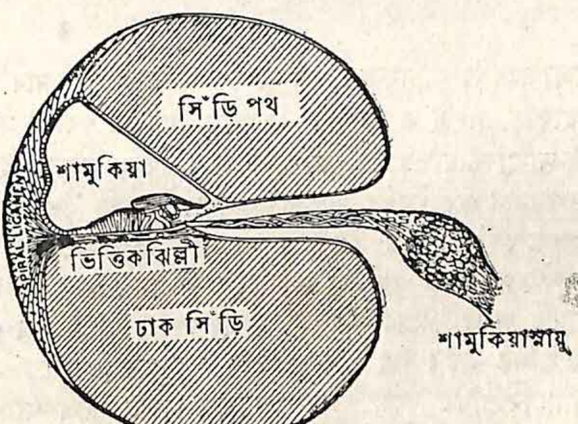
১-সংখ্যক চিত্রে দেখান হয়েচে বাগ্‌বর্তনী। প্রথম পর্বে বাগ্‌ধ্বনি জন্ম নেয় বক্তার মস্তিষ্কে এবং পরে স্নায়ু পথে পেঁছায় স্বরযন্ত্রে। দ্বিতীয় পর্বে এ রূপ নেয় ধ্বনি তরঙ্গে। তৃতীয় পর্বে এ পেঁছায় শ্রোতার কর্ণে, আর পরে স্নায়ু পথে পেঁছায় মস্তিষ্কে যেখানে বাগর্থ বেরয়। তাই তৃতীয় পর্বে কর্ণই প্রথম ভূমিকা নেয়। এর তুলনা হ'তে পারে নাদপট (soundboard) অথবা পিয়ানোর তারের সঙ্গে—পাখির আছে ৩০০০ তার, বিড়ালের ১৬,০০০, আর মানুষের ২৪,০০০ মটর কলাইয়ের চেয়েও ক্ষুদ্রায়তনে সংনমিত হ'য়ে আছে।[১৫]

কর্ণের গড়ন

মানুষী কর্ণের আছে তিনটি অংশ— বহিঃকর্ণ ; মধ্যকর্ণ ; অন্তঃকর্ণ। বহিঃকর্ণের তিনটি ভাগ—(১) কর্ণপত্রক (pinna) ; (২) শ্রুতি-নালিকা

(auditory canal) ; ও (৩) কর্ণপটহ (eardrum)। কর্ণপত্রক স্থিতিস্থাপক কোমলাস্থির ফলক। একদা মনে করা হোতো যে এ ধ্বনিতরঙ্গ সংগ্রহ করে শ্রুতি-নালিকা পথে পাঠায় কর্ণপটহে, যা ভিতরের দিকে নালিকা বন্ধ করে দেয়। অধুনা জানা গেচে যে শ্রবণ ব্যাপারে এর দান অতি সামান্যই। শ্রুতি-নালিকার দৈর্ঘ্য প্রায় ২·৫-২·৭ cm ও ব্যাস প্রায় ০·৭ cm। এর সীমা কর্ণপটহ, যা একটি অপর্যাবৃত্ত সূক্ষ্মঝিল্লী অর্থাৎ এর নেই স্বভাবী কম্পাংক। এ পেশী দ্বারা বিধৃত আছে ঈষৎ শঙ্কুর আকারে। এই পেশীর সংকোচনে কর্ণপটহের দৃঢ়তা বাড়ে এবং এতে অতিনিম্ন কম্পাংকের ধ্বনিজাত ক্ষতি থেকে এ রক্ষা পায়। নালিকায় ধ্বনিচাপের পরিবর্ত্তিতে স্পন্দমান হ'য়ে ওঠে কর্ণপটহ। সাধারণ বাক্-এর স্পন্দবিস্তার প্রায় $১০^{-৮}$ cm।

কর্ণপটহের পিছনে থাকে মধ্যকর্ণ। এ তিনখানি হাড়ের শৃঙ্খলায় গড়া একটি ক্ষুদ্র বিবর—(১) হাতুড়ি (hammer) ; (২) নেহাই (anvil) ; ও (৩) পাদানি (stirrup)। হাড়ের (ossicles) আকৃতি অনুসারেই হয়েচে এ-নামকরণ। একদিকে আছে কর্ণপটহ, অন্যদিকে ডিম্বল গবাক্ষের (oval window) ঝিল্লী, যা অন্তঃকর্ণীয় দেয়ালের অংশও। এই হাড়গুলি লিভারের (lever) কাজ করে এবং কর্ণপটহের স্পন্দকে অন্তঃকর্ণের তরলে পৌঁছে দেয়। হাড়গুলির



চিত্র : ৯—শামুকিয়ার অনুপ্রস্থছেদ

ভর যথাক্রমে ০·০২৩,০·০৫ ও ০·০৩ gm। এরা তৈরি হয় ৩ এর বলগুণন থেকে। তিনখানি হাড়ের যান্ত্রিক সুবিধা ৬০—বল পরির্ধনেও—প্রান্তীয় ঝিল্লীর পরিবর্ত্তন এবং চাপের পরিবর্ধনে গুণাংক ২০। কর্ণপটহের দুদিকে বায়ু চাপের সাম্য বজায় রাখতে মধ্যকর্ণ যুক্ত হয়েচে ইউষ্টেকিয়ান নলের (Eustachian tube) দ্বারা। এ নালী সাধারণত লয়ে থাকে; তবে গলাধঃকরণে বা জৃম্ভনে এ বিস্তারলাভ করে। তাইতো উড়োজাহাজের যাত্রীদের মাঝে-মাঝে মিষ্টি খাওয়ানো হয়।

অন্তঃকর্ণ ১½" দীর্ঘ একটি অস্থিময় নালীতে তৈরি এবং সর্পিলে (spiral) কুণ্ডলীকৃত, নাম যার শামুকিয়া (cochlea)। এ হ'লো প্রকৃত শ্রবণ প্রকোষ্ঠ এবং ভিত্তিক ঝিল্লীতে (basilar membrane) দ্বিধা বিভক্ত। দু'টি বিভাগের নাম সিঁড়ি পথ (scala vestibuli) ও ঢাক সিঁড়ি (scala tympani) এবং এরা পরস্পর যুক্ত হয়েচে শামুকিয়া শীর্ষে এক ক্ষুদ্র পথে, নাম যার সর্পিলিকা (helicotrema)'। ১¼" র ভিত্তিক ঝিল্লীর উপর দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন দৈর্ঘ্য ও টানের সহস্রাধিক ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র তন্তু। এরা ভূমি থেকে শীর্ষে দীর্ঘতর এবং মস্তিষ্কের সঙ্গে যুক্ত হয়েচে স্নায়ু মারফতে। শামুকিয়া তরলে পূর্ণ এবং এখানে তন্তুসমূহ দণ্ডায়মান। সর্পিলিকার ক্ষেত্র ০·১৫ mm^2। এর অনুপ্রস্থচ্ছেদ চিত্র ঃ ৯-এ দেখান হ'লো।[১৬]

শ্রবণক্রিয়া

কর্ণনালী প্রবেশক ধ্বনিতরঙ্গ কর্ণপটহকে সজোরে স্পন্দমান করে। এই স্পন্দপুঞ্জ হাতুড়ি, নেহাই ও পাদানি মারফতে ডিম্বল গবাক্ষে সঞ্চারিত হয়। ঝিল্লীস্পন্দে শামুকিয়ার তরলে তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। তরঙ্গ মালা সেই সব তন্তুকে অনুনাদে স্পন্দমান করে যাদের স্বভাবী কম্পাংক তরঙ্গ কম্পাংকের অনুরূপ হয়। তন্তুস্পন্দে তৈরি হয় বৈদ্যুত আবেগ (impulse), যা শ্রৌত স্নায়ু মারফতে মস্তিষ্কে চালিত হয় এবং ধ্বনিরূপে ব্যাখ্যাত হয়। Ohm বলেন ঃ "কর্ণ শুধুমাত্র সরল স্বরের সংবেদন অনুভবকরে, যখনি তা সরল সমঞ্জস দোলনে উত্তেজিত হয়। এ অন্য প্রতিটি পর্যাবৃত্ত স্পন্দকে সরল সমঞ্জস দোলন মালায় বিশ্লেষিত করে, যারা প্রত্যেকে একটি সরল স্বরের সংবেদনের অনুরূপ।"[১৭]

প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতায় কানের স্পর্শকাতরতা

কানই সম্ভবত সর্বাধিক সংবেদনশীল ধ্বনি-নিরূপক (detector)। চিত্র ঃ ২-এ দেখান হয়েচে যে তীক্ষ্ণতার একটি নিম্নতর সীমা আছে, যার নিচে ধ্বনি

র'য়ে যায় অশ্রুত এবং এর প্রাবল্য তাই শূন্যে পেঁছায়। ঐ চিত্রে তীক্ষ্নতার প্রারম্ভ মানই দেয়া হয়েচে। ১,000 cps কম্পাংকে স্বভাবী নিরীক্ষকের প্রারম্ভতীক্ষ্নতা ধরা হয় $১0^{-১৬}$ watts per sq. cm। এ হলো ক্ষুদ্রতম তীক্ষ্নতা যাতে উদ্দীপ্ত হয় ধ্বনি-সংবেদন। কান ৩,৫00 cps কম্পাংকের ধ্বনিতে সবচেয়ে বেশি স্পর্শকাতর এবং এ-কম্পাংকে আছে প্রারম্ভ-তীক্ষ্নতা $১\text{'}৫৫ \times ১0^{-১৭}$ watt, চাপবিস্তার $১\text{'}২৫ \times ১0^{-১0}$cm। এই তীক্ষ্নতা শূন্য থেকে ৩000 মাইল দূরে অবস্থিত ৫0-watt এর $১\text{'}১ \times ১0^{-৪}$ dyne per sq. cm এবং স্মরণবিস্তার বিজলীবাতি থেকে যে আলো ও তাপ পাওয়া যায় তারি সমান। 'চাপবিস্তার' সম্পর্কে স্মর্তব্য যে কানের পটহত্বক ক্ষেত্র ১ sq. cm এবং একটি মশকের ওজন $১0^{-৩}$ gm এর। এই মশকের ওজনের দশ হাজার ভাগের এক ভাগের কোন পতঙ্গ যদি পটহত্বকে ৩,৫00 বার প্রতি সেকেন্ড উপরে নিচে নাচতে থাকে তবেই আমরা ধ্বনি শুনতে পাই। আবার 'সরণ বিস্তার' অর্থাৎ স্পন্দকালে মধ্যক অবস্থান থেকে বায়ুর চরম বিহার হ'লো মাত্র ১.২৫×১0^{-১0} cm।

ধ্বনি তীক্ষ্নতা শ্রব্যতার আরেকটি সীমা বেঁধে দেয়। ধ্বনি অতি দুর্বল বা অতি তীক্ষ্ন হ'লে তা শোনা যায় না। সংবেদন তখন শ্রবণ না হ'য়ে হ'য়ে ওঠে অনুভূতি (feeling) এবং এ-সীমাকে বলে অনুভূতির প্রারম্ভ সীমা (threshold of feeling)। এই অনুভূতি—সীমায় নির্ধারিত হয় প্রাবল্য গ্রামের উচ্চতর সীমা। ১,000 cps. কম্পাক তীক্ষ্নতার অনুরূপ হবে অনুভূতির প্রারম্ভসীমা এবং এ শ্রব্যতাসীমার অনুরূপ তীক্ষ্নতার চেয়ে $১0^{১৩}$ গুণ বেশি। প্রস্বর গ্রামের মাঝখানে এবং গড়প্রাবল্যের ধ্বনির জন্যে প্রত্যক্ষযোগ্য ক্ষুদ্রতম প্রাবল্যবৃদ্ধি হবে শতকরা ১0-এর তীক্ষ্নতার সমান। এর অর্থ, এ হবে 0'৪ phon। বস্তুত এই 0'৪ phon উত্তম কান ধরতে পারে। কাজেই ১ phon হলো বিনিশ্চয়ের (discrimination) সাধারণ সীমা।[১৬]

প্রস্বর-সুবেদিতা

শ্রব্যতা সীমা প্রতিসেকেন্ডে ২0 cycles ও ২৫,000 per second। উচ্চ প্রস্বরীয় স্বরসম্পর্কে কানের সুবেদিতা বয়সের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। শুধুমাত্র তরুণেরা শুনতে পায় ২৫,000 কম্পাংকের স্বর এবং মধ্য বয়সে এই সীমা আরো নিচে নেমে যায়। প্রস্বর বিনিশ্চয় গবেষণাগারের মতো বাস্তব জীবনে ততটা ভালো নয়—নিম্নতর প্রাবল্যস্তরে এ ভালো নয়। বস্তুত ৫00 কম্পাংকের নিচে এ ততটা ভালো নয় এবং গবেষণাগারে ও ৬২ কম্পাংকে এ নেমে যায়

স্বরের এক ষষ্ঠাংশে। পক্ষান্তরে গীতল স্বরের তুলনায় বিশুদ্ধ স্বরের প্রস্বর বিভেদ ধরা সুকঠিন।[১৬]

শ্রৌত সুরগুণিতক

Helmholtz দেখিয়েচেন যে দুটি বলের কম্পাংক f_1 ও f_2 হলে যে-তন্ত্রে তারা সক্রিয় তা শুধু যে f_1 ও f_2 দেয় তাই নয়, অধিকন্তু দেয় $f_1—f_2$ অর্থাৎ এতে যোজিত স্বর (summation tone) যেমন পাওয়া যায়, তেমনি বিয়োজিত স্বর (difference tone) ও। গণিতীয় বিশ্লেষণে পাওয়া যায় অন্য স্বর ও বিশেষত $2f_1$, $2f_2$ ও f_1+f_2 কম্পাংকও। প্রথম দুটি সুরগুণিতক স্বরাংশ (harmonic partials) এবং তৃতীয়টি যোজিত স্বর। কানের যন্ত্র কৌশল (mechanism) ও এ-ভাবে কাজকরে—যখনি পর্যাপ্ত তীক্ষ্মতার বিশুদ্ধ স্বর এর উপরে পড়ে তখনি লব্ধি সংবেদন আসে সুরগুণিতক সমেত উত্তম গুণান্বিত স্বরের এ-সব শ্রৌত সুরগুণিতক (aural harmonics) পাওয়া যায় কর্ণে দু'টি জিনিসের যুগপৎ উপস্থাপনে—একটি f-কম্পাংকের প্রবল বিশুদ্ধ-স্বর; অন্যটি সমন্বয়শীল তীক্ষ্মতা ও পরিবর্তনশীল কম্পাংকের বিশুদ্ধ স্বর। শ্রৌতসুরগুণিতক বিশুদ্ধস্বরে উৎপন্ন হলে, পরিবর্তনশীল কম্পাংকের স্বরে দেবে বিস্পন্দ (beat)-এ আসবে যখন কম্পাংক হবে f এবং 2f, 3f, 4f প্রভৃতি। আবার বিস্পন্দী তোলন স্বরের তীক্ষ্মতা সমন্বয়ন করে বের করা যাবে স্বতন্ত্রতম বিস্পন্দের তীক্ষ্মতা এবং এ হবে শ্রৌত সুরগুণিতকের তীক্ষ্মতা।

দেখা গেচে যে অসমঞ্জস তন্ত্র দ্বিগুণ ভাবে প্রণোদিত হ'লে তার ফলশ্রুতি হয় যোজিত সুর। কর্ণও এরূপ একটি তন্ত্র। কাজেই কানে তৈরি হয় যোজিত সুর, যা শ্রৌত সুরগুণিতকের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে লব্ধিসংবেদনের পরিবর্তন ঘটায়। কখনো-কখনো যোজিত সুর প্রবলিত হয় কানের কাছে উপযুক্ত অদুনাদক উপস্থাপনে। এ-সব ক্ষেত্রে তারা বাইরে উৎপন্ন হয়, যন্ত্রে অথবা বায়ুতে। আবার প্রায়ই যোজিত সুর শোনা যায় অনুনাদক ব্যতিরেকে এবং অনুনাদক দিলেও প্রবলিত হয় না। এ-ক্ষেত্রে যোজিত সুর উৎপন্ন হবে কানের ভিতরে। এ-সব সুর প্রমান করেচেন Wegel ও Lane।[১৮] যদি বিশুদ্ধ সুরের কম্পাংক $f_1=1,200$, $f_2=700$ হয়, তবে $3f_1+f_2=4,300$; $2f_1+2f_2=3,800$; $3f_2+f_1=3,300$; $3f_1—f_2=2,900$; $2f_1—2f_2=1,000$; $3f_2—f_1=900$। ২৫০ কম্পাংকের বিশুদ্ধসুর অশ্রুত, তেমনি অসমঞ্জস স্বরাংশের স্বর।[১৬]

শ্রুতি সূত্র

পটহ-ত্বক ও ত্রিধাস্থিকে প্রভাবিত করে যে শ্রুতিনালী ও ভিত্তিক ঝিল্লীস্থিত শামুকিয়ার উপর দিয়ে ধ্বনির যে প্রগতি তা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু স্নায়ু শক্তিতে ধ্বনিশক্তির বাস্তব রূপান্তরণ অনুধাবণ করা ততটা সহজ নয়। এ-সম্বন্ধে তন্তুময় ভিত্তিক ঝিল্লীর দান স্মর্তব্য। একেই বলা হয় হেল্ম-হোল্‌ৎসের শ্রুতিতত্ত্ব (Helmholtz's theory of audition)। এই মতানুসারে শামুকিয়া পথে অগ্রসরমান ধ্বনিতরঙ্গ অনুনাদে উদ্দীপ্ত করে সমলিয়ত (in tune with) ভিত্তিক ঝিল্লীর বিশিষ্ট অরাংশ-কে (radial strip)। এ-ভাবে সৃষ্ট স্পন্দ সাক্ষাৎভাবে সঞ্চারিত হয় অনুরূপ কেশকোষে (hair cell) ও সর্পিল স্নায়ুতন্তুতে, যা ভিত্তিক ঝিল্লী ও কর্টির রড (rods of Corti) এর মাঝখানে পোষিত হয়।[১৯] ভিত্তিক ঝিল্লীর বিভিন্ন তন্তুপুচ্ছ স্পন্দকের কাজ করে। এখানে প্রণোদিত স্পন্দ ও অনুনাদের গণিতীয় ব্যাখ্যা দেয়া হ'লো। বাইরের কোন প্রযুক্ত বল (impressed force) না থাকলে কম্পমান বস্তুর গতিতে দু'টি বিরোধী বল দেখা দেয়—একটি বেগের আনুপাতিক প্রতিবন্ধী (retarding) বল; অন্যটি সরণের আনুপাতিক প্রত্যানয়ক (restoring) বল। যদি m = বস্তুভর, t = কাল, x = সরণ, a = প্রতিবন্ধীধ্রুবক, b = প্রত্যানয়কাংক (spring factor), c = ধ্রুবক হয়, তবে সুসমঞ্জস প্রযুক্ত বলের ক্ষেত্রে বস্তুতে সক্রিয় বলের চেহারা দাঁড়াবে এরূপ:

$$m\frac{d^2x}{dt^2} = -\ a\frac{dx}{dt} - bx + c\cos pt \cdots\cdots\cdots (14)$$

m দিয়ে ভাগ করে পদগুলির পুনর্বিন্যাস করলে সমীকরণটি হবে—

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \lambda\frac{dx}{dt} + \mu x = F\cos pt \cdots\cdots\cdots\cdots (15)$$

যেখানে $\lambda = \frac{a}{m}$, $\mu = \frac{b}{m}$, $F = \frac{c}{m}$।

যদি A = বিস্তার হয়, তবে

$$x = A\cos(pt - \phi) \cdots \quad \cdots \quad \cdots (15a)$$

$$\therefore\ A^2 = \frac{F^2}{(\mu - p^2)^2 + \lambda^2 p^2} \cdots \quad \cdots \quad \cdots (15b)$$

$$\text{ও } \tan\phi = \frac{\lambda p}{\mu - p^2} \cdots \quad \cdots \quad \cdots (15c)$$

উপরের (15b) ও (15c) থেকে A ও ϕ র মান পাওয়া যাবে। আর 15—সংখ্যক সমীকরণের সমাধান হবে—

$$x = Ce^{-ft} \operatorname{Cos}(gt - \phi) + A \operatorname{Cos}(pt - \phi) \cdots\cdots (16)$$

এখানে প্রথম পদকে Raleigh বলেচেন বস্তুর অবাধ কম্পন ঃ আর দ্বিতীয়টিকে প্রণোদিত কম্পন। এ-প্রসঙ্গে অনুনাদ (resonance) এসে পড়ে ঃ বস্তুস্পন্দের স্বাভাবিক পর্যায়কাল $= \frac{2\pi}{\sqrt{\mu}}$; আর প্রযুক্তবলের পর্যায়কাল $= \frac{2\pi}{p}$। দু'টি পর্যায়কাল সমান হ'লে $\mu = p^2 \cdots \quad \cdots \quad \cdots (16a)$

এই শর্তে বিস্তার A-এর হবে চরম মান। তাই (15)—সংখ্যক সমীকরণ থেকে পাওয়া যায় $A = \infty \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots (16b)$

যেখানে $\mu = p^2$, $\lambda = 0$। যদি অনুনাদ ঘটে এবং বস্তুস্পন্দ প্রতিহত না হয় অর্থাৎ শুধু তত্ত্বগতভাবে টেকে কিন্তু বাস্তবে নয়, তবে স্পন্দবিস্তার হবে অপরিমিতভাবে বৃহৎ।[২০]

৩.৬ স্বর ও সুর, অধিসুর ও সুরগুণিতক

বিভিন্ন প্রস্বর উপাদানে উৎপন্ন ধ্বনি জটিল এবং একে বলে স্বর (note)। আর প্রত্যেক উপাদানকে বলা হয় সুর (tone)। কাজেই একক কম্পাংকের ধ্বনি হ'লো সুর ; এবং স্বর হ'লো সুরের সমবায় এবং একাধিক কম্পাংকে তৈরি। স্বর তাই বিশ্লেষিত হয় সুর-উপাদানে। পক্ষান্তরে সুর একটি সরল বা বিশুদ্ধ ধ্বনি, যাতে থাকে একটিমাত্র ধ্বনি এবং যার বিশ্লেষণ নেই। জটিল ধ্বনি একাধিক সুর সমবায়ে গঠিত ; আর নিম্নতম কম্পাকের সুরকে বলে মূল (fundamental) বা মুখ্যসুর (prime tone) এবং উচ্চতর সুর-গুলি অধিসুর (overtone) বা উচ্চতর স্বরাংশ (upper partial tones) বলে পরিচিত। মনে রাখতে হবে যে যখন একটি একক স্বর একাধিক বিভিন্ন গীতযন্ত্রে গাওয়া হয়, তখন দক্ষ কান ধর্তে পারে যে গীতস্বরের কম্পাংকের অনুরূপ স্বর ছাড়াও অন্যান্য কম্পাংকের স্বর বর্তমান, যদিও তারা মুখ্য স্বরের তুলনায় অনেকটা কম তীক্ষ্ন। কান এ-ভাবে যে স্বরকে ভেঙে আর বিশ্লেষণ কর্তে পারে না তাকেই বলে 'সুর'। কাজেই গীতল স্বর সাধারণভাবে সুরে তৈরি আর স্বরের প্রস্বর নিম্নতম সুরের অনুরূপ।

যদি সুরের কম্পাংক n হয়, তবে যে-সব সুরের কম্পাক 2n, 3n, 4n ইত্যাদি তাদের বলা হয় সুরের সুরগুণিতক (harmonics) এবং এই সুরকে মূল (fundamental) বলে। যে-সব সুরে স্বর তৈরি হয় তারা আবশ্যিক-ভাবে নিম্নতম সুরের সুরগুণিতক নয়। ফলে পৃথক করার জন্যে তাদের

বলা হয় অধিসুর (overtone) বা মূলের উচ্চতর স্বরাংশ (upper partials)। সুরের বেলায় শব্দায়মান (sounding) বস্তুর দোলন বা বায়ুজাত তরঙ্গ হ'লো সরল সমঞ্জস দোলন (simple harmonic vibration)। এই তথ্য আবিষ্কার করেন Ohm এবং এ-থেকে নামকরণ হয়েচে সমঞ্জস দোলন। গীতল ততযন্ত্রের (stringed instrument) স্বরে যে-অধিসুর থেকে তারা সব মূল কম্পাংকের সঠিক (exact) গুণিতক (multiple)। কিন্তু সকল গীতযন্ত্রে এ-নিয়ম খাটেনা। তাই ঘণ্টির দোলনে যে স্বর উৎপন্ন হয় তাতে উচ্চতর স্বরাংশগুলি সর্বদাই মূল কম্পাংকের সঠিক গুণিতক নয়। এ-জন্যে অধিসুর বা উচ্চতর স্বরাংশ ব্যবহৃত হয় উচ্চতর স্বরাংশ বুঝাতে, তা সে সঠিক গুণিতক হোক বা নাই হোক। সঠিক গুণিতক বুঝাতে শুধুমাত্র সুরগুণিতক ব্যবহৃত হয়। কাজেই সাধারণ অধিসুর সুরগুণিতক, কিন্তু যেকোন একটি অধিসুর আবশ্যিকভাবে সুরগুণিতক নয়। যে-সব অধিসুর সুর গুণিতক নয় তাদের বলা হয় অসমঞ্জস অধিসুর (inharmonic overtone)।[২১]

গণিতের সহায়তায় বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে। বিতত তারের (stretched string) অনুপ্রস্থ কম্পনে যদি n=কম্পাংক, m=তারের ভর, λ=তরঙ্গদৈর্ঘ্য, v=বিস্তারণ (propagation) বেগ ও l=তার দৈর্ঘ্য হয়, তবে ঃ

$$v=\sqrt{\frac{T}{m}}=n\,\lambda \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (17)$$

যেখানে T=টান (tension)। অর্থাৎ

$$n=\frac{1}{\lambda}\sqrt{\frac{T}{m}} \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (17a)$$

এক, দুই, তিন ইত্যাদি ভাগে বিভক্ত হ'য়ে কম্পন হ'লে $\left(1=\frac{\lambda}{2}\right)$

তাদের চেহারা হবে এরূপ ঃ

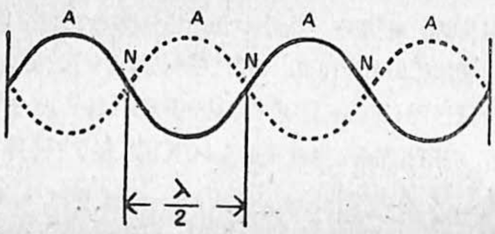
$$n_1=\frac{v}{2l}=\frac{1}{2l}\sqrt{\frac{T}{m}} \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (17b)$$

$$n_2=\frac{v}{2l/2}=2.\,\frac{1}{2l}\sqrt{\frac{T}{m}}=2n_1 \quad \cdots \quad (17c)$$

$$n_3=\frac{v}{2l/3}=3.\,\frac{1}{2l}\sqrt{\frac{T}{m}}=3n_1 \quad \cdots \quad (17d)$$

সাধারণ ভাবে $n_s=\frac{s}{2l}\sqrt{\frac{T}{m}}$ ... (17e)

এ থেকে বোঝা যায় যে তার থেকে উৎসারিয়ে উঠেচে একটি পূর্ণাঙ্গ সমঞ্জস শ্রেণী, অর্থাৎ মূল (n_1) এবং তার সুর গুণিতক। গোটা তার এককভাবে স্পন্দমান হলে পাওয়া যায় নিম্নতম সুর যাকে বলে 'মূল'। দু'টি ভাগে স্পন্দমান হলে কম্পাংক দ্বিগুণ হবে এবং অনুরূপ স্বরকে বলা হয় দ্বিতীয় সুরগুণিতক বা প্রথম অধিসুর। এ-ভাবে s-ভাগে কম্পমান হলে কম্পাংক হবে মূলের s গুণ এবং তার অনুরূপ স্বর হবে s-তম সুরগুণিতক। এখানে উল্লেখ্য যে দ্বিধা বিভক্ত স্পন্দে আছে দু'টি সুস্পন্দ বিন্দু (antinodes) ও তিনটি নিস্পন্দ বিন্দু (node)। অনুরূপভাবে তিনভাগে স্পন্দশীল তারে আছে তিনটি সুস্পন্দ ও চারটি নিস্পন্দ ইত্যাদি। সুস্পন্দ ও নিস্পন্দের চেহারা এরূপ ঃ[২২] চিত্র ঃ ১০-এ দ্রষ্টব্য।



চিত্র : ১০—সুস্পন্দ ও নিস্পন্দ

এখানে A = সুস্পন্দ ও N = নিস্পন্দ। দু'টি সুস্পন্দের মধ্যে দূরত্ব হলো $\frac{\lambda}{2}$, নিস্পন্দের মতোই; নিস্পন্দ ও পরের সুস্পন্দের দূরত্ব হবে $\frac{\lambda}{4}$।

৩.৭ বিস্পন্দ

দু'টি ধ্বনি উৎসের একই কম্পাংক থাকলে তাদের তরঙ্গ দু'টি পেঁছায় উৎস-ঘেরা লোকের কোথাও একই দশায় এবং কোথাও বা বিরোধী দশায়। প্রথম জায়গায় ধ্বনি তীক্ষ্ণতা চরম হয়, আর দ্বিতীয় স্থানে অবম। এ-ছাড়া অন্যস্থানে তীক্ষ্ণতা পায় মধ্যবর্তী মান। কালের পরিবর্তনে কোন স্থানে তীক্ষ্ণতার পরিবর্তন হবে না। কেননা, যদি কোন স্থানের এক উৎস-জাত

সংনমন অন্য উৎসজাত সম্প্রসারণের উপর পড়ে এবং নীরবতা উৎপন্ন হয়, তবে যে কোন উৎসের অর্ধেক পর্যায়কাল পরে প্রথমটির সম্প্রসারণ দ্বিতীয়টির সংনমনের উপর পড়বে একই জায়গায় এবং উৎপন্ন হবে নীরবতা। তাই উভয় উৎস নিঃসৃত তরঙ্গমালা সর্বদাই একই স্থানে বিরোধী দশায় পেঁছাবে এবং নীরবতা উৎপন্ন হবে। ফলে যখনি দু'টি উৎসের একই কম্পাংক থাকে, তখন চরম বা অবম তীক্ষ্নতার ধ্বনিগুচ্ছ সব সময় নির্দিষ্ট স্থানগুলিতে হাজির হয়।

কিন্তু ধ্বনি-উৎস দু'টির যদি থাকে ঈষৎ ভিন্ন কম্পাঙ্ক, তবে দেখা দেয় স্বতন্ত্র ঘটনা। কেননা, যে-কোন বিশেষস্থানে দু'টি উৎস-নির্গত তরঙ্গমালা এক সময়ে একই দশায় থাকবে যখন দু'টি সংনমন বা সম্প্রসারণের উপরিপাত ঘটে ; কিন্তু কালায়নে উৎসদু'টির অসমান পর্যায় কালের জন্যে, দ্রুত স্পন্দমান বস্তুটি অন্যটির চেয়ে অর্ধেক কম্পন বেশি পাবে এবং তার ফলে তরঙ্গ দুটি বিরোধী দশায় থেকে ঘটাবে পারস্পরিক ব্যতিকরণ (inter ference)। তাই যখন ধ্বনি-উৎস দু'টির থাকে স্বতন্ত্র কম্পাংক, যে-কোন স্থানে লব্ধি ধ্বনির তীক্ষ্নতা হবে চরম নির্দিষ্ট কালে আর অন্যকালে অবম। লব্ধি ধ্বনির তীক্ষ্নতার এই পর্যাবৃত্ত পরিবৃত্তিতে জন্ম নেয় বিস্পন্দ (beat)।

গণিতীয় বিশ্লেষণ

এবার গণিতের সাহায্যে বিস্পন্দের বিশ্লেষণ। দু'টি তরঙ্গের সরণ সমীকরণ এ-ভাবে স্থাপন করা যায়ঃ $x_1 = a \cos mt$; এবং $x_2 = b \cos (m+n) t$। যদি n কে m এর তুলনায় ছোট মনে করা যায়, তবে দু'টি তরঙ্গের কম্পাংক, $\frac{m}{2\pi}$ ও $\frac{m+n}{2\pi}$ প্রায় সমান। ধরা যাক লব্ধি সরণের সমীকরণঃ $x = c \cos (mt+\phi) = a \cos mt + b \cos (m+n) t$। এখন $t = \frac{\pi}{2m}$ হ'লে $\cos mt = 0$। কাজেই পাওয়া যায়ঃ

$$-c \sin \phi = -b \sin nt \quad \cdots \quad (18)$$

আবার $t = \frac{\pi}{m}$ হ'লে $\sin mt = 0$. কাজেই পাওয়া যায়—

$$c \cos \phi = a + b \cos nt \quad \cdots \quad (18\ a)$$

$$c = \sqrt{a^2 + b^2 + 2ab \cos nt} \quad \cdots \quad (18\ b)$$

এবং $$\tan \phi = \frac{b \sin nt}{a + b \cos nt} \quad \cdots \quad (18\ c)$$

(18 b) সমীকরণ থেকে জানা যায় যে লব্ধিগতির বিস্তার নিয়ত নয়, কিন্তু কালের সঙ্গে হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। বিস্তারের এই উচ্চাবচন (fluctuation) ঘটায় লব্ধি ধ্বনি তীক্ষ্ণতায় পর্যাবৃত্ত পরিবৃত্তি, যার নাম বিস্পন্দ। (18 b) থেকে পাওয়া যায় যে c-র মান চরম হবে যখন cosnt=1 হবে, অথবা nt= 0, 2π, 4π, ইত্যাদি। অর্থাৎ $t=0, \frac{2\pi}{n}, \frac{4\pi}{n}$ ইত্যাদি। তাই c-র যে কোন দু'টি ক্রমিক চরম মানের অন্তর (interval) হবে $\frac{2\pi}{n}$ c-র চরম মান= =a+b। অনুরূপভাবে c অবম হবে যদি cosnt=−1, অথবা nt= π, 3π, 5π ইত্যাদি। অর্থাৎ $t=\frac{\pi}{n}, \frac{3\pi}{n}, \frac{5\pi}{n}$ ইত্যাদি। তাই c-র যে কোন দুটি ক্রমিক অবম মানের অন্তর হবে $\frac{2\pi}{n}$। c-র অবম মান =a-b।

এ-থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে লব্ধিস্বরের বিস্তার বা তীক্ষ্ণতায় যে উচ্চারণের পর্যায়কাল আছে তা হ'লো এর দু'টি ক্রমিক চরম বা অবম মানের কালান্তর বা $\frac{2\pi}{n}$। কাজেই লব্ধি স্বরের তীক্ষ্ণতায় যে উচ্চাবচনকম্পাংক আছে তা হ'লো বিস্পন্দের কম্পাংক, যার মান $\frac{n}{2\pi}$। আবার স্বরউপাদানের কম্পাংক-বিভেদ $=\frac{m+n}{2\pi}-\frac{m}{2\pi}=\frac{n}{2\pi}$। অর্থাৎ বিস্পন্দের কম্পাংক কারক স্বর—কম্পাংকের বিয়োজন (difference)। স্বর-উপাদানের বিস্তার, সমান অর্থাৎ b=a হ'লে, লব্ধিস্বরের বিস্তার ঘটবে 0 ও 2a এর মধ্যে। দেখা যায় যে লব্ধি দোলনের কম্পাংক $\frac{m}{2\pi}$। (18c) সমীকরণ জানান দেয় যে লব্ধিগতির দশা কোণ ϕ ধ্রুব নয়, কিন্তু t—নির্ভর অর্থাৎ কালের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। বিস্পন্দী অভিক্রিয়ার কারণ এই যে নির্দিষ্ট কালন্তরালে তরঙ্গমালার দশা এক হয় এবং একে অন্যকে প্রবলিত করে ; অবার নির্দিষ্ট মধ্যবর্তী কালে তারা দশায় হয় পরস্পর বিরোধী এবং একে অন্যকে বাতিল করে। এ-থেকে বিস্পন্দকে ব্যতিচারের উদাহরণ হিসেবে গণ্য করা যায়।

বিস্পন্দ সুরবাদ

Sorge ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ও Tartini ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে অবিষ্কার করেন যে n_1 ও n_2 কম্পাংকের দু'টি সুরের উপরিপাত ঘটলে তৃতীয় আরেকটি সুর উৎপন্ন হয়, যার কম্পাংক $n_1 - n_2$। এই নতুন সুরটি 'তার্তিনী সুর' নামে পরিচিত। পরে Helmholtz-এর নাম দেন 'বিয়োজন সুর, এই কারণে যে সুরের কম্পাংকটি কারক সুরদ্বয়ের কম্পাংকের বিয়োজন। Langrange ১৭৫৮ খ্রীষ্টাব্দে ও Young ১৮০০ খ্রীস্টাব্দে ইঙ্গিত করেন যে বিয়োজন সুর ও বিস্পন্দ এক। ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে Konig দু'টি গ্লাস রডের অনুদৈর্ঘ্য দোলন থেকে এর উৎপাদন করেন। বিস্পন্দ পর্যাপ্তদ্রুতিতে ঘটলে কান তাকে নতুন সুর বলে স্বীকৃতি দেয়। একেই বলে "বিস্পন্দসুরবাদ" বা কোণিগের সিদ্ধান্ত ঃ বিস্পন্দ ও বিয়োজন সুর ভৌত ভাবে অভিন্ন। কানই তাদের মধ্যে পার্থক্য নির্ধারণ করে এবং সেকেণ্ডপ্রতি ১৬ বিস্পন্দের বেশিকে নতুন সুর বলে স্বীকার করে।

তীক্ষ্ণতাবাদ

Helmholtz গবেষণায় আবিষ্কার করেন যে বিয়োজন সুরের সঙ্গে আরেকটি সুরও পাওয়া যায়, যার কম্পাংক $n_1 + n_2$ অর্থাৎ উপাদানসুরের কম্পাংকের যোজন। একে তিনি বলেন "যোজনসুর" (summation tone)। যোজন সুর তখনি উৎপন্ন হয় যখন মুখ্য সুর হয় তীক্ষ্ম। এ থেকেই জন্ম নেয় যোজন সুরের তীক্ষ্ণতাবাদ। Helmholtz-এর অঙ্গীকারে f বলের ক্রিয়ায় স্পন্দশীল তন্ত্রের সরণ x-এর রূপ হবে $f = ax + bx^2 + cx^3 + \cdots\cdots\cdots$। ছোট-ছোট সরণে $x^2, x^3 \cdots$ হবে x-এর তুলনায় আরো ছোট। তাই পরিবর্তিত রৈখিক আকারের ঃ $f = ax$। দু'টি বলে f_1 ও f_2 এর সমীকরণ হবে ঃ

$$f_1 = ax_1 + bx_1^2 + cx_1^3 + \cdots \quad \cdots \quad \cdots (19)$$

$$f_2 = ax_2 + bx_2^2 + cx_2^3 + \cdots \quad \cdots \quad \cdots (20)$$

দু'টি বলের যুগপৎ ক্রিয়ার তন্ত্রে আসবে X সরণ ; তাই

$$f_1 + f_2 = aX + bX^2 + cX^3 + \cdots \quad \cdots \quad \cdots (20a)$$

আবার (19) ও (20) সমীকরণ থেকে

$$f_1 + f_2 = a(x_1 + x_2) + b(x_1^2 + x_2^2) + c(x_1^3 + x_2^3) + \cdots \quad \cdots \quad \cdots (20b)$$

(21) ও (22) তুলনা করলে দেখা যায় X সরণ-উপাদান x_1 ও x_2 এর যোগফলের সমান নয়।

পক্ষান্তরে উপাদান সরণ, x_1 ও x_2 ছোট হলে $x_1{}^2$, $x_1{}^3$, $x_2{}^2$, $x_2{}^3$ ইত্যাদিও ছোট হবে রৈখিক পদের তুলনায়। ফলে (19) ও (20) সমীকরণ হবে $f_1 = ax$ ও $f_2 = ax_2$। কাজেই $f_1 + f_2 = aX = a\ (x_1 + x_2)$ এবং $X = (x_1 + x_2)$। এতে প্রমাণিত হয় যে কোন তন্ত্র যদি প্রবল বলের অধীন হয় এবং বৃহত্তর সরণঘটে তবে লব্ধিসরণ উপাদান সরণের যোগফলের সমান হয়না। অর্থাৎ উপরিপাত সূত্রটি এখানে খাটেনা, কেননা এ অপ্রতিসম (asymmetrical) তন্ত্র। হেল্মহোলৎস-এর গণিতে ধরা পড়ে যে বিয়োজন সুরের তীক্ষ্ণতা যোজন সুরের চেয়ে বেশি এবং তাই এ প্রথমেই প্রত্যক্ষ হয়।

অপ্রতিসাম্যবাদ

লক্ষণীয় যে বিস্পন্দ সুরবাদ জোর দেয় মন্ময় গড়নের উপর, আর তীক্ষ্ণতা-বাদ যোজিতসুরের তন্ময় গড়নের ইঙ্গিত করে। Waetzmann-এর সাধারণ অপ্রতিসাম্যবাদ ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে দু'টির সমন্বয় সাধন করে যোজিত সুরের মন্ময়তা ব্যাখ্যা করেচে। বক্রের ফুরিয়ে বিশ্লেষণে ধরা পড়েচে মুখ্য সুর, বিয়োজন সুর ও যোজিত সুর। কানের পটহত্বক কেন্দ্রস্থলে হাড়ের জন্যে একদিকে ভারী হওয়ায় এ একটি অপ্রতিসম তন্ত্র যাতে উৎপন্ন হয় যোজিত সুর।[২৩]

বিস্পন্দচিত্র

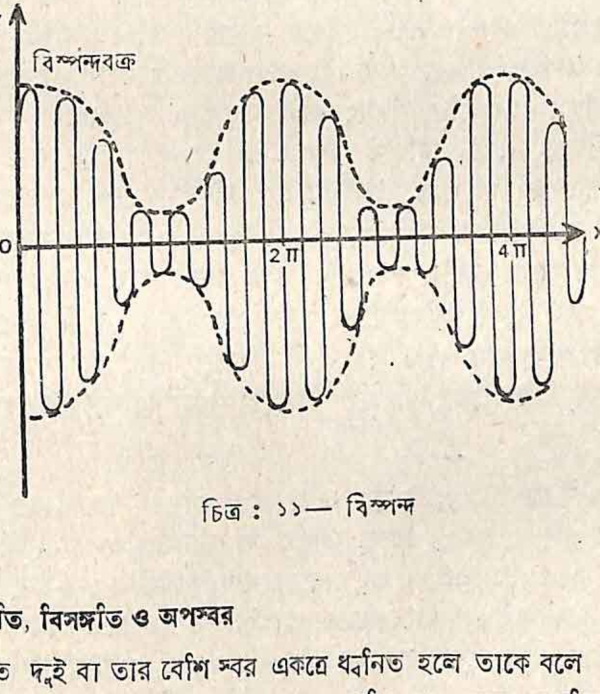
ধরা যাক দুটি দোলনের আছে একক বিস্তার, কিন্তু বিভিন্ন বৃত্তীয় কম্পাংক, w_1 ও w_2 এবং দুয়ের মান একই। তাহলে আমরা শুধু নিচের ফলনের আচরণ নিয়ে আলোচনা কর্বো:

$$Y = \sin w_1 x + \sin\ w_2 x\ (w_1 > w_2 > o)$$
$$= 2\cos\tfrac{1}{2}\ (w_1 - w_2)\ x \sin\tfrac{1}{2}(w_1 + w_2)\ x \cdots\ \cdots\ \cdots(21)$$

(ত্রিকোণমিতীয় সূত্রানুসারে)

এখানে $\frac{1}{2}\ (w_1 + w_2)$ বৃত্তীয় কম্পাংকের দোলন ও $\frac{4\pi}{(w_1 + w_2)}$ পর্যায়কাল আছে। এর বিস্তার নিয়ত নয়। পক্ষান্তরে বিস্তার হলো $2\cos\frac{1}{2}\ (w_1 - w_2)x$, যা দীর্ঘতর পর্যায়কাল,

$\frac{4\pi}{(w_1-w_2)}$, এর সঙ্গে পরিবর্তমান। এই দৃষ্টিকোণ কাজে লাগে যখন দুটি বৃত্তীয় কম্পাংক—w_1 ও w_2—আপেক্ষিকভাবে বৃহৎ এবং তাদের বিয়োজন, (w_1-w_2), তাদের তুলনায় ক্ষুদ্র হয়। তা হলে $\frac{4\pi}{(w_1+w_2)}$ পর্যায় কালের দোলনের বিস্তার হবে $2\cos\frac{1}{2}(w_1-w_2)$, যা দোলনের পর্যায়কালের তুলনায় আস্তে-আস্তে পরিবর্তিত হবে। আর এই বিস্তার-বদল দীর্ঘ পর্যায়কাল $\frac{4\pi}{(w_1-w_2)}$ এর সঙ্গে পর্যায়ক্রমে পুনরাবৃত্ত হবে। বিস্তারের এ- সব স্পন্দমান পরিবর্তনগুলিকে বলে বিস্পন্দমালা। ১১-সংখ্যক চিত্রে এ দেখান হ'লো।[২৪]



চিত্র : ১১— বিস্পন্দ

৩.৮ সঙ্গতি, বিসঙ্গতি ও অপস্বর

সঙ্গীতে দুই বা তার বেশি স্বর একত্রে ধ্বনিত হলে তাকে বলে স্বরসঙ্গতি (chord)। যে সব সুর-সমবায়ে কান খুশি হয় তারা সঙ্গতির (consonance) জনক। অন্যদিকে এদের অভিক্রিয়া অপ্রীতিকর হলে সমবায় হয় বিসঙ্গতির (dissonance) কারক। গীতল স্বরের পার্থক্য ধরা পড়ে তিনটি বিষয়ে—(১) তীক্ষ্ণতা বা প্রাবল্যের বিভেদ; (২) প্রস্বরের বিভিন্নতা;

ও (৩) গীতল গুণ (timbre)। এদের সমবায়ের কথাই আলোচ্য। মনে রাখতে হবে যে দুটি স্বরের ক্রমিক ধ্বনিকে বলে সুতান বা সুস্বর (melody) আর যুগপৎ ধ্বনিকে বলে স্বরসঙ্গীত (harmony)। কিন্তু কানের কাছে স্বরের প্রীতিকর সমবায়ই গ্রাহ্য এবং এ ঘটে যখন দুটি কম্পাংকের অনুপাত প্রকাশ করা যায় অতিবৃহৎ নয় এমন দুটি পূর্ণ সংখ্যায়। কাজেই গীতল স্বরের প্রস্বরীয় সম্পর্ক বিবেচনায় প্রধান হয়ে ওঠে তাদের কম্পাংক-অনুপাত, বিয়োজন নয়। আর দু'টি স্বরের কম্পাংক-অনুপাতকে বলে সুরান্তর (interval)। তাই তিনটি স্বরের কম্পাংক যদি n_1, n_2, ও n_3 হয়, তবে প্রথম ও দ্বিতীয়টির সুরান্তর হবে n_1/n_2 এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়টির n_2/n_3। এখানে লক্ষণীয় যে কতক সুরান্তর প্রীতিকর, কতক অপ্রীতিকর। এখন বিবেচ্য কানের কাছে কেন ও কি-ভাবে এই প্রীতিকর বা অপ্রীতিকর অভিক্রিয়া ঘটে।

মনে রাখতে হবে যে শ্রুতিস্নায়ুর অন্ত্যপ্রত্যঙ্গগুলি সূক্ষ্মঝিল্লী অর্থাৎ ভিত্তিক ঝিল্লীতে অবস্থিত এবং এই ঝিল্লী আবার অবস্থিত অন্তঃকর্ণ অর্থাৎ শামুকিয়ার অন্তঃস্থ অস্থিপ্রকোষ্ঠে। হেল্‌মহোলৎসের শ্রবণবাদ অনুসারে ভিত্তিক ঝিল্লীর বিভিন্ন তন্তুগুলি অর্থাৎ কটির তন্তুগুচ্ছ অনুনাদকের কাজ করে —প্রতিটি তন্তু একটি নির্দিষ্ট কম্পাংকের দোলনে সাড়া দেয়। তন্তুর স্পন্দনে প্রতিষঙ্গী স্নায়ুপ্রান্ত উদ্দীপ্ত হ'য়ে মস্তিষ্কে জন্মায় সংবেদন, যার নাম ধ্বনি। তাই গীতল স্বরের ধ্বনন-জাত বিক্ষোভ শামুকিয়ার তরলে প্রবেশ করলে সেখানকার তন্তুগুলি স্পন্দমান হ'য়ে উঠবে যদি তাদের স্বাভাবিক পর্যায়কাল সরল স্বরের পর্যায়কালের সঙ্গে মিলে যায়। একটি স্বরের ধ্বনি হ'লে তন্তুর শুধু মাত্র একটি বা এক অতিক্ষুদ্র অনুপাত স্পন্দমান হবে এবং মস্তিষ্ক সেই ধ্বনিকে আরো সরলতর সংবেদনে বিশ্লেষণ কর্তে সমর্থ নয়।

প্রায় একই প্রস্বরের দু'টি সুর একই সঙ্গে ধ্বনিত হ'লে কিছু-কিছু তন্তু উভয় সুরে সাড়া দেবে; কিন্তু উদ্ভূত স্পন্দমালা বিস্পন্দের জন্যে হবে সবিরাম (intermittent)। এই বিরাম যদি যথেষ্ট আস্তে-আস্তে ঘটতে থাকে, তবে বিস্পন্দ শোনা যাবে স্বতন্ত্র ধ্বনি গরিষ্ঠ হিসেবে। কিন্তু বিস্পন্দ দ্রুত হ'লে তন্তুগুচ্ছ পূর্ণ বিশ্রামের সময় পায় না, অথবা উত্তেজনার মাঝখানে স্নায়ুপূর্ণ উপশমের (recovery) সময় পায় না; তাই দেখা দেয় স্বর বিসঙ্গীত (discord)। আর সুরান্তরাল যদি এত বৃহৎ হয় যে কোন তন্তুই উভয় সুরে স্পন্দমান হতে পারে না, তবে রূক্ষতাবোধ অদৃশ্য হবে। যদি প্রতিটি তন্তু একাধিকভাবে স্পন্দমান হতে সমর্থ হয় অর্থাৎ অধিসুর হয়ে যায়

মূলের সুরগুণিতক, তবে তন্তুটি একটি সুরেই সাড়া দেবে, যেমন অষ্টককে। এতে বোঝা যায় কেন অষ্টককে (octave) দেখাদেয় স্বরসঙ্গীতি (consonance)। এতে ব্যাখ্যাত হয় কেন একটি সুর ও তার অষ্টকের কম্পাংকযুক্ত আরেকটি সুর জন্ম দেয় স্বরসঙ্গীতির।

একই কম্পাংকের দু'টি সুর নিয়ে শুরু করে যদি ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি করা যায় একটি সুরের কম্পাংক, তবে উদ্ভূত বিস্পন্দ সংখ্যা বাড়বে ক্রমাগত। অত্যন্ত মন্থর বিস্পন্দমালা খুব বেশি অপ্রীতিকর হবে না ; তবে বিস্পন্দী কম্পাংক বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অপ্রীতিকরতা বাড়বে যে পর্যন্ত না সেকেণ্ড প্রতি নির্দিষ্ট সংখ্যক বিস্পন্দে স্বরবিসঙ্গীতি গরিষ্ঠ হয়। বিস্পন্দ সংখ্যা এর চেয়েও বেশি হ'লে অপ্রীতিকর সংবেদন ক্রমে ক্রমে কম্‌বে। গরিষ্ঠ স্বরবিসঙ্গীতিও অবিরাম সংবেদন যুক্ত বিস্পন্দী কম্পাংক হবে কারক সুরের চরম কম্পাংকের সঙ্গে পরিবর্তমান। এ দেখা যায় পিয়ানোয় সুরান্তরালের ধ্বননে—অর্ধসুরের (semitone) অন্তরালে আছে ৪৯৫, ৫২৮ কম্পাংক ও সেকেণ্ডপ্রতি ৩৩ বিস্পন্দ এবং পঞ্চম (fifth) অন্তরালে ৬৬,৯৯ কম্পাংক ও সেকেণ্ডপ্রতি ৩৩ বিস্পদ ; কিন্তু প্রথমটি বেসুরো, দ্বিতীয়টি, সুরেলা। মিশ্রসুরের সঙ্গতি ও বিসঙ্গতি আলোচনায় উচ্চতর স্বরাংশও বিবেচ্য, কেননা মূলের ঐকমত্য (accord) থাকলেও সুরের উচ্চতর স্বরাংশ হতে পারে বিসঙ্গতির জনক।[২৫] সব গীতল স্বরৈক্য (concord) অষ্টক ও ৪ : ৫ : ৬ অনুপাতের ত্রিক কম্পাংকে গড়ে ওঠে। অষ্টক ও ত্রিকের একত্র ধ্বন্‌নে উৎপন্ন হয় ঐকতান (chord)। কাজেই স্বরৈক্য সব সঙ্গীতেরই মূলাধার। স্বররৈক্যের প্রীতিকর ফলই স্বরসঙ্গীতি (harmony) যা আবশ্যিক নয় ; কিন্তু সুস্বর (melody) অর্থাৎ প্রীতিকর স্বরানুক্রম থাকা চাই। ইউরোপীয় সঙ্গীত ত্রিক ও ঐক্যতান সঞ্জাত স্বর-সঙ্গীতি-নির্ভর ; ভারতীয় সঙ্গীত সুস্বরে প্রতিষ্ঠিত।[২৬]

যে-সবধ্বনি কানকে প্রভাবিত করে তারা দু'ভাগে বিভক্ত। এক শ্রেণী তৈরি হয় হ্রস্ব ধ্বনিতে, যা স্বলপকাল স্হায়ী অথবা যদি বা কিছুকাল স্হায়ী হয়, তারা নিয়ত পরিবর্তমান। এদেরকে বলা হয় অপস্বর (noise)। অন্যটি এমন সব ধ্বনিতে তৈরি যাদের কারক দোলন পর্যাবৃত্ত। এরাই গীতল স্বরনামে পরিচিত। প্রথমটি অনিয়মিত, দ্বিতীয়টি নিয়মিত স্পন্দনে জাত। অপস্বর হ্রস্বকালের স্পন্দে উৎপন্ন হয় এবং এর কারণ অভিঘাত (shock), ঘর্ষণ, বিস্ফোরণ বৈদ্যুত ক্ষরণ (electric discharge) ইত্যাদি। অপস্বর গীতল ধ্বনি থেকে স্বতন্ত্র এর পর্যাবৃত্তিহীনতায়—এতে নেই কোন নির্দিষ্ট কম্পাংক। একাধিক অপস্বর অবশ্য প্রস্বরের দিকে ঝোঁকে, তবে তার জন্যে দায়ী এর সহচরী গৌণ ক্রিয়া। অপস্বর বিরোধী

সংস্থা গড়ে উঠেচে এবং British Standards Institution-এর সংজ্ঞা নির্দেশ করেচেন : "অপস্বর-প্রাপকের অনভিপ্রেত ধ্বনি।"[২৭] এ-সংজ্ঞা মন্ময় এবং এতে একজনের অপস্বর অন্যজনের সঙ্গীত হ'তে পারে। বস্তুত একই ব্যক্তির অপস্বর অন্য সময়ে সঙ্গীত হতে পারে।

অপস্বরের মণ্ময় ও ভৌত দিক আছে। সাধারণত বিভিন্ন কম্পাংকের বহু সংখ্যক ধ্বনি-উৎস-এর যোজিত ধ্বনি উৎপাদে তৈরি হয় অপস্বর। এজন্যে একে বলে অপ্রস্বরিত ধ্বনি। অপস্বর তিন শ্রেণীতে পড়ে। প্রথম শ্রেণী মোটামুটি ৩০—৭০ db-এর—এরা বাড়িতে ঘুম বা স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যতিচার করে। দ্বিতীয়টি ৭০—১০০ db-এর—এরা কাজের ব্যাঘাত ঘটায়। আর তৃতীয়টি ১00db এর উপরে—এরা কান ও স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। অপস্বরের সুস্পষ্ট লক্ষণ হলো এর প্রাবল্য। এরি জন্যে বিরক্তি উৎপন্ন হয়। প্রাবল্যের প্রমাণ মাপনীর সঙ্গে শ্রুতির তুলনা চলে। অপস্বর মাপনীর (noise-meter) পাল্লা :৩০ phon-এর—এ কানের শ্রবণ সীমাও বটে।[২৮]

তাই অপস্বর হ'লো অপর্যাবৃত্ততরঙ্গ।

৩.৯ ফুরিয়ে বিশ্লেষণ

বাক্‌তরঙ্গের বর্ণালি (spectrum) আছে। এরি মধ্যে পড়ে সরল উপাদানের কম্পাংক ও বিস্তারের লক্ষণগুলি আর এদের সমবায়ে গড়া মিশ্র তরঙ্গমালা। এরূপ সমবায়ের নিয়মানুগামিতা গণিতীয় ভাষায় বিশ্লেষিত ও বর্ণিত হতে পারে—পদ্ধতির নাম হলো ফুরিয়ে বিশ্লেষণ (Fourier analysis)। ধ্বনি-বর্ণালি-লেখী (sound spectrograph) এসব দেখাতে পারে এবং রেখাচিত্রল প্রদর্শনীকে বলা হয় বর্ণালি চিত্র (spectrogram)। কাজেই বর্ণালিচিত্র জোগায় এমন একটি মাধ্যম যাতে যুগপৎ দেখায় ধ্বনি বর্ণালির (spectrum) মুখ্য লক্ষণগুলি, যথা, কম্পাংক, বিস্তার ও কাল।[২৯]

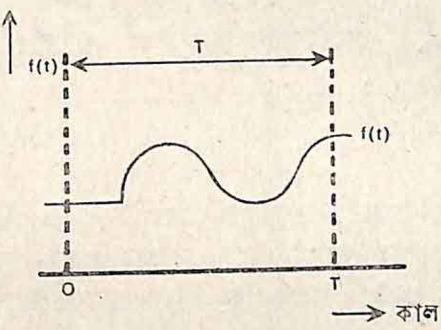
বিশ্লেষণ প্রণালী

কাল-ফলন (time function)-কে ১২-সংখ্যক চিত্রে দেখান হলো। গণিতের ভাষায় এ হলো —

$$f\ (t) = c_0 + \sum_{n=1}^{n=\infty} a_n \ \sin n\frac{2\pi}{T}t + \sum_{n=1}^{n=\infty} bn \cos n \frac{2\pi}{T} t \quad \cdots\ \cdots\ \cdots (22)$$

যেখানে গুণাঙ্ক (co-efficient) c_0, a_n, b_n হ'লো যথাক্রমে ঃ

$$c_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)\,dt \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (22a)$$



চিত্র : ১২—কাল-ফলন-রেখ

$$a_n = \frac{1}{2T}\int_0^T f(t) \sin n\frac{2\pi}{T}t\,dt \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (22b)$$

$$b_n = \frac{1}{2T}\int_0^T f(t) \cos n\frac{2\pi}{T}t\,dt \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (22c)$$

অবশ্য ২২-সংখ্যাক সমীকরণকে আরো সরল করা যেতে পারে, যথা,

$$f(t) = c_0 + \sum_{n=1}^{n=\infty} c_n \sin\left(n\frac{2\pi}{T}t + \phi n\right) \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (23)$$

যেখানে $c_n = \sqrt{a_n^2 + b_n^2} \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (23a)$

এবং $tg\phi_n = \frac{b_n}{a_n} \quad \cdots \quad \cdots \quad \cdots \quad (23b)$

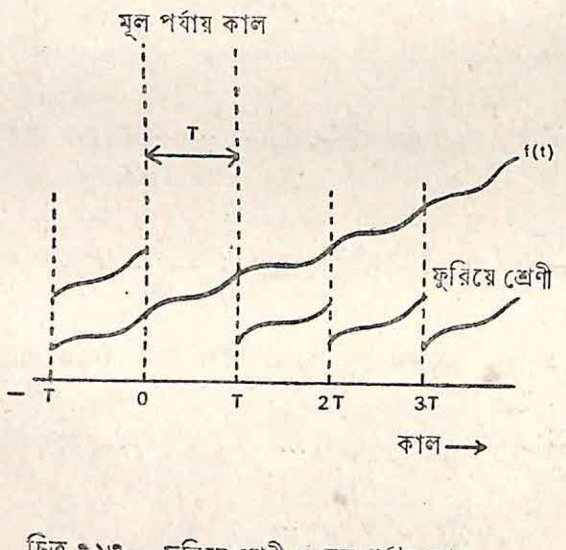
এখানে স্মর্তব্য যে ২৩-সংখ্যাক সমীকরণে বিধৃত আছে গতাণুগতিক সূত্রটি ঃ

"T কালান্তরের মধ্যে কাল-ফলন f(t) কে গাণিতিকভাবে ধরা যেতে পারে সংখ্যাহীন সাই-তরঙ্গের যোগফল বা উপরিপাত (superposition) হিসেবে, যাদের কম্পাংকগুলি মূল কম্পাংকমান $f_0 = \frac{1}{T}$ এর গুণিতক।"

এরি জন্যে এ-ধরনের বিশ্লেষণকে বলা হয় সুরগুণিতক (harmonic) বিশ্লেষণ এবং এ-ভাবে সংজ্ঞিত (thus defined) উপাদানগুলি সুরগুণিতক বলে পরিচিত। প্রতিটি সুরগুণিতকের নিজস্ব কম্পাংক আছে। নিজস্ব বিস্তার (যেমন c_n) এবং নিজস্ব তথাকথিত দশাকোণ (phase-angle), যথা—ϕ_n।

ফুরিয়ে কাল

২৩-সংখ্যক সমীকরণে প্রদত্ত ফুরিয়ে শ্রেণী (Fourier series) শুধুমাত্র T কালান্তরে f(t) ফলনের বর্ণনা করে। ফুরিয়ে শ্রেণী নিজেরই পুনর্বৃত্তি করে যেমন, তেমনি o ও T কালে-বাঁধা f (t)-এর অংশ বিশেষকেও এবং তা



চিত্র : ১৩— ফুরিয়ে শ্রেণী ও মূল পর্যায় কাল

T-কালান্তরে পর্যাবৃত্তভাবেই। এর পরিচয় দেখান হ'লো ১৩—সংখ্যক চিত্রে। এ-থেকে বোঝা যাবে কি-ভাবে ফুরিয়ে শ্রেণী T-পর্যায় কালের সঙ্গে পর্যাবৃত্ত-

ভাবে T—কালান্তরে f(t) র পুনর্বৃত্তি করে। এই পুনর্বৃত্তি হ'লো গণিতের উপরি পাওনা। তবে মূল পর্যায় কাল বহির্ভূত f(t)-এর বাস্তব কাল ধারার সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। এর কারণ ফুরিয়ে শ্রেণী মূল পর্যায় কালের বাইরে f (t)-র কোন বর্ণনা দেয় না।[৩০]

ফুরিয়ে সূত্রের প্রয়োগ

বক্ররেখার পদগুলি সংখ্যায় সীমিত বা অসীম হতে পারে। যে-কোন পদ এমন কি বিপরীত (harmonic) শ্রেণীর প্রথম পদটি নিখোঁজ হতে পারে। ধরা যাক দু'টি সুরের একটি জটিল দোলন এবং সুর দু'টি প্রস্বরের এত কাছাকাছি যে বিস্পন্দ উৎপন্ন হয়। সুরগুলি বিশুদ্ধ হ'লে তারা জন্ম নেবে সমঞ্জস দোলনে এবং ফুরিয়ে উপপাদ্য যৌগদোলনে—যা দেয়া আছে তার বেশি কিছু বের কর্তে পার্বে না। যেমন দু'টি সুরের কম্পাংক ১০০ ও ১০১ হলে, ফুরিয়ে বিশ্লেষণে এই দু'টি স্পন্দই পাওয়া যাবে, আর বেশি কিছু নয়। এরা যে বিপরীত শ্রেণীর সদস্য তার কৈফিয়ৎ কি? জবাব হলো এরা উভয়ই শ্রেণীর ১০০-তম ও ১০১-তম পদ এবং আর কোন পদ বর্তমান নেই। যৌগ দোলনের কম্পাংক 1 কেননা, এক সেকেণ্ডে, কিন্তু তার আগে নয়, প্রতিটি উপাদানই সম্পূর্ণ কর্বে সঠিক সংখ্যক দোলন। এ-ক্ষেত্রে মূলের আছে একক কম্পাংক, কিন্তু শূন্য বিস্তার। তবে ১০০ ও ১০০π বা ১০০ $\sqrt{2}$-র অপ্রমেয় (incommensurable) কম্পাংকের দু'টি সমঞ্জস দোলনের যৌগে ফুরিয়ে উপপাদ্য প্রযোজ্য হবে না। কেননা, যৌগ দোলনটি পর্যাবৃত্ত নয়।

দোলন সম্পর্কে বলা যায় যে মাধ্যমে কণার বেগপরিবর্তন যত বেশি আকস্মিক হবে, ততই প্রবলতর হবে নিম্নতরের তুলনায় উচ্চতর সুর-গুণিতক উপাদান। আর বাদ্যযন্ত্রের গড়নে ব্যবহৃত হয় এ-সূত্রটি। Ohm-এর সূত্র থেকে জানা যায় যে কান স্বরকে সরল সমঞ্জস উপাদানে বিশ্লেষিত কর্তে পারে এবং আমাদের গণিতীয় বিশ্লেষণে ঐ পদ্ধতিরই অনুসরণ করা উচিত। বস্তুত সাইন ফলনটি পর্যাবৃত্ত ফলনের মধ্যে সরল-তম। ভৌত বিদ্যার একাধিক স্বতন্ত্র শাখায় পর্যাবৃত্ত পরিবর্তনে প্রকৃতির বিশ্লেষণ পদ্ধতি ফুরিয়ে উপপাদ্যের অনুগমন করে। কোন ঘটনা পর্যাবৃত্ত বক্রে প্রদর্শিত হলে ঐ উপপাদ্যটি ব্যবহৃত হ'তে পারে এবং কি-কি সুরগুণিতক উপাদানে এ তৈরি, তাও বের করা যায়। উপপাদ্যটি সর্বদাই ব্যবহৃত হচ্ছে সূর্যকলঙ্ক ও চৌম্বকঝটিকা, বৈদ্যুত যন্ত্রের বিভবের উত্থান ও পতন, জোয়ার ভাটার হ্রাস বৃদ্ধি প্রভৃতির বিশ্লেষণে।[৩১]

৩.১০ স্বর, স্বন ও বল

ভাষায় ধ্বনি সম্পর্ক শ্রৌত বা প্রত্যঙ্গীয়। ১-সংখ্যক চিত্রে দেখা যায় যে বাইরের ধ্বনি কানে পেঁছায় এবং পরে মস্তিষ্কে যায়। শ্রুতির ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া লক্ষণীয় এবং নিচে দেয়া হ'লো।

শ্রবণ ও কর্ণপাত

শ্রবণ ও কর্ণপাতের মধ্যে প্রভেদ আছে। শ্রবণে (hearing) আমরা চাই বা না চাই, যেকোন ধ্বনি শ্রাব্য সীমার মধ্যে এলে কান তাকে ছেড়ে দেয়। তবে কর্ণপাতে (listening) মনোযোগ দিতে হয়। অর্থাৎ কর্ণপাত শ্রবণ ও মনোযোগের যৌথ ফসল। শ্রবণ ও কর্ণপাতের পার্থক্য বোঝা যায় মা'য়ের আচরণে। মা উচ্চকিত সজীব সংলাপে ব্যাপৃত থাকতে পারে, কিন্তু তবুও তার শিশুর দুর্বলতর ক্রন্দন তা থেকে বাদ পড়ে না। কেননা এক বিশেষ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ অপস্বরের খোঁজে সে গিয়ারিত (geared up)। তাই কর্ণপাত অতিমাত্রায় বরণাত্মক (selective) এবং এতে মনোযোগদেয়া বুঝায়। কানকে বাদ দিয়ে ধ্বনির যান্ত্রিক বিশ্লেষণ বিশেষ উপকারে আসে না। এর কারণ এই যে যান্ত্রিক তথ্যের বহর এত বেশি যে এখানে কানের সহযোগিতার প্রয়োজন। যখন আমরা কথা বলি তখন ধ্বনিতরঙ্গ শ্রোতার কানে আঘাত হানে এবং আমাদের নিজের কানেও। কাজেই এই পুনর্নির্বিষ্ট ক্রিয়াবিধি (feedback mechanism) আমাদের উক্তি পরিধারণ করে (monitor)। অনেকের সূক্ষ্ম বিনিশ্চয়ের (discrimination) স্বাভাবিক ক্ষমতা আছে ; আবার অনেকে কম-প্রতিভাবান। তবে সর্বদাই ক্ষমতাবৃদ্ধির অবকাশ আছে। আর এ-কাজ হতে পারে কানের প্রশিক্ষণে। কর্ণপাত ও উচ্চারণের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক আছে। যতভাল ভাবে আমরা ধ্বনি-পার্থক্য শুনি, .তত ভাল ভাবেই তাকে অমরা প্রকাশ কর্তে সক্ষম। এখানে সঠিক উচ্চারণ নিয়ন্ত্রণে পুননিবেশের দান অনস্বীকার্য। সযত্ন কর্ণপাত কিন্তু দৈনন্দিনজীবনের কর্ণপাত থেকে স্বতন্ত্র। আটপৌরে কর্ণপাতে বিভেদ ভুলে আমরা ঐক্যের দিকেই ঝুঁকি। কাজেই কানের ধ্বনিবিজ্ঞানীর (ear-phonetician) শিক্ষার প্রয়োজন। ৩২

বক্তার আসনে শ্রোতা

বাক্-ধ্বনির চেয়ে ধ্বনি-উৎপাদক বিচলনই স্পন্দ। ভাষার স্পন্দ তাই এমন বিশেষ ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টি করে পদ্য (verse)। সব সন্দেহ শেষ পর্যন্ত দৈহ্য বিচল নরস্পন্দ। ভাষার স্পন্দ। তাই এমন কিছু যা মুখ্যত

শ্রোতার চেয়ে বক্তার নিজস্ব—এ বক্তার বিচলন—জাত, এবং জন্ম নেয় বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টিকারী পেশীয় বিচলনে। স্বভাবতই প্রশ্ন জাগে কি-করে শ্রোতার জন্মে এই স্পন্দবোধ। এর ব্যাখ্যা এই যে আমাদের বাক্-প্রত্যক্ষণ-শুধুমাত্র এর স্পন্দের দিকটাই নয়, কিন্তু এর অন্যান্য লক্ষণও যথেষ্ট পরিমাণে নির্ভর করে বক্তা-শ্রোতার একীভবনের উপর। আমরা যখন বাক্-ধ্বনি কর্ণপাত করি, তখন তাকে শুধুমাত্র ধ্বনি-হিসেবেই প্রত্যক্ষ করিনা, দেখি তাকে বিচলনের সূত্রকোষ (clue) রূপে। এ হ'লো বক্তা যে বিভিন্ন বাগ্‌প্রত্যঙ্গের বিচলন করে সে সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্যে শ্রোতার স্বজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া (intuitive reaction)। আমরা পেশীর ভাষায় বাক্ প্রত্যক্ষ করি। তাই I. A. Richards বলেন যে ছন্দ (metre) "উদ্দীপনে নয়, আমাদের প্রতিবেদনে"। [৩৩]

গানে কর্ণপাত করায়ও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়। P. E. Vernon বলেনঃ "স্পন্দ সংগীতের একটি অংশ শ্রাব্যের চেয়ে দৈহ্য প্রকৃতির"। তিনি আরো বলেন যে অনেকে সংগীত প্রত্যক্ষ করেন পিয়ানো বা অন্য যন্ত্রে হস্ত-স্থাপনার পরিভাষায়।[৩৪] অপরে কান-দেওয়া প্রতিটি সঙ্গীতশিল্পী সম্পর্কে এ প্রযোজ্য। কিন্তু ভাষা সম্পর্কে আমরা সবাই অনুষ্ঠান-শিল্পী (performers)।

বাক্-স্পন্দ, অতএব পদ্যস্পন্দ বক্তাশায়ী এবং এ শ্রোতাশায়ী হয় সেই পরিমাণে যে পরিমাণে সে নিজেকে বক্তার সঙ্গে অভিন্ন কর্তে পারে। D. Abercrombie-এর নাম দিয়েচেন "ধ্বনিক সমানুভূতি" (phonetic empathy)। এরজন্যে শ্রোতার থাকা চাই ভাষার সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয়; এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ হবে তার মাতৃভাষা। বাক্‌স্পন্দ তাই প্রধানত পেশীস্পন্দ—ধ্বনিস্পন্দের চেয়ে বরং এ দৈহ্য বিচলনের স্পন্দ। তাই পদ্যকে অবিলম্বে চেনা যায় এবং নীরব পাঠে ও পদ্য বলে অনুভূত হয়। এর অন্য কোন ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া সুকঠিন। [৩৫]

ভাষায় ত্রয়ী

ভাষার আছে ত্রিধারূপ এবং এ উচ্চারণ-সঞ্জাত। ধ্বনিক সম্পর্ক শ্রোত হ'তে পারে বা প্রত্যঙ্গীয়। যে-ভাষায় কণ্ঠপ্রস্বর (voice-pitch) ব্যবহৃত হয় শব্দের পৃথকীকরণে তাকে বলা হয় "সুরেলা ভাষা" (tone language) যেমন চীনা, পাঞ্জাবী, প্রভৃতি। এর ভিত্তিমূলে আছে "সুরমান" (toneme) যা একটি সুরে তৈরি এবং আদর্শস্থানীয়। এই সুর (tone), স্বরভঙ্গি (intonation) থেকে আলাদা। স্বরভঙ্গীয় ভাষায় (intonation languages) কম্পাংক পরিবর্তিত উক্তির দীর্ঘল বিস্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত, যেমন হিন্দি,

দ্বিতীয় পর্ব ঃ বাঙ্‌লা ছন্দ

চতুর্থ অধ্যায় : উচ্চারণ প্রক্রিয়া

নির্দিষ্ট লক্ষণ-যুক্ত, বাক্-প্রত্যঙ্গ-নিঃসৃত ধ্বনিক্রমে তৈরি হয় কথ্যভাষা। ধ্বনিক্রমকে বলা হয় শুধু ধ্বনি বা বাক্-এর রৈখিক বা খণ্ডবৈশিষ্ট্য ; আর লক্ষণকে ছন্দ বা বাক্-এর খণ্ডাতিগ বৈশিষ্ট্য। এই ধ্বনিক্রমের উপাদান সঠিক বাগ্ধ্বনি ও শ্রুতি। বাগ্ধ্বনি হ'লো বাগ্ প্রত্যঙ্গের স্বেচ্ছাজাত নির্দিষ্ট শাব্দিক অভিক্রিয়া—এরা প্রত্যঙ্গের নির্দিষ্ট ক্রিয়ার ফল। অতিপ্রত্যক্ষ পথে বাগ্ধ্বনির এক অবস্থান থেকে অন্য অন্য অবস্থানে যাবার কালে বাক্প্রত্যঙ্গ যে আনুষঙ্গিক সঞ্চারী ধ্বনি উৎপন্ন করে তাকে বলে শ্রুতি।

—ডেনিয়েল জোনস্ (১)

৪.১ বাগ্যন্ত্রের বিচলন

ধ্বনি সৃষ্টি হয় শ্বাসবায়ুর নিঃশ্বাসে (নিগর্মন) ও প্রশ্বাসে (গ্রহণে)। প্রধানত নিঃশ্বাসেই ধ্বনির সৃষ্টি হয়। তবে সিন্ধীভাষায় কয়েকটি ধ্বনি প্রশ্বাসে জন্ম নেয়। এসব ধ্বনি বিপরীত মুখী (inverse) বলে পরিচিত। বাঙলা ভাষায় এ-রকম ধ্বনি মাঝে-মাঝে দেখা যায় ভয়ে বা বিস্ময়ে ; কিন্তু নিয়মিত ধ্বনিমালায় এদের স্থান নেই। সাধারণত বাগ্-সৃষ্টি চারটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়ার যৌথফল : (১) বায়ু-প্রবাহ প্রক্রিয়া ; (২) স্বনন প্রক্রিয়া ; (৩) মুখনাসিক্য প্রক্রিয়া ; ও (৪) উচ্চারণীয় প্রক্রিয়া। এই চারটি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশিলষ্ট আছে চারটি প্রত্যঙ্গের ক্রিয়াকলাপ, যথা, ফুস্ফুস্, কণ্ঠতন্ত্রী, কোমলতালু এবং জিভ্ ও ওষ্ঠ। চারটির মধ্যে উচ্চারণীয় প্রক্রিয়া সবচেয়ে জটিল। শ্বাসবায়ু ফুস্ফুস্ থেকে বেরিয়ে দুটি শ্বাসনালীর (windpipe or trachea) ভিতর দিয়ে আসে। শ্বাসনালীর শীর্ষস্থানে কণ্ঠনালী (larynx) অবস্থিত। কণ্ঠনালীর ভিতরে দু'টি পাতলা শৈলষ্মিক ঝিল্লী আছে, যাদের নাম কণ্ঠতন্ত্রী (vocal cord)। এ ঝিল্লী দু'টি স্থিতিস্থাপক : নিঃশ্বাস কখনো ঝিল্লী স্পর্শ করে উপরে চলে আসে, আবার কখনো বা ঝিল্লী দু'টি প্রসারিত হয়ে নিঃশ্বাসের পথ রোধ করে। শেষোক্ত অবস্থায় বায়ুপ্রবাহ ঝিল্লী দুটিকে ঠেলে নির্গমনের পথ তৈরি করে এবং তাতে কণ্ঠতন্ত্রী আন্দোলিত হয়ে স্পন্দন সৃষ্টি করে।

স্বনন প্রক্রিয়ায় দেখা যায় কন্ঠতন্ত্রীর ন্যূনপক্ষে সাতটি দশা : (১) ঘোষ (voice) অর্থাৎ কণ্ঠতন্ত্রীর স্পন্দন ; (২) অঘোষ অর্থাৎ কণ্ঠতন্ত্রীদ্বয় আলাদা ; (৩) মহাপ্রাণন—এ ঘটে উচ্চারণীয় সংকীর্ণনে ও মুক্তির পরেও

অঘোষ অবস্থার স্বল্প কালে ; (৪) মর্মর বা 'শ্বাসধ্বনি' (breathy voice)—আরিটেনয়েডের বিযুক্ত অবস্থায় সন্ধিবন্ধনী (ligamental) কণ্ঠতন্ত্রী স্পন্দশীল ; (৫) স্বরযন্ত্রীয়করণ বা 'শ্বাসধ্বনি'—আরিটেনয়েড দৃঢ়পিনদ্ধ, কিন্তু সন্ধিবন্ধনী কণ্ঠতন্ত্রীর স্বল্পাংশ স্পন্দশীল ; (৬) কণ্ঠনালিক সংবার—কন্ঠতন্ত্রী এক সঙ্গে বিধৃত ; ও (৭) ফিস্‌ফিসানি—কন্ঠতন্ত্রী একসঙ্গে বিধৃত অথবা সংকীর্ণত, অবশ্য আরিটেনয়েডের মধ্যস্থান এ থেকে বাদ। ঘোষধ্বনি হলো সংস্কৃতে বর্গের ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম বর্ণ, স্বরবর্ণ; ও ইংরেজি z। এদের উচ্চারণে কন্ঠতন্ত্রী দু'টি প্রায় পরস্পরকে স্পর্শ করে। ফলে বায়ুপ্রবাহের এ-সংকীর্ণনের মধ্য দিয়ে যাতায়াতের সময় একটি চোষক ক্রিয়া (suction effect) দেখা যায়, যা কন্ঠতন্ত্রীদ্বয়কে একত্রিত করে। কিন্তু একত্রণের সঙ্গে-সঙ্গে বায়ু প্রবাহ থেমে যায় আর আকর্ষণের ক্রিয়াও, ফলে তারা আলাদা হয়ে জমাট চাপকে মুক্তি দেয়। আবার সুরু হয় চোষক ক্রিয়া ইত্যাদি এবং এ-ভাবে চক্কর চলতে থাকে, যার ফলে নিয়মিত স্পন্দন উৎপন্ন হয়, এর আরেক নাম 'ঘোষ'। সংস্কৃতে বর্গের ১ম ও ২য় বর্ণ এবং শ, ষ, স অঘোষধ্বনি। ধ্বনির স্পন্দহার দুটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—কণ্ঠতন্ত্রীর টান ও জমাটচাপ। এদের যে কোন একটির বৃদ্ধিতে প্রস্বর বাড়বে। যেসব বলে কন্ঠতন্ত্রীর চাপ বাড়ায় তারা দু'ভাগে বিভক্ত : এক, স্বরযন্ত্রীয় পেশীগুচ্ছ ; দুই, জিভের উচ্চারণীয় বিচলন, যাতে স্বরযন্ত্র উপরে ওঠে এবং কন্ঠতন্ত্রীর বিস্তার ঘটে। কণ্ঠতন্ত্রীর পরিবর্তন ঘটে দু'ভাবে—(১) কণ্ঠতন্ত্রীর নিচেকার বায়ুচাপের পরিবর্তন ; (২) স্বরযন্ত্রের পেশীক্রিয়ায় কন্ঠতন্ত্রীয় টানের পরিবর্তন।

বায়ুপ্রবাহ ক্রিয়াবিধি চাররকমের—ফুস্‌ফুসীয় ; কন্ঠনালীয় (বহির্গামী ও অন্তর্গামী) ; জিহবামূলীয়। প্রথমটি বহির্গামী অর্থাৎ শ্বসন পেশীয় নিয়ন্ত্রণে ফুস্‌ফুসের বায়ু বহির্গত হয় আর এতে স্পৃষ্ট ধ্বনি জন্ম নেয়, যেমন, প, ট, ক। কণ্ঠনালীয় বাহির্গামী প্রবাহে রুদ্ধ কণ্ঠনালীর ঊর্ধ্ব বিচলনে গলনালীয় বায়ু সংনমিত হয় ; ফলে নিষ্ক্রামক (ejective) স্পর্শধ্বনি আসে যেমন 'হাত' স্থলে আৎ'। দ্বিতীয়ত, আর কণ্ঠনালীয় অন্তর্গামী প্রবাহে স্পন্দশীল কণ্ঠনালীর নিম্নগামী বিচলন ঘটে আর অবরোধ দেখা দেয়। সংস্কৃত শ, ষ, স এবং ইংরেজি s, z এর অন্তর্গত। জিহবামূলীয় অন্তর্গামী প্রবাহে জিভের আগুপিছু বিচলনে মুখের বায়ু তনুভূত হয় এবং শীৎকার (click) উদ্ভূত হয়, যেমন দেখা যায় গরু-ঘোড়া তাড়াতে চ্‌চ্‌চ্‌চ্‌ ধ্বনি। তৃতীয়টি হলো মুখ-নাসিক্য প্রক্রিয়া যাতে কোমল তালু উত্তোলিত হয়ে ঊর্ধ্বগলনালীতে জিহবামূলীয় সংবার ঘটায় ; অথবা এ নিচে নেমে নাকদিয়ে বায়ুকে বের করে দেয়। এই দু'টি প্রক্রিয়ার পার্থক্য নির্দেশিত হয় একটিকে মৌখিক, অন্যটিকে নাসিক্য বলে।

প্রচলিত ব্যবহারে সেই ধ্বনিকেই 'নাসিক্য' বলে যাতে মুখপথ রুদ্ধ হয় এবং সব বায়ুই নাসিকা দিয়ে নির্গত হয়। অন্যদিকে সেই ধ্বনিকে 'নাসিক্যীভূত' বলে যাতে কোমল তালু নিম্নগামী হয় কিন্তু মৌখিক কোন স্পর্শসংবার ঘটেনা—ফলে, কিছু বায়ু নাক দিয়ে, আর কিছু মুখ দিয়ে বের হয়ে যায়।

ধ্বনি তার উচ্চারণ স্থানের উপর নির্ভরশীল। এই স্থানগুলি হলো—ওষ্ঠ্য ; দন্তোষ্ঠ্য ; দন্ত্য ও আন্তর্দন্ত্য ; দন্তমূলীয় ; পশ্চাদ্দন্তমূলীয় ; মূর্ধণ্য ; তালব্য ; তালব্য দন্তমূলীয়, জিহ্বামূলীয় ; আলজিহ্ব্য ; গলনালীয় ; কণ্ঠনালীয়। ছান্দসিক বৈশিষ্ট্য নিরূপণের জন্যে স্বর ও অর্ধস্বরের পার্থক্য করা হয় এভাবে—একটি আক্ষরিক সন্নিকর্ষ ; অন্যটি অনাক্ষরিক সন্নিকর্ষ। অবশ্য সাক্ষাৎভাবে কোন শারীরবৃত্তীয় বা শাব্দিক ধর্ম চোখে পড়ে না যা আক্ষরিক অংশকে অনাক্ষরিক থেকে পৃথক্ করে। তা সত্ত্বেও বক্তারা তাদের ভাষণপ্রষ্টা জটিল পেশীয় ঘটনার অনুক্রমকে একক মালায় সাজিয়ে নেয়, যার একটি হলো অক্ষর এবং তারা জানে ভাষণের অক্ষর সংখ্যাকে। সাধারণত আক্ষরিক ধ্বনি অনাক্ষরিক ধ্বনি থেকে দীর্ঘতর। এ-ছাড়াও প্রয়োজন উচ্চারণের লাক্ষনিক হারের। কেননা এতে অংশ দৈর্ঘ্যের পরিবর্তন নিরূপিত হয়। উক্তির হারে প্রভাবিত হয় উচ্চারণ হার আর প্রথমটি নিরূপিত হয় আংশিকভাবে বক্তার বয়স ও আবেগাত্মক অবস্থা দিয়ে।[২]

কাজেই বাগ্‌যন্ত্রের বিচলনে জন্ম নেয় বাক্। এই বিচলনের আছে ত্রিধারূপ—বন্ধনীয় বিচলন (movement of fixation) ; নিয়ন্ত্রিত বিচলন (controlled movement) ; ও ক্ষেপক বিচলন (ballistic movement)। বল সমান ও বিপরীতমুখী হলে দেহে দেখা দেয় বন্ধনীয় বিচলন বা বিরাম। যতি এরকম একটি ঘটনা যখন পাঁজরপিঞ্জর লিপ্ত হয় এই বন্ধনীয় বিচলনে। দ্বিতীয়টি ঘটে যখন দেহে বল হয়ে ওঠে অসমান ও বিপরীতমুখী। কাজেই বৃহত্তর বলের দিকে চলতে থাকে বিচলন। অক্ষর-সঞ্জাত বাক্ উচ্চারণ কালে মধ্যচ্ছদা ঋজু-উদরীয় পেশীতন্ত্র (diaphragm-rectus abdominis musculature) নিয়ন্ত্রিত বিচলনে থাকে। অবশ্য ত্বরিত বাক্ (rapid speech)-এ গোটা পাঁজরপিঞ্জরটাই নিয়ন্ত্রিত বিচলনের সামিল হয়। এ ফুসফুসের সংকোচন ঘটায় এবং বাক্-এর উপাদান যোগায়। তার তৃতীয়টি দেখা দেয় যখন ধনাত্মক পেশীপুঞ্জ সংকুচিত হয়ে দেহকে গতিশীল করে। কখনো-কখনো দেহ অবাধে ছোটে এবং ঋণাত্মক পেশীপুঞ্জ সংকুচিত হয়ে দেহকে স্থিতিতে নিয়ে যায়। অতিদ্রুত অক্ষর ও ব্যঞ্জনগতি হলো ক্ষেপক বিচলনের নিশ্চিত ফসল। এখানে লক্ষণীয় যে চিত্রাঙ্কণ পড়ে নিয়ন্ত্রিত বিচলনের মধ্যে, যেমন মুদ্রাক্ষর লিখন, পিয়ানো বাজানো প্রভৃতি ক্ষেপক বিচলনের অন্তর্গত।

প্রশ্বাসে ফুসফুস স্ফীত হয় আর নিঃশ্বাসে সংকুচিত হয়। ফুসফুসের নিজস্ব পেশী সংকোচন বা প্রসারণ নেই। এ-কাজ করে পাঁজরাপিঞ্জরীয় পেশীপুঞ্জ। পাঁজরাপিঞ্জরের প্রসারণ ও সংকোচনের সঙ্গে সঙ্গে ফুসফুসেরও অনুরূপ পরিবর্তন ঘটে। পাঁজরাপিঞ্জরীয় সম্প্রসারণ তিন রকমের—উধ্বার্ধ; অগ্র-পশ্চাৎ; পার্শ্বিক। প্রথমটির জন্যে দায়ী মধ্যচ্ছদার সংকোচন; দ্বিতীয়ের জন্যে বহিঃস্থ পাঁজরমধ্যীয় পেশীর সংকোচন; ও তৃতীয়টি ঘটে পাঁজরের আকৃতি ও কোণের অবস্থানের জন্যে। অনুরূপভাবে পাঁজরাপিঞ্জরের সংকোচনও ঐ তিনরকমের এবং এ ঘটে ঋজু-উদরীয় পেশীর ক্রিয়ায় এবং অন্যদুটিও অর্থৎ বহিঃস্থ পাঁজর মধ্যীয় পেশী ও পাঁজরীয় কোণ ও আকৃতি ক্রিয়াশীল। Stetson ও Hudgings এর মতে অক্ষর স্পন্দ ঘটে বিপরীতমুখী পাঁজর মধ্যীয় পেশীর ক্ষেপক বিচলনে; আর পর্ব, বাক্যাংশ বা শ্বাসগুচ্ছ হলো বিপরীতমুখী মধ্যচ্ছদা—ঋজু-উদরীয় পেশী পুঞ্জের সক্রিয় ফল। বৃহত্তর পেশীর সংকোচনে প্রকাশ পায় নিয়ন্ত্রিত বিচলন। কাজেই অক্ষর স্পন্দপুঞ্জের জন্যে আছে একটি মাত্র বিচলন আর এর নাম হলো মধ্যচ্ছদা—ঋজু-উদরীয় পেশীতন্ত্রের বিচলন যাতে অক্ষরগুলি কার্যকর গোষ্ঠীতে একত্রিত হয়। এককথায়, বৃহত্তর নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসীয় বিপরীতমুখী পেশীপুঞ্জে পাঁজরমধ্যীয় পেশীর পথ সুগম করে অক্ষর তৈরিতে। বৃহত্তর পেশী পুঞ্জ শুধুমাত্র অক্ষর-একত্রণের সহায়ক। তাই শ্বসন পেশীর সহযোগিতা বাক্-উৎপাদনে এক রকম, আবার সাধারণ শ্বাসে অন্যতর। সাধারণ শ্বাসে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসের কাল একই এবং বিচলনের প্রতি চক্করে আছে বিরতি। অপরপক্ষে বাক্-শ্বসণে নিঃশ্বাসের তুলনায় প্রশ্বাসের কাল হ্রস্বতর এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োজনে বিরতি-বন্টন ঘটে ব্যাপকভাবে।[৩]

৪.২ সঞ্চালক একক

ঐচ্ছিক নিয়ন্ত্রাধীন পেশীপুঞ্জ সংনমনশীল বহুসংখ্যক প্রলম্বিত কোষ বা তন্তুতে (fibre) তৈরি। এরা আবার কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত এবং প্রত্যেক শ্রেণী আবার সুষুম্না কাণ্ডে (spinal cord)-র একটি নির্দ্দিষ্ট স্নায়ুকোষের (nerve cell) সঙ্গে সংযুক্ত। স্নায়ুকোষ ও তার সংশ্লিষ্ট পেশীয় তন্তুর সমবায়কে বলে সঞ্চালক একক (motor unit)। প্রতিটি পেশী হাজার-হাজার সঞ্চালক এককে গঠিত। স্নায়ুকোষের ক্ষরণে (discharge) সেই নির্দিষ্ট সঞ্চালক এককের সব পেশীয় তন্তু সংকুচিত হয় এক সেকেণ্ডের কয়েক শতাংশের জন্যে এবং আবার শ্লথনে চলে যায়। সাধারণত পেশী একটু টানের অবস্থায় থাকলে, পেশীতন্তুর প্রত্যেক সক্রিয়গোষ্ঠীকে উদ্দীপ্ত করে তার উপযুক্ত স্নায়ুকোষ

নিম্নহারে অর্থাৎ প্রতিসেকেণ্ডে ৫-১০ ঃ ফলে টান থাকাকালীন অল্প সময়ের জন্য এ সংকুচিত হয়। এ অবস্থায় পেশীসমগ্রে একটি নির্দিষ্ট মুহূর্তে থাকে স্বল্পসংখ্যক সংকুচিত তন্তু। টান বৃদ্ধির জন্যে আছে দু'টি প্রক্রিয়া। প্রথমত, প্রতিটি সক্রিয় স্নায়ুকোষের ক্ষরণ ঘটে ঘন-ঘন এবং পেশীতন্তুর সংশ্লিষ্ট শ্রেণী থাকে সংকুচিত অবস্থায় আর পেশীসমগ্রের টান-অবস্থার সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয়ত, উদ্দীপিত পেশীতন্তু গোষ্ঠীর মোট সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। সঞ্চালক এককের পেশীতন্তু উদ্দীপিত হলে পেশীকোষে জন্ম দেয় এক বৈদ্যুত ক্ষরণ যারনাম 'ক্রিয়া বিভব' (action potential)।

চারটি পেশী বা পেশীগোষ্ঠীর অনুসন্ধানে ব্যবহৃত তড়িৎ-পেশী-লেখে (Electro-myography)-র ফলাফল নিচে দেয়া হলো ঃ

(১) বহিঃস্থমধ্যপাঁজর (external intercostals)—প্রতিটি পাঁজরে বিদ্যমান পেশীর সরুপাত (sheet) যাকে বলা হয় বহিঃস্থ মধ্যপাঁজর। এদের তন্তু উপরে ও পিছনে এমনভাবে বিস্তৃত যে এরা পেশীপাতের নিম্নতর অংশরূপে পরিচিত আর পাঁজরকে সংযুক্ত করে প্রথম পাঁজর, গ্রীবার কশেরুকা (vertebrae of the neck) ও করোটি-ভূমির (base of the skull) সঙ্গে। এদের কাজ হলো পাঁজর পিঞ্জরের উত্তোলন ও ফুসফুসের সম্প্রসারণ।

(২) অন্তঃস্থ মধ্যপাঁঞ্জর (Internal intercostals)—এদের অবস্থান ও পাঁজরের মধ্যবর্তী, তবে বহিঃস্থ মধ্যপাঁজরের তুলনায় গভীরতর। এদের তন্তুগুলি নিচে ও পিছনে বিস্তৃত এবং বহিঃস্থ মধ্যপাঁজরের সঙ্গে কৌণিকভাবে অবস্থিত। এরা পেশীপাতরূপে গণ্য আর পাঁজরকে সংযুক্ত করে শ্রেণীচক্রের (pelvis) সঙ্গে অন্যান্য পেশীপুঞ্জ অর্থাৎ কুক্ষীয় আন্তর তির্যক মারফতে। এদের কাজ হলো পাঁজরকে টেনে নামান, যার ফলে বক্ষবিবরের আয়তন কমে যায় এবং ফুসফুসে বায়ুচাপ বাড়ে।

(৩) পশ্চাদ্দেশীয়, কুক্ষীয়, আন্তর ও বাহির তির্যক—এরা কুক্ষি ও পশ্চাতের পেশীপুঞ্জ, যা প্রধানত ভুজ ও দেহকাণ্ড (trunk) বংকন (bending) সম্পর্কীয় পেশীক্রিয়ায় ব্যবহৃত হয়। তবু তারা বক্ষবিবরের আয়তন হ্রাসের সহায়ক হয়, যখন ফুসফুস থেকে বায়ু বের করে দিতে চরম প্রচেষ্টা চালান হয়।

(৪) মধ্যচ্ছদা—এ কুম্ভকাকৃতি (dome-shaped) পেশী, যা উরসক্রিয়ার ভূমি। এর সংকোচনে বক্ষোগহ্বর অধরিকভাবে (inferiorly) বেড়ে যায় এবং তাতে ফুস্‌ফুসের সম্প্রসারণ ঘটে।

বাক্-উচ্চারণে শ্বাসপেশীর প্রকার ও মাত্রা নির্ভর করে দুটি জিনিসের উপর—এক, উপশ্বাসরন্ধ্রীয় চাপ ; দুই, ফুসফুসীয় বায়ুর পরিমাণ। তাই

দেখা যায় প্রথমত আধলিটারের (litre) ও কিছু বেশী স্বাভাবিক শ্বাস ; দ্বিতীয়ত, বলন প্রস্তুতিকালে গভীর প্রশ্বাস ; ও তৃতীয়ত, বলনকালে আয়তন হ্রাস। উক্তিকালে উপশ্বাসরন্ধ্রীয় চাপের স্তরমধ্যকে (mean level) বৃদ্ধি ঘটে ; উক্তির পরে উপশ্বাসরন্ধ্রীয় চাপ আবার ফিরে আসে পূর্ববর্তী স্তর-মধ্যকে এবং শ্বসন চল্‌তে থাকে। কণ্ঠতন্ত্রীর নিচেকার বায়ুচাপ চারটি কারকের (factor) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত—

(ক) চাপ কমে যায় প্রশ্বাসের পেশীয় ক্রিয়ায়, যেমন বহিঃস্থ মধ্যপাঁজর দ্বারা পাঁজর পিঞ্জরের উত্তোলন বা মধ্যচ্ছদার সংকোচন। উভয় ক্রিয়ায় বক্ষো-গহ্বরের সম্প্রসারণ ঘটে।

(খ) চাপ বাড়ে নিঃশ্বাসের পেশীয় ক্রিয়ায় এবং এর অংশভাক্ হলো অন্তঃস্থ মধ্যপাঁজর, বহিঃস্থ তির্যক বা ঋজু-উদরীয়-পেশী পুঞ্জ ঃ এরা প্রত্যেকেই বক্ষোগহ্বরের আয়তন কমাতে পারে।

(গ) চাপ-প্রভাবিত হবে শ্বাসরন্ধ্রে বা কণ্ঠ পথের অন্যত্র বায়ুপ্রবাহের বাধাসৃষ্টিতে।

(ঘ) শ্বাসনালিক চাপ প্রভাবের অন্ত্য কারক হলো শ্লথন চাপ অর্থাৎ কুক্ষি নির্গত বল ও ফুস্‌ফুসীয় বিততকলা-প্রেরিত বলের সমষ্টি এবং পাঁজর পিঞ্জরের স্থিতিস্থাপক গড়ন। গরিষ্ঠ প্রশ্বাসের পরে শ্লথনচাপ জলের ৩০ সেন্টিমিটারের বেশি হতে পারে ; কিন্তু স্বাভাবিক প্রশ্বাসে, যেমন শান্তশ্বসনে এ জলের ৫ সেন্টিমিটার।

এই চারটি কারক হাপর জোড়ের অনুরূপ। প্রথমত, হাতল (handle) গুলোর পৃথকীকরণের ক্রিয়াবিধির সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বহিঃস্থ মধ্যপাঁজর ও মধ্যচ্ছদার প্রশ্বাসীয় ক্রিয়াকলাপের। দ্বিতীয়ত, হাতল-একত্রনী প্রতিরোধী ক্রিয়াবিধির সগোত্রীয় হলো অন্তঃস্থ মধ্যপাঁজর ও অন্যান্য পেশীপুঞ্জের নিঃশ্বাসীয় ক্রিয়াকলাপ। তৃতীয়ত, পরিবর্তী (variable) রন্ধ্রের (orifice) অনুরূপ হলো শ্বাসরন্ধ্রে ও কণ্ঠপথে সংকীর্ণনেয় পরিবর্তন। চতুর্থত, হাতল মধ্যবর্তী স্প্রিং-এর সঙ্গে সাদৃশ্য আছে শ্লথন চাপের।

কাজেই দুটি ঘটনা মধ্যপাঁজরীয় ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেচে। প্রথমটি হলো ফুস্‌ফুস্ নির্গত বায়ুপ্রবাহের বৃদ্ধির হার যা দেখা যায় অঘোষ ধ্বনিতে। দ্বিতীয়ত, অন্তঃস্থ মধ্যপাঁজরীয় ক্রিয়াকলাপ ফুটে ওঠে সরল উক্তিতে, যেমন একক প্রচাপিত অক্ষরের পুনরাবৃত্তিতে। এখানে দুটি জিনিস দ্রষ্টব্য। এক, উক্তিকালে পেশীয় ক্রিয়ার সাধারণ বৃদ্ধি ঘটে ঃ দুই, পেশীয় ক্রিয়া ফেটে পড়ে দমকে-দমকে (bursts) এবং দেখা দেয় প্রতিটি অক্ষরের অব্যবহিত পূর্বে। প্রথমটি সামিল হয় উক্তিকালীন ফুস্‌ফুসীয় বায়ুর আয়তন হ্রাসের সঙ্গে ; আর

দ্বিতীয়টি ধ্বনিতাত্ত্বিক প্রচাপের সঙ্গে। এখানের লক্ষণীয় কেউ-ই এমনকি শিশুও, অক্ষরের চেয়ে কোন ছোট কিছু উচ্চারণ কর্তে পারে নাঃ নিশ্চয়ই সে একটি স্বতন্ত্র 'ব' বা 'প' সৃষ্টি কর্তে পারে না। দ্বিতীয়ত, 'শিশুদের অস্ফুট শব্দে (babble) অক্ষরের চেয়ে ক্ষুদ্রতর কোন এককের সন্ধান পাওয়া যায় না; যেমন তারা বলতে পারে 'মা, মা, মা, না, না, না, বা, বা, বা,' কিন্তু কখনো, বলে না 'মা, না, বা, মা, না, বা, মা, না, বা'। মনে হয় তারা গোটা অক্ষর শেখে, ধ্বনি বিজ্ঞানীদের ক্ষুদ্রতর একক উপেক্ষা করেই। কাজেই আক্ষরিক এককই গ্রহিতব্য।[৪]

৪৩ আক্ষরিক ধ্বনি

প্রত্যেক ঐচ্ছিক পেশী গুচ্ছে-সাজান পেশীতন্তুর সমষ্টিতে তৈরি। প্রতিটি তন্তু হলো স্বতন্ত্র একক এবং এর আকৃতি বেলনীয় (cylindrical) বা স্তম্ভাকার (prismatic); আর, এ ৯ থেকে ৪০ মিলিমিটার দীর্ঘ ও এর ব্যাসার্ধ এক মিলিমিটারের দশাংশ থেকে শতাংশ। পেশী প্রবেশক সঞ্চালক স্নায়ু হলো স্নায়ুতন্তুর একটি গুচ্ছ (bundle) এবং এর প্রত্যেকটিতন্তু একটি একক স্নায়ুকোষের শাখা। এই স্নায়ুকোষঙ্গণ (neuron)—কোষ+উপাঙ্গ দিয়ে তৈরি—স্নায়ুতন্ত্রের কার্মিক (functional) একক। আর মানুষের দেহে এর সংখ্যা বহু লক্ষ। সাধারণত কোন স্নায়ু পেশী খাপে প্রবেশ করলে এর বিভিন্ন তন্তুর বিচ্ছুরণ ঘটে এবং প্রত্যেকে শাখাপ্রশাখায় চারিয়ে যায় ১৫০ থেকে ১৬০ বার, যতক্ষণ না একটি একক স্নায়ু শাখা একটি একক পেশীতন্তুতে প্রবেশ করে। তাই যেকোন পেশীয় ক্রিয়ার সঞ্চালক একক হলো একটি সঞ্চালক কোষঙ্গণ যার সঙ্গে যুক্ত থাকে পেশীতন্তুর একটি গোষ্ঠী।[৫]

প্রত্যেকটি পেশীয়তন্তু সংকুচিত হয়ে প্রবেশক প্রতিটি স্নায়ুঘাত কে তার যথা সাধ্য গরিষ্ঠ টান দেয়। আর কোষঙ্গণ থেকে স্নায়ুঘাতের বিস্তার প্রায় ধ্রুব থাকে। তাই যে-কোন উদ্দীপন পূর্ণ সাড়া জাগায়ঃ এ-ক্ষেত্রে প্রতি-ক্রিয়া ঘটে "সর্বাস্তি বা নাস্তি"-র সূত্রে। প্রত্যেক স্নায়ুঘাতের বৈদ্যুত বিভব-লক্ষণের আবির্ভাব ও তিরোভাবের কাল প্রায় ·০০৩৫ সেকেণ্ড এবং ·০০৩ সেকেণ্ড যাবৎ স্নায়ু স্বাভাবিক উদ্দীপনে দুর্গল (refractory) থাকে নতুন ঘাত প্রেরণের আগেভাগে। স্নায়ুতন্তু দিয়ে এরূপ ঘাতের বিস্তারণ (propagation) হার প্রায় প্রতি সেকেণ্ডে ১০০ মিটার। স্নায়ুতন্তুর পূর্ণ উদ্দীপনে প্রত্যানয়ণের (restoration) তুলনায় পেশীতন্তুর শ্লথন (relaxation) বেশি সময় নেয়। কাজেই স্নায়ুঘাত শ্লথন কালের বেশি হারে পেশীতন্তুতে প্রবেশ করলে পেশীকোষের পূর্ণ সংকোচন আবিষ্ট (induced) হয়।

একটি একক স্নায়ুঘাতে আসে পেশীতন্তুর টান আর প্রতি সেকেণ্ডে ৪০ বা ৫০ হারে স্নায়ুঘাতের পুনবৃত্তিতে ঘটে তন্তুর গরিষ্ঠ সংকোচন বা ধনুষ্টঙ্কার। অবশ্য চরমসীমার নিচেকার হারে স্নায়ুঘাত পাঠালে সংকোচনের একটি অনুক্রম দেখা যায়ঃ ফলে প্রতি দু'টি ঘাতের মাঝখানে পেশীয়তন্তু শ্লথনে যেতে পারে। বাক্‌-এ ব্যবহৃত পেশীক্ষেত্রে উদ্দীপন আসে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্র থেকে আর যে-কোন বাক্‌-বিচলন হলো স্নায়ুঘাতের দেশকালীয় আদর্শ সঞ্জাত মাত্রিক সক্রিয়তা।

বৃত্তি অনুসারে বাগ্‌ধ্বনিকে দু'ভাবে ভাগ করা যায়ঃ অক্ষরীয়ক (syllabics), ও অনক্ষরীয়ক (non-syllabics)। এ-বিভাগের ভিত্তি হলো অক্ষরের স্বীকৃতি। অক্ষরীয়ক হলো ধ্বনি সমষ্টি এবং এর পরিচিতি মেলে শাব্দ অভিলেখকের ডেসিবেল মাপনী ($১০^{-৬}$ watt) প্রদর্শিত শব্দশক্তির নির্দিষ্ট "চূড়া"-য়। যে-কোন উক্তির প্রতিটি ভগ্নাংশের জন্যে আছে একেকটি 'চূড়া' যাকে বলা হয় অক্ষর। আর Stetson বলেচেন যে অক্ষর হ'লো একটি সঞ্চালক একক। অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষরই ভিত্তিগত ভাবে একটি গোটা বিচলনজট যার বৃহত্তর অন্তর্নিহিত বিচলন হলো শ্বাস স্পন্দ বা বক্ষঃপেশীতন্ত্রীয় ঘাত (thrust) এবং এতে ফুসফুসে ঘটায় বায়ুর সংনমন। তারপরে বায়ু-বিচ্ছুরণ শুরু, নিয়ন্ত্রিত বা প্রতিহত হয় উচ্চারক প্রত্যঙ্গের বিচলনে। কাজেই অধিকাংশ আক্ষরিক বিচলনের নিয়ামক হলো অনক্ষরীয়ক, কিন্তু অক্ষরীয়ক গৌণ উপাদান। Stetson এর মতে, অক্ষর বাস্তব, অলীক হয়।[৬]

বাক্‌-সৃষ্টি ও প্রত্যক্ষণের একক আছে। উক্তি হলো বাক্‌যন্ত্রীয় নিয়ন্ত্রিত অঙ্গভঙ্গির শ্রেণী। নতুন উক্তির সৃষ্টি লগ্নে আছে সীমিত সংখ্যক সঞ্চিত অনুজ্ঞার বিন্যাস। অনুরূপভাবে বাক্‌-প্রত্যক্ষণে আছে নক্‌শা—অনুবন্ধী প্রক্রিয়া যাতে পূর্ণ উক্তির তুলনায় কিছু-কিছু ক্ষুদ্রতর সঞ্চিত একক বর্তমান। বাক্‌-বোধের মূলকথা শ্রুতি-উদ্দীপক থেকে তথ্যসংগ্রহের প্রক্রিয়া। এতে একধ্বনির সঙ্গে অন্য ধ্বনির সাদৃশ্য নিরূপণ ও পৃথকীকরণ এ-দুই-ই ঘটে। প্রত্যক্ষণের বেলায় প্রসঙ্গ (context) শ্রোতার উপর প্রভাব বিস্তার করে তিনভাবে। প্রথমেই আছে "সন্নিবেশ প্রসঙ্গের" অভিক্রিয়া (effect), যেমন বক্তা ও শ্রোতার সনাক্তকরণ, দেশ-কাল ও পূর্ববর্তী ভাষণ। দ্বিতীয়ত, ভাষাতাত্ত্বিক প্রসঙ্গে প্রভাবিত হয় শ্রোতা, যেমন সন্ধির নিয়ম। তৃতীয়ত, পুরোগামী শব্দের ধ্বনিক (acoustic) প্রসঙ্গ। এর প্রভাব নৈঃশব্দ্যের ৭½ সেকেণ্ডকাল স্থায়ী হয়। অবশ্য মনস্তাত্ত্বিক বর্তমানে গরিষ্ঠ স্থিতিকাল হলো ২·৩ এবং ১২·০ সেকেন্ডের মধ্যবর্তী। এখানে স্মর্তব্য যে বাগ্‌ধ্বনির সঙ্গে অন্যান্য শ্রুতি উদ্দীপক-এর তফাৎ এই যে এখানে প্রতিটি শ্রোতা সম্ভাব্য বক্তা, যে যা শোনে তার রব কর্তে অভিজ্ঞ।

ফলে শ্রোতা বাগ্ধ্বনির শ্রাব্যগুণাবলীর বিন্যাস কর্তে পারে উৎপাদনী সঞ্চালক ক্রিয়ায় ও উদ্দীপকের শাব্দিক ধর্মে। শব্দসৃষ্টিতে বক্তার তিন রকমের প্রত্যাবৃত্তপুষ্টি (feedback) আছে—(১) অস্থি ও বায়ু পরিবহন (conduction) —জাত শ্রুতি (auditory) পুষ্টি ; (২) ওষ্ঠ, জিহ্বা, তালু ও কণ্ঠনালীর বিভিন্ন প্রত্যঙ্গের মধ্যে স্পর্শ্য (tactile) পুষ্টি ; এবং (৩) পেশীপ্রসার ও সন্ধি (joint) বিচলন-জাত সঞ্চালক (kinaesthetic) পুষ্টি। এ-সব উপাত্ত থেকে এটাই মনে হয় যে ক্ষুদ্রতম একক কেন্দ্র-সঞ্চিত অনুজ্ঞার সামিল এবং গোটাটাই ঘোড়ার (trigger) মতো বেরিয়ে আসে কম পক্ষে দু'টি মূলধ্বনির অঙ্গভঙ্গি হিসেবে। তাই অক্ষর-ই হ'য়ে দাঁড়ায় ভিত্তিক ক্ষুদ্রতম এককের সম্ভাব্য প্রার্থী। এর অর্থ হলো এই যে কেন্দ্রীয় প্রক্রিয়ায় সঞ্চিত থাকে বহুসংখ্যক একক। সবচেয়ে মিতব্যয়ী আদর্শে বিধৃত আছে সঞ্চিত এককাবলী যার অনুরূপ হলো স্বর এবং আদি ও অন্ত্য ব্যঞ্জন সহধ্বনি (allophone)।[৩]

অক্ষরীয়কের সারাৎসার হলো এই যে ফলের দিক থেকে (gennemically) এ হবে অক্ষরের প্রধান অনুনাদীয় উপদান অথবা ফলনের দিক থেকে (genetically) অক্ষরের নির্গত শ্বাস স্পন্দের বাহন। অত্যন্ত অনুনাদশীল উপাদানকে বলা হয় স্বর। অথচ স্বর ও ব্যঞ্জনকে ফল বা ফলন হিসাবে বিচার করার সত্যিকার সন্তোষজনক কোন পদ্ধতি নেই। যাই হোক, স্বর হলো অত্যাবশ্যক গীতল ধ্বনি, যেমন ব্যঞ্জন অত্যাবশ্যক অপস্বর। প্রথমের বেলায় মৌল ধ্বনি উৎপন্ন হয় স্বরযন্ত্রে আর পরিবর্তিত হয় অতিকণ্ঠনালীয় প্রত্যঙ্গে। ব্যঞ্জনের বেলায় কিন্তু স্বর-যন্ত্রীয় ক্রিয়া অত্যাবশ্যক নয় ঃ এ শুধু বায়ুপ্রবাহকে গলনালীতে পরিবহন করে। অতিকণ্ঠনালীয় প্রত্যঙ্গই ব্যঞ্জনের ধ্বনি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। যে-জোর নিয়ে অক্ষরের ক্রমিক ধ্বনিমালা আমাদের শ্রবনেন্দ্রিয়কে আঘাত করে তাকেই বলা হয় অনুনাদ বা অনুরণন। অনুরণন উর্ধ্বগ মানে নিচেকার ধ্বনি-গুচ্ছকে সাজান যেতে পারে এভাবে—

১. ব্যঞ্জন—(ক) স্পৃষ্ট, যথা, প, ট, ক ; ব, ড, গ, ; এবং
(খ) মুক্ত, যথা, ফ, স ; ভ, জ।

২. স্বরকল্প (vowellike)—যেমন ল, ম, ন, র ; ও।

৩. স্বর—যেমন ই, উ, এ, অ।

বাক্-এর অত্যন্ত স্বাভাবিক বিভাগ হলো অক্ষর ঃ এরা ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ যাতে আমাদের কান বাক্যকে বিভক্ত করে। আর অক্ষরের সবচেয়ে অনুরণনশীল ধ্বনি অর্থাৎ যাকে কেন্দ্র করে অন্য সব ধ্বনি সংঘবদ্ধ হয় তাকেই বলে

ঐ অক্ষরের আক্ষরিক ধ্বনি। কাজেই আমরা বলতে পারি যে আক্ষরিক ধ্বনি সাধারণত স্বরই বটে আর স্বরের বিশিষ্ট বৃত্তি হলো অক্ষর তৈরি, কিন্তু স্বরকল্প অক্ষর তৈরী কর্তে পারে, আবার নাও পারে।[৭]

এখানে লক্ষণীয় যে স্বাভাবিক উক্তির ধ্বনিক্রমে থাকে অনুনাদের চূড়া (peak) ও খাদ (valley)। যে-সব ধ্বনিতে অনুনাদের চূড়া তৈরি হয় তাদের বলা হয় আক্ষরিক আর উক্তিতে থাকে একাধিক অক্ষর, কেননা আক্ষরিক ধ্বনিমালা এরি অন্তর্গত। সাধারণত নির্নায়ক উপাদান হলো চাপ-বন্টন : একেকটি স্বর স্বতন্ত্র চাপঘাতে উচ্চারিত হতে পারে আবার একটি একক ঘাত দুয়ের উপর বিস্তৃতও হতে পারে। শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রথম বা দ্বিতীয় স্বরটি অধিকতর অনুরণনশীল হয়ে আক্ষরিক চূড়ার কাজ কর্তে পারে এবং অন্যটি হয়ে যায় অনাক্ষরিক। দ্বিস্বর ধ্বনি (diphthong)-তে দেখা যায় অক্ষরীয়কের তুলনায় অনক্ষরীয়ক স্বরের উচ্চতর জিভ-অবস্থান। সন্নিহিত অক্ষরীয়ক স্বর সম্পর্কিত হলে তাকে বলে অর্ধস্বর।[৮] এ স্বর আগেও থাকতে পারে আবার পরেও, যেমন 'করিই্‌', 'শোও্‌' প্রভৃতি। তবে অর্ধস্বর দিয়ে বাঙলায় অক্ষর ও শব্দ সূচনা খুব কমই হয়। বিদেশী 'ইয়ার' 'ইয়োরোপ' 'ওয়ার্ড' শব্দে ছাড়া আদৌ হয় কিনা তা তর্কসাপেক্ষ। কিন্তু চার্লস্‌ ফার্গুসন ও মুনীর চৌধুরী বাঙ্‌লায় চারটি - ই্‌, উ্‌, এ্‌ (য়্‌), ও্‌—অর্ধস্বরধ্বনি নির্ধারণ করেচেন। অক্ষর গঠনে চূড়াটি প্রথমে আর খাদটি পরে বসে, যেমন 'আয়্‌' 'উড্‌,'।[৯] তবে অর্ধস্বর (semi-vowel) ও স্বরকল্প (vowel-like) এর মধ্যে প্রভেদ আছে। প্রথমটির আঙ্গিক গঠন স্বরের কিন্তু শব্দতত্ত্বের দিক থেকে ব্যঞ্জন। আর স্বরকল্প আঙ্গিক গঠনে ব্যঞ্জন সদৃশ, কিন্তু শব্দতত্ত্বে ব্যঞ্জন নয়, স্বরই বটে, যেমন, র্‌, ল্‌, ম্‌, ন্‌, (r, l, n, m,)।[১০]

এখানে মনে রাখতে হবে যে বাঙলায় মূল স্বরধ্বনি হিসেবে কোন দীর্ঘ-স্বর নেই। কোনো অক্ষরকে গুরুত্ব দিতে হলে ঐ অক্ষর-নির্ভর স্বরধ্বনি সাময়িকভাবে দীর্ঘ হতে পারে। তবে স্বাভাবিক উচ্চারণে অন্ত্যাক্ষর (ultimate syllable)-এর স্বরধ্বনিই দীর্ঘতম হয়। এ-কারণে 'আজ', 'কাল', 'যা' 'তা' প্রভৃতি একাক্ষরিক (mono-syllabic) শব্দের স্বরধ্বনিও দীর্ঘ। কিন্তু বহু-আক্ষরিক (poly-syllabic) শব্দে অন্ত থেকে আদি অক্ষরে আসতে গেলে দেখা যায় তার আনুপাতিক কালহ্রস্বতা। আবার প্রথম থেকে শেষ অক্ষরের হিসেবে স্বরধ্বনির বৃদ্ধিই সূচিত হয় এবং অন্ত্যাক্ষরটি হয় দীর্ঘতম। তাই বাঙলার স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য ধ্বনিমান গত (phonemic) নয়, কিন্তু উচ্চারণ গত (phonetic)।[১১] অনুনাদের দিক থেকে ব্যঞ্জনে দেখা যায় ৬টি স্বাভাবিক

শ্রেণী ঃ ব্যঞ্জন ; অনুনাসিক ; পার্শ্বিকধ্বনি ; কম্পনজাত 'র্' ; উচ্চস্বর, যথা 'ই', বা 'ড' ; এবং নিম্নস্বর, যথা, 'অ', বা 'ও'।

বাক্-এর শাব্দিক ব্যাপারটা ব্যাখ্যা করেছেন Homer Dudley বেতার দূরভাষের (radio telephony) বিস্তার মডুলনের ভিত্তিতে। এর সহায়ক হয়েছে Bell Telephone Laboratories এর Vocoder ও Voder। এতে প্রেরক-নির্গত নিত্যতরঙ্গ মালার প্রয়োজন। এই বাহকতরঙ্গে প্রযুক্ত হয় বাহকের ব্যতিকরণে (interference) বা মডুলনে বার্তাবহ তরঙ্গরূপ। ফলে দেখা দেয় অধ্যারোপিত বিন্যাসে (superimposed configuration) এক বাহক তরঙ্গমালা আর এই বিন্যাসই গৃহীত ও ব্যাখ্যাত হয়। মানুষের বাক্-এ আছে দু'টি স্বতন্ত্র বাহক-উৎস—এক, কণ্ঠপটির স্পন্দমান ভ্যান্‌ভ্যানানি ; দুই, বহির্গামী শ্বাসপ্রবাহে বাধা-সঞ্জাত ফোস্‌ফোসানি বা এলামেলো (random) রব। অবশ্য ঘোষ ব্যঞ্জনে বাহক উৎস দু'টি যুগপৎ ক্রিয়াশীল। জিভ্, কোমলতালু, হনু ও ঠোঁটের বিচলন শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজনে এতটা মন্থর যে এদেরকে স্পন্দমান গতি হিসেবে শোনা যায় না। যা আমরা শুনি তা হ'লো ধ্বনির স্থির উৎস বা বাক্-এর বাহক কম্পাংকের উপর এইসববিচলনের মডুলনীয় অভিক্রিয়া।[৫] এরি সঙ্গে মিলে যায় Stetson এর ব্যাখ্যাও ঃ "বাক্ হলো বিচলন-প্রসূত একপ্রস্ত ধ্বনির চেয়ে বরং একপ্রস্ত বিচলন যা শ্রাব্য হয়।"[৬]

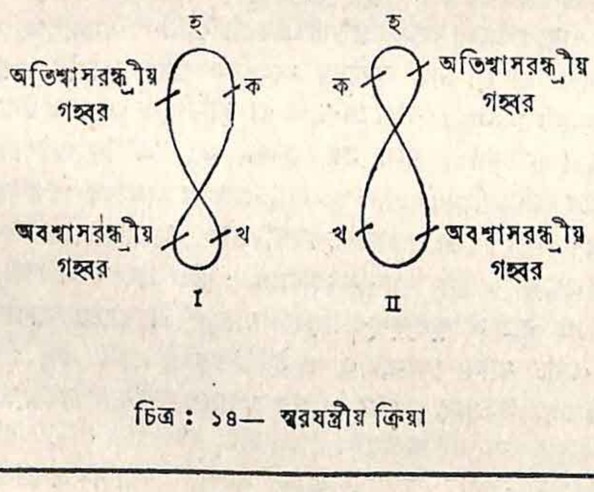
৪.৪ স্বরযন্ত্রীয় ক্রিয়া

ফুসফুস্-ই ধ্বনি-উৎপাদনের জনিত্র (generator)। এখান থেকে সব বায়ু এক সময়ে বের হয় না। ফুস্‌ফুসের সমমাপের ছোট-ছোট শ্বাসক্ষেপণের সঙ্গে নিঃসৃত বায়ু-প্রবাহের ফলে জন্ম নেয় একেকটি ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ, যা অক্ষর হিসাবে চিহ্নিত হয়। তাই শ্বসনের স্বল্পতম প্রয়াসে একটি বক্ষঃস্পন্দের (single breath pulse) ফলে যে-ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একবারে উচ্চারিত হয় তাকেই অক্ষর (syllable) বলা হয়, যেমন 'ও', 'এ' কিংবা 'বাক', 'প্রাণ' প্রভৃতি। তবে ধ্বনি (phone বা sound)-র সঙ্গে অক্ষরের পার্থক্য আছে। ব্যবহারিক দিক থেকে ধ্বনি স্বয়ংসম্পূর্ণ অবিভাজ্য একটি ছোট একক ; অন্যদিকে অক্ষর এক বা একাধিক ধ্বনি সমবায়ে গঠিত এবং ফলে তা বিভাজ্য (divisible)ও বটে। ফুস্‌ফুস্-তাড়িত বায়ুর একবারের ধাক্কায় সৃষ্টি হ'তে পারে একটি ধ্বনি যেমন, এ, ও, ই, উ প্রভৃতি, একটি শব্দ (word) যেমন বাক্, কান্, ইত্যাদি, অথবা শব্দের খণ্ডাংশ যেমন, আ/বার্, প্র/মান্ প্রভৃতি। একটিমাত্র ধ্বনি উত্থিত হলে তাকে বলা হয় শুদ্ধ ধ্বনি (phone), যেমন এ, ও, ক্, ন্ ; আর কয়েকটি ধ্বনির সমবায় দেখা দিলে সে হয়ে ওঠে

অক্ষর, যেমন ব্‌+আ+ক্‌=বাক্‌, বা ক্‌+আ+ন্‌=কান্‌ প্রভৃতি।[১১] এখানে মনে রাখতে হবে যে ছন্দ নির্ণয়ে ও আলোচনায় অক্ষরের বিভাজন কাম্য নয়, যেহেতু এ একক। ফলে 'অনু-বিভাজন এখানে অবৈজ্ঞানিক'।[৫] Stetson তাই অক্ষর-কে বলেচেন "ক্ষুদ্রতম, অবিভাজ্য, ধ্বনিতাত্ত্বিক একক।" ভিত্তি হিসাবে অক্ষর হ'লো এক দমক বায়ু, যা আন্তর পাঁজরীয় পেশী সংনমনের ধাক্কায় কণ্ঠনালীর ভিতর দিয়ে উর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হয়। সাধারণত এ কণ্ঠতন্ত্রীর ক্রিয়ায় মডুলিত হয়। এর সহযাত্রী হলো আনুষঙ্গিক বিচলন অর্থাৎ অক্ষর উপাদান যা একে বিশেষিত করে।

এবার স্বরযন্ত্রীয় ক্রিয়ার কথা। কণ্ঠতন্ত্রী নির্গমন বায়ুথেকে জন্ম দেয় বাক্‌-এর তবে ঘোষীভবন নির্ভর করে এর বাধার পরিমাণের উপর। এ অবশ্য বাক্‌-এর, মৌল প্রস্বরের নিয়ামক। কিন্তু এখানে বিবেচ্য যে শ্বসন যন্ত্রটি দু'টি ভাগে বিভক্ত—শ্বাসরন্ধ্রে বিভক্ত দু'টি গহ্বর, যথা অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় (supra-glottal) ও অবশ্বাসরন্ধ্রীয় (infraglottal)। প্রথমটি শেষরটির তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র। তবে অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় গহ্বরের চাপভেদ অবশ্বাসরন্ধ্রীয় চাপ প্রকরণ প্রভাবিত কর্তে পারে। ব্যঞ্জন অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় গহ্ববরের মুখ বন্ধ করে দেয় বায়ুর চাপ বৃদ্ধি করে—এ-চাপ নিঃশ্বাস পেশীয় বিচলনের বিপরীত দিকে কাজ করে এবং একে রুদ্ধ করে দেয়। 'হ'-এর উচ্চারণে স্বরযন্ত্রের কাজ কেমন চলে তা ১৪-সংখ্যক চিত্রে দেখান হ'লো।

বায়ুর একটি বেলুন নিয়ে একে স্ফীত করা যাক—মাঝখানে গিঁট দেয়া



চিত্র : ১৪— স্বরযন্ত্রীয় ক্রিয়া

যাক এবং মুখও গিঁট দিয়ে বন্ধ করা যাক, যাতে বায়ু আর বেরুতে না পারে। ক-অংশে চাপ দিলে খ-অংশ স্ফীত হবে অর্থাৎ ক-এর বায়ু চাপ খ-এর বায়ুতে সঞ্চারিত হবে। এখানে সংঘর্ষ দেখা দেবে—যে বল একে একই আয়তনে রাখতে চায় বা একে হ্রস্বতর কর্তে চায়, তার বিরুদ্ধে চলবে এর প্রতিক্রিয়া। কাজেই অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় গহ্বরের ব্যঞ্জন সংবার নিঃশ্বাস পেশীর বিরুদ্ধে কাজ করবে। শ্বাসলিখের (pneumograph) সাক্ষ্য এরূপ—

(১) বায়ু চাপ সর্বদাই শূন্যস্তরের উপরে এবং এ সংনমিত বায়ু স্তম্ভের ইঙ্গিত করে (suggest)।

(২) মুখের ও বক্ষের বায়ু চাপ বিপরীতমুখী অর্থাৎ মুখের বায়ু চাপ বাড়লে বক্ষের বায়ুচাপ কমে—একে অন্যের বিপরীত কাজ করে। পরীক্ষাগারে দেখা গেচে যে 'টাইট' শব্দের আদি ব্যঞ্জন 'ট' অক্ষর স্পন্দের বিস্পন্দে ঘা দেয়, আর দ্রুত উচ্চারণে বিস্পন্দঘা পড়ে অক্ষরের পিছটে। মন্থর উচ্চারণে প্রত্যেক অক্ষরের পরে শূন্যস্তর দেখা যায়। কিন্তু অতিদ্রুত উচ্চারণ কখনই শূন্যস্তর স্পর্শ করে না।

(৩) ব্যঞ্জন আনুষঙ্গিক বিচলন অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় গহ্বরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, কিন্তু বক্ষ পেশীর সঙ্গে নয়।

(৪) দ্রুত অক্ষর উৎপন্ন হতে পারে সেই সব উপাদানে যারা অতিশ্বাস-রন্ধ্রীয় গহ্বরের বায়ু চাপ নিয়ন্ত্রণে সমর্থ।

Stetson' তাই বলেন যে অনুরেখের (tracing) সাক্ষ্য অনুসারে ব্যঞ্জন সংবারে বক্ষচাপ কম্‌তে থাকে, আর মুখের চাপ বাড়ে দুটি গহ্বরের চাপ ভেদের জন্যে। যদিও একই সময়ে ব্যঞ্জন ও বক্ষপেশী সংকুচিত হয়, বক্ষচাপ বাড়তে সুরু করে ব্যঞ্জন স্পর্শের মাঝামাঝি থেকে। সংশ্লিষ্ট গহ্বরের আয়তনের জন্যে ঘটে ·৯৩—·০৫ সেকেণ্ডের এই শ্লথন বা বিলম্ব (lag)। বাক্‌-এ ২০০০ ঘন সেন্টিমিটারের গহ্বর দ্রুত বন্ধ করে ব্যঞ্জন পেশী, কিন্তু বক্ষপেশী ২৫০০ ঘনসেন্টিমিটার গহ্বরের দেয়ালের সীমিত এলাকায় কাজ করে। দেখা যায় যে ব্যঞ্জন ও বক্ষপেশী একই সঙ্গে সংকুচিত হয় না—প্রতিটি ব্যঞ্জনের সঙ্গে আছে ব্যঞ্জন পেশীর সংকোচন, কিন্তু বক্ষে শূন্যস্তরের ঊর্ধ্বে চাপস্তরের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যে বায়ুচাপ সন্তত বা অনবচ্ছেদ এবং বক্ষনিঃশ্বাসীয় পেশী নিরবচ্ছেদ সংকোচনে অস্তিমান। এখানে লক্ষণীয় যে দ্রুত উচ্চারণে আন্তরপাঁজরীয় ও মধ্যচ্ছদা-কুক্ষীয় পেশীতন্ত্র অনবরত সংকুচিত। অবশ্য বাক্‌-উচ্চারণে ও শ্বাসকর্মে শ্বসন পেশীয় ক্রিয়ায় একটু তারতম্য দেখা যায়—

(১) সাধারণ শ্বসনে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাসে একই সময় নেয়। কিন্তু বাক্‌-শ্বসনে দ্রুত প্রশ্বাসের পরে আসে নিয়ন্ত্রিত মন্থর নিঃশ্বাস।

(২) সাধারণ শ্বসনে এক চক্করের পরে আসে বিরতি ; কিন্তু বাক্-এ ভাষার প্রয়োজনে এ যে কোন স্থানে আস্‌তে পারে।

(৩) সাধারণ শ্বসনে কখনো কখনো দেহের ভৌত প্রয়োজনে আমরা যেমন বেশি বায়ু গ্রহণ করি, তেমনি ছাড়িও বেশি বায়ু। অপর পক্ষে বাক্-এর কারবার ৫০০ ঘনসেন্টিমিটার বায়ুর জোয়ার (tidal air) নিয়ে ; আর আমাদের ফুস্‌ফুসে্‌র ধারণ ক্ষমতা হলো ৫০০০ ঘনসেন্টিমিটার।[১২]

Kruisingha তাই বলেচেন যে স্বরের বেলায় মূল ধ্বনির উৎপাদক স্বরতন্ত্র (larynx) আর অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় প্রত্যঙ্গ এর পরিবর্তন ঘটায়। অপরপক্ষে ব্যঞ্জনের বেলায় স্বরযন্ত্র আবশি[illegible]নয়—এর কাজ হলো বায়ু প্রবাহের গলনালীতে পরিবহন, আর অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় প্রত্যঙ্গ ব্যঞ্জনধ্বনির বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করে। এদের সংজ্ঞা দেয়া যায় এ-ভাবে। বাগ্‌ধ্বনিকে স্বর বলে যখন তাঁরা এমনভাবে উৎপন্ন হয় যে বায়ু প্রবাহ অবাধে মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়। আর বাগ্‌ধ্বনিকে ব্যঞ্জন বলে যখন তারা এমনভাবে উৎপন্ন হয় যে বায়ুপ্রবাহ মুখ দিয়ে নিঃসৃত হওয়ার সময় ক্ষণিকের জন্যে কোন স্থানে স্পৃষ্ট হয় অথবা এমন সংকীর্ণ পথে চালিত হয় যে আমরা ঘর্ষণ (friction) শুনতে পাই।[১৩]

এরি পটে বিবেচ্য অক্ষরে ক্রিয়াশীল বিভিন্নধরনের অক্ষর। প্রথমত, সরলব্যঞ্জন যেমন ব্, প্, স্, প্রভৃতি ; দ্বিতীয়ত, সংযোজক ব্যঞ্জন (linking consonant)। এরা তিন রকমের—যৌগ ; প্রান্তযোজক (abutting) ; ও যুগ্ম (double)। প্রথমের আবির্ভাব হয় যখন অক্ষরস্পন্দে একাধিক ব্যঞ্জন আদি বা অন্তে কাজ করে, যথা, স্প, আৰ্ষ্ট। বাঙলায় কিছু স্বাঙ্গীকৃত (naturalised) যৌগব্যঞ্জন আছে যারা স্থান পেয়েচে বর্ণবিন্যাসে (orthography) যেমন, স্ক, ফ্র, ম্ল, হ্ন প্রভৃতি। প্রান্তযোজক ব্যঞ্জনের উদ্ভব হয় যখন অক্ষরমালায় উক্তির হার বাড়ে এবং প্রথম অক্ষরের অন্ত্য ব্যঞ্জন পরবর্তী অক্ষরের আদি ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয়। এখানে অন্ত্য ব্যঞ্জনের পিছট বিহার হয় ঘনীভূত আর সংযুক্তক যুগল (abutting pair) যে সময় নেয় তা হলো দু'টি আদি ব্যঞ্জনের সময়। বাঙলায় কিছু স্বাঙ্গীকৃত যুগল আছে—(১) এক সদস্যের, যথা 'অব্য' ; (২) দুই সদস্যের, যথা 'আব্দার' ; (৩) এক সদস্যের একই স্পর্শবিন্দু, যেমন 'অ্যাটলাস' ; (৪) এক সদস্যের বিভিন্ন স্পর্শবিন্দু, যথা 'উলিক' ; ও (৫) দুই সদস্যের বিভিন্ন স্পর্শবিন্দু, যথা 'আবগারী'। এ-ছাড়া যুগ্মব্যঞ্জনের আবির্ভাব ঘটে যখন এক সদস্যের যোগবাহ যুগলের একই স্পর্শ বিন্দুতে একই ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হয়, যেমন, 'পাট্টা,' 'বাট্টা' প্রভৃতি।

এখানে লক্ষণীয় যে সংযোজক যুগলের যৌগ ও প্রান্তযুক্তক রূপের মধ্যে

আছে প্রভেদ। 'স্নান' ও 'দন্ত' এদের পরিচায়ক। প্রথমের 'স্ন' একক ব্যঞ্জনের কাজ করে এবং এ মোচক ব্যঞ্জন রূপে প্রতিভাত হয়। অপরপক্ষে দ্বিতীয়ে 'ন' ও 'ত' দুটি অক্ষরে ক্রিয়াশীল—প্রথম অক্ষরের 'ন্' হলো অন্ত্য ব্যঞ্জন আর 'ত' দ্বিতীয় অক্ষরের আদি ব্যঞ্জন। দন্+ত মন্থর গতিতে উচ্চারিত হলে এরা এদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে; কিন্তু দ্রুত গতির উচ্চারণে এরা হবে প্রান্ত যোজক 'দন্ত', যেখানে 'ন্' ও 'ত' একত্রিত হয়েচে। এভাবে দৎ+ত=দত্ত সাধিত হয়েচে। এখানে প্রথম অক্ষরের অন্ত্যব্যঞ্জনের পিছট বিহার ও পরবর্তী অক্ষরের আদিব্যঞ্জনের বিস্পন্দ বিহার ঘনীভূত হয়েচে। তবে প্রান্তযোজনে (abutting)-র কাল দুটি আদি ব্যঞ্জনের সমান। দ্রুতির হার প্রতি সেকেন্ডে ২.৫ থেকে ৩ অক্ষর হলে, অন্ত্য ব্যঞ্জন ঠিক থাকে: হার বেড়ে ৩ এবং ৪ অক্ষরে দাঁড়ালে এরা প্রান্তযুক্ত ব্যঞ্জন হিসেবে বর্তমান থাকে। সাধারণত হার প্রতি সেকেন্ডে ৫টি অক্ষরে দাঁড়ালে শুধু আদি ব্যঞ্জন দেখা দেয়।

এবার যৌগ ব্যঞ্জনের কথা—এতে দুই বা ততোধিক মূল ধ্বনি থাকতে পারে, কিন্তু এদের একটি থাকে স্পর্শ ধ্বনি (occlusive), অন্যরা তরল স্বর (liquid); তরল স্বরকে বলা হয় অন্তর্ব্যঞ্জন। দুটি তরলে একটি যুগল হতে পারে, তারা দুটি প্রকৃত (true) ব্যঞ্জন নয়। 'স্ন'—তে প্রথম (স) ও দ্বিতীয় (ন) সদস্য সবাই তরলধ্বনি। কিন্তু 'প্লেট'-এ প্রথম সদস্য 'প্ল' প্রকৃতব্যঞ্জন, আর দ্বিতীয় সদস্য তরল। ব্যঞ্জন যদি দুই সদস্যে উৎপন্ন হয়, তাদের উদ্ভব ঘটে যুগপৎ: প্রথম ব্যঞ্জনের উচ্চারণের সঙ্গে-সঙ্গে দ্বিতীয়টিও প্রস্তুত হয় এবং দুটি কাজই কম-বেশি দ্রুতভাবেই সম্পন্ন হয়। 'চ' সম্পর্কে অনুরেখ (tracing) বলে যে এ প্রলম্বিত (continuant) ধ্বনি এবং এর স্পৃষ্টভাব নষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু আমরা জানি যে জিভের ডগার অগ্রভাগ এর স্বাভাবিক বিপরীতের বিরুদ্ধে বন্ধ। সংস্কৃত ধ্বনিবিদরা একে বলেচেন রুদ্ধ বা বন্ধ (shut) ধ্বনি; কিন্তু বাস্তবিক এ যৌগ ধ্বনি। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এ-গোষ্ঠীকে বলেচেন ঘৃষ্ট (affricate)। এ ধ্বনিগুচ্ছ একটি ব্যঞ্জন বা ধ্বনিমূলের সমবায় যে সম্বন্ধে সঠিক কিছু বলা কষ্ট সাধ্য। বিভিন্ন ভাষায় আছে মতভেদ। জার্মানদের উচ্চারণ হলো tsch; ফরাসীদের tch; ইংরেজদের ch; আর সংস্কৃত, বাঙলা ও হিন্দীতে c অর্থাৎ রুদ্ধ ধ্বনি। এ-গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটে যখন কোন শ্রেণী বর্ধমান দ্রুতিতে উচ্চারিত হয়—মোচনের পরিবর্তে অবরোধী ব্যঞ্জন পরবর্তী মোচক ব্যঞ্জনের সঙ্গে সংযুক্ত হয়। যেমন 'টাস, টাস, টাস', বার-বার বর্ধমান দ্রুত উচ্চারণে হয়ে যায় 'স্ট'। ফলে যৌগ মিলন (compound couplet)টি একদিকে যেমন উচ্চারণ দ্রুতির ফল, অন্যদিকে তেমনি প্রান্তযোজক জোড়।[১৪]

ইংরেজি syllable-এর প্রতিশব্দ সংস্কৃতে ও বাঙলায় 'অক্ষর'। এর অর্থ এই যে গুণ, ধর্ম, অবয়ব ও স্বরূপের দিক থেকে যার ক্ষয় (ক্ষরণ) নেই তাকেই অক্ষর বলে ঃ এ স্বয়ং সম্পূর্ণ বা আত্মনির্ভরশীল। আর স্বর-ধ্বনিই হচ্ছে অক্ষরের জীবন অর্থাৎ স্বরই অক্ষর ঃ 'স্বরো হ ক্ষরম্‌।'[১৫] ঋক্‌ প্রাতিশাখ্যে (১৷৩)-র টীকাকার উবট 'স্বর' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ দিয়েছেন ঃ 'স্বর্যন্তে শব্দ্যন্তে পঠ্যন্তে ইতি স্বরা ঃ'। স্বর অন্যধ্বনির সাহায্য ছাড়াই স্বয়ং পূর্ণ ও স্পষ্ট রূপে উচ্চারিত হয় ; আর ব্যঞ্জন স্বরধ্বনি ছাড়া স্বয়ং স্পষ্টরূপে উচ্চারিত হতে পারে না। তাই তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২১।১) বলা হয়েচে ঃ 'ব্যঞ্জনং স্বরাঙ্গম্‌।' ত্রিভাষ্যরত্নে এর ব্যাখ্যা হলো এই যে ব্যঞ্জন একাকী দাড়াতে পারে না এবং তাই সে সাপেক্ষ, আর স্বর নিরপেক্ষ ঃ 'ব্যঞ্জনং কেবলম্‌ অবস্হাতুং ন শক্নোতি কিং তু সাপেক্ষম্‌। স্বরস্তু নিরপেক্ষঃ'। স্বরধ্বনি নিজেই একটি অক্ষর, যেমন 'উনির' 'উ'; ইতি-র 'ই' প্রভৃতি। আবার ব্যঞ্জনের সঙ্গে মিলেও স্বরধ্বনি অক্ষর গঠন করে, যেমন, 'বাজে' অথবা 'কাজে'-র 'বা' 'কা' ও 'জে'। এ-জন্যে সংস্কৃত বৈয়াকরণেরা অক্ষর-নির্মাণে ব্যঞ্জন ধ্বনিগুলোকে একটি মালার মুক্তার সঙ্গে আর স্বরধ্বনিগুলোকে সে-মালার সূত্রের সঙ্গে তুলনা করেচেন।[১৬]

তবে স্বর ও ব্যঞ্জনের পুরনো সংজ্ঞা এখন আর টেঁকেনা। সম্পূর্ণভাবে যুক্ত না হলেও স্বরধ্বনি ছাড়াই ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত, এমন কি পূর্ণভাবে রূপায়িতও হতে পারে। এর সমর্থন মেলে নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনি 'ন্‌', 'ম্‌' এবং 'ঙ' 'তে' ; তরল ধ্বনির অন্তর্ভুক্ত কম্পনজাত 'র্‌'-ধ্বনিতে ; আর পার্শ্বিক ধ্বনি 'ল্‌'—তে। এ-কালের ধ্বনি বিশ্লেষণে উষ্মধ্বনিগুলো এর মধ্যে পড়ে। কোন-কোন ভাষায় এ-ধ্বনিগুলো অক্ষরের মূলাধার (nucleus)। এর কারণ এই যে অক্ষর গঠনে ধ্বনির ব্যঞ্জনা (sonority)-র সঙ্গে আছে বহনক্ষমতা (carrying power) ও গুরুত্ব (prominence)। এক কথায় ধ্বনি-দৈর্ঘ্য, শ্বসন চাপ ও আপেক্ষিক ব্যঞ্জনায় প্রতিষ্ঠিত হয় প্রাধান্য। তাই কোন-কোন ভাষায় স্বর ছাড়াও 'ম্‌', 'ন্‌', 'ল্‌', 'স্‌', প্রভৃতি প্রলম্বিত ব্যঞ্জনগুলো অক্ষর নির্মাণের মূলাধার। যেমন জাপানী ভাষায় ska (হরিণ) শব্দে 'স্‌', kra (ঘাস) শব্দে 'ক্‌' এবং ma (ঘর) শব্দে ম্‌ স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন করেচে। ইংরেজি ভাষায় funnel (funl) এর '1', mutton (mutn) এর 'n' এবং বাঙলায় 'তুমি একথা বল্‌ছো' ! 'ম্‌', ! এর 'ম্‌'। আলাদা অক্ষর তৈরি করেচে। তবে একথা সত্যি যে প্রতিভাষার স্বাভাবিক কথা বার্ত্তায় প্রলম্বিত ব্যঞ্জন ধ্বনি-গুলোর তুলনায় স্বরধ্বনিগুলোর শ্রুতিদ্যোতকতা, বহমান ক্ষমতা ও অনুনাদী ব্যঞ্জনা অনেক বেশি। ফলে স্বর ধ্বনি গুলোই অক্ষরের মূলধার রূপে প্রতিভাত হয়।[১৭]

৪.৫ উচ্চারণের স্বরূপ

ধ্বনি বিজ্ঞানের দিক থেকে বাক্ সর্বদাই শুধুমাত্র ধ্বনির রৈখিক অনুক্রম নয়—এ আরো কিছু। এই ধ্বনিগুলি ফুস্‌ফুস্ বহির্গত বায়ু থেকে উৎপন্ন বলেই বক্ষযন্ত্র অনুক্রমকে অংশে-অংশে ভাগ করে। আর এদের একেকটি বিভাগকে বলা হয় শ্বাসমেল (breath-group)। এ হ'লো এক শ্বসনে উৎপন্ন ধ্বনিমালা। পর্যাপ্ত প্রশ্বাসের প্রয়োজনে এর গরিষ্ঠ স্থিতিকাল নিয়ন্ত্রিত —অবশ্য ফুস্‌ফুসে বায়ু থাকা পর্যন্ত এ স্থায়ী হয় না। দুটি আংশিক-স্বতন্ত্র ক্রিয়াবিধি আছে, যারা বায়ুগ্রহণ ও বর্জনের অর্থাৎ প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসের নিয়ামক। প্রথমটি মধ্যচ্ছদা ও কুক্ষীয় পেশীপুঞ্জে তৈরি; দ্বিতীয়টি বক্ষমধ্যীয় পেশীপুঞ্জে গঠিত। প্রথমে ঘটায় বক্ষবিবরের আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি আর এ ঘটে এর নিচেকার দেয়ালের (মধ্যচ্ছদা) উধর্বাধ বিচলনে। প্রতিটি শ্বাসপর্বেই তাদের গতি কমিবেশি স্থির থাকে; তবে প্রশ্বাসের জন্যে শ্বাসপর্বের মাঝখানে তাদের ক্রিয়া উল্টে যায়। এ হ'লো শ্বাসপর্বের শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি।

অন্যদিকে দ্বিতীয় ক্রিয়াবিধিতে বক্ষমধ্যীয় পেশীপুঞ্জ পাঁজরের ক্রমিক যুগলের মাঝখানে সম্প্রসারিত হয় এবং বক্ষবিবরের আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় পার্শ্বিক দেয়ালের অর্থাৎ পাঁজর-পিঞ্জরকে (rib-case) সঞ্চালিত করে। বাক্-উচ্চারণে বক্ষমধ্যীয় ক্রিয়াকলাপ শ্বাসপর্বের সবটায় সমভাবে থাকে না, কিন্তু এর দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। এ হ'লো বেশি বায়ুসেবী স্বর-এর সঙ্গে কম বায়ুসেবী ব্যঞ্জনের একান্তকরণের অনুবন্ধী। বাক্ তাই ছোট-ছোট স্পন্দশ্রেণীতে বিশিষ্ট হয়ে ওঠে আর এ হলো বক্ষমধ্যীয় পেশী-পুঞ্জের বিচলনের ফল। এই স্পন্দকে বলা হয় ধ্বনিগত অক্ষর। জাতিরূপ হিসেবে (typically) অক্ষরের কেন্দ্র হলো কোন একটি স্বর বা অন্য অনুনাদক এবং শুরু ও শেষ হয় কোন রুদ্ধ উচ্চারিত অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত ধ্বনিতে। ফলে বাক্ এই সব অক্ষর ও শ্বাসপর্বে গঠিত এবং এরাই বাক্-এর ভিত্তিক কাঠামো ও সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত বিভাজন। এ হলো ধ্বনিবিজ্ঞানের কথা: অবশ্য এদের ধ্বনিমূলীয় মর্যাদা আলাদা ব্যাপার। অনেক ভাষায় অক্ষরে কোন ধ্বনিমূলীয় মর্যাদা নেই—এরা ধ্বনিগত ক্রিয়াবিধির অংশমাত্র, যেখানে উচ্চারণই মূলকথা। অন্যভাষায় অক্ষর-স্পন্দের সঙ্গে ধ্বনির সম্পর্ক ধ্বনিমূলের দিক থেকে তাৎপর্যবহ, কাজেই ভাষা-বর্ণনায় অক্ষর বিভাজনের প্রয়োজন দেখা দেয়। এখানে মনে রাখতে হবে যে ধ্বনিমূলীয় (phonemic) ও ধ্বনিতাত্ত্বিক (phonetic) অক্ষর এক নয়। তাই ধ্বনি-বিজ্ঞান

(phonetics) ও ধ্বনিমিতি (phonemics) কে স্বতন্ত্র রাখতে হবে।[18] এরি ব্যত্যয় হলে মারাত্মক ভুলের ফসল ফলে।

বাক্ শ্বসননির্ভর অর্থাৎ ফুস্‌ফুস্ নির্গত বায়ু প্রবাহে উৎপন্ন হয় বাগ্‌ধ্বনি। এই বায়ুপ্রবাহ অনবচ্ছেদ রৈখিক প্রবাহ নয়, কিন্তু স্পন্দকল্প (pulse-like): শ্বসন পেশীর একান্তরী (alternate) সংকোচন ও শ্লথনে ঘটে বায়ুচাপের ছেদহীন দ্রুত উচ্চাবচণ (fluctuation)। প্রতিটি পেশীয় সংকোচন ও ফলে বায়ুচাপবৃদ্ধি হলো উরস্পন্দ (chest pulse), যাতে তৈরি হয় অক্ষর। উরসম্পন্দ বলে এইজন্যে যে বক্ষের পাঁজরমধ্যীয় পেশীপুঞ্জ এর জন্যে দায়ী। মানুষী বাক্-এর ভিত্তি হলো এই উরসম্পন্দীয় পদ্ধতি। এ-ছাড়াও আছে দ্বিতীয় একটি স্পন্দকল্প পেশীয় বিচলন, যার উপর বায়ুপ্রবাহ আংশিকভাবে নির্ভরশীল। এ-পদ্ধতি শ্বসনপেশীর আরো শক্তিশালী ও কমপৌনঃপুনিক সংকোচন মালায় তৈরি—মাঝে-মাঝে এ উরসম্পন্দের সঙ্গে মিলে যায় ও তাকে বলবত্তর করে; আর বায়ুচাপে ঘটায় উল্লেখ্যতর ও আকস্মিকতর বৃদ্ধি। এ-সব বলবত্তরণী (reinforcing) বিচলনে সৃষ্টি হয় প্রচাপস্পন্দীয় পদ্ধতি এবং বাক্-এ সংযুক্ত উরসম্পন্দের সঙ্গে। বাক্‌স্পন্দ তাই দুটি স্পন্দ-পদ্ধতির স্পন্দ: সংলাপের বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টিতে এরা যে-ভাবে মিলিত হয় এ হলো তারি ফল। প্রথমটি অক্ষরকালিক স্পন্দ; দ্বিতীয়টি প্রচাপকালিক স্পন্দ।[19]

অক্ষর ও শ্বাসপর্ব নিয়েই তৈরি হয় বাক্। বর্তমানে প্রায় সকল ভাষায় প্রচাপ (stress) দেখা যায়; কিন্তু বৈদিক ভাষায় ছিল প্রস্বর (pitch) অর্থাৎ উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিত ভেদে বিভিন্ন পথে সুর সঞ্চালিত হতো। বেদের এই স্বরবৃত্তি ছিল ধ্বনিমান-সূচক (phonemic): স্বরের পরিবর্তন ঘটতো, যেমন ব্রহ্মন্—প্রার্থনা, কিন্তু ব্রহ্মন্—পুরোহিত। পরবর্তীকালে এ প্রস্বর রূপান্তরিত হলো প্রচাপ-এ। সংস্কৃতও সংস্কৃতানুবর্তী প্রাকৃত ও আধুনিক ভাষায় বৈদিক স্বর সঞ্চারের পরিবর্তে দেখা দিলো শ্বাসাঘাত: স্বরগ্রামের তীব্রতার জায়গায় এলো শ্বসনের প্রাবল্য। আধুনিক বাঙলায় আদ্যক্ষর প্রচাপিত হওয়ায় ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখা গেচে। পরিবর্তনগুলি এরূপ—

১. আদি হ্রস্বধ্বনির অযথা-দীর্ঘত্ব-প্রাপ্তি: যথা, সংস্কৃত 'অপর'>প্রাচীন বাংলা 'অবর'>মধ্যবাঙলা 'আ অর'>আধুনিক বাঙলা 'আর'।

২. চাপহীন মধ্য স্বরবর্ণের লোপ, ফলে দ্বিমাত্রিকতা বা দ্ব্যক্ষরতা (bi-morism/bi-syllabism), যথা, গামোছা>গাম্‌ছা।

৩. প্রচাপ ও উচ্চারণদ্রুতি (tempo)—জনিত পদ বা বাক্যের সংকোচন যথা, যাইচ্ছা তাই>যাচ্ছেতাই।

৪. চাপজাত ব্যঞ্জনদীর্ঘত্ব (emphatic gemination) যথা, সবাই> সব্বাই।[20]

দ্বিমাত্রিকতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। দু'মাত্রা অর্থাৎ 'চ-ল' এই দুটি অক্ষর সহজভাবে উচ্চারণকালে যতটুকু সময় লাগে, বাঙলা চলিত ভাষার শব্দগুলি আলাদা উচ্চারিত হলে সাধারণত ততটুকু সময়ের দৈর্ঘ্য মেনে চলতে চায়। এ-জন্যে তিন বা চার মাত্রার শব্দ হলে সেগুলিকে সংক্ষিপ্ত করে দু'অক্ষরের বা মাত্রার শব্দে পরিণত করার প্রয়াস দেখা যায়; যথা চলিয়া>চ'লে। এজন্যে একাক্ষর-শব্দ স্বয়ং পৃথক্‌ভাবে উচ্চারিত হলেও বাঙলায় কখনো হ্রস্ব হয়না, কিন্তু দ্বিমাত্রিক বা দীর্ঘভাবে উচ্চারিত হয়; যথা 'রা—ম'—দু'টি হ্রস্ব অক্ষর (syllable) যুক্তপদ এবং দ্বিমাত্রিক; আর 'রা—ম্' দীর্ঘ এক-অক্ষর যুক্ত পদ, একাক্ষর হলেও দ্বিমাত্রিক। বর্ণের নাম, একাক্ষর 'ক—, খ—, গ—, এবং দ্ব্যক্ষর 'ক-কার', 'খ—কার' 'গ—কার' প্রভৃতি—উভয়ই দ্বিমাত্রিক। সুদীর্ঘ বা অনেকাক্ষর শব্দকে যথাসম্ভব দু' অক্ষরের বা দু' মাত্রার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে ভেঙে ল'য়ার দিকে প্রয়াস দেখা যায়; যেমন পূর্ণ উচ্চারণে অ—প—রা—জি—তা (৫ অক্ষর), কিন্তু চলিত কথায় ফলের নাম হিসেবে অপ্—রা—জি—তা (২+২=৪ অক্ষর, দুটি দ্বিমাত্রিক খণ্ডে বিভক্ত)।[21]

বাক্যের উচ্চারণ কালে কোন-কোন পদ একটু জোরের সঙ্গে উচ্চারিত হয় এবং এ-জোর বা চাপ পদের কোনও একটি অক্ষরকে অবলম্বন করে হ'য়ে থাকে। বাঙলার সাধু ভাষায় এবং বিশেষত চলিতভাষায় এ-চাপ পড়ে সাধারণত আদ্য অক্ষরেই; যেমন 'আছে,' 'আছে' নয়, কিন্তু হিন্দীতে দ্বিতীয় অক্ষরে—'গু'সাঈ" বাঙলায় কিন্তু প্রথম অক্ষরে—'গোসাঁই',। আদ্য অক্ষরে চাপ পড়ে যদি শব্দগুলি স্বতন্ত্রভাবে অবস্থান করে; কিন্তু বাক্যে প্রযুক্ত হলে শব্দের স্বকীয় বল খর্ব হয়ে যায় অনেকাংশে। এক নিঃশ্বাসে উচ্চার্য পূর্ণার্থ ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র খন্ড মেলে (weak-group) অর্থাৎ একনিঃশ্বাসময় পর্বে বা শ্বাসপর্বে, অথবা অর্থমেলে বা পর্বে (sensegroup) বাক্য বিভক্ত হ'য়ে যায়। এ-সব শ্বাস-পর্বে বা অর্থপর্বে একাধিক শব্দ বা পদ থাকে, কিন্তু তাদের প্রচাপন অব্যাহত থাকে না। একটি মাত্র প্রচাপন মেলে গোটা শ্বাস বা অর্থপর্ব মধ্যে। যেমন—'আমাদের সঙ্গে / আরো অনেক যাত্রী / মন্দিরের মধ্যে / 'প্রবেশ ক'রেছিল।'[22] এখানে ইংরাজির সঙ্গে বাঙলা প্রচাপনের পার্থক্য। ইংরেজিতে পাঁচ রকমের প্রচাপন দেখা যায়—শব্দচাপ; বাক্যচাপ; বিশেষ চাপ; ধ্বনিমান চাপ; দ্বৈত চাপ, যেমন Interesting; It's about four o'clock;

I said he was unsuccessful ; Increase (noun), Increase (verb) ; arm-chair। কিন্তু বাঙলায় আছে প্রথম তিনটি। শব্দচাপ দেখা যায় অনেকাক্ষরিক বা যৌগ শব্দের প্রথম অক্ষরে, যথা, 'মনোরঞ্জন,' খাওয়া দাওয়া। তবে শব্দচাপ বাক্যচাপের অধীন এবং সংলাপে বাক্যচাপ পড়ে অর্থপর্বের প্রথম প্রধান শব্দের আদ্য অক্ষরে। উদাহরণ আগেই দেয়া হয়েচে। বিশেষ চাপ দেখা দেয় ক্রোধ, আকস্মিক গরমিল ও বিস্ময়ে এবং এ পড়ে, যথা 'আহ' অথবা' 'তুমি' যাও।'[২২] ইংরেজির particle ও preposition অর্থাৎ অব্যয়, নিপাত ও কর্মপ্রবচনীয় ব্যতীত অন্য শব্দগুলিতে, সাধারণত আদ্য অক্ষরে চাপ পড়ে এবং বাক্যে ব্যবহৃত হলেও প্রত্যেকের চাপ অব্যাহত থাকে, কিন্তু বাঙলায় তা নয়। ইংরেজির 'North' ও Wind উভয়ের আছে চাপ এবং মিলিত the 'North' Wind-এ তার লোপ নেই। অন্যদিকে বাঙলায় 'উত্তুরে' ও 'হাওয়া'য় আছে আদ্যঅক্ষরে চাপ, কিন্তু মিলিত 'উত্তুরে হাওয়া'য় আছে একটিমাত্র চাপ যা পড়েচে প্রথমশব্দের প্রথম অক্ষরে। কাজেই বাঙলায় প্রচাপন সম্বন্ধে নিয়ম হলো এই—

(১) স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত শব্দের আদ্য অক্ষরে প্রচাপ পড়ে।

(২) বাক্য এক বা একাধিক শব্দযুক্ত বাক্যাংশে বা বাক্য-খণ্ডে অথবা পর্বে বিভক্ত হয় এবং প্রতিপর্বের অর্থ সম্পূর্ণ ও এক নিঃশ্বাসে উচ্চার্য।

(৩) এরূপ প্রত্যেক বাক্যখণ্ডে বা পর্বে একটিমাত্র প্রচাপ পাওয়া যায় প্রথম বিশিষ্টার্থক শব্দের আদ্য অক্ষরে।

(৪) বাক্যখণ্ডের অন্য শব্দগুলি তাদের নিজ-নিজ পৃথক্ প্রচাপ হারায়।[২১]

(৫) যতদূর সম্ভব প্রচাপন ঘটে প্রায় সমান কালান্তরে অর্থাৎ বাক্যের বিভিন্ন অর্থপর্বের ঝোঁক একই কালদৈর্ঘ্যের দিকে। কালান্তর সমান করার জন্যে স্বল্পসংখ্যক অক্ষরের অর্থপর্বের একটি অক্ষর দীর্ঘায়িত হয়, আর বেশি সংখ্যক অর্থপর্বটি দ্রুত উচ্চারিত হয়। প্রচাপনের এ-সব সমান কালান্তরে ভাষায় ফুটে ওঠে স্পন্দশীল চরিত্র।[২৩]

স্বর ও অর্ধস্বরের পৃথকীকরণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে অবশ্য আক্ষরিক ও অনাক্ষরিক সন্নিকটনে (approximation)। তবে আক্ষরিক ও অনাক্ষরিক খণ্ডের পৃথকীকরণে কোন শারীরবৃত্তীয় বা শাব্দিক ধর্ম সাক্ষাৎ-

ভাবে চোখে পড়ে না। যদিও কোন একক পেশীভঙ্গি অক্ষরকে সূচিত করে না, তবুও উচ্চারণীয় বিচলনের কাল ও সমন্বয়ের জন্যে একটি শারীরবৃত্তীয় এককের সংজ্ঞার প্রয়োজন আছে। বক্তারা তাঁদের উক্তির জটিল পেশীয় ঘটনা-ক্রমকে এককের স্তরক্রমে (hierarchy) প্রকাশ করে এবং তারা জানে কোন্ উক্তির অক্ষর সংখ্যা কত। সাধারণত আক্ষরিক ধ্বনি অনাক্ষরিকের তুলনায় দীর্ঘতর। আবার অনেক ভাষা হ্রস্বদৈর্ঘ্যের তারতম্য (contrast)—কেও ব্যবহার করে। এখানে এই সব পরিবর্তন নির্দিষ্ট করার জন্যে প্রয়োজন "উচ্চারণের একটি লাক্ষণিক হার" (a feature rate of articulation)—এর। উচ্চারণ-হার অবশ্য একটি আপেক্ষিক গুণ যা অনেকাংশে উক্তিহার (rate of utterance) এর উপর নির্ভরশীল। আর শেষেরটি নিরূপিত হয় বক্তার বয়স ও আবেগে।[২৪] এখানে মনে রাখতে হবে যে এই উচ্চারণ-হারই বাঙলা ছন্দে বিশেষ জরুরী। এক-এক ভাষায় একেকটি বৈশিষ্ট্য আছে অক্ষর-মেলে (grouping of syllables)। টিউটনিক ভাষায়, যেমন ইংরেজিতে, আছে প্রস্বন (accent) যা প্রচাপিত ও চাপহীন অক্ষরের উপর নির্ভর করে। রোমানিক ভাষায় এ-কাজ করে উক্তি—দ্রুতি, আর বাঙলায় এ-সম্পাদিত হয় কথন হারে বা উচ্চারণের লাক্ষণিক হারে।[২৫] 'প্রাকৃত পৈঙ্গলম্'[২৬]-এ এর সমর্থন মেলে—

জই দী হো বিঅ বন্নো, লহু জীহা পঢ়ই হোই সোবি লহু।
বন্নোবি তুরিঅ পঢ়িঅো, দোত্তিন্নি বি ঐক্ক জানে হু॥ ১।৮॥

অর্থাৎ যদি দীর্ঘ বর্ণ ও লঘু-জিহ্বায় পঠিত হয়, তাহলে সেও লঘু অর্থাৎ হ্রস্ব হয়ে যায়। বর্ণ যদি তাড়াতাড়ি পড়া যায়, তাহ'লে দু-তিন বর্ণও এক হয়ে যায়।

উচ্চারণ-হার (tempo)—ই ছন্দ-গঠনের মূল উপাদান। তাই ঋক্-প্রাতিশাখ্যে (১৩। ৪৬-৯) আছে—

তিস্রো বৃত্তীরুপদিশন্তি বাচো বিলম্বিতাং মধ্যমাংচ দ্রুতাংচ॥ ৪৬
অভ্যাসার্থে দ্রুতাংবৃত্তিং প্রয়োগার্থে তু মধ্যমাম্।
শিষ্যানামু পদেশার্থে কুর্যাদ্‌বৃত্তিং বিলম্বিতাম্॥ ৪৯

অর্থাৎ উক্তিদ্রুতির তিন অবস্থা—বিলম্বিত, মধ্যম ও দ্রুত। পুনরাবৃত্তিতে দ্রুত-উচ্চারণ, আবৃত্তিতে মধ্যম, আর শিষ্যদের উপদেশে বিলম্বিত। অর্থ ছাড়াও ভাষাতাত্ত্বিক শ্রেণী হিসেবে উচ্চারণ হার তাৎপর্যবহ। কাজেই সর্ব-স্তরের বিশ্লেষণে এর প্রভাব অনস্বীকার্য।[২৭] এখানে ভারতীয়রা পথ-প্রদর্শক।[২৮] তাই ব্যাস শিক্ষায় (৩৪৬) বলা হয়েচে যে দৈর্ঘ্য-বিভেদের ভিত্তি হলো মধ্যমদ্রুতি। প্রাচীন বৈয়াকরণেরা এদের একটি মাপও দিয়েচেন। কৈয়টের[২৯] মতে এ-তিনের অনুপাত হলো—৯ঃ ১২ঃ ১৬ অর্থাৎ দ্বিতীয়টি প্রথমের

এক-তৃতীয়াংশ বেশি, আর তৃতীয়টি দ্বিতীয়ের এক-তৃতীয়াংশ বেশি। কৈয়ট এই অনুপাতকে ভৌত-মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেচেন। ১২ঃ৯ অনুপাতের অর্থ হলো এই যে "মধ্যম বাক্ শ্রবণকালে শ্রোতার সুষুম্না নাড়ী থেকে ১২ বিন্দু স্নায়বিক তরল বেরোয়, আর দ্রুত বাক্-এর বেলায় বিন্দু-সংখ্যা দাঁড়ায় ৯।" অনুপাত নিয়ে মতানৈক্য আছে। ঋক্‌তন্ত্র ব্যাকরণে (২।৩১—৩৩) এ অনুপাত ৩ঃ৪ঃ৫, আর উবট দেখিয়েচেন ১৬ঃ২০ঃ২৫ বা ৪ঃ৫ঃ৬¼।[৩০] এ-ব্যাপারে লন্ডনস্থ পিটম্যান ইস্কুলের অধ্যক্ষ হল্যান্ডের অভিমত হলো ঃ "বাক্ ব্যক্তিগত ব্যাপার বলে বাক্-এর গরিষ্ঠ বা লঘিষ্ঠ হার নির্ধারণ কঠিন। মোটামুটি বলা যায় যে সাধারণ সংলাপে কথনের গড় হার হলো প্রতি মিনিটে আনুমানিক ১৪০ টি শব্দ। অধ্যাপকরা ১২০ থেকে ২০০ টি শব্দ উচ্চারণ করেন, আর শেষেরটি হলো হ্রস্ব উৎক্ষেপ (spurt)"।[৩১] কাজেই অনুপাত দাঁড়ায় ১২০ : ১৪০ ঃ ২০০। এতে মধ্যম হবে ১৫৬। এখানে স্মর্তব্য যে ক্রমিক অনুপাতের নিয়ম অনুসারে মধ্যম= $\sqrt{\text{দ্রুত}\times\text{বিলম্বিত}}$। তাই কৈয়ট ও উবটের গণনা সঠিক অর্থাৎ ৯ঃ১২ঃ১৬ বা ১৬ঃ২০ঃ২৫ নির্ভুল। এরি মধ্যে কৈয়টই ভৌত-মনস্তাত্ত্বিক তথ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করেচেন তাঁর অনুপাততত্ত্ব এবং এ তাই বৈজ্ঞানিক। এ-ক্ষেত্রে হল্যান্ডের ১৪০ এর জায়গায় হবে ১৫৬। এ-প্রসঙ্গে বর্মার সিদ্ধান্ত তাই—২ঃ৩ বা ১৩ঃ১৫—সঠিক নয় বলে মনে হয়। ১২০ঃ১৫৬ঃ২০০ এর ভিত্তিতে প্রথম ও দ্বিতীয়ের অনুপাত হবে ১০ঃ১৩।

এখানে স্মর্তব্য যে কম্পানজাত ধ্বনি (trills), শিস্‌ধ্বনি (taps) ও তাড়ন-জাত ধ্বনি (flaps)-র মধ্যে পার্থক্য আছে যেমন, তেমনি আবার এরা স্পৃষ্টধ্বনি (stops), ঘৃষ্টধ্বনি (fricative) ও সন্নিকৃষ্ট (approximant) ধ্বনি থেকেও আলাদা। তাই স্পন্দন-লক্ষণের দ্বারা কম্পনজাত ধ্বনির (যথা, 'র') ও শিস্‌ধ্বনি (যথা, স্) কে চিহ্নিত করা যায়। এদের পার্থক্য স্পৃষ্ট ও তাড়ন-জাত ধ্বনির বিভেদের তুল্য এবং এতে আরেকটি লক্ষণের প্রয়োজন অর্থাৎ হার। এরি মারফতে পৃথকীকরণ সহজ হয়ে ওঠে। এ হারগ্রামে (rate scale) অধিকাংশধ্বনির স্বাভাবিক মান শূন্য বা 0। তবে যখনি কোন স্পর্শধ্বনি অতিদ্রুত উচ্চারিত হয়, তখন এ উচ্চতর মানে সংখ্যায়িত হতে পারে। এতে তাড়নজাত ধ্বনি (যেমন 'হংস'—এ)-র মান+১ হতে পারে। তাই এ স্পর্শধ্বনি ও তাড়নজাত ধ্বনির সঠিক পার্থক্য নির্দেশ করে এ-ভাবে ঃ স্পর্শ ধ্বনি (যথা ঃ 'র‍্যাট') তাড়নজাত ধ্বনিতে অর্থাৎ 'র‍্যাটি'তে রূপান্তরিত হতে পারে এই হার-লক্ষণের বৃদ্ধিতে। সব দৈর্ঘ্য-ভেদ এ-ভাবে বর্ণিত হতে পারে। প্লুত উচ্চারণরীতি চারটি লক্ষণে বিশিষ্ট করা যায়—স্পর্শন, ঘর্ষণ, স্পন্দন ও দ্রুতি-হারায়ণ।[৩২]

পঞ্চম অধ্যায় ঃ বাক্ প্রবাহ

প্রতিটি উক্তি-ই মাত্রা, প্রস্বর ও প্রচাপের সংশ্লিষ্ট ছান্দসিক লক্ষণযুক্ত একটি সন্তত ও পরিবর্তনশীল ধ্বনিগুণের ছাঁচ। শব্দ হলো এ-সন্ততি থেকে বিমূর্তণ এবং প্রসঙ্গ অনুসারে এর বিভিন্ন ধ্বনিগত রূপায়ণের প্রত্যাশা আবশ্যিক। তা সত্ত্বেও শব্দ বক্তার পক্ষে এক বিভাজ্য ভাষাতাত্ত্বিক বাস্তব। অধিকন্তু কখনো—কখনো এ নিজেই একটি উক্তি গঠনে সমর্থ। শব্দকে বিমূর্ত ভাষাতাত্ত্বিক একক ধরলেও, বিচ্ছিন্ন উচ্চারণে এর মূর্তরূপায়ণ ও যোজিত বাক্-এ এর উচ্চারণের পার্থক্য অবহিত হওয়ার প্রয়োজন, কেননা এ ধ্বনি-পরিবেশ অথবা প্রাস্বনিক বা স্পন্দমান গোষ্ঠীর চাপের অধীন সদস্য হিসেবেই। যোজিত বাক্-এর শব্দরূপ কখনো বিশেষ প্রসঙ্গরূপে পরিচিত।

—এ. সি. গিমসন[১]

৫.১ বাক্—সংযুতি

স্বরযন্ত্রস্থ কণ্ঠতন্ত্রীর ভিতর দিয়ে বায়ুপ্রবাহ সজোরে ফুস্‌ফুস থেকে নিঃসৃত হয়। তন্ত্রীর স্পন্দন প্রেরিত হয় এবং স্বরযন্ত্র, মুখ গহবরের পীঠ ও তালু প্রভৃতি দিয়ে তৈরি অনুনাদী গহ্বরে বলবত্তর হয়। ধ্বনির প্রস্বর নিয়ন্ত্রন করে কণ্ঠতন্ত্রীর ফাঁক-নিয়ামক পেশীয় ক্রিয়া আর তন্ত্রীয় টান। যে জোর নিয়ে বায়ুপ্রবাহ কণ্ঠতন্ত্রীর দিকে ধাবিত হয় তার উপর নির্ভর করে প্রাবল্য। আর ধ্বনিগুণ নিরূপিত হয় বায়ু বিবরের অনুনাদী ক্রিয়ায় যেমন বক্ষ, মুখ, কণ্ঠ, নাসিকা ও অস্থায়ী কোটর (sinus)। গানের আঙ্গিকে জোর দেয়া হয়, যেমন প্রলম্বিত পর্যায়কাল স্থায়ী নিত্য ও সঠিক প্রস্বর-পোষণের উপর, তেমনি অনুনাদী কোটর কৌশলী নিয়ন্ত্রণের উপরও, যা ধ্বনির অভিক্ষেপ (projection) ও রূপের সঙ্গে জড়িত। বস্তুত সবচেয়ে ক্রান্তিক (critical) প্রয়োজনের মধ্যে হলো একটি গ্রাহ্য উপস্বনে (timbre) পৌঁছানো। মানুষী স্বরের পাল্লা চার সপ্তকের একটু বেশি। দু'টি স্বরের (note) কম্পাঙ্ক অনুপাত ১ঃ২ হলে তাদের মধ্যে যে অবকাশ থাকে তাকেই বলে সপ্তক। মূল স্বরের এই পাল্লার মধ্যে আছে ৪০ থেকে ১৪০০ চক্কর যুক্ত কম্পাংকপটি।

বাক্‌ধ্বনির সাধারণ শ্রেণীবিন্যাস করা হয় 'ঘোষ বা অঘোষ'—এর ভিত্তিতে। ঘোষধ্বনি হলো স্বর এবং তাতে আছে নিম্নতর কম্পাংকের (২০০০ চক্করের নিচে) উপাদান। অঘোষধ্বনি হলো ব্যঞ্জন এবং এর শক্তিবণ্টন ঘটে উচ্চতর কম্পাংকে। এই দুই শ্রেণীর বাগ্‌ধ্বনির বৈশিষ্ট্য এই যে ব্যঞ্জনের তুলনায় স্বরই অধিকতর

শক্তি বহন করে। অনেক ক্ষেত্রে এই শক্তির পরিমান শত গুণ। তাসত্ত্বেও বাক্‌বোধ পরিবেশনে ব্যঞ্জনের আছে একটি মুখ্য ভূমিকা। বস্তুত স্বরলোপ বা স্বরের জায়গায় অন্য কোন উদাসীন (neutral) ধ্বনির (যেমন 'উঃ') প্রতিস্থাপনে বাক্‌বোধগম্যতার কোন হেরফের হবে না। কিন্তু ব্যঞ্জন বর্জনে বাক্য তার বোধগম্যতা হারাবে। মানুষী স্বরের প্রকৃত তীব্রতা আশ্চর্যভাবেই কম—সাধারণত সংলাপে প্রয়োজন হয় $\frac{১}{১০০০০০}$ ওয়াটের উৎপাদ (output) শক্তির। আর স্বরোৎপাদক ক্রিয়াবিধির সামর্থ্য বেশ নিচেই—সম্ভবত শতকরা একভাগ।[২]

উচ্চারিত ধ্বনির কতগুলি এককেটি প্রশ্বাসে গুচ্ছবন্ধ (breath-group) হয়, আর এতে সব ধ্বনির উচ্চারণ সমান প্রধান্য পায় না। এই প্রশ্বাসবদ্ধ ধ্বনিগুচ্ছই অক্ষর। বাঙলা অক্ষরে স্বরধ্বনি-ই প্রধান। প্রধান ধ্বনি (peak of sonority বা sonant) হ'ল স্বর বা vowel (V) ; অপ্রধান ধ্বনিগুলি ওর সঙ্গী একং তাই তারা ব্যঞ্জন বা consonant (C)। অক্ষরের সাধারণ ধ্বনি-বিন্যাস তাই CVC। কিন্তু C শূণ্য হতে পারে। ফলে অক্ষরে ধ্বনিবিন্যাসের রূপ এই—CVC ; VC ; V ; CV। আবার C একক ব্যঞ্জন না হয়ে যুক্ত ব্যঞ্জনও হতে পারে। কার্যত তাই অক্ষরগুলি এরূপ দাঁড়ায়—

১.	CCVCC	যথা, গ্র্যাণ্ড ;
২.	CCVC	যথা, প্রাণ ;
৩.	CVC	যথা, পান ;
৪.	VC	যথা' আন্ ;
৫.	V	যথা, ও ;
৬.	CV	যথা, না ;
৭.	CCV	যথা, শ্রী ;
৮,	CCCV	যথা, স্ত্রী।

স্বরের পরে ব্যঞ্জন দিয়ে যে-সব অক্ষরের শেষ, অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত হলে, যেমন প্রথম চারটি, তাদের বলে রুদ্ধ বা সংবৃত অক্ষর (closed syllable) ; আর স্বরের পরে ব্যঞ্জন না থাকলে অর্থাৎ স্বরান্ত হ'লে, যেমন শেষ চারটি, তাদের বলে মুক্ত বা বিবৃত অক্ষর (open syllable)।[৩]

এবার সংযুতির পরিকল্পনীয় প্রদর্শনের (schematic representation of structure) কথা। গণিতীয় অর্থে সংযুতি (structure) হলো বাগ্-ধ্বনির নিয়ামক। এ শুধু ভৌত সংযুতিই নয়, কিন্তু ভৌত সংযুতির বিভিন্ন উপাদানের সম্পর্কও। বাগ্ধ্বনি শাব্দিক বা বৈদ্যুতিক মাধ্যমে প্রেরিত

হলে এই গণিতীয় সংযুতি-ই থাকে নিশ্চর (invariant), যদিও ভৌত গড়ন হয় পরিবর্তিত, সংকুচিত অথবা কর্তিত (mutilated)। নিশ্চর থাকে এই গণিতীয় সংযুতি যখন শ্রবণকালে অনবচ্ছেদ শাব্দিক স্পন্দন রূপান্তরিত হয় সবিরাম (intermittent) স্নায়ু ঘাতে (nerve impulses)। একটি সহজ পরিকল্পিত উদাহরণ নেয়া যাক। ধরা যাক, কোন বাগ্ধ্বনি s এর n—সংখ্যক মূল কম্পাঙ্ক আছে, যথা $N_1 \cdots N_2 \cdots N_n \cdots$। এ-সব কম্পাঙ্কের অনুপাত, $\frac{N_1}{N_1}, \frac{N_2}{N_1}, \ldots \frac{N_n}{N_1}$, ধরা যাক যথাক্রমে $P_1\ (=1),\ P_2 \cdots P_n$; আর এদের বিস্তার যথাক্রমে $A_1,\ A_2 \cdots A_n$ এবং এদের অনুপাত—

$$\alpha_1 \left(=\frac{A_1}{A_1}=1\right),\ \alpha_2 \left(=\frac{A_2}{A_1}\right) \cdots \alpha_n \left(=\frac{A_n}{A_1}\right)।$$

মূল কম্পাংক N_1 এর সমঞ্জল (harmonic) উপাদান

$$\sum_{m=1}^{n_1} m\,N_1,$$ যার বিস্তার হলো $a_1,\ a_2 \cdots a_n$।

কাজেই এদের বিস্তার অনুপাত $\frac{a_1}{A_1}$, [যেহেতু $a_1 = A_1$, এর মান $=1$],

$$\frac{a_2}{A_1} \cdots \frac{a_{n1}}{A_1}\ ।$$

অনুরূপভাবে, সাধারণ মেলের (general group) জন্যে হবে, $\sum_{m=1}^{n_n+1} mN_n$,

এবং কম্পাংক অনুপাতগুলি দাঁড়াবে,

$$\frac{a_1^{(n-1)}}{A_n}=1,\quad \frac{a_2^{(n-1)}}{A_n}, \ldots\ldots \frac{a_{n+1}^{(n-1)}}{A_n}$$

এখানে অবশ্য নির্ণয় কর্তে হবে এগুলি :

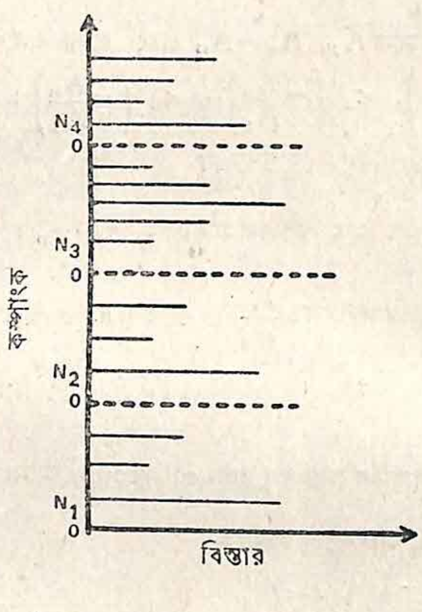
(ক) n মূলের সম্পর্ক নির্ধারণী সূত্র ;

(খ) n মূলের বিস্তার অনু পাতের সম্পর্ক নির্ধারণীসূত্র ; ও

(গ) হার্মনিকস (harmonics) বা সঙ্গীত বিস্তার অনুপাতের নির্ধারণী সূত্র বা সূত্রাবলী। কোন বাগ্ধ্বনির বিভিন্ন ঘটনায় পরিবর্তন ঘটলেও অনুপাত সম্পর্ক নিশ্চর থাকবে, যদিও N_1 A_1 ও ai $(i=1,\ 2 \cdots n_1)$ -র যেকোন ব্যষ্টিগত মান হ'তে পারে। সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটলেও, এ-সব সম্পর্কের সূত্রাবলী থাকবে নিশ্চর। কাজেই স্বর ও ব্যঞ্জনেব গতানুগতিক প্রভেদ উবে যায় : ব্যঞ্জন স্বর যতটা, ততটাই স্বর ও ব্যঞ্জন।

এবার মূল ও স্বরগুণিতক (fundamental and harmonic)। ১৫—সংখ্যক চিত্রে এদের পারস্পরিক সম্পর্ক দেখান হলো—

বিভিন্ন মূল ও তাদের স্বরগুণিতক পরিবর্তনশীল, কেবলমাত্র কিছু-কিছু পারস্পরিক সম্পর্ক নিশ্চয় : বাগ্‌ধ্বনির একক নমুনার মিশ্রবর্ণালী (composite spectrum) কালের অনুপ্রস্থচ্ছেদে (cross-section) ভিন্ন গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়, আর প্রতিটি গোষ্ঠী একটি মূল ও তার স্বরগুণিতকে গঠিত



চিত্র : ১৫— মূল ও স্বরগুণিতক

হয়। এখানে মূল হলো N_1, N_2, N_3, ও N_4। এরা পরস্পর স্বরগুণিতক-রোধী (inharmonics)—এরা নির্দিষ্ট কম্পাংকও নয়। বিস্তার সম্বন্ধেও ঐ একই কথা। অবশ্য অনুপাতও পরিবর্তনশীল। আর এ সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে যখন আমরা বাগ্‌ধ্বনিতে প্রত্যক্ষ করি যুগপৎ বিস্তার ও কম্পাংক মডুলনের ঘটনা। বাগ্‌ধ্বনিতে আছে একটি নির্দিষ্ট নিয়ম যাতে নির্ধারিত হয় বিভিন্ন কম্পাংক, বিস্তার, ও দশা। এই নিয়মই থাকে নিশ্চয়। আবার কোন-কোন বাগ্‌ধ্বনিতে দু'টি মূল যেমন N_2 ও N_3 নির্দিষ্ট হতে পারে এবং কিছু পরিবর্তনশীল যথা N_1 ও N_4। যাহোক, গণিতীয় সংযুতি নিশ্চয় থাকে, যদিও তার ভৌত বর্ণালী ভিন্ন হয় কম্পাংক গড়নে।[৪]

এখানে উল্লেখ্য যে প্রাচীন গ্রীকরা আধুনিকদের মতো কবিতা পংক্তির পর্ব নিয়ে মাথা ঘামান নি : তাঁরা ক্ষুদ্রতর একক অর্থাৎ পর্বাঙ্গ নিয়ে সুরু করেচেন এবং এর নাম দিয়েচেন 'উত্থান' (rise) ও 'পতন' (fall)। এই উত্থান ও পতনের অনুপাতকে ভিত্তি করে তাঁদের ছন্দের শ্রেণী বিভাগ করেচেন। উত্থানকে পতন থেকে পৃথক্ করা হয়েচে তিনভাবে—(ক) বৃহত্তর স্থিতিকাল (duration); (খ) বৃহত্তর সুস্থিতি (stability); বা (গ) ঐ দু'য়ের সমবায়ে। এখানে সুস্থিতির অর্থ হলো রূপের নিশ্চরতা (invariability)। তবে ছন্দে এক পর্বের সঙ্গে অন্য পর্বের অনুপাত সাধারণত দেখান হয়নি। এক কথায়, প্রাচীন গ্রীকরা পর্বের সমকালীনতার (isochronism) দাবী করেননি। এ-প্রসঙ্গে Aristoxenus-এর উক্তি স্মরণীয় : "প্রতিটি পর্বই সংজ্ঞিত (defined) হয়েচে একটি নির্দিষ্ট অনুপাত বা সাদৃশ্যে (analogia), যা দুটি অনুপাতের মধ্যে এমন জায়গায় অবস্থিত যে অর্থ দিয়ে চেনা যায়।" তিনি বল্তে চান যে গণিতীয় অনুপাত সম্ভব হলেও তা স্পন্দসম্পর্কে অপ্রাসঙ্গিক যদি না তা কানে ধরা যায়। কাজেই কানে বোধগম্য অনুপাতই প্রাসঙ্গিক।[৫]

তরঙ্গ মাপক লিপিতে (kymographic tracing) ধরা পড়েচে যে বাঙলা উচ্চারণের হার হলো প্রতিসেকেণ্ডে ৪.৪৫ টি অক্ষর।[৬] একে মধ্যম উচ্চারণ ধরলে এবং কেয়টের সূত্রানুসারে দ্রুত ও বিলম্বিত উচ্চারণের মাত্রা দাঁড়ায় যথাক্রমে ৫.৯৩ এবং ৩.৩৪ অক্ষর। কাজেই বাঙলা উচ্চারণহার হবে যথাক্রমে : দ্রুত—৫.৯৩ অক্ষর; মধ্য—৪.৪৫ অক্ষর এবং বিলম্বিত ৩.৩৪ অক্ষর প্রতি সেকেণ্ডে। এখানের লক্ষণীয় যে ধ্বনি বা অক্ষরের স্থিতিকাল উক্তি-দ্রুতর উপর নির্ভরশীল। উক্তির গড় হার অনুমিত হয় ৬ থেকে ২০ টি ধ্বনি প্রতি সেকেণ্ডে; বোধগম্যতা না হারিয়ে এর চেয়েও নিম্নতর ও আরো উচ্চতর দ্রুতি হামেশাই চোখে পড়ে। ধ্বনি চিনতে যে-সময়ের প্রয়োজনে তা নির্ভর করে ধ্বনিপ্রকৃতি ও প্রস্বরের উপর। এ ব্যাপারে অবশ্য স্বর ও ব্যঞ্জনের পার্থক্য রয়েচে। তবে স্বর ৪ মিলিসেকেণ্ড স্থায়ী হলে তাকে চিনতে অসুবিধা হয় না।[৭] উক্তি কালশায়ী বলে স্থিতিকাল বাগ্‌রূপের একটি। মাত্রা কাজেই স্থিতিকাল duration ও দ্রুতি (tempo) এক নয়—এরা পারস্পরিক সম্পর্কে বিধৃত। যদি রূপমান (morpheme) food ০.৫ সেকেণ্ডে উচ্চারিত হয়, তবে দ্রুতি হবে ১÷০.৫ বা ২ প্রতিসেকেণ্ডে। ইংরেজিতেও ত্রিধা দ্রুতি দেখা যায় : সাধারণ দ্রুতি ২ টি অক্ষর ও ৫টি বাগ্‌ধ্বনি প্রতিসেকেণ্ডে; প্রাণবন্ত সংলাপে দ্রুতি দাঁড়ায় ৪ থেকে ৫টি অক্ষরে ও ১০ থেকে ১২ বাগ্‌ধ্বনিতে; আর ত্বরিত উক্তিতে এ হলো ৪টি অক্ষর ও ২১টি বাগ্‌ধ্বনি।[৮] এই তিনের অনুপাত অক্ষরের বেলায় হলো ১ : ২ : ৪ অর্থাৎ দ্বিতীয়টি প্রথমের দ্বিগুণ, এবং তৃতীয়টি দ্বিতীয়ের দ্বিগুণ।

এ হলো গুণোত্তর প্রগতি (geometrical progression)। ধ্বনির বেলায় এ দাঁড়ায় ৫ : ১০ : ২১ অর্থাৎ অক্ষরের অনুপাতের মতোই। এই নিরিখে বাঙলা উচ্চারণের হার হবে ২.২২ : ৪.৪৫ : ৮.৯০। এ-হারই বাঙলা উচ্চারণে গ্রাহ্য।

এবার স্বরের উপর ব্যঞ্জনের অভিক্রিয়া (effect)-র কথা। এ দেখা যায় দু'ভাবে, আকৃতি ও দৈর্ঘ্য অনুসারে। মুখের বাইরে বায়ুচাপ (air pressure outside the mouth) অভিলেখ (record) অর্থাৎ A. O. tracing থেকে জানা যায় যে অল্পপ্রাণ (non—aspirated) ব্যঞ্জনের পরবর্তী স্বরের আকৃতি শঙ্কুর (cone) মতো। অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি (occlusive) মুক্ত স্বর, শুরু হয় প্রায়গরিষ্ঠ বিস্তারের সঙ্গে-সঙ্গে এবং শেষ হয় শুঁড়াকারে (tapering form)। কিন্তু মহাপ্রাণ (aspirated) ব্যঞ্জন-যুক্ত স্বরের আকৃতি টাকু-সদৃশ (spindle-like) আচ্ছাদন (envelope)। এবার দৈর্ঘ্যের বিচার। সম প্রচাপিত অক্ষরের স্বরদৈর্ঘ্য মোচক ব্যঞ্জনের উপর নির্ভরশীল। এ ঘোষ ব্যঞ্জনের সঙ্গে দীর্ঘতম এবং মহাপ্রাণিত ব্যঞ্জনের সঙ্গে হ্রস্বতম। এদের মধ্যবর্তী হলো অল্পপ্রাণিত ব্যঞ্জনের অভি-ক্রিয়া। এ থেকে সাধারণ সূত্র হলো এই : ব্যঞ্জন স্পর্শের পশ্চাদ্বর্তী বায়ুচাপের সঙ্গে স্বরদৈর্ঘ্যের সম্পর্ক ব্যস্তানুপাতিক (inversely proportional)। গণিতের ভাষায় এ হলো :

$$L \text{ (স্বর দৈর্ঘ্য) } = \frac{k}{p},$$

যেখানে p = বায়ু চাপ ও k = ধ্রুবক। L ও p-এর মান জানলেই k-এর মান জানা যাবে।[৬]

৫.২ প্রবাহভঙ্গি — গান, গদ্য, পদ্য

বাক্‌প্রবাহের তিনটি রূপ লক্ষণীয় — গান, গদ্য, পদ্য। প্রথমেই গানের কথা। আগেই বলা হয়েচে যে ফুসফুস ও বাক্‌তন্তু (vocal cord) কণ্ঠ-স্বরের মূল উপাদান। এদের যোগ্যাযোগ্য ব্যবহারেই স্বরের উৎকর্ষাপকর্ষ অর্থাৎ মাধুর্য ও কার্কশ্য নির্ণিত হয়। এই স্বরের তিন অবস্থা। প্রথমটি হলো তিগ্মতা (intensity) : এতে কোন্ স্বর কত দূর হ'তে শোনা যায়, তার যোগ্যতা বুঝায় স্বর দুর্বল হ'লে কানে কানে বলার প্রয়োজন হয় ; অত্যন্ত প্রবল হ'লে পাঁচ-দশ ক্রোশ হ'তে শোনা যায়। কিন্তু তা কণ্ঠের অসাধ্য। তাই মধ্যবর্তী বলে তিগ্মতায় গীত গানই মোলায়েম বা সুললিত হয়। দ্বিতীয় অবস্থার নাম 'রূপ' বা আকার : এতে বিভিন্ন লোকের স্বর চেনা যায়। এই বিভিন্নতাকে রূপভেদ (timbre) বলে। দুই ব্যক্তির কথার স্বর বিভিন্ন

হলেও, গীত-স্বর একই রূপের। আর তৃতীয় অবস্থাটি প্রস্বর (pitch) অর্থাৎ স্বরের, উচ্চতা ও গম্ভীরতা। বালকের বা স্ত্রীলোকের স্বর সরু বা উচ্চ এবং বয়স্ক পুরুষের স্বর মোটা বা গম্ভীর অর্থাৎ খাদ। গানে স্বর সচরাচর 'সুর' নামে কথিত হয়। বাঙ্লা ভাষায় দু'য়ের পার্থক্য আছে। 'স্বর'-এ বুঝায় আওয়াজ, যেমন কণ্ঠস্বর, বংশীস্বর প্রভৃতি ; 'সুর'-এ বুঝায় সা, রি, গ, ম, প, ধ, নি এই সাতটি সুর বা 'সপ্তক' ঃ ষড়জ (সা), ঋষভ (রিখব), গান্ধার (গ), মধ্যম (ম), পঞ্চম (প), ধৈবত (ধ), ও নিষাদ (নি)। ইংরেজিতেও আছে এই পার্থক্য note (স্বর) ও tone (সুর)-এ।

ধ্বনি হলো একটি নির্দিষ্ট সংবেদন যা কর্ণক্রিয়া বিধি উদ্দীপনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এতে সংবেদনের বহিঃস্থ কারণ বুঝায়। আর ধ্বনি গীতল (musical) কি না তা নির্ভর করে এই সংবেদনের চরিত্রের উপর। গীতল ধ্বনি তাকেই বলে যা একাধারে মসৃণ, নিয়মিত, সুখকর ও প্রসারিত। এর উল্টোটাই অগীতল। গীতল স্বরের উৎস সর্বদাই কোন না কোন স্পন্দনশীল তন্ত্র (system)। এ হতে পারে (ক) বিতত তার (stretched string) যেমন পিয়ানো বা বেহালায়, (খ) বায়ুস্তম্ভ যেমন অর্গ্যান নলে (organ pipe), (গ) সুষির যন্ত্র (wind instrument) যেমন সুরশলাকায় (tuning fork) বাঁকান দণ্ড, অথবা (ঘ) ঋজুদণ্ড, যেমন কাঠের বাদ্যযন্ত্রে। ধ্বনি বায়ুমাধ্যমে একবিন্দু থেকে অন্য বিন্দুতে চালিত হয় বায়ুসমগ্রকে বাদ দিয়ে শব্দতরঙ্গের অগ্রগতির দিকেই। তরঙ্গের অগ্রগতি কালে স্থিতি অবস্থান হতে মাধ্যমের গরিষ্ঠ অপসরণ হলো গতির বিস্তার ঃ এ হলো মধ্যক (mean) অবস্থান থেকে শীর্ষের উচ্চতা বা খাদের নিম্নতার মাপ। একটি স্পন্দ সম্পূর্ণ কর্তে কোন বিন্দু যে সময় নেয় তাকে বলে গতির পর্যায়, আর এক সেকেণ্ডে যতগুলি স্পন্দ সম্পূর্ণ হয় তা কম্পাংক নামে অভিহিত। যদি পর্যায় $=T$ এবং কম্পাংক $=f$ হয়, তবে $T=\frac{1}{f}$। স্পন্দকালে কণিকা যে অবস্থায় পৌঁছায় তাকে বলে দশা। তাই একটি শীর্ষ ও খাদ বিপরীত দশায় অবস্থিত অথবা দু'টি শীর্ষ একই দশায় বর্তমান। একই দশায় অবস্থিত দুটি ক্রমিক কণার মধ্যবর্তী দূরত্বকে বলা হয় তরঙ্গদৈর্ঘ্য λ, যা আছে দুটি শীর্ষ বা খাদের মধ্যে। কণাবেগ (particle velocity) হলো মাধ্যম কণার বেগ আর তরঙ্গবেগ তরঙ্গরূপের বেগ। কণা প্রতি সেকেণ্ডে ঊর্ধ-অধ দোলে f-গুণ—যে-মুহূর্তে এ পথ শীর্ষে পৌঁছায় সে-মুহূর্তে তরঙ্গশীর্ষ একে অতিক্রম করে। কাজেই এক সেকেণ্ডে f-সংখ্যক তরঙ্গ একে অতিক্রম করে। যদি $c=$ ধ্বনি বেগ, $f=$ কম্পাংক ও $\lambda=$ তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হয়, তবে $c=f\lambda$ আর $f=\frac{c}{\lambda}$। উচ্চ-প্রস্বরিত স্বরে উৎপন্ন হয় হ্রস্ব ধ্বনি

তরঙ্গ এবং এ হ্রস্ব বলে এর তরঙ্গদৈর্ঘ্যও কয়েক সেন্টিমিটার। সাধারণ ধ্বনিতরঙ্গ আরো দীর্ঘতর এবং পুরুষের মূল প্রস্বরের বেলায় প্রায় আড়াই থেকে তিন মিটারের মতো তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের হয়। আরেকটি ঘটনা হলো বিস্পন্দ (beat)। যখন প্রায় একই কম্পাংকের দুটি ধ্বনির উৎস যুগপৎ স্পন্দিত হয়, তখন দেখা দেয় ধ্বনি ও মৌনের পর্যাবৃত্ত একান্তরণ (periodic alteration) যাকে বলে বিস্পন্দ। মানুষী স্বর একটি সমর্থ পরিবর্তিত্র (transformer) হলেও, গায়ক স্বরোৎপাদনে যে শক্তি প্রয়োগ করে তার কেবল শতকরা একভাগ নিয়োজিত হয় শ্রোতৃমন্ডলীর বিনোদনে আর বাকী নিরানব্বই ভাগ সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়। কান দু'টি স্বরের একটি সম্পর্ক স্থাপন করে যখনি তাদের কম্পাংক একটি সরল সাংখ্যিক অনুপাতে দেখা দেয়। আরম্ভক স্বর (keynote) যদি c হয়, তবে c ও c´ দুটি স্বরের স্বরান্তর (interval) হবে সপ্তক (octave)। কম্পাংক অনুপাত ১ঃ২ এবং ১২০০ cent। f_1, ও f_2 যদি প্রস্বর হয় এবং k = ধ্রুবক তবে প্রস্বরান্তর (pitch interval) $= k \log_2 \frac{f_1}{f_2}$।

গান স্পন্দশীল আর একে মাপা হয় দণ্ডে (bar) যা স্বরকম্পে (beat) বিভক্ত। সাধারণত একটি দণ্ডের মধ্যে থাকে দুই, তিন বা চারটি স্বরকম্প এবং গানকে তখন বলা হয় দ্বিতীয় (duble), তৃতীয় (triple) বা চতুর্থ (quadruple) কালশায়ী। এই স্বরকম্প আবার হ্রস্বতর স্বর-সমষ্টিতে ভাগ হয়ে যায়, সাধারণত দুই বা তিনের সমষ্টিতে। দু'য়ের সমষ্টিকে বলা হয় সরল ; আর তিনের সমষ্টিকে যৌগ। এ-সব অবশ্য কালস্বাক্ষর (time-signature) দিয়ে নির্ধারিত হয়। দুটি সংখ্যায় এ নির্দেশিত হয়—একটির পরে আরেকটি। উপরেরটিতে নির্দ্দিষ্ট হয় দণ্ডের স্বরসংখ্যা আর নিচেরটিতে স্বরের রকম। যেমন $\frac{2}{4}$ কালস্বাক্ষরের নিচেরটি (৪) নির্দেশ দেয় অর্ধস্বরসংক্ষেপের চতুর্থাংশ (quarter of a semi breve) এর অর্থাৎ অর্ধবিন্দু পরিমিত স্বরচিহ্ন (crotchet) ; আর উপরেরটি (২) তে বুঝায় যে প্রত্যেক দণ্ডে আছে এর দুটি। স্বরকম্প যেমন দণ্ডে একত্রিত হয়, তেমনি দণ্ডও আরো বৃহত্তর এককে সংগঠিত হয়, যেমন বাক্‌মেল (phrase), বাক্য (sentence), বাক্-সমগ্র (period) প্রভৃতি। বাক্‌মেল স্পন্দমান সংযুতির (rhythmical structure) ক্ষুদ্রতম একক—এতে আছে দুটি দণ্ড এবং এ অসম্পূর্ণ যেমন, God save the king এ আছে তিনটি দ্বি-দণ্ড বাক্‌মেল। অনুরূপভাবে বাকসমগ্র দুই বা ততোধিক বাক্যে সুসমঞ্জস (balanced)। গীতল চিন্তার এই সব ক্ষুদ্রতর একক লয় (cadence) দিয়ে নিরূপিত হয়। সাহিত্যে যতিবিধানের (punctuation) যে কাজ, গানে লয়েরও সেই কাজ। লয়-এ বুঝায় 'পতন'

পূর্বতন কালে —কিন্তু আজকাল-এর অর্থ হয়েচে প্রসারিত ও অনির্দিষ্ট[১১]। গীত বা স্পন্দিত ধ্বনিতে আছে লয় বা পতন, যেমন স্বরের পতন ঘটে কথনে, বা নৃত্য, গীত ও পদ্যের সংখ্যামানে। সংগীতে এ নির্দেশ করে গানের কলির সমাপ্তিসূচক ঐকতান, যার ক্রমিক আবির্ভাবে উদ্ভূত হয় একদিকে প্রতীক্ষা, অন্যদিকে উপসংহার। cadenza হলো ইতালীয় রূপ যা ব্যবহৃত হয় কণ্ঠ বা যান্ত্রিক রচনার বাগাড়ম্বর প্রকাশে এবং গতিসমাপ্তির অব্যবহিত পূর্বে বা রচনা শেষে।[১২]

এবার সংগীতে স্পন্দের কথা। স্পন্দ হলো কালাংশের বিশেষ বিন্যাস। সাধারণত আমরা কাল মাপি একে মনে-মনে ভাগ করে। তবুও আমরা ব্যবহার করি বাহ্য অনুষঙ্গ, যেমন হাত-তালি, লাঠি-ঠক্ঠকি, ধাতব পাতে ঘা, বা ঢোলকে চাটি। অবশ্য খুব পরিচিত কালপ্রবাহমাপের রীতি হলো ঘড়ির টিক্‌টিক্ বা হাততালি। উদাহরণ দেয়া যাক—

```
(ক) 1 2 3   1 2 3   1 2 3   1 2 3......  ......
    × - -   × - -   × - -   × - -
(খ) 1 2     1 2 3   1 2     1 2 3......  ......
    × -     × - -   × -     × - -
```

যেখানে প্রতিটি '×'-এ হাততালি বুঝায়। এখানে আছে কালবিভাজক দু'টি বিন্যাস। (ক)-তে আছে তিনটি গণন (count) প্রত্যেক বিভাগে — একটি হাততালি ও দুটি হাততালিশূন্য। এর নক্‌শা হলো ৩+৩ এর, যেমন (খ) এর ২ + ৩ স্পন্দ। অনবচ্ছেদ ক্ষণ সমষ্টির এই শ্রেণীকে বলে গীতল স্পন্দের সরলরূপ। আর এই বিভাগকে বলা হয় 'দন্ড' (bar)। এ-সব সমষ্টির আর কোন ক্রম নেই। কিন্তু ভারতীয় সংগীত এই 'দন্ড' নিয়ে সৃষ্টি করে পরবর্তী ক্রম, যাতে জন্মায় 'তাল'-এর ধারণা। 'তাল' হলো এ-সব ছাঁচের আবৃত্ত বিন্যাস। তাল-এর সারাৎসারিক বৈশিষ্ট্য হলো এর চক্রীয় cyclic প্রকৃতি। অর্থাৎ একপ্রস্থ স্পন্দমান একক চক্রে সন্নিহিতভাবে স্থাপিত হয়ে পুনরাবৃত্ত হতে থাকে। এ বোঝা যায় কালপ্রবাহ ও সাপ্তাহিক দিনের পুনরাবৃত্তিতেঃ কাল চলেচে রৈখিকভঙ্গিতে, কিন্তু এ-প্রবাহের উপর স্থাপিত হয়েচে সপ্তাহের দিন-গুলি, যেমন সোমবার নিজের পুনরাবৃত্তিতে সপ্তাহকে চক্রে পরিণত করে। অনুরূপভাবে গানের কালও এগিয়ে চলে। কিন্তু তাল এরি উপরে স্থাপিত হয় আর প্রতিটি আঘাত নিয়মিত কালান্তরে চক্রে বার-বার আবর্তিত হয়। দক্ষিণ ভারতীয় সংগীতে আছে দ্ব্যক্ষরে 'দ্রুত', চতুরক্ষরে 'লঘু', ও অষ্টাক্ষরে 'গুরু'। কিন্তু অক্ষরের কোন বাস্তব কালমাপ নেই অর্থাৎ একে ঘড়ি বা মাত্রামান

(metronome) যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায় না। এ একেবারেই মন্ময় ; তবে গতানুগতিক অভ্যাসে এ পেয়েচে একটি গ্রাহ্য কালদৈর্ঘ্য। স্থিতিকালের উপর নির্ভর করে এর আছে তিনটি বেগমাত্রা বা লয়—বিলম্বলয় ; মধ্যমলয় ; ও দ্রুতলয়। এদের প্রত্যেকেই পূর্ববর্তীর চেয়ে দ্বিগুণ দ্রুততর। তাই মধ্যমলয় দ্রুতিতে বিলম্বের দ্বিগুণ আর দ্রুত মধ্যমের দ্বিগুন।[১৩] এ-প্রসঙ্গে দামোদর মিশ্র তাঁর 'সঙ্গীতদর্পণে' (১৮৮১) বলেচেন—

* * * ১৪১

দ্রুতো মধ্যো বিলম্বশ্চ দ্রুতঃ শীঘ্রতমো মতঃ।
দ্বিগুণৌ দ্বিগুণৌ জ্ঞেয়োৎ স্মান্মধ্যবিলম্বিতৌ॥

অর্থাৎ এক মাত্রায় একটি সুর উচ্চারিত হলে সে হবে মধ্যম লয় ; এ-ক্রিয়া দু মাত্রায় ব্যাপ্ত হলে আসবে বিলম্বিত লয় ; আর এক মাত্রায় দুটি ক্রিয়া বা বর্ণ উচ্চারিত হলে হবে দ্রুতলয়। ভাষা কথায় এরা ঠা, দুন ও চৌদুন নামে পরিচিত। মাত্রামান যন্ত্রে তিনটির মান এভাবে অংশাংকিত—বিলম্বিতগতির অঙ্ক ৫০-১০০ ; মধ্যগতির অঙ্ক ১০০-১৬০ ; দ্রুতগতির অঙ্ক ১৬০-২০৮।[১৪]

এবার জন্মকথা। মনে কোন প্রকার আঘাত পড়লে কয়েকটি প্রতিবিম্ব ভেসে ওঠে। এতেই আমরা ব্যাপারটা নিজেরা বুঝি এবং প্রতিবিম্বের বা প্রতিমার সাধারণগুণের সহায়তায় অপরকেও বুঝাই। প্রতিবিম্ব দু'প্রকারের—বস্তুগত ও কথাগত। বস্তুগত প্রতিমা দেখা যায় চিত্রে, যেমন কথাগত প্রতিমার আধিক্য সাহিত্যে। এ-ছাড়াও তৃতীয় আরেকটি নির্বিশেষ প্রতিমা আছে যার নাম সুর এবং এ সংগীতের উপজীব্য। অভিজ্ঞতা সূক্ষ্ম ও সাধারণ বোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং তাই তার ভাষাও সূক্ষ্ম। এ ভাষার নাম সুর। এর অক্ষর স্বর। এর বিন্যাস লয়, তাল প্রভৃতি। সুর হলো বিমূর্ত বোধের (imageless awareness) নতুনরূপ এবং উপযুক্ত প্রতিমা। সুরানুভূতির প্রতিমা স্বরবিন্যাস—কথাও নয় চিত্রও নয়। এখানেই গানের পার্থক্য সাহিত্য থেকে।[১৫]

মনে রাখতে হবে যে সুর ও কথা এক নয়। ফলে সংগীত বা গান ও সাহিত্য, তা সে গদ্যই হোক বা পদ্যই হোক সমগোত্রীয় নয়। তাই কথাকে সুরেলা কর্লে কথা তার স্বাতন্ত্র্য হারায় ; আবার সব কথাকে সুরান্তরিত করাও সম্ভব নয়। কথা ও সুরের পার্থক্য আছে বলেই একটি সন্ধিশর্তের প্রয়োজন। তা সত্ত্বেও দু'টির ধাচ আলাদাই থাকে। প্রথমত বাঙলা কথায় (অর্থাৎ গদ্য ও পদ্যে) অর্থপরিবর্তনে স্বরবর্ণের হ্রস্বতায় ও দৈর্ঘ্যে কোন তারতম্য ঘটে না। ফলে দিন, দিন-কাল ও দীনদুঃখী একই ভাবে উচ্চারিত হয়। কিন্তু ধ্রুপদের ব্রজভাষায় স্বরোচ্চারণ রীতিতে অর্থের

পরিবর্তনে তারতম্য ঘটে, যেমন দিন ও দীনদয়াল। এতে জোর দেয়া হয় উপান্ত স্বরবর্ণে। ব্রজভাষায় প্রথম স্বরবর্ণ ছোট হয়ে এবং শেষটি দীর্ঘতর হয়ে 'রাখাল' ও 'মাতাল' যথাক্রমে 'রা-খোয়াল' ও 'মাতোয়াল'-এ পরিণত হয়। কিন্তু বাঙলা গানে স্বরবর্ণের স্বাভাবিক সংকোচে ক্ষতি হয় তানের কেননা খেয়ালে প্রথম স্বরবর্ণের আশ্রয়ে তান নেয়া হয় না, শেষের উপান্তস্বরেই নেয়া হয়। খেয়ালের তুলনায় ধ্রুপদ তাই অনেকটা ভালো এখানে। স্বর সংকোচের জন্যে যে ক্ষতি হয় বাঙালী গায়ক তা পূরণ করেন 'য়' দিয়ে, যেমন 'মা আমার'—এর মাঝের অবকাশ অতিক্রান্ত হয় 'মা-য়—আমার' শ্রুতিতে। দ্বিতীয়ত, বাঙলার উচ্চারণে স্বরের চেয়ে ব্যঞ্জন ও যুক্তবর্ণের ভিড় বেশি। তাই সংগীতে তানের স্থান সংকীর্ণ এবং ছোটগমকের অবসর আছে, কিন্তু বড় গমকের স্থান নেই। তৃতীয়ত, বাঙলায় গুণবাচক বিশেষ্য কম, তাই কবিতায় বস্তুবাচক বিশেষ্যের জামাই-আদর। কিন্তু বস্তুগত প্রতিমা ঠিক সংগীতধর্মী নয়। তাই গান গাওয়ার সময়ে কথাকে অস্পষ্টভাবে উচ্চারণ কর্তে হয়। চতুর্থত, বাঙলায় ক্রিয়া-পদ নিতান্ত কম এবং স্বরান্তশব্দ আরো কম। সবই প্রায় হসন্ত। অতএব 'য়' জুড়ে দিতে হয়। ফলে 'তানের' স্থান আরো কমে যায় বাঙলা গানে। তানে চাই স্বরবর্ণের দীর্ঘ অবসর, সংগীতের অবসর গাওয়ার পর, রেশে।[১৫]

এ-প্রসঙ্গে সুর ও কথাকে এক ধরে ছন্দের মূল সূত্র আবিষ্কারের প্রচেষ্টা অবৈজ্ঞানিক ও ত্রুটিপূর্ণ।[১৬] সংগীতের স্বরকম্প (beat) ও দণ্ড (bar) নিয়ে অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় গড়ে তুলেচেন তাঁর "পর্ব (bar)-পর্বাঙ্গ (beat)" বাদ। প্রকৃতপক্ষে একে বলা উচিত 'স্বরকম্প-ও-দণ্ড' বাদ, কেননা এ বেশি মূলানুগ। সংগীতে স্বর-কম্পের জন্যে আছে সুরের বাহার। কিন্তু একে কথায় আনা যায় না। কাজেই ভুল হয়েচে দুয়ের একাত্মীকরণে। দ্বিতীয়ত, এতে অস্বীকৃত হয়েচে বাঙলা কথার উচ্চারণরীতি। বস্তুত এই উচ্চারণরীতিই বাঙলা গদ্য ও পদ্য রচনায় মুখ্য স্থান অধিকার করেচে। তৃতীয়ত, 'অনিয়মিত ছন্দেই এ প্রযোজ্য'।[১৭] চতুর্থত, গানে বিভিন্ন শ্রোতার মানসিক প্রকৃতির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বোধগম্য যে শব্দ তাকেই আশ্রয় কর্তে হয় যাতে সুরের ধর্ম অক্ষুণ্ণ থাকে। এই কথার বিশেষ বস্তুগত প্রতিবিম্ব থাকে না। "কানুহাইয়ার হাতে তখন বাঁশী থাকে না, মাথার চূড়াও উড়ে যায়—থাকে তখন স্বরবর্ণের সাজ, যার উপর তানের ঝলক খোলে ভাল।"[১৫] কিন্তু কবিতায় এ অচল। তাই উক্ত 'স্বরকম্প—ও—দণ্ড' বাদ যুক্তিসহ নয়। অতএব, এ-মন্তব্য 'বিবেচনা-সম্ভূত' নয় যে, "অমূল্যধন বাংলা ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে যা বলেন নি তা বক্তব্যই নয়।"[১৮]

শব্দ ব্যবহৃত হয় তিনটি উদ্দেশ্যে—(ক) সাধারণ বাক্‌; (খ) যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তা; ও (গ) সাহিত্য। যুক্তিনিষ্ঠ ভাষা তথ্যের বর্ণনা দেয়, সত্য ও মিথ্যার নিরিখে বিচার্য এবং এ গদ্যরূপে বর্তমান। সাহিত্য তথ্যের কোন বাস্তব বর্ণনা দেয়না, অনুমানে চলে এবং কল্পনাসঙ্গতিতে বিচার্য। সাহিত্যের অধিকাংশই লেখা হয় কোন-না-কোন নিয়মিত পুনরাবৃত্তির রূপে, তা সে ছন্দ, প্রস্বন স্বরদৈর্ঘ্য, মিল, অনুপ্রাস, সমান্তরতা (parallelism) হোক বা এদের সমবায়ই হোক; আর একে বলা হয় পদ্য। প্রায় পদ্যই সাহিত্যিক এবং দার্শনিক বা ঐতিহাসিক রচনা পদ্যে লিখিত হলে তা সাহিত্য শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। এখানে সাহিত্যিক ও অসাহিত্যিক শ্রেণীর বিভেদ স্মর্তব্য ঃ তথ্যবর্ণনা সত্যের নিরিখে বিচার-সহ হলে তা হয় অসাহিত্যিক; আদৌ কল্পনা-প্রসূত সামঞ্জস্যে বিচার্য হলে তা হয়ে ওঠে সাহিত্যিক। মনে রাখতে হবে যে সাধারণ বাক্‌-এর ভাষা গদ্য নয় অথবা নিদেন পক্ষে যে পরিমানে এ পদ্য নয় সে পরিমাণেই এ গদ্য। সাধারণ বাক্‌ বিশেষত কথ্য বা অবর (vulgar) ভাষা হলো বিচ্ছিন্ন পৌনঃপুনিক (repetitive) ও প্রস্বনিত অলংকার (rhetoric) —এ গদ্য থেকে যেমন পৃথক, তেমনি নিয়মিত ছন্দ (metre) থেকেও। গদ্য হলো সাধারণ বাক্‌-এর শ্রেষ্ঠ আচরণ ঃ এ বাক্‌-এর প্রচলীকরণ (conventionalization) যা করে শিক্ষিত বা উচ্চারক মানুষ যখন সে যুক্তিনিষ্ঠ চিন্তার আদর্শের সঙ্গে নিজের বাক্‌-এর আত্তীকরণে সচেষ্ট হয়। প্রচলীকরণের কমপক্ষে দু'টি রীতি আছে—একটি নিয়মিত ভাবে পুনরাবৃত্ত ছন্দের সরল ও আদিম পদ্ধতি; অন্যটি সুসঙ্গত ও যৌক্তিক বাক্যবিন্যাসের আরো বুদ্ধীকৃত (intellectualised) পদ্ধতি। যখন পুনরাবৃত্ত স্পন্দ প্রধান ভূমিকা নেয় আর বাক্যবিন্যাস-এর অধীনস্থ হয়, তখন পাওয়া যায় পদ্য। বাক্য বিন্যাসের প্রধান ভূমিকায় পুনরাবৃত্তির আদর্শ গৌণ ও অনিয়মিত হলে আসে গদ্য। দু'য়ের পার্থক্য এই স্পন্দবিভেদে। এ ছাড়াও আছে তৃতীয় আরেকটি রীতি, যার নাম দেয়া যায় আনুষঙ্গিক স্পন্দ (associational rhythm) যার একক গদ্যবাক্যও নয়, আবার ছান্দসিক পংক্তিও নয়, কিন্তু একধরনের চিন্তা-শ্বাস (thought-breath) বা বাক্‌মেল (phrase)। এরি পরিচায়ক হলো মুক্তক (free verse) ও "চিৎপ্রবাহ" (stream of consciousness) গদ্য।[১৯]

তিগ্মতা, স্থিতিকাল ও প্রস্বরে ধ্বনি একত্রিত হয় ক্ষুদ্রতর গুচ্ছ ও সমষ্টিতে এবং পরে বৃহত্তর অনুক্রমে ঃ এ হলো স্বাভাবিক বাক্‌-এর ধ্বনি সংযুতি। স্বনমান (phoneme) ও সমষ্টিতে (aggregation) একত্রিত হতে পারে এবং গুণের সমবায়ে মাত্রাগত বল ও সম্পর্ক ক্রিয়াশীল হয়। কিন্তু বাক্‌সংযুতির

একক প্রধান উপাদান হিসেবে অক্ষর-ই, কেননা এতে গুণীয় বিভেদের চেয়ে মাত্রিক সমষ্টি বর্তমান ঃ শ্রুতিগতভাবে (acoustically) এ হলো অনুনাদ অবনতি (recession) কালীন একটি একক ধ্বনি-একত্রন, যা ঘটে একটি নির্দিষ্ট শীর্ষ বা কেন্দ্র অর্থাৎ আক্ষরিক কেন্দ্রক (syllabic nucleus) ঘিরে। যে-কোন বাগ্-ধ্বনির অর্থপূর্ণ প্রবাহে অনিবার্য অনুনাদবৈচিত্র্যের আবশ্যিক ফল এই অক্ষরগঠন। তাই অক্ষর সব ভাষায় অস্তিমান লঘিষ্ঠ সমষ্টিগত একক এবং মৌলিক স্পন্দমান এককও বটে। তবে আক্ষরিক উপাদানের সংখ্যাও ক্রমে বৈচিত্র্য আছে। অধিকাংশ ভাষায় আক্ষরিক কেন্দ্র হলো দৃষ্টান্ত হিসেবে একটি স্বর (V) যার আগে ও পরে অনুষঙ্গী ব্যঞ্জন (C) থাকতে পারে, বা নাও পারে——CV, VC, CVC, CCVCC প্রভৃতি। আক্ষরিক কেন্দ্র ব্যঞ্জনও হতে পারে, যেমন Psst ! ; কিন্তু জাপানীতে একটি একক ব্যঞ্জন অক্ষর হতে পারে, যেমন ma (গৃহ-অর্থে)-র m। স্থিতিকালের উপাদান বা "কালসঙ্গতি" (timing) ও আক্ষরিক গড়নে সক্রিয় হতে পারে, যেমন বাঙলায়। তিগ্মতা বা অনুনাদের মাত্রা-বলীর (degrees) আভ্যন্তরীণ বৈশাদৃশ্যে বহু-দৃষ্ট (typical) অক্ষরের অন্তর্ভুক্ত হয় লয়বিন্যাসের (pattern of cadence) লঘিষ্ঠ উপস্থাপন। তাই আন্তরাক্ষরিক (intra-syllabic) স্তরে বর্ধিষ্ণু (rising) বা একান্তরী (alternating) লয় প্রদর্শিত হয় CV-CV-CV ধরনের ক্রমে—অনেকভাষায় CV পৌনঃপুনিক অথবা অক্ষর গঠনের একমাত্র ব্যবস্থা। স্বাভাবিক বাক্-এর বৃহত্তর সমষ্টিতে অক্ষর-একত্রণের রূপান্তরণ নিরূপিত হয় প্রধানত ভাষার বাক্যরীতিক গড়নে (Syntactic structure) এইসব বৃহত্তর এককের অর্থগত কৃত্যে। বস্তুত অক্ষর গঠনে অক্ষরসমন্বয়ের বাক্যরীতিক এককে রূপান্তরণ পদ্ধতি বিভিন্ন ভাষায় বিভিন্ন রকম। প্রতিটি এককের ধ্বনিক সত্তা বজায় রাখতে কখনো আনা হয় ছেদ কখনো বা সংহতি। উক্তির বৃহত্তম একক চিহ্নিত হয় বিরাম সীমায়, যাতে ধ্বনি ছিন্ন হয় মৌনে। বাক্-এর ধ্বনিক অনুগড়নে (microstructure) অনবচ্ছেদের মাত্রা পোষণের প্রয়োজনে ক্ষুদ্রতম সমষ্টি-এককের সীমা নির্ধারণে প্রকৃত মৌনের ব্যবহার নিষিদ্ধ। কাজেই ক্ষুদ্রতর একক তার অখন্ডতাও স্বাতন্ত্র্যের জন্যে নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ চূড়ায়-মান (culminative) বা একত্রনী উপাদানের উপরে, কিন্তু বিভাজক বহিঃস্থ সীমা-নির্ধারক (delimitative) অভিক্রিয়ার উপর নয়। আর মধ্যবর্তী এককগুলি বিভিন্নভাবে চূড়ায়মান ও সীমানির্ধারক উপাদানে তৈরি। ফলে ক্ষুদ্রতর এককে সমাকলন উপাদানের ঘনীভবন বা অধিকতর একত্রণ ঘটে অর্থাৎ কিনা প্রস্বন ও স্বরভঙ্গির ছান্দসিক ঝোঁক ও কাল-নিরূপণ—বৃহত্তর এককের

বিস্তৃততর প্রসারের (span) উপরও দেখা যায় পরিবর্তিত ও ব্যাপ্ত আকারে (diffused form)। তবে লক্ষণীয় যে একক বৃহত্তর হলে স্বরভঙ্গি (সুস্বর—melody) তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে ; আর একক ক্ষুদ্রতর হলেও এর সনাক্ত-করণের জন্যে অন্যান্য ছান্দসিক উপাদানের উপর হয় বেশি নির্ভরশীল। একত্রণের ক্ষুদ্রতম একক, অক্ষর, সচরাচর চিহ্নিত হয় আদৌ এর নিউক্লীয় কেন্দ্রক বা অক্ষরীয়কের প্রাধান্যেও ; তবে এর সীমানা প্রায়ই থাকে অনির্দিষ্ট।

অক্ষরের পরবর্তী ধ্বনিক সমষ্টি অর্থাৎ আক্ষরিক বা স্পন্দিত সমষ্টি ও বিশেষিত হয় প্রধানত আভ্যন্তরীণ নিউক্লীয় ঘনীভবনে—এ এমন একটি ধ্বনিগুচ্ছ যা একটি একল ধ্বনিতত্ত্বের প্রচলিত আদর্শে উচ্চারিত হয় অথবা প্রস্বন ও স্বরভঙ্গির ধ্বনিরেখা (contour) যার নিউক্লীয় কেন্দ্র বা শীর্ষ পূর্ণরূপে হলো ধ্বনিতাত্ত্বিক চরম প্রস্বন। গণ-এককে নিউক্লীয় কেন্দ্রই সমধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। স্পন্দিত গণের নিউক্লীয় কেন্দ্রকে বলা যেতে পারে ভরকেন্দ্র (centroid) যা অক্ষরীয়কের (syllabic) অনুরূপ। গণ-একক একটি অক্ষর হতে পারে, আবার হতে পারে একাধিক শব্দ যারা একটি প্রধান প্রস্বনে সংগঠিত। এই গণ-এককই উক্তির একটি লঘিষ্ঠ মুক্ত একক এবং সকল অবাধ উক্তি-এককের জাতিরূপ। এর ধ্বনিতাত্ত্বিক গড়ন একটি ভিত্তিক আদর্শ স্থাপিত করে যা রক্ষিত হয় বৃহত্তর এককে এর সম্প্রসারণে। আক্ষরিকগণ (syllabic group) সরল বা যৌগিক হতে পারে। সরল গণে ধ্বনিরেখ কেন্দ্রকে (contour-nucleus) একটি প্রধান প্রস্বন প্রচ্ছন্ন থাকে ; যৌগিক গণে একাধিক প্রস্বন থাকে, যথা প্রবল, মধ্য ও দুর্বল। ত্র্যক্ষর পদে দু'টি প্রচাপ (stress) থাকে, মুখ্য ও গৌণ যেমন, ´আলু—´ভাজা। স্বতন্ত্র পদের প্রচাপ পদ-সংযোগে অনেক সময় খর্ব হয়ে যায় । ফলে একটি শ্বাস গোষ্ঠীর (breath group) একটি প্রধান পদে মুখ্য প্রচাপ পড়ে, যেমন, ´বাংলা অ`মাদের ´মাতৃ`ভাষা, অথবা, অ´নেক উপক`ার করেছ।[২০] বাঙলায় দু'রকমের প্রচাপ আছে – শব্দ প্রচাপ (word stress) ও বাক্য-প্রচাপ (sentence stress)। প্রথমের উদাহরণ ´মনোরঞ্জন ; দ্বিতীয়ের 'তুমি যাবে তো ´খাওয়া দাওয়া সেরে নাও।' প্রবল ক্রোধ, তীক্ষ্ম মতভেদ ও বিস্ময়ে প্রচাপ পড়ে গুরুত্বপূর্ণ শব্দের আদ্য অক্ষরে। প্রচাপিত অক্ষরের দ্রুত উল্লম্ফন ঘটে এবং পরবর্তী তীব্র পতন ও ঃ ফলে সংশিল্পষ্ট স্বর যুগপৎ দীর্ঘীকৃত হয়। এতে বোঝা যায় যে বাঙলায় জোর (emphasis) প্রচাপ ও স্বরদৈর্ঘের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছে, যেমন, তুমি যাও। মনে রাখতে হবে যে বাঙলায় ধ্বনিমানিক ও দ্বিগুণ প্রচাপ নেই।[২১]

গণ-এককের মধ্যেও দেখা দেয় লয়ের আদর্শ—প্রস্বনিত ধ্বনিরেখা (contour) হলো লয়ের প্রতিরূপ। তবে কেবল অক্ষরগণের স্তরেই লয় বাক্-এ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাক্-এর সাধারণ লয় গণ-এককের একল লয়ের অনুক্রম থেকে স্বতন্ত্রঃ এ হলো প্রধান ও জোরহীন অক্ষরের অবস্থানগত সম্পর্কের একটি সন্তত (continuous) আদর্শ, যেখানে গণ-বিভাজন বা গণ-সীমানার অথবা গণ-ধ্বনিরেখার কোন নির্দেশ নেই। বস্তুত সাধারণ লয়ে উপস্থাপিত হয় একান্তরণ বা অন্য সন্তত পুনরাবৃত্তির নিয়মনিষ্ঠা (regularity)। গদ্যের বৃহত্তর স্পন্দমান ছাঁচ তৈরি হয় এককের প্রবলতর ও ও দুর্বলতর উপাদানের একত্রণ ও বণ্টনে (massing and distribution): এর-অনুরূপ হলো বৃহত্তর বাক্যরীতিক ও আলঙ্কারিক সত্তা, যেমন বাক্মেল (phrase)। অন্তর্বর্তী সদস্য (intermediate members) বাক্য, যা প্রাচীন অলঙ্কার শাস্ত্রীয় কমা, কোলন ও বাক্সমগ্রের (period) সমগোত্রীয়। এ-সব এককে সঠিক লয়ে প্রতিস্থাপিত হয় বৃহত্তর বিচলন বা তরঙ্গিত গতি এবং এরি সঙ্গে তুলিত হতে পারে ভারকেন্দ্রীয় গণের অন্তঃস্থ আক্ষরিক এককের ছোটখাট তীক্ষ্ম বৈশাদৃশ্য। সঠিক লয় বাক্-এর বৃহৎ গড়নের ধর্ম, কিন্তু স্বাভাবিক বাগ্-রূপ অর্থাৎ অনুগড়নে নয়। তবে বৃহত্তর এককের আকৃতি সজ্জায় অনুগঠনীয় উপাদানের অংশ থাকতে পারে এবং সঠিক লয় তাই আলঙ্কারিক এককের সজোর অংশে প্রতিফলিত হয়।

ভারকেন্দ্রীয় আক্ষরিক গণ-একক ধ্বনিতাত্ত্বিকের কাছে বাক্যরীতিক শব্দ-একক বা ধ্বনিক শব্দ। প্রকৃতপক্ষে সংযুতির দুটি ক্ষুদ্রতম ধ্বনিতাত্ত্বিক একক অক্ষর ও গণ—অবশ্যই ধ্বনিতাত্ত্বিক সত্তা, বাক্যরীতিক এককের সঙ্গে যার প্রতিষঙ্গ (correspondence) নির্দিষ্ট নয়। এখানে উল্লেখ্য যে ধ্বনির আলঙ্কারিক ও বাক্যরীতিক একত্রণ বা সমাবেশে ধ্বনির সীমানা বাক্যরীতিক এককের সঙ্গে মিলে যায়; কিন্তু এমন কোন বাক্যরীতিক বা রূপমূলীয় সত্তা নেই যা অনিবার্যভাবেই অক্ষর বা ভারকেন্দ্রীয় অক্ষর-গণের সঙ্গে মিলে যায়। অক্ষ শব্দ বা শব্দাংশ; আক্ষরিক গণ একক শব্দ বা শব্দ সমষ্টি। 'মা' ও বৃষ্টির 'বৃষ্' অক্ষর; 'রেলগাড়ি' ও 'রেলগাড়ি ধায়' আক্ষরিকগণ। শব্দ ধ্বনিক একক নয়, কিন্তু বাক্যরীতিক সত্তা—ধ্বনিতাত্ত্বিক দিক থেকে এর জুড়ি হলো একক অক্ষর-গণ কিন্তু সর্বদা নয়, যেমন তোমার—তো+মার্—এ দুটি মিলে গেছে, এর প্রত্যয়ও আছে, যথা—

হায়রে রূপ | কার,
না হয় কারো | করো নি উপ | কার।

এখানে 'রূপকার' ও 'উপকার' খণ্ডিত হয়েছে অর্থাৎ শব্দ ও গণের গরমিল

এসেচে। অবশ্য বৃহত্তর অলঙ্কারিক একক—বাক্‌মেল, সদস্য, বাক্য - ধ্বনি তাত্ত্বিক ভাবে একটি একক ভারকেন্দ্রীয়গণ। এই বৃহত্তর একক একাধিকগণের সমন্বয়। তাই এখানে সারি (series) ও রীতি (system)-র পার্থক্য এসে পড়ে। দু'রকমের একক আছে—একটি অনুক্রম একক (sequence) যা তৈরি হয় সারির সীমা নির্ধারণে; অন্যটি রীতির একক, যা গড়ে ওঠে আভ্যন্তরীণ একত্রনী ধর্মে। তবে স্পন্দমান গড়নের একক প্রধানত আলঙ্কারিক বা বাক্যরীতিক বিভাগের অনুরূপ পদ্যেব্যবহৃত ধ্বনিক একক নয়। এসব বিভাগ —শব্দ, বাক্‌মেল, বাক্যাংশ, বাক্য বা বাক্‌সমগ্র—বাক্-এর সর্বত্র বর্তমান এবং এরা স্পন্দের কারক প্রতিমান (balance) সৃষ্টিতে সক্রিয়। বস্তুত সব বাক্‌স্পন্দই বাক্-এককের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। বাক্-এর স্বাভাবিক বৃত্তীয় এককে উপরি পাতিত ছাঁচেঢালা এই স্পন্দ হলো সকল বাক্-এর মৌল ও অত্যন্ত ভিত্তিস্থানীয় স্পন্দ, হোক্‌না সে গদ্য, পদ্য, ছান্দসিক বা অছান্দসিক উক্তি। এই স্পন্দ যখন একলা থাকে এবং বাক্-এর প্রতিমান ও মাপ নির্ধারিত হয় স্বাভাবিক বৃত্তীয় এককে গণসত্তা বজায় রেখে, কিন্তু চক্রীয় পুনরাবৃত্তি বাদ দিয়ে, তখন সে হয় স্বাভাবিক গদ্যের স্পন্দ। কিন্তু ছান্দসিক স্পন্দ গদ্যস্পন্দ থেকে আলাদা, কেননা এতে নেই গণসত্তা, কিন্তু আছে চক্রীয় পুনরাবৃত্তির একক ও এমন একটি সত্তা যা কোন নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনানুসারে গঠিত হয়েচে কৃত্রিম ভাবে গণের ছান্দসিক উপাদানের বিমূর্তন ও পুনর্যোজনায় (recombination)। চক্রীয় সত্তার ছান্দসিক পরিকল্পনা (metrical schematisation) ক্রমিক (serial) হতে পারে অক্ষর বা প্রচাপ গণণায়; তবে এতে উৎপন্ন হয় গণ-এককের চেয়ে বৃহত্তর একক বা পংক্তি, যা গণ-একক ও আলঙ্কারিক একক থেকে স্বতন্ত্র। অথবা এ রীতিবন্ধও হতে পারে যখন বিসদৃশ উপাদান বা মানের অনুপাত বা বিন্যাসে এ পর্ব গড়ে তোলে যা গণ-একক থেকে স্বতন্ত্র—এ পর্বই রূপান্তরিত হয় পংক্তি-এককে, যা স্বাভাবিক একত্রণী একক থেকে আলাদা।

এখানে মনে রাখতে হবে যে পরিকল্পনানুসারে কাজ চললেও, পুনরাবৃত্তির এককই সারাৎসার। তবে অধিকাংশ ভাষার ছান্দসিক পদ্যে দেখা যায় পরিকল্পনীয় আদর্শ অনুযায়ী বৈচিত্র্য, যা এসেচে চক্রীয় একক বা পর্ব এবং পংক্তি এই দুই স্তরে। কাজেই সাধারণভাবে বলা যায় গদ্য ও পদ্য সম্পর্কে—

(১) বাক্ স্পন্দ ছান্দসিক (metrical) হবে যেখানে বিশিষ্ট সম্মেলক (aggregatory) গণ বা শব্দ-এককের সমতুল বা ক্ষুদ্রতর এককের নির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার (schematisation) সন্তত পুনরাবৃত্তি ঘটে।

(২) বাক্‌স্পন্দ পদ্য হবে যদি বিশিষ্টগণ বা শব্দ এককের তুলনায় বৃহত্তর

এককের অনবরত ছেদহীন পুনরাবৃত্তি ঘটে—তবে পদ্য ছন্দোহীন বা মুক্ত হবে যদি গণস্তরে বা তার নিচে পরিকল্পিত চক্রের ছেদহীন পুনরাবৃত্তি না ঘটে।

(৩) এ দু'য়ের একটিও না ঘটলে বাক্‌স্পন্দ হবে গদ্যের।[২২] এদের উদাহরণ নিচে দেয়া গেলঃ বাঙলা ছন্দে অক্ষর একক হয়েছে চাপবৃত্তে, যেমন,

/ / / /
বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদী এল | বান

এখানে অক্ষর হয়েছে একক, যা শব্দের তুলনায় ছোট। 'বিষ্টি' একটি শব্দ, কিন্তু 'বিষ্' একটি অক্ষর এবং এ হয়েছে স্পন্দ প্রবাহের একক। অবার শব্দের তুলনায় বৃহত্তর এককও আছে, যা কখনো 'পদ' অবার কখনো বা 'পর্ব' হয়ে ওঠে। 'পদ' একক হয়ে গড়ে তুলেচে তানবৃত্ত ছন্দ, যথা,

অঘ্রানে শীতের রাতে। নিষ্ঠুর শিশির ঘাতে
পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া।

এখানে আছে ৮+৮ ও ১০ এর পদক্ষেপ। 'পর্বে' প্রকট হয় তালবৃত্ত ছন্দ, যথা,

ভূতের মতন | চেহারা যেমন | নির্বোধ অতি | ঘোর

এবার গদ্যের কথা। গদ্যস্পন্দের একক বাক্‌মেল (phrase) আর কয়েকটি বাক্ মেলের সমবায়ে গড়ে ওঠে বৃহত্তর স্পন্দগণ অর্থাৎ বাক্য বা বাক্যাংশ। এইবাক্-মেলের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে পদ্যপর্বের, এবং বাক্যের সঙ্গে পদ্যপংক্তির। একটি গৌণ বিরামে প্রতিটি অর্থপর্ব বিভক্ত হয়ে যায়; আর বাক্য মুখ্য বিরতি-তে। । ও ॥ চিহ্নে বুঝাবে গৌণ ও মুখ্য বিরতি। নিচে দেখান হলো—

১ ২ ১ ২ ১ ২
সত্য সেলুকাস | কি বিচিত্র | এই দেশ ॥

৫.৩ প্রচাপ, প্রস্বর ও মাত্রাবিচার

বাক্-গুণের মধ্যে আছে প্রস্বন (accent), জোর (emphasis), স্বরভঙ্গি (intonation), ও বাক-মেলন (phrasing)। আগেই বলা হয়েছে যে বাঙলায় অক্ষর সংগঠিত হয় উক্তির দ্রুতিতে। ইংরেজির প্রস্বন (accent) এর নিয়ামক নয়। এ-প্রসঙ্গে বলেন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ঃ প্রচাপ (সূচিত হয় অক্ষরের পূর্বে / -এই চিহ্নে) সাধু বাংলায় একল শব্দ সম্পর্কে তাৎপর্যপূর্ণ নয়। চলিত বাঙলায় প্রচাপ গড়ে প্রধানত বিশিষ্ট শব্দের আদিতে। এই প্রচাপ, অবশ্য, ইংরেজির মতো তত প্রবল নয়। শব্দ-প্রচাপ সর্বদাই বাক্য-প্রচাপের

অধীন, আর সংলাপে বাক্যপ্রচাপ প্রায়ই অর্থপর্বের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শব্দের আদ্যঅক্ষরে পড়ে। চলিত ভাষার পঠনে ঈষৎ কৃত্রিম বাগাড়ম্বর উচ্চারণে এই প্রচাপ আদ্যঅক্ষর হতে পরবর্তী অক্ষরে অপসারিত হতে পারে যদি তার ম, ণ, ঙ, ল, র এর সঙ্গে ব্যঞ্জনীয় যোগ থাকে। বিশিষ্ট শব্দের প্রচাপ বাক্যপ্রচাপে মিশে যায়। কেননা একটি অর্থপর্বে থাকে আদিতে বা তার সন্নিকটে শুধুমাত্র একটি মুখ্য প্রচাপন। এই-ই নিয়ম, তবে কোন বিশেষ-শব্দে জোর দিতে প্রচাপের অবস্থান পরিবর্তিত হতে পারে। প্রচাপনে আবশ্যিক দৈর্ঘ্য নেই, কিন্তু সাধারণত প্রচাপিত অক্ষরে থাকে নিচু প্রস্বরণ। যতদূর সম্ভব, প্রচাপ আসে প্রায় সমান-সমান কালান্তরে অর্থাৎ বাক্যের বিভিন্ন অর্থপর্বের কালদৈর্ঘ্য একই থাকার পক্ষপাতী। কালান্তর সমান রাখার জন্যে অল্পসংখ্যক-অক্ষরের অর্থপর্বের একটি অক্ষর দীর্ঘীকৃত হয় এবং অধিকসংখ্যক অক্ষরের পর্বটি দ্রুত উচ্চারিত হয়। প্রচাপের সমান-সমান কালান্তরে ভাষার বিশিষ্ট স্পন্দমান প্রকৃতি ফুটে ওঠে, যা লক্ষণীয় বিশেষত উচ্চ পঠনে"।[২৩]

এখানে স্মর্তব্য যে ধ্বনির প্রচাপভেদ নির্ভর করে শ্বসন কার্যের মাত্রা ও স্বরযন্ত্রীয় ক্রিয়ার উপর। অতিরিক্ত শ্বসনকার্যে দৈর্ঘ্য বৃহত্তর হয় এবং প্রস্বর ও প্রাবল্য বাড়ে। দৈর্ঘ্য, প্রস্বর ও প্রাবল্যের শাব্দিক প্রতিরূপ (counter-part) হলো স্থিতিকাল, মূল কম্পাংক ও তিগ্মতা ঃ এদের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রচাপ প্রতিকৃতির (pattern) পরিবর্তন সহসম্পর্কিত। বস্তুত প্রচাপ হলো "সমগ্র বাগুৎপাদনতন্ত্রে শারীরবৃত্তীয় শক্তিমাত্রার যোগ, যা ফুসফুসীয় স্বননীয় ও উচ্চারণীয় প্রণালী দিয়ে প্রবাহিত।"[২৪] অবশ্য প্রচাপকে শ্রুতিগুণান্বিত বলা যেতে পারে, যার শারীরবৃত্তীয় বৈশিষ্ট্যের সঠিক সংজ্ঞা দেয়া চলে না। তবে প্রচাপের আরেকটি কাজও আছে ঃ এ হলো আক্ষরিকতার মতোই একটি সংগঠনীসূত্র। কোন উক্তির কালনির্দেশক স্বরকম্প সংগঠনের জন্যে ইংরেজিতে এমন একটি এককের দরকার, যা অক্ষরের চেয়ে বৃহত্তর, কিন্তু স্বরভঙ্গীয় ধ্বনি-রেখার (intonation contour) চেয়ে ক্ষুদ্রতর। প্রচাপের এই ধ্বনিতাত্ত্বিক সত্তাই তৈরি করে প্রস্বন (accent)[২৫]

বাঙলা ভাষার সাধারণ নিয়ম হচ্ছে আদ্যক্ষরে প্রচাপ পড়ে, যেমন ´প্রমাদ ´প্রসাদ প্রভৃতি। কিন্তু হিন্দী ভাষায় এর বিপরীত ক্রিয়া, যেমন পর´মাদ, পর´সাদ ইত্যাদি। বাক্যে এদের পার্থক্য দেখান হলো—

/ / / / /
বাংলা ঃ তাজমহলের পাথর দেখেছ, দেখেছ তার প্রাণ ?

/ /
হিন্দী ঃ তাজমহলকা পাথর দেখা, কভী দেখা উসীকাজান ?

আবার বাঙ্‌লার সঙ্গে ইংরেজিরও পার্থক্য আছে। বাঙলায় একক শব্দে প্রচাপ পড়ে আদ্যক্ষরে, যেমন উত্তুরে, হাওয়া, জোর, বইছে। এদিয়ে বাক্য তৈরি হলে এ দুটি শ্বাসপর্বে বিভক্ত হয়ে যায়, যেমন, উত্তুরে হাওয়া। জোর বইছে। এ যেন এক পরিবারের কর্তারই প্রাধান্য। কিন্তু ইংরেজিতে প্রত্যেক শব্দ প্রচাপ আঁকড়ে থাকে, অবশ্য অব্যয় (particle) ও উপসর্গ (preposition) বাদে। উদাহরণে স্পষ্ট হবে—

বাংলা ঃ পাহাড় | সমুদ্র | নক্ষত্রের দ্বারা | উদ্দীপিতভাব | এমন, গভীর এবং চমকপ্রদ হতে পারেনা। যেমন হয়। বাগনারের। সঙ্গীত।

ইংরেজি··· The impression produced by mountains, seas and stars is not so great, so thrilling, as the music of Wagner.

ইংরেজিতে প্রত্যেক মৌলিক শব্দ নিজস্ব প্রচাপ বজায় রেখেচে।[২৬]

উপরের বাঙলা ও ইংরেজির প্রচাপন পদ্ধতি ভিন্ন-ভিন্ন। বাঙলায় আছে সাধারণত বলা হয় যাকে উরস্পন্দ (chest pulse); আর ইংরেজিতে প্রচাপ স্পন্দ (stress pulse) ও উরস্পন্দের সমবায়। ছড়ার ছন্দে বা চাপ বৃত্তে এরি পরিচয় পাওয়া যায়, যেমন,

বৃষ্‌টি৹ পড়ে | টাপুর৹ টুপুর | নদেয়৹ এলো | বান
শিবঠাকুরের | বিয়ে৹ হবে | তিন-কন্‌নে | দান।

এখানে (.) চিহ্নে বুঝায় বিরাম; (।) চিহ্নে প্রচাপ। বাঙলায় সংস্কৃতের মতো স্বরের প্রকৃতিগত হ্রস্বদীর্ঘত্ব নেই। তবে তারা শব্দে বা বাক্যে দীর্ঘীকৃত হতে পারে বিভিন্ন আবেগ প্রকাশনে বা জোর দেয়ায়। এ পরীক্ষিত সত্য ঃ এতে প্রমানিত হয় যে বাংলায় স্বরদৈর্ঘ্য ধ্বনিতাত্ত্বিক (phonetic), ধ্বনিমানিক (phonemic) নয়[২৭]। এ-কথা রবীন্দ্রনাথও স্বীকার করেচেন উক্ত "ছেলে ভুলানো ছড়া" সম্পর্কে অধ্যাপক জে. ডি. এণ্ডারসনকে লেখা চিঠিতে ঃ "আপনি পাবেন 'ছেলেভুলানো ছড়ায়'—বৃষ্টি পড়ে টাপুর-টুপুর—ছন্দবিন্যাসে

হ্রস্ব বা দীর্ঘস্বরের পরিবর্ত। এ-ছন্দে আছে প্রতি উপপর্বে তিন মাত্রা—একটি হ্রস্বধ্বনি আরেকটি দীর্ঘধ্বনি যার দু'টি মাত্রা। এই পরিবর্তে (হ্রস্ব-দীর্ঘের) কখনো দীর্ঘের পরে হ্রস্ব, আবার কখনো এর বিপরীত। কিন্তু সাধুবাঙলা পদ্যের মতো নয়—এ হ্রস্ব-দীর্ঘ ধ্বনিতে তরঙ্গিত। এ-পদ্যে একটি জিনিস লক্ষ্য করবেন যে ছন্দের প্রয়োজনে কিছু স্বর হয়েচে দীর্ঘীকৃত, অথচ এ ভাষার সাধারণ রীতির পরিপন্থী। 'পড়ে'-র 'এ' দ্বিতীয় উপপর্বে এবং 'টাপুর ও 'টুপুর'-এর 'উ' তৃতীয় ও চতুর্থ উপপর্বে হয়েচে দীর্ঘীকৃত। স্বরধ্বনি সম্পর্কীয় এই নিয়মভঙ্গ চলেচে শেষ অবধি। এর সঠিক আবৃত্তিতে বাঙালী মায়েদের বা তাদের শিশুদের কোনো অসুবিধা হয় নি, কেননা ছন্দের স্পন্দই হয়েচে তাদের পথ-প্রদর্শক"।[২৮] 'ছন্দের হসন্ত-হলন্ত'—এ তিনি আরো বলেচেন ; এটা তিন মাত্রার ছন্দ। অর্থাৎ চার পোয়ায় সেরওয়ালা এর ওজন নয়, তিন পোয়ায় এর সের। এর প্রত্যেক পা-ফেলার লয় হচ্ছে তিনের। তিন গণনায় যেখানে-সেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে। এত সহজ যে, হাজার হাজার ছেলেমেয়ে এই ছড়া আউড়েছে, তবু ছন্দের কোনো গর্তে তাদের কারোকন্ঠ স্খলিত হয়নি। ফাঁকগুলো ঠেসে ভরাতে কেউ ইচ্ছা করেন—দোহাই দিচ্ছি না করেন যেন— তবে এই রকম দাঁড়াবে ঃ

বৃষ্টি পড়ছে | টাপুর টুপুর | নদেয় আসছে | বন্যা,
শিবঠাকুরের | বিয়ের বাসরে | দান হবে তিন | কন্যা।"

এ-আলোচনা থেকে এটাই সুস্পষ্ট হয় যে বন্ধধ্বনি এখানের সর্বত্র গুরু, আবার স্থান বিশেষে মাত্রা প্রসারিত করে মুক্ত-ধ্বনিকেও গুরু করা হয়। উপরের ছড়ার ছন্দে স্বনবৃত্তের মতো সকল বন্ধধ্বনিই গুরু। অধিকন্তু 'পড়ে', 'এলো' 'বিয়ে' 'হবে' 'দান' এর শেষ ধ্বনিকে এবং 'বান-এর প্রথমধ্বনিকে টেনে গুরু করা হয়েচে। মনে রাখতে হবে যে হ্রস্ব-দীর্ঘ ব্যবহৃত হয় স্বর ধ্বনির পার্থক্য বুঝাতে, আর অক্ষর-গঠনে ব্যবহৃত হয় লঘু-গুরু।[২৯] রবীন্দ্রনাথের সমর্থনে রাজশেখর বসু বলেচেন ঃ "বাংলায় accent থাক্‌লেও ছন্দের বন্ধনে তা অবান্তর, সাধারণত গুরু ধ্বনি আর accent মিশে যায়। 'আকাশ জুড়ে মেঘ করেছে' ইত্যাদি চরণে প্রথম ধ্বনি 'আ', পাঠকালে তাতে accent পড়েনা। 'কাশ'-এ accent আছে বলা যেতে পারে। কিন্তু বস্তুত তা গুরুধ্বনি। 'প্রিয়নামটি শিখিয়ে দিত····· কালিদাস তো নামেই আছেন······'—এই দুই চরণের প্রথম ধ্বনি (প্রি-, কা-)-তে accent দেওয়া যায় না। এই রকম ছড়া জাতীয় ছন্দের একটি লক্ষণ—শেষ পর্ব ছাড়া প্রতিপর্বে ছমাত্রা। কিন্তু অন্য শ্রেণীর ছন্দেও ছ মাত্রা হতে পারে। অতএব এই ছন্দে বিশেষ লক্ষণ আর কিছু।

এই লক্ষণ—মাত্রা পূরণের জন্য স্থানেস্থানে যুক্ত ধ্বনিকে টেনে গুরু করা।"[৩০] আব্দুল হাইও বলেন: "প্রচাপিত অক্ষরের ঘটে দ্রুত উল্লম্ফন আর সংশ্লিষ্ট স্বরের যুগপৎ দীর্ঘীকরণের সঙ্গে হঠাৎ পতন।"[২৭] এই "দ্রুত উল্লম্ফন" ও "হঠাৎ পতন"-এ প্রকাশ পায় "বিস্ফোরণ", যার ফল "দীর্ঘীকরণ"। বিস্ফোরণের বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হলো "বন্ধস্থানে প্রচণ্ড ও দ্রুত চাপবৃদ্ধি"। আর এ ঘটে তিন প্রকারে—শক্তির বহিরস্থ উৎসে; বা অন্তঃস্থ তাপমোচী (exothermic) রাসায়নিক বিক্রিয়ায়, যাতে আপেক্ষিকভাবে বৃহৎ আয়তনের গ্যাস উৎপন্ন হয়; অথবা অনিয়মিত নিউক্লীয় বিক্রিয়ায়—কেন্দ্রকীয় বিখন্ডন (fission) বা সংযোজন (fusion) বা উভয়ই—আভ্যন্তরীণ শক্তিমোচনে।[৩১] একে "ভেক প্রলম্ফী ধ্বনি" বলে অভিহিত করেছেন মোহিতলাল মজুমদার—এ সাধুভাষার "গজেন্দ্রগামী" থেকে স্বতন্ত্র। এরি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

"এই (প্রাকৃত) ভাষায় যুক্তাক্ষরের কোন বিশেষ মূল্য নাই—সকলবর্ণই মুক্ত, কেহযুক্ত নয়; এখানে যুক্তবর্ণ কার্যত পরস্পর অযুক্ত থাকে, হসন্তই থাকে; এবং ঐ মধ্যস্থ হসন্ত আদ্যঅক্ষরের স্বরকে সংকুচিত বা প্রসারিত করে না, তাহার 'ঝোঁক' বা উচ্চারণ ক্রিয়ার জোরকে বর্দ্ধিত করে মাত্র—ইহাকে accent বা স্বরবৃদ্ধি, stress বা ঠেস, বলা যাইতে পারে। সাধুভাষায় যুক্তাক্ষরের পূর্ব অক্ষরে যেটুকু জোর বা স্বরবৃদ্ধি ঘটে, তাহা এইরূপ ঠেস হইতে স্বতন্ত্র; যে উচ্চারণে এইরূপ ঠক্কর বা উচট খাওয়া নাই, দ্রুততাও নাই, স্বরের একটু দীর্ঘত্ব অথবা গুরুত্ব আছে মাত্র। কিন্তু—'বিষ্টিপড়ে'-র 'বিষ্‌টি'-তে—যুক্তাক্ষর নয়—হসন্তই ধর্তব্য; তাহার ফলে, পূর্বঅক্ষরে যাহা ঘটে, তাহাকে আমি 'স্বর-বিস্ফোরণ' বলিব, এবং ইহাতেও একরূপ ব্যঞ্জন সংঘাতই ঘটিয়া থাকে। সাধুভাষায় স্বরের প্রাধান্য থাকায় 'বৃষ্টি' এই শব্দটির উচ্চারণ—বৃ-ষ+টি (স্বর প্রসারণ) এবং বৃষ+টি (স্বরসঙ্কোচ)—এই দুই প্রকার হইতে পারে। কিন্তু এই (প্রাকৃত) ভাষার উচ্চারণে, 'বিষ্টি'-র 'ষ্'—পূর্ব অক্ষরের স্বর-বিস্ফোরণের ফলে যেন ছিটকাইয়া উঠিয়া দুই দিকের ব্যঞ্জনধ্বনিকে সংঘট্টিত করিয়া তোলে, যথা—'বি / ষ্ \ টি'; সাধুভাষার উচ্চারণে যে ফাঁক-টুকু থাকে, এখানে তাহা থাকে না। (সাধুভাষায়) 'কন্+ঠে'; (প্রাকৃত ভাষায়)' 'ক / ন \ ঠে।'"[৩২]

মোহিতলালের উক্তিটি সর্বাংশে সঠিক নয়, কিন্তু ত্রুটিপূর্ণ। প্রথমত, "যুক্তাক্ষরের সকল বর্ণই মুক্ত" এ-কথা ঠিক নয়, কেননা মুক্ত হলে বর্ণের যুক্ত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেছেন: "যুক্তবর্ণ কার্যত পরস্পর

অযুক্ত থাকে, হসন্তই থাকে।" এ উক্তি ত্রুটিপূর্ণ। এখানে তিনি যুক্তবর্ণ (conjunct letter) ও যুক্তধ্বনি (conjunct sound) কে গুলিয়ে ফেলেচেন। দু'টি আলাদা জিনিস। যুক্তধ্বনি এক-প্রয়াসী উচ্চারণ (one breath articulation), কিন্তু যুক্তবর্ণ তা না হতেও পারে, অর্থাৎ এ ক্রমিক উচ্চারণ। তাই 'ভক্ত' শব্দটিতে ক্ ও ত্ ধ্বনি দু'টি যুক্ত যেমন "ক্ত", অথবা স্বতন্ত্র যেমন "ক্ত"—যেকোন পদ্ধতিতেই লিখিত হোক না কেন, তাদের উচ্চারকদের একবারের পেশী সঞ্চালনে তারা উচ্চারিত হয় না। আবার 'প্ল' ধ্বনিটি দুটি হরফের সাহায্যে লিখিত হলেও এবং তাদের দু'টি স্বতন্ত্র উচ্চারণস্থান থাক্‌লেও তাদের উচ্চারকদের একটি সম্মিলিত সজোর প্রয়াসেই তারা উচ্চারিত হয়। তাই আসে একটি মিলিত দ্যোতনা। এরা এক প্রয়াসজাত উচ্চারণ অর্থাৎ যুক্তধ্বনি। তৃতীয়ত, স্বর-বিস্ফোরণ কথাটি ঠিক নয়। এ ঘটে ব্যঞ্জনের সংঘর্ষে আর ভিতরে। তাই এ বহিস্ফোরণ (explosion) স্ফোট নয়, কিন্তু অন্তঃফোরণ (implosion) বা আস্ফোরণ বা অভিনিধান। বস্তুত ফরাসীরা নাম দিয়েচেন 'আস্ফোরণ', আর পাণিনি প্রভৃতি বৈয়াকরণরা 'অভিনিধান'। এ দেখা যায় 'ভক্ত' শব্দের ক্ ও ত্ এর উচ্চারণে – ক-ধ্বনিটি তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি বিবর্জিত অবস্থায় অসম্পূর্ণভাবে 'অভিনিধানজাত' উচ্চারণ পেয়েচে এবং ফলে তার উচ্চারকেরা পৃথক্ হয়না এবং বায়ু পথও উন্মুক্ত হয় না।[৩৩] এ-সম্বন্ধে পরে আরো আলোচনা হবে।

এখানে লক্ষণীয় যে বাঙলায় আছে দু'রকমের প্রস্বন—একটি উরসস্পন্দ (chest pulse) যাকে এন্ডারসন বলেচেন "প্রারম্ভিক" (start-off) বা স্বরিত প্রস্বন (tonic accent)। তিনি ইংরেজি পদ্য পয়ারে লিখেচেন কয়েকপংক্তি এবং বাঙলায় যেখানে আছে স্বরিত প্রস্বন সেখানে চিহ্নিত করেচেন প্রচাপনে (stress) যথা—

> //   /   /   /
> This is the melodious the delicately chiming
> //   /   //   /
> Metre of Bengali, in its pauses and its rhyming.[৩৪]

এ-ছাড়াও আছে প্রচাপ স্পন্দ (stress pulse), যার পরিচায়ক ছড়ার ছন্দ—এ উরসস্পন্দকে বলবত্তর করে। দু'য়ের মধ্যে উরসস্পন্দই স্বাভাবিক, প্রচাপ স্পন্দ আপতিক (accidental)। প্রচাপের সঙ্গে যুক্ত আছে জোর (emphasis)—বিবক্ষায় গুরুত্ব দিতেই এর প্রয়োগ। সাধারণ বাক্যে—'যত হাসি তত কান্না। কিন্তু জোর দেওয়ায়——যতই বল না কেন……।[৩৫]

প্রস্বর (pitch) ধ্বনির বৈশিষ্ট্য, যার জন্যে একে উঁচু বা নিচু বলা হয়। আরও নির্ভুলভাবে এহলো "ধ্বনির সেই মন্ময় গুণ যা স্বরগ্রামে নির্ধারণ করে এর অবস্থান"। বহুদিন যাবৎ প্রস্বর কম্পাংকের সঙ্গে সহ-সম্পর্কিত। পুরুষস্বরের পাল্লা ১২০ থেকে ৮,০০০ Hz (হার্‌ৎস); আর স্ত্রীস্বরের ২০০ থেকে ১০,০০০ Hz। মাঝে-মাঝে দেখা গেচে যে প্রস্বর শুধুমাত্র কম্পাঙ্কের উপরই নির্ভরশীল নয়, ও কিন্তু প্রাবল্যের (loudness) উপরও। উচ্চস্বরের প্রস্বরবৃদ্ধি ঘটে প্রাবল্য বৃদ্ধির সঙ্গে ; আবার নিম্নস্বরের প্রস্বর নামে প্রাবল্য-বৃদ্ধিতে। এই বিভেদসীমা আসে ৩,৫০০ Hz কম্পাঙ্কে, যা কানের বৃহত্তম সুবেদিতার কম্পাংক [৩৬]। কম্পাঙ্ক পরিবর্তন ঘটে দু'ভাবে——এক, পেশীয় ক্রিয়ার পরিবর্তনে, যাতে কন্ঠতন্ত্রীর শ্লথন ও স্থূলায়ন ঘটে ; দুই, কন্ঠতন্ত্রীর উপরে ও নিচে চাপ-ভেদের পরিবর্তনে। শ্বাসরন্ধ্রের মধ্য দিয়ে বহির্গামী বায়ুপ্রবাহকালে বাক্-উৎপত্তির জন্যে চাই ২ থেকে ৩ cm H_2O এর চাপভেদ। এর নিচেকার চাপভেদে বাক্ শোনা যাবে না। অবম মানের (liminal value) উপরে চাপের পরিবর্তনে কন্ঠতন্ত্রীর কম্পাঙ্কের পরিবর্তন ঘটবে পেশীয় টান বাদে। সাধারণত প্রস্বর পরিবর্তনের জন্যে দায়ী স্বরযন্ত্রীয় পেশীর ক্রিয়া। স্পর্শ ও উষ্ম বা শিস্‌ধ্বনিতে শ্বাসরন্ধ্র পেরোনো (transglottal) চাপভেদ কমে যায় আর স্বর-কম্পাঙ্কের পতন-প্রবণতা দেখা দেয় ধ্বনিকালে। ঘোষ ব্যঞ্জনের নিম্ন কম্পাঙ্কের ঘটনা স্বরোৎপত্তির একটি প্রসিদ্ধ উপাদান। বাক্-কম্পাঙ্কের পরিবর্তন সব ভাষাতেই দেখা যায়, কেননা সর্বদা একই সুরে কেউ কথা বলে না। ভাষাতাত্ত্বিক প্রয়োগে এর বৈলক্ষণ্য নজরে পড়ে বিভিন্নভাষায়। একদিকে, কম্পাঙ্ক পরিবর্তনকে রীতিমতো উক্তির দীর্ঘপ্রসারের সঙ্গে গ্রথিত করা যেতে পারে——এতে থাকে দৈর্ঘ্যে একাধিক অক্ষর, যার অনুরূপ হলো অপেক্ষাকৃত বাক্য বা বাক্যাংশের (clause) বৃহৎ বৈয়াকরণ একক। কম্পাঙ্ক বা প্রস্বর আদর্শ যদি এ-ভাবে ব্যবহৃত হয়, তবে তাকে বলা হয় স্বরভঙ্গি (intonation), আর যে-ভাষায় ব্যবহৃত হয় তাকে স্বরভঙ্গীয় ভাষা, যেমন ইংরেজি, হিন্দী, বাঙলা ইত্যাদি। আবার রীতিমতো প্রস্বর পরিবর্তন ও প্রস্বর আদর্শ উক্তির হ্রস্বপ্রসারের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে—এতে থাকে অক্ষর দৈর্ঘ্য, এবং শব্দ ও ধ্বনিমূলের হ্রস্ব বৈয়াকরণ একক। প্রস্বর আদর্শ এ-ভাবে ব্যবহৃত হলে তাকে বলে 'সুর' (tone) এবং যে-ভাষায় এ ব্যবহৃত হয় তাকে সুরেলাভাষা, যেমন, চীনা, ইগ্‌বো, জুলু প্রভৃতি[৩৭]। তাই এদের পার্থক্য নির্ধারিত হয় এ-ভাবে ঃ বাক্যরীতিক তথ্য পরিবেশনে প্রস্বর হয় স্বরভঙ্গি আর আভিধানিক (lexical) তথ্য সরবরাহে এ হয়ে ওঠে সুর। এখানে স্মর্তব্য যে লয়-এ নির্দেশ দেয় বিশেষ অক্ষরের প্রস্বর পতনের অস্তি বা নাস্তির ; অপর পক্ষে, শেষ শ্রুতি

(endglide ইঙ্গিত করে অক্ষরান্তিক প্রস্বরবৃদ্ধির অস্তি বা নাস্তির এবং বাকী শ্বাসপর্বে এর অবস্থিতির।[৩৮]

স্বরতন্ত্রীর কম্পনের দ্রুতির উপর স্বরপার্থক্য নির্ভর করে। বৈদিক উদাত্ত (উঁচু), 'অনুদাত্ত' (নিচু) এবং 'স্বরিত' (উঁচু ও নিচুর মিশ্র) স্বর বা সুরে উচ্চারিত হতো। প্রচাপের চেয়ে প্রস্বনই তখনকার রেওয়াজ ছিল। তাই 'ঋক্ প্রাতিশাখ্যে' (৩০১) বলা হয়েচে—

উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ ত্রয়ঃ স্বরা।
আয়াম বিশ্রম্ভাক্ষেপৈস্ত উচ্যন্তে ॥

অর্থাৎ তিনটি স্বর—উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত—উচ্চারিত হয় আরাম, বিশ্রম্ভ ও আক্ষেপ মারফতে। উবটের মতে (৩।২) শরীরস্থ বায়ুসংযোগে গাত্রের অর্থাৎ উচ্চারণ—অবয়বের ঊর্দ্ধগমন হলো 'আয়াম', অধোগমন 'বিশ্রম্ভ', আর তির্যক গমন 'আক্ষেপ'। অধিকন্তু স্বরবর্ণের সঙ্গে উদাত্তাদির ধর্মি-ধর্ম সম্পর্ক ঃ স্বরবর্ণ ধর্মী (গুণী), আর উদাত্তাদি ধর্ম (গুণ)। উঁচু ও নিচু স্বরের পার্থক্যও নির্ধারিত হয়েচে তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (xxii, ৯-১০) ঃ উঁচু স্বরের নিয়ামক হলো 'আয়াম' অর্থাৎ কাঠিন্য ও কণ্ঠনালীর সংকোচন ; নিচুস্বরের জনক হলো শ্লথন, মৃদুতা ও কণ্ঠনালীর বিস্তার। ইংরেজিতে প্রচাপের স্থান পরিবর্তনে শব্দার্থেরও পরিবর্তন ঘটে, যেমন desért= মরুভূমি (বিশেষ্য) ; désert= ত্যাগকরা (ক্রিয়া) ; insúlt= অপমান (বিশেষ্য) ; ínsult=অপমান করা (ক্রিয়া)। অনুরূপভাবে বৈদিক ভাষাতেও সুরের পরিবর্তনে অর্থের পরিবর্তন হতো। আদিতে উদাত্ত স্বরে বিশেষ্য হতো। কিন্তু অন্তোদাত্তে বিশেষণ হতো, যেমন, ́অপস = কর্ম (বিশেষ্য) ; অ ́পস = কর্মনিযুক্ত (বিশেষণ)। আদ্যুদাত্ত পদ কখনো-কখনো হতো ক্লীবলিঙ্গ ; আর অন্তোদাত্ত পুংলিঙ্গ, যেমন ́ব্রহ্মণ=প্রার্থনা (ক্লীবলিঙ্গ) ; ব্র ́হ্মণ=প্রার্থনাকারী (পুংলিঙ্গ)। আবার সাধারণত বহুব্রীহি সমাসে প্রথম শব্দে থাকত উদাত্তস্বর, কিন্তু তৎপুরুষ সমাসে পরের শব্দে, যেমন, ́রাজপুত্র = রাজাপুত্রযার (বহুব্রীহি)। রাজপু ́ত্র= রাজার পুত্র (তৎপুরুষ)। বৈদিক ভাষার পরের যুগে প্রস্বরের জায়গায় সুরু হলো প্রচাপ।

বাঙলায় সুরারোপ তেমন উল্লেখ্য না হলেও, সুরের ওঠানামা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়। এই সুর তরঙ্গ বা স্বরভঙ্গি (intonation) বাঙলার একটি বৈশিষ্ট্য। সঠিক স্বরভঙ্গি চারটি জিনিসের উপর নির্ভর করে—প্রস্বর ; প্রচাপ ; স্পন্দ ;

ও বক্তার উদ্দেশ্য বা মেজাজ। মানুষ শুধুমাত্র একল শব্দে কথা বলে না; সে তার চিন্তনকে প্রকাশ করে দৃঢ়-পিনদ্ধশব্দসমিষ্টতে। কোন বিশেষ মুহূর্তে তার অবস্থান এতে প্রকাশিত হয়। এ-রকম শব্দসমষ্টিকে বলা হয় অর্থপর্ব এবং এরা এক থেকে অন্যে বিচ্ছিন্ন হয় যতি-তে। অর্থপর্বের সামগ্রিক প্রস্বরণকে বলে সুর (tune)—অর্থপর্বের মতোই সুর হ্রস্ব বা দীর্ঘ হতে পারে। ইংরেজিতে স্বরের ওঠা-নামার ক্রমানুসারে এ সুর ছ'রকমের—(১) নিচু পতন (low fall); (২) উঁচু পতন (high fall); (৩) উত্থান-পতন (rise-fall); (৪) নিচু উত্থান (low rise); (৫) উঁচু উত্থান (high rise); ও (৬) পতন-উত্থান (fall-rise).[৬৯] বাঙলায়ও দেখা যায় এই সুরতরঙ্গ যার উদাহরণ নিচে দেয়া হলো—

(১) বর্ণনায়—এখানে ঘটে সুরের উঁচু থেকে নিচে ক্রমিক অবতরণ ঃ



বাংলা আমাদের মাতৃভাষা।

(২). প্রশ্নে ঃ (ক) বিশেষ প্রশ্নসূচক পদ আগে বা মাঝখানে ব্যবহৃত হলে সেই পদের উপর উঁচু সুর হয়, তবে বাক্যের শেষ দিকে অর্থাৎ ক্রিয়ার দিকে আসে সুরের ক্রমাবতরণ ঃ



এ কথা কে বলেছে ?

(খ) বিশেষ প্রশ্নবোধক পদ না থাকলে জিজ্ঞাসা বাক্যে বা 'কি'-যুক্ত বাক্যে সুর শেষের দিকে উঁচুতে ওঠে—



বাংলা ভাষা বলতে পারে ?

(৩) বিস্ময়ে — কম্পনধর্মী সুরতরঙ্গ দেখা যায় ঃ



কি চমৎকার খেলাই যে দেখলুম !

(৪) অসমাপ্ত বাক্যে — এখানেও কম্পনধর্মী সুরতরঙ্গ আছে ঃ



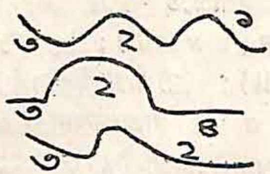
তুমিত এই বলে চলে গেলে এখন আমি—[৪০]

বাঙলায় চারটি স্বরভঙ্গি লক্ষণীয়—(১) উদাত্ত — আপেক্ষিকভাবে সর্বোচ্চ ; (২) নিম্নোদাত্ত — সর্বোচ্চের কিছু নিচু ; (৩) উচ্চানুদাত্ত — সর্বনিম্নের তুলনায় উচ্চ ; (৪) অনুদাত্ত — আপেক্ষিকভাবে সর্বনিম্ন। দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি পড়ে মধ্য বা স্বরিতের কোঠায়। এ দেখান হলো রেখভঙ্গিতে (contour) —

(১) তুমি কখন এলে ? :

(২) ওখানে একটা বাঘ ছিল :

(৩) তুমি যাবে ? :



যথার্থ তিনটি রেখভঙ্গি লক্ষণীয় —— এ আরোহী (rising), অবরোহী (falling) ও সমতলীয় (level)। বাঙলা বাক্‌ প্রবাহে যৌগিক বা জটিল বাক্যে ধ্বনিতরঙ্গ শ্বাসপর্বের অক্ষরগুলোতে সমানস্তরে থাকতে-থাকতে কিংবা ক্রমশ নিম্নগামী হতে-হতে শেষ অক্ষরে পৌঁছে কিছুটা প্রলম্বিত হয় ; তারপরে পরবর্তী নতুন শ্বাসপর্বটির প্রথম শব্দের প্রথম অক্ষরে কিছুটা প্রচাপনে আপেক্ষিকভাবে উচ্চস্বরগ্রামে কিংবা অবস্থাভেদে পূর্বপর্বের শেষ অক্ষরের পরিত্যক্ত স্বরগ্রামেই শুরু হয়। ধ্বনিতরঙ্গ বিশ্লেষণ রবীন্দ্রনাথের 'পঞ্চভূত' থেকে দেখান হলো—

১ /২/ ৩ ২ ১
এ + ´কি ঃ করিয়াছ ? তোমার + ডায়ারির + ´ঐ লোকগুলো কি + ´মানুঃষ?[৪১]

মনে রাখার প্রয়োজন যে জোরাল শব্দ বাক্‌মেলক (phrasing) বিচলনের সমাপ্তির সঙ্গে মিলে যায়। আর উপযুক্ত বাক্‌মেলনে সূচিত হয় সূক্ষ্ম অর্থভেদ। কবিতা আবৃত্তিতে প্রস্বর বৈচিত্র্য দেখা যায়। কিন্তু কথ্য বাক্‌-এ স্বরতরঙ্গ উল্লেখ্য বৈশিষ্ট্য নয়। বাক্‌মেল শব্দ অটুট রেখে অর্থ বের করে যেমন, তেমনি শব্দ ভেঙে নতুন সমবায়ও গঠন করে। এতে প্রমাণিত হয় যে শব্দৈক্য অলীক, যথা,

পৃথিবীটা + /কার বশ ? পৃথিবী + /টাকার বশ।

এখানে প্রথমটির অর্থ দ্বিতীয় থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।[৪২]

উচ্চারণভেদে যুক্ত বর্ণের মাত্রাভেদ ঘটে। সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে এ একমাত্রিক, কিন্তু বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দ্বিমাত্রিক। যেমন 'মন্থর' — এর 'ন্থ' সংশ্লিষ্ট হয়ে একমাত্রিক ; বিশ্লিষ্ট হয়ে দ্বিমাত্রিক। মন্‌ + থর → ন্‌ + থ। ছড়ার ছন্দের

দুটি ধারা আছে—এক, ছ'মাত্রার খেমটা তাল ; দুই, চৌমাত্রিক কাহারবা তাল। এখানে সাধারণত যৌগিক অক্ষরের — যুক্তাক্ষর, যুগ্মাক্ষর ও হসন্ত— সম্প্রসারণ ঘটে। তবে মৌলিক অক্ষরের সম্প্রসারণ এবং যৌগিক অক্ষরের সম্প্রসারণ এবং যৌগিক অক্ষরের সঙ্কোচনও আছে—

(১) চৌমাত্রিক চাপবৃত্ত —— ছিপখান। তিন দাঁড়। তিনজন। মাল্লা

চৌপর। দিনভর। দেয় দূর। পাল্লা।

(২) সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচন — আমি — সতী। লীলা-বতী-

সাত ভায়ের বোন। ভাগ্যবতী-

(৫.৪) ছেদ, যতি ও বিরাম

আগেই বলা হয়েচে যে দু' ধরনের শ্বসন সাধারণত স্বীকৃত — এক, কুক্ষীয়, যাতে মধ্যচ্ছদাই প্রধান চালক (prime mover) ; দুই, বক্ষীয় প্রকার, যাতে মধ্যচ্ছদার বিচলন কমে যায় আর ঊর্ধতন পাঁজর পিঞ্জরের গতিকে করা হয় ব্যাপকতর। দেহের বিরাম-অবস্থায় শ্বসনহার নির্ধারিত হয় রক্ত প্রবাহের প্রয়োজন অনুসারে। রক্তে যখন কার্বন ডাই-অক্সাইডের অন্তর্বস্তু ক্রান্তি বিন্দু (critical point) তে পেঁছায় তখন মধ্যচ্ছদা সংকোচক স্নায়ু সব স্বয়ংক্রিয়ভাবে উদীপ্ত হয়ে ওঠে এবং নতুন বায়ু প্রস্বসিত হয়। মোটামুটি, বিরামশ্বসনের হার প্রতি মিনিটে ১০ থেকে ২০টি প্রশ্বাস। বিরাম শ্বসনের ঘটনাপরম্পরা হলো প্রশ্বাস, নিঃশ্বাস ও বিরতি ; অথচ বিরতি উবে যায় যখন শ্বসন হার বাড়ে অথবা নিঃশ্বাসের আপেক্ষিক দ্রুতি হ্রাস পায়। বিরতি একটি দশাও বটে, যে-সময়ে চরমের চেয়ে আপেক্ষিক জড়তা দেখা দেয়। প্রশ্বাসীয় বিচলনে স্থানচ্যুত দৈহ্য অবয়ব ফিরে আসে নিঃশ্বাসকালে প্রায় তার আদি অবস্থানে তার নিজের ওজন ও স্থিতিস্থাপকতার গুণে। প্রশ্বাসের প্রায় সমতুল্য কালদৈর্ঘ্য নিঃশ্বাসেরও প্রয়োজন — এদের অনুপাত হবে প্রায় ১ : ১.১। মাঝে মাঝে বিরাম-শ্বসন চককরে পূর্ণসাম্য বিরাজ করে, তবে এরকম ঘটনা অপেক্ষাকৃত কম। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস দশার তুলনায় ব্যক্তি বিশেষের শ্বসনে আপেক্ষিক জড়তা (inertness) বা বিরতি— পর্যায়ের তারতম্য অনেক বেশি। বিরতিকে নিঃশ্বাসের অন্তর্ভুক্ত করে যদি দুটি দশা — প্রশ্বাস বনাম প্রশ্বাসহীনতা — পৃথকীকৃত হয়, তবে এদের স্থিতিকালের অনুপাত হবে ১ : ২ যখন শ্বাস-গ্রাহক বসে বিশ্রাম করে। বিরাম-শ্বসন মন্থরতম হয় যখন শ্বাসগ্রাহক শয়ান থাকে, আর দ্রুততম হয় যখন সে খাড়া দণ্ডায়মান থাকে। এখানে

স্মর্তব্য যে সাধারণ শ্বসনে নিঃশ্বাস ও প্রশ্বাস একই সময় নেয় ; কিন্তু বাক্‌-শ্বসনে দ্রুত প্রশ্বাসের পরেই আসে মন্থর নিয়ন্ত্রিত নিঃশ্বাস। দ্বিতীয়ত, সাধারণ শ্বসনে এক চককরের পরেই বিরাম আসে ; কিন্তু বাক্‌-উচ্চারণে বিরাম যে-কোন স্থানে আসতে পারে ভাষার প্রয়োজন অনুসারে[৪২]। এ-পরিপ্রেক্ষিতে মধুসূদন দত্ত বলেচেন ঃ "যতি অষ্টম অক্ষরে অবরুদ্ধ না থেকে স্বভাবতই আসে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অক্ষরের পরে। উদাহরণ—[৪৩]

২ ঃ জয় জয় অমরারি যার ভুজ বলে,
পরাজিত আদিতেয় দিতিসুত রিপু,
বজ্রী —— তিলোত্তমাসম্ভব কাব্য, ৪র্থ সর্গ (পৃঃ ২৩০)
৩ ঃ চলরঙ্গে মোর সঙ্গে নির্ভয় হৃদয়ে
অনঙ্গ ! —— মেঘনাদবধকাব্য, ২য় সর্গ (পৃঃ ২৫৬)
৪ ঃ কেহ কহে — মারি গদা ভীম যমরাজে
খেদাইনু। — তিলোত্তমা সম্ভব কাব্য, ৪র্থ সর্গ (পৃঃ ২৩০)
৬ ঃ আইলেন রক্ষেশ্বরী, সুরজা-সুন্দরী
কুঞ্জরগামিনী।" —ঐ, ২য় সর্গ (পৃঃ ২১৭)

বাক্‌-কালীন শ্বসনহার নিরূপিত হয় উক্তির প্রকৃতিতে। আমরা শ্বাসপর্বে কথা বলি অর্থাৎ কমবেশি গাঢ় সমাকলিত ধ্বনিক্রমে আর প্রত্যেক দু'টির মাঝখানে শ্বাস গ্রহণ করি। কাজেই বাক্‌-শ্বসনের হার বদলায় বাক্‌-এর প্রকার অনুসারে। বিরাম-শ্বসনের আপেক্ষিক বিরতিদশা নেই বাক্‌-শ্বসনে। প্রশ্বাসের বিচলন অতিমাত্রায় ত্বরান্বিত হয় ঃ বিরাম-শ্বসনে যে সময় লাগে তার অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সময়ে এর কাজ সম্পন্ন হয়। নিঃশ্বাস দশা প্রলম্বিত হতে পারে ঃ সাধারণ কথাবার্তায় আগম ও নিগমের স্থিতিকালের অনুপাত ১ ঃ ৩ থেকে ১ ঃ ১০ এবং কোন-কোন ক্ষেত্রে ১ ঃ ৩০, যখন বক্তার অনেক কিছু বলার থাকে। এই বৈসাদৃশ্যের মূল নিহিত আছে ধ্বনিতাত্ত্বিক আদিতথ্যে ঃ উচ্চারিত ধ্বনির অধিকাংশ ধ্বনি উৎপন্ন হয় ফুসফুস-নির্গত বহির্গামী মুক্ত বায়ুপ্রবাহের প্রতিবন্ধকে। প্রশ্বাসের পেশীয় ক্রিয়ায় অবয়ব স্থানচ্যুত হয় ; ফলে এর ওজন ও স্থিতিস্থাপকতায় চাপসৃষ্টি হয়, যাতে ফুস্‌ফুস্‌ থেকে বায়ু নিষ্কাশিত হয় বিরাম শ্বসনে। সজোর নিঃশ্বাসও সম্ভব, তবে তা ঘটে প্রধানত কুক্ষীয় দেয়ালের বৃহত্তর পেশীর সঙ্কোচনে। বাক্‌-শ্বসনে উক্তি—হার প্রতি সেকেন্ড ২.৫ থেকে ৪ অক্ষর হলে Stetson[৪৪] দেখেচেন যে কুক্ষীয় পেশীপুঞ্জ নিশ্চল (fixated) বা দৃঢ় হয়ে যায় এবং তাই পাঁজর-পিঞ্জরের নিম্নতর প্রান্তকে স্থির করে ধরে রাখে। এই ক্রিয়ায় তারা বক্ষপঞ্জরীয় পেশীকৃত সূক্ষ্ম পেশীয় স্পন্দের

এক প্রতিরোধী (resistant) ভিত্তি তৈরি করে। এই সব স্পন্দ অক্ষর পরম্পরার উপর শক্তি বণ্টনের অনুরূপ ঃ প্রতিটি অক্ষরের জন্যে থাকে এরূপ একটি স্পন্দ।[৪৫]

বাক্-প্রবাহ অনবচ্ছেদে চলতে পারেনা — স্পন্দের দুটি অঙ্গ আছে, বড় ও ছোট। বড়টির নাম চাল বা প্রদক্ষিণ ; ছোটটির নাম চলন বা পদক্ষেপ। এই আবর্তনে প্রদক্ষিণের চেয়ে পদক্ষেপেই ছন্দের বৈশিষ্ট্য বেশি নির্ভর করে। তাই এ দুই গতি পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির সমতুল্য। এখানে কাব্য-জগতের সঙ্গে পৃথিবীর মিল[৪৬]। উদাহরণ—

৬ ৬ ৬ ২
জীবন আজিকে। উদ্বেল হ'ল। জড় ভরতের। বুকে
— স্বর্গহতে বিদায় [৪৭]

এখানে ছ'মাত্রার চলন, কিন্তু চাল কুড়ি মাত্রার। অর্থাৎ কিনা পদক্ষেপ পড়চে ছ'মাত্রায় আর এ ঘুরে আসচে আবর্তনে কুড়ি মাত্রা প্রদক্ষিণ করে। এখানে প্রশ্নজাগে বিরতির প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে। মানুষের মন ও দেহের আছে নিত্য সম্বন্ধ অর্থাৎ মানসিক আবেগ ও দৈহিক উত্তেজনা এরা পরস্পর সম্পর্কিত। হাসি-কান্না, সুখ-দুখ, প্রেম-বৈরাগ্য, লজ্জা-ক্রোধ, উৎসাহ-বিস্ময় প্রভৃতি হৃদয়াবেগের বৈপরীত্যে—চাপল্য বা গাম্ভীর্য—রক্তপ্রবাহে ও শ্বসনে কখনো দ্রুতি, কখনো বা শ্লথন আসে। ক্রোধে রক্তপ্রবাহ দ্রুততর হয় ; আর বিষাদে এ হয় মন্থর। এ সব ক্রিয়ায় রক্তে সঞ্চিত হয় অতিরিক্ত কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং এ-দূরীকরণে দীর্ঘ নিঃশ্বাসের প্রয়োজন যেমন, তেমনি অতিরিক্ত অক্সিজেনের জন্যে চাই গভীর প্রশ্বাস। নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের এই রীতি বাক্ প্রবাহের নিয়ামক। ধ্বনি বিজ্ঞান দেখেচে যে দুটি ধ্বনির মধ্যে বিরতিকাল হলো এক সেকেন্ডের দশমাংশ ঃ "ধ্বনি শোনার সময় সংবেদন স্থায়ী হয় এক সেকেন্ডের $\frac{১}{১০}$ ভাগ উদ্দীপকের উত্তেজনার বিরতির পরে"[৪৮]। এই বিরতি-কাল খুবই সূক্ষ্ম। তাই কান একে ধরতে অপরাগ — অনুরণন চলতে থাকে এবং নিরবচ্ছেদ উচ্চারণে এক ধ্বনি অন্যটির সঙ্গে জড়িয়ে এককভাবে উচ্চারিত হয়। যদি S= সংবেদনমাত্রা ও R=উদ্দীপনমাত্রা হয় তবে এদের সম্পর্ক ফেক্নারের সূত্রে (Fechner's law) এ-ভাবে বিধৃত করা যায়——

$$S = K \log R \quad \cdots\cdots \cdots\cdots\cdots \quad (4)$$

এখানে স্মর্তব্য যে উপরের সমীকরণটি সিদ্ধ (valid) এই শর্তে যে R এর একক উদ্দীপনার প্রান্তিক মান এবং S এর সমাকলন সিদ্ধও আরম্ভসীমায় S=০। এ-ছাড়াও ধরতে হবে যে বেবারের সূত্র (Weber's law) সঠিক ঃ $\frac{\delta R}{R}$ = ধ্রুবক (শুধু লক্ষণীয় বিভেদ=শুলিব)[৪৯]।

এখানে ধ্বনিতত্ত্বের শারীরবৃত্তীয় ব্যাখ্যার প্রয়োজন। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের আংশিকভাবে স্বতন্ত্র দু'টি ক্রিয়া বিধি (mechanism) আছে। প্রথমটি মধ্যচ্ছদা ও কুক্ষীয় পেশীপুঞ্জে তৈরি। এই মধ্যচ্ছদা-কুক্ষীয় পেশীতন্ত্র বক্ষবিবরের আয়তনকে কখনো বাড়ায়, কখনো কমায় এর নিম্ন দেয়ালে (মধ্যচ্ছদা)-র ঊর্ধাধ বিচলন ঘটিয়ে। ধ্বনিক্রম উৎপন্ন হয় ফুসফুস হতে বায়ুর নিষ্কাশনে — বক্ষস্থ শ্বসন যন্ত্র এই ক্রমকে খন্ডশ ভাগ করে। এদের মধ্যে অত্যন্ত সুস্পষ্টটি হলো শ্বাস-বিভাগ বা পর্ব (breath group) ঃ এহলো একশ্বসনে উৎপন্ন ধ্বনিমালা। পর্যাবৃত্ত প্রশ্বাসের প্রয়োজনে এর গরিষ্ঠ স্থিতিকাল নিয়ন্ত্রিত হয়। অবশ্য শ্বাস-বিভাগ ফুসফুসীয় বায়ুর মতো স্থায়ী হয় না। মধ্যচ্ছদাকুক্ষীয় পেশীতন্ত্র শ্বাস-বিভাগে কমবেশি—নিয়তভাবে চলে ; শুধু প্রশ্বাসের সময় শ্বাসবিভাগগুলির মধ্যে এর ক্রিয়া পাল্টায়। দ্বিতীয় শ্বসন ক্রিয়াবিধি আন্তরপাঁজরীয় পেশীপুঞ্জে তৈরি। এরা ক্রমিক পাঁজর যুগলের মধ্যে সম্প্রসারিত হয়ে বক্ষবিবরীয় আয়তনের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটায় পার্শ্বিক দেয়ালে (পাঁজরীপঞ্জরে)-র বিচলনে। বাক্-উচ্চারণে আন্তরপাঁজরীয় ক্রিয়া সমস্ত শ্বাসবিভাগে স্থির থাকেনা, কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনের অধীন হয়। এর অনুষঙ্গী হলো স্বর ও ব্যঞ্জনের একান্তরণ — বায়ু পরিমাণের চাহিদা দ্বিতীয়ের তুলনায় প্রথমে অধিকতর। কাজেই বাক্ বিশেষিত হয় ছোট-ছোট স্পন্দে, যা জন্ম নেয় আন্তর পাঁজরীয় পেশীপুঞ্জের এই বিচলনে। আর এসব স্পন্দই ধ্বনিতাত্ত্বিক 'অক্ষর' নামে অভিহিত। কাজেই বাক্ হলো এইসব 'অক্ষর' ও 'শ্বাস' — বিভাগের' সৃষ্টি[৫০]।

শারীরবৃত্তীয় ভিত্তিতে দেখা যায় যে বিপরীত মুখী আন্তরপাঁজরীয় পেশীপুঞ্জের ক্ষেপক বিচলনে জন্ম নেয় 'অক্ষর' ; আর পর্ব, বাক্‌মেল (phrase) বা শ্বাস বিভাগ বা পর্ব হলো মধ্যচ্ছদা — ঋজুকুক্ষীয় পেশীপুঞ্জের বিপরীতমুখী ক্রিয়ার ফল। এতে সন্ধান মেলে অক্ষর ও শ্বাসপর্বের। মনে রাখতে হবে যে বৃহত্তর পেশীর সংকোচনে আছে নিয়ন্ত্রিত বিচলন ; আর কয়েকটি অক্ষরস্পন্দের জন্যে আছে মধ্যচ্ছদা — কুক্ষীয় পেশীতন্ত্রের বিচলন যাতে ঘটে কার্যকর অক্ষর একত্রণ। এই দুই পেশীয় ক্রিয়ার সমন্বয়ে অক্ষর ও বাক্‌মেলের উচ্চারণ সম্ভব হয়। মনে রাখতে হবে যে বৃহত্তর প্রশ্বাসীয় ও নিঃশ্বাসীয় পেশীপুঞ্জ বিপরীতমুখী হয়ে অক্ষর-উৎপাদক আন্তর পাঁজরের পারস্পরিক-ক্রিয়ার দৃঢ় ভিত্তি রচনা করে। বৃহত্তর পেশীপুঞ্জ শুধুমাত্র অক্ষরগুলোকে একত্রিত করে। সাধারণ শ্বসন ও বাক্ শ্বসনের পার্থক্যও এ-খানে—দ্বিতীয়টি প্রথমটির ব্যতিক্রম। প্রথমের কাল পরিমান নিঃশ্বাসে ও প্রশ্বাসে সমান থাকে এবং প্রতিটি বিচলন চককরে একটি করে বিরতি আছে। কিন্তু বাক্‌শ্বসন

নিঃশ্বাস প্রশ্বাসের চেয়ে দীর্ঘস্থায়ী আর বিরতি—বণ্টন ভাষার প্রয়োজনে ব্যাপক[৫১]।

বাক্-প্রবাহের অর্থ হলো বাগ্ধ্বনির স্পন্দমান অবয়ব। এর উপাদানের মধ্যে আছে বাক্-এর দৈহ্য গড়ন ও নিস্তব্ধতার পটে কালে কণ্ঠধ্বনির প্রবাহ ঃ এতে একদিকে ধ্বনি প্রতিহত হয় নিস্তব্ধতায় ও তার স্থিতিকালে ; অন্য দিকে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটে তার গুণ, প্রস্বর, দৈর্ঘ্য ও প্রচাপে। এ-সব সকল ভাষায় দেখা গেলেও, বিশেষ ভাষায় আছে বিশেষ উপাদানের গুরুত্ব। স্পন্দ তাই প্রত্যক্ষজ উপাত্তের কালক্রমে অপেক্ষাকৃত নেত্রাকর্ষক (conspicuous) উপাদানের আবর্তক একান্তরণ (recurring alteration)। এতে তিনটি জিনিষ লক্ষণীয়—(১) প্রবলতর ও দুর্বলতর উপাদানের আবর্তক একান্তরণ ও তাদের পারষ্পরিক সম্পর্কের ছাঁচ ; (২) আবর্তক একান্তরণে গোটা কালক্রমের ছেদে-ছেদে বিভাজন ও প্রবলতর উপাদান ঘিরে দুর্বলতার উপাদানের কেলাসন (crystall-isation) প্রবণতা ; এবং (৩) ক্রমের এ-সব প্রত্যক্ষ ছেদ বা বিভাগের মধ্যে কালিক সম্পর্ক। প্রথমটিকে বলা হয় (cadence) ; দ্বিতীয়টিকে একত্রায়ন (grouping) ; তৃতীয়টিকে মাপ (measure)। ক্রমাবয়বের আপেক্ষিক স্পষ্টতাই স্পন্দের হেতু ঃ এ হলো কম-বেশি মাত্রার বিশেষ পরিমাণের অনুভূত বিভেদ। বাক্-স্পন্দ তাই ধ্বনি ও মৌনের আপেক্ষিক পরিমাণের এক গঠনক্রম অর্থাৎ কম ধ্বনি বা মৌন এককের পটে বেশি ধ্বনি বা মৌন এককের এক সুসমঞ্জস লীলা। এ রকম শৃঙ্খলিত ধ্বনি-একক মালাই হলো অক্ষর ; তবে অক্ষর অন্য একক হতে ধ্বনি-বিরতিতে বিচ্ছিন্ন নয়, কেননা অক্ষরমালা মৌন বা নিস্তব্ধতা ছাড়াই একসঙ্গে চলতে পারে। অক্ষর তাই একটি কেন্দ্রীয় চূড়া ঘিরে কন্ঠধ্বনির এক একক প্রত্যক্ষ একত্রণ। ফলে অক্ষর নিজেই একটি ছোটখাট স্পন্দমান সমষ্টি বা বাক্মেল। এককে ভাষায় এককেটির উপর জোর দেয়া হয়। যেমন ইংরেজিতে প্রচাপ, বাঙলায় মাত্রা, চীনা ভাষায় প্রস্বর ইত্যাদি। যেখানে ধ্বনির কোন একক গুণ নেই, যেমন জাপানী ভাষায়, সেখানে আক্ষরিক চূড়ার শুধুমাত্র আবর্তনই পদ্যসূত্রের নির্দেশ দেয়[৫২]।

যে শব্দ দিয়ে বাঙলা বাক্যের সূচনা হয় তার প্রথম অক্ষরটি পরবর্তী অক্ষরগুলোর তুলনায় কিছুটা উঁচু স্বরগ্রামে শুরু হয়। শ্বাসপর্বশেষের পরবর্তীশব্দের প্রথম অক্ষরটি সম্পর্কে এ-কথা খাটে। অবশ্য শব্দের অর্থ-গুরুত্ব থাকার দরকার, যেমন কা́জ, কা́জলা প্রভৃতি। কিন্তু প্রথমে যদি উপসর্গ বা অপেক্ষাকৃত লঘুঅর্থসম্পন্ন পদাংশ থাকে তবে তা প্রচাপিত হয় না, যেমন প্রধা́ন, উপকা́র ইত্যাদি। প্রথম অক্ষর এড়িয়ে তার পরে

দীর্ঘস্বরের যুক্তাক্ষর বা ব্যঞ্জনান্ত বদ্ধাক্ষর থাকলে তার উপর প্রচাপ পড়ে, যথা, প্রসাদ, উপক্রম ইত্যাদি[৫৩]। এখানে মনে রাখতে হবে যে ধ্বনি বা অক্ষরের প্রচাপন গুণ যতনা শ্রুতিগ্রাহ্য, তার চেয়েও বেশি বক্তার প্রয়াসজাত। তাই ঈর্ষা, দ্বেষ, ক্রোধ, প্রভৃতি প্রকাশনে সংশ্লিষ্ট শব্দ বা শব্দাক্ষর উচ্চারণকালে বক্তার ও চোখমুখের ভঙ্গি বিকৃত হয়। তার শরীরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গও প্রবলভাবে আলোড়িত হয়ে ওঠে। ফলে শ্বাসক্ষেপনের চাপ অনুভূতির তারতম্য অনুসারে লঘু-গরু হয়। এ দেখা যায় 'প্রকাণ্ড' শব্দের উচ্চারণে। বক্তাকে উদ্দেশ করে উচ্চারিত হলে এর অর্থ হবে বর্ণনা– এখানে প্রচাপ ও দৈর্ঘ্য নেই। আবার যদি দ্বিতীয় অক্ষর 'কা' শুরু হতে না হতে তার উপরে শ্বাসের কিছু বেশি চাপ পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে 'ক' সংশ্লিষ্ট স্বরধ্বনি 'আ' বিস্ময়-প্রকাশে 'প্রকা……ণ্ড !' রূপে উচ্চারিত হয় তবে তাতে থাকবে প্রচাপ ও দৈর্ঘ্য দুই-ই। 'প্রকাণ্ড' শব্দের মূল ধ্বনিগুলির (প্‌-র্‌-অ-ক্‌-আ-ন্‌-ড্‌-অ) দুটি ক্ষেত্রে কোন পরিবর্তন হয়নি ; কিন্তু প্রথম উচ্চারণে প্রচাপ ও দৈর্ঘ্যবিহীন, আর দ্বিতীয় উচ্চারণটি প্রচাপ ও দৈর্ঘ্য সমন্বিত[৫৪]। তাই এখানে ভরকেন্দ্র (centroid) এসে পড়ে। সাধারণ বাক্‌ বা গদ্যের জাতিরূপে প্রস্বনিত অক্ষরের প্রচাপ দুর্বল যেখানে শব্দ যুক্তি বা অলঙ্কারের দিক থেকে অপ্রধান এবং এগুলোকে একটি মুখ্য প্রচাপ বা ভরকেন্দ্রের অধীনস্থ করার জন্যে ঝোঁক দেখা যায়। আর এই ভরকেন্দ্র যৌক্তিক বা আলঙ্কারিক জোরের অনুরূপ। ফলে বাঙলা গদ্যে পাওয়া যায় বিরতি—বিচ্ছিন্ন বৃহত্তর অক্ষর সমষ্টি, যাতে থাকে একটি প্রধান প্রচাপ – এ ভরকেন্দ্র ঘিরে আবর্তিত ধ্বনি সমষ্টি। অপরপক্ষে পদ্যের জাতিরূপে প্রতিটি অক্ষরের ভরকেন্দ্র হওয়ার সামর্থ্য রয়ে গেচে। কাজেই স্বাভাবিকভাবে দুর্বল অক্ষরই দুর্বল এবং এর কোন যুক্তিগত বা অলঙ্কারগত জোর নেই। ফলে গদ্যের চেয়ে পদ্যে দেখা যায় ক্ষুদ্রতর সমষ্টি—প্রত্যেক সমষ্টিতে অক্ষরসংখ্যা কম। দ্বিতীয়ত, এদের অনুক্রমের অভিক্রিয়া ও গদ্যের তুলনায় অধিকতর সন্তত। এর কারণ দুটি। এক, পদ্যে স্পন্দমান গোষ্ঠী প্রকৃত বিরতি দ্বারা বিচ্ছিন্ন নয়, কিন্তু এ বিচ্ছেদ ঘটে অর্ধ বিরামে অর্থাৎ কিনা সংক্ষিপ্ত দ্বিধা বা শুধুই ধ্বনি-স্ফীতি বিরতির আভাস দেয়[৫৫]। এ ঘটে ভরকেন্দ্রের ঘনীভবন ও আকর্ষণে, কিন্তু ধ্বনিপ্রবাহের প্রকৃত ছেদে নয়। দু'ই, ভরকেন্দ্রের আকর্ষক শক্তি চৌম্বক কেন্দ্রের মতোই একাধিক দিকে ও বিভিন্ন দূরত্বের উপর ক্রিয়াশীল হয়। কাজেই দুর্বল অক্ষর দুটি ভরকেন্দ্রের কমবেশি বিপরীত আকর্ষণের অধীন হয় এবং প্রত্যক্ষণের জন্যে হাজির করে একত্রণ নির্বাচন অথবা কচিৎ কখনো সুস্থিত অনির্ণেয়তা (stable indeterminacy)।

স্পন্দমানগোষ্ঠীর মধ্যে ভরকেন্দ্র ঘিরে দুর্বল অক্ষরের কেলাসনে গড়ে ওঠে নির্দ্দিষ্ট লয়—উত্থানশীল ; পতনশীল ; বা তরঙ্গিত। অনেক সময় লয় পৌণঃপুনিকভাবে আবর্তিত হয়, যেমন ৬ + ৬ মাত্রায় — —

জাহাজ ডুবেচে। মেঘনা-অতলে ;
দড়াদড়ি পাল। ভাসে নীল জলে।

লয় আবার পারস্পরিক গোষ্ঠী বা পর্বের মধ্যে আলাদাও হতে পারে, যেমন,

প্রেমের করুণ কোমলতা।
ফুটিল তা।
সৌন্দর্যের পুষ্পপুঞ্জে। প্রশান্ত পাষাণে।

এখানে প্রথম পংক্তিতে আছে ১০ মাত্রা, দ্বিতীয়ে ৪, তৃতীয়ে ৮ + ৬। এতে বৈচিত্র্য আসে—তবে উভয় ক্ষেত্রেই আছে সবল অক্ষর ঘিরে দুর্বল অক্ষরের স্বাভাবিক একত্রণ ; আর এ ছাড়াও আছে একটি অনবচ্ছেদ লয়ের সাধারণ ছাঁচ যা নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় গড়ে উঠেচে। এই সাধারণ ছাঁচ হয় অনিয়মিত যখন বিভিন্নলয়ের পরম্পরায় এ হ'য়ে ওঠে বিধৃত। অথবা এ নিয়মিত হতে পারে একই লয়ের পৌণঃপুণিক আবর্তনে। তবে বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য দেখা দিলে তাকেই বলা হয় ছান্দসিকতা, যেমন,

রোগ পালাল। অন্তরালে।
পড়লো প্রাণে। ছেদ।

এখানে শেষ পর্বে মাত্র দু'মাত্রা ৫ মাত্রার চলনেঃ এ এনেচে বৈচিত্র্য ৫ মাত্রার চলনে। অর্থাৎ ৫-মাত্রার স্পন্দনে দু'মাত্রার আবির্ভাব ছেদ টেনে দিয়েচে। এখানে স্পন্দ ও ছন্দ (rhythm and metre) এর পার্থক্য বুঝতে হবে। Rhythm এসেচে গ্রীক rhuthmos থেকে, যার rheo-এ বুঝায় প্রবাহিত হওয়া। এর বৈশিষ্ট্য হলো ধ্বনি ও মৌনের পর্যাবৃত্ত পুনরাবৃত্তি, যার ফলে সুসঙ্গতি ফুটে ওঠে। এ গদ্যে ও পদ্যে বর্তমান। Metre শব্দটি এসেচে গ্রীক metron থেকে, যার অর্থ মাপ বা মাপনী। এতে বুঝায় অক্ষরের নির্দ্দিষ্ট সুসম বন্টন, যা ইংরেজিতে দেখা যায় প্রস্বনিত অক্ষরবিন্যাসে, আর বাঙলায় অক্ষরের মাত্রা দৈর্ঘ্যে। স্পন্দ গদ্যে যেমন বর্তমান তেমনি পদ্যেও। কিন্তু ছন্দ দেখা যায় শুধুমাত্র পদ্যে। কাজেই দু'য়ের পার্থক্য এভাবে নির্দেশিত হয়। গদ্যে জোর বা আদিপ্রস্বন স্পন্দের নিয়ামক, যেমন মাত্রা ছন্দের। অর্থাৎ কালান্তরের পর্যায় হলো স্পন্দের সারাৎসার ; আর ছন্দে অক্ষর সংখ্যার গণিতীয় মাপ। গদ্যে প্রতিটি বাক্‌মেল (phrase) একেকটি সার্থপর্ব—এরা ক্ষুদ্র বিরতিতে

বিচ্ছিন্ন। কিন্তু বাক্য বিচ্ছিন্ন হয় বৃহৎ বিরতিতে। একেকটি বাক্‌-মেল পদ্যের পর্বের সমগোত্রীয়। যেমন,

১ ২ ১ ২ ১ ২ ৩
কয়েক মুহূর্তেই | ঘনান্ধকারে | সম্মুখ এবং পশ্চাৎ।
১ ২ ৩ ৪
লেপিয়া একাকার হইয়া গেল।

এখানে মাত্রার মাপের কড়াকড়ি নেই। কিন্তু পদ্যে এই নির্ভুল মাপই এর প্রাণ। যেমন,

লিয়ার বন্দীআজ | হৃদয় দানে।
পোড়ো মাঠে মাথা কোটে | ঝড়ে ও বানে।

এখানে ৮+৫ এ চলেচে ছন্দ। এরি ব্যতিক্রম হবার জো নেই। অবশ্য এ মাপ লয় ও একত্রণের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। Metre হলো মাপ বা মাপনী আর এ মাপে স্পন্দকাল। এতে ধ্বনি ও মৌন মাপা হয়—এ-মাপ এক প্রচাপ থেকে অন্য প্রচাপ, বা এক বিরাম থেকে অন্য বিরাম পর্যন্ত কখনো স্বতন্ত্রভাবে, কখনো সমবায়ে, অথবা লয় বা স্পন্দ গোষ্ঠীর পুনরাবৃত্তিতে। স্পন্দকাল সমান বা অসমান দৈর্ঘ্যে বিভক্ত হতে পারে। কাজেই স্পন্দপ্রপঞ্চ তিন ভাগে বিভক্ত হয়[৫২]—গদ্য ; পদ্য ; ও স্পন্দিত গদ্য। প্রথম দুটির উদাহরণ আগেই দেয়া হয়েচে। এবার স্পন্দিত গদ্যের উদাহরণ দেয়া হলো কালীপ্রসন্ন ঘোষের 'ঐহিক অমরতা' থেকে—

১ ২ ১ ২ ১ ২ ১ ২
পৃথিবীর এক দৃশ্য | সূতিকা গৃহ | আর এক দৃশ্য | শ্মশান— !

শেষ বাক্‌-মেলে 'বিরাম' হয়েচে মাত্রান্বিত বা মাত্রাযুক্ত।

বাঙলা ধ্বনিপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য এই যে প্রথম অক্ষরের প্রচাপে সংঘবন্ধ হয় অন্যান্য অক্ষরগুলি। তাই এতে খানিকটা ইংরেজি প্রচাপের আদল দেখা যায়। তবে ভাষা নিস্তরঙ্গ বলে, মাত্রা দৈর্ঘ্যই এখানে প্রধান হয়ে ওঠে। মাত্রানুসারে দুই ও তিনের চলনে সৃষ্টি হয় দুটি বিশেষ ছন্দ ছাঁচ। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "ধ্বনির দুইমাত্রা এবং তিন মাত্রা ছন্দের আদিম ও রূঢ়িক উপাদান। তারপরে এই দুই এবং তিনের যোগে যৌগিক মাত্রার ছন্দের উৎপত্তি"।[৫৬] একটির চলন চতুষ্পদের ; অন্যটির বাইকের মতো—একটি চলে মন্দগতিতে ; অন্যটি গড়িয়ে-গড়িয়ে। কবিতায় সাজানো পংক্তিকে সাধারণত চরণ বলা হয়। তবে পংক্তি মানেই চরণ নয়। চরণ (verse) গঠিত হয় ছন্দের পুরো মাপে—চরণকে ভেঙে পংক্তির আকারে সাজানো যায়। চরণ দীর্ঘ হলে এক বা একাধিক বিরামের প্রয়োজন দেখা দেয় প্রশ্বাসের জন্যে। চরণের এই

বিরতি-বিচ্ছিন্ন অংশগুলিই একটি পদ। এহলো দীর্ঘতম একক। পয়ার-জাতীয় ছন্দে একেকটি পদ একেকটি প্রচাপ বা ঝোঁকের শাসনে চলে, যেমন—

৮ ৬+২
মহাভারতের কথা | অমৃত-সমান।

৮ ৬ + ২
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান্।

'অমৃতসমান' এবং 'শুনে পুণ্যবান'—এই দু'অংশে ছ'টি অক্ষর থাকিলেও মাত্রাগণনায় এরা আট। পংক্তিতে আছে দু'মাত্রা পরিমাণ জায়গা ফাঁক আর সুরে এ ভরান হয়। ছ'য়ের চাল বলে এর গুণিতক ৮, ৬ ও ১০-এ খাপ খায়। এখানে চরণ-টিতে আছে দু'টি পংক্তি। চারটি পদ ও একেকটি পদে আট মাত্রা। ইংরেজি verse শব্দটি এসেছে লাতিন versum থেকে, যার অর্থ 'প্রত্যাবৃত্ত' (turned round)—প্রতি চরণ শেষে কবি আবার নতুনভাবে শুরু করে। পদ্য তাই গদ্য থেকে আলাদা, কেননা শেষেরটি আগেরটির মতো অক্ষর সংখ্যায় নিয়ন্ত্রিত নয়। বস্তুত ইংরেজি prose শব্দটি এসেচে লাতিন pro-versum থেকে যার অর্থ 'পুরোবৃত্ত' (turned forward)। তবে সাধারণত পংক্তি অর্থে চরণ ব্যবহৃত হয় বাঙলায়। তাই কবিতায় এরা সমার্থক বলে গণ্য।

এরপরে বিরতি আসে পর্বের শেষে। তিন মাত্রার চলনে আছে এই পর্বের গড়ন এবং তিন-দু'য়েও, আর এদের গুণিতকে। এ-ছন্দে পর্বভাগই মুখ্য। পদ ও পর্বের মধ্যে স্থূল পার্থক্য দু'টি। প্রথমত, পদের তুলনায় পর্বের মাত্রা হিসাব আরো সুনির্দ্দিষ্ট—পয়ারের মতো মধ্যবর্তী অযুক্ত বা যুক্ত হসন্তবর্ণের ওজন আবশ্যকমতো কম বা বেশি করা যায় না। যেমন, 'সুন্দর'-এর ধ্বনিভাগ হবে সু-ন্-দ-র্ এই চার মাত্রার। দ্বিতীয়ত, পর্বের মাপই চরণ মাপার একটি বাটখারা - এ চরণকে সমভাগে ভাগ করে, কেননা এ পদের চেয়ে ছোট। এ-ছাড়া পদ ও পর্বের প্রকৃতিগত প্রভেদও লক্ষণীয়—প্রস্বনের জাতিভেদ ও বিরামবৈচিত্র্য। পদের গোড়াতে একটি করে প্রস্বনিত শব্দ কাপ্তেন করে এবং তার পিছনে কয়েকটি অনুগত শব্দ সমান তালে পা ফেলে কুচ করে চলে যায়। এ-রূপ একেকটি প্রস্বন—কাপ্তেনের অধীনে ক'টি করে মাত্রা-সিপাই থাকবে, ছন্দের নিয়ম-অনুসারে তার বরাদ্দ হয়ে থাকে। কিন্তু পর্বে ছন্দের প্রয়োজনে প্রস্বন পড়ে সাধারণত উচ্চারণরীতি অনুসারে আদ্য-অক্ষরেই পড়ে—কিন্তু এতে বাক্যের অন্বয়ের অবকাশ নেই। নিয়মিত প্রচাপ আছে, যেমন—

। । । ।
নন্দপুর. চন্দ্রাবিনা. বৃন্দাবন. অন্ধকার।

আবার অনিয়মিত প্রচাপ স্পন্দের প্রয়োজনে, যথা—

।　　　　।　　　।
করিলাম বাসা· মনে হল আশা· আরামে দিবস· যাবে।

পর্বে সাধারণত প্রচাপ আসে স্পন্দের প্রয়োজনে, তবে মাঝে-মাঝে এ অর্থগত হয়ে পড়ে, যথা

।　　　　　　　　॥　　　　॥
দরজার পাশে· দাঁড়িয়ে সে হাসে | দেখে জ্বলে যায় পিত্ত।

এখানে ॥ চিহ্ন নির্দেশ করচে আলকারিক বা অর্থগত প্রচাপ। পর্বপ্রবাহের বৈশিষ্ট্য চরণান্তিক খণ্ড পর্ব—

কুঞ্জে আমার· এসে ফিরে গেছে· অকাল বৈশা—খী।

যুক্তাক্ষর ও হসন্তবর্ণের প্রভাবে মিশ্রপর্বে একটি প্রচাপই থাকে; কিন্তু স্বরান্ত-বর্ণ থাক্‌লে দু'টি প্রচাপ দেখা দেয়, যথা—

।　　　　।　　　　।
ধম্‌কে দিয়ে· চম্‌কে চেয়ে· থম্‌কে গেল· তক্ষুনি

আবার,

।　　।　　।　　।　　।　　।　　।
কুসুম + রথে· মকর + কেতু· উড়িত + মধু· পবনে।

হসন্তবর্জনে স্বর-প্রসারণের কোন অবকাশ না থাকলে, প্রচাপের হাতুড়ি-ঘা আসে—

ওরে হত্যা নয় আজ সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন

।　　।　　। ।　　।　　।　　।
অর্থাৎ　ওরে হত্যা-নয়াজ· স-ত্যা-গ্রহ শক্তি—রুদ্বো· ধন্[৫৭]।

বাক্‌প্রবাহে দু'রকমের বিরাম আছে—শ্বাসবিরাম ও সার্থ বিরাম। শ্বাস-বিরামের নাম যতি—এপূর্ণ নয়, আংশিক বিরতি। এতে বাক্‌প্রত্যঙ্গগুলি নিষ্ক্রিয় হয় না, সেকেণ্ডের এক দশমাংশ কালের মতো স্তব্ধগতি হয়ে থাকে মাত্র। অর্থ ও শ্বাস দু-ই সেখানে পূর্ণতা লাভ করে সেখানের পড়ে ছেদ। অর্থাৎ কিনা এখানে বাক্‌প্রত্যঙ্গগুলির বিশ্রামজাত একটি পূর্ণ নিস্তব্ধতার সৃষ্টি হয়। তাই বাঙলা বাক্‌-প্রবাহে দু'রকম পর্ববিন্যাস গড়ে উঠেচে—একটি শ্বাসপর্ব; অন্যটি স্বার্থপর্ব। অর্থের পূর্ণতায় ছেদ আসে। কথাবার্ত্তায় মানুষের ফুস্‌ফুস্‌ একটানা সক্রিয় থাকতে পারে না। নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সুবিধা অনুসারে বাক্‌প্রবাহে স্থানে-স্থানে ওঠানামা তথা ক্ষুদ্রবিরতির প্রয়োজন হয়। বাক্‌ প্রবাহের বৃহত্তর সার্থপর্বের অঙ্গীভূত এ বিরতিগুলি শ্বাসপর্ব, অর্থাৎ ছেদ ও যতিতে বাক্‌প্রবাহ পদ ও পর্বে বিভক্ত হয়ে যায়।[৫৮] পিঙ্গল-ছন্দসূত্রম্‌ (৬।১) এ যতির উল্লেখ আছে ঃ

'যতি বিচ্ছেদঃ।' ছন্দোমঞ্জরী (১।১২) তে আছে—

> যতির্জিহ্বেষ্ট বিশ্রাম স্থানং কবিভিরুচ্যতে।
> সা বিচ্ছেদবিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছয়া ॥

অর্থাৎ জিহ্বার বিশ্রাম বা স্থিতিস্থান 'যতি'। বিচ্ছেদ, বিরাম, বিরতি— এরা 'যতি' পর্যায়ের শব্দ। এঁরি প্রতিধ্বনি করেচেন এক প্রবীন বাঙলা ছান্দসিক ও 'যতি' পতনের সঙ্গে জিহ্বার নিষ্ক্রিয়তাকে যুক্ত করেচেন।[৫৯] কিন্তু ধ্বনি-উচ্চারণে শুধু জিভই নয়, আছে সমস্ত শ্বাসযন্ত্র, যার অন্তর্ভুক্ত হচ্চে বাগ্‌যন্ত্রও। অর্থাৎ বাগুৎপত্তির সঙ্গে জড়িত আছে চারটি স্বতন্ত্র প্রক্রিয়া—(১) বায়ু প্রবাহ প্রক্রিয়া; (২) স্বনন প্রক্রিয়া; (৩) মুখ-নাসিক্য প্রক্রিয়া; ও (৪) উচ্চারণীয় প্রক্রিয়া। এরা যথাক্রমে ফুস্‌ফুস্, স্বরতন্ত্রী, কোমলতালু, আর জিভ ও ঠোঁট-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।[৬০] এখানে উল্লেখ্য যে হলায়ুধ 'যতি'-অর্থে বুঝেচেন প্রতিপাদান্তে 'বিচ্ছেদ' এবং বিশেষ করে প্রতি 'শ্লোকার্ধে'। কাজেই এতে বুঝায় 'ছেদ', যেমন ছন্দোমঞ্জরীর 'যতি'তে বুঝায় শ্বাসবিরতি।

এবার যতি ও ছেদের পারস্পরিক সম্পর্কের কথা। ছেদ হলো অর্থবোধক বিরতি। সাধারণত কমা, সেমিকোলন ও দাঁড়ি দিয়ে এ বোঝান হয়। এ গদ্যেই বিশেষভাবে দেখা যায়, যেমন ঈশ্বরচন্দ্রের 'সীতার বনবাসের' প্রথম বাক্যটিঃ "রাম, রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া, অগত্যা নির্বিশেষে, প্রজাপালন করিতে লাগিলেন"। অন্য দিকে যতি হলো ছন্দ-বোধক বিরতি। পদ্যে এ বিশেষভাবে অনুভূত হয়ঃ আবৃত্তিকালে ছন্দের প্রয়োজনে চরণ এক বা একাধিক প্রচাপে উচ্চারিত হয়। একটি ঝোঁক, তাল বা আঘাত শেষ হলে বাগ্‌যন্ত্রে যে নিশ্চেষ্টতা দেখা যায়, তাকেই 'যতি' বলে। বাক্-প্রবাহ অনবচ্ছেদ নয়। ছেদ বা অর্থ-বিরতিযুক্ত ভাষাকে গদ্য বলে; আর ছেদযুক্ত ভাষা যতি-নিয়ন্ত্রিত হলে সে হয়ে ওঠে পদ্য। কাজেই গদ্য ছেদ—নির্ভর; কিন্তু পদ্য ছেদ ও যতিতে অস্তিমান। যতি ও ছেদ একই সময়ে পড়তে পারে; আবার দুইয়ের ব্যবধান থাকলে যতি-ই প্রধান হয়ে ছেদকে উপেক্ষা করে, যেমন,

(আর) ।ভাষাটাও তা। ।ছাড়া, মোটে। ।বেঁকে না, রয়। ।খাড়া।

এখানে দীর্ঘ দাঁড়িতে যতি-বিরতি, আর কমায় ছেদ-বিরতি দেখান হয়েচে। কাজেই পংক্তিটি সার্থপর্বে ও শ্বাস-পর্বে আলাদা হয়েচে। সার্থপর্বে এ হবেঃ 'ভাষাটাও তাছাড়া, মোটে বেঁকে না, রয় খাঁড়া।' আর শ্বাসপর্ব হবে এরূপঃ 'ভাষাটাও তা। ছাড়া, মোটে। বেঁকে না, রয়। খাড়া'।[৬১]

এ ছাড়াও আছে চাপ-বিরতি। এ প্রচাপ (stress) উঁচুপ্রস্বর (pitch) থেকে আলাদা—এই হ'লো বাচ্যভাবের জোর (weight of voice emphasis)।

এ বাচ্যের একটি ছোট হাতুড়ি—ঘা, যা পড়ে অক্ষরে এবং হ্রস্বাক্ষর ছান্দসিক দৈর্ঘ্যে দীর্ঘতর হয়। এই আঘাতে অতি ক্ষুদ্রস্বর বা সামান্যতম ক্ষুদ্র-অক্ষরও ছান্দসিক দৈর্ঘ্যে দীর্ঘতর হয়।[৮২] এ দেখা যায়, বাঙলার ছড়ার ছন্দে। কাজেই বাঙলা ছন্দে তিনটি আঘাত আছে উচ্চারণে—পদাঘাত, পর্বাঘাত ও চাপাঘাত। প্রথম দু'টি আনুভূমিক এবং তা প্রস্বরণ; আর তৃতীয়টি উল্লম্ব বা খাড়া এবং তা প্রচাপন। উদাহরণে এ সুস্পষ্ট হবে। প্রস্বরণের উচ্চারণ এরূপ, যথা—

/ / /
ঝরছেরে | মৌচাকের | মধু।

কিন্তু প্রচাপনে এ হবে,

| / |
ঝরছেরে মৌ | -চাকের মধু।

বাঁকা দাঁড়িতে বুঝায় প্রস্বরণ ; খাড়া দাঁড়িতে প্রচাপন। লক্ষণীয় যে 'মৌচাকে'-র বেলায় দ্বিতীয় দৃষ্টান্তে প্রচাপ এসেচে চা-য়ের উপর। কিন্তু 'মৌ'-য়ের উপর নয়। পদ ও পর্ব যেমন আছে সাধু ভাষার ছন্দে এখানে তেমনি আছে চাপ-বিভাগ, যার নাম দেয়া যায় অক্ষর মেল বা শুধু 'মেল'। কাজেই বাঙলা ছন্দে তিনটি বিভাগ এসে পড়ে—পদ, পর্ব ও মেল। বস্তুত এরা পর্বেরই নামান্তর। এরা যথাক্রমে তান, স্বন ও বলের পর্ব।

প্রচাপ স্পন্দ (stress pulse) দেশজ লোক সঙ্গীত থেকে উদ্ভূত। বাদ্য-ছন্দের অনুকরণে এর উদ্ভব। খেমটা ও কাহারবা তালের সমগোত্রীয় বলবৃত্ত ছন্দ। এ 'দুনী' চালের ছন্দ। অর্থাৎ সংগীতের স্বাভাবিক লয়ে যা একমাত্রা, এই ছন্দের তা দু'মাত্রার সমান। খেমটাতালের বোল ও ছড়ার ছন্দের পংক্তি মিলে যায় যথা,

+ | + |
ধাক্ ধিনা ধিন্ | নাক্ ধিনা ধিন্ | ধাক্ ধিনা ধিন | নাগ্ ধিনা ধিন

| | | |
আয় আয় সই, | জল আনিগে, | জল আনিগে, | চল।

আবার কাহারবা বোল ও ছড়ার ছন্দের পংক্তির মিলও আছে, যথা,

+ |
ধাগ্ নাত্ নাগ্ ধিন | তাগ্ নাত্ নাগ্ ধিন

| | | |
আগাডুম | বাগাডুম | ঘোড়াডুম | সা-জে

| | | |
বা বাসা খানি | গায়ে লাগা | আর্মানী | গির্জার

উপরের উদাহরণের ইঙ্গিত হলো যে বলবৃত্তে স্বর-সম প্রসারণ ঘটে প্রচাপনে। তাই এতে ছ'মাত্রা ও চারমাত্রার চলনে পর্ব গড়ে ওঠে, যাকে 'মেল' বলা হয়েচে। উচ্চারণের রীতি অনুসারে বিরতিরও রকমফের আছে। তাই তিন ছন্দের বিরতির নাম যথাক্রমে ছেদ (পদান্তিক), যতি (পর্বান্তিক), আর বিরাম (মেলান্তিক)। যতি ও বিরাম স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্তে কি-ভাবে আবর্তিত হয় তা নিচে দেখান হলো যথা,

স্বনবৃত্ত ঃ

খই আর। দই খাও। বই রাখো। তুলে
কই মাছ। ভাজা খেতে। শৈল গেছে। ভুলে।

এখানে চারমাত্রার চলন বা স্বন। কিন্তু প্রচাপনে এ হবে ছ'মাত্রার যথা,

বলবৃত্ত ঃ খই-আ-র। দই-খাও-। বই-রাখো-। তুলে-
কই মা-ছ। ভাজা-খেতে-। শইল গেছে-। ভুলে [৬১]

৫.৫ ভৌত মনস্তাত্ত্বিক স্বনবিদ্যা

I ঃ প্রস্বন

প্রস্বর হলো বাক্ ও সংগীতের উভয়নিষ্ঠ আদিম ভৌতমনস্তাত্ত্বিক লক্ষণ। বাক্-সঙ্গীত ছিল প্রাচীন কণ্ঠ যোগাযোগের বাহন, যা পরে দ্বিধাবিভক্ত হয় বাক্ ও সংগীতে। এই দ্বিধা-বিভাজনে প্রস্বরপরিবৃত্তি যুক্ত হয়েচে গীতল যোগাযোগের সঙ্গে ; আর তানরাগ বা স্বররূপ (tone-colour) স্বর ও ব্যঞ্জনযুক্ত বাক্-এর সঙ্গে। প্রত্যক্ষ ধ্রুবকের আরেক নাম প্রস্বন (accent), যা বাক্-এর সব শাব্দ লক্ষণের যোগ, যথা, কম্পাংক, তীব্রতা, অনুনাদিকা ও স্থিতিকালের সমবায়ের সৃষ্টি। এমন কি প্রচাপেও কম্পাঙ্ক পরিবৃত্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়, যা তীক্ষ্মতায় দেখা যায় না। স্বররূপ গড়ে ওঠে অধিসুরে। এখানে কম্পাংক ও বিস্তার বড়ো হয়ে ওঠে এবং এরা প্রৈতিমাত্রার সঙ্গে সম্পর্কিত। তাই তানের স্থিতিকাল ব্যতিরেকে শব্দ শক্তি (energy of sound)

$$E = m.n^2 .c^2 \cdots\cdots\cdots (25)$$

যেখানের m = কম্পক বস্তুর ভর ; n = কম্পাংক ; ও c = বিস্তার। এরি সঙ্গে যুক্ত কর্তে হয় পরিবর্ধক গুণাঙ্ক (multiplicative factor) হিসেবে কাল-

কে। ফলে গোটাউক্তির সম্পূর্ণ শক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এহলো কর্ম= শক্তি × কাল, যা পদার্থ বিজ্ঞানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এবং এর নাম A :

$$A = \int_{0}^{t} \triangle E = Et \cdots\cdots (26)$$

যেখানের $E = \Sigma e$ এবং e = প্রত্যেক সুরগুণিতকের প্রীতি বা শক্তি আর 'E'র মান [৩২] স্বনবিদ্যায় (acoustics) হলো প্রস্বন বা কর্ম। এতে বোঝা যায় যে উক্তির প্রারম্ভে এন্ট্রপি (entropy) গরিষ্ঠ। কিন্তু উক্তি চলার পথে ক্রমে ক্রমে এ কম্‌তে থাকে।[৬৩] তাই "বাঙ্গালার সাধু-ভাষায় এবং বিশেষ করিয়া চলিত-ভাষায়, এই জোর পদের আদ্যঅক্ষরেই সাধারণতঃ পড়িয়া থাকে। বাঙ্গালায় বাক্য বা বাক্যখণ্ডই স্বরাঘাত নির্দেশ করিয়া দেয়।"[৬৪] ধ্বনির তিন অবস্থা-উদ্দীপক হিসেবে জন্ম দেয় ভৌত স্বনবিদ্যার; সংবেদনে আসে শারীর বৃত্তীয় স্বনবিদ্যা; আর প্রত্যক্ষণে জন্মায় মনস্তাত্ত্বিক স্বনবিদ্যা। কাজেই কানের স্নায়বিক সাড়া অর্থাৎ বিকৃতি বিভব বিশ্লেষণে ধরা দেয়। যদি x = সংবেদন ও p = প্রযুক্ত বল হয়, তবে এদের সম্পর্ক গণিতের ভাষায় হবে : $x = a_0 + a_1p + a_2p^2 + \cdots\cdots a_np^n \cdots\cdots$ **(27)** যেখানে a_1, a_2 $\cdots\cdots a_n$ = ধ্রুবক।

বাঙলা ভাষার একটি সার্থ পর্বে বড়জোর দুটি প্রস্বনিত অর্থাৎ প্রচাপিত অক্ষর পাওয়া যায়। প্রচাপের মাত্রা বিচারে নিচের ক'টি পরিমাপকগুণ লক্ষণীয়—এরা স্বরধ্বনির গুণবাচক এবং নিচে দেখান হলো :

(১) অতি প্রবল (over loud)—যথা, 'এটা আপ/না : র' ? এখানে প্রচাপ পড়েছে 'না'-র উপর।

(২) অতি দীর্ঘ (over long)—গল্প বলনে সাধারণত ব্যবহৃত হয়, কিংবা দূরত্ব বোঝানোর জন্যে যেমন, 'সারিসারি আম, জাঃম, লিচু, আনার : স'। অথবা, ঐ···অ···ই (দূরত্ব ব্যঞ্জক)।

(৩) তড়িৎ ছাটাই (over clipped)—বিরক্তি বোধক ভাব প্রকাশে 'হ্'-দিয়ে শব্দ শেষের অক্ষর বন্ধ ক'রে দেওয়ার জন্যে ছাটাই যেমন, 'না-হ্', 'যা ঃ'।

(৪) সু-উচ্চ (over high)—সাধারণ প্রস্বর থেকে কোন একটি অক্ষরকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দিয়ে তুলে ধরার জন্যে, যথা—'আমি তখন আঃরো ছোট'।

(৫) সুদৃঢ় (over tense)—বিরতির পরবর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনিতে ও কণ্ঠ্য-

গুণপ্রাপ্ত স্বর ধ্বনিতে এ দৃঢ়তা ধরা পড়ে যেমন, 'ত্তা বেশ' ; 'আ-চ্ছা'।

(৬) সুবর্তুল (over round)—বর্তুলাকৃতি ঠোঁট করে আদর প্রকাশে, যথা, 'না-র' 'না'।

(৭) সু প্রসৃত (over front)—ব্যঙ্গবিদ্রূপেও মুখ-ভ্যাংচানোতে, যেমন 'বড়্ডো লেগেছে' এর বিকৃত উচ্চারণ 'বড়্ডো ল্যাগেছে'।

(৮) প্রবল ঘোষ (over breathed)—এ মহাপ্রাণিত, যেমন 'নহা-হ্-অ' বা 'দ্হ—আ—ও' ইত্যাদিতে প্রকাশ পায় অনুনয় বা অনুরোধ।[৬৫]

II ঃ অনুসূত্র

মানুষের বাক্-কে দেহ কলার (tissue of the body) সমাকল ফলন (integrated functioning) হিসেবে বর্ণনা করা যেতে পারে অর্থাৎ কলার সহগ ক্রিয়ার ভাষায়। গণিতে এর রূপ হবে—

$$Sp = f\ (a, b, c, \cdots m, n, \cdots x, y, z) \ \cdots\cdots\ \cdots \ (28)$$

যেখানে Sp=বাক্ আর a···m···x হলো বিভিন্ন দেহকলারক্রিয়া, যথা, পেশীয়, স্নায়বীয়, গ্রন্থীয় (glandular), অস্থিগত প্রভৃতি। এই সূত্রে এটা পরিস্ফুট যে বাক্-এর আছে সমাকল প্রকৃতি, এবং a, b ইত্যাদি কারকের (factor) পরিবর্তনে বাক্ ও পায় নতুন মান। কাজেই যোগাযোগ প্রক্রিয়ায় পেশীয় বিচলনের দান মনে রাখতে হবে। আর ধ্বনিকে পেশীয় বিচলনের ভাষায় ভাবতে হবে ; তবে কখনই সংবেদন স্নায়বীয় ক্রিয়া থেকে স্বতন্ত্র করে নয়। এর কারণ প্রথমটি দ্বিতীয়টির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। এখানে তাই পেশী শারীরবৃত্তের অনুপ্রবেশ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ফলে সংকোচন ও প্রসারণ ক্রিয়ায় খুঁজতে হবে উক্তির একক ঃ এহলো শারীরবৃত্তীয় অক্ষর যার নাম "অনুসূত্র" (hypha)। মীডার ও মুস্কিন্স (C. L. Meader / J. H. Muyskens) অনুসূত্রের তিনটি উপাদান বিশ্লেষণ করেচেন এ-ভাবে ঃ

(১) বিস্ফারক সংকোচন 0·8 sec স্থায়ী হয় এবং কপাটিকা (valve) খুলে দেয়। স্পর্শবর্ণের বেলায় অবশ্য থাকতে পারে নাসিকা বিবর-বিস্ফারকের এক সহগামী সরল সংকোচন।

(২) স্বরোৎপাদক স্বরযন্ত্রীয় ও অন্যান্য পেশীর ধনুষ্টঙ্কারী (tetanic) সংকোচন। এ-সব বিচলনের অন্তর্ভুক্ত হলো শ্বসন ও অনুনাদ প্রকোষ্ঠের রূপকার মৌখিক ও গলনালীয় পেশীতন্ত্রের ধনুষ্টঙ্কারী সংকোচন। এই সকল বিচলনের দৈর্ঘ ০·০৮ থেকে ০·৪০ sec বা তার চেয়েও বেশি হতে পারে বিশেষ ক্ষেত্রে।

(৩) ·০৬ sec স্থায়ী সংকীর্ণণী (constricting) সংকোচন। এ প্রলম্বিত হয়ে ধনুষ্টঙ্কারে পরিণত হতে পারে, যদি পরবর্তী অনুসূত্র সূচক বিস্ফারণের বেশি বিলম্ব হয়। সংবারের সঙ্গে সঙ্গেই অনুসূত্রও শুরু হয় না, কিন্তু এ ঘটে চরম সংকীর্ণণ মুহূর্তে।[৬৬]

এখানে স্মরণীয় যে পেশীয় ক্রিয়ার প্রাথমিক একক হলো সরল পেশীয় সংকোচন আর ধনুষ্টঙ্কার ব্যষ্টি সংকোচনের সমাহার (summation)। ইলেকট্রনিকের ভাষায় এহলো সমাকল বর্তনী (integration circuit)। ধনুষ্টঙ্কার থেকে সরল সংকোচন প্রাপ্তিকে বলা হয় অবকলন বর্তনী (differentiation circuit)। সংজ্ঞাত প্রত্যক্ষণ ও বিস্ফারক সংকোচনের কালান্তর প্রায় সমান। কালের রয়েচে ভৌত ও শারীরবৃত্তীয় স্তর এবং ছেদ ও অনবচ্ছেদ—দুটি স্তরেই কাল বিভিন্ন। মনস্তাত্ত্বিক স্তরে ও কালের আছে পরিবর্তন। সংজ্ঞাত কাল প্রক্রিয়া অসংজ্ঞাত থেকে ভিন্নতর। তাই জাগৃতি ও স্বপ্নের কাল সম্পর্কীয় অভিজ্ঞতা এক নয়। সংজ্ঞাত ও অতিসংজ্ঞাত কালেরও আছে বিভেদ। এ-ছাড়া রসানুভাব হলো কালহীন (timeless); আর এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় উত্তরণ একটি নিশ্চায়ক (crucial) মুহূর্ত[৬৭]। বাক্-ক্রমের ধ্বনি সীমা শাব্দিক ধারণা—নির্ভর; কিন্তু এর বর্ণনা উচ্চারণ ভিত্তিক, যেহেতু শাব্দ একক বিশ্লেষণক্ষম নয়। এখানে স্বননের বিচলনক্রমের আশ্রয় নিতে হয়। দেখা গেচে যে একই ধ্বনির অনুরূপ একই ক্রিয়া ঃ b (শাব্দকাল) = b´ (উচ্চারণকাল)। কাজেই প্রাথমিক একক পাওয়া যাবে b ও b´ এর যোগ বাক্-ক্রমের বিভাজনে, যার নাম ধ্বনিমূল বা ধ্বনিমান। এ-ধ্বনিমূল শাব্দিক ধারণা (acoustic impression) ও উচ্চার্য বিচলন (articulatory movement) এর যোগফল—শ্রুত একক ও কথিত একক, একে অন্যের কারক।[৬৮] এতেই তৈরি হয় অনুসূত্র।

ছন্দ জিনিসটি কালনির্ভর এবং তাই আছে এর মাত্রা। এতে আছে Reichenback যাকে বলেচেন আন্তরপ্রপঞ্চ (interphenomenon) ঃ "প্রপঞ্চের মধ্যবর্তী অপ্রত্যক্ষ ঘটনাসমূহ।"[৬৯] এতে গড়ে ওঠে একটি কালক্রম (time order) অর্থাৎ এক স্থানকালমিতি (geochronometry) ঃ t-অক্ষে প্রকৃত মুহূর্তটি নির্ধারিত হয় তখনি, যখন আমরা স্থাপন করি $t = a + b\eta + c\xi$, যেখানে a,b,c, সাধারণ বাস্তবসংখ্যা আর η, ξ ও অধঃক্রমের প্রকৃত অত্যনুরাশি। ছন্দপ্রবাহ বা স্পন্দ হলো সন্ততি (continuum) এবং গুণিতক $n.\eta < a$ বা $\eta.\xi < \eta$ অর্থাৎ $\xi > \eta$। কাজেই

$$t = a + b\eta + c\xi + \cdots\cdots \qquad (26)$$

এতে আছে ছান্দোপংক্তির পরিচয়, যা পর্বের কালপরিমাণের উপর

নির্ভরশীল। এবার স্থান-প্রত্যক্ষণের প্রকৃতি সম্পর্কে কিছু বলার প্রয়োজন। এ দু'টি স্বতন্ত্র জ্ঞান-উৎসের উপর নির্ভরশীল—একটি স্থানের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য তাৎক্ষণিক ও প্রায়োগিক সংজ্ঞা; অন্যটি মন্ময় আদর্শায়িত সংজ্ঞা। প্রথমটি মাপন-নিয়ন্ত্রিত; দ্বিতীয়টি স্থানের অন্তর্নিহিত ধারণা যা ইন্দ্রিয় পর্যবেক্ষণ-জাত ভুলের বাইরে। প্রায়োগিক স্থান প্রত্যক্ষণ তাই নির্ভুলতার সীমায় নিয়ন্ত্রিত; বিমূর্ত বা আদর্শ স্থান প্রত্যক্ষণ চায় অসীম নির্ভুলতা, যার ফলে এ সংখ্যা ধারণার পাটীগণিতীয় সংজ্ঞার সঠিক অনুরূপ হয়।[৭০]

(27) —সংখ্যক সূত্রের প্রয়োগ করা যায় কাব্যছন্দে। তরঙ্গমাপনী (Kymograph)র সহায়তায় Tennyson-এর একটি পংক্তির অক্ষরানুপাত ১৯২৪-এ Sonnenschein দেখেছেন এভাবে—

The long light shakes a-cross the lakes
12 : 31 : 27 : 45 : 7 : 34 : 9 : 55

এখানে লক্ষণীয় যে পর্ব হতে পর্বান্তরের কিংবা পর্বমধ্যে উত্থান হতে পতনের অনুপাত নিত্য নয়। তাছাড়া ভিন্ন-ভিন্ন বক্তার উচ্চারণে এ হবে ভিন্নতর। ১৯১৯-এ Ada Snell পেয়েছেন এ-অনুপাত—

The long light shakes a-cross the lakes
12 : 60 : 40 : 60 : 9 : 50 : 8 : 50

কিন্তু এ অন্যরূপ; অথচ ধ্বনিমাপনী মিথ্যা বলে না। কাজেই এখানে এসে পড়ে তীব্রতা ও (বল, প্রচাপ), প্রস্বর স্পন্দের লক্ষণ হিসেবে। আর পদ্যের ব্যাপারটি পরিষ্কার হয়ে ওঠে যখন এ বিবেচিত হয় মনস্তাত্ত্বিক বা নান্দনিক দিক থেকে, শুধুমাত্র ভৌত দৃষ্টিকোণ থেকে নয়। এখানে তাই দু'টি বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমত, জ্ঞানেন্দ্রিয় মারফতে কাজ করা মন সঠিক কালমাপক (chronometer) নয়: এ অনুপাতের সূক্ষ্ম বিভেদ কর্তে পারে না। দ্বিতীয়ত, মন-স্বীকৃত স্বতন্ত্র অনুপাতগুলি একীভূত হতে পারে। কানও 99 : 10 অর্থাৎ 1 এবং 1 : 2 এর পার্থক্য ধর্তে পারে না। ধ্বনি মাপনীতে প্রত্যেকটি স্বর ও ব্যঞ্জনের চরম স্থিতিকাল দীর্ঘ নয়—এরা এক সেকেন্ডের শততম অংশে গোণা হয়। তাই Tennyson এর পংক্তির অক্ষরগুলি সেকেন্ডের শতাংশ এবং কান ·07 ও ·09 বা ·09 ও ·012 এর পার্থক্য ধর্তে অপারগ।[৭১] কাজেই স্পন্দে আছে স্থিতিকাল আর কাল হলো স্পন্দের মূল লক্ষণ এই অর্থে যে এ ঘটনার আপেক্ষিক স্থিতিকাল। স্পন্দ আসে শব্দের সান্নিধি (juxtaposition) তে। একটি বাক্য—'যদি সুখ চাও, সন্তান কমাও'—স্পন্দশীল নয়। কিন্তু সান্নিধির পরিবর্তনে এ হয়ে ওঠে স্পন্দমান, যথা 'সুখ যদি চাও, কমাও সন্তান।'

III : স্থিতিমাত্রা

সংস্কৃতে বর্ণ (letter) কে 'অল্' বলে—২৩টি স্বর (অচ্) আর ৪২টি ব্যঞ্জন (হল্)। সমুদয়ে ৬৫টি বর্ণ।[৭২] ব্যঞ্জনান্ত বা হসন্ত অক্ষর আছে —এ হসন্ত বলেও পরিচিত, কেননা এ হস্ ( ) যুক্ত। কিন্তু বাঙলায় মূল স্বরধ্বনি (cardinal vowel) হলো ৮টি—ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও, ও', উ। মূল অর্ধস্বর ধ্বনি ৪টি—ই্, এ্, (য়), ও্, উ্। মূল দ্বৈতস্বরধ্বনি ১৯টি—ইই্, ইউ্, এই্, এও্, এউ্, এ্যাও্, এ্যায়্, আই্, আও্, আউ্, আয়্, আও্, অয়্, ওও্, ওউ্, ওই্, ওয়্, উই্, উউ্। মূল স্বরধ্বনি প্রত্যেকেই অনুনাসিক হ'তে পারে আর এই অনুনাসিকতার চিহ্ন ँ। অসংযুক্ত মূল ব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা ২৯—ক, খ, গ, ঘ, ঙ ; চ, ছ, জ, ঝ ; ট, ঠ, ড, ঢ ; ত, থ, দ, ধ, ন ; প, ফ, ব, ভ, ম ; ব, ল, শ, হ, ড়, ঢ়। ং এর কাজ করে ঙ ; আর বিসর্গ (ঃ) প্রকাশ করে অঘোষ 'হ'।[৭৩] মূল স্বরধ্বনির বৈশিষ্ট্য হলো দু'টি—নির্দিষ্ট জিভ্-অবস্থান ও শব্দগুণ। প্রথমটি ধ্বনিতত্ত্বের বইয়ে পাওয়া যাবে এবং দ্বিতীয়টি গ্রামোফোন অভিলেখে।[৭৪]

এবার যুক্তধ্বনির কথা। বাঙলায় যুক্তাক্ষর সম্বলিত মোট শব্দ সংখ্যা হচ্ছে ৯২৪৪[৭৫]। তবে সংযুক্তবর্ণ আছে ২৫০ এর মতো—কিন্তু শব্দের শুরুতে যথার্থ সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির সংখ্যা ৩৬টি এবং শব্দের মাঝখানে এ সংখ্যা ২৮টি। সংযুক্ত ধ্বনি এ-ভাবে বিভক্ত—

(ক) যথার্থ সংযুক্ত ধ্বনি ৩৬টি—স্ক, স্খ, ষ্ট, স্ত, স্থ, স্ন, শ্ল, স্প, স্ফ, স্পৃ (স্প্র), স্ত্র, ক্র (কৃ), খ্র (খৃ), গ্র (গৃ), ঘ্র (ঘৃ), ছ্র, (ছৃ), জ্র (জৃ), ট্র (টৃ), ত্র (তৃ), থ্র, দ্র (দৃ), ধ্র (ধৃ), নৃ, প্র (পৃ), ফ্র, ব্র, (বৃ), ভ্র (ভৃ), ম্র (মৃ), শ্র (শৃ), স্র (সৃ), ক্ল, গ্ল, প্ল, ফ্ল, ব্ল, এবং ম্ল।

(খ) দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি ২৬টি—ক্ক, চ্চ, ট্ট, ত্ত, প্প, গ্গ, জ্জ, ড্ড, দ্দ, ব্ব, ক্খ, চ্ছ, ত্থ, জ্ঝ, দ্ধ, ব্ভ, ড্ঢ, শ্শ, ল্ল, ল্লহ, র্র, র্ রহ, নন্, ন্ নহ, স্ম, স্মহ।

(গ) সমস্থানজাত নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জন ধ্বনি ১৯টি—ঙ্ক, ঙ্খ, ঙ্গ, ঙ্ঘ, ঞ্চ, ঞ্ছ, ঞ্জ, ঞ্ঝ, ণ্ট, ণ্ঠ, ণ্ড, ন্ত, ন্থ, ন্দ, ন্ধ, ম্প, ম্ফ, ম্ব, ম্ভ।[৭৬] উপরের '-্র' '-্ল' ও '্ন' ফলাজাত তরলধ্বনি নিঃসৃত এবং দ্বিত্বপ্রাপ্ত শব্দমধ্যবর্তী সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি সমন্বিত (আঘ্রান = আগ্ | ঘ্রান, শুক্ল = শুক্ | ক্ল, আশ্বাস= আশ্- | শ্বাস ইত্যাদি।) শব্দের সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির প্রথমটি দুই-অক্ষরে (syllable) বিভক্ত হ'য়ে গিয়ে তার প্রথম ভাগ পূর্ববর্তী অক্ষর এবং দ্বিতীয়

ভাগ পরবর্তী ধ্বনির সঙ্গে মিশে এক—প্রাণজাত দ্বিতীয় অক্ষর গঠন করে। অর্থাৎ এ-প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিখণ্ডিত হ'য়ে উচ্চারিত হয়। এ-জন্যে তার প্রথমটিতে সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রিয় (organs of speech) গুলো কিছুক্ষণ অর্গলবদ্ধ হয়ে যায় এবং তাই এদের উচ্চারণের কালপরিমান দীর্ঘ দ্বিতীয় ভাগের তুলনায়। প্রথমভাগ অর্গলবদ্ধ অমুক্ত উচ্চারণ পায় আর দ্বিতীয়ভাগ স্বতন্ত্রভাবে দীর্ঘতালাভ ক'রে—ফলে প্রথমটি দ্বিতীয়ের দ্বিগুণ হ'য়ে যায়। এ-ছাড়া সমস্থানজাত নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনি সঞ্জাত সংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আনুনাসিক ধ্বনিটি (ঝঙ্কার=ঝঙ্ | কার, ঝম্প=ঝম্ +পো প্রভৃতি) র উচ্চারণেও সংশ্লিষ্ট বাগিন্দ্রিয়গুলোর অনুরূপ অবস্থা হয় বলে এদের কালপরিমান ও দীর্ঘতর। তরঙ্গমাপনী অনুরেখে Kymograph tracing) ধরা পড়ে প্রথম ধ্বনিটির দীর্ঘতম কালপরিমাণ।

কিন্তু আন্তস্বরীয় (intervocalic) অসংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বল্পতম —শব্দের গোড়াতে তার তুলনায় দীর্ঘতর আর শব্দের শেষে আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘতম। উদাহরণ হলো 'থাকুক' শব্দটি—প্রথম ব্যঞ্জন ধ্বনি 'থ', আন্তঃস্বরীয় 'ক' এবং শব্দান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জন 'ক্' এর আনুপাতিক দৈর্ঘ্য বিশ্লেষণে এর যথার্থ্য প্রমাণিত হয়। হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আপাত অযুক্ত বলে উচ্চারকেরা তদবস্থায় কিছুক্ষণের জন্যে আটকে থাকে এবং তাই এর আনুপাতিক দৈর্ঘ্য অধিকতর। তবে শব্দমধ্যবর্তী অভিনিধান প্রাপ্ত অমুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় শব্দান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দীর্ঘতর, যেমন 'উপ্টান', 'সাত্পাঁচ' প্রভৃতি। এ শব্দগুলোর অভিনিধান প্রাপ্ত 'প্' 'ত্' ধ্বনিগুলোর তুলনায় প্রান্তবর্তী হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি 'ন্' 'চ্' আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘতর। আবার নিঃশ্বাসের এক প্রয়াসজাত এক প্রাণ—শ্রেণীর সংযুক্ত ব্যঞ্জনগুলো শব্দের শুরুতে এ—পর্যায়ের অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় দীর্ঘতর ; কিন্তু শব্দের মাঝখানে এ আরও সুপরিস্ফুট। অর্থাৎ শব্দমধ্যে সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রথমটির দৈর্ঘ্য আরো শ্রুতিব্যঞ্জক (prominent)। বাঙলা ছন্দের বৈচিত্র্য তাই নির্ভর করে হলন্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বস্বরের মাপের উপর। সংযুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনির পূর্বস্বর হওয়ার জন্যেই হোক, বা অসংযুক্ত হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বরই হোক, কিংবা দ্বৈত (diphthong) স্বরের শেষ স্বর ধ্বনিটির ব্যঞ্জনান্তিক (consonantal) ব্যবহারের জন্যেই হোক, সর্বত্র একই নীতি ক্রিয়া করে। এখানে পূর্বস্বরে থাকে টেনে-পড়ার অবকাশ। তাই স্বনবৃত্তছন্দে হলন্ত ব্যঞ্জনজাত বদ্ধাক্ষের (closed syllable) কে মুক্তাক্ষরের (open syllable) তুলনায় বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে পড়া হয় বলেই বদ্ধাক্ষরের স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যকে দু'মাত্রা ধরা হয় আর মুক্তাক্ষরের স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যকে একমাত্রা। [৭৬]

প্রত্যঙ্গের বায়ু-গতীয় দিক থেকে বাগ্‌-ধ্বনি উৎপত্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকে দু'টি ভিত্তিক কার্যকর উপাদান—এক, উদ্বোধন; দুই, উচ্চারণ। প্রথমটি হলো প্রত্যঙ্গের হাপর বা পিস্টন সদৃশ্য বিচলন যাতে কণ্ঠাঞ্চলীয় আয়তনের পরিবর্তন ঘটে; ফলে, সেখানকার বায়ুর সংনমন বা প্রসারণ ঘটিয়ে শুরু করে দেয় এ প্রকৃত বা স্থৈতিক (potential) বায়ুপ্রবাহ। আর দ্বিতীয়টি হলো প্রত্যঙ্গ বা উচ্চারকের বিচলন যা বায়ুপ্রবাহকে এমনভাবে বাধা দেয়, বা পরিবর্তিত করে যে একটি নির্দ্দিষ্টধ্বনির উদ্ভব সম্ভব হয়। উদ্বোধনের সঙ্গে তাই জড়িত ফুসফুস অর্থাৎ উরস্পন্দ (chest pulse) ও পীড়নস্পন্দ (stress pulse); আর উচ্চারণের সঙ্গে জিভ, ওষ্ঠ ও মুখ প্রভৃতি। তৃতীয় আরেকটি উপাদান হলো স্বনন, যার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে স্বরতন্ত্রী। অর্থাৎ স্বরতন্ত্রীর বিচলনই এখানে মুখ্য। উদ্বোধনের পরিবর্তেনে আসে পীড়ন (stress)। উচ্চারণের পরিবর্তিত রূপ হলো স্বনের স্থিতিকাল; আর স্বননের পরিবর্তন হলো সুর বা তান (tone)। এ তিনের ভিত্তিতে বাঙলা ছন্দ ত্রিধারূপ ধরেচে—বল-বৃত্ত; স্বন-বৃত্ত; তানবৃত্ত। এরা মাত্রায় প্রকাশিতব্য। স্বনবৃত্তের কথা আগেই বলা হয়েচে ঃ যুক্তবর্ণ মাত্রেই দ্বিমাত্রিক; তবে সংস্কৃতের মতো স্বরের হ্রস্ব—দীর্ঘতা নেই। উচ্চারণ এখানে মধ্য। এই অক্ষর দু'ভাবে পরিবর্তিত হ'তে পারে, যথাক্রমে পীড়নে ও তানে। প্রথমে আছে খাড়া দণ্ডাঘাত ঃ এতে পড়ে উদ্বোধক ঘা, ফলে এখানেও স্থিতিকাল বেড়ে যায় অক্ষরের। একে গ্রীকরা বলতেন ছন্দাঘাত। বলবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দ এরি উদাহরণ। অক্ষরের দ্বিতীয় পরিবর্তন ঘটে স্বননে অর্থাৎ কিনা তান সৃষ্টিতে। এখানে সুর এসে পড়ে পরিবর্তন ঘটায় সংযুক্ত বর্ণের পূর্ববর্তী অক্ষরে। আগেই বলা হয়েচে সংযুক্ত বর্ণ দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়, আর পূর্ববতী অক্ষর পরবর্তীর তুলনায় দীর্ঘতর হয়। কিন্তু স্বননে এর ব্যত্যয় হয়। অর্থাৎ পূর্বাক্ষরের ব্যঞ্জন লুপ্তপ্রায় হয়ে যায়। এবং এ-বৈশিষ্ট্যকে রবীন্দ্রনাথ অভিহিত করেচেন "শোষণশক্তি" বা "ভারবহন শক্তি" বলে।[৭৭] এখানে স্মর্তব্য তিনপ্রকারের স্বর বা বাচ্যভারের (voice weight) কথা, যার সম্পর্কে অরবিন্দ বলেচেন। প্রথমটি অনুভূমিক ভারদণ্ড, যার প্রকাশ দেখা যায় সংস্কৃত স্বরের হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুততত্ত্বে। বাঙলা ছন্দে এর স্বাভাবিক প্রয়োগ নেই। দ্বিতীয়টি হলো খাড়া সংঘাতভার (vertical ictus weight)—এহলো পীড়নের ফল। আর তৃতীয়টি ব্যঞ্জনভার (consonantal weight) যায় প্রয়োগ আছে স্বনবৃত্ত ছন্দে[৬২]।

এ-সম্পর্কে এক প্রধান ছান্দসিক বলেচেন ঃ "ধ্বনি এমন একটা জিনিস যার ভার ওজন, বা গুরুত্ব থাকতে পারে না। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ভার (weight)

না বলে বলা উচিত ভর (mass)" ।[৭৮] এ উক্তি অবৈজ্ঞানিক। বিজ্ঞানীর গবেষণায় দেখা গেচে যে প্রতিটি অক্ষরই উদ্বোধক শক্তি স্পন্দের প্রকাশ। আর উদ্বোধক যে বায়ুকে টানচে তার বিরুদ্ধে সর্বদাই বল প্রয়োগ করে চলেচে। তাই উদ্বোধক—চালিত বায়ুদেহকে আমরা সাধারণত আয়তনে প্রকাশ করি অর্থাৎ ঘন সেণ্টিমিটারে। এ-প্রক্রিয়াকে অন্যভাবেও দেখা যায়। উদ্বোধক দ্বারা স্থানচ্যুত একঘন সেণ্টিমিটার বায়ুর আয়তনকে মনে করা যেতে পারে এক বর্গ সেণ্টিমিটার ক্ষেত্র যাকে ঠেলে দেয়া হয়েচে এক সেণ্টিমিটার রৈখিক দূরত্বে। ধ্বনিক চাপকে জলের সেণ্টিমিটারে মাপা হয় (Cm H_2O); আর প্রত্যেক (Cm H_2O) প্রতিবর্গ সেণ্টিমিটারের 980·4 dynes এর চাপের সমতুল (dynes / Cm^2)। তাই একটি স্পৃষ্টব্যঞ্জনের সংবারকালে চাপের মাত্রা হলো 5 Cm $H_2O = 5 \times 980{\cdot}4$ dynes বল অর্থাৎ 4902 dynes / Cm^2 ।[৭৯] বলা বাহুল্য, এখানের শুধু mass বলায় অজ্ঞতাই প্রকাশ পায়। দ্বিতীয়ত, বলা হয়েচে যে "গুরুত্ব থাকতে পারে না" মনে রাখতে হবে যে প্রাচীন সংস্কৃত বৈয়াকরণগণ স্বরের পার্থক্য বুঝাতে ব্যবহার কর্তেন হ্রস্ব-দীর্ঘ আর অক্ষরের তারতম্যের জন্যে লঘু-গুরু।[৭৯] তাইতো রাজশেখর বসু বলেচেন: "সাধারণত গুরুধ্বনি আর accent মিশে যায়। ছড়াজাতীয় ছন্দের একটি লক্ষণ-মাত্রা পূরণের জন্য স্থানে-স্থানে যুক্তধ্বনিকে টেনে গুরু করা"।[৩০] বস্তুত 'হ্রস্ব' ও 'দীর্ঘ'—এ কাল পরিমাণ নির্দেশ করে; আর 'লঘু' ও 'গুরু'-তে উচ্চারণের আয়াস বা অক্ষরের ভার। কিন্তু এক প্রবীন ছান্দসিক দু'টিকেই অক্ষরের সঙ্গে যুক্ত করে ভুল করেচেন।[৮০] এখানে স্মর্তব্য যে প্রথম দু'টি শব্দ স্বর-সম্পর্কেই প্রযুক্ত, আর দ্বিতীয় যুগলটি অক্ষর সম্পর্কে। বলাবাহুল্য এ-সম্বন্ধে প্রাচীন প্রাতিশাখ্যকারগণ অবহিত ছিলেন। 'অ'-কে হ্রস্ব ধরে, তাঁরা এগিয়েচেন। তাইতো বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যে (১। ৫৫) বলা হয়েচে: "অমাত্র স্বরো হ্রস্বঃ" অর্থাৎ 'অ'-এর পরিমাণ স্বরই হ্রস্ব। এরি দ্বিগুণ হ'লো দীর্ঘ (১। ৫৭)। তবে 'অ' সংবৃত', আর 'আ' বিবৃত। আবার স্বরই অক্ষর: অথর্ববেদ প্রাতিশাখ্য (১। ৯৩)। এই স্বর সব্যঞ্জন, বা অনুস্বার যুক্ত অথবা শুদ্ধ এই তিন রকমের হতে পারে—এ প্রকাশিত হয়েচে ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যে (১৮। ৩২)। অক্ষর (Syllable) তাই দু'প্রকারের—শুদ্ধ ও মিশ্র। আর গুরু অক্ষরই দীর্ঘ অর্থাৎ দু'মাত্রার সমান: 'গুরু দীর্ঘম্' (ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য ১৮। ৪১)। এতে বোঝা যায় যে গুরুত্ব অর্থাৎ অক্ষরের ভার বা উচ্চারণের আয়াসের জন্যে কাল পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে যায়। এরি আভাস দেন রাজশেখর বসু যখন তিনি বলেন যে "গুরুধ্বনি আর accent মিশে যায়।" অর্থাৎ কিনা এরা প্রত্যেক দু'মাত্রার।

লঘু-গুরু ভার—নিষ্ঠ কিন্তু হ্রস্ব-দীর্ঘ মাত্রানিষ্ঠ। ব্যবহারিক দিক থেকে এই পৃথকীকরণকে স্বাগত জানিয়েচেন Whitney, যদিও তাত্ত্বিক দিক থেকে একে সমর্থন করেন নি। আর বিস্ময় প্রকাশ করেচেন এ-জন্যে যে "হিন্দুদের মতো এমন সূক্ষ্মধ্বনি নিরীক্ষকেরা আক্ষরিক মাত্রাকে আরো সুসমঞ্জস রূপায়নতত্ত্বে কার্যকর কর্তে প্রয়াসী হননি।"[৮১] Allen বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যের (IV. ১০৯) উক্তিকে বিপজ্জনক সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেচেন ঃ "সংযোগ পূর্বগতাঃ স্বরা ঃ দ্বিমাত্রা ঃ" "অর্থাৎ ব্যঞ্জনগোষ্ঠীপূর্ব হ্রস্বস্বর দু'মাত্রার। তাঁর যুক্তির পরম্পরার সোপান এরূপ ঃ

(ক) ব্যঞ্জনগোষ্ঠীপূর্ব হ্রস্ব স্বর · গুরু অক্ষর ;
(খ) দীর্ঘ স্বর = গুরু অক্ষর ;
(গ) ব্যঞ্জনগোষ্ঠী পূর্ব হ্রস্ব স্বর = দীর্ঘস্বর ;
(ঘ) দীর্ঘস্বর = ২ মাত্রা ;
(ঙ) ব্যঞ্জনগোষ্ঠীপূর্ব হ্রস্ব স্বর = ২ মাত্রা।

কাজেই Allen-এর মতে এই-যুক্তির ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিণাম গুরুতর ; কিন্তু বৃহত্তর বিপদ হলো পরবর্তী ধাপ নেওয়ার প্রবণতা যথা—∴ (ক) ও (ঙ) অনুসারে গুরুঅক্ষর = ২ মাত্রা। দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করেন যে ধ্বনি বিজ্ঞানীর মাত্রা ও ছান্দসিকের মাত্রার মধ্যে বিভেদ আছে। তাই দু'টিকে মিশিয়ে ফেলায় ত্রুটি এসেচে।[৮২] এবার এ-উক্তির বিচার—বিবেচনা। এখানে লক্ষণীয় যে যুক্তিপরম্পরা ঠিকই আছে এবং এ সঞ্চালী (transitive) সূত্রানুসারে সিদ্ধ।[৮৩] যেমন, ক = খ = গ অর্থাৎ ব্যঞ্জনগোষ্ঠীপূর্ব হ্রস্বস্বর = দীর্ঘস্বর। আবার গ = ঘ = ঙ অর্থাৎ ব্যঞ্জনগোষ্ঠীর পূর্ব হ্রস্বস্বর = ২ মাত্রা। তবে দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি আংশিকভাবে সত্য। ধ্বনিবিজ্ঞানী ঠিক-ঠিক বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে চলেন ; আর ছান্দসিকের এতটা বিজ্ঞান নিষ্ঠার প্রয়োজন নেই। এখানে প্রচলিত ঐতিহ্যের ও ভূমিকা রয়েচে। তাই "বৃত্তমুক্তাবলি তরল"—এ উক্ত হয়েচে ঃ "প্রচলিত ঐতিহ্য অনুসারে দীর্ঘক্ষারের মাত্রা দুই ধরা হয়, যা তিন-মাত্রাযুক্ত 'প্লুত'-এ ও আরোপিত হয়। একইভাবে ব্যঞ্জনের মাত্রা অর্দ্ধেক হলেও ব্যঞ্জননান্ত অক্ষরকে মাপা হয় দু'মাত্রায়। ব্যঞ্জন যে অক্ষরের মাত্রা বৃদ্ধি করে না তাও প্রথাসিদ্ধ।"[৮৪] এহলো ব্যবহারিক প্রথা। তাই ঋগ্বেদ প্রতিশাখ্যে (১৮। ৪১—২) বলা হয়েচে ঃ "গুরু দীর্ঘম্ ; গরীয়স্তু যদি সব্যঞ্জনংভবেৎ" অর্থাৎ দীর্ঘস্বর দীর্ঘাক্ষর। কিন্তু অক্ষর ব্যঞ্জনান্ত হলে দীর্ঘতর হবে। একে Verma সঠিক সিন্ধান্ত বলে মনে করেন, কেননা স্বরই দীর্ঘায়িত অক্ষরের জনক নয়, কিন্তু স্বর + ব্যঞ্জনের গোষ্ঠী-ই এর জন্যে দায়ী। এখানে ধ্বনিগত

স্থিতিকালই হয়েচে আক্ষরিক মাত্রার চরমভিত্তি। আর এ স্থিতিকাল প্রলম্বিত হয় গুরু অক্ষরে।[৮৫]

IV : বল, স্বর ও স্বন

মস্তিষ্কের বহিঃস্তরে স্নায়বিক ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে শুরু হয় মানুষের কণ্ঠাগুলে বাগধ্বনির উৎপত্তি। এতে তড়িৎ-রাসায়ণিক ঘাতগুচ্ছ প্রবাহিত হতে থাকে নিম্নতর মস্তিষ্কের স্নায়ুপথে কণ্ঠনিয়ামক পেশীপুঞ্জে। এই জটিলতা দেশ-কাল-শায়ী। পেশী প্রত্যঙ্গীয় ক্রিয়াকলাপের তিনটি কাজ—এক—কণ্ঠাগুলে বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি ; দুই—বায়ুপ্রবাহের স্থৈতিক বা গতীয় কিছু শক্তিকে ধ্বনি-তরঙ্গাকারে শব্দশক্তিতে রূপান্তরণ ; তিন—কণ্ঠনালী, ওষ্ঠ ও নাসিকার মধ্যবর্তী বিভিন্ন গুহিকার ভৌত পরিবর্তন ঘটাতে অনুনাদী সঞ্চারের উপর নিয়ন্ত্রণ অর্থাৎ এইসব ধ্বনিতরঙ্গের বহির্বায়ুতে প্রেরণের পরিস্রুতি (filtering)। এর জন্যে আছে তিনটি যন্ত্রকৌশল—ফুসফুসীয় ; গলনালীয় ; মুখ-গহ্বরীয়। এরা সবাই কিন্তু বায়ুপ্রবাহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। প্রথমে আছে ফুসফুসের শ্বসন প্রক্রিয়া—সংকোচন ও প্রসারণে ঘটে বহির্গামী ও অন্তর্গামী বায়ুপ্রবাহ। দ্বিতীয়ে আছে কণ্ঠে স্বরযন্ত্রের উচু ও নিচু বিচলন। শ্বাসরন্ধ্র বন্ধ হলে স্বরযন্ত্রের ঊর্ধ্বতন বিচলনে গলনালীর আয়তন কমে যায় এবং বায়ুপ্রবাহকে মুখ ও নাকের মধ্য দিয়ে বের করে দেয়। অপরপক্ষে নিম্নতন বিচলনে গলনালীর আয়তন বেড়ে যায় এবং বায়ুপ্রবাহকে প্রবেশ কর্তে দেয় ভিতরে। আর জিভ ও বায়ু-প্রবাহের উদ্বোধন কর্তে পারে। তালুতে উত্তোলিত বাধা সৃষ্টিকারী জিভকে যদি মুখের দিকে ঠেলে দেয়া হয় বাধা রেখে তবে বহির্গামী বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হবে। আবার যদি ঐ জিভকে পিছন দিকে ঠেলে দেয়া হয়, তবে প্রবেশক বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি হবে।[৮৬] এই তিনটি যন্ত্রকৌশলে পাওয়া যায় তিনটি ঘটনা—উদ্বোধন, স্বনন, ও উচ্চারণ। এদেরই পরিবর্তিত রূপ হলো পীড়ন, স্বর ও স্বন। এরাই তিনটি বাক্রীতির জনক। মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক অক্ষরের আছে একটি স্থিতি পরিমান (duration quantum) ঃ তাই অন্ত্যব্যঞ্জন হ্রস্ব হলে, স্বরটি হবে দীর্ঘ এবং তদ্বিপরীতভাবে। ভারতীয় ধ্বনিবিজ্ঞানীরা এ-সব প্রক্রিয়াকে দু'ভাগে ভাগ করেচেন—আন্তঃ প্রযত্ন (intra-buccal process) ও বাহ্য প্রযত্ন (extra-buccal process)। প্রথমটির মধ্যে পড়ে—(ক) সংবার, যা স্পর্শধ্বনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; (খ) মুক্তি, যা সুরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; এবং (গ) উষ্মধ্বনির ও অর্ধস্বরের সংকীর্ণণ। দ্বিতীয়টিতে আছে—(ক) গলনালিক প্রক্রিয়া, যা ঘোষ ও অঘোষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ; (খ) ফুসফুসীয় প্রক্রিয়া, যা মহাপ্রাণ ও মহাপ্রাণহীনতার সঙ্গে যুক্ত ; ও (গ) নাসিক্য প্রক্রিয়া, যার সঙ্গে

সংশ্লিষ্ট আছে নাসিক্যতা ও অনাসিক্যতা।[৮৭] উপরোক্ত তিনটির মধ্যে 'পীড়ন' পড়ে দ্বিতীয়ের খ-এর মধ্যে ; 'স্বর' দ্বিতীয়ের ক-এর মধ্যে ; আর স্থিতি প্রথমের অন্তর্ভুক্ত। বাংলা ছন্দ তৈরি হয়েছে এ তিনের ভিত্তিতে। যেহেতু স্থিতি স্বনেরই, তাই স্থিতির পরিবর্তে স্বন-ই প্রযোজ্য। আবার পীড়ন হলো বিচারক 'বল' ; তাই পীড়নের পরিবর্তে বল বলাই শ্রেয়। ফলে বাংলা ছন্দ গড়ে ওঠে তিনটি বিশেষ উপাদানে—বল, স্বর ও স্বন-এ। ছন্দেরও তাই ত্রিধারীতি—বলবৃত্ত ; স্বরবৃত্ত ও স্বনবৃত্ত।

অক্ষর দু'রকমের—মুক্ত ও বন্ধ স্বনবৃত্তে প্রত্যেক মুক্তাক্ষরই একমাত্রিক ও বদ্ধাক্ষর দ্বিমাত্রিক। স্থিতিমাত্রা প্রসঙ্গে এর আলোচনা হয়েছে উপরের III-অংশে। বদ্ধাক্ষর সর্বদাই দু'মাত্রার মর্যাদা পায় এখানে, তা সে শব্দান্তই হোক, বা শব্দান্তরবর্তীই হোক। এর কারণ স্বন (phone)—এর মোট স্থিতিমাত্রারই হিসাব রাখতে হয় এখানে। কিন্তু এই হিসাব শব্দান্তঃবর্তী অবস্থানে তানের টানে ভেসে যায় বাক্-প্রবাহে। ফলে বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যের (1·৫৯) "ব্যঞ্জনম্ অর্ধমাত্রা" আর ঠিক থাকে না শব্দমধ্যে—এ লোপ পায়, নামে মাত্র উচ্চারিত হয়। তাই এই ব্যঞ্জনকে আরো ক্ষুদ্রভাগে ভাগ করা হয়েছে—অণু ও পরমাণুতে ঃ "তদর্ধ-মনু ঃ পরমান্বর্ধানু মাত্রা" (1·৬০-৬১)। অর্থাৎ ব্যঞ্জন = $\frac{১}{২}$ মাত্রা ; অণু = $\frac{১}{৪}$ মাত্রা ; এবং পরমাণু = $\frac{১}{৮}$ মাত্রা। এ-সম্বন্ধে কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তি স্বরণীয় ঃ "ব্যাকরণ শাস্ত্রের নিয়মানুসারে হ্রস্বস্বরে লঘু ও দীর্ঘ স্বরে গুরু উচ্চারণ হয়, সঙ্গীতে গানের বর্ণসকল, প্রায়ই সে নিয়মের অধীন হয় না। সঙ্গীতছন্দের অনুরোধে হ্রস্বস্বর ও গুরুরূপে, দীর্ঘস্বর ও লঘুরূপে উচ্চারিত হইতে পারে। ব্যাকরণে ব্যঞ্জন বর্ণকে অর্ধমাত্রিক বলে বটে ; কিন্তু কি কাব্যের কি সঙ্গীতের কোন ছন্দই ব্যঞ্জন অর্থাৎ হসন্তবর্ণ মাত্রা ও বর্ণ সংখ্যার মধ্যে পরিগণিত হয় না। ছন্দে হসন্ত বর্ণের কোন পৃথক মাত্রা নাই ; উচ্চারণ সময়ে উহাতে কেবল জিহ্বা বা ওষ্ঠ সংলগ্ন হয় মাত্র। কাব্য ছন্দে উহা পূর্বস্থিত হ্রস্ব স্বরের গুরুতা সম্পাদন করে ; ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে ব্যঞ্জন বর্ণের জন্য যদি কোন মাত্রা ধরিতে হয়, তাহা পূর্ণ, অর্ধ নহে"।[৮৮] স্বরবৃত্তে শব্দমধ্য ব্যঞ্জনের লুপ্তপ্রায় উচ্চারণ হয় ; আর স্বনবৃত্তে পূর্ণ উচ্চারণ হয়। তবে উভয় ছন্দেই শব্দান্ত ব্যঞ্জন একমাত্রিক।

চাপজ পীড়ন (stress)-এর প্রত্যঙ্গীয়-বায়ুগতীয় ধ্বনিক সহচর হলো উদ্বোধকশক্তি। কিন্তু চাপের ধারণা বিঘ্নিত হয়েছে উদ্বোধকশক্তি ও স্বরভঙ্গি (কম্পাংক) ঘটনা দু'টির একত্রীকরণে। দেখা গেছে যে পীড়িত অক্ষরের উচ্চারণে উদ্বোধকশক্তি অপীড়িত অক্ষরের তুলনায় অধিকতর, এবং এঘটে উপশ্বাসরন্ধ্রীয় চাপ বা উদ্বোধক বেগ ব্যতিরেকেই। ধরা যাক 'হ' ও 'স' কে—

এদের আয়তন-বেগ যথাক্রমে 1200 ও 220 Cm^3/s ; আর চাপ যথাক্রমে 4 এবং 2·3 Cm H_2O। যদি বেগই পীড়নের প্রধান শারীরবৃত্তীয় অনুষঙ্গী হতো তাহলে হ্যাট-এর 'হ' স্যাট-এর 'স'-এর তুলনায় অধিকতর পীড়িত হতো ; কিন্তু বাস্তব পক্ষে তা হয় না। আবার চাপ প্রধান শারীরবৃত্তীয় অনুষঙ্গী হলে, 'স' 'হ'-এর তুলনায় প্রবলতর হতো ; কিন্তু তা হয় না। ফলে আমাদের অনুভূতি প্রকাশ পায় উদ্বোধকশক্তি মারফতে ঃ s ও h এর বেলায় এ যথাক্রমে .050 ও .048 watts। কাজেই উভয় ক্ষেত্রে বল প্রায় সমান। তাই উদ্বোধকশক্তি হলো উদ্বোধক বেগও চাপের গুণফল। দ্বিতীয়ত, এই উদ্বোধক শক্তির মাত্রা (quantum) আছে। অর্থাৎ উদ্বোধকশক্তির কমিবেশি স্পন্দমান বিস্ফোরণ ঘটে এবং এ একটি একক শীর্ষমানে পৌছায় ও উদ্বোধক ক্রিয়াকলাপ বাক্-এ প্রকাশ পায়। একেই বলে "চাপ-মেল" (stress group) যেমন ইংরেজীতে। কিন্তু অন্যান্য ভাষায় এ হ'য়ে ওঠে অক্ষরের সামিল, বিশেষত অক্ষর-কালিক স্পন্দ, যেমন ফরাসী বা বাঙলায়। যেহেতু 'বল'ই এর প্রকৃত স্বরূপ, তাই একে বলা হয় 'বলবৃত্ত', যেমন ছড়ার ছন্দ। 'পীড়ন-'কে 'বলে' রূপান্তর করা যায়, যেহেতু পীড়ন $= \frac{\text{বল}}{\text{ক্ষেত্র}}$ অর্থাৎ বল $=$ পীড়ন $\times$ ক্ষেত্র $=$ চাপ $\times$ ক্ষেত্র। এতে পীড়ন $=$ চাপ। তাই পীড়ন ও চাপ তুল্যমূল্য।

সবভাষায়ই বাক্-এর প্রধান বাহকতরঙ্গ হলো ফুস্‌ফুস্-প্রণোদিত বহির্গামী বায়ু প্রবাহ। একাধিক ভাষায় অবশ্য এ নির্গত হয় কমিবেশি স্পন্দমান বিস্ফোরণে বা মাত্রায়। ইংরেজিতে এ দেখা যায় চাপ স্পন্দ শ্রেণীতে—এদের প্রত্যেকটি তৈরি হয় উদ্বোধক শক্তির খাড়া একক আরোহের পরে মন্থরতর অবরোহে ; তারপরে দ্বিতীয় স্পন্দের গোড়ায় আবার নতুন খাড়া আরোহ ইত্যাদি। সমগতির ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে আছে উদ্বোধকশক্তির প্রতিটি স্পন্দের একই স্থিতিকাল ও একই শক্তি উৎপাদ (output)। এ-সব স্পন্দই 'মেল' নামে অভিহিত। এই মেল সমকালীন অর্থাৎ কমিবেশি সমান স্থিতিশীল অথবা প্রচাপিত অক্ষর (উদ্বোধক শক্তিবক্রের শীর্ষ) এর মধ্যবর্তী অন্তরাল মোটামুটি সমান, যদিও পুরোপুরি নয়। এর কারণ দ্রুতি বা গতির পরিবৃত্তি। তবে এ-কথা স্বীকার্য যে মেলক কাল (foot duration) সম্পূর্ণভাবে অক্ষর সংখ্যার উপর নির্ভরশীল নয়। তা যদি হোত, তবে এক, দুই, তিন অক্ষরের গড়স্থিতির অনুপাত দাঁড়াত 5 ঃ 10 ঃ 15, কিন্তু যন্ত্রে দেখায় 5 ঃ 6 ঃ 7। কাজেই সমকালীনতার পরিবর্তে সমগতীয়তা এখানে এসে যায় অর্থাৎ প্রতিটি মেলকে আছে প্রায় একই উদ্বোধক শক্তি উৎপাদ। কোন কোন ভাষায় এই উদ্বোধক শক্তি মাত্রা আরেকটি একক অর্থাৎ অক্ষরের সঙ্গে

মিলে যায়, যেমন ফরাসী ভাষায়। কাজেই উদ্বোধক শক্তি বণ্টনের আছে দু'টি প্রবণতা—প্রচাপ-কালিক স্পন্দ ও অক্ষর-কালিক স্পন্দ। একটি ইংরেজিতে; অন্যটি ফরাসীতে।[৮৯]

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলার বলবৃত্তের মেলক স্থিতিকাল শুধুমাত্র অক্ষরে বিবেচ্য নয়। এখানে রয়েচে উদ্বোধক শক্তির ক্রিয়া। আর উদ্বোধক শক্তি = Vv × p × ·0001 watts। তাই বলস্পন্দ বা চাপ স্পন্দই এখানে বড়কথা। অক্ষরগুলি এরি অধীন। Christabel এর ভূমিকায় Coleridge ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে যা বলেছিলেন এখানে তা স্মর্তব্য: "Christabel এর স্পন্দমিতি (metre) একটি নতুন সূত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত, যথা, প্রত্যেক পংক্তিতে গণণীয় প্রস্বন (accent), কিন্তু অক্ষর (syllables) নয়। প্রতিটি পংক্তিতে প্রস্বন আছে চারটি।" এরি উদাহরণ হিসেবে নেয়া যাক,[৯০]

'Tis the middle of night by the castle clock

… … … … … … … …

My sire is of a noble line.

প্রথম পংক্তিতে ৪টি প্রচাপিত অক্ষর আছে, আর দ্বিতীয়টিতে ৩ টি: '।'—চিহ্নে দেখান হয়েচে। সমতা-রক্ষার জন্যে প্রয়োজন মৌন প্রচাপ যা বর্তমান sire ও is এর মধ্যে। দাড়ি দিয়ে পর্ববিভাজিত হলে, পংক্তি দু'টি দেখাবে এ-রূপ: মৌন প্রচাপ বুঝাতে ব্যবহৃত হবে—

'This the | middle of | night by the | castle | clock,

… … … … … … … … …

My | sire ∧ is of a | noble | line.

কাজেই Coleridge-এর নতুন নীতি হলো: প্রতিটি পংক্তিতে আছে ৪টি "প্রচাপ স্পন্দ" বা "বল স্পন্দ", কিন্তু "প্রচাপিত অক্ষর" নয়।[৯১] এখানকার পর্ববিভাজনকে মেল বলাই সঙ্গত, যেহেতু এতে হিসাব রাখতে হয় প্রচাপের। এই মেল একেকটি প্রচাপ স্পন্দের সামিল। এরি মধ্যে অক্ষরের সংখ্যা, দৈর্ঘ্য বা মাত্রা পরিবর্তনশীল। তাই

গর্ গর্ গর। গর্জ্জে দেয়া। ঝর্ ঝর্ ঝর। বৃষ্টি ∧

—এতে আছে চারটি প্রচাপ স্পন্দ। কিন্তু প্রথম মেলে অক্ষর সংখ্যা ৩, দ্বিতীয়ে ৪, তৃতীয়ে ৩ এবং চতুর্থে ২ ও লুপ্ত ২ যা দেখান হয়েচে (∧)—

চিহ্নে। এবার অক্ষর থেকে সমতা খুঁজতে হবে মাত্রায়। প্রতিটি মেলে আছে ৬টি মাত্রা। কিন্তু শেষেরটিতে শুধু ৩টি ; তাই অন্তমেলে ৩ মাত্রা লুপ্ত আছে। মাত্রা কেন প্রসারিত হলো প্রত্যেক মেল-এ, তার কারণ নিহিত আছে প্রাচীন স্বর্ণবিদ্দের "অভিনিধানে" অর্থাৎ নিবিড় স্পর্শে, যার সগোত্রীয় হলো ফরাসী "আস্ফোরণ" (implosion)। তাই অর্থববেদ প্রাতিশাখ্যে (I. ৪৩) আছে ঃ "ব্যঞ্জনবিধারণমভিনিধান ঃ পীড়িত ঃ সন্নতরো হীনশ্বাসনাদ ঃ।" ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যের (VI. ৩৯ – ৪১) উক্তি হলো ঃ "নাদ ঃ পরোহভিনিধানাদ্ ধ্রুবং তৎতৎকালস্থানম্ ঃ অশ্রুতি ত্ব অঘোষাৎ ঃ নাসিকা স্থানম্ অনুনাসিকা চেৎ"। অর্থাৎ শব্দমধ্যে পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মধ্যে প্রথমটি স্পর্শধ্বনি হলে তাঁর উচ্চারণ সংস্কৃতের হলন্ত ব্যঞ্জনের মতো ; তার আনুষাঙ্গিক স্বরধ্বনি এ ক্ষেত্রে উচ্চারিত হয় না। এতে স্পৃষ্টধ্বনির প্রথমটি তার উচ্চারণ স্থান রীতি অনুসারে মুখবিবরের নির্দ্দিষ্টস্থানে কিংবা ঠোঁটে ইংরেজি act (aekt), begged (begd), apt (aept) শব্দের k, g ও p ধ্বনির মতো গঠিত হয়, কিন্তু মুক্ত হয় না। ফলে তাদের উচ্চারকেরা (articulators) ধ্বনিটিতে তার স্বস্থানে গঠন করে, সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে, কিন্তু তাকে পূর্ণরূপ দেবার জন্যে দ্রুত মুক্ত না হয়ে উক্ত অবস্থায় থাকতে-থাকতে তার পরবর্তী ধ্বনির স্থান গ্রহণ করে এবং সেটিকে পূর্ণভাবে রূপায়িত কর্বার জন্যে তারা দ্রুত মুক্ত হয়ে যায়। প্রথম স্পর্শধ্বনিটি এ পরিবেশে পরিমানের (quantity) দিক থেকে কিছুটা দীর্ঘাকৃত হয়, যেমন চাক্চিক্য, ঘাগ্রা। স্পৃষ্টধ্বনি না হ'য়ে অন্য ধ্বনি অর্থাৎ ঘর্ষণজাত (fricative), তরল ধ্বনি (liquid) ঃ পার্শ্বিক 'ল' কিংবা প্রকম্পন-জাত'র', তাড়নজাত (flap) এবং নাসিক্য ধ্বনি হলেও এরা স্বরবিহীন অবস্থায় উচ্চারিত হয়, কিন্তু স্পৃষ্ট ধ্বনির মতো 'অভিনিধান জাত' অসম্পূর্ণ উচ্চারণ পায় না। এর কারণ, তাড়নজাত ধ্বনি ছাড়া এদের প্রত্যেকটিই প্রলম্বিত ধ্বনি (continuant) যথা, মুশ্কিল, বৃষ্টি।[১২] ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্যে একেই বলা হয়েচে "ধ্রুব," যার অনুরূপ শব্দ হলো ফরাসীর tenue[১৩]। Jones বলেন ঃ "পরিবর্তন ব্যতিরেকে যে-সব ধ্বনি দীর্ঘতর বা হ্রস্বতর কালে বিধৃত থাকে তাদের বলে প্রলম্বিত ধ্বনি। প্রধান প্রলম্বিত ধ্বনি হলো স্বর, নাসিক্য, পার্শ্বিক, প্রকম্পিত ও ঘৃষ্ট ব্যঞ্জন, উষ্মতাহীন প্রলম্বিত ধ্বনি এবং স্পৃষ্টব্যঞ্জনের স্পর্শধ্বনি"।[১৪] 'গর্' ও 'ঝর'-এর 'র্' এবং বৃষ্টি'-র 'ষ্' তাই প্রলম্বিত হয়েচে।

... বলবৃত্তের মূল প্রকৃতি ছান্দসিকরা ধর্তে পারেন নি। তাই তাঁরা ভুল ব্যাখ্যার আশ্রয় নিয়েচেন। এক প্রবীন ছান্দসিক[১৫] বলেন ঃ "শ্বাসাঘাত হলন্ত বা যৌগিক অক্ষরের (closed syllable) উপরই পড়ে ; স্বরান্ত অক্ষরের

(open syllable) উপর শ্বাসাঘাত পড়িলে সেই স্বরটি একটু টানিয়া যৌগিক অক্ষরের সমান করিয়া লইতে হইবে।" এতে বোঝায় যে শ্বাসাঘাতের অভিক্রিয়ায় স্বরান্ত অক্ষর যৌগিক অক্ষরে পরিণত হয়। কিন্তু এর অভিক্রিয়া যৌগিক অক্ষরের উপর কি হবে সে সম্বন্ধে ছান্দসিক নিশ্চুপ। তাঁর মতে 'ধিন্‌তা ধিনা। পাক্যা নোনা'র প্রথম পর্বটি ৪ মাত্রার এবং দ্বিতীয়টিও তাই, কেননা পাকা-র উপর শ্বাসাঘাতের জন্য পাকা হবে পাকা-ন অর্থাৎ ৩ মাত্রায়। এ সিদ্ধান্ত অবৈজ্ঞানিক এই অর্থে যে হলন্ত অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাতের কোন অভিক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নি। দ্বিতীয়ত, তিনি বলেনঃ "শ্বাসাঘাত থাকার দরুন যৌগিক অক্ষর হ্রস্ব বলিয়া পরিগণিত হয়। বাগ্‌যন্ত্রের অঙ্গগুলির প্রবল আন্দোলন এবং বোধহয় সঙ্কোচন হয়; তজ্জন্য উচ্চারণের ক্ষিপ্রতা এবং লঘুতা অবশ্যম্ভবী।" তাহলে 'ধিন্‌তা' হবে দু'মাত্রার এবং ফলে প্রথম পর্বটি দাঁড়াবে ৪ মাত্রায় আর দ্বিতীয়টি ৫ মাত্রায়। এখানের সমতা কোথায়? তবে তার অজ্ঞতার পরিচয় ঐ "বোধ হায়" কথায় প্রকাশ পেয়েচে। আরেকজন প্রবীন ছান্দসিকও বলেচেনঃ "(এই) রীতিতে রুদ্ধমুক্ত নির্বিশেষে প্রত্যেকটি দলকেই (syllable) এক মাত্রা হিসাবে গণনা করা হয়। রুদ্ধদল সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট রূপে উচ্চারিত হয়।"[১৬] এও অবৈজ্ঞানিক। কেননা, তাঁর মতে মিশ্রবৃত্তে অর্থাৎ তানবৃত্তে ও "কোনো কোনো রুদ্ধদল উচ্চারিত হয় সংশ্লিষ্ট রূপে"। তাহলে শ্বাসাঘাতের কোন অভিক্রিয়া থাকে না। এ মন্তব্য যুক্তি সহ নয়। তাছাড়া তিনি দল ছেড়ে মাত্রা বিচারে নামেন নি। তৃতীয় আরেক ছান্দসিক[১৭] বলেচেনঃ "কথ্য ভাষায় অক্ষরের কোন মাত্রাগুণ নাই। এখানে প্রত্যেক অক্ষর বা স্বরান্ত বর্ণই গণনীয় এবং সেই গণনায় চারিটি ধ্বনিস্থান পাওয়া যাইবে। তথাপি, তাহা চারমাত্রা নয়, কারণ এ অক্ষরগুলি আদ্য অক্ষরের ঝোঁক্‌কে ধারণ করিয়া থাকে মাত্র। যুক্তবর্ণ কার্যত পরস্পর অযুক্ত থাকে, হসন্তই থাকে; এবং ঐ মধ্যস্থ হসন্ত আদ্য অক্ষরের স্বরকে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত করে না, তাহারা ঝোঁক বা উচ্চারণ ক্রিয়ার জোরকে বর্দ্ধিত করে মাত্র"। ইনিও অক্ষর ছেড়ে মাত্রায় নামেন নি। দ্বিতীয়ত, তিনি সাধু ও কথ্য ভাষার পার্থক্য এভাবে নির্দেশ করেচেনঃ "ওখানে যাহা ব্যঞ্জনারূঢ় স্বর, এখানে তাহা স্বরারূঢ় ব্যঞ্জন"। তা যদি হয়, তবে কি করে বলা যায় যে "স্বরান্তবর্ণই গণনীয়"? তাই এ আলোচনা বিজ্ঞানভিত্তিক নয়। এ কথা তিনি নিজেই স্বীকার করেচেনঃ "ধ্বনিবিজ্ঞানে বা ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস বা বিজ্ঞান জানা না থাকিলেও, বাংলা ছন্দের একটা সম্পূর্ণ পরিচয় যে রচনা করা যাইতে পারে তাহারই প্রমাণ ইহাতে (তাঁর বইয়ে) মিলিবে।"

ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ছন্দোবিজ্ঞান

কাব্যস্পন্দের লাবনি উৎসারিয়ে ওঠে একটি দ্বন্দ্ব হ'তে—একদিকে ছান্দসিক মাত্রাবন্ধ যাতে আমরা আদর্শ মাত্রিক গড়নের অনুরূপ একটি নির্দিষ্ট নিয়মিত প্রস্বনস্পন্দ কমবেশি প্রত্যাশা করি, এবং অন্যদিকে একটি বাক্‌স্পন্দ যা একে বাতিল ক'রে সবরকম বৈচিত্র্য আনে। (অর্থাৎ) কাব্যস্পন্দ গণ্য হতে পারে নির্দিষ্ট সংজ্ঞা ও সীমার অধীনস্থ সাধারণ বাক্‌স্পন্দ হিসেবে; আর এদের নিয়মাবলী নিঃসন্দেহে হবে ছন্দোবিজ্ঞান। স্পন্দ প্রকাশের মাত্র তিনটি উপায় আছে। প্রথমত, কিছু অক্ষরকে পৃথকীকৃত কর্তে হবে তাদের আপেক্ষিক হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা অনুসারে। দ্বিতীয়ত, বাচ্যের প্রস্বর পরিবৃত্তির প্রয়োজন। তৃতীয়ত, বাচ্যশক্তির পরিবর্তন ঘটাতে হবে কিছু অক্ষরকে অধিকতর প্রাবল্যে উচ্চারণ করে এবং এতেই আছে স্পন্দের বিভিন্ন অবয়বের অবাধ সংমিশ্রন। (আর রয়েচে) বেশ কিছু উপযুক্ত স্থিতিকালীন যতি বা মৌন। তাই বাক্‌স্পন্দে ছন্দোবিজ্ঞানের সংযোজনাই কাব্যস্পন্দ বা পদ্যের নির্ধারক। তাহলে ছন্দোবিজ্ঞানের সঠিক স্বরূপ কি? অক্ষর ব্যবহারের নিয়মাবলী সম্পর্কে মতৈক্য প্রতিষ্ঠাই হলো ছন্দোবিজ্ঞানের প্রথম অনিবার্য কাজ। অক্ষর নির্দিষ্ট হওয়ার পরের কাজ হবে তাদের সাধারণতম সমবায়ের —যা ব্যবহারিক দিক থেকে শব্দ—এককের সামিল-সংজ্ঞা ও নাম ঠিক করা এবং এরা পর্ব নামে পরিচিত। এর পরে ছন্দোবিজ্ঞানের তৃতীয় ধাপ হবে ছন্দোবন্ধ নির্ধারণ অর্থাৎ কবিরা পদ্য ও স্তবক সৃষ্টিতে যে প্রধান প্রধান পর্ব পদ্ধতি উদ্ভাবন করেচেন তার নিবন্ধন।

—রবার্ট ব্রিজেস্[১]

৬·১ ছান্দসিক মতবাদ

সাহিত্যকলার প্রত্যেক কৃতিই আদৌ ধ্বনিমালা যা থেকে উদ্ভূত হয় অর্থ। কোন কোন সাহিত্যকৃতিতে এই ধ্বনিস্তরের গুরুত্ব কমান হয়, আর এ হয়ে ওঠে স্ফটিকস্বচ্ছ যেমন অধিকাংশ উপন্যাসে। কিন্তু সেখানেও ধ্বনিস্তর অর্থের আবশ্যিক পূর্বশর্ত। এদিক থেকে কাব্য ও কথাসাহিত্যের পার্থক্য সমর্থন করা যায় না। ধ্বনির প্রভাব বিশ্লেষণে দুটি সূত্র মনে রাখতে হবে। প্রথমত, ধ্বনিকল্প (pattern of sound) ও কৃতি (performance)-র মধ্যে পার্থক্য কর্তে হবে। সাহিত্যিক কলাকৃতির পঠন হলো কৃতি, যাতে আদর্শ রূপায়িত এবং অন্যথায় বিকৃত হতে পারে। তাই স্পন্দ ও ছন্দের প্রকৃত বিজ্ঞান শুধুমাত্র ব্যক্তিগত আবৃত্তির অধ্যয়নে রচিত হতে পারে না। দ্বিতীয়ত,

অর্থকে বাদ দিয়ে ধ্বনিবিশ্লেষণের সাধারণ অঙ্গীকার (assumption) ভ্রমাত্মক, কেননা এ কলাকৃতির অখণ্ডতার পরিপন্থী এবং কেবলমাত্র ধ্বনির কোন নান্দনিক (aesthetic) অভিক্রিয়া নেই। অর্থাৎ অর্থ বা আবেগপ্রবণ সুরের সাধারণ ধারণা ছাড়া 'গীতল' কোন পদ্য নেই। কাব্যে বিশুদ্ধ ধ্বনি হয় মায়া নতুবা সম্পর্কের এক অত্যন্ত সরল ও মৌল শ্রেণীবিন্যাস যা অধ্যয়ণ করেচেন Birkhoff তাঁর "নান্দনিক মান"-এ [২]। এতে নেই কবিতার সামগ্রিক চরিত্রের সমাকলে ধ্বনিস্তরের গুরুত্ব ও বৈচিত্র্যের ব্যাখ্যান।

এখানে তাই সমস্যার দুটি দিকের পৃথকীকরণের প্রয়োজন ঃ ধ্বনির স্বকীয় (inherent) ও সম্পর্কীয় (relational) উপাদান। প্রথমে প্রকাশ পায় ধ্বনির মাত্রা-নিরপেক্ষ বিশেষ স্বাতন্ত্র্য যেমন অ, ও, প, বা ল—এখানে অ বা প ধ্বনির কমবেশি নেই। যে-সব অভিক্রিয়া সাধারণত 'গীতলতা' বা 'শ্রুতিমাধুর্য' নামে অভিহিত হয় তাদের ভিত্তি হলো গুণের সহজাত পার্থক্য। পক্ষান্তরে, সম্পর্ক-জাত পার্থক্য হলো স্পন্দ ও ছন্দের ভিত্তি ঃ প্রস্বর, ধ্বনি স্থিতি (duration of sound), প্রচাপ, পুনর্বৃত্তি সংখ্যা। এ-সব উপাদানে সম্ভব হয় পরিমাণগত পার্থক্য। প্রস্বর হয় উচ্চতর বা নিম্নতর, স্থিতিকাল হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর, প্রচাপ প্রবলতর বা দুর্বলতর, পুনর্বৃত্তি সংখ্যা বৃহত্তর বা ক্ষুদ্রতর। এই প্রাথমিক পার্থক্যটি অত্যন্ত জরুরী, যেহেতু এ ভাষা প্রপঞ্চের একটি সমগ্র গোষ্ঠীকে পৃথক কর্তে সমর্থ— রুশরা এর নামকরণ করেচেন 'বাদিত্রণ' (instrumentooka)। বস্তুত রুশশব্দটি Ghil—ব্যবহৃত[৩] instrumentation-এর অনুবাদ। ইঁনি কবিতায় এর প্রয়োগপূর্বিতা (priority) দাবি করেন। পদ্যে 'গীতলতা' বা 'সুতান' শব্দের ব্যবহার বর্জনীয়, কেননা এ বিভ্রান্তিকর। যে-সব ঘটনার কথা বলা হচ্চে তারা গানের সুতানের সমান্তরাল নয় ঃ সঙ্গীতের সুতান অবশ্য প্রস্বরের দ্বারা নিরূপিত হয় এবং তাই ভাষার স্বরভঙ্গির সঙ্গে অস্পষ্টভাবে সমান্তরাল চলে। বস্তুত দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য আছে ঃ কথ্য বাক্যের স্বরভঙ্গিতে থাকে তরঙ্গিত, দ্রুত-পরিবর্তনশীল প্রস্বর আর গীতল সুতানে নির্দিষ্ট প্রস্বর ও কালান্তর। শ্রুতিমাধুর্য শব্দটিও পর্যাপ্ত নয়। কেননা বাদিত্রসঙ্গীতে ব্রাউনিও, হপ্‌কিন্স, বা দ্বিজেন্দ্রলাল প্রভৃতি কবিদের সম্পর্কে শ্রুতিকটুতা (cacophony)ও বিবেচ্য, যেহেতু এঁরা স্বেচ্ছাকৃত-ভাবে কর্কশ ও দ্যোতক ধ্বনিক্রিয়ায় বিশ্বাসী, যেমন দ্বিজেন্দ্রলালের—

যদি জানতে চান আমি ঠিক কি রকম স্ত্রী চাই—
ফর্সা কি কালো কি মাঝারি রঙ,
লম্বা কি বেঁটে কি ক্ষীণা পীনা
দেখতে ঠিক পরী কি দেখতে ঠিক সং।

এই বাদিত্র কৌশলের মধ্যে পড়ে ধ্বনিকল্প ও ধ্বনিব্যঞ্জনার পৃথকীকরণ অর্থাৎ অভেদ বা সংশ্লিষ্ট ধ্বনিগুণের পুনরাবৃত্তি ও ধ্বন্যনুকৃতি (sound-imitation)-র মধ্যে পার্থক্য। ধ্বনিচিত্রে (sound-figures) থাকে পুনরাবৃত্ত ধ্বনিসংখ্যা, পুনরাবৃত্তিসংখ্যা, পুনরাবৃত্ত গোষ্ঠীতে ধ্বনিক্রম এবং স্পন্দশীল এককে ধ্বনির অবস্থান। মিল হলো ধ্বনিপুনরাবৃত্তির উদাহরণ আর এর অন্তর্ভুক্ত অনুপ্রাস (alliteration) ও স্বরসঙ্গতি (assonance)-র মতো অনুরূপ বিষয়ও। ধ্বনিকল্পে (sound-pattern) স্বর ও ব্যঞ্জন গুণের পুনরাবৃত্তি চূড়ান্ত (decisive)। এবার ধ্বন্যনুকৃতির কথা। শব্দই বস্তুর সঠিক উপস্থাপন এ-ধারণা আজকাল পরিত্যক্ত। তা সত্ত্বেও আধুনিক ভাষাবিদ্যা স্বীকৃতি দিয়েচে এক বিশেষ শ্রেণীর শব্দাবলীকে, যার নাম 'ধ্বন্যাত্মক' (onomatopoeic), যেমন cuckoo, buzz, কচর-মচর ঃ ব্যঞ্জন ধ্বনির দীর্ঘীকরণ বা দ্বিত্ব করলে ক্রিয়ার ক্ষণ বিরতভাবের সম্প্রসারণ ঘটে, যথা 'কলকল চলচ্চল টলটল তরঙ্গা'। অবশ্য পংক্তির ধ্বনি-প্রভাব অর্থ-নির্ভর, যেমন দেখিয়েচেন Rausom ঃ অনুকারী অভিক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে নষ্ট হয়ে যায় যদি 'the murmuring of innumerable bees' কে রূপান্তরিত করা হয় 'murdering of innumerable leaves' এ। m-এর জায়গায় d আসায় 'm-m' ধ্বনিকল্প লোপ পেয়েচে ; কাজেই innumerableও সরে পড়েচে।[৪] আবার 'ঝিল্লি ঝনকিছে ঝিনিঝিনি'তে আছে 'ঝ' ধ্বনির চারবারের পুনরাবৃত্তি। এই ঝ-ঝ ধ্বনিকল্পের পরিবর্ত্তনে যদি আসে 'মিল্লি বকিতেছে নিশিদিন' তবে কাব্যরসের ঘাটতি ঘটে ঃ পূর্বতন আমেজটা লোপ পায়। অনুরূপ ঘটনা দেখা দেয় 'নীরসঃ তরুবরঃ পুরতো ভাতি'র জায়গায় 'শুষ্কং কাষ্ঠং তিষ্ঠত্যগ্রে' লিখলে। তবে ধ্বন্যাত্মক শব্দের চেয়ে আরো ব্যাপক হলো ধ্বনি-প্রতীকতা বা শব্দের বাহ্যাকৃতি। অবশ্য সব ভাষায় ব্যাপ্ত হয়ে আছে সহ-সংবেদনের (synaesthesis) সমবায় ও সমিতি এবং এ-প্রতিষঙ্গ (correspondence) কবিরা তাঁদের কাজে লাগিয়েচেন। এ-প্রসঙ্গে Rimbaud-এর কবিতা "স্বরবর্ণালি" (les voyelles) উল্লেখ্য, কেননা এখানে স্বর ও বর্ণের মধ্যে এক-থেকে-এক প্রতিষঙ্গ (one-to-one correspondence) আছে। সম্মুখস্থ স্বরধ্বনি—e ও i (এ, ই)—গাঁটছড়া বেঁধেচে হাল্কা, দ্রুত স্পষ্ট ও উজ্জ্বল বস্তুর সঙ্গে, আবার ঐ একই সমিতি রয়েচে পশ্চাদস্থ স্বরধ্বনি—o ও u (ও, উ)—ও স্থূল, মন্থর, জড় ও কালো বস্তুর মধ্যে। Stumpt ও Köhler আরো দেখিয়েচেন যে ব্যঞ্জনকে দু'শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—দীপ্ত অর্থাৎ দন্ত্য (dental) ও তালব্য (palatal) বর্ণ ; আর অদীপ্ত অর্থাৎ ওষ্ঠ্য (labial) ও জিহ্বা মূলীয় (velar) স্পর্শবর্ণ।[৫]

এখানে মনে রাখতে হবে যে স্পন্দ ও ছন্দের সমস্যা বাদিত্রগণের থেকে আলাদা। সমাধানের প্রয়াসে এগিয়েচে একাধিক ছান্দসিক মতবাদ। এখানে প্রধান পাঁচটির আলোচনা হবে—(১) চিত্রল (graphic); (২) গীতল (musical); (৩) শ্রৌত (acoustic) (৪) গেস্তালীয় (gestalt); ও (৫) জননীয় (generative)। এদের প্রয়োগ সম্পর্কে নিচে বলা হলো--

I. **চিত্রল পদ্ধতি**—এ হলো প্রাচীনতম পদ্ধতি। এর কারবার হ্রস্ব-দীর্ঘের চিত্রল বা লৈখিক সংকেতে। হ্রস্ব বুঝাতে ∪, আর দীর্ঘ বুঝাতে — চিহ্ন ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয়টি প্রথমটির দ্বিগুণ। ছন্দময়ীর "হৃদ্যাশ্রীমূর্তি" ধরে ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর "ছন্দ সরস্বতী"তে : "পংক্তির গোড়ায় ভিন্ন অন্য সকল জায়গায় যুক্ত অক্ষর প্রকৃতপক্ষে একজোড়া অক্ষর। ঐ-কার আর ঔ-কার হচ্ছে স্বরসংকর, ইংরেজিতে যাকে বলে diphthong"। এ "মঞ্জুমরাল বাহনে" এগিয়ে চলে "গঙ্গা-যমুনা—পদ্ধতি"-তে অর্থাৎ যুক্তাযুক্ত বা দীর্ঘ-হ্রস্ব বিভেদে—

— ∪ ∪ ∪ ∪ | — ∪ ∪ ∪ ∪
"গঙ্গা-যমুনা- | সঙ্গম-জলে
∪ ∪ ∪ — ∪ | ∪ ∪
মেলিয়া যুক্ত | ডানা,
— ∪ ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪ ∪ ∪ ∪ —
মঞ্জু মরাল | বিহর হরষে
— ∪ ∪ ∪ ∪ | ∪ ∪
সঙ্গীত গাও | না না।"

এখানে 'গঙ্‌', 'সঙ্‌', 'যুক্‌', 'মন্‌' দু'মাত্রার অক্ষর এবং তাই তারা দীর্ঘ : অন্যান্যরা হ্রস্ব। তবে সংস্কৃতের হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব বাঙলায় নেই। এর প্রচলিত নাম মাত্রাবৃত্ত ছন্দ, যেহেতু এ মাত্রার হ্রস্ব-দীর্ঘত্বের উপর নির্ভরশীল। এঁরি ভিত্তিতে দিলীপ কুমার রায় ও প্রবোধ চন্দ্র সেন গড়ে তুলেচেন বর্ণনাত্মক ছন্দপ্রকরণ যথাক্রমে 'ছান্দসিকী (১৯৪০) ও 'ছন্দপরিক্রমা'য় (১৯৭৭)।

এ-পদ্ধতির মস্ত দোষ এই যে এ অক্ষরের মাত্রাগুণে সব ঠিক কর্তে চায়। কিন্তু এতে বাঙলা ছন্দের সব রহস্যের উদ্ঘাটন সম্ভব হয়নি। তাই এর বাইরে রয়ে গেচে প্রচলিত ছড়ার ছন্দ ও অক্ষরবৃত্ত, যার নাম দিয়েচেন প্রবোধ চন্দ্র সেন 'দলবৃত্ত' (অক্ষরকে 'দল' বলা হয়েচে) ও 'মিশ্রবৃত্ত'। আর প্রচলিত মাত্রা-বৃত্তের নাম করেচেন 'কলাবৃত্ত'। কাজেই দেখা যাচ্ছে 'কলা' বা মাত্রার বাটখারায় সবাইকে মাপা যাচ্ছে না : ফলে এসেচে তিনটি বাটখারা—কলা, অর্ধকলা ও

দল।[৭] বলাবাহুল্য যে এ অবৈজ্ঞানিক, কেননা এতে ঐক্যের পরিবর্তে বৈচিত্র্যকে প্রশ্রয় দিয়েচে। এ-সম্বন্ধে দিলীপ রায়ের মন্তব্য প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেচেন ঃ "ছন্দের গোড়াকার কথাটা যে ধ্বনিসাম্য এই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বটি সব আগে মনে গেঁথে নেওয়া চাই। অর্থাৎ কি না কোনো মূল ধ্বনিকে য়ুনিট নিয়ে সেই মাপে কাব্যকে সুসংবদ্ধ করলে তবেই তা হবে ছন্দ নইলে নয়—যেহেতু 'গদ্যছন্দকে' 'ছন্দ' নাম দিলে মনে পড়েই পরমহংসদেবের 'এক গোয়াল ঘোড়া'র গল্প। প্রবোধ চন্দ্র এই মূল য়ুনিট ধরেছেন তিন রকম। কিন্তু ধ্বনির য়ুনিট ত্রিবিধ হতে পারে না ব'লেই এ-ভাবে ছন্দকে বুঝতে গেলে মাপজোপের ব্যাপারটা সরল না হ'য়ে জটিলই হ'য়ে ওঠে"।[৮] রবীন্দ্রনাথ ও শুধুমাত্র মাত্রাগণনায় সায় দিতে পারেন নি এবং তিনি একথা জানিয়েচেন প্রবোধ চন্দ্র সেনকে তাঁর চিঠিতে (১৯৩৪ সেপ্টেম্বর, ২) ঃ

"যুগ্মস্বর অথবা স্বরবর্ণের সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বাংলা ছন্দে মাত্রা গণনায় বিকল্পে এক বা দুই মাত্রার পরিমাণ পেয়ে থাকে। 'হইল', 'তুইও' শব্দে এই নিয়ম। হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের যোগেও এই বিকল্পের উদ্ভব হয়। যথা 'ভেবেছিলাম তুমি'। যাকে আমরা সাধুভাষা বলি সে হসন্তের শব্দের দাবী মানতে চায় না—হসন্তের আদর চলতি ভাষায়। শাস্ত্রাচার ও লোকাচারের ভেদে একই ভাষায় দু'-রকমের প্রথা চলবে। মাত্রাগণনার বাঁধা নিয়ম বাংলা ছন্দ বিচারে চলে না, তার স্থিতিস্থাপকতা বিচার করতে হয়। ছন্দের নিয়মটা জানবার যোগ্য বিষয় বটে। কিন্তু ছন্দ ব্যবহার করবার কালে আরো বেশি কিছু আবশ্যক হয়, সেটা কাউকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। এর বেলাও খাটে 'ন মেধয়া ন বহু না শ্রুতেন'" [৯]।

II. **গীতল পদ্ধতি**—এ ধরে নেয় পদ্যছন্দকে গীতস্পন্দের অনুরূপ বলে। ফলে এর প্রকাশ ঘটে সাংগীতিক সংকেতে। মার্কিন মুলুকে এ শিক্ষকদের মধ্যে স্বীকৃতি লাভ করেচে। এ-পদ্ধতিতে প্রত্যেক অক্ষরকে এক অনুক্ত উচ্চতার গীতল স্বরের মান দেওয়া হয়। স্বরের দৈর্ঘ্য অবশ্য নির্ধারিত হয় খেয়াল-মাফিক ঃ দীর্ঘাক্ষরকে অর্ধস্বরমাত্রা, অর্ধহ্রস্বাক্ষরকে চতুর্থাংশ স্বরমাত্রা, হ্রস্বাক্ষরকে অষ্টমাংশ স্বরমাত্রা প্রভৃতি। ইংরেজির মাপ চলে এক প্রস্বরিত অক্ষর থেকে আরেকটি পর্যন্ত ; আর পাঠদ্রুতি সূচিত হয়

৩/৪ ৩/৮ বা ৩/২ মাপে। ৩/৮ তালাঙ্কের

খেম্‌টা এ-ভাবে চিহ্নিত হয়—



চিত্র : ১৬— খেমটার ঠেকা

রবীন্দ্রনাথ গীতল পদ্ধতির প্রবক্তা। তিনি ২৯ জুন, ১৯১৮ তারিখের এক চিঠিতে অধ্যাপক জে. ডি. এন্ডারসনকে লিখেছেন: "আমি ছন্দের হ্রস্ব ও দীর্ঘ বিভাগের আলোচনা করেচি। দীর্ঘ বিভাগগুলি সাধারণত মুদ্রিত পংক্তি দিয়ে দেখান হয়। কিন্তু স্পন্দের জন্যে আরো গুরুত্বপূর্ণ হলো হ্রস্বতর বিভাগগুলি। এরা সংগীতে যাকে বলে দন্ড (bar) তা-ই এবং স্বরকম্প (beat) দিয়ে মাপা হয়—বিশেষ ছন্দের স্পন্দানুসারে স্বরকম্পে থাকে ধ্বনি মাত্রার একটি নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ। ছন্দ প্রকরণের ভাষায় এই স্বরকম্প হ'লো প্রচাপ (stress)। তারা যে-ঝোঁকের সূত্রপাত করে তা নির্দিষ্ট আয়তনের ধ্বনি বহন করে।

যথা, ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
অ ধ রে ম | ধু র হা সি | বাঁ শি টি বা | জা ও |

এ-পংক্তির ছন্দে প্রতি দণ্ডের মধ্যে আছে চার মাত্রার বিভাগ। স্বভাবতই দন্তের শুরুতেই আসে স্বরকম্প এবং পরের স্বরকম্প পর্যন্ত এ থাকে নিলম্বিত।"[১]

তবে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা কাব্য ও সংগীতের অভেদ সাধন করেন নি। দু'য়ের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করে তিনি এদের সাদৃশ্যের কথাই বলেচেন। তাঁর মতে: "কাব্যে ছন্দের যে কাজ, গানে তালের সেই কাজ। অতএব ছন্দ যে-নিয়মে কবিতায় চলে তাল সেই নিয়মে গানে চলিবে। তাহাতে উৎপাত ঘটিল। এমন ছন্দ হইতে পারে যার প্রত্যেক লাইনে সমান মাত্রা বিভাগ নাই। যেমন—

বাজিবে, সখি, বাঁশি বাজিবে,
হৃদয়রাজ হৃদে রাজিবে।
বচন রাশি রাশি কোথা যে যাবে ভাসি'
অধরে লাজ হাসি সাজিবে।

ইহার প্রথম দুই লাইনে মাত্রাভাগ ৩+৪+৩=১০। তৃতীয় লাইনে ৩+৪+৩+৪=১৪। গান ধরিলাম। কিন্তু এক ফের ফিরতেই তালওয়ালা পথ আটক করিয়া বসিল। সে বলিল 'আমায় সমের মাশুল চুকাইয়া দাও'। আমি বলি এটা বে-আইনি আবোয়াব। কান-মহারাজের উচ্চ আদালতে দরবার করিয়া খালাস পাই। কিন্তু সেই দরবারের বাহিরে খাড়া আছে মাঝারি শাসনতন্ত্রের দারোগা। সে খপ করিয়া হাত চাপিয়া ধরে, নিজের বিশেষ বিধি খাটায়। রাজার দোহাই মানেনা"।[১১] কিন্তু অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় কাব্য ও সংগীত, কথা ও সুরকে এক করে রচনা করেচেন তাঁর 'পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদ' (beat and bar theory), যাকে বলা উচিত 'স্বরকম্প-ও-দণ্ড'বাদ : "আমি দেখাইতে চাহিয়াছি যে ভারতীয় সংগীতের ন্যায় বাংলা ভাষার ছন্দের ভিত্তি Bar and Beat ; এই জন্য এই সূত্র পরম্পরাকে সংক্ষেপে The beat and bar theory বা পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদ বলা যাইতে পারে"।[১২] তবে কথা ও সুর এক নয় বলে উক্ত পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদ বাঙলা ছন্দ সম্পর্কে যে খাটে না তা আগেই বলা হয়েচে।

ইংরেজি ছন্দ প্রস্বনবৃত্ত বলে এ কিছুটা সংগীতের কাছাকাছি যেতে পারে। তা সত্ত্বেও Robert Bridges বলেন : "প্রচাপ স্পন্দ কিছুদূর পর্যন্ত আধুনিক সংগীতের সঙ্গে অভিন্ন—যেখানে প্রত্যেক দন্ডই অনুসারীপূরক যুক্ত একটি প্রস্বন (accent followed by its complement)। আর আধুনিক সংগীতের এমন কোন স্পন্দ নেই যা প্রচাপ ছন্দপ্রকরণের সম্ভবপর ও যোগ্য স্পন্দ নয়। কিন্তু কাব্যে সংগীতের মতো সমান দন্ডের বাধ্যবাধকতা নেই ; কাজেই এ স্পন্দ ক্ষেত্র অনির্দ্দিষ্টভাবেই ব্যাপকতর। কাব্যের বাক্‌স্পন্দ বুঝতে গেলে গায়ককে উপলব্ধি করতে হবে যে স্পন্দের কতনা বিশাল ক্ষেত্র হতে হয়েচে সে নির্বাসিত সমদণ্ডীয় এই নিয়মের জন্যে। অবশ্য আজকাল গায়কদের একথা বলার প্রয়োজন নেই, কেননা তারা আগে থেকেই তাদের বন্ধনের জন্যে অনুশোচনা এবং এ-থেকে মুক্তি পেতে চাতুর্য প্রয়োগ করতে শুরু করেচে। তাদের গানে এর সাক্ষ্য মেলে পৌনঃপুনিক মধ্য বর্ণ লোপ ও কাল চিহ্নের পরিবর্তনে"।[১৩]

বাঙলা ছন্দ এই 'স্বরকম্প-ও-দণ্ড-বাদ' থেকে দূরে আছে। ছড়ার ছন্দ বা চাপবৃত্ত ছন্দ এর আওতায় আসতে পারে এক সংকীর্ণ ক্ষেত্রে। কিন্তু তালবৃত্ত ও তানবৃত্ত ঠিক-ঠিক এর সঙ্গে খাপ খায় না। এখানে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের কয়েকটি পংক্তিতে এর সমর্থন মেলে। যথা—

কালি কালো মিশি কালো | অমাবস্যার নিশি কালো |

।
গদাধরের পিসি কালো,
। ।
কিন্তু জানোনা | কি কালো | সেই কালো রঙ !

এখানে প্রচাপ পড়েচে যেখানে দণ্ড আছে বলা যেতে পারে। তবে তা পর্বের শুরুতে নয়। তাই ছন্দোলিপি (scansion)-র জন্যে মোহিতলাল ছন্দাতিরিক্ত অক্ষরের (hyper-metric syllables) শরণাপন্ন হয়েচেন। অর্থাৎ এখানে দণ্ডাঘাতের লক্ষণ থাকলেও পর্ব ও পর্বাঙ্গগুলি সমান মাপের নয়। এক কথায়, চলন সমকালিক হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া ছন্দের পদক্ষেপ নির্ধারণও কঠিন হয়ে উঠেচে। এ-পরিপ্রেক্ষিতে মোহিতলাল বলেন ঃ "অনিয়মিত ছন্দেই এই Bar and Beat থিয়রি প্রযোজ্য। বাংলা ছন্দের মূল সূত্ররূপে এই তত্ত্বকে দণ্ড ও আঘাতের মতো আস্ফালন করিবার কোন হেতু নাই। ইহা সাধারণ বাংলা কাব্যছন্দ নয়, একরূপ গদ্য ছন্দ বলিলেও চলে"।[১৪]

এ-তত্ত্বের গুণের মধ্যে হলো এই যে এ পদ্যে সমকালীনতার ব্যক্তিনিষ্ঠ অনুভূতির উপর জোর দেয় অর্থাৎ কিভাবে আমরা শব্দ-পঠনে দ্রুতি বা শ্লথন আনি, হ্রস্বীকরণ বা দীর্ঘীকরণ ঘটাই, এবং বিরাম আমদানি করি মাপের সমতার জন্যে। গেয়পদ্যে অঙ্কপাতন (notation) সফল ; তবে এ কথ্য বা আলঙ্কারিক পদ্যের বিচারে অত্যন্ত অপর্যাপ্ত এবং সাধারণত মুক্তক বা অসমকালীন পদ্যে অসহায় হয়ে ওঠে। তাই এর গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি আছে। প্রথমত, এ ব্যক্তির খেয়াল-খুশি পঠনকে প্রশ্রয় দেয়, যেমন ধরা যাক সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দু'টি পংক্তি—

। । । ।
মুক্ত বেণীর | গঙ্গা যেথায় | মুক্তি বিতরে | রঙ্গে,
। । । ।
আমরা বাঙালী | বাস করি সেই | তীর্থে বরদ | বঙ্গে।

—'কুহু ও কেকা' ঃ আমরা

১৯২৬ সালে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় স্বকীয় উচ্চারণ অনুসারে বলেছিলেন একে 'স্বরবৃত্ত' অর্থাৎ চাপবৃত্ত ছন্দ ঃ, কিন্তু ১৯৭২ সালে শিশির কুমার ভাদুড়ীর উচ্চারণ অনুসারে বলেচেন একে মাত্রাবৃত্ত বা তালবৃত্ত ছন্দ।[১৫] দ্বিতীয় ত্রুটি এই যে, সমতার জগদ্দল পাথরে পদ্য বৈচিত্র্য উবে যায় এবং সব পদ্যকে কয়েকটি একঘেয়ে স্বরকম্পে পরিণত করে। তৃতীয়ত, এ সব কবিতার মৌখিক আবৃত্তিকে গানের সুরে রূপান্তরণের জন্যে আমন্ত্রণ জানায়। সর্বশেষে যে সমকালীনতা প্রতিস্থাপিত হয় তা মন্ময় এবং এর চেয়ে বেশি কিছু নয়— এহলো ধ্বনি ও বিরাম বিকাশের একটি তন্ত্র, যাতে উভয়ই সমানীভূত প্রত্যক্ষ করা হয়।

III. **শ্রৌত পদ্ধতি**—এর স্বীকৃতি আজকাল ব্যাপক। এ বাস্তব তথ্যানুসন্ধানের উপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায়ই দোলনলিখ্ (oscillograph)-এর মতো বৈজ্ঞানিক যন্ত্রাদি প্রয়োগ করেঃ এতে কবিতাপাঠের প্রকৃত ঘটনাবলী বিধৃত হয়, এমন কি তাদের আলোক চিত্রও নেয়া হয়। বৈজ্ঞানিক ধ্বনি-জিজ্ঞাসার আঙ্গিক ব্যবহার করেচেন Sievers ও Saran জার্মেনীতে, Verrier ফ্রান্সে ইংরাজি উপাদানের ভিত্তিতে এবং E. W. Scripture মার্কিন মুলুকে। শ্রৌত ছন্দশাস্ত্র সুস্পষ্টভাবে স্থাপন করেচে ছান্দসিক উপাদানের স্বাতন্ত্র্য। আজকাল তাই প্রস্বর, প্রাবল্য, উপস্বন ও কালকে গুলিয়ে দেওয়ার কোন হেতু নেই, কেননা এরা বক্তা-নিঃসৃত ধ্বনি তরঙ্গের কম্পাঙ্ক, বিস্তার, আকৃতি ও স্থিতিকালের ভৌত পরিমেয় উপাদানের প্রতিষঙ্গী। মিল্টনের হারানো স্বর্গ (Paradise lost)-এর প্রথম পংক্তি—Of man's first disobedience, and the fruit-র উচ্চারণে স্বরের গতিপথ নির্ধারণ করেচেন Strangways

এ-ভাবে:  যেখানে =½ মাত্রা (দ্রুত), = ১ মাত্রা (লঘু) =২ মাত্রা (গুরু), =৩ মাত্রা (প্লুত) ও =বিরতি।[১৬]

আর এর চিত্ররূপ হবে ভূকম্পলিক্ (Seismograph) বিধৃত ভূকম্পের প্রচণ্ড দোলনের অনুরূপ, যা দেখানো হয়েচে "মিলের ভৌত ভিত্তি" বই-য়ের মুখপত্রে (Title Page)।[১৭] এ নিঃসন্দেহে বিজ্ঞানের কৃতিত্বের পরিচায়ক।

তবে এ-কথা অনস্বীকার্য যে প্রায়োগিক (laboratory) ছন্দশাস্ত্রে উপেক্ষিত হয়েচে অর্থ বা তাৎপর্য। তাই নেতি-বাচক সিদ্ধান্ত হলো এগুলোঃ (১) 'অক্ষর' বলে কোনো কিছু নেই, কেননা স্বর অনবচ্ছেদ; (২) 'শব্দ' নেই, যেহেতু এর সীমারেখা দোলনলিখ্-এ ধরা পড়ে না; (৩) সুতান বা সুর লহরী (melody) নেই, কেননা শুধুমাত্র স্বর এ কয়েকটি ব্যঞ্জনবাহিত হয়ে প্রস্বর সর্বদাই রব (noise) দ্বারা প্রতিহত হচ্ছে; (৪) সঠিক সমকালীনতা (isochronism) নেই, কেননা মাত্রার (measure) প্রকৃত স্থিতিকাল পরিবর্তমান; (৫) অক্ষরে কোন নির্দিষ্ট 'হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব' নেই, যেহেতু ভৌতভাবে হ্রস্বাক্ষর দীর্ঘাক্ষরের তুলনায় দীর্ঘতর হতে পারে; এবং (৬) প্রচাপের কোন বাস্তব বিভেদ নেই, কেননা প্রচাপিত অক্ষর প্রকৃতপক্ষে চাপহীন অক্ষরের তুলনায় কম তীক্ষ্ণতায় (intensity) উচ্চারিত হতে পারে। শ্রৌত পদ্ধতির মস্ত ভুল-এর অঙ্গীকার

(assumption) ঃ দোলনলিখের সিদ্ধান্তগুলি সাক্ষাৎভাবে ছন্দশাস্ত্র অনুধ্যানের প্রাসঙ্গিক। মনে রাখতে হবে যে পদ্যভাষার কাল প্রত্যাশার কাল[১৮] ঃ নির্দিষ্ট সময়ের পরে আমরা স্পন্দমান সংকেত প্রত্যাশা করি, কিন্তু এই পর্যাবৃত্তির সঠিক হওয়ার প্রয়োজন নেই কিংবা সংকেত ও প্রকৃতপক্ষে প্রবল না হলেও চলে যদি আমরা একে প্রবল বলে অনুভব করি। শুধুমাত্র শ্রৌত বা গীতল পদ্ধতিতে পদ্যের ছাঁচ অগম্য ও অবোধ্য। ছন্দতত্ত্বে পদ্যের অর্থ অনুপেক্ষণীয়। প্রধানত পদ্য নিয়ন্ত্রিত হয় বাক্‌-বিভাগে আরোপিত বাক্‌-মেলন (phrasing), স্পন্দমান ঝোঁক ও প্রকৃত বাক্‌-স্পন্দের প্রতিভারে (counterpoint)। আর এই বাক্‌-বিভাগ নিরূপিত হয় কেবলমাত্র পদার্থের পরিচিতির মাধ্যমে। তাই Abercrombie বিশ্বাস করেন যে "ছন্দ হলো স্পন্দ-কম্পের মণ্ডলিত পুনরাবৃত্তি ঃ কবিদের অভ্যাসই এর একমাত্র অধিকার। আর ছান্দসিক স্পন্দের জন্যে সূত্র বর্ণনা ও নিয়ম নির্ধারণ সব সময়ই সম্ভব—বাস্তব ধ্বনির সূত্র বা নিয়ম নয়, কিন্তু আদর্শ নির্দেশের ছাঁচসূত্র এবং নিয়মাবলী যাতে প্রকৃত পর্যাবৃত্তি আদর্শ ধ্রুবক নির্দেশ করে। এ হলো ছন্দোলিপি (scansion), যা পদ্যের ব্যক্তিগত বোধের উপর নির্ভরশীল"।[১৯] এই আদর্শেই মোহিতলাল মজুমদার রচনা করেচেন তাঁর "বাংলা কবিতার ছন্দ" (১৩৫২)। তাঁর মতে, "কবিতার ছন্দ-বিচার কাব্যরস বিচারেরই অঙ্গ, কারণ ছন্দও কবিতার একটি রসরূপ" (ভূমিকা, পৃঃ ॥৹)। ধ্বনি-বিজ্ঞান বাদ দিয়ে ব্যক্তিগত বোধের উপর নির্ভর কর্তে হলে ছান্দসিকের বিচারশক্তি চাই উন্নত ধরনের। এ না হলে হবে ভরাডুবি, যেমন হয়েচে এ-উক্তিতে ঃ "অক্ষর স্থির মাত্রিক। শব্দ প্রসারণে অক্ষরের মাত্রাবৃদ্ধি নহে, শব্দেরই অক্ষরবৃদ্ধি ও ফলে মাত্রাবৃদ্ধি হয়। অক্ষরের প্রসারণ সম্ভব নহে। স্থিরমাত্রিক বলিয়াই অক্ষর উচ্চার্যধ্বনি মাপিবার মান দণ্ড।"[২০] এর বিরুদ্ধে রায় দিয়েচে ধ্বনিমাপক যন্ত্রলিপি (Kymograph tracing): "'পাট গুদাম' ও 'কাঠ গুদাম' বাক্যাংশ দুটির স্বরতন্ত্রীর প্রকম্পন ও মুখের ধ্বনির প্রতিলিপি বিশেষভাবে লক্ষ্যযোগ্য। 'পাট' ও 'কাঠ' শব্দের 'ট' এবং 'ঠ' অঘোষধ্বনি হওয়া সত্ত্বেও বাক্‌প্রবাহের মধ্যে পড়ে তাদের পূর্ব ও পরবর্তী ঘোষধ্বনির প্রভাবে এখানে ঘোষতাগুণ লাভ করেছে।"[২১]

প্রায়োগিক ধ্বনিবিজ্ঞান সম্পর্কীয় কিছু-কিছু গবেষণা ভারতীয় ভাষা নিয়েও হয়েচে। এখানে উল্লেখ্য হলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, মুহম্মদ আব্দুল

হাই, ও এ, সি, সেন।[২২] তবে এ-বিষয়ে ভারতে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েচে পুণাস্থিত ধ্বনিবিজ্ঞান গবেষণাগার—ডেকান কলেজের স্নাতকোত্তর ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান। এ-প্রসঙ্গে C. R. Sankaran, P. C. Ganesh Sundaram ও B. C. Deva-এর গবেষণা উল্লেখ্য। এঁদের আল্ফাধ্বনি মান ও ধ্বনিকল্পবাদ (alpha-phoneme and phonoid) স্মর্তব্য ঃ দু'টি বাক্‌ধ্বনির মধ্যে কোন লক্ষণীয় সংক্রমণ বিন্দু (transition point) নেই। আল্ফা ধ্বনিমান তত্ত্বে বুঝায় এক কালাতীত অভিজ্ঞতা যা ছেদ নয় আবার অনবচ্ছেদও নয় অর্থাৎ এ দু'টি ঘটনার মধ্যে অস্তিমান থেকেও উভয়ে পরিব্যাপ্ত। এ-মাত্রাহীন অভিজ্ঞতা, যা কালমাপনীতে ধরা পড়ে না। আল্ফা-ধ্বনিকল্পবাদ সঠিক কালোৎপত্তিকে (punctiform origin of time) মেয় ভাষায় সংজ্ঞিত করার প্রচেষ্টা ঃ এ হলো আলোবেগের মতো চরম সংকেতের সংজ্ঞা দেয়ার প্রয়াস। আবেগ দিয়ে ব্যাপারটা বুঝান যায়। এ প্রতীকী প্রক্রিয়া যা কালের সঙ্গে অস্তিমান। কিন্তু রসের ধারণায় আছে বোধস্তরের স্বীকৃতি—এ অস্তিত্বের এমন অবস্থা যে কালশায়ী হয়েও সাময়িক প্রগতি সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন। একে বলা হয় আল্ফা-ধ্বনিমান অবস্থা। আর দুটি মনস্তাত্ত্বিক অবস্থার কালান্তরকে বলা হয় আল্ফা-ধ্বনিকল্প অবস্থা, যেমন ব্যঞ্জন-স্বর ধ্বনির সংক্রমণ। এ সম্বন্দে মনে রাখতে হবে যে শব্দের জন্ম আকাশে এবং পরে এ আমাদের চারপাশের বায়ুকে স্পন্দশীল করেচে। বায়ুকণার এই স্পন্দের নাম **নাদ** ; শ্রুতশব্দকে বলে **ধ্বনি** ; আর তুরীয় শব্দ **স্ফোট** নামে পরিচিত। প্রস্বর তার দৈর্ঘের আনুপাতিক। শব্দ উদ্দীপক হলে জন্ম নেয় ভৌত শব্দতত্ত্ব ; শব্দসংবেদনে আসে শারীরতাত্ত্বিক শব্দতত্ত্ব ; আর শব্দ-প্রত্যক্ষণে দেখা দেয় মনস্তাত্ত্বিক শব্দতত্ত্ব। কর্ণের স্নায়বিক সাড়া অর্থাৎ বিকৃতি বিভব (distortion potential) বিশ্লেষণে ধরা দেয়। যদি x=সাড়া, ও p=প্রযুক্ত বল (impressed force) হয়, তবে এদের সম্পর্ক হবে—[২৩]

$$x = a_0 + a_1 p + a_2 p^2 + a_3 p^3 + \cdots\cdots + a_n p^n \cdots (27)$$

যেখানে $a_1, a_2, a_3 \cdots a_n$ হলো ধ্রুবক।

সংগীতে এই আল্ফা-ধ্বনিকল্পের নাম শ্রুতি। বৈদিক উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত সম্পর্কীয় পরীক্ষালব্ধ তথ্য নিচে দেয়া হলো ২-সংখ্যক সারণীতে—

সারণী ২-আল্ফা ধ্বনিকল্পে বৈদিক স্বর

স্বরক্ষেত্র (tonal region)	গড় প্রস্বর (cps-প্রতি সেকেণ্ডে চক্কর)	গরিষ্ঠসীমা	স্বরক্ষেত্রের কালান্তর
উদাত্ত	185·2	166·6 হতে 200 cps	উদাত্ত হতে অনুদাত্ত 203 cents
অনুদাত্ত	164·8	142·9 হতে 181·8 cps	
স্বরিত	211·1	200 হতে 222·2 cps	স্বরিত হতে উদাত্ত 226 cents

এখানে মনে রাখতে হবে যে স্বরিত মধ্যস্বর, যার আরোহ হ'লো উদাত্ত আর অবরোহ অনুদাত্ত। এককভাবে স্বরিত-এর আলাদা অস্তিত্ব আছে ; কিন্তু স্তোত্রে এ 'শ্রুতি' (glide) তে পরিণত হয়। গানের জন্মলগ্নে এই শ্রুতি উদাত্তের অবরোহের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিল।[২৪]

IV. **গেস্তালীয় পদ্ধতি**—রুশ আচারনিষ্ঠরা (formalists) চেষ্টা করেছেন ছন্দশাস্ত্রকে নতুন ভিত্তিতে স্থাপন কর্তে। তাঁরা মনে করেন, পর্ব (foot) যথেষ্ট নয়, কেননা এমন অনেক পদ্য আছে যেখানে পর্ব অনুপস্থিত। দ্বিতীয়ত, ব্যক্তিনির্ভর সমকালীনতা (isochronism) একাধিক পদ্য ব্যাখ্যানে সমর্থ হলেও, এর প্রয়োগ কয়েকটি বিশেষ নমুনায় (type) সীমাবদ্ধ এবং বস্তুনিষ্ঠ অনুসন্ধানের অগম্য। তৃতীয়ত, এ-সব মতবাদ দিয়েছে কাব্যস্পন্দীয় এককের ভুল সংজ্ঞা। পদ্যকে যদি দেখা যায় কোন প্রচাপিত (বা দীর্ঘ) অক্ষর কেন্দ্রিত খণ্ড সমষ্টিরূপে, তাহলে একই বিন্যাস, এমন কি একই বিন্যাস-ক্রম পাওয়া যাবে একাধিক ভাষাতাত্ত্বিক কথনে যাকে কাব্য বলা চলে না। কাজেই স্পন্দের মৌল ঐক্য পর্ব নয়, কিন্তু গোটা পংক্তি এবং এ সিদ্ধান্ত গেস্তালীয় (gestalt) তত্ত্বেরই অনিবার্য ফলশ্রুতি। পর্বের কোন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নেই ; গোটা পদ্যের পরিপ্রেক্ষিতেই কেবল এরা অস্তিমান। প্রতিটি প্রচাপের বৈশিষ্ট্য পদ্যে তার অবস্থানের উপরই নির্ভর করে, অর্থাৎ এ প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় প্রভৃতি পর্ব কিনা। পদ্যের সংগঠনী ঐক্য বিভিন্ন ভাষায় ও ছন্দতন্ত্রে ভিন্নভিন্ন। এ হতে পারে সুতান অর্থাৎ প্রস্বরপরম্পরা যা মুক্তক (free verse)-কে পদ্য থেকে পৃথক করে। সংকেতবাহী প্রসঙ্গ বা মুদ্রণব্যবস্থা থেকে যদি জানা না যায় যে মুক্তকের অনুচ্ছেদ পদ্য কিনা, তাহলে তাকে গদ্য হিসেবেই পড়তে হবে। তা সত্ত্বেও এ পদ্য হিসেবেও গঠিত হতে পারে ভিন্ন স্বরভঙ্গিতে। এই স্বরভঙ্গি

সর্বদাই দ্বিপদী (dipodic) বা দ্বভাগে বিভক্ত এবং একে বাদ দিলে পদ্য আর পদ্য থাকেনা, হয়ে ওঠে স্পন্দমান গদ্য।

সাধারণ ছান্দসিক পদ্যের অনুশীলনে রুশরা প্রয়োগ করেন পরিসংখ্যান পদ্ধতি (statistical method) বাক্‌স্পন্দ ও রূপকল্পের পারস্পরিক সম্পর্কে। পদ্য আটপৌরে ভাষার উপর "সংঘবন্ধ বলাৎকার" (organised violence)। তাই আটপৌরে বাক্‌স্পন্দ ও উপরিপাতিত ছন্দের মধ্যে পদ্য হলো এক বিস্তারিত সম-বিষমের আদর্শ। এখানে আদর্শ বা রূপকল্প থেকে পৃথক করা হয় স্পন্দ বেগ (rythmic impulse)-কে : রূপকল্প স্থিতীয়, লৈখিক ; স্পন্দ বেগ গতীয়, প্রগামী (progressive)। প্রত্যাশিত সংকেতই পরে আবির্ভূত হয়। কাল বাদেও কলাকৃতির অন্যান্য উপাদান সংগঠিত হয়। এ-ধরনের স্পন্দবেগ প্রভাবিত করে শব্দ নির্বাচন, পদক্রমিক (syntactic) গড়ন ও পদ্যের সাধারণ অর্থ বা তাৎপর্য। পরিসংখ্যান পদ্ধতি অতি সরল। আলোচ্য কবিতায় বা কবিতা বিভাগে প্রচাপবাহী অক্ষরের শতকরা হার গোনা হয়। রেখাচিত্রে অক্ষর সংখ্যাকে ধরা হয় ভুজ এবং শতকরা হারকে কোটি। তাই পঞ্চপর্বিক পংক্তিতে পদ্য নিয়মিত হলে, পরিসংখ্যানে প্রকাশ পাবে প্রথম অক্ষরে শূণ্য হার, দ্বিতীয়ে পুরো হার, তৃতীয়ে শূন্য হার, ইত্যাদি। পদ্যের এ-রকম নিয়মানুবর্তিতা বিরল, কেননা এতে একঘেয়েমি এসে যায়। অধিকাংশ পদ্যেই দেখা যায় আদর্শ ও বাস্তব রূপায়ণের প্রতিসাম্য (counterpoint) অর্থাৎ দ্বিতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম অক্ষরস্থ পরাবিন্দুর (culmination point) দিকে রেখাচিত্রের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। পরিসংখ্যান পদ্ধতির মস্ত গুণ এই যে এতে হিসাব আছে সমগ্র কবিতার এবং তাই গুটিকয়েক পংক্তিতে যা পরিস্ফুট হয়না তা ধরা পড়ে এখানে। রুশ ভাষায় অবশ্য এ সফলকাম হয়েচে, কেননা প্রত্যেক শব্দে আছে শুধু একটি মাত্র প্রস্বন।[২৫]

এখানে স্মর্তব্য যে এ-ধরনের আলোচনা বাঙলায় এখনো হয় নি।

V. **জননীয় পদ্ধতি**—এ আবির্ভূত হয়েচে মধ্য—১৯৬০ সাল থেকে ১৯৭০ সালের মধ্যে ভাষাতাত্ত্বিক ছন্দশাস্ত্র বা ছন্দতত্ত্বের বিভিন্ন রূপ বুঝাতে : এ রূপান্তরী জননীয় ভাষাতত্ত্বের উপ-ফল। প্রচলিত ছন্দ তত্ত্বের তুলনায় এ দৃঢ়তর। তরঙ্গমাপনী (Kymograph) ও দোলনলিখ্‌-এ পদ্যবিচারে এসেচে যান্ত্রিকতা। পূর্ববর্তী গবেষকরা—Warner Brown, Ada Snell, P. Verrier ও Amos Morris—পর্বসাম্য ও হ্রস্ব-দীর্ঘ বিভেদের অসারতা আগেই উড়িয়ে দিয়েচেন। তবে E. W. Scripture-ই প্রথম যান্ত্রিক ভিত্তিতে এক নতুন ছন্দতত্ত্বের রূপরেখা দিয়েচেন। তিনি পরিত্যাগ করেচেন ছন্দাঘাত

(ictus) ও প্রচাপের অভেদ এবং এঁর জায়গায় স্থাপন করেছেন "ভরকেন্দ্র" (centroid)-এর ধারণা। এই ভরকেন্দ্র হলো অধিকতর শ্রুতিপ্রযুক্তি, তীক্ষ্ণতর প্রাবল্য, প্রস্বর পরিবর্তন, মন্দীভূত সংক্রমণ ও সঠিকতর উচ্চারণের যোগফল। তাই স্ক্রিপচারের মৌল একক হচ্ছে পংক্তি ঃ "পদ্যপ্রবাহের একটি বিস্তার যা মুদ্রিত পংক্তির সঙ্গে মিলে যায়।" পর্বের অস্তিত্ব তিনি অস্বীকার করেছেন, যেহেতু ধ্বনিরেখায় একে দেখা যায় না। এমনকি ধ্বনিক অনুরেখে (trace) অক্ষর-আবিষ্কারও কঠিন এবং অস্তিমান যা কিছু তা হলো আক্ষরিকতা (syllabicity)। এ বোঝাতে তিনি নতুন পরিভাষা আমদানি করেছেন। তবে W. Schramm ব্যবহার করেছেন পুরণো পরিভাষা যেমন প্রস্বন, প্রচাপ, পর্ব প্রভৃতি। Chomsky-র জননীয় ব্যাকরণও জুগিয়েছে উপাদান।

এঁর রকমফেরে আছে দু'টি ধারা-একটি হালে-কাইজার (Halle-Keyser) ; অন্যটি ম্যাগনুশন-রাইডার (Magnuson-Ryder)। Morris Halle ও Samuel Jay Keyser ১৯৬৬ সালে প্রথমের উদ্গাতা। এর আছে দুটি লক্ষণ—প্রথমত, প্রচাপ গরিষ্ঠতার ধারণা ; দ্বিতীয়ত, অবস্থান-পরম্পরাই পংক্তি কিন্তু পর্বসমষ্টি নয়। এখানে স্মর্তব্য যে প্রচাপের ধারণা ধ্বনিগত (phonetic) নয়, কিন্তু ধ্বনিতাত্ত্বিক (phonological)। ফলে এ তত্ত্ব প্রত্যক্ষভাবে রূপায়ণ—নির্ভর নয়। অবস্থান প্রবল ও দুর্বলভেদে দু'প্রকার—দুর্বল অবস্থানে প্রচাপ গরিষ্ঠ থাকতে পারে না। আর "প্রচাপগরিষ্ঠের" সংজ্ঞা হলো এই যে এ "ভাষাতাত্ত্বিকভাবে নিয়োজিত প্রচাপ যা মধ্যবর্তী সংযোগবিহীন সন্নিহিত উভয় অক্ষরীয় প্রচাপ হতে বৃহত্তর।" "ভাষাতাত্ত্বিকভাবে নিয়োজিত" বাক্-মেলের দ্যোতনায় আছে ব্যাকরণতন্ত্র বা নিয়মাবলী যা শব্দের বিশেষ অক্ষরে প্রচাপ নিয়োগ করে এবং বাক্‌মেলের মধ্যেও বিশিষ্ট অক্ষরে। আর "বৃহত্তর" শব্দে বুঝায় যে চরম উক্তিতে থাকে বিভিন্ন প্রচাপস্তর এবং প্রচাপস্তরের আপেক্ষিকতাই গণ্য হয়। উদাহরণ হিসেবে Edwin Arlington Robinson-এর Richard Cory-র প্রথম পংক্তিটি-Whenever Richard Cory went down town (রিচার্ড কোরি যখন শহরে যেতেন)-নেয়া যেতে পারে। প্রকৃত ধ্বনিগত প্রচাপ পড়ে দ্বিতীয় অক্ষরে ; কিন্তু বিশিষ্ট ধ্বনিতন্ত্রে 'whenever'-এর মতো ক্রিয়া বিশেষণের উপর এ নাও পড়তে পারে ; ফলে এ-অক্ষরটি কখনই প্রচাপ-গরিষ্ঠ হবে না। এখানে উল্লেখ্য যে Otto Jesperson ১৯০৩ সালে বলেছিলেন যে পর্বের ধারণা অচল এবং আয়াম্বিক ছন্দে প্রত্যাবৃত্ত আদিপর্বের রীতিমত ব্যাখ্যাও করেছিলেন। আর পদ্যপংক্তি যে অবস্থানের অনুক্রম, কিন্তু পর্বানুক্রম নয়, সেকথাও বলেছিলেন Edward Bysshe তার "কাব্যকলায়" (১৭৩৭)।

ম্যাগনুশন—রাইডার রীতিটি "বিশিষ্ট-লক্ষণ" বাদ নামে পরিচিত। Karl Magnuson ও Frank Ryder জার্মান কাব্যে কাজ করার সময় এর উদ্ভাবন করেন। এই মতে অক্ষরকে বলা হয় চতুর্লাক্ষণিক : ±প্রবল; ±দুর্বল : ±শব্দাঘাত; ±প্রাক্‌প্রবল। অক্ষর±প্রবল হয় যখন এ পায় আভিধানিক প্রচাপ অথবা এ হয়ে ওঠে অনভিধেয় বহু-আক্ষরিকতার প্রস্বনিত অক্ষর। এ হয়±শব্দাঘাত যখন এ শব্দ শুরু করে; আবার এ+আগু-প্রবল যখন এ শব্দের যে-কোন জায়গায় বসে+প্রবল অক্ষরের আগে। জার্মান ভাষায়—i— ও —u— ভিত্তিক প্রত্যয়+দুর্বল, আর —a— ও —ei— ভিত্তিক প্রত্যয়—দুর্বল। তবে এ ছন্দ পদ্ধতির মূল কথা এই যে একটি "প্রত্যাশাধাত্র" (expectation matrix) রয়েচে বর্তমান—জোড় বা প্রবল ছান্দস অবস্থানের জন্যে আছে লক্ষণগুলির এক আদর্শ সমাবেশ এবং বিজোড় বা দুর্বল ছান্দস অবস্থানের জন্যে এক আদর্শ সমাবেশ বা অক্ষরিক ধরন :

	জোড়	বিজোড়
শ — ত (শব্দাঘাত) ……	+	−
দু — ল (দুর্বল) ……	−	+
প্র — ল (প্রবল) ……	+	−
প্রা — ল (প্রাক্‌ প্রবল) ……	−	+

কাব্য কতকটা ছন্দোহীন বটে, কেননা "প্রত্যাশাধাত্রে"র সম্পূর্ণ রূপায়ণ সম্ভব নয়। তাই ছন্দশাস্ত্রের কাজ হলো ধাত্রের নেতিবাচক সম্পর্কে শর্তের কোন্-কোন্ বাধায় একটি লক্ষণ প্রকাশ পায় তা বের করা। আর এই সব বাধানিষেধ হলো "মূল নিয়মাবলী"—এরা জোড়-বিজোড়, বিজোড়-জোড়, জোড়-জোড় ও বিজোড়-বিজোড়-এর ছান্দস ফাঁকের সম্পর্ক নিয়ে কারবার করে। দেখা গেচে যে জোড়-বিজোড় সম্পর্ক "অতিমাত্রায় নিয়ন্ত্রিত"; ফলে সর্বদাই বাধা স্থাপিত হয় এ-সম্পর্কে, যা অন্য সম্পর্কে আবশ্যিক নয়। নিয়ম আবিষ্কার হলো এ ছন্দোরুদ্ধতার উদ্দেশ্য, কেননা এতেই পাওয়া যায় কোন লেখক, যুগ বা নমুনার ছন্দোমাত্রা বিনিশ্চায়ক লক্ষণগুলি। ছান্দসিক তাই তদন্ত-নির্ভর নমুনা বা সংগ্রহে প্রাপ্ত ঘটমান বা অঘটমান অক্ষর শ্রেণীর অনুক্রমের একটি তালিকা প্রস্তুত করেন এবং এ উপাত্ত থেকে নিয়ম বের করেন। এখানে স্মর্তব্য যে "শব্দাঘাত" ইংরেজি পদ্য বিশ্লেষণের একটি অঙ্গ।[২৬]

VI. **উপসংহার**—পদ্য পদ্ধতির ত্রিধা শ্রেণীবিন্যাস—আক্ষরিক, প্রাস্বনিক ও যাত্রিক—অপর্যাপ্ত ও বিভ্রান্তিকর। যেমন সার্বোক্রোট ও ফিনীয় মহাকাব্যে এই তিনটি তত্ত্বেরই ভূমিকা আছে। আধুনিক গবেষণায় দেখা গেচে যে, মাত্রিক লাতিন ছন্দ কার্যত পরিবর্তিত হয়েচে প্রস্বন ও শব্দসীমার দৃষ্টিতে। স্পন্দ-

ভিত্তিক উপাদান অনুসারে ঘটে ভাষাবৈচিত্র্য। ইংরেজি প্রচাপ-নিরূপিত এবং মাত্রা প্রস্বনের অধীন আর শব্দ সীমাও স্পন্দবৃত্তির এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। চেক-ভাষার শব্দসীমা হলো স্পন্দভিত্তিক। যার সব সময়ের সহযাত্রী হলো আবশ্যিক প্রচাপ ঃ আর মাত্রা হলো শুধুই ঐচ্ছিক বৈচিত্র্যকারী উপাদান। চীনা ভাষায় প্রস্বরই স্পন্দের প্রধান ভিত্তি ; এবং প্রাচীন গ্রীকভাষায় মাত্রাই সংগঠনী সূত্র, আর ঐচ্ছিক বৈচিত্র্যকারী উপাদান হিসেবে রয়েচে প্রস্বর ও শব্দসীমা।[২৭] বাঙলা ছন্দের ভিত্তি হলো মাত্রা, শব্দসীমা ও প্রচাপ। কলা-কৃতির সামগ্রিক উপাদান হিসেবেই ধ্বনি ও ছন্দের অনুশীলন কর্তে হবে এবং এ-থেকে অর্থও বাদ যাবে না।

৬·২ বাঙ্‌লায় ত্রিধা ছন্দ

১৯২৩ সালে দশম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রাখাল রাজ রায় ত্রিধাছন্দের কথা বলেন ঃ "বাঙ্‌লায় এখন তিন প্রকারের ছন্দ চলিয়াছে। প্রথম—অক্ষর গণনা করিয়া, ২য় প্রকার—মাত্রাগণনা করিয়া, আর এক প্রকারের ছন্দখনার বচন, ছেলেভুলান ছড়া, মেয়েলি ছড়ায় আবদ্ধ হইল। প্রথম প্রকার ছন্দের 'অক্ষর-মাত্রিক', ২য় প্রকারের 'মাত্রাবৃত্ত', এবং ৩য় প্রকারের 'স্বরমাত্রিক' বা 'ছড়ার ছন্দ' নাম দেওয়া যাইতে পারে।[২৮] ১৩২৫ সালে "ভারতী"তে (বৈশাখ, ১ম সংখ্যা, পৃঃ ৪—২৮) সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লেখেন "ছন্দ সরস্বতী" প্রবন্ধ এবং এই তিন ছন্দের কাব্যিক নামকরণ করেন—আদ্যাশ্রী, হৃদ্যাশ্রী ও চিত্রশ্রী। এরিসঙ্গে তিনি আরো দু'টি জুড়ে দিয়েছেন—দৃপ্তশ্রী ও মঞ্জুশ্রী। এরপরে প্রবোধচন্দ্র সেন ১৯২৯ সালে "প্রবাসী"তে (পৌষ) রাখালরাজের অনুসরণে তিন রীতির নাম করেন—অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। পরে তিনি এদের নতুন নাম দিয়েচেন—মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত। হালে তিনি এদের ব্যাখ্যা করেচেন এ-ভাবে ঃ "দলমাত্রক রীতি (syllabic style) তে রুদ্ধদল সাধারণতঃ সংশ্লিষ্ট-রূপে উচ্চারিত হয়। কলামাত্রক রীতি (moric style) তে এক-একটি কলাই একমাত্রা বলে গণ্য হয়। মিশ্রকলামাত্রকরীতি (mixed moric style) তে প্রত্যেক মুক্ত দলে এককলা, প্রত্যেক সংশ্লিষ্ট রুদ্ধ দলেও এক কলা এবং প্রত্যেক বিশিষ্ট রুদ্ধদলে দুই কলা হিসাবে মাত্রা গণনা করা হয়। এই মিশ্ররীতিতে মাত্রা গণনা করা হয় বলে এই রীতিকে বলা যায় মিশ্রকলামাত্রক রীতি। ...বাংলা ছন্দের ধ্বনি পরিমিত হয় দু'রকম মাত্রার সাহায্যে। এক ছন্দে মুক্ত-রুদ্ধ-নির্বিশেষে এক-একটি দলই একমাত্রা বলে গণ্য। এরকম মাত্রাকে বলা হয় দলমাত্রা (syllabic unit)। আর এক ছন্দে এক-একটি কলাই একমাত্রা বলে গণ্য। এরকম মাত্রাকে বলা যায় কলামাত্রা (moric unit)।"[২৯] দিলীপকুমার

রায় ব্যবহার করেচেন 'অক্ষরবৃত্ত', 'মাত্রাবৃত্ত' ও 'স্বরবৃত্ত' এবং বিভিন্ন য়ুনিটের অযৌক্তিকতা তুলে ধরেচেন : "প্রবোধচন্দ্র একটা জায়গায় মস্ত ভুল করেছেন—ছন্দের গোড়াকার কথাটা যে ধ্বনিসাম্য এই স্বতঃসিদ্ধ তত্ত্বটি সব আগে মনে গেঁথে নেওয়া চাই। অর্থাৎ কিনা কোনো মূল ধ্বনিকে য়ুনিট নিয়ে সেই মাপে কাব্যকে সুসংবদ্ধ করলে তবেই তা হবে ছন্দ, নইলে নয়। ধ্বনির য়ুনিট ত্রিবিধ হতে পারেনা। তাছাড়া বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে ভাবতে গেলেও সময়ের য়ুনিট—ওরফে মূলধ্বনি দ্বিবিধ বা ত্রিবিধ ধরলে ঝাপসা ঠেকে—মনে হয় এতে কোথাও কোনো ন্যায়ের ফাঁকি আছেই। শ্রুতিনিপুণ কান ধ্বনিকে শোনে সময়ের পটে বিছিয়ে আর গোনে 'সর্বদাই' একটা আঘাত (beat)-এর য়ুনিট দিয়ে, যার পারিভাষিক নাম মাত্রা। এখন, মাত্রাকে নাহক্ তিন রকম ধরলে সেটা বৈজ্ঞানিকও হতে পারেনা—কারণ, যে য়ুনিট দিয়ে ছন্দ মাপি তার একটি মাত্র মান থাকাই বিধেয়। এই য়ুনিটকেই বাংলা ছন্দে তথা সংগীতে আমরা 'মাত্রা' বলে থাকি। ধ্বনির য়ুনিট তিনরকম ধরাটা যে বৈজ্ঞানিক নয় এইটাই প্রবোধচন্দ্র ধরতে পারেননি।"[৩০] পরে অমিয় চক্রবর্ত্তীকে ১০। ১২। ১৯৩১-এ লেখা চিঠিতে তিনি আরো বলেচেন : "সেন মহাশয়ের যুক্তি আমার ওরিজিন্যাল লেগেছিল বটে, কিন্তু ওরিজিন্যাল কিছু বলতে হবে এই রোখ করে লেখা। অক্ষর গুণে গুণে চলাটা আমার কোনো দিন ভাল লাগেনি। বরাবরই মনে হয়েছে সত্য অনুভূতি তার ছন্দের সুরের বেগ আপনিই সৃষ্টি করে। কান চোখ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়ের রসবোধের সহজ প্রণালী দিয়ে চলে। ভাষার ও ছন্দের পরিণতি এই জাগতিক সত্যেরই একটা অন্যতম প্রমাণ মাত্র।"[৩১]

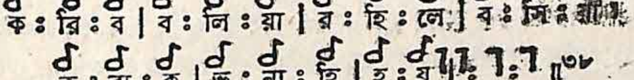
এখানে মনে রাখতে হবে যে এই ত্রিধাবিভাগ জাতিগত নয়, কিন্তু রীতিগত অর্থাৎ বংশগত : "এ যেন এক পিতার বহু সন্তান, তাদের কায়িকরূপে যতই তারতম্য ঘটুক না কেন, তাদের রক্তে কোনো পার্থক্য নেই—তাদের তাল, লয় এক, শুধু ঢং আলাদা।"[৩২] তাই মোহিতলাল মজুমদারের 'জাতিভেদ' অযৌক্তিক। তিনি বলেন : "একই ভাষার ছন্দে জাতিভেদ স্বীকার অনিবার্য হইয়া উঠিয়াছে। সাধুভাষা এবং প্রাকৃত ভাষা এই দুই নাম হইতেই প্রমাণ হয় যে, আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ভাষা এক নয়। যেহেতু ভাষার ধ্বনি প্রকৃতিই তাহার প্রধান বৈশিষ্ট্য, এবং সেই অনুসারেই উচ্চারণের পার্থক্য ঘটিয়া থাকে এবং উচ্চারণ রীতির উপরেই ছন্দ মুখ্যত নির্ভর করে—অতএব বাংলা ভাষার এই দুয়ের ছন্দ দুইটি পৃথক জাতি হইতে বাধ্য ; এবং এই জন্যই এক ধরনের ভাষায় যে ছন্দগুণ বা ছন্দসৌন্দর্য সম্ভব, অন্য ধরনের ভাষায় তা সম্ভব নয়"।[৩৩] অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় এই জাতিভেদ স্বীকার করেন না : "জাতি-বিভাগের হিসাবে ছন্দের মাত্রা নির্দ্দিষ্ট হয় না। তিন রকম রীতির

কবিতা বাংলায় প্রচলিত। মাত্রা পদ্ধতির দিক দিয়া যে বাংলা ছন্দে তিনটি স্বতন্ত্র জাতি আছে এরূপ মনে করার কোন যৌক্তিকতা নাই।"[৩৪] রবীন্দ্রনাথ "তিন জাতের ছন্দের" কথা বলেচেনঃ "ছন্দকে মোটের উপর তিন জাতে ভাগ করা যায়। সমচলনের ছন্দ, অসমচলনের ছন্দ এবং বিষম চলনের ছন্দ। দুই মাত্রার চলনকে বলি সমমাত্রার চলন, তিন মাত্রার চলনকে বলি অসমমাত্রার চলন এবং দুই-তিনের মিলিত মাত্রার চলনকে বলি বিষমমাত্রার ছন্দ।"[৩৫] এখানে 'জাত' শব্দটির অর্থ "প্রকার, শ্রেণী, যেমন 'ছোট জাতের আম'"।[৩৬] এ-বিভাগ মৌলিক—বল, স্বর ও স্বন-ভিত্তিক। তাই এ রীতিগোত্রীয় হলেও, জাত-ঘেঁষা, কেননা এখানে আছে উচ্চারণের রকমফের অর্থাৎ দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত।

চারুকলা দু'ভাগে বিভাজ্য—নমনীয় (plastic) ও স্পন্দশীল (rhythmic)। প্রথমের অন্তর্ভুক্ত হলো স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রবিদ্যা ; আর দ্বিতীয়ের মধ্যে পড়ে নৃত্য, গীত ও কাব্য। এদের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমত, নমনীয় কলা দর্শকের উপভোগ্য হ'য়ে ওঠে এর সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে এবং দ্বিতীয় কোন শিল্পীর সহায়তার দরকার হয় না। কিন্তু স্পন্দশীল কলায় মূল শিল্পী বাদে আরেকজন দ্বিতীয় বা নির্বাহী (executive) শিল্পীর প্রয়োজন হয়। তাই সংগীত চায় গায়ক, মূকাভিনয় নর্তক ও কবিতা পাঠক। দ্বিতীয়ত, কালের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই নমনীয় কলার ; কিন্তু স্পন্দশীল কলা কালসর্বস্ব। নাচে আছে দেহবিচলনের অনুক্রম, সংগীতে অস্ফুট ধ্বনির পারম্পর্য আর কাব্যে বর্তমান ধ্বনি, বা শব্দ ও অক্ষরের পর্যায়। সর্বশেষে নমনীয় কলায় নেই কোন ধ্বনি যেমন আছে স্পন্দশীল কলায়।[৩৭] কবিতা ও গান তাই এক গোষ্ঠীতে পড়ে—কবিতা কথা-প্রধান, আর গান সুর-প্রধান। গীতক্রিয়ার কাল অর্থাৎ যে-সুরে গান হয় তা পরিমিত বা অপরিমিত হতে পারে। অপরিমিত কালব্যয়ে আসে 'কথকতা' বা 'আলাপ' ; কিন্তু যে গীতে কালের পরিমাণ থাকে তাই 'গান' ; গীতে আদ্যোপান্তে কালপরিমাণের নিয়ম সমান রাখাকে 'লয়' বলে। এই 'লয়'-কে অর্থাৎ কাল পরিমাণের তুল্যতাকে রক্ষা ও শাসন করাই 'তালে'র উদ্দেশ্য—গানক্রিয়ার লয় প্রদর্শন করাকে 'তাল' বলে। লয়প্রকাশের জন্যে গানের কোন কোন অক্ষর সবলে উচ্চারণ কর্তে হয় আর এই বলবৎ উচ্চারণই প্রস্বন বলে পরিচিত। এক করতলের উপর অপর করতলের আঘাতে অর্থাৎ 'কর-তালি' দিয়ে ঐ প্রস্বন দেখান হয় বলে, গানকালের ঐরূপ পরিমাণ করার নাম তাল। কিন্তু গানকালের সম-পরিমাণ অসংখ্য প্রকারে করা যায় অর্থাৎ কিনা ছন্দ অসংখ্য প্রকার। যে আদর্শ কালের অনুপাতানুসারে ঐ পরিমাণের সমতা হয় এবং যার গণনানুসারে ছন্দের বিভিন্নতা

জন্মায়, সেই কালের নাম 'মাত্রা'। যেহেতু মাত্রার সমপরিমাণাসুরে সকল কালই বিভক্ত হয়, তাই মাত্রাই লয়। উদাহরণে বিষয়টি পরিস্ফুট হবে। যদি ১–২–৩–৪ এই চারটি অঙ্ক সমান-সমান কালে উচ্চারণ ক'রে এবং ১-এর উপর প্রস্বন ও তালি দিয়ে এদেরকে চারবার আবৃত্তি করা যায়, যেমন—

/   /   /   /
১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ | ১ ২ ৩ ৪ তাহলে একটি ছন্দের উদ্ভব হবে। প্রত্যেক প্রস্বন বা তালির কাল সমান চার ভাগে বিভক্ত হয়েচে বলে, প্রত্যেক ভাগ অর্থাৎ প্রত্যেক অঙ্ক ঐ ছন্দের মাত্রা—ছন্দটির মাত্রা সমষ্টি ষোল এবং একে বলা হয় 'চতুর্মাত্রিক' ছন্দ। মনে রাখতে হবে যে মাত্রাকালের কোন নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ নেই; তবে কেবল একটি নিয়ম এই যে যখন যে পরিমাণে তা স্থায়ী করা যাবে, তাই-ই থাকবে ছন্দের আদ্যোপান্তে সমান ও অখণ্ড। উক্ত ১ ২ প্রভৃতি স্থানে বর্ণ উচ্চারিত হলে গানের মতো হয়। গানের অক্ষর নানারূপে লঘু-গুরু হয়। গানের কলি তুল্য পরিমাণে বিভক্ত, যেহেতু তুল্য কাল হলে শ্রোতা গানের কিম্বা গতের পিছনে-পিছনে যেতে পারে। তবে এ-তুল্য বিভাগে গান একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে; ফলে নতুনত্ব বা বৈচিত্র্যের জন্যে ছন্দের উদ্ভব হয়েচে। প্রত্যেক ছন্দে কালের তুল্যতা রক্ষিত হয় যেমন, তেমনি কালক্রিয়ার বৈচিত্র্য ও সম্পাদিত হয়। তাই ছন্দের সংজ্ঞা হলো এই ঃ পরিমিত মাত্রাবিশিষ্ট রচনার মধ্যে ক্রিয়া বারম্বার লঘু-গুরু হয়ে মাঝে মাঝে নিয়মিত কালান্তরে প্রস্বন দিয়ে বিভক্ত হলে তাকে 'ছন্দ' বলে। যেমন 'সম্ভাবশতকে'র লঘু ত্রিপদী ছন্দের তালি ও মাত্রা সাজান যায় এ-ভাবে ঃ "করিব বলিয়া, রহিলে বসিয়া করা কভু নাহি হয়"—



৩৮

গানের ছন্দ সুরশূন্য বাক্যে উচ্চারিত হলে তা কাব্যছন্দের মতো শুনায়। তাই কবিতার ছন্দ ও সঙ্গীতের তাল এই দু'য়ের মূল নিয়ম একই প্রকার। অর্থাৎ পদ্যেও আছে লয়, তালি বা তাল এবং মাত্রা। কবিতায় থাকে কথা, গানে সুর। কথা ছন্দে বাঁধা পড়লে সে হয় কবিতা। কিন্তু এ কেবল বাইরে বাঁধন, অন্তরে মুক্তি। কথাকে তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হলো সেই তার-বাঁধা সেতার, কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। ধনুকের সে ছিলা, কথাকে সে তীরের মতো লক্ষ্যের মর্মের মধ্যে প্রক্ষেপ করে। কিন্তু গানের সুর একটি

বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে। কথা যেমন অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর তেমন নয়, সে আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনিবেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে।[৩৯] জীবনের বাহন হিসেবে ভাষা মানুষের মুখে কথা হয়ে উঠলে দেখা যায় সে বিচ্ছিন্ন ধ্বনি বা শব্দ উচ্চারণ করেনা, কিন্তু উচ্চারণ করে ছোট বড়ো অগণিত বাক্য। এককেটি ছোট শব্দ ও স্থান বিশেষে এক একটি বাক্য হতে পারে। বাক্য অর্ন্তনিহিত ধ্বনি সমন্বয়ে গড়ে ওঠে ও মুখ-নিঃসৃত হতে গেলেই অবিরল ধ্বনি স্রোতের সৃষ্টি হয়। এর প্রতিবিম্বন পৃথক্ পৃথক্ হরফে করা যায় না—কয়েকটি হরফের সাহায্যে এককেটি শব্দের রেখাচিত্র নির্মাণ করা হয়। এতে হরফের পরে না হোক প্রত্যেকটি শব্দের পরে আন্তর শব্দফাঁক (interword space) রাখা হয়। তবে কবিতা আবৃত্তিতে, বক্তৃতায়, কি লেখা পড়তে মানুষ যখন শুরু করে তখন শ্বাস বা স্বার্থপর্বের বিরাম ছাড়া দুই শব্দের মাঝখানে আর কোন ফাঁক থাকে না। আর একটি মনোভাব সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ না করে কিংবা একটি প্রয়োজন না মিটিয়ে সে থামে না। ফলে গোটা বাক্য এবং ক্ষেত্র বিশেষে বাক্যাংশ ভাষার একক হয়ে দাঁড়ায়। এ-দিক থেকে বাক্যই ভাষার বৃহত্তম একক, এবং অক্ষর নিম্নতম একক। বাক্য ও অক্ষরের মাঝখানের একক হলো এককেটি শব্দ। একটি অক্ষর শব্দ হতে পারে, একটি শব্দও বাক্য হতে পারে। কিন্তু পৃথকভাবে উচ্চারিত হলে ধ্বনি যে সংজ্ঞা লাভ ক'রে স্বেমহিম্নি পরিস্ফুট হয়ে ওঠে, অক্ষর, শব্দ ও বাক্য ব্যবহৃত হলে পূর্ব ও পরবর্ত্তী ধ্বনির কিছু না কিছু গুণ তার বিশিষ্ট রূপে সংক্রামিত হয়। অর্থাৎ ভাষাতরঙ্গ থেকে সংগৃহীত হয় এই অক্ষর, শব্দ, বাক্য প্রভৃতি।[৪০]

অক্ষর ও শব্দের তাই আছে দুটি রূপ—স্বতন্ত্র ও ছান্দস (prosodic)। বাক্-প্রবাহ অক্ষরতার স্বাতন্ত্র্য হারিয়ে একটানা রৈখিক ভাবে আপনাকে প্রকাশ করে। বাক্য গড়ে ওঠে শ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে উচ্চারিত অগুন্তি তরঙ্গ-ভঙ্গিজাত স্বতন্ত্র ধ্বনি বা ধ্বনি গুচ্ছে। এ তরঙ্গভঙ্গির প্রত্যেকটি-ই অক্ষর। বাক্প্রবাহে একটি অক্ষর শ্বসনের এক প্রয়াসে উচ্চারিত হয় বলে ঐ শ্বসন-নিষিক্ত যাবতীয় গুণই সমগ্র অক্ষরে বর্তায়। অক্ষর উচ্চারণের এই সামগ্রিক গুণকেই বলা হয় ছান্দসিকতা (prosody)। Whitney তাই প্রস্ফুটনের (articulation) সংজ্ঞা দিয়েচেন এ-ভাবে ঃ "প্রস্ফুটন জন্ম নেয়, স্বতন্ত্র ধ্বনি-উৎপাদন রীতিতে নয়, কিন্তু বাক্-প্রকাশের উদ্দেশে তাদের সংযোজন রীতিতে।" বস্তুত প্রস্ফুটনের ইংরেজি প্রতিরূপ শব্দটি এসেচে লাতিন articulationem (articulare) থেকে, যার অর্থ ছিলো ১৫৯৭ সালে

সংযুক্তি প্রণালী। এথেকে ১৬১৫-সালে অর্থ দাঁড়াল উচ্চার্যস্বর (articulate voice) ; ১৭১১ সালে উক্তি বা বাক্ ; আর ১৭৬৪ সালে উচ্চার্যধ্বনি, বিশেষত ব্যঞ্জন ধ্বনি।[৪১] এ-পরিপ্রেক্ষিতে Firth মনে করেন যে বাক্প্রবাহক্রমিক (syntagmatic) দৃষ্টিকোণ থেকে যে-কোন ধ্বনিক লক্ষণকে বাক্য বা শব্দের ছান্দসিকতায় প্রকাশ করা যায়। উপান্ত্য প্রচাপ বা সংযোজক যুগ্মীভবন (gemination) ছান্দস লক্ষণ। কাজেই শব্দের ধ্বনিক ও ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে—ধ্বনি ও ছন্দোপ্রকরণ। শব্দের আক্ষরিক প্রচাপ বা ছান্দসিকতার সঠিক ভাষান্তর হল জীবন্ত রূপ (anima vocis), অর্থাৎ শব্দের আত্মা, শ্বাস ও জীবন। গীতল মতবাদকে উপযোগী করে ছন্দোতত্ত্ব তৈরি হতে পারে। অক্ষরকে একটি স্পন্দ বা স্বরকম্প মনে করা যেতে পারে এবং শব্দ বা শব্দাংশকে দণ্ডদৈর্ঘ্য বা স্পন্দগুচ্ছ, যারা পরস্পর দৈর্ঘ্য, প্রচাপ, সুর, বাচ্যগুণ ও অনুনাসিকতার নির্দ্দিষ্ট আন্তঃসম্পর্কে সম্পর্কিত। এই সূত্রের নাম হলো অক্ষরের আন্তঃসম্পর্ক, যা বাক্প্রবাহক্রমিক সম্পর্ক বলে অভিহিত। এ স্বর-ব্যঞ্জনতন্ত্রীয় ধ্বনির পদক্রমিক (paradigmatic) বা বিভেদক সম্পর্কের পরিপন্থী, ধ্বনিতত্ত্বীয় পদক্রমিক রূপের প্রতিকূল, এবং ধ্বনির প্রাসঙ্গিক লক্ষণকে ধ্বনিমান এককের সহধ্বনি (allophone) ধরে বিশ্লেষণ প্রণালীর বিপরীত।[৪২] ছান্দসিক বিশ্লেষণ তাই পরিচালিত হয় ধ্বনিতাত্ত্বিক গড়নের স্বর ও ব্যঞ্জন উপাদানে অর্থাৎ C ও V এককে। ফলে সংজ্ঞানুসারে ধ্বনিত (phonic) উপাদানের অধিকাংশই ছন্দোপ্রকরণের বরাত দেয় ঃ ছন্দ একাধিক খণ্ডের নির্দেশ দেয় এবং তা যে কোন দৈর্ঘ্যের গড়ন হতে পারে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বাক্য হতে দীর্ঘতর গড়নের ছন্দ পাওয়া যায় না। কাজেই বিভিন্ন প্রকারের ছন্দ গড়ে ওঠে, যেমন অক্ষর ছন্দ, অক্ষর গোষ্ঠীর ছন্দ, বাক্মেল, বা বাক্যাংশ ছন্দ, এবং বাক্যছন্দ।[৪৩] স্বরভঙ্গি বাক্যছন্দের উপজীব্য ; বাক্মেল বা বাক্যাংশ ছন্দে আছে অবয়ব অক্ষরগুচ্ছের দৈর্ঘ্য, প্রচাপ ও সুরের পারস্পরিক সম্পর্ক ; এবং অক্ষর ছন্দের উপাদান দৈর্ঘ্য, সুর, প্রচাপ, তালব্যীকরণ, ওষ্ঠীভবন ইত্যাদি। এ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বাঙলায় অক্ষর, শব্দ ও বাক্যে সামগ্রিক উচ্চারণজাত ছ'প্রকারের ছান্দসিকতা লক্ষ্য করা যায়—(১) W-prosody বা সামগ্রিক ওষ্ঠীভবন ; (২) Y-prosody বা সামগ্রিক তালব্যীভবন ; (৩) V-prosody বা সামগ্রিক ঘোষীভবন ; (৪) H-prosody বা সামগ্রিক মহাপ্রাণীভবন ; (৫) N-prosody বা সামগ্রিক নাসিক্যীভবন ; ও (৬) R-prosody বা সামগ্রিক মূর্ধন্যীভবন।[৪৪]

পদ্যের বাক্প্রবাহিক চরণে দেখা যায় তিন রকমের চলন-বিভাগ। এ লয়েরই রকমফের—দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত (মহাভারত, ২।৪।৩৮)। এখানে 'পদ', 'তাল' ও

'লয়' (tempo) পরস্পর সম্পর্কিত এবং এ-কথা ভরতের নাট্য শাস্ত্রে কথিত আছে। অক্ষরযুক্ত যে কোন-কিছু 'পদ' নামে অভিহিত ঃ "যৎকিঞ্চিদক্ষর কৃতং তৎসর্বং পদসংজ্ঞিতম্" (৩২।২৯)। এই পদ স্বর ও তালের অনুভাবক বা নির্দেশক ঃ "পদং তস্য ভবেদ্ বস্তু স্বরতালানুভাবকম্" (৩২।২৮)। 'বস্তু' অর্থে বুঝায় অঙ্গ বা শাখা। কাজেই 'পদ', 'স্বর' ও 'তালে'র অপরিহার্য অঙ্গ। তাল হলো কালপ্রমাণ বিশেষ ঃ "ততঃ কালেন সংযুক্তো ভবেন্নিত্যং প্রমাণতঃ, গানং তালেন ধার্যতে" (৩১।৫২৭)। এই তালের অঙ্গ যতি, পাণি ও লয় ঃ "অঙ্গভূতা হি তালস্য যতিপাণিলয়াঃ স্মৃতাঃ" (৩১।৫৩০)। আর কাল বা সময়ের অন্তর অর্থাৎ ব্যবধানের নাম 'লয়' ঃ "কলা কালান্তর কৃতংস লয়ো নাম সংজ্ঞিতঃ" (৩১।৫৩৫)। দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত ভেদে লয় তিন প্রকার ঃ "ত্রয়ো লয়াশ্চ বিজ্ঞেয়া দ্রুতমধ্য-বিলম্বিতাঃ" (৩১।৫৩১)। Monier-Williams তাঁর A Sanskrit-English Dictionary (p. 903) তে "লয়" সম্পর্কে বলেচেন ঃ (In music) time regarded as of three kinds, viz, druta, 'quick,' madhya, 'mean or moderate' and vilambita, 'slow'। কেউ কেউ 'মধ্য'-এর পরিবর্তে 'ধীর' শব্দের আমদানি করেচেন এবং একে Monier-Williams-এর দোহাই দিয়ে সমর্থন করেচেন।[৪৫] এ ঠিক নয়, কেননা এতে 'মধ্য' শব্দের পারিভাষিক অর্থের দ্যোতনা নেই। তিন-প্রকার লয়ের অর্থ পাওয়া যায় "সঙ্গীতদর্পণে" ঃ

> দ্রুতো মধ্যো বিলম্বশ্চ দ্রুতঃ শীঘ্রতমো মতঃ।
> দ্বিগুণো দ্বিগুণো জ্ঞেয়ো তস্মান্মধ্য বিলম্বিতো ॥

অর্থাৎ দ্রুতের দ্বিগুণকালে মধ্য, এবং মধ্যের দ্বিগুণকালে বিলম্বিত। এক এক মাত্রায় একটি ক্রিয়া বা সুর উচ্চারিত হলে তাকে যদি 'মধ্য' বলা যায়, তাহলে সে-ক্রিয়াটি দু'মাত্রা ব্যাপক হলে হবে বিলম্বিত লয়; আর সেই একমাত্রার কালে দু'দুটি ক্রিয়া বা বর্ণ উচ্চারিত হলে, তাকে বলা হবে দ্রুত লয়। ভাষা কথায় এদের নাম ঠা, দুন ও চৌদুন। এককথায়, মধ্যের অর্ধকাল দ্রুতে এবং দ্বিগুণ-কাল বিলম্বিতে।[৪৬]

স্পন্দ কালাংশের এক বিশিষ্ট বিন্যাস। মনে-মনে ভাগ করে কাল মাপা হয় এবং হাততালি, কাঠি ঠোকাঠুকি বা ঢাকপিটুনি এ-কাজে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ঘড়ির টিক্‌টিক্ বা হাততালি কালের বিভাজন সূচিত করে। পুণরাবৃত্তি এর মোদ্দা কথা। তাই নিচে দুটি ছাঁচ দেখান হলো—

```
(ক)  ১২৩   ১২৩   ১২৩   ১২৩
     X . .  X . .  X . .  X . .
```

এখানে X-এ পড়েচে হাততালি।

```
(খ)  ১২   ১২৩   ১২   ১২৩   ১২   ১২৩
     X .  X . .  X .  X . .  X .  X . .
```

এখানে X-এ হাততালি। দুটি ছাঁচ আলাদা, কেননা (ক)-তে আছে প্রতি বিভাগে তিনটি গণনা (একটি তালিযুক্ত ও দুটি তালিশূন্য), যার ছাঁচ হলো ৩+৩। আর (খ)-এর নক্শা হলো ২+৩। অবিচ্ছিন্ন ক্ষণ সমষ্টির এই শ্রেণী হলো গীতল স্পন্দের সরল রূপ বা লয় ঃ আর তাল বা তালি এরকম নক্শার আবর্তক বিন্যাস। কাজেই তালের সারাৎসার এর চক্রিক বা আবর্তক প্রকৃতি। লয় ও তালকে কালপ্রবাহ ও সপ্তাহ-দিনের সঙ্গে তুলনা করা যায়। কালের প্রবাহ চলে রৈখিক রীতিতে ; কিন্তু এ-প্রবাহে উপরিপাতিত সপ্তাহের দিনগুলি।[৪৭] তাল চক্রিক আবর্তনে নিয়মিত অন্তরালে ফিরে আসে ঃ "ফিরে ফিরে আঁখিনীরে পিছু পানে চায়"। নদী ও নৌকার সঙ্গে তুলিত হতে পারে লয় ও তাল—একটির দিক অনুভূমিক, অন্যটি খাড়া ; একটি রৈখিক, অন্যটি বৃত্তাকার। লয়ের উপাদানে তাল তৈরি, কিন্তু তাদের দিক্ আলাদা। তালের গতি বিলম্বিত, মধ্য বা দ্রুত হতে পারে। দেহে নাড়ীস্পন্দ বিস্তারের মতো রচনাদেহে বিস্তৃত আছে তালের ঘাত। প্রত্যেক বারই স্পন্দ ফিরে আসে তার প্রথম ঘাতে বা তালিতে। কালের প্রকৃতিকে মনে হয় বৃত্তাকার, রৈখিক নয়। প্রারম্ভিক বাক্মেল ও ধুয়া বারবার প্রত্যাবৃত্ত হয় কিন্তু স্পন্দ সে-ভাবে ফেরে না, কেননা তাল স্পন্দ নয়। তাই যে-কোন দুই ব্যক্তির একইতাল, একই বিরতি (cadence) নেই। দু'জনের পক্ষে একই স্পন্দের পুনর্জনন সম্ভব, কিন্তু কখনোই এক তালের নয়। তালেরই আবর্তে আছে দুটি বিন্দু—সম্ ও খালি। প্রথমটিতে প্রবল ঘাত, দ্বিতীয়টিতে শূন্য ঘাত। ঘাতের সংখ্যায় মাত্রা নিরূপিত হয়। আবর্ত বা চক্র চলে বারে-বারে মাত্রা-নিষ্পেষণে—'সম্' বিন্দু পর্যন্ত সংকোচনে এবং পরে শ্লথনের বিস্ফারণে।[৪৮]

ইংরেজি tempo-র প্রতিশব্দ 'লয়'। আর ইংরেজি শব্দটি ১৭২৪ সাল হতে ব্যবহৃত হয়ে আস্চে ঃ tempo ব্যুৎপন্ন হয়েচে ইতালীয় শব্দ থেকে, যার মূল রয়েচে লাতিন tempus বা কাল-এ। সংগীতে তাই এর অর্থ হলো চলনের কাল বা দ্রুতি এবং বিশেষত এতে বুঝায় চলনের বিশিষ্ট দ্রুতি ও স্পন্দ। এর রূপকার্থ হলো ক্রিয়া বা গতির হার।[৪৯] গীতল চিন্তার ছোট ছোট এককগুলি নির্দ্দিষ্ট cadence বা তাল। সাহিত্যে বিরতির (punctuation) যে-স্থান, সঙ্গীতে cadence বা তালেরও সেই-স্থান। এই তাল প্রধানত দু'-রকমের হতে পারে—অন্ত্য ও মধ্য। প্রথমটি একটি বিভাগ বা পর্যায়ের শেষ সূচিত করে ; দ্বিতীয়টি বাক্মেল বা বাক্যাংশের সীমা নির্ধারণ করে।[৫০] তাল শব্দটি এসেচে 'তড়' ধাতু থেকে, যার অর্থ 'আঘাত করা'। তাইতো 'তাল' থেকে 'তালি', যেমন 'হাততালি' উদ্ভূত হয়েচে। এই 'তালের' সংজ্ঞা দিয়েচেন Velankar এ-ভাবে ঃ "(তাল হলো) আবর্তক বিরামের কাল উপাদানের

সহায়তায় ছান্দস চরণে প্রচাপ নিয়ন্ত্রণ"। এই বিরাম-নিয়ন্ত্রক প্রচাপ নির্দ্দিষ্ট হয় কণ্ঠ্য প্রস্বননে ; কিন্তু এ-ছাড়াও আছে হাততালি, বা দেহের অন্য কোন অংশের অনুরূপ বিচলন, অথবা করতাল বা ঢোলকের মতো কাল-নির্ধারক গীতযন্ত্রের ঘাত। সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দে এ-যতি অনিয়মিত কালান্তরালে পড়ে ; কিন্তু তালবৃত্ত ছন্দে এই বিরাম পুনরাবৃত্ত হয় 'মাত্রা'—নামধেয় নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক কালমুহূর্ত্তের শেষে। কাজেই তালবৃত্তের চরণ তালগণে বিভক্ত হয়ে যায় ঃ মাত্রাবাহী বর্ণে গড়ে ওঠে এই তালগণ এবং ছন্দোতালের প্রকৃতি অনুসারে দুটি প্রচাপিত বিরামের মধ্যে অস্তিমান। প্রতিটি তালকে পূর্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী তাল থেকে স্বতন্ত্র রাখা হয়। নির্বাক বা মৌনী বিরতিকেও কাজে লাগান হয়।[৫১] তাই তালি দিয়ে ছন্দের বিভিন্ন লয় ঠিক করা যায়। যেমন—৮+৮+১০ মাত্রায় বিভক্ত হয়েচে—

(১) তালি তালি

অঘ্রাণে শীতের রাতে | নিষ্ঠুর শিশিরঘাতে।

পদ্মগুলি গিয়াছে মরিয়া ॥

আবার ৫+৫+৫+৫ মাত্রায় ভাগ করা যায়, যেমন—

(২) তালি তালি তালি তালি

নন্দপুর | চন্দ্রবিনা | বৃন্দাবন | অন্ধকার

চার মাত্রার চলন, যেমন—

(৩) তালি তালি তালি তালি

আগাডুম্ | বাগাডুম | ঘোড়াডুম্ | সা-জে-

বাসাখানি | গায়েলাগা | আর্ম্মানী | গির্জার

এ কাহারবা তালের অনুরূপ। হিন্দুস্থানের সর্বত্রই সাধারণ লোকদের মধ্যে এ-তাল প্রচলিত। এরও দুটি মাত্র তালি এবং ধি-তে সম্। এর প্রচাপ প্রবল ; তাই প্রত্যেক মাত্রায় বর্ণ ব্যবহৃত হওয়ায় মাত্রায়-মাত্রায় তালি দিতে প্রবৃত্তি হয়। এর তালাঙ্ক ২/৪, যথা—

+ ২

২/৪ | ধি · ধি : কে · টে | না . ক : ধিন ॥

আর ছ'মাত্রার চলনও আছে, যেমন—

(৪) তালি তালি তালি তালি

বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদী এলো | বা-ন্

বা গিজতা গিজোড় | গিজ্‌তা গিজোড় | গিজ্‌তা গিজোড় | গাং

এ খেম্‌টা তালের অনুরূপ—এ ছন্দ তিন তিনটি হ্রস্ব মাত্রাবিশিষ্ট সমান চারিপদে

বিভক্ত। মাত্রাসমষ্টি বারো এবং তিন তিন মাত্রার অন্তরে প্রচাপ ও তালি পড়ে। এর তালাঙ্ক ১২/৮, যথা—

+ ৩ ০ ১
১২/৮ ধা : টে : ধে | না : তে : নে | তা : টে : ধে | না : ধে : নে ॥

এখানে প্রথম ধা-তে সম্ এবং তৃতীয় পদের তা-এর উপর ফাঁক। এর গতি দ্রুত এবং প্রত্যেক তৃতীয় মাত্রায় প্রচাপের আধিক্য থাকায় ফাঁক দিতে ইচ্ছে হয় না—সকল প্রচাপেই তালি মনে হয়।

উপরের উদাহরণ থেকে এটা সুস্পষ্ট যে চারটি চলনই স্বতন্ত্র। বৃহত্তম চলন ঘটেচে ৮ ও ১০ মাত্রায়। এর নাম 'পদ'। দ্বিতীয় চলন এসেচে ৫ মাত্রায়—এর নাম 'পর্ব'। তৃতীয় চলন দেখা যায় তৃতীয় ও চতুর্থ উদাহরণে। এর পদক্ষেপের নাম 'মেল', যা গঠিত হয়েচে অক্ষরকে কেন্দ্র করে: প্রচাপই এর বিশেষত্ব। 'মেল' শব্দটির ব্যুৎপত্তি এই: √মিল্ (মিলিত হওয়া)+অ (ঘঞ্—ভাববাচ্যে)। এতে বুঝায় আদিকুল, যেমন—বিবাহে কুলের মিল: 'ফুলিয়া মেল'। কীর্তনে সমস্ত গায়কের কণ্ঠ মিল করার জন্য সুর-ভাঁজা।[৫২] এ-থেকে আক্ষরিক মেল তৈরি করা হলো। ছন্দে তাই মেল—এ বুঝায় অক্ষর-সমষ্টির মিলন যা প্রচাপ-নির্ভর। বাক্-প্রবাহের উক্তি তাই বিভক্ত হয়েচে তিন বিভাগে: পদ, পর্ব ও মেল-এ। আর এ-বিভাগ বিরাম-নিয়ন্ত্রিত—পদবিরাম; পর্ববিরাম; মেলবিরাম। প্রথম উদাহরণে পদবিরাম এসেচে ৮ ও ১০ মাত্রায়; দ্বিতীয়ে পর্ববিরাম ৫ মাত্রায়; আর তৃতীয়ে ও চতুর্থে মেলবিরাম ৪ ও ৬ মাত্রায়। তিনটি বিরামের নামও আলাদা। যথা, ছেদ, যতি ও বিরাম। ধ্বনি ও মৌন এই দুয়ে মিলে রচিত হয়েচে স্পন্দ। পদ, পর্ব ও মেল-এর মূল হলো ভরকেন্দ্র (centroid)। অর্থাৎ শ্বাসকে কেন্দ্র করে যে প্রবাহ চলে তার মূলে কাজ করে প্রচাপ। প্রধানত এ পড়ে পদ, পর্ব ও মেল-এর আদিতে। এককথায় এ প্রচাপ ও ত্রিধা উচ্চারণ তিন রকমের হতে পারে। ইতালীয় নামের অনুরূপ এদের নামকরণ হতে পারে forte (ফোর্তে), piano (পিয়ানো) ও mezzo (মেজ্জো)। মেলে এ হবে স্ফীত (forte), পর্বে মধ্য (mezzo) ও পদে পেলব (piano)। ইতালীয় শব্দগুলির মূল লাতিন হলো fortis, planus ও medius। আর স্ফীত, মধ্য ও পেলব শব্দগুলিও একই প্রাচীন ধাতু থেকে ব্যুৎপন্ন হয়েচে।[৫৩]

এখানে স্মর্তব্য যে ছান্দসিক বিশ্লেষণের উপাত্ত লিখিত মূলগ্রন্থ নয়, কিন্তু আদর্শ মৌখিক রূপায়ণ। কিন্তু প্রত্যেক রূপায়ণই মূলগ্রন্থ নির্দেশিত বিধির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং রূপায়ণকে বিচার কর্তে হবে সে কতটা মূলানুগ হয়েচে। এ বিচারের মানদণ্ড হবে ভাষার প্রচলিত প্রথা ও লেখকের প্রয়োগ

রীতি। রূপায়ণ মূল-নিষ্কাশিত বিধির বিমূর্তন বলেই ছান্দসিক বিশ্লেষণ হবে এরি বর্ণনা এবং এরি অন্তর্গত হবে সম্ভাব্য একাধিক রূপায়ণ। অধিকাংশ ছান্দসিক মূল একই ছন্দোলিপির মধ্যে বিভিন্নভাবে পঠিত হতে পারে ; আবার বহু মূলকে পাঠের সময়ে সম্ভাব্য একাধিক ছান্দস সংগঠনে উপস্থাপিত করা যেতে পারে।[৫৪] এ-কথা বুঝতে না-পারায় এক ছান্দসিক মন্তব্য করেচেন যে, "প্রস্তাবিত ত্রিধা বিভাগ স্বীকার করিলে অনেক বাংলা কবিতাই ছন্দের রাজ্য হইতে বাদ পড়ে।" আর এরি সমর্থনে তিনি নিচের উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করতে চেয়েচেন যে এখানে "কোন বৃত্তের নিয়ম খাটে না" ঃ

বৃষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর | নদেয় এল | বান
শিব ঠাকুরের | বিয়ে হল | তিন্ কন্যে | দান।[৫৫]

এ ছন্দোলিপি তিনি করেচেন প্রতিপর্বে ৪-মাত্রা ধরে। কিন্তু একে রবীন্দ্রনাথ ধরেচেন ৬-মাত্রা ঃ এটা তিন মাত্রার ছন্দ। অর্থাৎ চার পোয়ায় সেরওয়ালা এর ওজন নয়, তিন পোয়ায় এর সের। এর প্রত্যেক পা-ফেলার লয় হচ্চে তিনের—

বৃষ্টি পড়ে— | টাপুর টুপুর | নদী এল— | বা-ন
শিবঠা·কুরের | বিয়ে— হবে— | তিন্‌ক·ন্নে— | দা-ন।

তিন গণনায় যেখানে-যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েচে।[৫৬]

৬.৩ নিরুক্তি

যে-কোন বৈজ্ঞানিক সমালোচনায় পরিভাষার জ্ঞান আবশ্যিক। ছন্দ আলোচনায় এ জরুরি। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে ছন্দশাস্ত্রে এখনো কোন নির্দিষ্ট সর্বজন-গ্রাহ্য পরিভাষা তৈরি হয়নি। ইংরেজি ছান্দসিক George Saintsbury তাই বলেচেন ঃ "এ-যাবৎ (ইংরেজি ছন্দো প্রকরণের উপর) কোন সত্যিকার প্রামাণ্য গ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি এবং এর কারণ এই যে এ-বিষয়ের মৌলসূত্র বা পরিভাষা সম্পর্কে কোন সর্বজন সম্মতি কোনদিন ছিল না বা বর্তমানেও নেই। ফলে ভুল বোঝাবুঝি ছাড়া এ-নিয়ে লেখার মতো আর কোন বিষয় এত কষ্টকর নয়।"[৫৭] উপলব্ধি সহজ করার উদ্দেশে সংজ্ঞা নিরূপণ করা গেলো নিচে।

(১) অক্ষর (syllable)—ভাষার দুটি রূপ আছে—লেখ্য ও শ্রুত। লেখ্যরূপ দৃশ্যরূপের নামান্তর। তাই একটি চোখের ভাষা (eye language),

অন্যটি কানের ভাষা (ear language)। আবার ভাষাদেহ ধ্বনিতে তৈরি। এরও আছে দু'টি দিক—শারীরবৃত্তীয় (physiological) ও শ্রৌত (acoustic)। ধ্বনি নিজে উচ্চারণ ক'রে নিজে শোনা যায় যেমন, তেমনি অপরকেও শোনানো যায়। আর ধ্বনি উচ্চারণ ফুস্‌ফুস্‌-তাড়িত বায়ুর সাহায্যেই কর্তে হয়। ফুস্‌ফুস তাই ধ্বনির জনিত্র (generator)। ফুস্‌ফুস সমমাপের ছোট-ছোট শ্বাসক্ষেপণের সঙ্গে বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টি করে এবং ধ্বনিপ্রবাহের মধ্যে একেকটি ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছই একেকটি অক্ষর বা syllable হিসেবে গণ্য হয়। কাজেই নিশ্বাসের স্বল্পতম প্রয়াসে একই বক্ষঃস্পন্দনের (single chest-pulse) ফলে যে ধ্বনি বা ধ্বনিগুচ্ছ একবারে উচ্চারিত হয় তাকেই অক্ষর বলে। যেমন, ও, এ কিংবা বাক্‌, কি প্রভৃতি।

তবে অক্ষর (syllable)-এর সঙ্গে ধ্বনি (sound বা phone)-র পার্থক্য আছে। ব্যবহারিক দিক থেকে ধ্বনি স্বয়ংসম্পূর্ণ অবিভাজ্য একটি ছোট একক; আর অক্ষর এক বা একাধিক ধ্বনি সমবায়ে গঠিত এবং তা আবার বিভাজ্যও হতে পারে। ফুস্‌ফুস্‌-নির্গত বায়ুর একবারের ধাক্কায় এ, ও, ই, উ প্রভৃতির উৎপত্তি যেমন সম্ভব, তেমনি কয়েকটি ধ্বনি মিলে একটি শব্দ (word) সৃষ্টি হতে পারে, যথা বাক্‌, চোখ্‌ ইত্যাদি, অথবা শব্দখণ্ড যেমন আ | বার, প্র | মাণ প্রভৃতি। যদি শুধুমাত্র একটি ধ্বনি উৎপন্ন হয়, তবে তা হবে একটি স্বন (phone) বা ধ্বনি (sound), যথা, ক্‌, এ ইত্যাদি। এ-ভাবে গঠিত হয়ে একটি স্বরধ্বনি ক্ষেত্রবিশেষে একটি অক্ষরও হ'তে পারে, যেমন 'এ তোমার সাজেনা'—র 'এ'। আবার কয়েকটি ধ্বনির সমবায়ে অক্ষর গঠিত হতে পারে, যেমন, ব্‌+আ+ক্‌=বাক্‌। প্‌+আ=পা প্রভৃতি।[৫৮] কেউ-কেউ অক্ষরের পরিবর্তে 'দল'—ব্যবহারের পক্ষপাতী। এ সম্বন্ধে অষ্টম অধ্যায়ের 'অক্ষর বনাম দল' দ্রষ্টব্য।

সাধারণত অক্ষর স্বরভিত্তিক। তবে পর্যাপ্ত প্রাধান্য (prominence) সহকারে উচ্চারিত হলে ব্যঞ্জন ও স্বতন্ত্র অক্ষর হতে পারে। আর প্রাধান্যই অক্ষরের ভিত্তি, শুধুমাত্র অনুনাদ (sonority) নয়। এই প্রাধান্যের আছে তিনটি উপাদান—দৈর্ঘ্য, শ্বাসবল ও অনুরণন বা অনুনাদ। অবশ্য স্বরের তুলনায় ব্যঞ্জনের অনুরণনশীলতা কম। তা সত্ত্বেও যদি অন্য দু'টি অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও শ্বাসবল-এর একটি বা উভয়ই উচ্চারণে প্রবল হয়, তাহলে ব্যঞ্জন একটি স্বতন্ত্র অক্ষর গঠনে প্রধান হয়ে উঠবে, যেমন জাপানী ভাষার k̩ra' (অর্থাৎ ঘাস)-এর 'k' ও 'm̩a' (ঘোড়া)-এর 'm'[৫৯]; আর বাঙলায় 'তুমি একথা বলছো'! 'ম্‌'-এর 'ম'।[৫৮] অনুনাদ হলো বহন-ক্ষমতা (carrying capacity)। ধ্বনির এই বহন-ক্ষমতা অন্তর্নিহিত গুণ বা রূপের (tamber) উপর নির্ভর-

শীল। কাজেই এ প্রাধান্য থেকে স্বতন্ত্র, কেননা প্রাধান্য নির্ভর করে গুণের সঙ্গে দৈর্ঘ্য, চাপ ও স্বরভঙ্গির উপর। স্বর ও ব্যঞ্জনের পার্থক্য শ্রৌত বিবেচনার অধীন অর্থাৎ বিভিন্ন ধ্বনির আপেক্ষিক অনুরণন বা বহন-ক্ষমতার উপর নির্ভরশীল। তাই দৈর্ঘ্য ও চাপ ধ্রুব হলে এবং স্বরভঙ্গি অনুভূমিক (level) থাকলে স্বর অঘোষ ব্যঞ্জনের তুলনায় প্রধানতর; মুক্তস্বর বদ্ধস্বরের চেয়ে প্রধানতর; অঘোষ ব্যঞ্জনের চেয়ে ঘোষ ব্যঞ্জনের প্রাধান্য অধিকতর; ল—ধ্বনি ও ঘোষ নাসিক্য ব্যঞ্জন অন্যান্য ঘোষ ব্যঞ্জনের চেয়ে প্রধানতর। মনে রাখতে হবে যে অধিকতর অনুনাদশীল ধ্বনি প্রাধান্য হ্রাসে ব্যঞ্জনকল্প হতে পারে; আর এ ঘটে দৈর্ঘ্য বা চাপের হ্রাসে; এবং আপেক্ষিকভাবে কম অনুনাদশীল ধ্বনির দৈর্ঘ্য বা চাপ বাড়িয়ে প্রধান করা যেতে পারে। কাজেই ধ্বনি প্রাধান্য ঘটতে পারে অন্তর্নিহিত অনুনাদে, দৈর্ঘ্যে, চাপে, বিশেষ স্বরভঙ্গিতে বা এদের সমবায়ে। প্রত্যেক বাক্যে আছে প্রাধান্য-তরঙ্গ, যা শ্রতারা ধর্তে পারে। এই তরঙ্গকে মনে করা যায় একটি তরঙ্গিত রেখা রূপে, যার শীর্ষ প্রাধান্য—গরিষ্ঠ, আর খাদ প্রাধান্য - লঘিষ্ঠ। শব্দে বা বাক্যাংশে (মেলে) এই শীর্ষ গোণা যায়। তাই শীর্ষ গঠনকারী ধ্বনিকে বলা হয় আক্ষরিক (syllabic); আর শব্দ বা মেল-এ থাকে এই শীর্ষসংখ্যা অনুসারে অক্ষরসংখ্যা, যথা button-hook-এর শীর্ষসংখ্যা ৩, অক্ষর সংখ্যাও তিন, আর ধ্বনি হলো u, n ও oo[৮০]।

(২) অতিমাত্রা (hypermetric)—এ গ্রীক hupermetros-এর প্রতিশব্দ। Huper উপসর্গে বুঝায় 'অতিক্রান্ত'; আর metros→metron-এর অর্থ মাত্রা বা মান।[৮১] কাজেই hypermetric-এর প্রতিশব্দ 'অতিমাত্রা' অর্থাৎ যা মাত্রাতিরিক্ত বা মাত্রা পেরিয়েচে। বাঙলা 'অতি' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েছে এ-ভাবে: √অৎ (নিয়ত গমন করা) + ই কর্তৃবাচ্যে, যার অর্থ আধিক্য। 'অতিমাত্রা' শব্দটির অর্থ, যে মাত্রাকে অতিক্রম করেচে: অতি (অতিক্রম) + মাত্রা, দ্বিতীয়া তৎপুরুষ। আবার এ বহুব্রীহিও হতে পারে, যেমন, অতিক্রান্ত মাত্রা হয়েচে যৎ কর্তৃক।[৮২] ছন্দে এ প্রযুক্ত হয় সাধারণত চরণের শেষে অতিরিক্ত অক্ষর বুঝাতে, যেমন শেক্সপীয়রের Hamlet-এ: To be or not to be : that is the question। প্রাচীন ছন্দে এতে বুঝাত এমন চরণ, যেখানে অন্ত্য অক্ষর লোপ পেত পরবর্ত্তী চরণের আদিতে প্রারম্ভিক স্বরের আগে। এ ছাড়া নিয়মিত ছান্দসিক রূপকল্পে আবির্ভূত অপ্রত্যাশিত অক্ষরকেও বুঝায়।[১৮] এর উদাহরণ আছে, যেমন সত্যেন্দ্রনাথের—

/ |
(এল) উতলা হাওয়া (ফুল) পলক নিয়ে
| |
(ক্ষীর) সাগর জলে (আলো) ঝলক দিয়ে !

এখানে মধ্যবর্তী বন্ধনীযুক্ত 'ফুল' ও 'আলো' অতিমাত্রা ; কিন্তু আদ্যের 'এল' ও 'ক্ষীর' অধিছন্দ। চরণান্তিক 'অতিমাত্রা' হলো :

/ / / / /
আয় আয় সই | জল আনিগে | জল আনিগে | চল্

এর 'চল্' অক্ষর। বস্তুত যাকে খণ্ডপর্ব বলা হয়েচে এ তাই।

মনে রাখতে হবে যে 'অধিছন্দ' আর 'অতিমাত্রা' এক নয়। এ-সম্বন্ধে সঠিক জ্ঞানের অভাবে দুই-কে এক বলে প্রতিভাত হতে পারে। আর এক প্রবীন ছান্দসিকের হাতে হয়েচেও তাই। সত্যেন্দ্রনাথের উক্ত বন্ধনীযুক্ত আদ্য ও মধ্যের সব অক্ষরকেই তিনি hypermetric বলেচেন : "বন্ধনীর মধ্যে যাহা আদি তাহা ছন্দাতিরিক্ত (hypermetric)"।[৬৩] বলা বাহুল্য যে এখানে আদ্যের বন্ধনীযুক্ত শব্দগুলি 'অধিছন্দীয়' ; কিন্তু মাঝখানের বন্ধনীযুক্ত শব্দগুলি 'অতিমাত্রিক'।

(৩) অধিছন্দ (anacrusis)—ইংরেজি anacrusis শব্দটি এসেচে গ্রীক ana-krousis হতে। ana উপসর্গে বুঝায় 'উপরি' (up) যার krousis উৎপন্ন হয়েচে krouo থেকে, এবং অর্থ হলো আঘাত বা ঘা দেওয়া। কাজেই এর অর্থ 'উপরি ঘাত' অর্থাৎ কিনা ঘা-দিয়ে সুরোৎপাদন। সংগীতে তাই এতে বুঝায় প্রথম দণ্ডপংক্তির পূর্ববর্তী চাপশূন্য স্বরকে ; ছন্দে এর অর্থ দাঁড়ায় চরণাদ্যের চাপ শূন্য অক্ষর। অর্থাৎ কবিতায় এ হলো মূল ছন্দের আদিতে চরণারম্ভিক অতিরিক্ত অক্ষর। চরণের বহির্ভূত বলে এ অক্ষরগুলি সঠিক ছন্দের অঙ্গ নয়।[৬৪] এরি বাঙলা প্রতিশব্দ হলো 'অধিছন্দ'। 'অধি' ব্যুৎপন্ন হয়েচে এ-ভাবে : ন = অ + √ধা (ধারণে) + ই কর্তৃবাচ্যে। এর অর্থ : যে অভিধা সম্বন্ধে অর্থকে ধারণ করে না, কারণ এ উপসর্গদ্যোতক, কিন্তু বাচক নয়। এতে অধিকারও বুঝায়, যেমন ঘনরাম চক্রবর্তীর "ধর্মমঙ্গলে"—"কোন জনে করে অধি রবি যতক্ষণ / প্রকাশে যামিনী যোগে যেমন মদন"[৬৫]। লাতিন (ইংরেজি) ad উপসর্গের এ সমতুল, যার অর্থ 'বৃদ্ধি' বা 'যোগ'।[৬৬] কাজেই 'অধিছন্দের অর্থ ছন্দাতিরিক্ত শব্দ বা অক্ষর। যেমন,

/ / /
কৃষ্ণ কলি | আমি তারেই | বলি

/ / / /
(যারা) নিত্য কেবল | ধেনু চরায় | বংশীবটের | তলে

এখানে বন্ধনীর মধ্যেকার 'যারা' অধিছন্দের উদাহরণ।

কোন কোন ছান্দসিক 'অধিছন্দের' পরিবর্তে 'অতিপর্ব' ব্যবহারের পক্ষপাতী।[৬৭] এ ঠিক নয়, কেননা এতে নেই anacrusis-এর দ্যোতনা।

শব্দটির সম্পর্ক গোটা 'চরণ' বা ছান্দসিক পংক্তির সঙ্গে, কিন্তু বিভক্ত 'পর্বে'র সঙ্গে নয়। চরণকে বাদ দিলে অতিরিক্ত অক্ষরের কোন মূল্যই থাকে না। ফলে এমন একটি শব্দের প্রয়োজন যা এই ছান্দসিকতা ধর্তে পারে। আর এ দাবি পূরণ করে অধিছন্দ। তাই এ ব্যবহার্য, কেননা 'অতিরিক্ত' বুঝাতেও ব্যবহৃত হয় 'অধিমাস', 'অধিবাস' প্রভৃতি।

(৪) অমিত্রাক্ষর (blank verse)—শব্দটির উদ্ভাবয়িতা মাইকেল মধুসূদন দত্ত, যিনি এর ব্যবহার করেন তাঁর "মেঘনাদবধ কাব্যে"র মঙ্গলাচরণে (২২ পৌষ, ১২৬৭)। এ ইংরেজি Blank verse এর প্রতিশব্দ। রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত চিঠিতে কবি এর ব্যাখ্যানে বলেন: "অষ্টম অক্ষরে যতি আবন্ধ না থেকে এ স্বাভাবিকভাবে আসে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ অক্ষরের শেষে, আর উদাহরণ দিয়েচেন "মেঘনাদবধ" (২য় সর্গ, ৩৩০-৩১ পংক্তি) থেকে: "চল রঙ্গে মোর সঙ্গে | নির্ভয় হৃদয়ে | অনঙ্গ"।[৬৮] এখানে লক্ষণীয় যে মাইকেল 'অক্ষর' শব্দটি ব্যবহার করেচেন, কিন্তু 'বর্ণ' নয়। ছন্দের ধাচ তানবৃত্ত এবং এর গড়ন সাধারণত ৮+৬ এ। এই পদক্ষেপ ৮-এ অর্থাৎ ৮-এর শেষে বা পদান্তে যতি পড়বে আর চরণান্তেও অর্থাৎ ৮+৬ এ। তাই তিন অক্ষরের শেষে যতি পড়েচে এবং অর্থেরও বিরতি ঘটেচে। এ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেচেন: "একদা নিয়মিত অংশে বিভক্ত ছন্দই সাধু কাব্যভাষায় একমাত্র পাঙ্‌ক্তেয় বলে গণ্য ছিল। আমাদের কানের অভ্যাসও ছিল তার অনুকূলে। তখন ছন্দে মিল রাখাও ছিল অপরিহার্য। এমন সময়ে মধুসূদন বাংলা সাহিত্যে আমাদের সংস্কারের প্রতিকূলে আনলেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তাতে রইল না মিল। তাতে লাইনের বেড়াগুলি সমানভাবে সাজান বটে, কিন্তু ছন্দের পদক্ষেপ চলে ক্রমাগতই বেড়া ডিঙিয়ে। অর্থাৎ এর ভঙ্গি পদ্যের মতো, কিন্তু ব্যবহার গদ্যের চালে। অমিত্রাক্ষর ছন্দ তার যতিভাগের অমিতি এবং মিলের অভাব সত্ত্বেও কাব্যের পঙ্‌ক্তিতে চলে গেছে।"[৬৯] এখানে দু'টি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েচে—যতিভাগের অমিতি ও মিলের অভাব।

Blank verse শুরু করেন Surrey (১৫১৭-৪৭) ভার্জিলের Aenid এর ইংরেজি অনুবাদে (১৫৪০); আর এর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন দেখা যায় Milton (১৬০৮-৭৪) এর Paradise Lost (১৬৬৭) এ। একে বলা হয় অমিল পঞ্চমাত্রিক আয়াম্বিক ছন্দোবন্ধ; সমিলকে বলে মাহাকাব্যিক চরণযুগল (heroic couplet)। শেষেরটি আমদানি করেন Chaucer (১৩৪০-১৪০০) তাঁর Canterbury Tales (১৩৯১) এ।[৭০] এই Blank verse-এর অনুসরণে মাইকেল আবিষ্কার করেন অমিত্রাক্ষর ছন্দ। তিনি রাজনারায়ণ বসুকে লেখেন (১লা জুলাই, ১৮৬০): "Paradise Lost পড়লেই জানতে পারবে কেমনে

ক্ষুদ্র বাঙালী কবির পদ্য গড়ে উঠেচে। এ দেশে Blank verse এর প্রচলন কেবল সময়ের প্রশ্ন। ইংরেজি Blank verse এর মতো স্বরকে যতি দিয়ে চালনা কর্তে হবে। আমার উপদেশ পড়ো, পড়ো, পড়ো। কানকে নতুন তালে প্রশিক্ষণ দাও এবং পরে জানতে পার্বে এটা কি"।[৭১] কাজেই অমিত্রাক্ষরকে বুঝতে হবে Blank verse এর নিকষে। ইংরেজি Blank verseর ভিত্তি হলো "পঞ্চ-প্রচাপ-পংক্তি" (five-stress line) আর বাঙলায় এর জুড়ি হলো ৮+৬ এর পয়ার। এক কথায় মিল্টনের Iambic pentameter বা five-stress line-র সগোত্রীয় বাঙলা পয়ারের ৮+৬ এর মাপ। অর্থাৎ এরাই মহাকর্ষের কাজ করেচে ঃ তাই পঞ্চ-প্রচাপের ছন্দোবন্ধ থেকে মুক্ত হয়ে Blank verse এর স্পন্দ যেমন প্রবহমান হয়েচে, তেমনি অমিত্রাক্ষর ও আঁজব্মাঁয় পংক্তি-লঙ্ঘক হয়ে পাড়ি জমিয়েচে। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য "অযুগ্ম সংখ্যার" উপর যতিপাতের বিরোধী, যদিও মাইকেল তৃতীয়, সপ্তম ও একাদশে যতি দিতে প্রস্তুত।[৬৮] তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "সমমাত্রার ছন্দের অর্থাৎ পয়ার জাতীয় ছন্দের বিশেষত্বই হচ্ছে এই যে, এ ছন্দে দুই, চার, ছয়, আট, দশ প্রভৃতি দু'য়ের multiple-এর পর ইচ্ছামত যতি স্থাপন করা যায়। এখানেই এ ছন্দের শক্তি। এজন্যেই এ জাতীয় ছন্দে আঁজাঁব্মাঁ (enjambement) চালানো সম্ভব হয়েছে। যেখানেই দুয়ের multiple পাওয়া যায় সেখানেই থামতে পারা যায় বলেই প্রবহমান পয়ার রচনা করা সম্ভব হয়েছে। এ ছন্দে অযুগ্ম সংখ্যার পর যতি দেওয়া চলে না। মধুসূদন অবশ্য 'অকালে'র পর যতি দিয়েছেন—'বীর বাহু চলি যবে | গেলা যমপুরে | অকালে'—এটাকে অবশ্য একরকম করে সমর্থনও করা যায়। তথাপি এ ছন্দে অযুগ্ম unit এর পর যতি না দেওয়াই রীতি। আর এজন্যেই অসমমাত্রার ছন্দে আঁজাঁব্মাঁ বা প্রবহামানতা আনা যায় না।"[৭২]

এখানে উল্লেখ্য যে রবীন্দ্রনাথ মাইকেলের অযুগ্ম সংখ্যার যতিকে—'অকালে'—সমর্থনও করা যায় বলেচেন, কিন্তু তার উপায়ের কথা বলেন নি। এ ব্যাপারে তাই আরো গভীরে প্রবেশের প্রয়োজন। এ-প্রসঙ্গে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের কথা প্রণিধান যোগ্য ঃ "যে-প্রকারে বিরাম চিহ্নানুসারে গদ্য পাঠ করা যায় সেই প্রকারে অমিত্রাক্ষর পয়ার পাঠ করিতে হয়। কেবল ইহার চিহ্ন (ছেদ) ব্যতীত ছন্দের দুই (৮ম ও ১৪শ অক্ষরে) যতি আছে। তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা কর্তব্য। তাঁহারা (পাঠকরা) পয়ারের অষ্টম ও চতুর্দ্দশাক্ষরে যতি রাখিয়া, বাক্যার্থের শেষ হইলে পৃথক যতি রাখিলেই তিলোত্তমা পাঠে সুখী হইতে পারিবেন।"[৭৩] উপরের 'বীরবাহু ···· যবে'র পরে আছে পদান্ত যতি। আর 'গেলা যমপুরে'র পরে চরণান্ত যতি—এরা ৮ম ও ১৪শ অক্ষরে বর্তমান। এরা সব ছন্দোযতি ; কিন্তু এ-ছাড়া রয়েচে অর্থযতি বা ছেদ যার পরিচয় আছে

'অকালে'-র পরে। কাজেই প্রবহমানতা এসেচে এই ছেদের জন্যে। যতি ও ছেদের অমিত্রতাই অমিত্রাক্ষরের বৈশিষ্ট্য। যতি বলতে বুঝায় বিরাম—'ছন্দোমঞ্জুরী' (১। ১২) বলে যে "যতির্জিহেবষ্ট বিশ্রাম স্থানং কবিভিরুচ্যতে"। 'পিঙ্গলছন্দ ঃ সূত্রম্'-এ (৬। ১) এর সমর্থন আছে ঃ "যতির্বিচ্ছেদ ঃ"। কিন্তু এ-বিরাম বা বিশ্রাম শ্বাসের দিক থেকে অর্থাৎ প্রাণ বিশ্রাম করে যতিতে। কিন্তু এ-ছাড়া রয়েচে আরেকটি বিরতি, যার নাম ছেদ—এ হলো মনের বিশ্রাম অর্থাৎ কিনা "বাক্যার্থের শেষ"। তাই মন ও প্রাণের দ্বন্দ্বেই গড়ে ওঠে আঁজাঁব্মাঁ বা প্রবহমানতা, মিল এর বড়ো কথা নয়। যতি ও ছেদের এই পার্থক্যের জন্যেই একে বলা হয় অমিত্রাক্ষর। তাই রবীন্দ্রনাথ এই দ্বন্দ্ব নিয়ে রসিকতা করেচেন তাঁর "ঘরে বাইরে"তে (পৃঃ ১২৬) ঃ "আমি কৌতুক করে বল্লুম, মিত্রে মিত্রে মিলে অমিত্রাক্ষর। হয়ত আমাদের ভাগ্যকবি প্যারাডাইস্ লস্ট-এর মত একটা এপিক লেখবার সংকল্প করেচেন।" বস্তুত ছেদ দুই বা দুইয়ের গুণিতকে আসে। যেখানে অযুগ্ম সংখ্যা সেখানে অক্ষরটিকে টেনে পড়তে হয়, কেননা এ তানবৃত্ত ছন্দ। 'অকালে' এই টানে হয়েচে চার, তিন নয়। এ বোঝা যায় পরবর্তী শব্দ প্রবাহে, 'কহ, হে, দেবি'র 'হ'-এর উচ্চারণে। 'হ' একাধারে স্পর্শহীন ঘোষ মহাপ্রাণ ও উষ্ম বা শিস্ ধ্বনি।

অনেকেই এ দ্বন্দ্ব ধরতে পারেন নি। তাই তারা মিলের অমিত্রতা খুঁজেচেন অমিত্রাক্ষরে। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেচেন তাঁর "বঙ্গীয় শব্দকোষে"র (১৯৬৬), প্রথম খণ্ডে, পৃঃ ১৬৮-এ ঃ "ইহা চৌদ্দ অক্ষরের ছন্দ, পঙ্ক্তির শেষ দুই অক্ষরের মিল থাকে না"। এ ভুল অজ্ঞতা-প্রসূত। আবার কেউ কেউ এর নাম পরিবর্তনে উৎসাহী। তাই হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় একে অভিহিত করেচেন "অমিত্র ছন্দ" বলে।[৬৮] দুটি কারণে এ সমর্থনীয় নয়। এক, ছন্দে আছে মিতালি—একই ধাচের পুনর্বৃত্তির প্রত্যাশা। কাজেই 'অমিত্র ছন্দে' প্রকাশ পায় দু'টি পরস্পর বিরোধী ধারণা। দুই, উদ্ভাবয়িতার নাম রাখাই কাম্য। অবশ্য কেউ-কেউ আবার 'অমিতাক্ষর' শব্দের পক্ষপাতী। এর মধ্যে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও আছেন।[৬৯] অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়ও একে "অমিতাক্ষর" বলেচেন।[৭৪] কিন্তু এ ঠিক নয়। এ-সম্পর্কে মোহিতলাল মজুমদারের উক্তি প্রণিধান যোগ্য ঃ "মধুসূদনের ছন্দে যতিস্থান নির্দ্দিষ্ট নয় বলিয়া, তাঁহার ছন্দ 'অমিত্রাক্ষর'! অর্থাৎ তাহার অক্ষর সংখ্যাও ঠিক নাই—সে চরণ মাপহীন! কোন ছন্দ যে 'অমিত্রাক্ষর' হওয়া সত্ত্বেও গদ্য না হইয়া পদ্য হইতে পারে, এমন সিদ্ধান্ত মৌলিক বটে!"[৭৫] মনে রাখতে হবে যে অমিত্রাক্ষর ছন্দে মহাকবীয় সূত্র হলো ৮+৬ ও ১৪ এর দুর্লঙ্ঘ্য নিয়ম। মহাকর্ষের একটি সীমা আছে, যার মধ্যে থাকলে কোন বস্তু আবার ফিরে আসতে পারে পৃথিবীতে ; এর

বাইরে গেলে সে আর ফেরে না। ছন্দেও তাই আছে স্পন্দসীমা—এর মধ্যে থাক্‌লে পদ্যের মান বজায় থাকে, কিন্তু এর বাইরে সে হবে নিছক গদ্য। ছেদ ও যতি যথাক্রমে স্পন্দের উচ্চতর ও নিম্নতর সীমা। এরি মধ্যে চলাফেরা করলেই তবে সে পদ্য, অন্যথায় গদ্য।

(৫) চরণ (verse)—পদ্যের অখণ্ড ধ্বনি প্রবাহকে 'চরণ' বলে। এ কয়েকটি মেল, পর্ব, ও পদের সমষ্টি। সাধারণত এ পংক্তির সমতুল; তবে দু'য়ের মধ্যে পার্থক্য আছে। নির্দ্দিষ্ট দৈর্ঘ্যের ও তরঙ্গায়িত ধ্বনিপ্রবাহকে 'চরণ' বলে। আর ব্যুৎপত্তিগত অর্থও তাই: এ √চর্ (গমণ করা)+অন্ করণে অর্থাৎ যদ্বারা গমণ করা যায়। কিন্তু 'পঙ্‌ক্তি' হলো অনিয়মিত দৈর্ঘের বর্ণশ্রেণী। একটি 'চরণ'কে একাধিক পংক্তিতে সাজান যেতে পারে। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ তাই বলেন: "নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষর, মাত্রা, বা স্বর যথানির্দ্দিষ্ট যতি-সহকারে বিন্যস্ত হইলে, তাহাকে কবিতার 'চরণ' বলে। কয়েকটি চরণ লইয়া একটি শ্লোক হয়। একটি চরণে কয়েকটি পদ থাকিতে পারে।"[৭৬] একটি শ্লোক নেয়া গেল—

মহাভারতের কথা | অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে | শুনে পুণ্যবান্॥

এখানে প্রত্যেক চরণে যতি আছে ৮ ও ১৪ অক্ষরের পরে। তাই দু'টি চরণে একটি শ্লোক হয়েচে। আর প্রতি চরণে ৮ ও ৬-এর দু'টি 'পদ' আছে। এর সমর্থন মেলে নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণে: "পদ্যের এক একটি প্রধান ভাগকে 'চরণ' বলে। এক একটি কবিতায় দুই বা অধিক চরণ থাকে। এক চরণের মধ্যে দুই বা অধিক অপ্রধান ভাগ থাকে; তাহাদের নাম 'পদ'।"[৭৭] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ঐ একই কথা বলেচেন: "পর্ব অপেক্ষা বৃহত্তর ছন্দোবিভাগের নাম চরণ। চরণের পরে পূর্ণযতি আসে। আজকাল এক একটি চরণ পৃথক্ এক একটি পঙ্‌ক্তিতে লিখিত ও মুদ্রিত হয়। চরণের মধ্যে একাধিক নির্দ্দিষ্ট সংখ্যার পর্ব থাকে।"[৭৮]

পদ ও চরণ সমার্থক মানুষের একটি বিশেষ অঙ্গ বুঝাতো। কিন্তু বাঙ্‌লা ছন্দে এরা স্বতন্ত্র, যদিও উভয়ে ছন্দোবন্ধ। পদ হলো ছন্দের পদক্ষেপ, আর চরণ প্রদক্ষিণ—একটি ছোটো গতি, আরেকটি বড়ো গতি। পদ হলো চলন, চরণ হলো চাল। বাঙলা ছন্দে পদবিভাগ হয় যেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই একটি করে ঝোঁকালো শব্দ কাপ্তেন করে এবং তার পিছনে কয়েকটি অনুগত শব্দ সমান তালে পা ফেলে কুচ করে চলে যায়। আবার একেকটি ঝোঁক-কাপ্তেনের অধীনে কয়েকটি মাত্রা-সিপাই থাকে। পয়ার তাই চতুষ্পদ ছন্দ—পদ

+ চার থেকে এর উৎপত্তি। এর একেকটি পদ একেকটি ঝোঁকের শাসনে চলে, যথা—

মহাভারতের কথা। অমৃত সমান।
কাশীরাম দাস কহে। শুনে পুণ্যবান।

এখানে দণ্ড বিভাজিত অংশগুলি একেকটি 'পদ'। তাই চারটি পদ নিয়ে রচিত হয়েচে শ্লোকটি বা পয়ারটি। অন্যদিকে, যাতে ছন্দের সম্পূর্ণতা হয় অর্থাৎ প্রদক্ষিণ শেষ হয় তাকেই বলে 'চরণ' বা চাল। যেমন—

সকাল বেলা। কাটিয়া গেল।
বিকাল নাহি। যায়।

এখানে দু'টি পঙ্‌ক্তি মিলেই চরণ, কেননা পঙ্‌ক্তি ও চরণ এক নয়। দু'টি পঙ্‌ক্তি মিলেই হয়েচে এ-চরণ। যদি প্রতি পঙ্‌ক্তিতে প্রদক্ষিণ শেষ হতো, তাহলে অবশ্য এরা দু'টি 'চরণ' হতো এবং পঙ্‌ক্তি ও চরণ মিলে যেতো, যথা—

সকাল বেলা। কাটিয়া গেল।
বকুলতলে। আসন মেল।

তাই যে বিরামস্থলে পৌঁছে পদ্যছন্দ অনুরূপভাগে পুনরাবর্তন করে সে-পর্যন্ত হলো চরণের বিস্তার—মাঝখানে জোড়ের মুখে শেষ করা অসংগত।[৭৯] তাইতো ছন্দোমঞ্জরী (১।৪) বলেচে ঃ "পদ্যং চতুষ্পদী"।

এখানে 'চরণের' পরিবর্তে পঙ্‌ক্তি ব্যবহার ঠিক হবে না, কেননা এ-উদ্ভাবনের উৎস হলো পদ ও চরণের অভেদকল্পনা। এতে লালমোহন বিদ্যানিধি বিপদে পড়েচেন এবং তাই পদ ও চরণের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করেচেন ঃ "এক একটি কবিতার পদ অর্থাৎ যত চরণ (প্রধান বিভাগ) থাকে, তাহা ধরিয়া বঙ্গভাষার ছন্দঃগণনা করা হয়। যথা, ত্রিপদী, চৌপদী ইত্যাদি। ঐ চরণ ও পদ এক নহে।"[৮০] ছন্দের প্রদক্ষিণ বুঝাতে রামমোহন রায় ব্যবহার করেচেন 'চরণ' আর বিভাজিত দলগুলিকে অভিহিত করেচেন 'বিভাগ' নামে ঃ "পয়ার, তাহার দুইচরণ, প্রত্যেক চরণে চতুর্দ্দশ অক্ষর। ত্রিপদী, যাহার দুই চরণ হয় ; প্রত্যেক চরণ, তিন বিভাগ— প্রথম দুয়ের আট অক্ষর, আর তৃতীয় ভাগ দশ অক্ষর হয়।"[৮১] এই বিভাগই 'পদ'। কেউ-কেউ মাইকেলের 'চতুর্দ্দশ পদী'র (১৮৬৬) উল্লেখ করেচেন। কিন্তু এথেকে পদ যে চরণ তা প্রমাণিত হয় না, কেননা এ ব্যাকরণের পদ-অর্থে ব্যবহৃত হয়েচে ঃ "সুপ্তিঙন্তং পদম্"। অর্থাৎ কিনা সুপ্-প্রত্যয়ান্ত ও তিঙ্-প্রত্যয়ান্ত শব্দই পদ।[৮২] মাইকেলের "চতুর্দ্দশ পদীর" অর্থ পরিস্ফুট করেচেন প্রকাশকরা তাঁদের বিজ্ঞাপনে (১৮৬৬) ঃ "কবিতাগুলির প্রত্যেকেই চতুর্দ্দশ মাত্র পদ বিশিষ্ট"।[৮৩] তাই 'চরণের' জায়গায় পঙ্‌ক্তি আমদানি করার প্রয়োজন নেই—এ প্রস্তাব গ্রহণীয় নয়।[৮৪]

(৬) ছন্দ (metre)—শব্দটি দু'ভাবে ব্যুৎপন্ন হতে পারে। প্রথমত, শব্দটি "ছন্দস' বা 'ছন্দঃ' এবং সংস্কৃতে এ ক্লীবলিঙ্গঃ ব্যুৎপত্তি হলো √চন্দি, আহলাদন +অস্ কর্তৃবাচ্যে, যার 'চ' রূপান্তরিত হয়েছে 'ছ'—এ (অমরকোষ টীকা দ্রষ্টব্য)। তাই ছান্দোগ্যোপনিষৎ-এ (১. ৪. ২) আছেঃ" দেবা বৈ মৃত্যোর্বিভ্যতস্ত্রয়ীং বিদ্যাং প্রাবিশংস্তে ছন্দোভিরচ্ছাদয়ন্ যদে ভিরচ্ছাদয়ং স্তবছন্দ সাং ছন্দস্তম্" অর্থাৎ দেবতারা মৃত্যুভীত হয়ে বেদবিদ্যায় বা কর্মে ব্যাপৃত রইলেন এবং ছন্দ বা মন্ত্রদ্বারা আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করলেন; যেহেতু তাঁরা মন্ত্রসমূহে আপনাদিগকে আচ্ছাদিত করেছিলেন তাই এই মন্ত্রসকলের নাম হলো ছন্দ। 'ছন্দস্' এখানে বেদ। দ্বিতীয় অর্থ হলো নিয়মিত মাত্রাযুক্ত পদ্য, যেমন "গায়ত্রী ছন্দসামহম্" (গীতা, ১০।৩৪)। এথেকে তৃতীয় অর্থ হলো 'ছন্দঃশাস্ত্র' বা prosody: 'কল্প্যতে ছন্দঃশাস্ত্রং তদ্ বেদানাং পাদরূপধৃক' (শুক্রনীতিসার, ৪. ৩. ৩৬)। দ্বিতীয়ত, বিসর্গহীন 'ছন্দ' ব্যুৎপন্ন হয়েছে এ-ভাবেঃ √ছন্দ্+অচ্ কর্মবাচ্যে। শব্দটি পুংলিঙ্গ, যার অর্থ গোপনীয় রহস্য। এর এক অর্থ অভিপ্রায়, ইচ্ছা, যেমন, "স্বচ্ছন্দোঽত্র বিধীয়তাম্" (কাশীনাথ পাণ্ডুরঙ্গ পরব-সংস্কৃত রামায়ণ, শক ১৮১০, ২. ৯. ৭)। দ্বিতীয় অর্থ 'বশ', যথা "স্বচ্ছন্দবনজাতেন শাকেন (হিতোপদেশ ১.৭০)। তৃতীয় অর্থ অবয়বসংস্থান, গঠন, যথা 'বয়ান সুছন্দ' (বিদ্যাপতি, ২)। চতুর্থ অর্থে বাঙ্‌লায় বুঝায় প্রকার, ভাব, যেমন, 'কোমর বান্দে কত ছন্দ পাগে' (শ্রী ধর্মমঙ্গল, ১৯৩)। বস্তুত সংস্কৃত 'ছন্দস' থেকে এসেছে প্রাকৃত 'ছন্দ', আর হিন্দী ও মরাঠীতে হয়েছে ছংদ, ছান্দ।[৮৫] কাজেই বাঙলায় বিসর্গহীন ছন্দ-ই প্রযোজ্য। বিধুশেখর শাস্ত্রী বলেছেন যে "আমাদের ছন্দ, মন, তপ সংস্কৃত ছন্দস্, মনস, তপস থেকে বাঙ্‌লা ভাষায় আসেনিঃ এদের প্রাকৃত অকারান্ত অপভ্রংশ থেকেই এসেছিল"। তাই দিলীপকুমার রায় ঠিকই বলেছেনঃ "'ছন্দ' শব্দটিকে আমরা অকারান্তই উচ্চারণ করি—যদিও ছন্দোরাজ, ছন্দোবন্ধ, ছন্দোময়—এ ও চলে। এরূপ স্থলে বৈকল্পিক ব্যবহারই প্রশস্ত—যখন যেটা কানে ভালো লাগে তখন সেটা সেই ভাবেই গ্রহণীয়।"[৮৬]

অধুনা প্রচলিত 'ছন্দ' শব্দটিতে ব্যুৎপত্তির দিক থেকে আছে সংস্কৃত ও প্রাকৃতের আমেজ। কিন্তু অর্থে এসেছে বিদেশী metre এর দ্যোতনাও। ইংরেজিতে দুটি শব্দ আছে—rhythm ও metre। একটি সামান্য, অন্যটি বিশেষ। Rhythm ব্যুৎপন্ন হয়েছে গ্রীক rhythmos, লাতিন rhythmus ও মধ্য ফরাসী rhythme হতে, আর মূল ধাতুটি হলো rhein, যার অর্থ স্রোতে প্রবাহিত হওয়া (flow)। ইংরেজি শব্দটির জন্মকাল ১৫৫৭ খ্রীষ্টাব্দ; Heraclitus-এর একটি সূত্র (aphorism) এখানে স্মর্তব্যঃ "সব বস্তু ব'য়ে

চলে অর্থাৎ প্রবাহশীল"। এরি বাঙলা হলো 'স্পন্দ'—এ আমাদের চারি দিকেই বর্তমান, স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধিতেও জোয়ার ভাটায় স্পন্দ আছে যেমন, তেমনি আবার মানুষের গানে ও নাচে। এথেকে ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে স্পন্দের অর্থ হলো স্বরমাত্রা বা প্রচাপ বা উভয়ের দ্বারা নিরূপিত উদাত্ত (arsis) ও অনুদাত্ত (thesis) অক্ষরের মিত পর্যাবৃত্তি—এক প্রকারের ছান্দসিক (metrical) বিচলন যা নিরূপিত হয় চরণ বা পর্বের দীর্ঘ-হ্রস্ব বা প্রচাপিত—চাপহীন অক্ষরের সম্পর্কে। কিন্তু metre শব্দটি উদ্ভূত হয়েচে গ্রীক metron, লাতিন metrum, ও প্রত্ন ইংরেজি meter থেকে। ইন্দো-ইউরোপীয় ধাতুটি হলো mĕ, যার অর্থ মাপা। ১৪ শতকে প্রত্নফরাসী metre থেকে এ গৃহীত হয় নতুনভাবে ঃ বর্তমান ফরাসী শব্দটি হলো mètre। এর অর্থ হলো কাব্যস্পন্দের যেকোন রূপ—এর প্রকার গঠিত হয় পর্ব বা অক্ষর সমষ্টির চরিত্র ও সংখ্যায়। ছন্দোশাস্ত্রে এতে বুঝায় এক ছান্দসিক সমষ্টি বা পরিমাপ। বাঙলায় এর প্রতিশব্দ হলো 'ছন্দ'। কাজেই rhythm ও metre হলো 'স্পন্দ' ও 'ছন্দ'। অর্থাৎ প্রবাহ ও মাত্রা বা মানদণ্ড। ইউরোপীও ভূখণ্ডে দৈর্ঘ মাপা হয় metre-এ; ইংলন্ডে ও ভারতে meter মাপে গ্যাস বা বিদ্যুৎ সরবরাহ। তাই ছন্দ হলো স্পন্দের নিয়মিত ও পর্যাবৃত্ত ছাঁচের সংগঠন। স্পন্দ স্বতঃস্ফূর্ত, কিন্তু ছন্দ চেষ্টা-প্রসূত। নৃত্যস্পন্দ ছন্দের একটি রূপ—এর প্রকাশ শব্দে নয়, ক্রিয়ায়। সংগীত ও ছন্দিত, তবে এতে ধ্বনিই প্রধান, শব্দ আবশ্যিক নয়। কাজেই স্পন্দ যদি হয় জাতি (genus), তবে ছন্দ প্রজাতি (species)। এ-জন্যে বলা হয় ঃ সব ছন্দই স্পন্দ, কিন্তু সব স্পন্দ ছন্দ নয়। আর ইংরেজিতে এ স্বীকৃতি পায় ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে।[৮৭]

(৭) ছন্দোলিপি (scansion)—ইংরেজি scansion শব্দটি লাতিন scandere থেকে এসেচে ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে ঃ scandere এর অর্থ আরোহন করা।[৮৭] সঙ্গীতের সুর নিচু থেকে উপরে ওঠে সোপান শ্রেণীর ন্যায়। সাংকেতিক স্বরলিপিতে সুরের উচ্চতা ও নীচতা সোপানের মতো চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ হয়। এ-বোঝানোর জন্যে সিঁড়ি আকারে ব্যবহৃত রেখাকে "মঞ্চ", বলে। পাঁচ রেখার মঞ্চই সাধারণত ব্যবহৃত হয়—নিম্নভাগকে খাদমঞ্চ ও উপরের ভাগকে উচ্চ মঞ্চ বলে। দু'টি মঞ্চ চিনবার জন্যে আদিতে দু'টি সংকেতাক্ষর লেখা থাকে যাদের নাম "কুঞ্চিকা"।[৮৮] গানের স্বরলিপির মতো ছন্দ বোঝানোর ও লিপি আছে এবং এর নাম ছন্দোলিপি। এতে চরণ ছন্দোবদ্ধ বিভাগে বিভক্ত হ'য়ে যায়। অর্থাৎ এ হলো পদ্যের মাত্রিক বিশ্লেষণ। ছন্দোলিপিতে সাধারণত এই সংকেতগুলি ব্যবহৃত হয়—হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষর বুঝাতে ◡ ও — ; প্রচাপিত

ও চাপহীন অক্ষরের জন্য / ও × ; পর্ববিভাগের জন্যে । ; যতি ও ছেদ প্রদর্শনে ∧ ও ॥ ইত্যাদি ।[৮৯]

ছন্দোলিপি হলো গোটা কবিতা, অথবা তার একটি চরণ বা চরণ শ্রেণীর ছন্দ সনাক্তকরণের কৌশল। এর প্রধান ও প্রথম উপাদান হলো বাক্য, বাক্যাংশ বা শব্দের স্পন্দশ্রবণ বা তানে কর্ণপাত করা। এতে ধরা পড়বে একেক কবির একেকটি বৈশিষ্ট্য, যথা শেক্সপীয়ারের তান স্পন্ডেইক, চশারের ট্রকেইক, ট্রাহার্নের আয়াম্বিক, টেনিসনের ডাক্‌টিলিক ও ডিলামেয়ারের এনাপেষ্টিক।[৯০] বাঙলা কবিতায় এই তান দেখতে হবে উচ্চারণরীতির পরিপ্রেক্ষিতে অর্থাৎ এ দ্রুত, মধ্য, না বিলম্বিত। তারপর প্রচাপ আছে কি নেই তার বিচার কর্তে হবে। যথা—

বঁধুর লাগি | কেশে আমি ¦ পরব এমন ¦ ফুল,
স্বর্গে মর্তে | তিনভুবনে | নাই কো যাহার | মূল

এ চতুর্পার্বিক বা চতুর্মেলক ; বলবৃত্ত ছন্দ ; আর লয় দ্রুত।

(৮) ছেদ (caesura ; sense pause)—তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (XXII,১৩) চার রকম বিরামের উল্লেখ আছে—ঋগ্বিরাম, পদবিরাম, বিবৃত্তিবিরাম, সমানপদ বিবৃতিবিরাম এবং এরা যথাক্রমে তিন, দুই, এক ও অর্ধমাত্রার। বাঙলা ছন্দে তিনটি অবকাশ গ্রহণীয়ঃ "শব্দান্তের বিরাম, পর্বান্তের যতি এবং পদান্তের ছেদ। এগুলি পৃথক বলার সার্থকতা এই যে এদের কাল পরিমাণ এক নয়, ক্রমবর্ধমান।"[৯১] তবে 'শব্দান্তের' জায়গায় গ্রহণ কর্তে হবে "মেলান্তের" কেননা দু'টি শব্দের মেল-এ এর সৃষ্টি। 'তাই 'বিষ্টি পড়ে | টাপুর টুপুর'-এ 'বিষ্টি' শব্দের সঙ্গে 'পড়ে' এবং 'টাপুর' শব্দের সঙ্গে 'টুপুর'-এর মেল ঘটেচে। প্রথম শব্দটির প্রচাপের সঙ্গে দ্বিতীয় শব্দটি গাঁটছড়া বেঁধেচে। তাই এর প্রয়োগ। 'মেল'—শব্দে বুঝায় "বিবাহে কুলের মিল, (যথা) 'ফুলিয়া মেল' ; কীর্তনে সমস্ত গায়কের কন্ঠ মিল করবার জন্য সুর ভাঁজা"।[৫২] বলবৃত্ত ছন্দে খেমটা তাল ও কাহরবা বোল-এর সঙ্গে মেল ঘটে ব'লেও এর প্রয়োগ।

ছেদ অর্থের সঙ্গে জড়িত, অর্থাৎ ছেদে থেমে পাঠকের বুদ্ধি সমাপ্ত বাক্যের অর্থ বোঝে এবং আগামী বাক্যের ভাব গ্রহণের জন্যে কোমর বাঁধে। অমিত্রাক্ষরের কারবার ছেদকে নিয়ে। এখানে লক্ষ্য শুধু অর্থ আর আবেগ। ছন্দ শিল্পের কারিকুরি নেহাৎ নগণ্য। এখানে শ্বাসের অবকাশ এতই অপ্রচুর যে ছোট-খাট অসম্পূর্ণতার হিসাব রাখা আর তার সাধ্যে কুলোয় না। তান থাকার জন্যে তারি উপরে দায়িত্ব দেওয়া হয় ত্রুটি ঢাকবার। আর পাঠক ছেদের উদ্দেশ্যে

ঊর্ধ্বশ্বাসে ছোটে এবং ফলে তাকে তিন, পাঁচ সাত প্রভৃতির মতো অযুগ্ম সংখ্যায় অনায়াসেই থামানো যায়। যেমন,

সম্মুখ সমরে পড়ি। বীরচূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে। গেলা যমপুরে
অকালে ॥

এই তানবৃত্ত ছন্দে—একদণ্ডে বুঝাচ্ছে পদান্ত ছেদ ; আর বাক্যান্তের ছেদ বুঝাতে আছে দ্বিদণ্ড। এই পদ ৬, ৮ ও ১০ মাত্রার হতে পারে। যতি শ্বাসগ্রহণের কাল এবং এতেই আসে পর্ব। কিন্তু অবকাশ ঘনঘন এলে শ্বাসের অনটন থাকে না এবং প্রত্যেক বর্ণই তার ওজন পেতে পারে। এই যতিবহুল ছন্দই স্বনবৃত্ত নামে পরিচিত, যেহেতু এর চাল দ্রুত, ধ্বনি তরঙ্গায়িত এবং প্রতিটি স্বনই তার মর্যাদা পায়।[৭১] এ প্রসঙ্গে ৫ম অধ্যায়ের (৫.৪) দ্রষ্টব্য—ছেদ, যতি ও বিরাম।

(৯) পদ (verse clause)—শব্দটির ব্যুৎপত্তি এরূপ—√পদ্ (গমণ করা) +অ করণ কারকে। ছন্দের পুরা মাপ যতখানি পাওয়া যায় ততখানি-ই 'চরণ'। আবার 'চরণ'কে ভাগ করে সাজান যেতে পারে। চরণ দীর্ঘ হলে মধ্যে এক বা একাধিক বিরাম প্রশ্বাসের জন্যে প্রয়োজন এবং ছন্দের ছাঁদ অনুসারে এই বিরামের কাল স্বল্প বা দীর্ঘ হয়ে থাকে। চরণের এই যতি বা বিরাম-বিচ্ছিন্ন অংশগুলিই এককেটি পদ। পদের আর ভাগ নেই। ফলে পয়ার-এ এই পদই ছন্দের গতি-ভঙ্গি বা ছাঁদ নিরূপণ করে। এক হিসেবে এ তার measure বা মাপনী।[৭২] রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "বাংলা ছন্দে যে পদবিভাগ হয় সেই প্রত্যেক পদের গোড়াতেই একটি করিয়া ঝোঁকালো শব্দ কাপ্তেনি করে এবং তাহার পিছন-পিছন কয়েকটি অনুগত শব্দ সমানতালে পা ফেলিয়া কুচ করিয়া চলিয়া যায়। এইরূপ এক-একটি ঝোঁক-কাপ্তেনের অধীনে কয়টা করিয়া মাত্রা-সিপাই থাকিবে, ছন্দের নিয়ম-অনুসারে তাহার বরাদ্দ হইয়া থাকে।"[৭৯] উদাহরণ আগেই দেয়া হয়েচে।

সংস্কৃতে গঙ্গাদাসের "ছন্দোমঞ্জরী" (১।৪)-তে আছে ঃ "পদ্যং চতুষ্পদী"। এ-থেকে 'চরণে'র সঙ্গে 'পদে'র অভেদ কল্পনা করেচেন কেউ-কেউ। কিন্তু সংস্কৃতে 'চরণ' 'পাদে'র সমতুল হলেও বাঙলা 'পদে'র সমতুল নয়। তাই সংস্কৃত টীকায় বলা হয়েচে ঃ "শ্লোকস্য চতুর্থো ভাগঃ পাদঃ। 'মাত্রিকস্য চতুর্ভাগঃ পাদ ইত্যভিধীয়তে' ইত্যুক্তত্বাৎ'। মাত্রিকস্য শ্লোকস্য চতুষ্পদী পাদচতুষ্টয়-যুক্তং, পদ্যং নাম নিগদ্যতে।" ভারতী টীকা (হিন্দী)-য় আছে ঃ "চারপাদ (চরণ) মিলকর পদ্য হোতা হৈ"।[৭৩]

(১০) পদ্য (verse)—ইংরেজি verse শব্দটি এসেচে লাতিন versus থেকে, যার অর্থ আবর্তন।[৭৪] এতে বুঝায় এমন শব্দসমষ্টি যাতে ছান্দসিক অভিক্রিয়া জন্ম নেয়। সৃষ্টিকলা ও বিশ্লেষণ বিজ্ঞান পদ্যভিত্তিক হলে তাকে বলে

ছন্দোলিপিকরণ (versification) বা পদ্যীকরণ। ম্যাকসমূলার মনে করেন যে versus ও সংস্কৃত 'বৃত্ত'-এর মধ্যে সাদৃশ্য আছে। পদ্য স্পন্দমান অক্ষর শ্রেণী, যা বিরতি-বিভাজিত ও এককচরণ-শায়ী।[৯৫] ছন্দোবন্ধ পদযুক্ত বাক্যকে 'পদ্য' বলেঃ "ছন্দোবন্ধ পদং পদ্যম্" (সাহিত্যদর্পণ, ৬।২৮৯)। আর যেখানে ছন্দের নিয়মাবলী অনুসৃত হয় না তাকেই 'গদ্য' বলেঃ সাহিত্যদর্পণ ৬।২৯৭। পদ্যে বুঝায় ছন্দোবন্ধ তালের বোল, যথা, 'সুপদ্য বাজে বাদ্য'।[৯৬] কিন্তু 'গদ্য' হলো কথ্য ভাষার ন্যায় পদচ্ছন্দোবন্ধহীন ও তানসাম্য (harmony) যুক্ত কবিকৃত রচনা বিশেষ। তাইতো সাহিত্য দর্পণকার বলেন (৬।২৯৭)ঃ বৃত্তগন্ধোজ্ঝিতং গদ্যম্" অর্থাৎ বৃত্ত শেষহীন শ্রব্যকাব্য।[৯৭] গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য পরিস্ফুট হবে এদের ধাতুগত অর্থ থেকে। 'গদ্য' শব্দটি সিদ্ধ হয়েচে এ-ভাবেঃ গদ্ (বলা)+য কর্মবাচ্যে অর্থাৎ কথা বলার ভাষা। এ কথোপ-কথনের ভাষা। অন্যদিকে, 'পদ্য' শব্দটির উৎপত্তি এরূপঃ পদ (চরণ)+য (যুক্তার্থে)। কিন্তু পদ শব্দটি 'পদ্'—ধাতুজ, যার অর্থ গমন করা। কাজেই পদ্যে চরণের অর্থাৎ পরিমিত অক্ষরের হিসাব রাখতে হয়, কিন্তু গদ্যে তার বালাই নেই; তবে গদ্যেরও স্পন্দ আছে এবং তা মাত্রাগত না হলেও শ্বাসপতনের যতি এবং শব্দের গুরু বা লঘু উচ্চারণাদি দ্বারা নিয়মিত হয়। হ্রস্ব, দীর্ঘ, উদাত্ত, অনুদাত্ত, স্বরিত, দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত প্রভৃতি স্বর বৈচিত্র্যের মিলনে যে সুর গাম্ভীর্যের বা ঝঙ্কার মাধুর্যের সৃষ্টি হয় তাই পদ্যকে গদ্য হতে স্বাতন্ত্র্য দান করে।[৯৮]

গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য বাহ্য অর্থাৎ এ গড়ে ওঠে নিয়মিত ছন্দ মারফতে। গদ্যের লক্ষ্য স্পন্দ, পদ্যের ছন্দ। একটি অনিয়মিত, অন্যটি নিয়মিত। কিন্তু কবিত্ব আলাদা জিনিস—এর অস্তিত্ব উভয়ে দেখা যায়। পদ্য হলেও এতে কবিত্ব না থাকতে পারে; আবার গদ্যেও এ থাকতে পারে। এর কারণ কবিত্ব সৃজনী প্রকাশ, গদ্য গঠনী প্রকাশ। ভাবের ঘনীভবনে কবিত্বের উৎপত্তি। তাই এর জার্মান শব্দ dichtung-ই এর বৈশিষ্ট্য—এই dictung এ বুঝায় কাব্য সৃষ্টি ও ঘনীভবন। গদ্য তাই তৈরি শব্দের গড়ন; কিন্তু কাব্য নূতন সৃষ্টি, কেননা শব্দ হ'য়ে-ওঠা আর এ মননের সঙ্গে সঙ্গেই জন্ম নিতে থাকে। পদ্যের লক্ষ্য এই হ'য়ে-ওঠা ভাবের ঘনীভবন। তাই কূটাভাসের মতো শোনাবে যদি বলা যায় যে কবিত্ব একটি একক শব্দে বা অক্ষরে অস্তিমান হতে পারে এবং চরম ক্ষেত্রে স্পন্দহীন হতে পারে; কিন্তু গদ্য মেল ছাড়া থাকতে পারে না, আর মেল-এর সর্বদাই আছে কোন না কোন স্পন্দ।[৯৯] গদ্যের চালটা পথে চলার চাল, পদ্যের চাল নাচের। গদ্যে প্রধানত অর্থবান শব্দকে ব্যূহবন্ধ করে কাজে লাগান হয়। পদ্যে প্রধানত ধ্বনিমান শব্দকে ব্যূহবন্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়। পদ্যছন্দের প্রধান

লক্ষণ হলো চরণসীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো। নির্দিষ্টমাপের ধ্বনিগুচ্ছে একেকটি চরণ সম্পূর্ণ এবং তার পরে একটি করে বড় যতি। গদ্যে এই নিয়মের শাসন নেই। গদ্যে বাক্য যেখানে আপন অর্থ সম্পূর্ণ করে সেখানেই সে দাঁড়ায়। কিন্তু পদ্য ছন্দ যেখানে আপন ধ্বনি সংগতিকে অপেক্ষাকৃত বড়ো রকমের সমাপ্তি দেয়, অর্থবিচারে সেখানেই শেষ করে।[১০০] "গদ্য ও পদ্যে"র পার্থক্য কবির ভাষায় এ-ভাবে ব্যক্ত করা যায়—

সংসারে যে অনেক অভাব, অনেক জোড়াতালি—
তার তরে, ভাই, বাগিয়ে কলম গদ্য লেখো খালি;
কেবল যখন মাঝে মাঝে প্রাণের পরব আসে,
তখন, ওহো! পদ্য লেখো হাস্য—কলোচ্ছ্বাসে।[১০১]

(১১) পর্ব (foot)—এ এসেচে পৃ (পূরণ করা)+বন্ কর্তৃবাচ্য থেকে। এতে বুঝায় গ্রন্থি, যেমন 'শিবায়নে' আছে: 'দণ্ডদুই দলিশঙ্খ এক গাছিতার। অনেক যতনে তিন পর্ব করে পার'।[১০২] সংস্কৃতে ও প্রাকৃতে 'পর্ব' শব্দের ব্যবহার নেই—আছে 'গণ' শব্দ। তাই বাঙ্‌লা ছন্দোশাস্ত্রে 'পর্ব' শব্দটি পারিভাষিক অর্থে প্রযুক্ত হয়েচে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "আমাদের হাতে তিন পর্ব আছে। মণিবন্ধ পর্যন্ত এক, এটি ছোটো পর্ব। কনুই পর্যন্ত দুই, কনুই থেকে কাঁধ পর্যন্ত তিন। যাকে আমরা সমগ্র বাহু বলি সে এই তিন পর্ব মিলিয়ে। আমাদের দেহে এক বাহু অন্য বাহুর অবিকল পুনরাবৃত্তি। প্রত্যেক ছন্দেরই এমনিতরো একটি সম্পূর্ণ 'রূপকল্প' অর্থাৎ প্যাটার্ন আছে। ছন্দোবন্ধ কাব্যে সেই প্যাটার্নকেই পুনঃপুনিত করে। সেই প্যাটার্নের সম্পূর্ণ সীমার মধ্যেই তার নানা পর্ব পর্বাঙ্গ প্রভৃতি যা-কিছু। সেই সমগ্র প্যাটার্নের মাত্রাই সেই ছন্দের মাত্রা।"[১০৩] পর্ব তাই চরণের ক্ষুদ্রতর বিভাগ। পদের সঙ্গে পর্বের প্রভেদ চারটি। প্রথমত, পদের তুলনায় পর্বের মাত্রা আরো সুনির্দিষ্ট: মধ্যবর্ত্তী যুক্ত বা অযুক্ত হসন্তের ওজন প্রয়োজনানুসারে কম বা বেশি করা যায় না, যেমন 'মন্তর'-এর ধ্বনিভাগ চার মাত্রার: 'ম—ন্—ত—র্'। দ্বিতীয়ত, পর্ব একটি সত্যিকার মাপনী, কেননা পদের চেয়ে আয়তনে ছোট এবং চরণকে সমভাবে ভাগ করে দেয়। তৃতীয়ত, পর্বগত প্রচাপ আদ্যক্ষরকেই আশ্রয় করে এবং তা ছন্দানুবর্তী হয়। ফলে ভাব, অর্থ, অথবা বাক্যের অন্বয় বাধা পায়। উদাহরণে এ সুস্পষ্ট হবে—

নিম্নে যমুনা বহে স্বচ্ছশীতল।
ঊর্ধ্বে পাষাণতট শ্যাম শিলাতল॥

এ ছন্দ অনিশ্চিত পদক্ষেপে দোলায়মান, কেননা একে পদ ও পর্ব অনুসারে পড়া যায়:

(১) পদ-ভাগ অনুসারে—

নিম্নে যমুনা বহে | স্বচ্ছশীতল (৮+৬)
ঊরধ্বে পাষাণতট | শ্যাম শিলাতল (৮+৬)

(২) পর্ব-ভাগ অনুসারে—

নিম্নে যমুনা | বহে স্বচ্ছশী | তল (৬+৬+২)
ঊর্ধ্বে পাষাণ | তট শ্যাম শীলা | তল (৬+৬+২)

প্রথমটিতে যুক্তাক্ষরের জন্যে কোন প্রচাপ নেই—৮ মাত্রার প্রবাহে একটি ছেদ এসেচে। দ্বিতীয়টিতে প্রচাপেই পর্বের সৃষ্টি হয়েচে।

চতুর্থত, পর্বে খণ্ডপর্বের স্থান আছে, কিন্তু পদে খণ্ড পদ নেই, যথা—

কুঞ্জে আমার | এসে ফিরে গেছে | অকাল বৈশা | খী[১০৪]
(৬+৬+৬+১)

পদ ও পর্বের প্রভেদ না বোঝার জন্যে অনেকে ভুল করেন ছন্দের প্রকৃতি নির্ধারণে।[১০৫] যেমন—

নমো নমো নমঃ | সুন্দরী মম | জননী বঙ্গ | ভূমি

এর ছন্দ হলো ৬+৬+৬+২ মাত্রার, অথচ একে বলা হয়েচে দ্বিপদী, দ্বিতীয় পর্বান্তে চরণকে দ্বিখণ্ডিত করে। কিন্তু আসলে এ পর্বে-পর্বে এগিয়েচে। আবার পদ-চারী

এ দুর্ভাগ্য দেশ হতে। হে মঙ্গল ময়

৮+৬ এ বিভক্ত ; কিন্তু একে পর্বে ভাগ করা হয়েচে এ-ভাবে—

এ দুর্ভাগ্য | দেশ হতে | হে মঙ্গল | ময়।

ফলে পর্বে-পর্বে মাত্রা হয়েচে পরিবর্তিত, যেমন প্রথম পর্বের মাত্রা ৬, দ্বিতীয় পর্বের ৪, তৃতীয় পর্বের ৫ এবং দু'মাত্রার একটি খণ্ড পর্বও আছে। কিন্তু পর্বের মাত্রা সুনির্দ্দিষ্ট ; তাই এ-বৈচিত্র্য বা পরিবর্তনশীলতা নিষিদ্ধ। আবার একে চার-চার পর্বে ভাগ করা হয়েচে প্রথন দু'টি চরণে ; কিন্তু তৃতীয় ও চতুর্থ চরণে এভাগ আর টেকেনি, যেমন—

এ দুর্ভাগ্য | দেশ হতে ॥ হে মঙ্গল | ময়,
দূর করে | দাও তুমি ॥ সর্ব তুচ্ছ | ভয়।
মস্তকতু : — লিতে দাও ॥ অনন্ত আ : কাশে
উদার আ : লোক মাঝে ॥ উন্মুক্ত বা : তাসে। —নৈবেদ্য, ৪৮

একে সমর্থন করার জন্যে এক ছান্দসিক "লঘু যতি লোপে"র আমদানি করেচেন এবং পর্বকে 'পদে' রূপান্তরিত করেচেন। এর কারণ দিয়েচেন এই ঃ "প্রথম দুই পংক্তির পদগুলি বিযুক্ত পার্বিক, আর পরের দুই পংক্তির পদগুলি যুক্ত পার্বিক।"[১০৫] এ উক্তি অজ্ঞতা-প্রসূত। কবিতাটি পড়লেই বোঝা যাবে এর

পদক্ষেপ পদ-এ, পর্বে নয়। তাই ৮+৬ এ চলেচে এই পদযাত্রা, পর্বযাত্রা নয়। অর্থাৎ এ তানবৃত্ত ছন্দ। মনে রাখতে হবে যে পর্ব বিভাজিত হয় যতি-তে।

(১২) প্রচাপ (stress)—৫ম অধ্যায়ের (৫.৩) দ্রষ্টব্য ঃ 'প্রচাপ, প্রস্বর ও মাত্রাবিচার'। প্রত্যঙ্গের বায়ুগতীয় অনুষঙ্গ হলো প্রচাপ। এ উদ্বোধকের বেগ ও চাপের গুণফল। জলের সেন্টিমিটারে (cmH_2O) মাপা হয় ধ্বনিক চাপ ঃ আর প্রত্যেক cmH_2O=প্রতিবর্গ সেন্টিমিটারে 980.4 ডাইন (dynes/cm^2)। তাই স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের সংবারের চাপ হলো $5\ cmH_2O = 5 \times 980.4$ dynes-এর বল অর্থাৎ 4902 dynes / cm^2। উদ্বোধক শক্তি = $p \times {}^{\cdot}000098 \times V_v$ watts. যেখানে p=চাপ ; V=আয়তন বেগ।[১০৩] অর্থাৎ প্রচাপ এরি সমতুল্য। কাজেই ছড়ার ছন্দে বা বলবৃত্তে যে প্রচাপ সৃষ্টি হয়, তা এরি সমান। এখানে যুক্ত হয় উরসস্পন্দ ও কুক্ষি স্পন্দ। এই দুই স্পন্দের প্রচাপের ফলে বলবৃত্ত আর এই 'বল'-এর প্রভাব দেখা যায় স্বরে বা হসন্তে। এ-জোর পড়েচে নিচের দণ্ডাঙ্কিত অক্ষরের উপর—

/ /
আমি নারব | মহাকাব্য
/
সংরচনে
/
ছিল মনে—
/ / /
ঠেকল কখন | তোমার কাঁকণ কিঙ্কিনীতে। —রবীন্দ্রনাথ

এখানে তৃতীয় পংক্তিতে মোহিতলাল দেখেচেন 'ছি'-র দুর্বলতা। তাঁর মতে ঃ "হয় হসন্ত না হয় অর্থঘটিত জোরের দ্বারা আদ্য অক্ষরের ঝোঁক বজায় আছে ; কেবল 'ছিল মনে'র 'ছি' অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে। কারণ ইহাতে কোনটাই নাই। 'ছিল মনে' যদি 'ছিলেন মনে' হইতে পারিত, তবে এই দোষ ঘটিত না, কারণ, হসন্তটি আদ্য-অক্ষরে যুক্ত না থাকিয়া যদি শব্দের শেষেও থাকে, তাহা হইলেও ঝোঁকটির বলহানি হয় না।"[১০৪] বলা বাহুল্য এ-উক্তি ঠিক নয়, কেননা বল আসে উদ্বোধক শক্তির প্রয়োগে, কিন্তু হসন্তের আবির্ভাবে নয়। হসন্ত বা স্বরান্ত অক্ষর ফল বা কার্য, কিন্তু কারক নয়। ছি'র পরে উদ্বোধক শক্তির প্রভাব আছে, তাই এ সজোরে উচ্চারিত হয় ছন্দের কাঠামো বজায় রাখতে।

মুখগত ও মুখের বহিঃস্থ চাপ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল এরূপ। মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের স্পর্শকালে মুখগত চাপ অমহাপ্রাণের তুলনায় বৃদ্ধি পায়, তা সে ঘোষই হোক বা অঘোষই হোক। ঘোষ বা অনুনাদিনী মহাপ্রাণের একটি

অঘোষ দশা আছে, যখন স্পর্শের শেষভাগে দেখা দেয় উচ্চ প্রচাপ বা ক্ষুদ্রতর বিস্তারের ঘোষ কম্পাংক ; কিন্তু অঘোষ মহাপ্রাণে চলতে থাকে অবিরাম স্বর-কম্পাংক যা শেষে স্বর-এ মিশে যায়। ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা দেখা যায় বহিঃস্থ চাপের অনুরেখে আর ব্যঞ্জনের এই স্থিতিকাল মাপা যায়। চার প্রকারের ব্যঞ্জনের—মহাপ্রাণ ও অমহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের ঘোষ ও অঘোষ দুইভাগে—মহাপ্রাণতার গড় দৈর্ঘ্য হলো '৮ সেকেন্ড এবং এদের পাল্লা '০৬ থেকে '১২ সেকেন্ড। তবে মহাপ্রাণ ও অমহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের অভিক্রিয়া স্বরের পরে ভিন্নতর। মহাপ্রাণিত স্পর্শধ্বনিমুক্ত অক্ষরের স্বরে দেখা যায় যে স্বরকম্পাংকের প্রারম্ভে বিস্তার থাকে ছোট এবং ক্রমে-ক্রমে এ গরিষ্ঠ আকার ধারণ করে স্থিতিকালের মাঝামাঝি। অন্যদিকে অমহাপ্রাণ ব্যঞ্জনমুক্ত অক্ষরের স্বরে দেখা যায় প্রথম থেকেই কম্পাংকের গরিষ্ঠ বিস্তার। স্পন্দমেলে এর হদিশ মেলে মহাপ্রাণ ও অমহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের সমবায়ে। তাই ত্র্যক্ষর মেলে প্রথম বা তৃতীয় অক্ষরে জোর পড়লেও, মহাপ্রাণিত ব্যঞ্জনের মহাপ্রাণতা অক্ষুণ্ণ থাকে, যদিও প্রচাপিত অক্ষরের তুলনায় চাপহীন অক্ষরের মহাপ্রাণতা অনেক কম। উপরের 'ছিল মনে'র 'ছ' মহাপ্রাণিত এবং প্রচাপিত বলেই হয়েচে বলবত্তর। অবশ্য তিন অক্ষরের মধ্যমটির মহাপ্রাণতা ক্ষুদ্রতম। এখানে মহাপ্রাণ ও অমহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনির উচ্চারণে আনুষঙ্গিক বিচলনের কথা এসে পড়ে। মহাপ্রাণিত অঘোষ স্পর্শধ্বনির উচ্চারণে গলনালীয় দেয়ালপেশী অমহাপ্রাণ ব্যঞ্জনের তুলনায় একটু বেশি সংকুচিত হয়। এই টানের পরিচয় ফুটে ওঠে স্পর্শকালে এ অঞ্চলে মুখগত উচ্চ চাপসহ স্ফীতি বা স্ফীতি-হীনতায়। আর ঘোষ স্পর্শধ্বনিতে শ্লথন মাত্রা অধিকতর, যদিও মুখগত চাপ কম। এবং স্ফীতি অঘোষের তুলনায় ঘোষেই অধিকতর। এখানে লক্ষণীয় যে মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি যুক্ত অক্ষরে সর্বদাই বক্ষপেশীয় ঘাত গুরুতর। এবার অক্ষর স্পন্দে স্পর্শ ব্যঞ্জন স্থাপনের কথা। দেখা গেচে যে, অমহাপ্রাণের বেলায় স্পর্শকালেই ঘটে গরিষ্ঠ চাপ ; কিন্তু মহাপ্রাণের ক্ষেত্রে এ চাপ আসে স্পর্শ ব্যঞ্জন বিভাজনের বহু পরে। কাজেই অমহাপ্রাণিত অক্ষরবাহী গুরু অক্ষরস্পন্দ কখনই মহাপ্রাণিত হয় না। মহাপ্রাণের মুখগত চাপ উচ্চতর ঃ এ চলতে থাকে অক্ষর উচ্চারণের হার সেকেন্ডে ৬ থেকে ৮ পর্যন্ত। মুখগত চাপের স্তর বৃদ্ধি পায় দ্রুতির সঙ্গে এবং স্পর্শব্যঞ্জন—ঘোষ বা অঘোষ—উচ্চতর স্তরে ওঠে ; কিন্তু মহাপ্রাণিত ব্যঞ্জনে গরিষ্ঠ হারেও উচ্চতর চাপ প্রকাশ পায়।[১০৭]

(১৩) প্রস্বর (pitch)—৫ম অধ্যায়ের (৫.৩) দ্রষ্টব্য ঃ 'প্রচাপ, প্রস্বর ও মাত্রা বিচার'। সুরের উচ্চতা বা নিম্নতাকে প্রস্বর বলে। উচ্চারিত ধ্বনির চারটি বৈশিষ্ট্যের মধ্যে এ একটি, অন্য তিনটি হলো স্থিতিকাল, প্রাবল্য ও

গুণ। প্রস্বর মাপা হয় প্রতি সেকেন্ডের কম্পাংক সংখ্যায় (৮ থেকে ৩০,০০০), কখনো বা উচ্চ (উদাত্ত) বা নিম্ন (অনুদাত্ত) শব্দে এবং প্রায়ই গীতল সংকেতে। প্রস্বন (accent) দু'ভাগে বিভক্ত—একটি হলো প্রস্বর (pitch), অন্যটি প্রচাপ (stress)। প্রস্বর কম্পাংকে মাপনশীল হলেও স্বরের প্রাবল্য ও গুণের উপরও এ নির্ভরশীল। তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি পেলে, নিম্ন কম্পাংকের প্রস্বর নিচে নেমে যায়; আবার উচ্চস্বরের প্রস্বর উপরে ওঠে। এই প্রস্বর পরিবৃত্তির পরিমাণ হলো শতকরা ২০ ভাগ পতন, যখন সেকেন্ড প্রতি ২০০ চক্করের স্বরপ্রাবল্য ৬০ থেকে ১২০ ডেসিবেল-এ তোলা যায়। মিশ্রস্বরের প্রস্বরের কোন পরিবর্তন হয় না, এর উপাদানের কিছু-কিছু দূরীভূত হলেও। এমনকি মূল ও প্রথম সাতটি অধিস্বর স্বরগ্রাম থেকে সরিয়ে দিলেও প্রস্বর ঠিকই থাকবে। এর কারণ মন্ময় যুক্তস্বন (combination tone), যা কানে জন্মায়।[১০৮]

(১৪) বিরাম বা ন্যাস (cadence)—৫ম অধ্যায়ের (৫.৪) দ্রষ্টব্য: 'ছেদ, যতি ও বিরাম'। সাধারণত সাধুভাষার ছন্দ ছেদ ও যতি নিয়ে গঠিত হয়। কিন্তু বাদ্যযন্ত্রের যথা ঢোল ও মাদলের অনুকরণে আরেকটি কাব্যছন্দের উদ্ভব হয়েচে বাঙলার কথ্যভাষার বা ছড়ার ছন্দে। ছন্দাঘাত (ictus) এর বড়োকথা—ঢোল, মাদল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে তাল বা তালি বলতে যে আঘাত বুঝায়, এই ছন্দাঘাতের সঙ্গে তার মিল আছে। এ-ছন্দাঘাত কিন্তু শ্বাসাঘাত থেকে স্বতন্ত্র। প্রথমত, ছন্দাঘাত শ্বাসাঘাত হতে প্রবলতর। দ্বিতীয়ত, শ্বাসাঘাত পড়ে 'শব্দের' প্রথম অক্ষরে, কিন্তু ছন্দাঘাত 'মেলের' (বা পর্বের) প্রথম অক্ষরে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে অবশ্য দুই আঘাত মিলে যায় অর্থাৎ 'মেলের' ও শব্দের প্রথম অক্ষর এক বলে 'আঘাত' ঐ একই স্থানে পড়ে। ফলে দু'টি আঘাতকেই এক বলে ভ্রম হয়। যেমন,

| / |
ঝরছেরে মৌ।—চাকের মধু

এখানে দন্ত চিহ্নে বুঝায় ছন্দাঘাত, আর বাঁকা চিহ্নে শ্বাসাঘাত। স্বাভাবিক উচ্চারণে প্রথম অক্ষর 'মৌ'—য়ের উপরে শ্বাসাঘাত পড়ে; কিন্তু ছন্দের প্রয়োজনে এ পড়েচে 'চা'-য়ের উপর। তাই শ্বাসাঘাত-প্রধান উচ্চারণে এ শোনাবে এ-রকম:

/   /   /
ঝরছেরে। মৌচাকের। মধু।[১০৯]

সংগীতে দণ্ড রেখা (bar-line) ছন্দাঘাত বা প্রচাপের দ্যোতক আর এ নেতৃত্ব দেয় স্বর ও বিরাম সমবায়ে মেল গঠনে। গান রাচনায় তাই তিনটি

অনুপাত (ratio) লক্ষণীয়—(১) উত্থান ও পতনের অনুপাত; (২) এক দণ্ডের সঙ্গে অন্য দণ্ডের অনুপাত; ও (৩) এক মেলের (phase) সঙ্গে অন্য মেলের অনুপাত। দন্ত রেখায় সংগীত পঙ্‌ক্তি মেল-এ বিভক্ত হয়ে যায় এবং এই মেল-এর স্থিতিকাল পরস্পর সমান। আর প্রতি মেল-এর মধ্যে স্বর ও বিরামের স্থিতি ও সঠিকভাবে মাপা হয় যাতে তারা পরস্পর আনুপাতিক হয় অর্থাৎ স্বর ও বিরামের যোগফল একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক কালমাত্রার সামিল হয়। এতে প্রথম দুটি অনুপাত দেখা দেয়। ঘড়ি যখন বলে 'টিক্ ট্যাক্ ট্যাক্,' আমরা পাই দুই বা তিনের সমান উপাদানের মেল পরম্পরা। কিন্তু সংগীতের দণ্ড - উপাদান অবশ্যিকভাবে সমান নয়—তারা একে অন্যের সঙ্গে স্থিতির যেকোন সরল অনুপাতে দণ্ডায়মান। সর্বদাই দণ্ড যে একই কালে অস্তিমান থাকবে তা নয়ঃ অনেক সময় সাধারণ কালের দণ্ডের অনুচর হতে পারে ত্রিক কালের দণ্ড ইত্যাদি। এ হলো পরিবৃত্তির কথা। তাই সংগীতের ভাষায় বলা হয় যে "কাল-স্বাক্ষর" (time-signature) বদলাতে পারে। তবে নতুন কাল-স্বাক্ষরের দণ্ড পূর্বের দণ্ডের সঙ্গে স্হিতির সমতা রক্ষা করে দ্রুতির অর্থাৎ উচ্চারণ বেগের পরিবর্তনে। তাই তো 'প্রাকৃত পৈঙ্গলে' (১। ৮) উক্ত হয়েচে—

জই দীহো বিঅ বন্নো, লহু জীহা পঢ়ই হোই সো বিলহু।
বন্নো বি তুরিঅ পঢ়িও, দো ত্তি ন্নি বি একক জানেহু ॥

তাই ছড়ার ছন্দে ৪ ও ৬ মাত্রার মেলই লক্ষণীয়—এরা যথাক্রমে 'কাহরবা' ও 'খেমটা' তালে রচিত, যা আগেই উল্লিখিত হয়েচে। প্রয়োজনানুসারে মৌলিক অক্ষরের যেমন সম্প্রসারণ হয়, তেমনি যৌগিক অক্ষরের সঙ্কোচনও। যেমন—

সম্প্রসারণঃ আমি- সতী-। লীলা- বতী -

সঙ্কোচনঃ সাত ভায়ের বোন। ভাগ্যবতী-।

প্রথম ও দ্বিতীয় মেলে মৌলিক স্বর সম্প্রসারিত হয়েচেঃ আর তৃতীয় মেলে ঘটেচে মাত্রা সঙ্কোচন; আবার চতুর্থমেলে 'ঈ'—সম্প্রসারিত হয়েচে। কাজেই এ-সব ঘটেচে উচ্চারণ দ্রুতির জন্যে—কখনো বেগ অপেক্ষাকৃত দ্রুত, কখনো বা মন্হর। তবে মেলের মাত্রা সংখ্যা সব ক্ষেত্রেই ঠিক আছে। এই মেল সমবায়ে গড়ে উঠেচে ন্যাস (cadence)ঃ এ হলো জিভের বিশ্রামের জন্যে ছন্দের বিচ্ছেদ অর্থাৎ নিবৃত্তি। এ চারপ্রকারের—এক ছন্দের শেষে অপন্যাস; দুই ছন্দের শেষে সংন্যাস; তিন ছন্দের শেষে বিন্যাস; আর সুর ও তালের এবং ছন্দ ও পদ্যের শেষে পূর্ণন্যাস। তাই 'সঙ্গীত রত্নাকর' টীকায় আছেঃ "নস্যতে—ত্যজ্যতে

যস্মিন যেন বা গীতমিতি ন্যাস ঃ"।[১১০] পাশ্চাত্য সংগীতে ও চতুর্বিধ ন্যাস লক্ষণীয় - ন্যাসে বুঝায় "গীতল বিচলন বা মেলের সমাপ্তি" এবং ইংরেজিতে cadence এই অর্থেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। স্যামুয়েল জনসনের মতে এ হলো "পদ্য বা পর্যায় প্রবাহ" অথবা "স্বরপতন"।[১১১] ন্যাসের অর্থ তাই "গীতল মেলের সমাপ্তিসূচক ঐকতান যা ক্রমিকভাবে প্রত্যাশা জন্মায় এবং পরে জোরের সঙ্গে মূলের ইঙ্গিতে চূড়ান্তের ধারণা দেয়।"[১১২]

বাঙলা গীতল ও নৃত্যচটুল ছন্দ তাই ন্যাস-ভিত্তিক মেলে প্রতিষ্ঠিত। এ বৃহত্তর একক, পদ বা পর্বের মতো নয়। গ্রীকদের মতো ক্ষুদ্রতর এককে এ প্রতিষ্ঠিত, অর্থাৎ পর্ব—বিভাজন যাকে বলা হয় উত্থান ও পতন। আর এই উত্থান-পতনের অনুপাতেই এ-ছন্দ তৈরি হয়েচে। উত্থান-পতন থেকে পৃথকীকৃত হয়েচে তিনটি উপায়ে—অধিকতর স্থিতিকাল, বা সুপ্রতিষ্ঠা, অথবা দুয়েরি সমন্বয়নে। সুপ্রতিষ্ঠায় বুঝা যায় রূপের অপরিবর্তনীয়তা। এখানে গ্রীক Aristoxenus (খ্রীঃপূঃ ৪র্থ শতক) এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য ঃ "প্রত্যেক পর্ব সংজ্ঞিত হয় একটি নির্দিষ্ট অনুপাতে অথবা এমন সাদৃশ্যে যা অর্থস্বীকৃত দু'টি অনুপাতের মধ্যে কোথাও বর্তমান।" কাজেই গাণিতিক দিক থেকে এই অনুপাত সম্ভব হলেও তা স্পন্দের ব্যাপারে অপ্রয়োজনীয়, যদি না এ কানে বোধগম্য হয়। কাজেই তাঁর মতে সুসঙ্গত অনুপাত তাকেই বলে যা কান স্বীকার করে।[১১২] অবশ্য Pythagoras (৫৭২-৪৯৭ খৃঃ পূঃ) আবিষ্কার করেন যে যখন একটি তার বিসর্পী জালে (movable bridge) বিভক্ত হয়ে সম্পর্কিত দু'টি স্বর উৎপন্ন করে, তখন তার খণ্ডের দৈর্ঘ্যানুপাত সর্বদাই দুটি সংখ্যায় অনুপাতের সমান হয়। আর এরা তৈরি করে গীতান্তরাল।[১১৩] তাইতো semiquaver, quaver, quaver crotchet, chrotchet minim প্রভৃতিতে সংখ্যাগত স্পন্দ লক্ষণীয়। এখানে অনুক্রমিক দণ্ডগুলি জ্যামিতিক প্রগতিতে দণ্ডায়মান অর্থাৎ প্রত্যেক দণ্ডের কালমাত্রা পূর্ববর্তী কালমাত্রার গুণিতক আর সাধারণ অনুপাত হলো ২। সংক্ষেপে ক্রমিক দণ্ডানুপাত হলো ৩ ঃ ৬ ঃ ১২ ঃ ২৪।[১১২] এরি পরিচিতি আছে মেলে, যার অবয়ব হলো স্বর ও বিরাম।

(১৫) ব্যঞ্জন (consonant)—এতে বুঝায় স্বর বাদে বর্ণমালিক অন্যান্য উপাদান। সাধারণত এরা ব্যবহৃত হয় স্বরের সূচনা ও শেষ নির্ধারণে। এদের জনিত্র দন্ত, জিহ্বা ও ওষ্ঠ ; এদের কতক আবার সম্পূর্ণ ধ্বনিরোধক, যেমন ব, ড, ছ। কতক আবার অসম্পূর্ণরোধে ব্যবহৃত হয়—অবশিষ্ট ধ্বনি দুর্বল সুরে পরবর্তী স্বরের জানান দেয়, যেমন ফ, ভ, ল, ম, ন। র ও স-এ তীক্ষ্নতা কিছুটা কমে যায়, আর পরবর্তী স্বরের আভাস পাওয়া যায়। এদের ক্ষণস্থায়ী প্রকৃতির জন্যে বহুসংখ্যক উচ্চ সুরগুণিতকের উদ্ভব হয়, উচ্চতর

স্বরাংশ হিসেবে। কাজেই বাক্-এর উচ্চ বোধগম্যতার জন্যে প্রয়োজন হয় প্রশস্ত পটি-ওয়ালা কম্পাংকের। অবশ্য বাক্শক্তির অত্যধিক অংশই বহন করে স্বরবর্ণ।[১১৪]

বাঙলা বর্ণবিন্যাসে (orthography) স্পর্শধ্বনিগুলোকে এ-ভাবে সাজান হয়ঃ

অল্পপ্রাণ		মহাপ্রাণ		নাসিক্য
অঘোষ	ঘোষ	অঘোষ	ঘোষ	
ক	গ	খ	ঘ	ঙ—পশ্চাদ জিহ্বামূলীয়
চ	জ	ছ	ঝ	ঞ—ঘৃষ্ট
ট	ড	ঠ	ঢ	ণ—দন্তমূলীয় মূর্ধণ্য
ত	দ	থ	ধ	ন—দন্ত্য জিহ্বা মূলীয়
প	ব	ফ	ভ	ম—ওষ্ঠ্য

মুখ-বহির্ভূত বায়ুচাপের অনুরেখে দেখা গেচে যে ব্যঞ্জনের সন্ধিবিচ্ছেদ ও স্বরকম্পাংকের মধ্যে একটি অঘোষ দশা আছে। উচ্চারণ বেগ বাড়লে এ-দশা ও সমগ্র অক্ষরটির আয়তন কমে যায়, কিন্তু অঘোষ দশা বর্তমান থাকে। আর এর কাল ·০৪ থেকে ·০৮ সেকেণ্ড স্থায়ী হয়। তবে ওষ্ঠমহাপ্রাণ বর্ণের উচ্চারণ বেগ বাড়লে, ব্যঞ্জনসংবার ক্রমাগত দুর্বলতর হতে হতে অবশেষে সংবার একেবারেই লোপ পায়। আর স্বর টাকুর আকার ধারণ করে। স্পর্শবর্ণে 'প'-এর অবস্থা এরূপ—ব্যঞ্জনসংবার স্থিতিশীল এবং কখনো দুর্বল হয় না; ব্যঞ্জনের সন্ধি বিচ্ছেদ ও স্বরের মধ্যে কোন অঘোষ দশা থাকে না; আর স্বরের আকার শঙ্কু-সদৃশ। 'ব'-এর পুনরাবৃত্তি ঘটলে, অক্ষরটি ·২৮ সেকেণ্ড সময় নেয় আর স্বরযন্ত্রীয় কম্পাংকের লাগে ·৪৮ সেকেণ্ড এবং এ নিয়ত বর্তমান। দ্বিতীয়ত 'ভ'-এর সঙ্গে এর পুনরাবৃত্তি ঘটলে, মহাপ্রাণ বর্ণটিতে আসে একটি অন্তর্বর্তী কম্পক দশা, যার অস্তিত্ব দেখা দেয় ব্যঞ্জনের সন্ধি বিচ্ছেদ ও স্বরের মাঝখানে। সজোর উচ্চারণে অবশ্য অন্তবর্তী দশা আংশিক অঘোষ ও আংশিক স্পন্দশীল। অক্ষর দৈর্ঘ্যের তুলনায়, স্বরযন্ত্রী কম্পন একটু বেশি হয়। আর একথা 'দ' ও 'ধ' সম্পর্কেও খাটে।

মুখের আভ্যন্তরীণ চাপ এবং স্বরযন্ত্র ও গলনালীর বিচলন এ-প্রসঙ্গে তাৎপর্যপূর্ণ, কেননা এতে মেলে ঘোষ ও অঘোষ-এর পার্থক্যের কারণ। ঘোষ উচ্চারণে স্বরযন্ত্র ও গলনালীর ঘটে নিম্নগ বিচলন, আর ব্যঞ্জনের সন্ধিবিচ্ছেদের সঙ্গে সঙ্গে বা তার আগেই উর্ধগ বিচলন শুরু হয়। এতে বোঝা যায় যে ঘোষ

ধ্বনিতে ব্যঞ্জনের সন্ধিবিচ্ছেদের আগেই কম্পন শুরু হয়, যেমন 'ব', 'দ', 'গ' প্রভৃতিতে। কিন্তু অঘোষ মহাপ্রাণ বা অল্পপ্রাণ বর্ণে নেই এই নিম্নগ বিচলন। এখানে অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ ধ্বনির পার্থক্যও লক্ষ্যণীয়। মহাপ্রাণ ধ্বনির সহযাত্রী ভারী ওজনের অক্ষর স্পন্দ হলেও অল্পপ্রাণ মহাপ্রাণের প্রভেদ এর উপর নির্ভরশীল নয়। এ নির্ভর করে অবশ্য ব্যঞ্জনের সন্ধিবিচ্ছেদ ও অক্ষরস্পন্দের সহযোগিতার উপর। অঘোষ অল্পপ্রাণের ক্ষেত্রে ব্যঞ্জনের সন্ধিবিচ্ছেদ ও আক্ষরিক বায়ুচাপের গরিষ্ঠ সীমা মিলে যায় অর্থাৎ এক হয়; কিন্তু অঘোষ মহাপ্রাণের বেলায় আক্ষরিক গরিষ্ঠতা আসে ব্যঞ্জনের সন্ধিবিচ্ছেদের বহু পরে; আর এ-জন্যে আসে একটি অঘোষ দশা ব্যঞ্জনের সন্ধিবিচ্ছেদ ও পরবর্তী স্বরের মাঝখানে এবং এ ·০৮ সেকেন্ড স্থায়ী হয়।

মনে রাখতে হবে যে দু'টি বিপরীতমুখী পেশী গোষ্ঠী আছে, স্বরযন্ত্রের U-আকৃতি পেশী পুঞ্জ (hyoid unit), উলম্ব বিচলন নিয়ন্ত্রণের জন্যে। দু'রকমের U-আকৃতি পেশীপুঞ্জ আছে—অতি-U ও অব-U। অতি-U পেশীপুঞ্জের সংকোচনে স্বরযন্ত্রীয় U-একক উপরে ওঠে, আর অব-U পেশী পুঞ্জের সংকোচনে এ নিচে নামে। ঘোষ স্পর্শ ধ্বনির উচ্চারণে অব-U পেশীপুঞ্জ সক্রিয় হয়। তবে 'ফ'-এর মতো কয়েকটি অঘোষ মহাপ্রাণের বেলায় অতি-U এর ক্রিয়া সামান্যই, কিন্তু অন্যের বেলায় নয়।[১০৭]

(১৬) মাত্রা (measure)—পঞ্চম অধ্যায়ের (৫·৩) দ্রষ্টব্য: "প্রচাপ, প্রস্বর ও মাত্রাবিচার"। অক্ষর-গঠনে স্বর-দৈর্ঘ্যের প্রাধান্য বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়েচে ছন্দে। ধ্বনিতাত্ত্বিক বর্ণনায় ভারতীয়রা ব্যবহার করেচেন 'মাত্রা'। এ উচ্চারণের স্থিতিকাল নিরূপণের একক (unit of measure)। লাতিনে একে বলা হয় mora বা "বিলম্ব", আর গ্রীক ভাষায় chronos বা "কাল"। তাই গ্রীক ও লাতিন ভাষার মাত্রাবৃত্ত কবিতায় mora বা chronos-এ বুঝায় হ্রস্ব স্বরের স্থিতিকাল। দীর্ঘস্বর এর দ্বিগুণ।[১১৫] বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যে (I. ৫৫-৬) বলা হয়েচে: "অমাত্রস্বরো হ্রস্বঃ। মাত্রা চ।" অর্থাৎ 'অ'—কারের পরিমাণ সূচক স্বরই হ্রস্ব এবং একে বলা হয় "মাত্রা"। আবার (তত্রৈব, II. ২৮) "মাত্রা পরিমাণে" অর্থাৎ পরিমাণ বোঝাতে মাত্রার প্রয়োগ। এই স্বর যে অক্ষর (syllable) তা বলা হয়েচে অথর্ববেদ প্রাতিশাখ্যে (I.৯৩): "স্বরোক্ষরম্"। তাই (তত্রৈব, I.৫৯, ৬১) "একমাত্রো হ্রস্বঃ। দ্বিমাত্রো দীর্ঘঃ" অর্থাৎ একমাত্রায় হ্রস্ব ও দু'মাত্রায় দীর্ঘ অক্ষর। এ-ছাড়া তিনমাত্রার প্লুতের কথা বলা হয়েচে ঋক্ প্রাতিশাখ্যে (I.৩০): "তিস্রঃ প্লুত উচ্যতে স্বরঃ"। এক কথায়, 'অ'—দৈর্ঘ্যের স্বর হ্রস্ব অর্থাৎ এর মূল্য একমাত্রার: এর দ্বিগুণকে বলা হয় দীর্ঘ অর্থাৎ দু'মাত্রার; আর এর তিনগুণকে ধরা হয় প্লুত অর্থাৎ তিনমাত্রার। এ-ছাড়া

আছে ব্যঞ্জন যার অর্দ্ধেকমাত্রা নির্দ্দিষ্ট হয়েচে তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (I. ৩৭) ঃ "হ্রস্বার্ধকালং ব্যঞ্জনম্"। তবে স্বতন্ত্রভাবে ব্যঞ্জনের মূল্য নেই বলে, স্বর ও ব্যঞ্জন মিলেই হয় উচ্চারণ। তাই (তত্রৈব, XXI. ১) বলা হয়েচে ঃ "ব্যঞ্জনং স্বরাঙ্গম্" অর্থাৎ ব্যঞ্জন স্বরের অঙ্গ বলেই, এর স্বাতন্ত্র্য নেই। এ মিশোলে, স্বরই অঙ্গী ব্যঞ্জন অঙ্গ, আর অঙ্গীর নামেই মিশ্রণের পরিচিতি। প্লুতবাদে হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বীকৃত হয়েচে বাংলা ছন্দে স্থান বিশেষে, যদিও বাংলায় স্বাভাবিক দীর্ঘস্বর নেই। অর্থাৎ হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব বৈকল্পিক—এ ছন্দের প্রয়োজনে আসে, স্বাভাবিক ভাবে নয়। যেমন,

অবাক হৈনু হাটে দেখিয়া গুবাক

—ভারতচন্দ্র

আর অর্ধ আয়ু দিবরু কৈল অঙ্গীকার

—কাশীরাম

এখানে 'হৈ' দ্বিমাত্রিক, কিন্তু 'কৈ' একমাত্রিক।

বাজসনেয়ী প্রতিশাখ্যে (I. ৫৫-৬) 'মাত্রা'র মান নিরূপিত হয়েচে, আর এ হলো 'অ'-কারের পরিমাণ সূচক। অর্থাৎ 'অ'-কারের উচ্চারণীয় স্থিতিকালই হ্রস্ব ও একমাত্রার। আর পরিমাণ বুঝাতে 'মাত্রা'ই ব্যবহার্য কেননা এ হলো duration quantum বা ব্যাপ্তি পরিমাণ যা অক্ষরে প্রযোজ্য।[১০৬] এই মাত্রা পদ্ধতি W.S. Allenও গ্রহণ করেচেন এবং বলেন যে এর "স্পষ্ট উপযোগিতা" আছে ধ্বনি-তাত্ত্বিক বর্ণনায় ; আর লাতিন moraর প্রতিশব্দ হিসেবে রেখেচেন 'মাত্রা'।[১১৬] তাসত্ত্বেও এক প্রবীণ ছান্দসিক 'কলা' আমদানি করেচেন mora বুঝাতে ঃ তাঁর মতে 'কলা' ও 'মাত্রা' সমার্থক নয়, কেননা কলা হলো 'ধ্বনিকণিকা' আর 'মাত্রা' মাপের একক (unit of measure)।[১১৭] কাজেই প্রশ্ন জাগে কলার সার্থকতা নিয়ে। উপরের আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট হয়েচে যে 'অ'-কারের পরিমাণে নির্দ্দিষ্ট হয়েচে এই ধ্বনিকণিকা। তাই নির্দ্দিষ্ট 'অ'-এর জায়গায়, অনির্দ্দিষ্ট কলা-প্রয়োগের কোন হেতু নেই। দ্বিতীয়ত, বলা হয়েচে যে H. T. Colebrooke ব্যবহার করেচেন 'কলা' এবং এর সাংকেতিক চিহ্ন K-অক্ষর, যেমন 4K, 5K, 6K। তাই কলাই গ্রহণযোগ্য। কিন্তু এ-উক্তি যুক্তিসহ নয়। কেননা Colebrooke নিজেই কলাকে 'মাত্রা'র সমার্থক হিসেবে ব্যবহার করেচেন। তিনি বলেচেন ঃ "1C= one Matra or Cola"।[১১৮] ফলে 1C বা 1K এর পরিবর্তে 1m ধর্তে কোন বাধা নেই। তৃতীয়ত, মাত্রা ও কলার পার্থক্য নির্ধারণে দুই-ই এক হয়ে গেচে, অথচ এ-দিকে ছান্দসিকের খেয়াল নেই। তাঁর মতে মাত্রা হলো unit of measurment ; আর কলা ধ্বনি পরিমাপের unit। তা হলে কলা=

মাত্রা।[১১৯] বস্তুত 'কলা' ও 'মাত্রা' যে এক 'তার' প্রমাণ রয়েচে আপ্তের সংস্কৃত-ইংরেজি অভিধানে। Apte বলেন, কলা=a syllabic instant ; আর 'মাত্রা'=a prosodial or syllabic instant। এর অর্থ হলো দুই-ই এক এবং এরা তুল্যমূল্য ঃ একটি হ্রস্ব স্বরের উচ্চারণকাল।[১২০] এ-সম্বন্ধে স্পষ্ট নির্দেশ আছে বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যে যেখানে উক্ত হয়েচে যে ঃ 'অ'-কারের পরিমাণসূচক স্বরই হ্রস্ব এবং একে বলে 'মাত্রা' ; আরো বলা হয়েচে যে পরিমাণ বুঝাতে মাত্রাই প্রযোজ্য [1. ৫৫-৫৬ ; ২৮]। নরহরি চক্রবর্ত্তিও জানতেন যে কলা ও মাত্রা এক এবং তাই তিনি বলেচেন তাঁর 'ছন্দঃ সমুদ্র' গ্রন্থে (পৃঃ ২০০০) ঃ "মাত্রা কলা এক সংজ্ঞা, যৈছে ছন্দ বৃত্ত। এ সঙ্কেত জানো, পুন কহি 'দেহ চিত্ত।"[১২১] চতুর্থত, কলা-কর্তা বলেচেন ঃ "সংস্কৃতে ও প্রাকৃত ছন্দ শাস্ত্রে হ্রস্বস্বর-পরিমিত ধ্বনিকে বলা হয় কলা (mora)"। এ উক্তি তথ্যানিষ্ঠ নয়। কেননা, আগেই দেখান হয়েচে প্রাচীন ছান্দসিকরা 'মাত্রা' শব্দই ব্যবহার করেচেন। আর তাঁরা হ্রস্বস্বর না বলে 'অ'-কারকেই গ্রহণ করেচেন। এই তথ্য দু'টি নাজানার ফলে অজ্ঞতা-প্রসূত হয়েচে তাঁর উক্তিটি। পঞ্চমত, বলা হয়েচে ঃ "কোনো সংস্কৃত ছন্দেই শুধু দল (syllable, অক্ষর) মাত্রার হিসাব চলে না। দল কখনও মাত্রারূপে গণ্য হয় না, একমাত্র কলাই মাত্রারূপে গণ্য হয়। প্রাকৃত ছন্দশাস্ত্রেও তাই।"[১১৭ (ii)] এ মন্তব্য সম্পূর্ণভাবে ভুল এবং সত্যের অপলাপ করে। এখানে Apte-র উক্তি স্মরণীয় ঃ "স্তবক বা পদ্য চারি পাদ বা চতুর্থাংশের সমন্বয়ন, যা নিয়ন্ত্রিত হয় অক্ষর (দল) সংখ্যায় অথবা মাত্রা সংখ্যায়। মাত্রা সংখ্যাত ছন্দে হ্রস্বস্বরে দেওয়া হয় এক মাত্রা আর দীর্ঘস্বরে দুইমাত্রা।"[১২০] কাজেই 'মাত্রা' বাঙলা ছন্দে অস্তিমান ; এর পরিবর্তনের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

বাঙলার সাধুভাষা ও কথ্যভাষার উচ্চারণগত ধ্বনিভেদ লক্ষণীয়। প্রথমের স্বরের মর্যাদা দ্বিতীয়ে অনুপস্থিত। সাধারণত সাধুভাষায় ব্যঞ্জনধ্বনি স্বরের শাসন মানে, কিন্তু কথ্যভাষায় স্বরধ্বনি ব্যঞ্জনের শাসন মানে। অর্থাৎ একটিতে আছে ব্যঞ্জনারূঢ় স্বর, অন্যটিতে স্বরারূঢ় ব্যঞ্জন।[১০৪] রবীন্দ্রনাথ এদের নাম দিয়েচেন সংস্কৃত বাঙলা ও প্রাকৃত বাঙলা এবং এদের লয়ের পার্থক্যও নির্দেশ করেচেন। তিনি বলেন ঃ "প্রাকৃত বাংলার দেহতত্ত্বটা হসন্তের ছাঁচে, সংস্কৃত বাংলার স্বরান্তের (হসন্তের নয়)। অর্থাৎ উভয়ের ধ্বনিস্বভাবটা পরস্পরের উল্‌টো। প্রাকৃত বাংলা স্বরবর্ণের মধ্যস্থতা থেকে মুক্ত হয়ে পদে পদে তার ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে আঁট করে তোলে। সুতরাং ছন্দের বুনোনি সমতল নয়, তা তরঙ্গিত। সংস্কৃত ভাষায় স্বরধ্বনির দাক্ষিণ্য আর প্রাকৃত বাংলায় তার কার্পণ্য—এইটেই হল দুটো ভাষার ধ্বনিগত মূল পার্থক্য। স্বরবর্ণবহুল ধ্বনিসংগীত এবং স্বরবর্ণবিরল ধ্বনিসংগীতে প্রভূত প্রভেদ। স্বরের ধ্বনিই ব্যঞ্জনের ধ্বনিকে অবকাশ দেয়, তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা

করে ; সেগুলো সরে গেলেই ব্যঞ্জনধ্বনি পিণ্ডীভূত হয়ে পড়ে। চলিত এবং চল্‌তি, ঘৃণা এবং ঘেন্না শব্দগুলো তুলনা করে দেখলেই বোঝা যাবে। প্রাকৃত বাংলার ছন্দে যতিবিভাগ সকল সময় ঠিক কাটাকাটা সমান ভাগে নয়। পাঠক একজায়গায় মাত্রা হরণকরে আর-এক জায়গায় ওজন রেখে তা পূরণ করে দিলে নালিশ চলে না। সংস্কৃত বাংলায় যে শব্দের মাপ দুই-এর, তার ওজনও দুই-এর। কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় মাপ দুই-এর হলেও ওজন তিনের।"[১২২]

বস্তুত সাধুভাষার ছন্দে অর্থাৎ স্বনবৃত্ত ও তানবৃত্তে মাত্রাই মুখ্য হয়ে ওঠে। কিন্তু বলবৃত্তে বল বা চাপই মুখ্য আর একে মাত্রার সঙ্গে সমতা রক্ষা কর্তে হয়। অর্থাৎ ওজনকে খাপ খাওয়াতে হয় মাত্রার সঙ্গে। যেহেতু 'স্থিতি কোয়াণ্টাম' নির্দ্দিষ্ট থাকে, তাই ওজনের নিক্তিতে মাত্রারও হরণ-পূরণ ঘটে। যেমন—

। । । ।
আমি — যদি —। জন্ম নিতেম। কালি — দাসের। কালে —

এখানে লক্ষণীয় যে ছন্দাঘাতের দরুণ অর্থাৎ বল বা চাপের প্রয়োগে পাঠক 'আমি যদি' দুই—দুই মাত্রায় দ্রুতি পাঠ করে 'জন্ম' ও 'নিতেম' শব্দের কাছ থেকে উভয়ের জরিমানা আদায় করে নেয়। নইলে ছন্দের তাল কাটে, কেননা এটা তিনমাত্রার তাল। আবার 'কালিদাসের' শব্দটিতেও ঐরকম রফা নিষ্পত্তি কর্তে হয়েচে। অর্থাৎ 'কালি'তে যেটুকু কম পড়েচে 'দাসের' মধ্যে সে দায় আদায় করে নিতে হয়।[১২২] এই ছন্দাঘাতকে অরবিন্দ বলেচেন বাচ্যভার (voice weight)—বাচ্যের (স্বরের) খাড়া ছন্দাঘাত ভার বা ওজন। স্বর ও চাপ এখানে একযোগে কাজ করে যাতে "মাত্রার একটি জটিল কিন্তু সুসংগত পদ্ধতি" গড়ে উঠতে পারে। এ-ছাড়াও আছে দৈর্ঘ্য-নির্ধারণের ব্যঞ্জনভার অর্থাৎ ব্যঞ্জন বহুলতায় দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়।[১২৩] এখানে মাত্রা নিরূপণে 'অভিনিধান' (implosion) ও স্ফোটের (explosion) কথা স্মর্তব্য। Vendryes বলেন ঃ

"প্রতিটি স্পর্শ বর্ণ ব্যঞ্জনে আছে তিনটি স্বতন্ত্র স্তর ঃ সংবার বা অভিনিধান ; হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর স্থিতিকালের ধৃতি ; এবং মোক্ষ বা স্ফোট। যেমন সরল ব্যঞ্জন 'ট'-য়ের উচ্চারণে অভিনিধানের অব্যবহিত পরেই ঘটে স্ফোট আর ধৃতি ক্বচিৎ-বোধগম্য কালক্ষণে পরিণত হয়। অপর পক্ষে, এই তিনটি পর্যায়ই চিহ্নিত আছে দ্বিত্ব ব্যঞ্জনে, যা হ্রস্ব ব্যঞ্জনের তুলনায় সজোরে উচ্চারিত শুধুমাত্র দীর্ঘব্যঞ্জন। 'অক্ত'-গুচ্ছে 'ক' অভিনিহিত ধ্বনি যা পরবর্তী স্ফোটধ্বনি 'ট' থেকে কম অবধারণশীল। দুটি বিপরীত ক্রিয়ায় গুচ্ছ পরিবর্তিত হয়। নিছক কুড়েমির জন্যে বক্তা 'ক'-এর উচ্চারণ না করে অভিনিধানের অব্যবহিত পরেই জিভের ডগাকে 'ট'-এর অবস্থানে আনতে পারে—এতে চূড়ান্ত ফল হবে দীর্ঘ 'ট'-এর 'অট্ট'। অথবা আবার 'ক'-এর ঠিক-ঠিক মূল্য দেওয়ার অভিপ্রায়ে

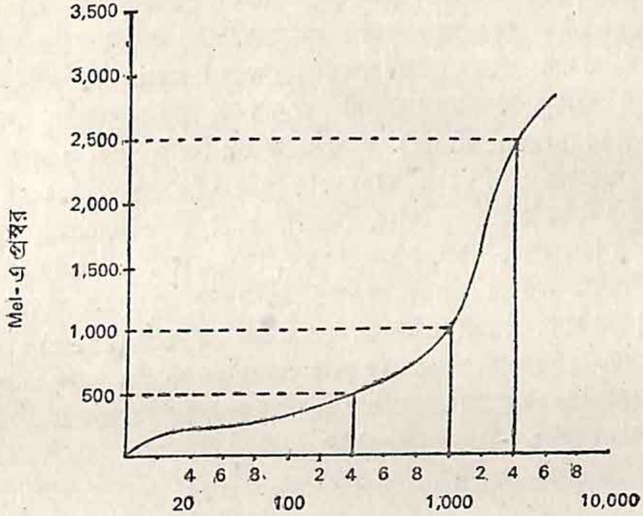
বক্তা 'ট'-স্ফোটে যাবার আগে ঐ একই বিন্দুতে অভিনিহিত 'ক'-এর অনুসরণ কর্তে পারে হাল্কা-ভাবে উচ্চারিত স্ফোটে।"[১২৪]

(১৭) মেল (phrasal cadence)—৫ম অধ্যায়ের (৫.৪) দ্রষ্টব্য ; "ছেদ যতি ও বিরাম"। 'মেল' শব্দটি ব্যুৎপন্ন হয়েচে এভাবেঃ মিল্ (মিলিত হওয়া) + অ (ঘঞ্) ভাব বাচ্যে। এর অর্থ মিলন—আদৌ এতে বুঝায় রাঢ়ীয় কুলীন দিগের বিভাগ। দেবীবর ঘটক কুলীনদিগকে ছাত্রিশ মেলে বা শাখায় বিভক্ত করেন। 'মেল' কৌলীন্যহীনতার পরিচায়ক।[১২৫] প্রচলিত আছে 'ফুলিয়া বা ফুলে মেল' অর্থাৎ ফুলিয়া বা ফুলে গ্রামের (নদীয়া) কুলীন গোষ্ঠী। এ-ছাড়া আছে 'মেলবন্ধন' যাতে বুঝায় কোন্ গোষ্ঠীর সঙ্গে কোন্ গোষ্ঠীর বিবাহ প্রশস্ততার নির্দেশ-করণ। আবার 'মেলভাঙ্গা' বাগ্বিধি ও প্রচলিতঃ এর অর্থ নির্ধারিত মেল ভিন্ন অন্য মেলে কন্যা দান।[১২৬] সংগীতে আছে এর অর্থঃ "কীর্তনে সমস্ত গায়কের কণ্ঠ মিল করিবার জন্য সুরভাঁজা"।[৫২] ইংরেজিতে এর প্রতিরূপ হলো phrase বা সংগীতের চারদণ্ডের (bar) স্বরবিরামের (cadence) ক্ষুদ্র ও একটি কমিবেশি স্বতন্ত্র অংশ।[১২৭] ধ্বনিবিজ্ঞানে mel হলো স্বনৃতীক্ষ্ণতা (pitch)-র একক। কম্পাংক (frequency) একটি ভৌতরাশি এবং ভৌত যন্ত্রে এ মাপা হয়। এর একক হলো প্রতি সেকেণ্ডের চক্কর। স্বনৃতীক্ষ্ণতা বা প্রস্বর (pitch) ভৌতরাশি নয় ; কাজেই এর পরিমাপ ভৌতযন্ত্রে হয় না। অন্যসব মন্ময় বিষয়ের মতোই এ সংবেদন। তবুও একটি একক যার নাম mel তা উদ্ভাবিত হয়েচে এ পরিমাপের জন্য। mel এর সংজ্ঞা নির্ধারিত হয়েচে এ-ভাবে। ৬০ ডেসিবেল (db)-এর ধ্বনিচাপস্তরে অর্থাৎ ০.০০০২ ডাইন (dyne)/cm^2 এর প্রারম্ভসীমায় প্রতিসেকেণ্ডে ১০০০ চক্করের বিশুদ্ধ সুরের প্রস্বর (pitch) কে ধরা হয় ১০০০ মেল (mels)। প্রস্বর বনাম কম্পাঙ্ক বক্র দেখান হলো ১৭-সংখ্যকচিত্রে।

এক শ্রোতা দুটি স্বতন্ত্র দোলক থেকে বিকল্পে দুটি বিশুদ্ধ সুর শুনতে পায়। তাকে একটি কম্পাঙ্কের (frequency) সঙ্গে অন্যটির দিগুণ প্রস্বরের (pitch) সমন্বয় কর্তে বলা হয়। নির্দেশ দোলকের প্রত্যেক স্থাপনের সঙ্গে দ্বিতীয় দোলকের কয়েকটি যোজনা সন্নিবিষ্ট করা হয়। এ-ভাবে সমস্ত পাল্লাই এর আওতার মধ্যে এসে যায়। শ্রোতাকে অন্যান্য উপাদান মাধ্যমেও প্রস্বরের হ্রাস বা বৃদ্ধি ঘটাতে বলা হয়। এ-থেকে mel-এ একটি প্রস্বরগ্রাম (scale of pitch) তৈরি হয়।[১২৮]

সংগীত থেকে এই 'মেল' শব্দটি সৃষ্টি হয়েচে—এতে বুঝায় 'বোলের' মেল। আগেই লয় ও তালের কথা বলা হয়েচে। গানে তালের ছন্দ ও লয় বিশুদ্ধ হচ্ছে কিনা তার প্রমাণ ও শাসনের জন্যে বাঁয়া মৃদঙ্গাদি যন্ত্রে লঘু-গুরু আঘাত

দিয়ে তালের ছন্দটি গানের সঙ্গে বাদন করার রীতি ভারতীয় সংগীতে প্রচলিত আছে। একে বলে "ঠেকা" দেওয়া। এ-সব আঘাতের প্রস্বন এবং লঘু-গুরুত্ব অনুসারে তাদের প্রত্যেকের একেকটি নাম কল্পিত হয়েচে। যেমন—ধা তেটে



প্রতি সেকেণ্ডে (cps) কম্পাংক চক্কর

চিত্র : ১৭— প্রস্বর বনাম কম্পাংক

ধিন তাক, তা দিৎথুন না প্রভৃতি। এদেরকে 'ঠেকা'র 'বোল' বলা হয়। প্রতিটি তালের বোল পৃথক।[১২৯] লোকসঙ্গীতের বাদ্যে ও নৃত্যে এই বোলেরই অনুসরণ হয়েচে। মাদল প্রভৃতি সাঁওতালি বাদ্যে এ দেখা যায়, যথা—

।　　　　　।　　　　　।　　　　　।
দিপির ঃ দিপাং। দিপির ঃ দিপাং। দিপির ঃ দিপাং। তাং

বাঙলার ঢোল ও ঢাকের বাদ্যেও—

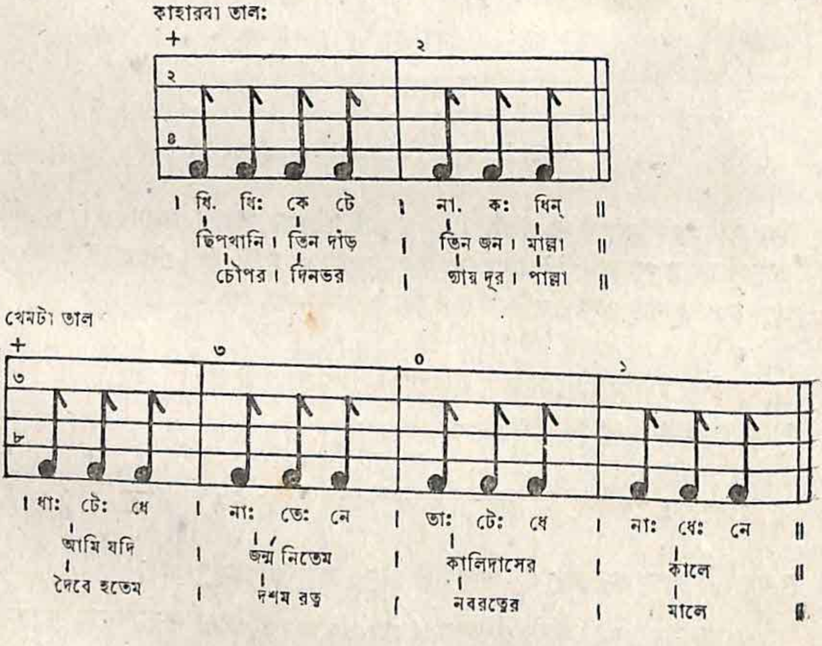
।　　　　　।　　　　　।　　　　　।
গিজতা ঃ গিজোড়্। গিজ্তা ঃ গিজোড়্। গিজ্তা ঃ গিজোড়্। গাং

　　　　।　　　　　।　　　　　।　　　　　।
অথবা　লাক্ চড়া চড়্। লাক্ চড়া চড়্। লাক্ চড়া চড়্। চড়্

এ্যাণ্ডারসন এই আদি প্রচাপ (stress) এর জন্যে দায়ী করেন আদিম অধিবাসীদের। তাঁর মতে এই বাঙ্লা প্রস্বনন দেখা যায় প্রস্বন-কে সামনে ঠেলে দেওয়ায় ; অন্যদিকে হিন্দীতে এর প্রয়োগ দ্বিতীয় এবং কখনো কখনো অন্ত্য

অক্ষরে দ্রষ্টব্য। বাঙলায় শুধু যে স্বতন্ত্র শব্দের আদ্যাক্ষরই প্রস্বনিত হয় তাই নয়, কিন্তু খণ্ড বাক্যের (clause) আদ্যক্ষরও প্রবলভাবে প্রস্বনিত হয়। আদিবাসীরা দ্রাবিড় বা তিব্বত-বর্মীয় কোচ-উচ্চারণ করতেন দীর্ঘ সংশ্লেষাত্মক ক্রিয়াকে অধিছন্দীয় (anacrusis) বা প্রারম্ভিক (start-off) প্রস্বনে। এণ্ডারসনের সিদ্ধান্ত তাই : "বাঙলা প্রস্বন হিন্দী বা মারাঠী প্রস্বন থেকে আলাদা যেমন নাকি ফরাসী প্রস্বন ইংরেজি বা জার্মান প্রস্বন থেকে স্বতন্ত্র ; পক্ষান্তরে ভারত ও ইউরোপের অধিকাংশ আধুনিক ভাষায় আছে প্রবল শব্দ-চাপ (word stress)। তাই এত কম বিদেশীই আদিবাসীদের মতো ফরাসী বা বাঙ্‌লা বলতে পারেন। ফরাসীতে সুরেলা প্রস্বন (accent tonic) আগে আসে এবং বিরতি পদ্যে মধ্যযতি ঘোষণা করে। বাঙলায় এ বিরতির পরে আদি অধিছন্দীয় প্রস্বন যা আসে উক্তির ধ্বনিময় এককের প্রারম্ভে। হিন্দি, ইংরেজী, মারাঠী, ইতালীয়, জার্মান প্রভৃতিতে শব্দের উপর অবস্থান-নিরপেক্ষ চাপ, পড়ে ; কিন্তু ফরাসী ও বাঙলায় খণ্ডবাক্যে শব্দের অবস্থান অনুসারে প্রস্বনের হেরফের হয়।"[১৩০] বস্তুত এই আদ্যক্ষর চাপ ওয়েল্‌স্ লোকদের ইংরেজী উচ্চারণের মতো : এর নাম প্রচাপ (stress)।

বাদ্যের এই দেশজ তাল ও ছন্দ দেখা যায় প্রাকৃত বাংলার ছন্দে। এর দু'টি প্রকার লক্ষণীয়—কাহারবা তালের চার মাত্রা ও খেমটা তালের ছ'মাত্রা। উদাহরণ নিচে দেয়া হলো ১৮-সংখ্যক চিত্রে।[১২৯]



চিত্র : ১৮— কাহারবা ও খেমটা তাল

এই রীতি পাশ্চাত্য লোকসংগীত ও নৃত্যেও দ্রষ্টব্য। সাধারণত তিনটি সূত্র সেখানে ক্রিয়াশীল। প্রথমত, মূলসুরের ঐক্য; দ্বিতীয়ত, বাক্য ও বাক্যাংশের সামঞ্জস্য; তৃতীয়ত, প্রথম ও দ্বিতীয় নীতিকে বলবত্তর করতে কমি-বেশি অনুক্রম বা রূপকল্পের ব্যাপক ব্যবহার। সংগীতে তাড়ন (beat) সমষ্টি দণ্ডে (bar) সংগঠিত হয়; আবার দণ্ডগুলি বৃহত্তর এককে রূপ ধরে, যেমন মেল (phrase), বাক্য (sentence), পর্যায় (period) প্রভৃতি। কাজেই মেল হলো স্পন্দীয় গড়নের ক্ষুদ্রতম একক, সাধারণত যাতে থাকে দুটি দণ্ড এবং এ অপূর্ণ। তাই বাক্যে রূপান্তরণের জন্যে এর প্রয়োজন এক বা একাধিক অনুরূপ মেল-এর। ফলে 'God save the king' বাক্যে আছে তিনটি দ্বি-দণ্ড মেল। লোকসংগীতের দুটি গড়ন চোখে পড়ে—দ্বিক (binary); ও ত্রিক (ternary)। ধরা যাক চারটি মেলের পর্যায়কাল (period) a, b, a, c, যেখানে a হলো প্রারম্ভিক মেল। দ্বিক গড়নে থাকে দুটি বাক্য বা ভাগ এবং প্রত্যেক একক বা মেল যুগল একটি বাক্যে পরিণত হয়, যথা $a^1b \| a^2b$। এর চেয়ে বৃহত্তর সুতানে (melody) বাক্য ও মেলের পুনরাবৃত্তি ঘটে, যেমন $a^1b \| c^2c \| a^3b$। বাক্য বুঝাতে যদি A,B ব্যবহৃত হয়। তবে দ্বিক হবে AB ঃ আর ত্রিক ABA। এখানে স্মর্তব্য যে ইউরোপে সতেরো ও আঠারো সতকে কণ্ঠসংগীতে ত্রিকের প্রভাব বেশী হয়েচে ঃ কিন্তু যন্ত্রসংগীতে দ্বিকের প্রাধান্য বজায় ছিল।[৫০] এতে আছে সঙ্গত যা মেলের সগোত্রীয় ঃ সঙ্গত তৈরি হয়েছে সম্ (বাদ্যের আরম্ভ) ও গত (গীতবাদ্যের বিশ্রামস্থল) নিয়ে। দুয়েই আছে প্রারম্ভ ও শেষ।

উপরের আলোচনা থেকে এটা সুস্পষ্ট যে ইউরোপীয় সংগীতের beat and bar theory-র বাঙলা প্রতিরূপ 'পর্ব-পর্বাঙ্গবাদ' নয়,[১২] কিন্তু 'তাড়ন-ও-দণ্ডবাদ'। তাছাড়া সাধু বাঙলার পদ ও পর্ব এবং প্রাকৃত বাঙলার মেল এক নয়। প্রথমে আছে প্রস্বর (pitch), আর দ্বিতীয় প্রচাপ (stress)। কাজেই পদ, পর্ব ও মেলকে গুলিয়ে দেয়ার কোন হেতু নেই। এতে ছন্দের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ স্থান পায়নি এবং এ অবৈজ্ঞানিক। তাই এক প্রবীন ছান্দাসিক ঠিকই বলেচেন ঃ "দুই ধ্বনি প্রকৃতির দুই ভাষা (সাধু ও প্রাকৃত), ও ছন্দের তিন ঠাটকেই এক গাড়ে ঠেলিয়া দিয়া বাংলা ছন্দের মূলসূত্র আবিষ্কার পাণ্ডিত্যের প্রশংসা করিলেও বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারিনা। ছন্দের প্রকৃতিও তাহার ঠাটগুলিতে এই 'সর্বংখল্বিদং ছন্দে'র (Bar and beat থিয়রি) মত ছন্দতত্ত্বের শরণাপন্ন হইবার প্রয়োজন নাই ; এই তত্ত্বকে 'দণ্ড ও আঘাতের' মতো আস্ফালন করিবার কোন হেতু নাই।"[৯২] এখানে মনে রাখতে হবে যে প্রস্বর ও প্রচাপ এক নয়—সাধারণভাবে সাধু বা সংস্কৃত বাঙলা প্রস্বর-নির্ভর, কিন্তু প্রাকৃত বাঙলা প্রচাপনির্ভর। একটিতে কাজ করে উরস স্পন্দ (chest pulse), অন্যটিতে

প্রচাপ স্পন্দ (stress pulse)। একথা আগেই বলা হয়েচে। ফলে প্রথমটিতে উদ্ভূত হয় অক্ষর-বৃত্ত (syllable-timed) স্পন্দ, আর দ্বিতীয়টিতে প্রচাপ-বৃত্ত (stress-timed) স্পন্দ।[১৩১] দুটি স্পন্দ যে এক নয় তা বলাই বাহুল্য। তাই ভাষাতাত্ত্বিক ছন্দশাস্ত্র গড়ে তুলেচেন S. Chatman ১৯৬৪ সালে নিছক স্পন্দীয় ভিত্তিতে। এখানে দুটি ভাগ আছে—একটি, আবির্ভাব (event) ; অন্যটি অভিক্ষেপ (prominence)। প্রথমটির রূপকার অক্ষর (syllable), দ্বিতীয়টি জটিলতর। ছান্দসিক অভিক্ষেপ রূপায়িত হতে পারে একাধিক লক্ষণের যে কোন একটি দিয়েঃ ভাষাতাত্ত্বিক প্রচাপ, প্রস্বর বা শূণ্য রূপায়ণ। ছন্দোচরণে প্রচাপ ছাঁচ গঠন-নির্ভর ও পরিবর্তনশীল। চ্যাটম্যানের মতেঃ "কবিতার ছন্দ অর্থপূর্ণ ছন্দোলিপির ধাত্র। স্পন্দ হলো মানুষের শ্রুতিসুলভ প্রত্যক্ষ (percept), কিন্তু ছন্দ কল্পনা"। মনই এখানে কর্তা, জ্ঞানেন্দ্রিয়রা নয়—সে স্বতন্ত্রভাষাতাত্ত্বিক প্রপঞ্চকে সরল বিভেদে রূপ দেয়, আর আলাদা জিনিস মেপে তাদের সমীকরণ বানায়। ছন্দ তাই কোন চরণের গঠন বা শ্রুতিকে প্রভাবিত করে না, তবে, শুধুমাত্র এই বোধ জন্মায় যে স্পন্দকে যে-কোন বিমূর্ত পরিকল্পের সমতুল্য করা যেতে পারে—পরিকল্পটি অবশ্য অনুমিত কিন্তু প্রত্যক্ষীভূত নয় এবং পঠনের উপর এর কোন প্রভাব পড়ে না।[১৩২]

(১৮) যতি (pause)- ৫ম অধ্যায়ের (৫.৪) দ্রষ্টব্যঃ "ছেদ, যতি ও বিরাম"। শব্দটির ব্যুৎপত্তি এরূপঃ যম্ (নিবৃত্ত করা)+ তি (ধি), যাতে জিহ্বা নিবৃত্ত হয়। এর অর্থ ছন্দে স্বরের বিরাম স্থান।[১৩৩] তাই পিঙ্গলের "ছন্দঃ সূত্রম্" (৬।১) এ বলা হয়েচেঃ "যতির্বিচ্ছেদঃ" অর্থাৎ যতি হলো চরণ-বিভাজন। এর ব্যাখ্যা করেচেন হলায়ুধ তাঁর বৃত্তিতেঃ "বিচ্ছিদ্যতে বিভজ্যতে পদ পাঠো হস্মিন্নিতি বিচ্ছেদো বিশ্রামস্থানম্, স চ যতিরিত্যুচ্যতে"। যতির প্রয়োগ সম্পর্কে তিনি শ্লোক উদ্ধৃত করেচেন যার অর্থ হলোঃ "প্রতি পর্বান্তে যতি থাকবে এবং বিশেষত প্রত্যেক শ্লোকার্ধে। চার বা অধিক অক্ষরের পরেও এ পড়তে পারে—কখনো এ আসে শব্দ মধ্যে।" ছন্দোমঞ্জরীতেও (১।১২) আছে ঐ একই কথাঃ

যতির্জিহ্বেষ্ট বিশ্রামস্থানং কবিভিরুচ্যতে।
সা বিচ্ছেদ বিরামাদ্যৈঃ পদৈর্বাচ্যা নিজেচ্ছায়া ॥

ছন্দের মধ্যে জিহ্বার বিরামার্থে, অথবা শ্বাসগ্রহণার্থে যে বিচ্ছেদের স্থান থাকে তাকে ছান্দসিকগণ 'যতি' নামে অভিহিত করেন। ছন্দের যত্রতত্র বিশ্রাম গ্রহণ অসম্ভব, কেননা তাহলে ছন্দভঙ্গ হবে। হেমচন্দ্রের "ছন্দোহনুশাসনম্" (১।১৫) এও বলা হয়েচেঃ "শ্রব্যো বিরামো যতিঃ"। এখানে লক্ষণীয় যে পিঙ্গল যেখানে জোর দিয়েচেন বক্তার কথনবিরতির পরে, সেখানে হেমচন্দ্র শ্রোতার শ্রুতি-বিরতিকেই তুলে ধরেচেন।

যতির উৎপত্তিতে আছে ছন্দের ত্রিধা বিবর্তন—বৈদিক ; সংস্কৃত ; প্রাকৃত। বৈদিক ছন্দ হলো 'অক্ষরবৃত্ত', যা দেখা যায় গায়ত্রী-অনুষ্টুভ, ত্রিষ্টুভ্‌ জগতী-তে। এতে আছে ৮, ১১ ও ১২টি বর্ণ, আর গায়ত্রীতে আছে তিনপংক্তির স্তবক, যদিও অন্য তিনটিতে চার পংক্তির স্তবক (stanza)। এ ছন্দ হ্রস্ব-দীর্ঘত্বের কোন পার্থক্য নির্দেশ করেনা। স্বর-মড়ুলনই এর বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত এই তিন প্রস্বরের ভিত্তিতে রচিত। পরে এলো ধ্রুপদী সংস্কৃতের 'বর্ণবৃত্ত' ছন্দ, যেখানে প্রথম দেখা দিল ধ্বনি-পরিবৃত্তি। এতে এলো হ্রস্ব-দীর্ঘবর্ণের পার্থক্য তিনটি বিষয়ে—এক, ধ্বনিমান ; দুই, আক্ষরিক পরিমাণ ; ও তিন, উচ্চারণকাল। দীর্ঘবর্ণ হ্রস্বের দ্বিগুণ বলে স্বীকৃত হলো এবং তাদের পরম্পরাক্রমও নির্দিষ্ট হলো। বৈদিক ছন্দের একক ছিল একক বর্ণ ; এখানে এলো হ্রস্ব-দীর্ঘ-বর্ণের ক্রমও। আর এই অনুক্রম নির্ধারিত হলো বর্ণসমবায়ে—তিন বর্ণের সমবায়ই নেয়া হলো, কেননা এ বৃহতের মধ্যে ক্ষুদ্রতম এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহত্তম। পিঙ্গলই এই ত্রিকের স্রষ্টা, আর এর আছে ৮টি সংখ্যা, যথা ম, য, র, স, ট, জ, ভ, ও ন। বর্ণ-বৃত্তের একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য যতি-র সৃষ্টি—চরণমধ্যেই এ হলো ছন্দবিরাম। এরি ফলে উচ্চারণের সুবিধা হয়—প্রথমে ছিল এ প্রথাসিদ্ধ, পরে হলো এ আবশ্যিক। এরপরে সংস্কৃতে এলো তৃতীয় আরেকটি ছন্দ যার নাম 'মাত্রাবৃত্ত'—এ নেতিবাচক 'বর্ণবৃত্ত' অর্থাৎ মাত্রাগণের সংযোগস্থলে দীর্ঘবর্ণ পরিত্যক্ত হলো। ছন্দ পরে প্রাকৃত অপভ্রংশে মোড় নিল এবং এলো তালবৃত্ত—এখানে হ্রস্ব-দীর্ঘের বিভেদ নিরূপিত হতে লাগল 'তাল' অনুসারে। 'কাল-মাত্রা'র সমীকরণ স্বভাবতই লোপ পেল। তাল-বা সংগীত এলো স্বর বা ধ্বনির প্রচাপনে, যা দেখা দিল কালমাত্রা নির্ধারিত নির্দিষ্ট সময়ের পরে তালি দেওয়ায়। এই তালির সংস্কৃত নাম তাল, যা তড়্‌-ধাতু থেকে উদ্ভূত এবং এর মানে আঘাত করা বা ঘা দেওয়া।[১৩৪] এখানে লক্ষণীয় যে এই তিনটি ধারাই দেখা যায় বাঙলা ছন্দের ত্রিধা বিভাগে, যদিও তারা আছে পরিবর্তিত আকারে। তাই অক্ষরবৃত্তের প্রতিতুল তানবৃত্ত, বর্ণবৃত্তের অনুরূপ স্বনবৃত্ত, আর তানবৃত্তের অনুবন্ধী বলবৃত্ত।

উপরের আলোচনায় এটা সুস্পষ্ট যে 'যতি' জিভের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ও শ্রবণের অনুগামী। তাই অর্থের সঙ্গে একে যুক্ত করলে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হতে পারে। সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে যতির প্রকারভেদ এরকম ঃ পূর্ণযতি ঃ পর্বযতি—সমাসগত, সন্ধিগত ও পদমধ্য ; আর খণ্ডযতি।[১৩৫] এখানে অর্থের দ্যোতনা নেই এবং এ যতি যে শ্রুতিগত, তার কথা বলেচেন হেমচন্দ্র ঃ 'শ্রব্যো বিরামো যতিঃ'। হিন্দিতে আছে 'বিরাম'—এ ছন্দোগতও দু'রকমের, যথা বাক্যগত ও তানগত। তাই এ পূর্ণযতি ও অর্ধযতি এবং চরণান্তিক, আবার এ মধ্যগও। লক্ষণীয় যে এ শুধু ছান্দোগত, অর্থগত নয়। অর্থাৎ বিরাম হলো metrical pause। জয়কীর্তিকৃত

'ছন্দোঽনুশাসনে' (১।১০) বলা হয়েছে ঃ 'বাগ্বিরামো যতিঃ স্যাৎসংস্থাপ্যতে শ্রুতি সুন্দরম্‌ ; জয়দেবের 'ছন্দে' (১।৯) ঃ 'বিরামো যতিরিতি' ; ভট্ট কেদারের 'বৃত্তরত্নাকরে' (১।১১) ঃ "জ্ঞেয়ঃ পাদ চতুশ্চতুর্থাংশো যতির্বিচ্ছেদ সংজ্ঞিতা" ।[১৩৭] কোথাও 'ছেদের উল্লেখ নেই, যা পারিভাষিক অর্থে প্রযোজ্য। এমতাবস্থায় এক প্রবীন ছান্দসিকের উক্তি বিচারসহ নয়, কেননা এ অজ্ঞতা-প্রসূত ঃ "সংস্কৃত, প্রাকৃত, হিন্দি প্রভৃতি সব ভাষাতেই যতি ও ছেদ অভিন্ন বলে স্বীকৃত। প্রয়োজন মতো 'ভাবযতি' এবং 'ছন্দোযতি' ব্যবহার করলেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় এবং ভ্রান্তির পথও রুদ্ধ হয়।"[৬৭] প্রসঙ্গত স্মর্তব্য যে ছন্দঃশাস্ত্রে 'ছেদ' ও 'যতি'র অভেদের প্রশ্নই ওঠে না, কেননা, 'যতি' ব্যবহৃত হয়েচে পারিভাষিক শব্দ হিসেবে, আর 'ছেদে'র নেই সেইস্থান।[১৩৮]

সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রে 'গণ' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েচে ইংরেজি foot এর প্রতিশব্দ হিসেবে। দু'টি বিরামের মধ্যবর্ত্তী অংশকে 'গণ' বলে। গণ্যতে ইতি গণঃ —যা গণনা করা যায় তাই-ই গণ। অর্থাৎ এক, এক দুই, এক দুই তিন বা এক দুই তিন চার ইত্যাদি গণনা ক্রমে যে মাত্রাসকল সম্বন্ধ হয়ে ছন্দ গঠিত হয়, তা-ই-ই গণ, যেমন এক-ক্রিয়া বা একমাত্রিকগণ, দ্বিক্রিয়া বা দ্বি-মাত্রিকগণ প্রভৃতি।[১২৯] এই 'গণ' বাঙলা ছন্দে তিনটি আকারে প্রকাশ পেয়েচে বিরামের প্রকৃতি অনুসারে। প্রথমেই পদ যা ছেদ-ভিত্তিক অর্থাৎ তানের সঙ্গে মধ্য উচ্চারণে হয় এর উদ্ভব। তাই ৮+৬ বা ৮+১০এ চরণ গড়ে ওঠে এবং এ ছন্দকে বলা হয় তানবৃত্ত। দ্বিতীয়ে আছে পর্ব, এ যতি-ভিত্তিক অর্থাৎ বিলম্বিতলয়ে ধ্বনির পূর্ণ উচ্চারণই এর কাম্য ; তাই আসে স্বনবৃত্ত। আর তৃতীয়ে আছে চাপের প্রাধান্য যার চলন দ্রুত এবং এর পদক্ষেপ ঘটে মেল-এ। আর মেল-এ হিসাব রাখতে হয় চাপ বা বলের সুস্থিতির। তাই ন্যাস বা বিরামএর ভিত্তি এবং উচ্চারণের বলই এর বনিয়াদ বলে একে বলা হয় বলবৃত্ত। প্রথম দু'টিতে আদ্য অক্ষরের ঝোঁকই প্রস্বরের কাজ করে ; আর তৃতীয়টিতে প্রচাপের বল। স্বনবৃত্তে ও তানবৃত্তে আদৌ মাত্রাপরিমাণই গণ্য ; কিন্তু বলবৃত্তে চরণ খণ্ডিত হয় বিরামে অর্থাৎ মেল-বিভাগে। আর এই মেল-এ আছে বিপরীতের সমাহার—প্রচাপ ও

| | ৯

বিরামের সমন্বয়ন, যেমন, বৃষ্টি পড়ে। টাপুর টুপুর। প্রথমের প্রবল চাপ দ্বিতীয়ের বিরামে মেল বেঁধেচে।

(১৯) লয় (tempo)—√লী+অ (অচ্‌) ভাববাচ্যে— এভাবে শব্দটি সাধিত হয়েচে আর লী-ধাতুর অর্থ হলো 'মিলিত হওয়া'। অর্থাৎ গীতের আদ্যোপান্তে কালপরিমাণের নিয়ম এক সমান রাখাকে লয় বলে। তাইতো অমর কোষে আছে ঃ 'লয়ঃ সাম্যম্‌'। অমর কোষ টীকায় উক্ত হয়েচে যে এ

গীতবাদ্য পাদন্যাসাদির ক্রিয়াকলাপের পরস্পর সাম্য। রঘুবংশে [৯(৩৫)] বলা হয়েচে, লয়-এ বুঝায় নৃত্যগীত বাদ্যের কালক্রিয়ার ঐক্য অর্থাৎ তালসাম্য। এই লয় দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত ভেদে ত্রিবিধ ঃ মহাভারতম্ (২।৪।৩৮)।[১৩৯] এই লয়কে অর্থাৎ কাল পরিমাণের তুল্যতাকে রক্ষা ও শাসন করাই তালের উদ্দেশ্য—গান ক্রিয়ার লয় প্রদর্শন করাকে 'তাল' বলে। লয় প্রকাশের জন্যে কোন-কোন অক্ষর সবলে উচ্চারণ কর্তে হয় এবং এই বলবৎ উচ্চারণকে প্রস্বন বলে। এক করতলের উপর অপর করতলের আঘাত দ্বারা অর্থাৎ করতালি দ্বারা ঐ প্রস্বন দেখানো হয় ব'লে, গানকালের ঐ পরিমাণ করার নাম 'তাল' রাখা হয়েচে।[১২৯] মহাভারতে (২।৪।১৫) উক্ত হয়েচে তাল, প্রমাণ ও লয়স্থান। নীলকণ্ঠ তাঁর "ভারত ভাবদীপা" টীকায় বলচেন ঃ "সাম্যং তাল বিশেষঃ । প্রমাণে গীতবাদ্য তালানাং ধ্বনিসাম্যে, লয়ে দ্রুত মধ্য বিলম্বিতে। স্থানে উরঃ শিরঃ কণ্ঠাদৌ।"

তাই Monier-Williamsও বলেন ঃ "লয়—(in music) time, regarded as of three kinds, viz druta (quick) madhya (mean or moderate) and vilambita (slow)।"[১৪০] কিন্তু এক প্রবীন ছান্দসিকলয়ের ইংরেজী করেচেন 'cadence' এবং 'মধ্যলয়ে'র জায়গায় আমদানি করেচেন 'ধীর লয়'।[৪৫] কিন্তু এ-উক্তি অজ্ঞানতা—প্রসূত ও ভুল। প্রথমত, cadence-এর প্রতিশব্দ 'ন্যাস' আর লয়ের প্রতিশব্দ ইংরেজি tempo। এই ন্যাস বা cadence-এর কথা আগেই বলা হয়েচে বিরামের সংজ্ঞা নিরূপণে। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় cadenceকে 'ন্যাস'ই বলেচেন।[১১০] তা ছাড়া অমরকোষ টীকায় বলা হয়েচে যে গীতবাদ্য পাদন্যাসাদির ক্রিয়াকালের সাম্যই 'লয়'—ন্যাস তাই লয়ের অন্তর্গত, কিন্তু এর সঙ্গে অভিন্ন নয়। দ্বিতীয়ত, লয় সব জায়গায় 'মধ্য' বলে ঘোষিত হয়েচে ; এমনকি মনিয়র উইলিয়ামস্ও তা স্বীকার করেচেন। এমতাবস্থায় তাঁরি দোহাই দিয়ে 'ধীর লয়'-এর সমর্থন যুক্তিসহ নয়। যেখানে ত্রিধা লয় বলতেই শাস্ত্রকাররা দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত বলেচেন, সেখানে 'মধ্য'-এর পরিবর্তে 'ধীর'এর আমদানি অজ্ঞানতার পরিচায়ক।

ইংরেজী cadence শব্দটি মধ্য ইংরেজীতে আসে প্রাচীন ইতালীয় cadenza থেকে, যা, cadere ক্রিয়া থেকে উদ্ভূত এবং এর অর্থ 'পতিত হওয়া'। ১৫৯৭ খ্রীষ্টাব্দে দু'টির প্রয়োগ দেখা যায় এবং এদের অর্থ গীতল বিচলন বা বাক্যাংশের (মেল-এর) সমাপ্তি। আর tempo শব্দটি এসেচে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে লাতিন tempus থেকে, যার অর্থ 'কাল'। সংগীতে এর অর্থ "নাচ বা অন্য সুরের বিশেষ বেগ ও স্পন্দ ; বিচলনের আপেক্ষিক বেগ বা হার"।[১৪১] এখানে লক্ষণীয় যে, 'পতন' আর 'কাল' এক নয় যেমন, তেমনি ন্যাস ও লয়ও এক নয়।

(২০) স্পন্দ (rhythm)—দ্বিতীয় অধ্যায়ের (২.১৪) দ্রষ্টব্য ; এ-প্রসঙ্গে (৬)

সংখ্যক 'ছন্দ'-ও পঠিতব্য। কথ্যস্পন্দের উপাদান হলো বাক্-এর ভৌত অবয়ব, ও কালায়নে মৌন ভাঙ্গা স্বরধ্বনির প্রবাহ, যার বিভেদন জন্ম নেয় একদিকে যেমন মৌনের স্থিতিতে ও মৌন খণ্ডক ধ্বনিতে, তেমনি উক্তির প্রকৃতি, প্রস্বর, দৈর্ঘ্য ও তীক্ষ্ণতা সম্পর্কীয় ধ্বনি পরিবৃত্তিতে। সব ভাষায়ই এ-সব উপাদান বর্তমান; কিন্তু তাদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন উপাদানের উপর জোর দেওয়া হয় এবং বিভিন্ন সম্পর্ক স্থাপিত হয়। যে-কোন ভাষার এইসব জন্মগত বৈশিষ্ট্যই পদ্যগঠনের তাৎক্ষণিক স্থৈতিক উপাদান, যা আরো বলবৎ। হয় নাচ বা গানের বহিঃস্ত প্রভাবে। এতে স্পন্দমান আদর্শ গড়ে ওঠে সুস্পষ্ট পুনর্বৃত্তি ও বৈসাদৃশ্যের সমবায়ে। কাজেই স্পন্দের সংজ্ঞা দেওয়া যায় এ-ভাবে ঃ "স্পন্দো (হলো) প্রত্যক্ষ উপাত্তের কালিক শ্রেণীতে পৌনঃপুনিক একান্তরণ, যা লীলায়িত হয় বেশি স্পষ্ট ও কম স্পষ্ট এক বা একাধিক উপাদানের মধ্যে"।[১৪২]

সবলতম স্পন্দ বাদে আর সবগুলোতেই তিনটি উপাদান বর্তমান। প্রথমত, প্রবলতর ও দুর্বলতর উপাদানের আবর্তক একান্তরণ এবং উভয়ের পারিস্পরিক স্বভাবজাত রূপকল্প বর্তমান। দ্বিতীয়ত, আছে শ্রেণী সমগ্রের খণ্ডে-খণ্ডে বিভাজন, যা ঘটে দুটি কারণে—এক, উপাদানের প্রকৃতি ও আবর্তক একান্তরণ; দুই প্রত্যক্ষণের জন্যে দুর্বলতর উপাদানের প্রবলতরকে ঘিরে সংঘায়ন বা কেলাসন। তৃতীয়ত, শ্রেণীর প্রত্যক্ষ বিভাগের মধ্যে কালিক সম্পর্ক। প্রথমটির নাম ন্যাস, যা দেখা যায় পদ, পর্ব ও মেল-এ; দ্বিতীয়টিকে বলে সংঘায়ন যা গড়ে ওঠে স্বর, স্বন ও বল-এর ভিত্তিতে; আর তৃতীয়টি হলো মাত্রা, যা কালের মাপনী।

(২১) স্বর (vowel)—আগেই বলা হয়েচে ব্যঞ্জন হলো সূচনা ও শেষ বুঝানোর ক্ষণস্থায়ী ধ্বনি। আর স্বরধ্বনি হলো স্বরোৎপন্ন ধ্বনির স্থির অবস্থা। এখানে স্মর্তব্য যে অক্ষর স্বর ও ব্যঞ্জনের সমবায়ে উৎপন্ন। স্বর বাক্-এর অধিকাংশ শক্তি বহন করে। স্বরোৎপত্তির তত্ত্বানুসারে প্রতিটি স্বরবর্ণে থাকে প্রধানত দুটি সুর, যা স্বরধ্বনির প্রস্বর-নির্ভর নয়। স্বরধ্বনির প্রধান উৎস হলো মুখ ও জিভ্, যা দুনী অনুনাদকের কাজ করে। তবে এই দুনী অনুনাদকের উদ্দীপনরীতি এখনো রহস্যাবৃত। Helmholtz-এর মতে দুনী অনুনাদক স্বরযন্ত্রীয় স্বরাংশের কিছু কিছু ব্যাখ্যা দিয়েচে। কিন্তু এতে কোন ব্যাখ্যা নেই কোন ক্রিয়া বিধিতে স্বরধ্বনির তথা স্বরতন্ত্রীয় স্বরের প্রস্বর কখন স্বরধ্বনির বিশিষ্টসুরের একটি বা উভয়ের উপরে থাকবে। তাছাড়া এতে স্বরযন্ত্রের উপর অনুনাদকের ক্রিয়ারও কোন উল্লেখ নেই। Hermann স্বরযন্ত্র ও অনুনাদককে একটি যুগ্মিত তন্ত্র (coupled system) বলে মনে করেন। তৃতীয় আরেকটি মতবাদে বলা হয়েচে যে উদ্দীপন আসে শ্বাসরন্ধ্র নির্গত বায়ুর কমিবেশি পর্যাবৃত্ত দমকায়। এতে স্বর ও স্বরযন্ত্রের মধ্যে কোন সুসঙ্গত সম্পর্কের প্রয়োজন নেই। স্বরগুণ নির্ভর করে

মুখবিবরে জিভের সঠিক অবস্থানের উপর এবং এতে স্বরের দুটি সুরের মধ্যে সুসমঞ্জস সম্পর্ক গড়ে ওঠে। পৃথিবীর ভাষা সমূহে সত্তরেরও বেশি আছে স্বর।[১১৪] বাঙলায় মূল স্বরধ্বনি হলো ৮টি—ই, এ, এ্যা, আ, অ, ও', ও, উ।

ধ্বনির উৎপত্তির জন্যে প্রয়োজন একটি কম্প্র মাধ্যম যা শক্তি-সংযোগে গতিশীল হয়ে ওঠে। কম্পকের কাজ করে স্বরতন্ত্রী দুটি, যখন ফুসফুসীয় বায়ুচাপে এরা সক্রিয় হয়। এ-ছাড়া স্বরযন্ত্রীয় ধ্বনির পরিবর্তন ঘটায় গলনালী, মুখবিবর ও কোন কোন ক্ষেত্রে নাসিকা গহ্বরস্থ অনুনাদী প্রকোষ্ঠ। কাজেই শ্রোতার ধ্বনি-গুণের ধারণা কম্পক ও অনুনাদকের যৌথ ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। এখানে স্মর্তব্য যে স্বাভাবিক স্বরধ্বনির ভিত্তি হলো শ্বাসরন্ধ্রীয় সুর (glottal tone)। গুণ পরিবর্তনের জন্যে দায়ী অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় অনুনাদক। বস্তুত স্বরতন্ত্রীর স্পন্দন এমন যে মূল কম্পাঙ্ক ছাড়াও কিছু সংখ্যক অধিসুর বা সুরগুণিতক উৎপন্ন হয়। ধ্বনিগুণের সৃষ্টিলগ্নে আছে যে বিভিন্ন তীক্ষ্ণতাযুক্ত কম্পাঙ্কের জটিল পাল্লা তাকেই বলে শব্দবর্ণালি (acoustic spectrum), আর কোন একটি ধ্বনির বৈশিষ্ট্যসূচক শক্তিপটিকে ধ্বনির (স্বরের) প্রস্বরাবয়ব (formant) অর্থাৎ সুরের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অপরিবর্তনশীল স্বরাংশসমষ্টি। শব্দ বর্ণালি লেখীযন্ত্রে এ সম্বন্ধে পরীক্ষা হয়েচে। স্বরের তিনটি প্রস্বরাবয়ব আছে 4000 cps-এর মধ্যে এবং এদের সহায়তায় স্বরের শাব্দিক গড়নের সনাক্তকরণ সম্ভব।[১৪৩] বাংলা স্বরধ্বনির তিনটি প্রস্বরাবয়ব স্ত্রীকণ্ঠে কেমন দাঁড়ায় তার পরিচয় নিচে দেয়া হলো—(I) একক—উচ্চারিত স্বর; (II) বাক্যে উচ্চারিত স্বর যথা 'একটা কাল গাড়ি'; এবং (III) প্, ফ্, ব্, ভ্ প্রভাবিত আ-স্বর।

সারণী ঃ ৩-স্বরের কম্পাঙ্ক মান[১০৭]

		I. একক-উচ্চারিত			II. বাক্যে উচ্চারিত			III. প্রভাবিত 'আ'
		ই	এ্যা	আ	ই	এ্যা	আ	ব্যঞ্জনে বিশেষ কোন পরিবর্তন নেই ঃ শুধুমাত্র ভা-তে তৃতীয় প্রস্বরাবয়ব অনুপস্থিত
প্রস্বরা-	১	400	750	800	400	750	800	
বয়ব	২	2700	2000	1500	2700	1850	1700	
(formant)	৩	3250	3000	2700	4500	2750	3000	

IV. অন্যান্য স্বরধ্বনির প্রস্বরাবয়ব

		অ	ও	এ	উ
প্রস্বরা-	১	400	400	350	403
বয়ব	২	1000	800	2500	800
(formant)	৩	3000	3000	3000	×

সপ্তম অধ্যায় ঃ ছন্দের স্বরূপ

স্পন্দ হলো একটি চরণ গতির সামগ্রিক গুণ আর এ বিভিন্ন উপাদানের গুণফল, কেবল প্রচাপ বা মাত্রা নয়। স্পন্দমিতি বা ছন্দ বলবিদ্যার বিষয়; স্পন্দ প্রায় অবিশ্লেষ্যভাবে জৈব। ছন্দ সংজ্ঞিত হতে পারে চরণ মধ্যে শাব্দিক খুঁটিনাটির—তাত্ত্বিকভাবে নিয়মিত, যদিও ব্যবহারের দিক থেকে কখনো কখনো অনেকটা বিভিন্ন—এক আবর্তক ছাঁচ হিসেবে। কাজেই সংজ্ঞায় ছন্দকে বর্ণনা কর্তে হয় চরণ মধ্যে বা চরণ পরম্পরায় কোন নিয়মিত ছাঁচে প্রচাপ, মাত্রা, প্রস্বর বা নিছক সংখ্যা অনুসারে অক্ষর বণ্টনরূপে। আরও রেওয়াজ আছে প্রতিটি চরণে মাত্রিক একক বা পর্ব নির্দেশ করার। আমরা স্পন্দকে নদীর সঙ্গে তুলনা কর্তে পারি ঃ এর উপনদীগুলি হলো প্রচাপ, অক্ষরের স্থিতিকাল, যতি, মেল বা পদক্রম ও সামগ্রিক অর্থ। আর নদীর মতোই যে কোন স্পন্দ জটিল, প্রায় অবিশ্লেষ্য স্রোতে পূর্ণ এবং সর্বদাই পদক্ষেপ ও মেজাজে পরিবর্তনশীল।

—কে, শেপিরো ও আর, বিউম[১]

৭.১ ছন্দের প্রকার ও নামকরণ

গদ্য ও সংগীতের মতো কবিতা কালে সঞ্চরণশীল ধ্বনিকলা। বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্যে ধ্বনিগুলি বিভিন্ন এককে বিশ্লেষিত হতে পারে, যেমন স্বন (phone) বা অক্ষর। কাজেই ধ্বনি উচ্চারিত হয় এবং প্রত্যক্ষীভূত হয় ক্রমিকভাবে। লেখ্য বা কথ্য অক্ষরের অগ্রগতির সঙ্গেসঙ্গেই এরা ভাব ও চিত্রকল্প সৃষ্টি কর্তে থাকে যা বুঝে আমরা সাড়া দি। যুগপৎ আমরা সাড়া দি ধ্বনিতে এবং বিচলন গুণেও অর্থাৎ তাদের আপেক্ষিক বেগ বা শ্লথন এবং সাপেক্ষ সমতার পরিপাটিতে। ধ্বনিপ্রবাহ একাধারে চিত্রকল্প, চিন্তা ও অনুভূতিতে রূপ নেয়, অন্যদিকে এ নিজস্ব অধিকারে প্রতিষ্ঠিত থাকে অর্থাৎ কিনা নিছক ধ্বনি হিসেবে। কবিতার কন্দরে রয়েচে ধ্বনি, আর বিচলন ও ছাঁচ-এ কবির আঙ্গিকের অংশ এবং শব্দার্থের মতোই কবিতায় আমাদের কল্পনা ও আবেগের সাড়া নির্ধারণে সমান তাৎপর্যপূর্ণ। কাজেই বলা যেতে পারে যে কবির ছন্দঃশাস্ত্র বা ছন্দোবিজ্ঞান—ধ্বনিপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণভাষার মধ্যেই তাঁর ভাষা। ছন্দঃশাস্ত্র কবিতার চিন্তা ও অনুভূতির পরিপূরক ঃ এ-বিভিন্ন উপাদানকে এক অবিভাজ্য ও বোধগম্য অভিজ্ঞতায় রূপান্তরণের সহায়ক। কাব্যরাণীর নির্দেশ হলো ঃ "অন্তরে তাকাও তুমি তারপরে লেখো"।[২] তাই কবিতার দৃষ্টি ও তার ছন্দায়ণের (versification) মধ্যে আছে একটি নিবিড়

সম্পর্ক'—দ্বিতীয়টি প্রথমটির সেবায় সর্বদাই সক্রিয় কাজে নিয়োজিত। ছন্দঃশাস্ত্র অধ্যয়নের অর্থ ধ্বনি ও লয়, প্রবাহ ও ছেদ, চরণ ও স্তবক, মিল ও অমিল এইসব জিনিসের অনুধ্যান। কাব্যকলার সমঝোতা ও উপলব্ধির জন্যে এ-সব বিষয়ের অনুশীলন আবশ্যিক, যেমন প্রয়োজনীয় গূঢ়ার্থ, রূপক ও চিত্রকল্পের অধ্যয়ন। ছন্দোবিজ্ঞানের অনুশীলন অব্যবহিত উপলব্ধির বাইরে নিয়ে যায় এবং কাব্য কোন্ কৌশলে তার বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে তার আবিষ্কারে সচেষ্ট হয়। এ মাননিক উপলব্ধির ঘাটে পৌঁছে দেয় আর যে-ব্যক্তি কাব্যকলায় শিক্ষিত হবার অভিলাষী তাঁর পক্ষে এ এক আবশ্যিক অনুশীলন। তাই কবিতা বা পদ্যকে মাত্রায়িত বা ছন্দোবদ্ধ ভাষা বলা যেতে পারে অর্থাৎ এমন ভাষা যাতে কিছু আক্ষরিক গুণ যেমন প্রচাপ বা মাত্রাকে দৃঢ়ভাবে অথবা নিদেনপক্ষে আপেক্ষিকভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়। নির্দিষ্ট রূপকল্প বা ছাঁচকে বলে ছন্দ; উদ্ভূত কাব্যকে পদ্য। অবশ্য কিছু-কিছু মহৎ কবিতা ছন্দোহীন। যেমন বাইবেলের হিব্রু "স্তোত্র" (psalms), বা রাজা জেমস্-এর ওরি ইংরেজি রূপান্তর (১৬১১), অথবা রবীন্দ্রনাথের "লিপিকা" (১৯২২)। সমস্ত মুক্তক (free verse)-ই অমাত্রায়িত (unmetered)। সাধারণত, কাব্য দু' ভাগে বিভক্ত ছান্দসিকভাবে: এক, মাত্রায়িত কাব্য বা পদ্য; দুই, মুক্তক।[৩]

I. প্রকার

প্রশ্ন জাগে বাঙলা ছন্দের প্রকার নিয়ে। এ-সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা আগেই হয়েচে (দ্রষ্টব্য, ২.১৩, ২.১৪, ২.১৫ ও ৬.২)। দেখা গেচে শারীরবৃত্তীয় কারণেই রয়েচে ত্রিধাছন্দের মূলে: প্রচাপন; প্রস্বরন: প্রস্ফুটন। প্রথমটি শ্বাস-তন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত—উরসস্পন্দের সঙ্গে কুক্ষিস্পন্দনে মিলিত হয়ে আনে প্রচাপন বা বলবৃদ্ধি। দ্বিতীয়টি স্বরতন্ত্রীয়; আর তৃতীয়টি উচ্চারণতন্ত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই তিনটির নাম দিয়েছেন Jones যথাক্রমে চাপমান (stroneme), স্বরমান (toneme) ও কালমান (chroneme)। সংস্কৃত ছন্দ বিবর্তনে এই তিনটি ধারার পরিচয় মেলে তালসংগীত, স্বরসংগীত ও বর্ণসংগীতে। প্রথমটি দেখা যায় স্বর মণ্ডলনে, যেমন বৈদিক উদাত্ত-অনুদাত্ত-স্বরিতে, যার পরিচায়ক হলো অক্ষরবৃত্ত গায়ত্রী-অনুষ্টুভ। ত্রিষ্টুভ ও জগতী। বর্ণের সঙ্গে স্বরই যুক্ত হয়ে এই সংগীত সৃষ্টি করে। কবি তাইতো বলেচেন:

> হেনিস্তব্ধ গিরিরাজ, অভ্রভেদী তোমার সংগীত
> তরঙ্গিয়া চলিয়াছে অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত
> প্রভাতের দ্বার হতে সন্ধ্যার পশ্চিম নীড়পানে
> দুর্গম দুরূহ পথে কীজানি কী বাণীর সন্ধানে!
>
> —রবীন্দ্ররচনাবলী: উৎসর্গ, সংখ্যা ২৪, পৃঃ ৪১.

দ্বিতীয় ধাপে এসেচে ধ্রুপদী সংস্কৃতে স্বনপরিবৃত্তি অর্থাৎ বর্ণসংগীত। পূর্বে ছিল একক বর্ণের একক আর পংক্তিগুলি সংজ্ঞিত হতো এই একক বর্ণ সংখ্যায়—বর্ণ বিন্যাসক্রমের কোন মর্যাদা ছিল না। এখন এই নতুন একক আবিষ্কৃত হলো হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বনের পরিবৃত্তির স্বীকৃতিতে। বর্ণসংগীতে স্বর-সংগীতের প্রস্বরণ স্থান পেলো প্রাথমিক উপাদান হিসেবে, কিন্তু মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করলো হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বন বা ধ্বনির বিন্যাস-জাত সংগীত। এরি আরেক ভিয়ান মেলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে, যেখানে মাত্রাগণে সংযোগস্থলে দীর্ঘবর্ণ পরিত্যক্ত হলো। ছন্দোবিবর্তনের তৃতীয় ধাপ হলো তালসঙ্গীত যা কালনিয়ন্ত্রিত প্রস্বনের সংগীত। এর বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে না স্বর-মড়্‌লনে, কিংবা হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বনের নির্দিষ্টক্রমেও। এ স্বর বা স্বনের প্রচাপনে জন্ম নেয়, যা আসে কাল-মাপা নির্দিষ্ট পর্যায়ের অবসানে, আর এরই নাম কালমাত্রা। হাততালিতে বা ঢোলকের চাটিতে এই তাল পাওয়া যায়ঃ এই আঘাতের সংস্কৃত নাম 'তাল', যা 'তড়'-ধাতু থেকে উদ্ভূত এবং এর অর্থ ঘা-দেওয়া। এ প্রচাপন আসে ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ বা ৭ম কাল মাত্রায় অথবা তাদের গুণিতকে। কথান্তরে, চার রকমের মূল তাল আছে, ৪, ৫, ৬ ও ৭ মাত্রার। প্রাকৃত ও অপভ্রংশে ছন্দ তাই তালবৃত্ত। কাজেই দেখা যায় সংস্কৃত ছন্দ তিনটি মূল সংগীতে স্পন্দশীল—স্বর, বর্ণ-বিন্যাস ও তাল-এ।[৪]

বৈদিক-সংস্কৃত-প্রাকৃত-অপভ্রংশের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙলা ছন্দও ত্রিধা বিভক্তঃ স্বরবৃত্ত; স্বনবৃত্ত; বলবৃত্ত। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েচে শারীরবৃত্তীয় কারণও। তৃতীয়ত, বাঙলা ছন্দের অভিজ্ঞতাও এরি আভাস দেয়। এর প্রমাণ আছে লয়ে (tempo)। বিচারের এই হলো মানদণ্ড। শাব্দিক প্রকাশে যতটা তথ্য, ততটাই লয়ের তথ্য। গদ্য বা পদ্য পঠনে এ ধরা পড়ে। মন্থর বা বিলম্বিত পঠনের প্রয়োজন, যদি চাই অবসাদের চিত্রকল্পের সঙ্গে অর্থোদ্ধার; আর দ্রুত পঠন আসে উত্তেজক দৌড় বা দ্রুত গতি প্রকাশনে। অবশ্য লয়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকে ভৌতগুণও, যেমন অক্ষর, দৈর্ঘ্য, প্রচাপ-বণ্টন ও উক্তি-স্বাচ্ছন্দ্য।[৫] লয়ে যে শাব্দিক গড়ন প্রকাশ পায় তাতে আছে একটি সম-কালিক সূত্র অর্থাৎ চরণ, স্বর, স্বন বা বল, যেভাবেই বিভক্ত হোক না কেন ছেদ, যতি বা বিরাম-এ, অন্তরালগুলি অর্থাৎ পদ, পর্ব ও মেল সম-কালিক হয়। ছন্দগুলি পাওয়া যায় স্বর, স্বন ও বল-এর সঙ্গে বৃত্ত যুক্ত করে। 'বৃত্ত' শব্দটির বুৎপত্তি এরূপঃ বৃৎ (বর্তনে) + ত (কতৃবাচ্যে) অর্থাৎ যা বর্তন করে। তাই ঋক প্রাতিশাখ্যের ভিত্তিতে Monier-Williams এর অর্থ করেচেনঃ 'turn of a line', the rhythm at the end of a verse, final rhythm।[৬] এখানে বৃৎ-ধাতুর অর্থ 'to turn, roll on, revolve', যেমন বেণীসংহারে (৩।৭)ঃ 'যাবদিয়ং লোকযাত্রা বর্ততে'।[৭] আর ইংরেজি verse শব্দটিতে আছে এরই দ্যোতনা, কেননা

এ এসেচে লাতিন versus থেকে, যার অর্থ আবর্তন।[৮] তাই বাঙলাছন্দের প্রয়োগকালে এই অর্থই গ্রহণীয়, কিন্তু সংস্কৃত ছন্দের অর্থ নয়, যেহেতু সেখানে 'বৃত্ত' শব্দটি প্রযুক্ত হয়েচে এক বিশেষ অর্থেঃ 'a metre in general, especially a metre regulated by the number of syllables it contains (as opposed to জাতি)'।[৭] বৃত্ত ও জাতি ভেদ আছে সংস্কৃত ছন্দে—একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক অক্ষরে নিয়ন্ত্রিত, অন্যটি মাত্রাকৃত। তাই 'ছন্দোমঞ্জরী' (১।৪)র উক্তি—

পদ্যং চতুষ্পদী, তচ্চ বৃত্তং জাতিরিতি দ্বিধা।
বৃত্তমক্ষরসংখ্যাতং জাতির্মাত্রাকৃতা ভবেৎ ॥

ত্রিধা বাঙলা ছন্দের নামেই প্রকাশ এদের বৈশিষ্ট্য। স্বরবৃত্তে বুঝায় যে এতে আছে স্বরসংগীত অর্থাৎ প্রস্বনন বা প্রস্বরের তানই এখানে মুখ্য, যাকে রবীন্দ্রনাথ শোষণশক্তি বলে অভিহিত করেচেন। এখানে প্রস্বরণই উচ্চারণে সহায়তা করে এবং এর পদক্ষেপ পদে-পদে এবং লয় মধ্য। স্বনবৃত্তে প্রতিটি স্বনের মাত্রাই গণ্য—ঠিক-ঠিক উচ্চারণ আছে প্রতিটি ধ্বনির। এর পদক্ষেপ পর্বে-পর্বে এবং লয় বিলম্বিত। আর বলবৃত্তে মুখ্য হলো প্রচাপ—এর পদক্ষেপ ঘটে মেল-এ এবং লয় দ্রুত। এ তিনের পদক্ষেপ নিয়ামক হলো ছেদ, যতি ও বিরাম। নিচে এদের উদাহরণ দেওয়া হলো—

স্বরবৃত্তঃ একদিন ছিল শুধু। মহাশূন্য দেশকাল ঘিরে।
দিকে দিগন্তরে ব্যাপ্ত।
স্বনবৃত্তঃ কত ব্রহ্মের। গৈরিক বাসে। ধূসর হয়েচে। ধরা,
সাধনা শুনেচে। নির্বাণ ম। র্মর
বলবৃত্তঃ কে ডেকেচে। নটবরকে। হঠাৎ কেন। হাঁচে,
হাত ঝুম্‌-ঝুম্‌। পা-ঝুম্‌ঝুম্‌। খেলার তালে। নাচে।

— অনিলবিশ্বাসঃ উদ্বেগউপকূলে, পৃঃ ৪৮, ৬৯, ৭৪

এ-পর্যন্ত কোন ছান্দসিকই বল্‌তে পারেননি কেন বাঙলা ছন্দ ত্রিধা হলো। তাঁরা এই বিভাগকে স্বতঃসিদ্ধ হিসেবে গ্রহণ করেচেন। কেউ বলেচেন "মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্ত"।[৯] আরেকজন এদের নাম দিয়েচেন "তানপ্রধান, ধ্বনি-প্রধান ও বলপ্রধান"।[১০] এবং তৃতীয় আরেকজন বলেচেন "পদভূমক, পর্বভূমক ও ছড়ার ছন্দ"।[১১] তবে অমূল্যধনের তিনের সম্পর্কে মতামত কিছুটা ধরা পড়ে দুই বা তিন পর্বাঙ্গ নিয়ে কেন পর্ব সৃষ্টি হয় তার ব্যাখ্যানে। তাঁর মতেঃ "এই প্রশ্নের উত্তর দিতে হইলে বোধ হয় গণিতের দার্শনিক তত্ত্ব বা বিশ্বরহস্যের

জটিল তথ্যের আলোচনা করিতে হয়। সৃষ্টির মূলতত্ত্বের বিভাগ জড় ও চৈতন্য। প্রকৃতি ও পুরুষ এইরূপ দুইটি ভাগ, কিংবা কোন একটা Trinity, যেমন ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর এইরূপ তিনটি ভাগ কেন? গণিতে ২ আর ৩ কে প্রাথমিক জোড় ও বিজোড় সংখ্যা বলা হয় এবং তাহা হইতেই সমস্ত সংখ্যার উৎপত্তি স্বীকার করা হয়। এইরূপ কোন দার্শনিক তত্ত্বের সাহায্যে ছন্দোবিজ্ঞানে ২ ও ৩ এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করা যায়।”[১০] এ উক্তি যুক্তিনিষ্ঠ নয় এবং তাই অবৈজ্ঞানিক। ছন্দোবিজ্ঞানে এ গোঁজামিলের অজ্ঞতা ঢাকবার প্রচেষ্টা।

II ঃ নামকরণ

বাঙ্‌লা ছন্দোরীতির বিভিন্ন নামের পরিচয় ৪-সংখ্যক সারণীতে তুলে ধরা হ'লো—

সারণী ঃ ৪-ছন্দোরীতির নাম বৈচিত্র্য।[১২]

১	২	৩
বাঙলা ছন্দ	সংস্কৃত-প্রাকৃত রূপ	বাঙলায় নাম বৈচিত্র্য
স্বরবৃত্ত	অক্ষরবৃত্ত-স্বরসংগীত	অক্ষরবৃত্ত; তানপ্রধান; আদ্যাশ্রী-গাঙ্গিনীতরণ পদ্ধতি; পয়ার জাতীয়; আক্ষরিক; পদভূমক; মিশ্রবৃত্ত; অক্ষরমাত্রিক।
স্বনবৃত্ত	বর্ণবৃত্ত; মাত্রাবৃত্ত-বর্ণসংগীত	মাত্রাবৃত্ত; ধ্বনিপ্রধান; হৃদ্যাশ্রী গঙ্গা-যমুনা পদ্ধতি; ব্রজবুলি-ভাঙা; মাত্রিক; পর্বভূমক; কলাবৃত্ত; স্বরমাত্রিক; হসন্তপ্রাণ মাত্রাবৃত্ত; দৃপ্তশ্রীবিমানবিহার পদ্ধতি।
বলবৃত্ত	তালবৃত্ত-তালসংগীত	স্বরবৃত্ত; বলপ্রধান; চিত্রশ্রী-ঝর্ণাঝামর পদ্ধতি; লোক ছন্দ; ছড়ার ছন্দ; স্বরান্তিক; দলবৃত্ত; দলমাত্রিক; মঞ্জুশ্রী-বুলবুল গুলজার পদ্ধতি।
উভবৃত্ত	—	দ্বৈতবৃত্ত

বাঙলা ছন্দের বিজ্ঞান-সম্মত নাম হলো স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্ত। কাজেই অন্যান্য নাম যে-পরিমাণে এ থেকে বিচ্যুত, সে-পরিমাণে অবৈজ্ঞানিক ও পরি-

ত্যাজ্য। প্রথমেই 'মিশ্রবৃত্ত, কলাবৃত্ত ও দলবৃত্তে'র কথা। এ নামকরণের সমর্থনে দিলীপ কুমার রায়কে সাক্ষী মানা হয়েচে ঃ "আমার অনেক ভ্রান্ত ধারণার নিরাকরণ হয়েছে। স্বরবৃত্ত (ওরফে দলবৃত্তের) য়ুনিট দল আর মাত্রাবৃত্ত (ওরফে কলাবৃত্তের) য়ুনিট কলা, এ ভেদজ্ঞানের প্রয়োজন আছে। অক্ষরবৃত্ত ছন্দের ও নবনামকরণ 'মিশ্রকলাবৃত্ত'কেও অভিনন্দন না করার কোনই হেতু নেই।"[১৩] এ-সব নামে পরিচিতি মেলে না ছন্দের মূল প্রকৃতির। অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা একটি চিঠিতে (৩০।১২।৩১) দিলীপ কুমারের মন্তব্য এরূপ ঃ "সেন মহাশয়ের যুক্তি আমার ওরিজিন্যাল লেগেছিল বটে। কিন্তু ওরিজিন্যাল কিছু বলতে হবে এই রোখ করে লেখা।"[১৪] এখানে স্মরণীয় রবীন্দ্রনাথের একখানি চিঠির বয়ান (২।৯।৩৪) ঃ "ছন্দের নিয়মটা জানবার যোগ্য বিষয় বটে—কিন্তু ছন্দ ব্যবহার করবার কালে আরো বেশি কিছু আবশ্যক হয়। সেটা কাউকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না—এর বেলাও খাটে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন'।"[১৪]

মনে রাখার প্রয়োজন যে বৈজ্ঞানিক সত্য তথ্যনির্ভর এবং এ-তথ্য বিজ্ঞানের অনুমোদনসাপেক্ষ। আর এ ব্যক্তিগত মতামতের উপর নির্ভর করেনা। তাই ছন্দোবিজ্ঞানের তথ্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এর উত্তীর্ণ হওয়া চাই। বাঙলা ছন্দের শ্রেণীবিন্যাসে পরিভাষাগুলি পরীক্ষা করে দেখা যাক। পরিভাষায় থাকে কোন বস্তুর সংজ্ঞা আর আরিস্ততল মনে করেন যে "সংজ্ঞা এমন একটি বাক্যাংশ যা বস্তুর সারাৎসারের দ্যোতক"।[১৫] আর এই সারাৎসার হলো মৌল গুণাবলীর এক প্রস্ত, যা ঐ বস্তুর মূর্ত হাওয়ার আবশ্যিক ও পর্যাপ্ত শর্ত। সংজ্ঞায় তাই থাকে দুটি অবয়ব—গণ (genus) ও ভেদ (differentia)। ভেদ হলো সারাৎসারের সেই অংশ যা একই গণভুক্ত এক প্রজাতিকে (species) অন্য প্রজাতি থেকে পৃথক করে। এক গণভুক্ত বিভিন্ন প্রজাতি প্রদর্শনকে বিভাজন (division) বলে—এতে শ্রেণী উপশ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে যায়। বিভাজন তাই সংজ্ঞার সঙ্গে সম্পর্কিত, কেননা এ শ্রেণীবিস্তৃতির সীমা বেঁধে দেয়। আবার বিভাজনকে যদি দেখা যায় প্রজাতি বাদ দিয়ে একেকজন সদস্যের দিক থেকে, তবে এ প্রক্রিয়ার নাম শ্রেণী বিভাগ (classification)। তাই বিভাজনে গণ প্রজাতিতে বিভক্ত হয়ে যায়, কিন্তু শ্রেণী-ভাগে ব্যষ্টি সমষ্টিতে সংঘবদ্ধ হয়। প্রথমটি নিম্নগ। দ্বিতীয়টি ঊর্ধ্বগ। এই বিভাজনের তিনটি সূত্র আছে ঃ (১) এ সামগ্রিক ; (২) গণের প্রজাতিঅবয়বেরা একে অন্যকে বহিষ্কার করে ; এবং (৩) বিভাজন প্রতিস্তরে একটি নীতিই অনুসরণ করে, অর্থাৎ বিভাজনের মূলতত্ত্বকে।[১৬] এই অভীক্ষায় (test) সারণীর তৃতীয়স্তম্ভের নামগুলি টেকেনা। যেমন, 'মিশ্রবৃত্ত' নামটি অচল, কেননা এ বিভাজনসূত্রের দ্বিতীয় ও তৃতীয় নিয়মভঙ্গ করেচে। তেমনি 'কলাবৃত্তে' দল (অক্ষর) রয়েচে। তাই এতে দ্বিতীয় নিয়মটি লঙ্ঘিত হয়েচে। 'দ্বৈতবৃত্ত'—এরও ঐ

একই কথা। কাজেই এ-সব নাম একটিও বিচার-সহ নয়। মূলে পৌঁছানোর অক্ষমতাই এর জন্যে দায়ী।

৭.২ স্পন্দ মিতির সূত্রাবলী

I. স্পন্দ ও স্পন্দমিতি বা ছন্দ

১. স্পন্দনে প্রত্যানয়ক বল সাম্য অবস্থান হতে কণিকার সরণ দূরত্বের ঠিক-ঠিক আনুপাতিক।

দোলন ও স্পন্দনের মধ্যে পার্থক্য আছে। স্পন্দন দোলনের এক বিশেষ রূপ। দোলনে কণিকা সাম্য অবস্থান থেকে যতদূরে যাবে তত বেশি হবে তার প্রত্যানয়ক বল। কিন্তু স্পন্দনে এই অনুপাত সঠিক। তাই স্পন্দশক্তি বিস্তারবর্গের আনুপাতিক।[১৭]

২. বাক্‌ধ্বনি স্পন্দশীল ফুসফুসীয় বায়ুপ্রবাহের সৃষ্টি।

শ্বসনপেশীর একান্তর সংকোচন ও প্রসারণে দেখা দেয় বায়ুচাপে নিয়ত ও দ্রুত হ্রাসবৃদ্ধি। প্রতিটি পেশীয় সংকোচন ও বায়ুচাপের অনুবন্ধী বৃদ্ধি-ই হলো উরস্পন্দ, যার স্রষ্টা বক্ষের আন্তর পাঁজরীয় পেশীপুঞ্জ। আর প্রত্যেক উরস্পন্দে জন্ম নেয় একটি অক্ষর। এই অক্ষর-জনন প্রক্রিয়া, উরস্পন্দীয় পদ্ধতি হলো মানুষী বাক্-এর ভিত্তি। এ-ছাড়াও আছে স্পন্দশীল পেশীয় বিচলনের আরেকটি পদ্ধতি যার উপর আংশিকভাবে বায়ুপ্রবাহ নির্ভরশীল। শ্বসন পেশীর কম-পৌনঃপুনিক কিন্তু বেশী জোরালো সংকোচনমালায় তৈরি হয় এ-পদ্ধতি যা উরস্পন্দের সঙ্গে মাঝে-মাঝে মিশে তাকে বলবত্তর করে, আর বায়ুচাপে ঘটায় আরো বেশি গণনার যোগ্য ও অধিকতর আকস্মিক বৃদ্ধি। এই সব বলবৎ-করণী বিচলনই তৈরি করে চাপস্পন্দ বা বলস্পন্দ পদ্ধতি। উরস্পন্দ ও বলস্পন্দ মিলে সৃষ্টি হয় বাক্।

৩. বাক্‌-স্পন্দ উরসস্পন্দ ও বলস্পন্দের যৌথ সৃষ্টি।

কথা বলার বায়ুপ্রবাহ সৃষ্টিতে দু'টি স্পন্দ যেভাবে মিলিত হয় বাক্‌স্পন্দ হলো তার ফলন। বস্তুত স্পন্দ আগে ভাগেই বায়ুপ্রবাহে বর্তমান—শব্দতৈরির স্বর ও ব্যঞ্জন উপাদান এর উপর ন্যস্ত হওয়ার আগেই। সব কথ্যভাষায়ই এ দু'টি স্পন্দ পদ্ধতি অস্তিমান, তবে প্রতিটি ভাষায় এদের সমন্বয়ন ভিন্ন-ভিন্ন। এদের সংঘটনে জন্ম নেয় দু'ধরনের পর্যাবৃত্তি—দুটি পদ্ধতির একটি অন্যটিতে সমান কালান্তরালে স্পন্দের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে।[১৮]

৪. **প্রত্যেক অক্ষরই আন্তরপাঁজর পেশী পুঞ্জীয় ক্রিয়ার ক্ষেপক স্ফোট।**

একটি পেশী বা পেশীপ্রস্তের বাধাহীন সংকোচন সঞ্জাত বিচলনকে বলে ক্ষেপক বিচলন। কথা বার্তায় কিছু-কিছু পেশীয় বিচলন নিয়ন্ত্রিত। অন্যসব ক্ষেপক বিচলন প্রতিটি ঐচ্ছিক পেশী গুচ্ছে-গুচ্ছে সাজান পেশীতন্তুর সমষ্টিতে তৈরি। আর প্রত্যেক তন্তু একটি স্বতন্ত্র একক-এ 9 থেকে 40 millimeter লম্বা ও 1 মিলিমিটারের 1/10 বা 1/100 অংশ এর ব্যাস; আর আকৃতি বেলনীয় বা প্রিজ্‌মীয়। স্নায়ু-তন্ত্রের কার্যকর একক হলো নিউরোণ (neuron)। তাই যে কোন পেশীয় ক্রিয়ার সঞ্চালক একক হলো পেশীতন্তু-প্রান্তিক একটি একক সঞ্চালক নিউরোণ। আর অক্ষরই হলো এই সঞ্চালক একক। অর্থাৎ প্রতিটি অক্ষরই মূলত একটি বিচলনজট, যার অন্তর্নিহিত বৃহত্তর বিচলন হলো শ্বাসস্পন্দ বা উরস পেশীতন্ত্রীয় ঘাত।[১৯]

৫. **বল-সৃজক স্পন্দ শ্রেণী সমকালীন ক্রমে বিন্যস্ত হলে সৃষ্টি হয় বলবৃত্ত স্পন্দ; আর অক্ষর সৃষ্টিকারী স্পন্দশ্রেণী সমকালীন ক্রমে বিন্যস্ত হলে পাওয়া যায় অক্ষরবৃত্ত স্পন্দ, অর্থাৎ স্বর-স্বনীয় স্পন্দ।**

স্পন্দ দু'রকমের—বলবৃত্ত ও অক্ষর (syllable)-বৃত্ত। প্রথমটির উদাহরণ বাঙলা ছড়ার ছন্দ; দ্বিতীয়টি দেখা যায় স্বরবৃত্ত ও স্বনবৃত্তে। এখানে স্মর্তব্য যে স্পন্দশ্রেণীর একটি সমকালীন ক্রমে ন্যস্ত হলে অন্যটি সেরকম হবে না অর্থাৎ- একটি সমকালীন স্পন্দে সক্রিয় হলে, অন্যটি ক্রিয়াশীল হবে অ সমকালীন স্পন্দে।[১৮] বলবৃত্তের একটি উদাহরণ নেয়া যাক—

| | | |
বাইরে শুধু। জলের শব্দ। ঝুপ্‌ঝুপ্‌। ঝুপ্‌

এখানে প্রচাপ পড়েচে চারটি: খাড়াদণ্ডে দেখান হয়েচে; কিন্তু অক্ষর আছে এগারোটি—প্রথম দুটি মেলে বা পর্বে আছে ৪+৪=৮টি অক্ষর আর তৃতীয়ে দুটি অক্ষর এবং চতুর্থটিতে মাত্র একটি অক্ষর। কাজেই বলস্পন্দে ও অক্ষর স্পন্দে পরস্পরে মিল নেই এবং এই ফাঁক পূরণের জন্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় মেলে অক্ষর হবে সম্প্রসারিত। আবার অক্ষর বেশি হলে তারা হবে সঙ্কুচিত, যেমন,

| | | |
যমুনাবতী। সরস্বতী। কাল যমুনার। বিয়ে

এখানে প্রথম মেলে আছে ৫টি অক্ষর, দ্বিতীয়ে ৪, তৃতীয়ে ৪ ও চতুর্থে ২। মোট ১৫। এখানেও ৮টি মেল এবং অক্ষর সংখ্যা ১৫, যদিও প্রথমটিতে আছে মাত্র ১১টি অক্ষর। এদের সাম্য বজায় আছে অর্থাৎ সমকালীনতা উচ্চারণের দ্রুত ও বিলম্বিত লয়ে। প্রথম পংক্তিতে আছে সম্প্রসারণ, আর দ্বিতীয়টিতেও। প্রতি

মেলে মাত্রাসংখ্যা ৬—শেষেরটি বাদে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "বাংলাভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে, ধনুকের ছিলের মতো, টানলে বাড়ে, টান ছেড়ে দিলে কমে। সেটাকে গুণ বলেই গণ্য করি। আমরা দ্রুত লয়ে বলতে পারি 'এইরে', আবার তাকে টানলে ডবল করে বলতে পারি 'এ-ইরে'। তার কারণ স্বরবর্ণগুলো জীব ধর্মী, ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সঙ্কোচন-প্রসারণ চলে।"[২০]

৬. স্পন্দ কালিক ঘটনাক্রমের সেই ধর্ম যা দর্শকের মনে ক্রমসংজক একাধিক ঘটনা বা ঘটনা সমষ্টির স্থিতিকালের মধ্যে অনুপাত বোধ জন্মায়।

স্পন্দের ইংরেজি প্রতিশব্দ rhythm—এ সাধিত হয়েচে rheo ধাতু থেকে, যার অর্থ 'প্রবাহ'। পরবর্তীকালে এর মানে দাঁড়ায় পরিমিত বিচলন অর্থাৎ নিয়মবর্তিতা বা ক্রমানুসরণ বা চারুশীলতা। উপরের সংজ্ঞায় চারটি বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। প্রথমত, এতে উক্ত হয়েচে স্পন্দ কি জিনিস। কিন্তু এ কি করে বা কিসের উপরে নির্ভরশীল তা অনুক্ত রয়ে গেচে। দ্বিতীয়ত, সংজ্ঞা অনুপাত বোধের কথা বলেচে ; কিন্তু বলে নি যে ক্রম নিজেই গণিতীয় বা মাত্রামাপক যাথার্থ্যের অনুপাতে নির্ধারিত। এর কারণ, কিছু-কিছু ক্রমে এরকম অনুপাত আছে ; তবে অন্যে নেই। তৃতীয়ত, এতে স্থিতিকালের কথা আছে, কেননা কাল ঘটনার আপেক্ষিক স্থিতির অর্থেই স্পন্দের মৌল বৈশিষ্ট্য। চতুর্থত, কালিক ঘটনার কথা বলা হয়েচে এবং এতে তাদের মাপের সম্ভাবনা বুঝায়, যেমন তরঙ্গলেখ (Kymograph) এর সহায়তায়। মনে রাখতে হবে যে কালের সব ঘটনাক্রমই স্বয়ং স্পন্দশীল নয়।[২১]

৭. স্পন্দ প্রায় অবিশ্লেষ্য ভাবেই জৈব ; স্পন্দমিতি বা ছন্দ যান্ত্রিক বা বলবিজ্ঞানের বিষয়।

স্পন্দকে নদীর সঙ্গে তুলনা করা যায়। এর উপনদীগুলি হলো প্রচাপ, অক্ষরের স্থিতিকাল, যতি, বাক্যাংশ বা পদক্রম এবং সর্বাত্মক অর্থ। আর নদীর মতোই স্পন্দ জটিল ও প্রায় অবিশ্লেষ্যভাবে প্রবাহময় এবং সর্বদাই পদক্ষেপে ও মেজাজে পরিবর্তনশীল। এক কথায়, স্পন্দ হলো চরণগতির গুণসমগ্র, যা বিভিন্ন উপাদানের ফসল, শুধুমাত্র প্রচাপ বা পরিমাণের উপর নির্ভরশীল নয়। অন্যদিকে স্পন্দমিতি হলো স্পন্দের মাপন বা ছন্দ। তত্ত্বের দিক থেকে এ নিয়মিত, তবে ব্যবহারের দিক থেকে বিচিত্র ঃ ছন্দ হলো চরণমধ্যে শাব্দিক খুঁটিনাটির এক আবর্তক আদর্শ বা ছাঁচ। নিয়মবর্তিতা বা প্রতিসাম্যের ধারণা দেওয়ার জন্যে আছে একটি নির্দিষ্ট শাব্দিক গড়ন, যা বলবত্তর হয়েচে সমকালীন সূত্রে অর্থাৎ এই তথ্যে

যে চরণবিভাগের অন্তরালগুলি পরস্পর সমান। ফলে স্পন্দমিতি বা ছন্দ হয়ে দাঁড়ায় অক্ষর বণ্টনের ক্রিয়াবিধি আর এ হলো চরণমধ্যে বা চরণগুচ্ছে কোন নিয়মিত ছাঁচে বা আদর্শে প্রচাপ, মাত্রা, প্রস্বর বা নিছক সংখ্যা অনুসারে অক্ষরের বণ্টন।[১]

৮. স্পন্দ প্রত্যক্ষ (percept) ; ছন্দ প্রত্যয় (concept)।

সকর্ণ মানুষের কাছে প্রত্যক্ষ পৌঁছায় তার স্পন্দ নিয়ে। কানের ক্রিয়াবিধি উৎক্রান্ত (reversed) টেলিফোনের মতো। টেলিফোন বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিবৃত্তিকে মধ্যচ্ছদার স্পন্দে রূপান্তরিত করে ; কিন্তু কান কর্ণপটহের স্পন্দকে রূপান্তরিত করে বিদ্যুৎপ্রবাহে, যা মস্তিষ্কে পাঠায় সংবেদন।[১৭] আর জ্ঞানেন্দ্রিয় নয়, কিন্তু মন-ই বিভিন্ন ভাষাতাত্ত্বিক ঘটনা গুচ্ছকে সরল বিভেদে পরিণত করে এবং পরমভৌত প্রকৃতির অতি বিসদৃশ বস্তুগুলি মেপে তাদের সমীকরণও তৈরি করে। এতে বুঝায় যে ছন্দ চরণের পঠন বা শ্রবণরীতিকে সাক্ষাৎভাবে প্রভাবিত করে না ; তবে এইটুকু শুধু জানা যায় যে স্পন্দকে অতিবিমূর্ত কোন পরিকল্পের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো যায়, আর এ-পরিকল্প কেবলমাত্র অনুমানসিদ্ধ, কিন্তু প্রত্যক্ষজ নয় এবং এ পঠনের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করে না। বস্তুত ছন্দিত কবিতার চরণকে অনেক সময় ভিন্ন-ভিন্ন স্পন্দ সমবায়ে পড়া যেতে পারে ; কাজেই তাদের মধ্য থেকে যে কোন একটির বাছাই কর্তে পুরনো অর্থের ছন্দ চূড়ান্ত নয়। তাই চরণের বিভিন্ন সম্ভাব্য ব্যাখ্যানে একই ছন্দের প্রয়োজন নেই, যদিও তা থাকতে পারে। এক কথায় কবিতার ছন্দ হলো তাৎপর্যপূর্ণ ছন্দো-বিশ্লেষের (scansion) ধাত্র (matrix)।[২২]

৯. গদ্য স্পন্দশীল ; পদ্য ছন্দোবদ্ধ ; আর কাব্য রসাত্মক বাক্য, যা গদ্যে-পদ্যে অস্তিমান।

বিশ্বনাথ কবিরাজ তাঁর 'সাহিত্য দর্পণে'' (১।৩) কাব্যের সংজ্ঞা দিয়েচেন ঃ "বাক্যং রসাত্মকং কাব্যম্" অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। বাক্য হলো যোগ্যতা, আকাঙ্ক্ষা ও আসত্তিযুক্ত পদের সমষ্টি। আর রস হলো আস্বাদযোগ্য বস্তু ঃ "রস্যতে আস্বাদ্যতে"। রসের নিষ্পত্তি সম্পর্কে ভরতের "নাট্যশাস্ত্রে"র (৬।৩১) সূত্রটি এখানে স্মরণীয় ঃ "বিভাবানুভাবব্যাভিচারী সংযোগাদ্ রস নিষ্পত্তিঃ" অর্থাৎ বিভাব (কারণ), অনুভাব (কার্য) ও ব্যাভিচারীভাব (সঞ্চারী) এর সমন্বয়ে রস উদ্ভূত হয়। এখানে স্মর্তব্য যে রসই একাধারে কাব্যবীজ ও কাব্যফল। কাব্যফল-রূপ রসাস্বাদনের স্বরূপ সাহিত্যদর্পণকার (৩।২) নির্দেশ করেচেন "ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরঃ" বলে। এই রসের ব্যাখ্যা দিয়েচেন অরবিন্দ তাঁর "দিব্যজীবনে" যা

অনির্বানের ভাষান্তরে দাঁড়ায় এরূপ ঃ "রস বস্তুর সার ও স্বাদ দুই-ই। বিষয়ের সংস্পর্শে তার সারটুকু খুঁজি না আমরা—শুধু দেখি কিভাবে আলোড়িত করে সে আমাদের কামনা ও ভয়কে, লালসা ও বিরাগকে। তাই বিষয়ের রস আমাদের চেতনায় বিবর্তিত হয় অপূর্ণ আনন্দের ক্ষণিকায়, অর্থাৎ সারগ্রাহিতার সামর্থ্য থাকে না তার মধ্যে। হৃদয় ও মন সম্পূর্ণ অনাসক্ত হয় যদি এবং সেই অনাসক্তির বীর্য নাড়ীতন্ত্রেও সংক্রামিত হয়, তাহলে রসের এই অপূর্ণ তির্যক প্রকাশকে ধীরে-ধীরে অবলুপ্ত করে শুদ্ধসত্তার অব্যভিচারী আনন্দের বিচিত্র উল্লাসকে তার স্বারসিক সত্য স্বরূপে আস্বাদন করা অসম্ভব হয় না, যখন কাব্য ও কলার বিষয়বস্তুকে আমরা গ্রহণ করি সামাজিকের সহৃদয়তা নিয়ে। আমরা তখন অনাসক্ত নির্লিপ্ত শুধু ভাবি বিষয়বস্তু ও তার রসের কথা। সামাজিকের এই রসবোধ অবশ্য বিশুদ্ধ আনন্দ সত্তার অবিকল প্রতিরূপ কখনও হতে পারে না। কেননা ব্রহ্মানন্দ কাব্য-রসোত্তীর্ণ অতিমানস অনুভব। ব্রহ্মানন্দে শোক, ভয়, জুগুপ্সা বিলুপ্ত হয় আলম্বন সুদ্ধ। কিন্তু কাব্যরসে আলম্বন থাকে অক্ষুণ্ণ।"[২৩]

কাব্য তাই রসাত্মক বাক্য অর্থাৎ সৃজনীবাক্যের অভিব্যক্তি। আবার নির্মিত বাক্যের প্রকাশনও আছে, যা আটপৌরে সংলাপে ও কথিত গদ্যে দেখা যায়। প্রথমটি সৃষ্টি, দ্বিতীয়টি নির্মাণ। দুইয়ের পার্থক্য এখানে যে কাব্য জন্ম নেয় ঘনীকরণ প্রক্রিয়ায়; গদ্য বিচ্ছুরণ প্রক্রিয়ায়। কাব্যের জার্মান প্রতিশব্দ তাই Dichtung; আর জার্মান ধাতু dichten এ বুঝায় ঘনীকরণ ও কবিতারচনা। তাই কবিতা সম্পর্কে বলা যায় ঃ কাব্য মজ্জা ও সারমর্মের সৃষ্টি।[২৪] এ হলো গীতোক্ত (৪।৭) "আত্মানং সৃজাম্যহম্" অর্থাৎ নিজেকে নিজে সৃষ্টি করে। বের্গসোঁর মতে শব্দ হয়ে-ওঠা—শব্দ ও চিন্তার মধ্যে কোন কালান্তরাল নেই। শব্দই চিন্তা, চিন্তাই শব্দ, আর চিন্তা ও শব্দই কাব্য। অপরপক্ষে গদ্য গড়ে-তোলা শব্দের কাঠামো অর্থাৎ যে-সব মৃত উপাদান পুনর্জীবিত হয়েচে তাদের নিয়ে এ তৈরি; আর এ-জীবনই স্পন্দ। তাই আপাত-বিরোধী মনে হতে পারে যে কাব্য অন্তর্নিহিত থাকতে পারে একটি একক শব্দে, একটি একক অক্ষরে এবং অন্তিম ক্ষেত্রে স্পন্দহীনও হতে পারে; কিন্তু গদ্য বাক্যাংশ ছাড়া থাকতে পারে না, আর বাক্যাংশে কোন না কোন স্পন্দ থাকবেই।[২৫]

গদ্য ও পদ্যের গরমিল এখানে যে গদ্যে পংক্তি মুদ্রাক্ষরীয় প্রয়োজন জাত বলেই পঠন কালে উপেক্ষিতা হয়, কিন্তু পদ্যে তাই হয়ে দাঁড়ায় স্পন্দশীল একক, যার নাম চরণ; সঙ্গে সঙ্গে চরণপ্রান্তকে বিশেষ বিরাম চিহ্নের মর্যাদা দেওয়া হয়। এই চরণ স্পন্দের ক্ষুদ্রতর এককে তৈরি হয়।[২৬] গদ্য চলে বাক্য ও অনুচ্ছেদের এককে; পদ্য চরণ ও চরণব্যূহে যার নাম স্তবক। আবার পৃষ্ঠার উপর থেকে নিচে গদ্যের বাক্য চলে অবিচ্ছেদ্যভাবে; অনুচ্ছেদ শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোন

মুদ্রাক্ষরীয় ছেদ দেখা যায় না। অপর পক্ষে, কাব্যের বাক্যের মধ্যে নিয়মিত যতি বা ছেদ দেখা দেয়। তাই মিল্টনের "হারানো স্বর্গে"র প্রথম বাক্যটি ১০ অক্ষর বিশিষ্ট ১৬টি চরণে বিভক্ত। সব পদ্যেই চরণ আছে—এ প্রায় সার্বজনীন বৈশিষ্ট্যে পরিণত হয়েচে।[১] বর্তমানে গদ্য ও পদ্যের মাঝখানে দুটি ধাচের আবির্ভাব হয়েচে ঃ একটি গদ্য হতে পদ্যের দিকে এগিয়েচে ঃ অন্যটি পদ্য হতে গদ্যের দিকে যাত্রা করেচে। প্রথমটি স্পন্দশীল গদ্য, যার নমুনা হলো রবীন্দ্রনাথের "লিপিকা" ও "গীতাঞ্জলির" ইংরেজি অনুবাদ। একে রবীন্দ্রনাথ বলেচেন rhythmic prose ঃ "লিপিকার রচনাগুলি প্রথমে rhythm রক্ষার জন্য পদ্যের মতো ভাঙাভাঙা লাইনেই লিখেছিলুম। পরে পদ্যের মতো ছাপান হয়েচে।" দ্বিতীয়টি মুক্তক (free verse), যা অছান্দিত। ছন্দ ও অছন্দের তফাৎ আছে ঃ "কথা একটাতে চলে, আর-একটাতে শুধু বলে, কিন্তু চলেনা। গদ্যে প্রধানত অর্থবান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে কাজে লাগাই, পদ্যে প্রধানত ধ্বনিমান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়।"[২৩] মুক্তকের উদাহরণ Walt Whitman-এর Song of Myself। কেউ-কেউ একে বলেন স্পন্দমান গদ্য, কেউ-কেউ আবার কাব্যগুণান্বিত। সার্থকবাক্যাংশ ও চিত্রকল্পীয় ছাঁচ প্রভৃতির পরিবৃত্তিসহ পুনর্বৃত্তির অনিয়মিত স্পন্দশীল লয়ে প্রতিষ্ঠিত এই মুক্তক। যখনি চোখ বা কানের দৌত্যে কবিতায় ছান্দসিক আদর্শের নির্বন্ধ অনিয়ম স্থাপিত হয়, তখনি তাকে বলে মুক্তক।[২৭] এ-সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য।

১০. ছন্দ আনে নান্দনিক বা মানসিক দূরত্ব।

ছন্দ একাধারে আবেগের প্রকাশক ও নিয়ামক। কাব্য যে রসের উদ্রেক করে তাকে সাহিত্যদর্পণকার (৩।২) "বেদ্যান্তর স্পর্শশূন্য" বলেচেন। অর্থাৎ রস পদার্থের সঙ্গে কোন বাহ্য বস্তুর সম্পর্ক থাকে না। কাব্য শোক-কে শ্লোকে পরিণত করে সৃষ্টি করে এক নির্লিপ্ত আনন্দলোক। Bullough একে অভিহিত করেচেন "মানসিক দূরত্ব" (Psychical distance) বলে ঃ "কবি ও শিল্পীর কার্যকলাপে অহংও বস্তু সম্পর্কের ব্যক্তিগত চরিত্র পরিশ্রুত হয়। এতে মুক্ত হয় আবেদনের ব্যবহারিক ও মূর্ত্ত প্রকৃতি।"[২৮] আর এ-কাজে ছন্দ হয় কাব্যের সহায়ক। একথা স্বীকার করেচেন Wordsworth তাঁর Preface to Lyrical Ballads এ ঃ "ছন্দের একটি প্রবণতা হলো ভাষাকে কিছুটা তার বাস্তব থেকে মুক্ত করা ও রচনাসমগ্রের উপর বস্তুহীন অস্তিত্বের এক আধাচেতন প্রলেপ লাগানো ; (ফলে) দয়াদ্র্' পরিস্থিতি ও ভাবাবেগ ছন্দোবদ্ধ রচনায় সহনীয়, বিশেষত মিলে, কিন্তু গদ্যে নয়।"[১]

II. বাগ্ধ্বনি

১১. বাগ্ধ্বনি উৎপাদনের দু'টি কার্যকর মৌল উপাদান হলো উদ্বোধন ও প্রস্ফুটন ; এ ছাড়া আছে স্বনন, যা এতটা মৌল নয়।

প্রত্যঙ্গীয় বায়ুসচল দৃষ্টিকোণ থেকে বাগ্ধ্বনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট আছে দু'টি প্রক্রিয়া—উদ্বোধন ও প্রস্ফুটন। এখানে প্রত্যঙ্গ উদ্বোধক অর্থাৎ উদ্বোধনের কাজ করে। আর উদ্বোধন হলো প্রত্যঙ্গের হাপর বা পিস্টন সদৃশ বিচলন, যা সন্নিহিত কণ্ঠাঞ্চলীয় আয়তনের পরিবর্তন ঘটায় সেখানকার বায়ুর সংনমন বা সম্প্রসারণে এবং ফলে প্রকৃত বা সম্ভাব্য বায়ুপ্রবাহের সূচনা করে। কাজেই উদ্বোধন সূচকের ভূমিকা নেয়। অন্যদিকে প্রস্ফুটন বা উচ্চারণ প্রত্যঙ্গের একটি বিচলন, বা অঙ্গবিন্যাস যা বায়ুপ্রবাহকে এমনভাবে বাধা দেয় বা পরিবর্তিত করে যে একটি নির্দিষ্টশব্দের উদ্ভব হয়। সব বাগ্ধ্বনিতে আছে এই উদ্বোধন ও প্রস্ফুটন। এরা আবশ্যিক। তৃতীয় আরেকটি উপাদান আছে, নাম যার স্বনন। এ আগের দুটির মতো ততটা মৌল নয়। ফুসফুসীয় ধ্বনির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বলেই এ প্রথম দুটির তুলনায় কম মৌল। এতে বুঝায় এমন স্বরযন্ত্রীয় ক্রিয়া, যা উদ্বোধক নয়, আর প্রস্ফুটকও নয় ঃ স্বানিক ক্রিয়াকলাপ প্রধানত স্বরতন্ত্রীর বিচলন ও অঙ্গবিন্যাস। বায়ুস্তম্ভ যখন স্বরযন্ত্রের ভিতর দিয়ে যেতে থাকে তখন ঘটে এই স্বনন।[২৯] স্বরতন্ত্রী এখানে কম্পকের কাজ করে—স্পন্দ সব স্বরে এবং Z-এর মতো ব্যঞ্জনে লক্ষণীয়। এ হলো স্বরতত্ত্ব (tonic theory) বা সুরের মতবাদ। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে R. Husson স্পন্দের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েচেন স্নায়ু-পেশীয় ভাষায়। তাঁর মতে বাক্-এ কণ্ঠতন্ত্রীর স্পন্দন ঘটায় সাক্ষাৎভাবে কণ্ঠ যন্ত্রস্থ আবর্তক স্নায়ু এবং উপশ্বাসরন্ধ্রীয় বায়ুচাপ ব্যতিরেকে। কম্পাংক বা প্রস্বর নির্ভর করে প্রত্যক্ষ স্নায়ুসংভরণের উপর, আর স্বরযন্ত্রীয় সুরের তীক্ষ্ণতা উপশ্বাসরন্ধ্রীয় বায়ুবল নির্ভর।[৩০]

১২. **সব বাক্-ই অক্ষর ও শ্বাসমেলে গঠিত।**

ধ্বনির দিক থেকে বাক্ সর্বদাই ধ্বনিগুচ্ছের রৈখিক অনুক্রমের চেয়েও আরো কিছু বেশি। ফুস্ফুস্-নির্গত বায়ুতেই এদের জন্ম এবং তাই বক্ষঃস্থ শ্বাসযন্ত্র অনিবার্যভাবেই এই ক্রমকে খণ্ডে-খণ্ডে ভাগ করে। এদের মধ্যে স্পষ্টতম বিভাগটির নাম শ্বাসমেল (breath group)। এ হলো এক শ্বসনে উৎপন্ন ধ্বনিমালা। এর গরিষ্ঠ স্থিতিকাল পর্যাবৃত্ত প্রশ্বাসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। অবশ্য এই শ্বাসমেল ফুস্ফুসীয় বায়ুর মতো স্থিতিশীল নয়।

বস্তুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রনের দু'টি আংশিকভাবে স্বতন্ত্র ক্রিয়াবিধি আছে। একটি হলো কুক্ষীয় ; অন্যটি বক্ষীয়। প্রথমটি তৈরি হয় মধ্যচ্ছদা ও কুক্ষির পেশীপুঞ্জে। এরা বক্ষঃবিবরের আয়তনে পরিবর্তন ঘটায় এর নিম্নতর দেয়ালের

(মধ্যচ্ছদা) ঊর্ধাধ বিচলনে। প্রত্যেক শ্বাসমেলে তাদের গতি কমিবেশি সুস্থির ; কেবলমাত্র শ্বাসমেলের অন্তরালে প্রশ্বাসের জন্যে তাদের ক্রিয়া উল্টে যায়। এহলো শ্বাসমেলের শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি। দ্বিতীয় ক্রিয়াবিধির উপাদান হলো আন্তর পাঁজরীয় পেশীপুঞ্জ। এরা ক্রমিক পাঁজরযুগলের মধ্যে বিস্তৃত এবং বক্ষঃগুহিকার আয়তনে হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটায় পার্শ্বিক দেয়াল অর্থাৎ পাঁজর পিঞ্জরের বিচলনে। অবশ্য বাক্-এ শ্বাসমেলের আদ্যন্ত আন্তর পাঁজরীয় পেশীর ক্রিয়া নিয়ত নয়, কিন্তু দ্রুততর পরিবৃত্তির অধীন। সরলতম ক্ষেত্রে এতে অতি বায়ুভুক স্বরের একান্তরণ কমবায়ুভুক ব্যঞ্জনের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধে। কাজেই বাক্ আন্তর পাঁজরীয় পেশী পুঞ্জের গতিসঞ্জাত ক্ষুদ্র স্পন্দমালায় চিহ্নিত হয়। আর এই স্পন্দমালা হলো অক্ষরসমূহ। সাধারণত অক্ষর কোন স্বর বা অন্য অনুনাদককে কেন্দ্র করে অস্তিমান এবং তার আরম্ভ ও শেষ ঘটে সংবৃত উচ্চারণে।[৩১]

১৩. সাধারণ শ্বসন ও বাক্‌-শ্বসনের মধ্যে প্রভেদ আছে।

সাধারণ শ্বসনে প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসের কাল সমান সমান। কিন্তু বাক্-শ্বসনে দ্রুত প্রশ্বাসের পরে আসে মন্থর ও নিয়ন্ত্রিত নিঃশ্বাস। দ্বিতীয়ত, প্রথমে এক চক্রের পরে বিরাম আসে, আর দ্বিতীয়ে ভাষার প্রয়োজন অনুসারে যে-কোন জায়গায় বিরাম বা যতি আসতে পারে। তৃতীয়ত, শরীরের ভৌত প্রয়োজনে সাধারণ শ্বসনে আমরা অধিকবায়ু গ্রহণ করি যেমন, তেমন ত্যাগ করিও বেশি বায়ু ; কিন্তু বাক্-এর কারবার ফুস্‌ফুসের শ্বাসবায়ু নিয়ে এবং এর পরিমাণ হলো ৫০০০ c.c।[৩২]

১৪. স্বরযন্ত্রীয় ক্রিয়া স্বননবৃত্তিতে রূপ ধরে যখন কণ্ঠভাঁজের স্পন্দন স্বরধ্বনির স্বর অথবা ভ ও জএর মতো ঘোষ উষ্মধ্বনি উৎপাদনে সক্ষম।

শ্বাসরন্ধ্র বেশ প্রশস্ত ও মুক্ত ; কিন্তু গাঢ়শ্বসনের আয়তন বেগে শ্বাসরন্ধ্রে ঘটে অশান্ত (turbulent) প্রবাহ এবং জন্ম নেয় ফোঁস্ ফোঁস ধ্বনি। শ্বসন পেশীয় ক্রিয়ায় বহির্বাহ নিয়ন্ত্রিত হলে বিক্ষোভ থেমে যায়, কিন্তু থাকে মৌন শ্বাস। এ ঘটে যখন আয়তন বেগ হয় ২০০-৩০০ cm^3/s অর্থাৎ ক্রান্তিক বেগের সমতুল্য। এরি নাম মৌন স্বনন। এর দুটি ধারা—এক, শ্বাস স্বনন (breath phonation), যখন আয়তন বেগ ২০০-৩০০ cm^3/s ; দুই, শূন্য স্বনন (nil phonation) যখন আয়তন বেগ প্রথমটির নিচে যায়। 'হ' প্রথমের উদাহরণ, আর 'ফ', 'স' দ্বিতীয়ের।

প্রস্বনন প্রস্বরনে রূপান্তরিত হয় যখন স্বরের উদ্ভব হয় কণ্ঠে। কণ্ঠ ভাঁজ স্পন্দন প্রক্রিয়া শুরু হয় টানওয়ালা ভাঁজ নিয়ে, যদিও কিঞ্চিৎ উন্মুক্ত। ফুস্‌ফুস্-নির্গত বহির্গামী বায়ুপ্রবাহ অতি সংকীর্ণ স্বরতন্ত্রীর মধ্য দিয়ে গমনকালে ত্বরান্বিত হয় এবং তার ফলে শ্বাসরন্ধ্রীয় চাপ কমে যায় বার্ণৌলী-অভিক্রিয়ায়

(Bernoulli effect) অর্থাৎ গরিষ্ঠ বেগের অনুবন্ধ হলো লঘিষ্ঠ চাপ এবং তদ্বিপরীত এই সূত্রানুসারে। তাই কণ্ঠভাঁজ বন্ধ হয়ে যায়, যা পরে উপশ্বাসরন্ধ্রীয় চাপে উন্মুক্ত হয়, আবার বার্ণৌলী-অভিক্রিয়ায় ও স্বকীয় স্থিতিস্থাপকতায় বন্ধ হয় আর এ-ভাবেই চক্রের পুনর্বৃত্তি ঘটে বারেবারে। একেই বলে পেশীয়-স্থিতিস্থাপক তত্ত্ব, কেননা এর অঙ্গীকারে আছে কণ্ঠভাঁজের স্পন্দনের জন্যে দায়ী তিনটি উপাদানের সম্মিলিত অভিক্রিয়া—(i) উপশ্বাসরন্ধ্রীয় চাপ ; (ii) কণ্ঠ-ভাঁজের স্থিতিস্থাপক ধর্ম ; ও (iii) বার্ণৌলী-অভিক্রিয়া। কাজেই স্বরোৎপাদনে নিদেন পক্ষে ২ থেকে ৩ cm H_2O-এর উপশ্বাসরন্ধ্রীয় চাপের প্রয়োজন। ধ্বনির চাপ মাপা হয় নলের সেণ্টিমিটারে (cm H_2O) অর্থাৎ ৯৮০.৪ dynes/cm^2-এর চাপে। আয়তন বেগের নিম্নতম মান হলো 50 cm^3/s ; এবং বাক্-এর গড় আয়তন বেগ হলো ১০০-৩৫০ cm^3/s। শ্বাসরন্ধ্র খোলার সঙ্গে-সঙ্গে উচ্চবেগের বায়ুজেট, গড়ে ২০০০-৫০০০ cm/s গলনালীতে উৎক্ষিপ্ত হয়। এই রকম উচ্চ বেগ জেটের পর্যাবৃত্ত শ্রেণীই অতিশ্বাসরন্ধ্রীয় বিবরের অনুনাদক প্রকোষ্ঠগুলিকে অনুরণনশীল করে তোলে স্বরোৎপাদনে।[৩৩] এই প্রস্বরণে আসে তান।

১৫. প্রস্বর পরিবৃত্তি সাধারণত ঘটে কণ্ঠভাঁজের উপর স্বরযন্ত্রের পেশীয় ক্রিয়ায় ; তবে শ্বাসরন্ধ্র পারের চাপ-বিভেদও বিশেষ ক্ষেত্রে উল্লেখ্য।

দু'টি প্রণালীতে কম্পাংক পরিবৃত্তি ঘটে—এক, পেশীয় ক্রিয়ার পরিবর্তনে, যাতে কণ্ঠভাঁজ হয়ে যায় দৃঢ় ও শিথিল ; দুই, কণ্ঠভাঁজের ঊর্ধাধ চাপ-বিভেদের তারতম্যে। নিম্নতম মানের (২-৩ cm H_2O) উপরে চাপের হঠাৎ পরিবর্তনে কণ্ঠভাঁজের কম্পাঙ্কেরও পরিবর্তন হবে, পেশীয় টান বাদেই। সাধারণত স্বরযন্ত্রীয় পেশীক্রিয়াই দায়ী। তা সত্ত্বেও অন্য প্রসঙ্গে শ্বাসরন্ধ্রপারে চাপভেদে ঘটে কম্পাঙ্ক পরিবর্তন। এরি উদাহরণ হলো ঘোষ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনে ও উষ্ণধ্বনিতে। এসব ক্ষেত্রে শ্বাসরন্ধ্র-পেরোনো চাপভেদ নেমে যায়, আর এইসব ধ্বনির উচ্চারণে স্বরকম্পাঙ্কের পতন প্রবণতা লক্ষণীয়। বিভিন্নভাষার ইতিহাসে স্বন্ বা সুরের (tone) উৎপত্তিতে ঘোষ ব্যঞ্জনের অবনমিত কম্পাংকের ঘটনা একটি সুপরিচিত উপাদান। কম্পাংক পরিবৃত্তি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ভিন্ন ভিন্ন ভাবে কাজে লাগায়। এখানে দু'টি রীতি লক্ষণীয়—স্বরভঙ্গি (intonation) ও স্বর (tone)। প্রথমটি উক্তির দীর্ঘবিস্তারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট, যেমন দ্বিতীয়টি হ্রস্ববিস্তারের সাথে।[৩৩] এ হলো তান উদ্ভবের কারণ।

III. উচ্চারণ

১৬. সাধারণত পদের আদ্য অক্ষরেই জোর (প্রচাপ বা বল) পড়ে ; কিন্তু

বাক্যখণ্ডে অর্থাৎ শ্বাস মেলে বা অর্থপর্বে আদ্যশব্দের আদ্য অক্ষরই প্রচাপিত হয় আর অন্যশব্দের জোর লোপ পায়।

বাঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য এই যে ঝোঁক পড়ে পদের আদ্যঅক্ষরে, কিন্তু হিন্দির মতো দ্বিতীয় অক্ষরে নয়। যেমন—আছে, কিন্তু আছে নয়; গোসাই, গুসাঈঁ নয়। এ নিয়ম শব্দগুলির স্বতন্ত্র অবস্থানে প্রযোজ্য। বাক্যে প্রযুক্ত হলে নিয়ম পাল্টে যায়। এর কারণ বাক্য তখন এক নিঃশ্বাসে উচ্চার্য পূর্ণার্থ কয়েকটি খণ্ডে অর্থাৎ শ্বাসমেল বা অর্থপর্বে বিভক্ত হয়ে যায়। এই মেল বা পর্বান্তর্গত শব্দ বা পদগুলির স্বকীয় প্রচাপ বা বল অটুট থাকে না। বাক্যখণ্ডে আদ্য শব্দের আদ্য অক্ষরের উপরই জোর বা ঝোঁক পড়ে ঃ মেল বা পর্বের অন্য শব্দের প্রচাপ লুপ্ত হয়ে যায়। অর্থাৎ মেল বা পর্বে থাকে শুধু একটি মাত্র ঝোঁক বা প্রচাপ। যেমন—সাহিত্যের। শ্রেষ্ঠ ফুল। কবিতা ;। কবিতার। শ্রেষ্ঠফল। গান। বাঙলার বাক্যস্থ শ্বাসমেল বা অর্থপর্ব যেন কতগুলি রেল-গাড়ির সমষ্টি, বলাহত বা প্রচাপিত প্রথম অক্ষর যেন ইঞ্জিন গাড়ি, বাক্যখণ্ডের অন্য অক্ষরগুলিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে।[৩৪]

১৭. **প্রচাপ ছাড়াও আছে প্রস্বর, যা বাক্যসমগ্রে ব্যবহৃত হয়, কিন্তু একক শব্দ বা অক্ষরে নয়।**

প্রস্বর হলো কণ্ঠস্বরের উন্নয়ন ও অবনমন। বৈদিক ভাষায় এইরূপ কথার সুর লক্ষণীয় ছিল—শব্দের অক্ষরবিশেষ উঁচুসুরে কথিত হতো, আর অন্য অক্ষর নিচুসুরে। এই কণ্ঠস্বর তিন প্রকারের ছিল—(i) উদাত্তস্বর বা আরোহীসুর (high pitch); (ii) অনুদাত্ত স্বর বা নিচের সুর (low pitch); ও (iii) স্বরিতস্বর বা অবরোহী সুর (combind rise and fall)। এর উদাহরণ হলো প্রশ্ন বাচক বাক্য ঃ 'তুমি যা^বে ?' এখানে 'তুমি শব্দটি উঁচুসুরে বলা হয় ; 'যাবে'-র 'যা' খুব নিচুসুরে ; আর 'বে' অক্ষরের বেলায় সুর বেশ উঁচুতে উঠেচে।[৩৪]

১৮. **একাক্ষর শব্দ পৃথকভাবে উচ্চারিত হলে হ্রস্ব থাকে না, হয়ে যায় দীর্ঘ অর্থাৎ দ্বিমাত্রিক ; অনেকাক্ষর শব্দে যথাসম্ভব দু'অক্ষর বা মাত্রার ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র-খণ্ডে বিভাজনের দিকেই ঝোঁক আছে উচ্চারণের।**

বাঙলাভাষার বৈশিষ্ট্য হলো দ্বিমাত্রিকতা (bimorism), যা চলিত ভাষায় লক্ষণীয়। 'রা—ম' হলে দু'টি অক্ষরের (syllable) একটি পদ এবং দ্বিমাত্রিক।

কিন্তু কথ্য উচ্চারণে 'রা—ম্' একাক্ষরিক, তবে দ্বিমাত্রিক। বর্ণের নাম একাক্ষর, যেমন 'ক, খ', প্রভৃতি ; এবং দ্ব্যক্ষর 'ক-কার', 'খ-কার' ইত্যাদি—এখানে একাক্ষর ও দ্ব্যক্ষর উভয়েই দ্বিমাত্রিক। আবার অনেকাক্ষর শব্দকে ভেঙে ভেঙে দুই-দুই অক্ষরে ভাগ করা হয়। যেমন, 'যমুনাবতী' ৫ অক্ষরের ; কিন্তু উচ্চারণে হয়ে যায় ৪ অক্ষরের—যমুনা+বতী (২+২)। 'ফেলিয়া দাও' সাধুভাষায় ৫ অক্ষরের ; হয়ে যায় ৩ অক্ষরের 'ফেলে দাও' ; কথ্যভাষার দ্রুত উচ্চারণে ২ অক্ষরের 'ফেল্ দাও্'।[৩৪]

১৯. অক্ষরমাত্রা লয়নির্ভর এবং এই লয় তিন প্রকারের—দ্রুত, মধ্য, বিলম্বিত।

উচ্চারণের গতিকে (tempo, speed) লয় বলে। এর উদ্দেশ্য কবিতা বা পদ্যের আদ্যন্ত কাল পরিমাণের নিয়ম সমান রাখা। তাই অমরকোষের উক্তি ঃ 'লয় সাম্যম্'। ছন্দ মাত্রায়িত বলেই লয়ের প্রভাব এখানে অধিকতর। এই উচ্চারণ হারই বাঙলা ছন্দে বিশেষ জরুরী। এখানে '(৪.৫) ঃ উচ্চারণের স্বরূপ' দ্রষ্টব্য। ঋক্‌প্রাতিশাখ্যে (১৩।৪৬-৯) ত্রিধা উক্তির উল্লেখ আছে। কৈয়টের মতে (পাণিনি I. ১.৭০) এ-তিনের অনুপাত ৯ ঃ ১২ ঃ ১৬ অর্থাৎ দ্বিতীয়টি প্রথমটির এক-তৃতীয়াংশ বেশি, আর তৃতীয়টি দ্বিতীয়টির এক-তৃতীয়াংশ বেশি। ক্রমিক অনুপাতের সূত্রানুসারে মধ্যম=$\sqrt{\text{প্রথম} \times \text{তৃতীয়}}$। তাই কৈয়টের গণনা নির্ভুল। এখানে স্মর্তব্য কৈয়ট তাঁর অনুপাতকে ভৌত—মনস্তাত্ত্বিক প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত করেচেন। ছন্দে তাই অক্ষর দু'প্রকারের—স্বাভাবিক ও প্রভাবিত। সাধারণত স্বাভাবিক অক্ষরে মাত্রার হ্রস্ব-দীর্ঘ ভেদ নেই ; কিন্তু প্রভাবিত অক্ষরে এ এসে পড়ে। ছন্দাঘাতে (ictus) এই প্রভাব আসতে পারে, যথা,

।   ।
ধিন্‌তা ধিনা- । পা-কা নোনা-

এখানে 'ধিনা', 'পাকা' ও 'নোনা' যথাক্রমে 'না-', 'পা-' ও 'না-' এর মাত্রা সম্প্রসারণে দু'মাত্রায় পরিণত হয়েচে। এরা প্রভাবিত অক্ষর।

২০. দ্রুতলয়ে আসে সংবৃত বা সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ ; বিলম্বিত লয়ে বিবৃত বা বিশ্লিষ্ট উচ্চারণ।

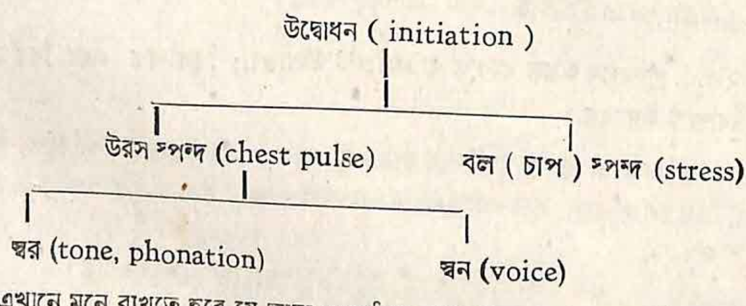
পঠনের গতিতে হ্রস্ববর্ণ দীর্ঘ হয়ে যায় আর দীর্ঘবর্ণ হ্রস্ব। অতিদ্রুত পঠনে দু'তিন বর্ণও এক হয়ে যায়। এ সম্পর্কে প্রাকৃত পৈঙ্গলম্ (১।৮)-এ আছে সমর্থন—

জই দীহো বিঅ বন্নো, লহুজীহা পঢ়ই হোই সো বি লহু।
বন্নো বি তুরিঅপঢ়িগ্রো, দোত্তিন্নি বি ঐকক জানেহু ॥

'অন্তর' শব্দটি সংবৃত উচ্চারণে সিদ্ধ। এর বিবৃত উচ্চারণ হবে 'অন্‌+তর্‌। দুটি উচ্চারণের তফাৎ এখানে যে, সংবৃত উচ্চারণের প্রথম অক্ষরের ব্যঞ্জন 'ন্' যুক্ত হয়েছে দ্বিতীয় অক্ষরের 'ত'-এর সঙ্গে ; কিন্তু বিবৃত উচ্চারণে যুক্তাক্ষর 'ন্ত' পরস্পর বিশ্লিষ্ট হয়ে গেছে। প্রথমটি হলো একান্নবর্তী পরিবারের দ্যোতক, দ্বিতীয়টি বিভক্ত পরিবারের।

২১. বাঙলা ছন্দ ত্রিধা বিভক্ত উচ্চারণ বৈশিষ্ট্যে—বলবৃত্ত ; স্বরবৃত্ত ; স্বনবৃত্ত।

উদ্বোধন-এর দিক থেকে আছে দু'টি স্পন্দ—একটি, উরস স্পন্দ ; অন্যটি, বল (চাপ) স্পন্দ। আবার প্রস্ফুটনের আছে দু'টি প্রকার—স্বর ও স্বন্‌। একটি প্রধানত কণ্ঠের সঙ্গে জড়িত ; অন্যটি প্রধানত জিভ, নাসিকা ও মুখের সঙ্গে। এদের ইংরেজী প্রতিশব্দ হলো যথাক্রমে tone ও voice। Tone শব্দটি এসেছে লাতিন tonus, গ্রীক tonos থেকে, যার অর্থ প্রতান (stretching) ; অন্যদিকে voice উৎপন্ন হয়েছে লাতিন vocem, vox যার অর্থ ধ্বনি বা স্বন। এর-ই সগোত্রীয় হলো লাতিন vocare অর্থাৎ ডাকা বা আহ্বান করা এবং গ্রীক epos অর্থাৎ শব্দ বা বাক্‌। Tone-এর অর্থই হলো কণ্ঠধ্বনি—স্বর যন্ত্রই স্পন্দশীল পেশীয় পটিজাত ধ্বনি ; আর voice-এ বুঝায় প্রাণী, বিশেষত মানুষের মুখে উচ্চারিত ধ্বনি বা স্ফোট ধ্বনি অর্থাৎ উক্তি বা বাক্‌। 'স্বর' শব্দটি উৎপন্ন হয়েছে এ-ভাবে ঃ √স্বৃ+অ (অচ্‌) কর্তৃবাচ্যে, আর এর মানে যা শব্দ করে। এতে বুঝায় উদাত্তাদি স্বরত্রয়, যার কথা বলা হয়েছে তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যে (২১।১) ঃ "উদাত্তশ্চানুদাত্তশ্চ স্বরিতশ্চ স্বরাস্ত্রয়ঃ। অর্থাৎ এ কণ্ঠধ্বনি। অন্যদিকে 'স্বন' শব্দটি সাধিত হয়েছে স্বন্‌ (শব্দকরা) + অ (ভাববাচ্যে) এ-ভাবে। এর অর্থ ধ্বনি, শব্দ ; ঋগ্বেদে (১।৩৮।১০) আছে 'অধ স্বনান্‌ মরুতাম্‌'। ব্রজাঙ্গনা কাব্যে তাই বলা হয়েছে ঃ "স্বন, স্বন, স্বনে শুন বহিছে পবন"।[৩৬] তাই অনিবার্যভাবেই এসে পড়ে ত্রিধারূপ—বলবৃত্ত ; স্বরবৃত্ত ; স্বনবৃত্ত। এই শ্রেণীবিভাগ নিচে দেখান হলো—



এখানে মনে রাখতে হবে যে ভাষা ও ধ্বনির আছে স্বতন্ত্র নাম তাদের বিভাজন

শ্রেণী বুঝাতে। ভাষাতাত্ত্বিক নাম হলো স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ ; কিন্তু ধ্বনিতাত্ত্বিক নাম স্বর (vocoid) ও স্বন (contoid)। এ-নাম ব্যবহার করেচেন Pike।[৩৭] স্বর (tone), স্বন (phon), ও বল (stress) প্রধানভাবে উপস্থিত আছে ত্রিধা ছন্দে ঃ এদের একক বৈশিষ্ট্য হলো সুরমান (toneme), কালমান (chroneme) ও চাপমান (stroneme)। এদের ভিত্তিতে তিন রকমের বিজ্ঞান পাওয়া যায়, যথা, স্বরবিজ্ঞান (tonetics), স্বনবিজ্ঞান (phonetics) ও বলবিজ্ঞান (stronetics)।[৩৭] এই তিনধারার পরিচয় আগেই দেয়া হয়েচে। এরা যথাক্রমে বৈদিক, সংস্কৃত ও অপভ্রংশের স্বরসঙ্গীত, বর্ণসংগীত অর্থাৎ ধ্বনি বা স্বন-পরিবৃত্তির সংগীত (স্বন সংগীত) ও তালসংগীত এর সগোত্রীয়। এককথায় এরা তান, মাত্রা ও তালের দ্যোতক।[৩৮]

IV. ছন্দোনির্ণয়

২২. ছন্দের দু'টি অঙ্গ—একটি চাল ; অন্যটি চলন।

ছন্দোনির্ণয়ের মূল কাজ হলো দু'টি গতির নির্ধারণ—একটি প্রদক্ষিণ ; অন্যটি পদক্ষেপ। এদের চাল ও চলন বলে। এ দু'টি পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতির মতো—একটি বড়ো গতি, অন্যটি ছোটোগতি। উদাহরণে বিষয়টি স্পষ্টতর হবে।

১	২	৩	৪
মহাভার	-তেরকথা	অমৃতস	-মান
৫	৬	৭	৮
কাশীরাম	দাসকহে	শুনেপুণ্য	-বান্।

এখানে চলন হলো চারমাত্রায় অর্থাৎ চারমাত্রায় পা ফেলে চলেচে ছন্দ, আর আটমাত্রায় ঘুরে আস্চে। এখানে যুক্তাক্ষরে, যেমন, 'পুণ্য' দু' মাত্রা আছে, কেননা ৭ম পদক্ষেপ 'শুনে পুণ্য' আর ৫ম বা ৬ষ্ঠ পদক্ষেপ—'কাশীরাম', 'দাস কহে'—একই ওজনের। বস্তুত চালের তুলনায় চলনই ছন্দোনির্ণয়ে বেশি সহায়ক। প্রাচীন পয়ার রীতির এ-ছন্দ দু'য়ের গুণিতক ৪-এ চলেচে। এ দ্বৈমাত্রিক চলনের সূচক, ৪র্থ ও ৮ম চলন আপাত দু'মাত্রার হলেও, এ সুরের জন্যে হয়েচে চতুর্মাত্রিক। ফাঁকটা সুর পুরণ করেচে।[৩৯] চাল বিভাজিত হয় চলনে অর্থাৎ প্রদক্ষিণ সম্পূর্ণ হয় কয়েকটি পদক্ষেপে।

২৩. চলন এগোয় আয়াস ও আরামের দু'টি পায়ে অর্থাৎ গতি ও বিরতিতে। আর চাল চলন-নির্ভর।

বিশ্রাম-শ্বসন ও বাক্‌-শ্বসনের মধ্যে পার্থক্য আছে। দেহ যখন বিশ্রাম করে তখনকার শ্বসনহার নির্ধারিত হয় রক্তপ্রবাহের প্রয়োজনে। রক্তে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ ক্রান্তিবিন্দুতে পৌঁছুলে মধ্যচ্ছদা সংকোচক স্নায়ুগুচ্ছ আপনা-আপনি উত্তেজিত হয় এবং টাট্‌কা বায়ু প্রশ্বসিত হয়। মোটামুটি বিশ্রাম শ্বসনের হার প্রতি মিনিটে ১০-২০ বার শ্বাসগ্রহণ। বিশ্রামশ্বসন প্রশ্বাস, নিঃশ্বাস ও বিরামের অনুক্রম। বিরাম দশায় আপেক্ষিক জড়তা দেখা যায়। প্রশ্বাস ও নিঃশ্বাসের অনুপাত প্রায় ১ ঃ ১.১। নিঃশ্বাসের সঙ্গে বিরাম যুক্ত হলে প্রশ্বাস ও প্রশ্বাসহীনতার ব্যাপ্তি অনুপাত হবে ১ ঃ ২। শ্বসনকারীর হেলান অবস্থায় বিশ্রাম শ্বসনের বিচলন মন্থরতম, আর দাঁড়ান অবস্থায় দ্রুততম।

কিন্তু বাক্‌-শ্বসন নির্ধারিত হয় উক্তির প্রকৃতিতে। আমরা কথা বলি শ্বাস মেলে অর্থাৎ কমিবেশি অখণ্ড ধ্বনি ক্রমে, যার দু'টির মধ্যে আমরা শ্বাসগ্রহণ করি। তাই বাক্‌-শ্বসনের হার বাক্‌-প্রকারের সঙ্গে পরিবর্তনশীল। প্রায়ই এই হার বিশ্রাম শ্বসনের চেয়ে মন্থরতর; তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ দ্রুততর। বাক্‌-শ্বসনে নেই আপেক্ষিক বিরতি বা জড়তা। এখানে অর্ধেক বা এক-তৃতীয়াংশ সময়ে প্রশ্বাস বিচলন সম্পূর্ণ হয়, আর নিঃশ্বাস দশা অতিমাত্রায় বিলম্বিত হয়। সাধারণ সংলাপে আগম-নিগমের অনুপাত ১ঃ৩ থেকে ১ঃ১০, তবে এ ১ঃ৩০ পর্যন্ত উঠতেও পারে। বাক্‌-শ্বসনে উক্তির হার প্রতিসেকেণ্ডে ২.৫ থেকে ৪ অক্ষরে পৌঁছালে, কুক্ষিপেশী-পুঞ্জ দৃঢ়ীভূত বা সংবদ্ধ হয়ে যায় এবং তারা পাঁজর পিঞ্জরের প্রান্তকে দৃঢ়ভাবে ধরে রাখে। এ আন্তরপাঁজরীয় অক্ষর স্পন্দের পরিপন্থী।[৪০]

তাই চলন নিয়ন্ত্রিত হয় কুক্ষি-পেশীয় ক্রিয়ায়—একদিকে গমন, অন্যদিকে বিরতি। চাল ও আবার চলন-নিয়ন্ত্রিত। ফলে এখানে আছে গমন ও বিরতি, আয়াস ও আরাম।

২৪. চলন তিন প্রকারের—সম ; অসম ; বিষম।

ছন্দের জাত নির্ণয়ে চলনই তাৎপর্যপূর্ণ। বস্তুত একাজে চালের চেয়ে চলনই অধিকতর সহায়ক। এই চলনের উপাদান দুই ও তিনকে নিয়ে অর্থাৎ সৃষ্টিমূলে রয়েচে জোড় ও বিজোড়ের লীলা। পাটীগণিতে জোড় ও বিজোড়—১, ২-এর পার্থক্য একটি পুরাতন বৈশিষ্ট্য। এ-পার্থক্য পাইথা-গোরাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। Philolaus বলেন ঃ "সংখ্যা দু'টি বিশেষ ভাগে বিভক্ত হয়েচে—জোড় ও বিজোড়, আর দুয়ের মিশ্রণে সৃষ্টি হয়েচে জোড়-বিজোড়ে তৃতীয়।" Nicomachus এদের সংজ্ঞা নির্দেশ করেচেন এ-ভাবে ঃ "যুগ্ম (জোড়) সংখ্যা তাকেই বলে যাকে একই প্রক্রিয়ায় গরিষ্ঠ ও লঘিষ্ঠ অংশে ভাগ করা যায়—আয়তনে 'গরিষ্ঠ কিন্তু

সংখ্যায় অর্থাৎ দু'টি অর্ধেকে, লঘিষ্ঠ; অপরপক্ষে অযুগ্ম বা বিষম সংখ্যা তাকেই বলে যাকে এ-ভাবে ভাগ করা যায় না, কিন্তু যা কেবল অসমান দুটি অংশে বিভাজ্য"। তাঁর মতে জোড়সংখ্যা দুটি সমান ভাগে অথবা দু'টি অসমান ভাগে বিভাজ্য; আর বিজোড় সংখ্যা বিভাজ্য দুটি অসমান অংশে অর্থাৎ একটি বিজোড়, অন্যটি জোড়। তাই দেখা যায় প্রথমটির ভাগগুলি একই প্রকৃতির অর্থাৎ উভয়ই হয় জোড়, না হয় বিজোড়; কিন্তু দ্বিতীয়টির ভাগগুলি ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অর্থাৎ একটি জোড়, অন্যটি বিজোড়।[৪১] তবে পাইথাগোরীয়রা জোড় ও বিজোড়কে সসীম ও অসীমের সঙ্গে অভেদ কল্পনা করেছেন। সংখ্যা স্থানিক— 'এক' 'বিন্দুর' সঙ্গে অভেদ, যেমন, 'দুই' 'রেখা'র সঙ্গে এবং 'তিন' 'তলে'র সঙ্গে। আর জোড় ও বিজোড় এবং সসীম ও অসীম হলো দশটি মৌল দ্বন্দ্বের মধ্যে দুটি; অন্যদের মধ্যে আছে পুরুষ ও নারী এবং স্থিতি ও গতি।[৪২]

গ্রীক চিন্তাধারার ভিত্তিতে ছন্দের চলন দেখা দেয় জোড়-বিজোড়ের লীলা হিসেবে। তবে এখানে দু'টি পরিবর্তনের প্রয়োজন। এক, প্রথম বিজোড় সংখ্যা, 'এক',-কে বাদ দিতে হবে, কেননা ছন্দের ব্যাপারে একাধিক-এর দরকার। তাই 'দুই' থেকে শুরু হবে এখানে। দ্বিতীয়ত, জোড় ও বিজোড় স্থিতি ও গতির অনুরূপ হিসেবেই গ্রাহ্য। ফলে জোড়ে আসে স্থিতি, আর বিজোড়ে গতি অর্থাৎ এ গড়িয়ে চলে। সংস্কৃত-প্রাকৃত—অপভ্রংশের নজিরায় তাই ছন্দে দৃশ্য হয়ে ওঠে তিনটি চলন—সম; অসম; ও বিষম।[৪৩] এই বিভাগ দুই ও তিনের সমবায়ে গড়ে উঠেচে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলচেন: "ধ্বনির দুই মাত্রা এবং তিনমাত্রা বাংলা ছন্দের আদিম এবং রূঢ়িক উপাদান। তারপরে এই দুই এবং তিনের যোগে যৌগিক মাত্রার ছন্দের উৎপত্তি—তিন+দুই, তিন+চার, তিন+দুই+চার প্রভৃতি।"[৩৯] এবার তিন প্রকার চলনের উদাহরণ—

সম: তারা. গুলি সারা. রাতি। কানে. কানে. কয়।
সেই. কথা. ফুলে. ফুলে। ফুটে. বন. ময়॥

—রবীন্দ্রনাথ: ছন্দ, পৃঃ ৬৪

অসম: আঁধার. রজনী. পোহাল.
জগৎ. পুরিল. পুলকে।

—রবীন্দ্রনাথ: ছন্দ, পৃঃ ৪৫

বিষম: তমাল. বনে। ঝরিছে. বারি-। ধারা,
তড়িৎ. ছুটে। আঁধারে: দিশা-। হারা।

—রবীন্দ্রনাথ: ছন্দ, পৃঃ ১৪৬

২৫. চলন-বিরতির ত্রিধারূপ—ছেদ ; যতি ; বিরাম।

চলন হলো চালের বাটখারা অর্থাৎ এতে মাপা হয় ছন্দের প্রকার। এর পরিমাণ নির্ধারিত হয় ছেদ, যতি ও বিরামে। অর্থাৎ কিনা এই তিনটি বাটখারার গড়ন নির্ধারক। এদের কথা আগেই বলা হয়েচে (৫.৪) ঃ "ছেদ, যতি ও বিরাম"—এ। মধ্য লয়ে আট পোরে কথাবার্ত্তা চলে, যার সাধারণ নাম গদ্য। এরি প্রয়োগ হয়েচে বাক্‌ছন্দ হিসেবে কবিতায় বা পদ্যে। এখানে বিরতি অর্থমাফিক অর্থাৎ অর্থের ছেদই এর বড় কথা। তাই এচলন একটু লম্বাটে ঃ লম্বা লম্বা পা ফেলে এ এগোয়। এ দেখা যায় স্বরবৃত্ত ছন্দে, কেননা প্রস্বরের সুরই এই দীর্ঘ পদক্ষেপের সহায়ক, আর 'পদে'র পরেই পড়ে এই ছেদ। সাধারণত ৬, ৮, ও ১০ মাত্রার পরেই ছেদ-এর আবির্ভাব। দ্বিতীয়টি হলো যতি, যার পদক্ষেপ আরো ছোট। সাধারণত এ আসে ৩ মাত্রার ও তার গুণিতকে, যেমন ছেদ পড়ে ২ মাত্রায় ও তার গুণিতকে। তাই যতির আবির্ভাব ৩ বা ৬ মাত্রায় এবং এই পদক্ষেপকে বলে 'পর্ব'। উচ্চারণ মন্থর বলেই প্রতিটি স্বন (phon) নিজের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। ফলে প্রত্যেক স্বনের স্বাতন্ত্র্যে বাক্ প্রবাহ নাতিদীর্ঘ অবয়বে কাটা-কাটা হয়ে পড়ে। এ গড়িয়ে-চলা ছন্দ, চলে ঠিক চাকার মতো। অন্যদিকে স্বরবৃত্তের ছন্দ চৌকা। মনে রাখতে হবে যে "দুই সংখ্যাটা স্থিতিপ্রবণ, তিনসংখ্যাটা গতিপ্রবণ"[৩৯]। তৃতীয়টির নাম বিরাম, যা দেখা যায় বলবৃত্তে। বল-ই এখানে মুখ্য ; তবে বল যাতে বেসামাল না হয় তার জন্য রক্ষাকবচও আছে। অর্থাৎ প্রচাপ আসে প্রথমে ও তারপরে শ্লথন। এ দুইয়ে মিলে চলনকে করে নিয়ন্ত্রিত। ফলে এ হয়ে দাঁড়ায় বিষম চলন অর্থাৎ গতি ও বাধায় গড়ে এর পদক্ষেপ, যা বিশেষিত হয় 'মেল'—নামে। এবার ছেদ, যতি, বিরামের উদাহরণ—

ছেদ ঃ ভবানীর কটু ভাষে। লজ্জা হৈল কৃত্তিবাসে।
ক্ষুধানলে কলেবর। দহে।

এ ত্রিপদী, যার চলন আটমাত্রায় অর্থাৎ দুই-য়ের গুণিতকে। ফলে 'ছেদ' পড়েচে চলনশেষে অর্থাৎ আটমাত্রায়। চতুর্থ পদটি 'দহে', যা ঠেক দিয়ে ছন্দটাকে খাড়া রেখেচে। কারণ ঃ "চতুষ্পদ জন্তুর পায়ের তেলোটা চওড়া হয় না, কিন্তু মানুষের শরীরের টল টলে ভারটা দুই পায়ের পক্ষে বেশি হওয়াতেই তাহার পদতলটা গোড়ালি ছাড়াইয়া সামনের দিকে খানিকটা বিস্তীর্ণ ; সেইটুকুই ত্রিপদীর ঐ শেষ দুটো অতিরিক্ত মাত্রা।"

যতি ঃ নবীন। কিশোরী। মেঘের। বিজুরী। চমকি। চলিয়া। গেল।

এখানে চলন তিন মাত্রায়। তাই এ গড়িয়ে চলেচে ঃ "তিনমাত্রার শব্দগুলি একটা আর একটার গায়ের উপর গড়াইয়া পড়িয়া ঠেলা দিয়া চলিয়াছে, থামানো দায়। অবশেষে একটি দুই মাত্রা আসিয়া তাহাকে ক্ষণকালের জন্য ঠেকাইয়াছে।"[৩৯]

। । । ।
বিরাম ঃ বৃষ্টি পড়ে। টাপুর টুপুর। নদী এলো। বান

এখানে দণ্ডাহত অক্ষরে প্রচাপ পড়েচে, তাই পরবর্তী শব্দে বিরামের প্রয়োজন বিশেষ জরুরী। ফলে 'বৃষ্টি'তে যে-প্রচাপ ছন্দাঘাতের (ictus) কাজ করচে, তা পরবর্তী শব্দে 'পড়ে' শিথিল হয়েচে। এ ভাবে প্রচাপ-শ্লথনে উদ্ভব হয়েচে একটি শ্বাস মেল-এর বা শুধু মেল-এর। এই 'মেল' চিহ্নিত করে 'বিরাম'।

বিরতির এই ত্রিধা বিভাগের সঙ্গে তুলনীয় তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের (২২।১৩) চতুর্বিভাগ ঃ ত্রিমাত্রিক বাগ্বিরাম ; দ্বিমাত্রিক পদবিরাম ; এক মাত্রিক বিবৃত্তি-বিরাম ; ও অর্ধমাত্রিক সমান পদ বিবৃত্তি-বিরাম।

২৬. ছন্দ চলে পদ, পর্ব ও মেলে।

চলনের বহর তিন প্রকারের—পদ, পর্ব ও মেল। এদের ব্যাখ্যা আগেই দেওয়া হয়েচে "(৬.৩) ঃ নিরুক্তি"তে—দ্রষ্টব্য (৯), (১১) ও (১৭) সংখ্যা। মধ্য, বিলম্বিত ও দ্রুত উচ্চারণের ভিত্তিতেই পদ, পর্ব ও মেল এর সন্ধান মেলে।

পদ ও পর্বের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমত, পদে আসে প্রস্বরের স্বরের বা সুরের প্রাধান্য ; কিন্তু পর্বে স্বন-এর। ফলে মধ্যবর্তী অযুক্ত বা যুক্তবর্ণের ওজন কম বা বেশি করা যায় পদে। কিন্তু পর্বে নয়, যেমন,

সম্মুখ সমরে পড়ি। বীর চূড়ামণি

এখানে পদবিভাগ ৮+৬ মাত্রায় এবং যুক্ত 'ম্ম' এক মাত্রা ওজনের। কিন্তু

নন্দপুর। চন্দ্রবিনা। বৃন্দাবন। অন্ধকার

এ যুক্ত বর্ণগুলি দ্বৈমাত্রিক ; তাই এখানে আছে পর্বের পরিচয় ; আর চলন হলো ৫+৫+৫+৫ মাত্রার। দ্বিতীয়ত, পদ মধ্য লয়ে উচ্চারিত হয় বলে, এতে আছে দ্বৈমাত্রিক লয় ; অন্যদিকে পর্ব ত্রৈমাত্রিক লয়ে উচ্চারিত হয়। ফলে পদ স্থিতি-প্রবণ, কিন্তু পর্ব গতি-প্রবণ। তাই

নিখিল আকাশ ভরা। আলোর মহিমা

—৮+৬ এর পদে এগিয়েচে। প্রথম পদটি ৩+৩+২ ; কিন্তু এর উচ্চারণ

। ।
হলো—নিখি-ল্আ-কাশ-ভরা। দ্বিতীয় পদ ৩+৩ মাত্রার ; তবে এর উচ্চারণরূপঃ

। ।
আলো-র্ম্-হিমা। গোটা চরণটি দাঁড়ায় এরূপ ঃ

নিখি-ইল্আ-কাশ-ভরা। আলো-ওরম্-হিমা

লক্ষণীয় যে দ্বিতীয় পর্দাটি প্রথম পদের লয় দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, আর ঝোঁকের তেমন অবকাশ নেই। কেননা, প্রতিটি ধ্বনি বা স্বন স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারে নি স্বর প্রবাহের জন্যে। একে তিনমাত্রায় লয়ে রূপ দিলে হবে—

আলোর মহিমা। নিখিল আকাশ। ভরা

অর্থাৎ এখানে প্রতি পর্বে এসেচে ৩+৩ মাত্রার লয়, আর অন্ত্য পর্বে তিনের গতিকে প্রতিহত করা হয়েচে। এ আর পদ নয়, পর্ব।

দ্বিতীয়ত, পর্বস্পন্দে গতিই বড় কথা এবং এতে পর্বগুলি কাটা-কাটা হতে পারে। পদে কিন্তু স্বরপ্রবাহ থাকে। অর্থাৎ প্রথমটিতে থাকে ঝোঁক, দ্বিতীয়টিতে এরি অভাব। মধ্যবর্তী যুক্তাক্ষরকে দু'মাত্রার ওজন দিলে এ পার্থক্য ধরা পড়ে। যথা,

পদ ঃ নিম্‌নে যমুনা বহে। স্বচ্ছ্‌ শীতল (৮+৬)

| |

পর্ব ঃ নিম্নে যমুনা. বহে। স্বচ্ছ শীতল [৬+ (২)+৬]

তৃতীয়ত, গতিকে বাঁধবার জন্যে চাই খণ্ড পর্ব। বস্তুত পদের ব্যাপারে খণ্ড পদ নেই। যেমন,

| | | |

কুঞ্জে আমার। এসে ফিরে গেছে। অকাল বৈশা-। খী

এখানে খণ্ডপর্ব এসেচে 'খী'-তে।

অবশেষে প্রচাপ বা ঝোঁক বৈচিত্র্যে ধরা পড়ে পদ, পর্ব ও মেল-এর পার্থক্য। প্রথম দু'টিতে আছে উরসস্পন্দ, আর তৃতীয়টিতে বল-স্পন্দ। অর্থাৎ বলস্পন্দ উরসস্পন্দ থেকে বলবত্তর। তিনটি চরণ-বিভাগে তিনটি ঝোঁকের বল-পরিমাণ ভিন্নতর। এর কারণ, পদ স্বরনির্ভর ; পর্ব স্বন-নির্ভর ; ও মেল বল-নির্ভর। তাই বলের সাধারণ উপস্থিতি লক্ষণীয় প্রথমে ; এ বেড়ে আরো বেশি হয় দ্বিতীয়ে ; আর তৃতীয়ে এ বৃহত্তম। এদের নামকরণ হতে পারে বল (\\), অধিবল (/), অতিবল (।)। নিচে এই ত্রিধা ঝোঁকে তিনের পরিচয় দেখান হলো—

\\ \\

পদ ঃ রাত্রিকালে দুর্জনেরা। হাঁকে লুণ্ঠনাশে

/ / / /

পর্ব ঃ রাত্রিকালে। দুর্জনেরা। হুঙ্কারিল। লুণ্ঠনাশে

| | | |

মেল ঃ রাতের বেলায়। ডাকাতগুলো। হুঙ্কার দিল। লুটের আশে।

এখানে লক্ষণীয় যে বল বা ঝোঁক পর্ব ও মেল-এ অনেকটা কাছাকাছি এসে

গেচে।[১১] অধিবল ও অতিবলের পার্থক্য এবং স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্ত রীতির বিভেদ না ধরতে পারায় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের ভুল হয়েচে নিচের চরণের ছান্দোনির্ণয়ে—

মুক্ত বেণীর। গঙ্গা যেথায়। মুক্তি বিতরে। রঙ্গে।
আমরা বাঙালী। বাস করি সেই। তীর্থে-বরদ। বঙ্গে।
—সত্যেন্দ্রনাথ ঃ কুহু ও কেকা—'আমরা'

আগে (১৯২৬) একে তিনি 'বলবৃত্ত' বলে অভিহিত করেচেন ; পরে (১৯৭২) একে 'স্বনবৃত্ত' বলেচেন।[৪৪] প্রবোধ চন্দ্র সেন মহাশয় বলেন ঃ এর মূলে আছে তাঁর ও শিশির কুমার ভাদুড়ীর আবৃত্তি। বস্তুত চরণ দু'টি যে দু'রীতিতে অর্থাৎ বলবৃত্ত ও স্বনবৃত্তে পাঠ্য তা এঁরা কেউ-ই ধর্তে পারেন নি। এখানে স্মর্তব্য যে স্পন্দ প্রত্যক্ষ, আর ছন্দ ধারণা। কবিতা বা পদ্যের চরণ-কে তাই বিভিন্ন স্পন্দ মেলে পড়া যায়। এ-জন্যেই Chatman বলেচেন ঃ "যে-কোন কবিতা ছন্দের শ্রেষ্ঠ বর্ণনা এই যে এ সকল অর্থবহ ছন্দোবিশ্লেষের ধাত্র"।[২২] এ-প্রসঙ্গে তাই সেন মহাশয়ের উক্তি যুক্তি-সহ নয় ঃ "আসলে এটা কলাবৃত্ত (স্বনবৃত্ত) রীতির ছন্দ। Stress আছে বটে ; কিন্তু তা তার ছন্দোগত ধর্ম নয়, কবিকর্তৃক আরোপিত। Stress টা কোনো বিশেষ রীতির প্রকৃতিগত নয়।"[৯] তিনি ধর্তে পারেননি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটি—Stress বা বল প্রচাপ-উদ্ভূত এবং এর শারীরবৃত্তীয় ভিত্তি রয়েচে। তাই এ কবির কৃপাপ্রার্থী নয়।

২৭. ছন্দের উপাদান অক্ষরের উচ্চারণরীতি ও বিরতি এবং তারি সঙ্গে প্রস্বর ও প্রচাপ।

উচ্চারণ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য "(৪.৫) ঃ উচ্চারণের স্বরূপ" ; বিরতি সম্পর্কে "(৫ ঃ ৪) ঃ ছেদ, যতি ও বিরাম" ; এবং প্রস্বর ও প্রচাপ সম্পর্কে "(২.১৩) ঃ প্রচাপ, প্রস্বর ও স্বরভঙ্গি" এবং "(৫.৩) ঃ প্রচাপ, প্রস্বর ও মাত্রাবিচার"। বস্তুত প্রচাপ ও প্রস্বর বাঙলা ছন্দের অঙ্গ বলেই এদের নামেই হয়েচে 'বলবৃত্ত' ও 'স্বরবৃত্তে'র নামকরণ। বলের যেমন আছে ত্রিধারূপ, তেমিন প্রস্বরেরও। তিনটি ছন্দকে প্রস্বরের ক্রমবর্ধমান শ্রেণীতে সাজালে দাঁড়ায় ঃ বলবৃত্ত ; স্বনবৃত্ত ; ও স্বরবৃত্ত। এবার বলের ক্রমবর্ধমান শ্রেণীতে হবে ঠিক উল্টোটা ঃ স্বরবৃত্ত ; স্বনবৃত্ত ; ও বলবৃত্ত। বলের আছে পরিমাণগত তিনটি ক্রম, যথা, বল (স্বরবৃত্তে), অধিবল স্বনবৃত্তে) ও অতিবল (বলবৃত্তে)। প্রস্বরেরও তেমিন তিনটি ক্রম আছে, স্বর (বলবৃত্তে), অধিস্বর (স্বনবৃত্তে), অতিস্বর (স্বরবৃত্তে)। প্রস্বর ও প্রচাপের সমন্বয়ে চলে ছন্দ—প্রবাহ।

সুনীতি কুমার মনে করেন যে স্বরভঙ্গি বা প্রস্বরণ বাঙলা বাক্‌-এ তাৎপর্যপূর্ণ নয়, যেমন দেখা যায় পাঞ্জাবি ও সুইডিশ ভাষায়। তবে এর অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না।[৪৫] দেখা গেচে যে অর্থের সূক্ষ্ম বিভেদ বুঝাতে স্বরভঙ্গির ভূমিকা আছে। অভিলেখ সাক্ষ্য দেয় যে মেল বা বাক্যাংশ বিচলনই অর্থ-বিভেদের জন্যে দায়ী। যেমন,

তুমি কি। যাবে? —প্রশ্নবোধক;
তুমি। কি যাবে-নিষেধার্থক।[৩২]

তবে মেল-বিচলনের সঙ্গে যে স্বরভঙ্গি সংশ্লিষ্ট সে-সম্বন্ধে কোন সংশয় নেই। স্বরভঙ্গি ছাড়াও কবিতায় আছে স্বরতরঙ্গ বা সুরেলা উচ্চারণ, যার প্রাধান্য স্বরবৃত্তে স্বীকৃত। তাই প্রস্বরের ভূমিকা নগণ্য নয় স্বরবৃত্তে, যেমন স্বনবৃত্তে বা বলবৃত্তে।

V. মাত্রাসাম্য

২৮. অক্ষরই বিচলনের তথা ছন্দের একক এবং এ দু'প্রকারের—মুক্ত ও বন্ধ।

বাগ্‌ধ্বনি বৃত্তি অনুসারে দু'ভাগে বিভাজ্য—আক্ষরিক ও অনাক্ষরিক। শাব্দ অভিলেখে ধরা পড়েচে যে শাব্দশক্তির নির্দিষ্ট চূড়া আছে যা আক্ষরিক ধ্বনির সঙ্গে ঠিকঠিক মিলে যায়। উক্তির প্রত্যেক অংশের জন্যে আছে এরূপ "চূড়া"। কাজেই Stetson (স্টেটসন্) মনে করেন যে "অক্ষরই সঞ্চালক একক" অর্থাৎ প্রত্যেক অক্ষরই আদৌ একটি বিচলন জট, যেখানে বৃহত্তর অন্তর্নিহিত বিচলন হলো শ্বাসস্পন্দ বা বক্ষঃপেশীতন্ত্রের ঘাত, যার ফলে ফুস্‌ফুসীয় বায়ু সংনমিত হয়। উচ্চারক প্রত্যঙ্গের বিচলনে বায়ু নিঃসারণ শুরু হয় এবং পরে নিয়ন্ত্রিত বা প্রতিহত হয়। এখানে অনাক্ষরিকরা আক্ষরিক বিচলনের নিয়ামক এবং আক্ষরিক গৌণ উপাদান হয়ে দাঁড়ায়। তাই অক্ষর বাস্তব, অলীক নয়।[৪৬] তবে ব্যবহারিক দিক থেকে অনুরণনশীলতা (sonority) এখানে সহায়ক—মোটামুটি এ শাব্দ-শক্তির সমান আর Bell Telephone Laboratories এ এর পরিমাণ মাপাও হয়েচে। আক্ষরিকের মূলকে দু'ভাবে দেখা যেতে পারে—শাব্দিক ঘটনা হিসেবে এ হলো অক্ষরে অধিকতর অনুনাদীয় উপাদান; আর বাক্‌-প্রত্যঙ্গের দিক থেকে এ হলো অক্ষর-নিঃসৃত শ্বাস স্পন্দের প্রধান বাহক। অধিক অনুনাদশীল উপাদান-গুলোকে বলা হয় স্বরধ্বনি, যদিও স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনির মধ্যে পৃথকীকরণের কোন সন্তোষজনক পথ নেই।[১৯]

বাঙলা অক্ষর দুই প্রকারের—মুক্ত, যেমন, আ, ও, টা প্রভৃতি; বদ্ধ যেমন, নাক্‌, ধান। এ দুই নিয়ে বাঙলা শব্দ সপ্তাক্ষরিক বা তদূর্ধ্ব সংখ্যকও হতে পারে। সপ্তাক্ষরিক শব্দ, যথা, অ। ন। তি। প। রি। চি। ত=৭। এখানে মনে রাখতে হবে যে প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনির হরফের মধ্যে একটি স্বরধ্বনি লুকিয়ে আছে,

যার নাম 'অ'। তাই কোন একটি ব্যঞ্জন বর্ণ (letter) কে শব্দের বাইরে উচ্চারণ কর্তে গেলেই তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি 'অ' আপনা থেকে উচ্চারিত হয়ে উক্তবর্ণকে একটি পূর্ণ অক্ষরের মর্যাদা দেয়। যেমন, ক্+অ=ক, প্+অ=প ইত্যাদি। এগুলো শুধু বর্ণই নয়, একেকটি অক্ষর (Syllable)। এক কথায়, অক্ষরগঠনে ব্যঞ্জন পরবর্তী স্বরকে অনুসরণ করে, যেমন ট্+উ=টু প্রভৃতি।[৪৭]

২৯. স্বর হ্রস্ব ও দীর্ঘ ভেদে দ্বিবিধ ; কিন্তু অক্ষরও দ্বিধাবিভক্ত—লঘু ও গুরু ; আর ছন্দে উভয় ভেদই ব্যাপ্তিতে এক।

স্বর ও ব্যঞ্জন নিয়ে অক্ষর তৈরি হয়। স্বরের বেলায় হ্রস্ব-দীর্ঘত্ব আছে ; অক্ষরের ক্ষেত্রে লঘু-গুরুত্ব। হ্রস্বতার নিরিখ হলো 'অ'—স্বরের মাপ। তাই বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যে (I/৫৫-৫৭) বলা হয়েচে ঃ "অমাত্রস্বরো হ্রস্বঃ ; মাত্রা চ ; দ্বিস্তাবান দীর্ঘাঃ"। অর্থাৎ 'অ'-মাপের স্বরই হ্রস্ব এবং এ মাত্রাও—এর দ্বিগুণ কাল লাগে যে উচ্চারণের সেই দীর্ঘ। তবে অক্ষর পরিচয়ে ব্যবহৃত হয় লঘু ও গুরু শব্দ দুটি।[৪৮] এখানে স্মর্তব্য যে তাত্ত্বিক দিক থেকে 'হ্রস্ব-দীর্ঘ' এবং 'লঘু-গুরু' এক নয়। প্রথম যুগল ব্যবহৃত হয় কালদৈর্ঘ্য বা কালব্যাপ্তি বুঝাতে ; দ্বিতীয়টি ওজনের সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর দৈর্ঘ্য ও ওজন এক নয়। মনে রাখতে হবে যে এই দৈর্ঘ্য ভর নয়। তাই 'ধ্বনিভর' কথাটি অবৈজ্ঞানিক—ধ্বনি শ্রৌত, দৃশ্য নয়। ধ্বনিকে বর্ণের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলায় এসেচে এই ধারণা। ফলে বলা হয়েচে যে, "আয়তনে সমান হলেও রুদ্ধদলে ধ্বনিবস্তু থাকে বেশি"। এ-উক্তি অজ্ঞতা-প্রসূত ও যুক্তি-বিরোধী। তাই "গুরু রুদ্ধ দল ও লঘু মুক্ত দল" কে "আয়তনে সমান অর্থাৎ একমাত্রা" ধরা হয়েচে। ধ্বনি বাদে বর্ণের দিকে চেয়েই এ মন্তব্য করা হয়েচে, যেমন 'কথা-কন্থা', 'পাতা-পান্তা'। এখানে দু'টির ধ্বনিসাম্য নেই। তবে ছন্দের প্রয়োজনে কখনো-কখনো এরা এক হয়ে যায়। যদিও বিজ্ঞানের আলোচনায় এদের স্বাতন্ত্র্য বর্ণনীয়। দ্বিতীয়ত, আরেকটি উক্তি বিচার-সহ নয় ঃ "ধ্বনি এমন একটি জিনিস যার ভার, ওজন বা গুরুত্ব থাকতে পারে না। বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় ভার (weight) না বলে বলা উচিত ভর (mass)।"[৯] ভর কথাটি ধ্বনি সম্পর্কে প্রযোজ্য নয়। বাগ্ধ্বনি উৎপাদনে রয়েচে ফুস্ফুসীয় বায়ুপ্রবাহের সংনমন ও সম্প্রসারণ। কাজেই চাপ এখানকার বড়ো কথা। তাছাড়া প্রচাপের ভূমিকাও স্মর্তব্য। এই প্রচাপ হলো উদ্বোধক শক্তির প্রত্যঙ্গীয় বায়ু-সচল ও ধ্বনিক অনুষঙ্গী। এ স্বরভাঙ্গ (কম্পাংক) থেকে আলাদা। ফলে প্রচাপ (বল)=উদ্বোধক বেগ×চাপ।[২৯] পদার্থ বিজ্ঞানে প্রতি একক ক্ষেত্রে প্রযুক্ত বলকে বলা হয় প্রচাপ। অন্যদিক থেকে ভর হলো কোন বস্তুতে প্রযুক্ত 'বল' ও তার 'ত্বরণে'র অনুপাতের ধ্রুবক। এখানে 'ধ্বনি' দৃশ্য বস্তু নয়, কিন্তু বলজাত।[৪৯] কাজেই বিজ্ঞানের আলোচনায় সাবধানতার প্রয়োজন।

পাণিনি (I. ২. ২৭) উ-স্বরকে হ্রস্বকালীন, ঊ-স্বরকে দীর্ঘকালীন ও প্রলম্বিত উকে প্লুতকালীন বলে অভিহিত করেছেন ঃ "কালোহয়ং যথাক্রমং হ্রস্বদীর্ঘপ্লুতইত্যেবংসংজ্ঞোভবতি"। পরে (I. ৪. ১০-১২) হ্রস্ব স্বরকে লঘু এবং দীর্ঘ স্বরকে গুরু বলা হয়েছে। "হ্রস্বং লঘু। সংযোগে গুরু। দীর্ঘংচ"। পিঙ্গলের ছন্দঃ সূত্রে (I. ৯, ১৩) উক্ত হয়েছে যে লঘু অক্ষর হাল্কা পরিমাণের এবং গুরু অক্ষর দুটি হাল্কা পরিমাণের সমান। এরি পরিপ্রেক্ষিতে A. Borooah বলেনঃ "অক্ষর গুরু হবে যদি এতে থাকে দীর্ঘস্বর বা হ্রস্বস্বরের পরে যুক্তব্যঞ্জন, বিসর্গ বা অনুস্বার, কেননা উচ্চারণ এ-ক্ষেত্রে হয় বিলম্বিত। এ লঘু হবে যদি হ্রস্বস্বরের পরে না থাকে যুক্ত ব্যঞ্জন, বিসর্গ বা অনুস্বার, কেননা এ-সব ক্ষেত্রে উচ্চারণ প্রলম্বিত হয় না। যদি গুরু অক্ষরে ব্যঞ্জন থাকে তবে এ হবে গরীয় ; যদি লঘু অক্ষরে ব্যঞ্জন না থাকে তবে এ হবে লঘীয়।"[৫০] লঘু-গুরুর হ্রস্ব-দীর্ঘে রূপান্তরের নৈয়ায়িক ক্রিয়া সম্পর্কে W. A. Allen মন্তব্য করেছেন যে গুরু অক্ষর=২ মাত্রা ঃ এই সিদ্ধান্তটিতে রয়েছে "বৃহত্তর বিপদ", কেননা ধ্বনিবিদ্‌দের "মাত্রা" আর ছান্দোসিকদের "মাত্রা" এক নয়। তাঁর মতে ধ্বনিবিদ্‌দের যুক্তি পরম্পরা এরূপ ঃ

(i) যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর=গুরু অক্ষর ঃ তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য XXII, ১৪-১৫ ;

(ii) দীর্ঘস্বর=গুরু অক্ষর ঃ ঋক্‌প্রাতিশাখ্য, XVIII, ৪১-৪৪ ;

∴ (iii) যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর=দীর্ঘস্বর।

(iv) দীর্ঘস্বর=২ মাত্রা ঃ বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্য, IV ১০৯ ;

∴ (v) যুক্তব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর=২ মাত্রা ;

(i) ও (v) অনুসারে ∴ গুরুঅক্ষর=২ মাত্রা।

Allen শেষ সিদ্ধান্তে আঁৎকে উঠেছেন।[৫১] কিন্তু লক্ষ্য করেননি যে (iii) সিদ্ধান্তটি ভুল, নৈয়ায়িক যুক্তি (syllogistic reasoning) অনুসারে। এখানে আছে, (i) ও (ii)-তে তিনটি পদ (term)—'যুক্ত ব্যঞ্জনের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর', 'গুরুঅক্ষর ও 'দীর্ঘস্বর'। এদের মধ্যে মধ্যমটির অব্যাপ্তি দোষ ঘটেছে, তাই সিদ্ধান্তটি অর্থাৎ (iii) ঠিক নয়।[৫২] বস্তুত অক্ষর স্বর ও ব্যঞ্জনে তৈরি ; আর হ্রস্বস্বর 'অ' বা 'উ'-এর সমান। দীর্ঘস্বর এদের দ্বিগুণ। বর্ণালী লেখ-এ 'অ'-এর তিনটি প্রস্বরাবয়ব নারীকণ্ঠে ৪০০, ১০০০ ও ৩০০০ ; আর উ-র যথাক্রমে ৪০৩ ও ৮০০ চক্কর প্রতি সেকেণ্ডে। এরা প্রায়তুল্যমূল্য—বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্য 'অ'-এর সমর্থক, আর পাণিনি 'উ'-এর। উভয়ে প্রায় একজায়গায় এসেছেন হ্রস্বস্বরের কালব্যাপ্তিতে। এরি দ্বিগুণ হবে দীর্ঘস্বরে।[৩২]

প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে ফরাসী ছন্দ, কেননা ফারসী বাঙলার মতই আর্যভাষা। ফরাসীতে স্বরান্ত অক্ষর মুক্তাক্ষর এবং এ হ্রস্ব—দীর্ঘস্বরের মুক্তাক্ষর দীর্ঘই বটে। আবার ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর বদ্ধাক্ষর এবং এ দীর্ঘ। দীর্ঘস্বরের বদ্ধাক্ষর দীর্ঘতর ঃ হ্রস্ব বা দীর্ঘস্বরের দ্বিগুণ বদ্ধ অক্ষর ও দীর্ঘতর।[৫৩] বাঙলা সম্পর্কে আগেই বলা হয়েচে (দ্রঃ ২. ১৫) যে বাচ্যভার (voice weight) আছে এবং অরবিন্দের মতে এ তিন প্রকারের—আনুভূমিক ভার দণ্ড, খাড়া সংঘাতভার (vertical ictus weight) ; ও ব্যঞ্জনভার (consonantal weight)।[৫৪] অর্থাৎ বলের ভার বা ওজন অক্ষর দৈর্ঘ্যে রূপান্তরিত হয়। তাই ওজন-দৈর্ঘ্যই এর বড়ো কথা। প্রথমটিতে আনুভূমিকভাবে ভারদণ্ডে ঘটায় স্বরের স্ফীতি দীর্ঘায়ন। যেমন 'না-না-না-। মানবের তরে'। এখানে 'না'-র 'আ' আবেগে স্বর বেশিক্ষণ স্থায়ী হওয়ায় বাচ্যবৃদ্ধি হয়েচে। দ্বিতীয়টিতে ঘটায় খাড়া দণ্ডাঘাত, যেমন, বলবৃত্তে বলের প্রয়োগে। যথা, 'বৃ|ষ্টিপড়ে। টা|পুর টুপুর'। আর তৃতীয়টিতে আছে ব্যঞ্জনভার, যেমন, 'সম্মান'-এর ম্ম-তে ব্যঞ্জনসংঘাতে কাল দৈর্ঘ্য বেড়ে গেচে এবং এদেখা যায় স্বনবৃত্তে। এসম্বন্ধে রাজশেখর বসুও বলেচেন ঃ "বাংলায় গুরুধ্বনি আর accent মিশে যায়"।[৫৫] তাই অক্ষর গুরু হতে পারে এবং দীর্ঘও।

৩০. স্বর, স্বন ও বল ভিন্নভিন্ন হলেও তাদের ঐক্য মেলে অক্ষরের মাত্রা সাম্যে।

অক্ষর (Syllable) স্বর ও ব্যঞ্জনে তৈরি। সংস্কৃতের মতো বাঙলায় কোন হ্রস্ব-দীর্ঘস্বর নেই ; তবে ছন্দের প্রয়োজনে স্বর দীর্ঘও হতে পারে। যেমন, অনুকার বুঝাতে,

হী̄ হী শবদে। অটবী পুরিছে।

এখানে প্রথমে 'হী' দীর্ঘ। এরপরে ব্যঞ্জনের কথা। সংস্কৃতে ব্যঞ্জনের পৃথক্ মূল্য স্বীকৃত হয়নি—এরা স্বরের সহচরী। প্রত্যেকটি ধ্বনি-ই ভাষাদেহের মূল্যবান একক। তাই উপাদানের কোনোটাকেই বাদ দেওয়া যায় না। তবুও ব্যঞ্জনের তুলনায় স্বরের প্রাণশক্তি ও অনুরণন অধিকতর। তাই নারদ শিক্ষায় ব্যঞ্জনগুলো তুলিত হয়েচে একগাছি মালার মুক্তোর সঙ্গে আর স্বরগুলো সে-মালার সূত্রের সঙ্গেঃ "মণিবদ্ ব্যঞ্জনং বিদ্যাৎ, সূত্রবচ্চ স্বরং বিদুঃ"।[৫৬] বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যে (I. ৫৯) বলা হয়েচে যে ব্যঞ্জনের মাত্রা অর্ধেকঃ 'ব্যঞ্জনম্ অর্ধমাত্রা'। এ ঠিক নয় বলেচেন Allen।[৫১] স্বরের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্পর্ক নিরূপিত হয় উচ্চারণের লয়ে। মধ্য ও বিলম্বিত উচ্চারণে ব্যঞ্জনের স্বতন্ত্র ব্যাপ্তি বা মাত্রা বজায় থাকে, কিন্তু দ্রুত উচ্চারণে এ স্বরের সঙ্গে মিশে যায়।[৫৭] পতঞ্জলি মনে করেন যে ব্যঞ্জন স্বর-প্রস্বনের অংশভাক—স্বরসান্নিধির জন্যেই ব্যঞ্জনের এই পরিণাম।[৫৮]

তবে একথা অনস্বীকার্য যে ব্যঞ্জন যথেষ্ট প্রাধান্যে উচ্চারিত হলে আলাদা অক্ষর হতে পারে। অক্ষরের ভিত্তি শুধু মাত্র অনুনাদ নয়, প্রাধান্যও। আর এই প্রাধান্য (prominence) তিনটি উপাদানে তৈরি—দৈর্ঘ্য, শ্বাসবল ও অনুনাদ। ব্যঞ্জনের অনুনাদ স্বরের তুলনায় কম হলেও, যদি অন্য দুটি বা তাদের মধ্যেকার একটিও অর্থাৎ দৈর্ঘ্য ও শ্বাসবল, উচ্চারণে প্রকাশ পায়, তাহলে ব্যঞ্জনটি স্বতন্ত্র অক্ষর গঠন কর্তে পারে।[৫৯] এর পরিচায়ক হলো বাঙলার ত্রিধা ছন্দ। স্বরের প্রাধান্য আছে স্বরবৃত্তে অর্থাৎ কিনা সুরপ্রবাহ; স্বন প্রতিষ্ঠিত হয়েচে ব্যঞ্জনের স্বতন্ত্র মর্যাদায়, যা দেখা যায় স্বনবৃত্তে; আর বলবৃত্তে প্রকাশ পেয়েচে ব্যঞ্জনের বল। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেচেন: "এই (অর্থাৎ 'বৃষ্টিপড়ে' ছড়ায়) দুটি জিনিস দেখবার আছে। এক হচ্ছে বিসর্গের (হসন্তের) ঘটকালিতে ব্যঞ্জনের সঙ্গে ব্যঞ্জনের সম্মিলন, আর-এক হচ্ছে 'বৃষ্টি' এবং 'কন্যে' কথায় যুক্তবর্ণকে যথোচিত মর্যাদা দেওয়া।"[৬০] যুক্তবর্ণের বিশ্লেষণে ব্যঞ্জন পাওয়া যায়, যেমন বৃষ্টি=বৃষ্‌+টি, কন্যে=কন্‌+নে। ছড়ার ছন্দে (বলবৃত্তে) প্রচাপের ফলে ব্যঞ্জন পায় পূর্ণমর্যাদা এখানে। যুক্তবর্ণ স্বর-বিস্ফোরণে বিযুক্ত হয়ে যায় এবং ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে সম্মিলন ঘটে। যেমন, বৃষ্টি > ব্‌র্‌+ষ্‌+ট্‌+ই (ই); কন্যে > ক্‌ + ন্‌+য+এ (অ)। অক্ষরপ্রাধান্য নির্ভর করে অনুনাদ, দৈর্ঘ্য ও শ্বাসবলের উপর। তাইতো বাঙলা ছন্দে অনুনাদ-ভিত্তিক স্বরবৃত্ত; দৈর্ঘ্য-ভিত্তিক স্বনবৃত্ত; ও বল-ভিত্তিক বলবৃত্ত। প্রথমে স্বর বা সুরের জন্য ব্যঞ্জনের তুলনার স্বরেরই প্রাধান্য বেশি। দ্বিতীয়ে ব্যঞ্জনের অধিকার ব্যাপকতর হয়েচে সুরের জায়গায় স্বনপ্রতিষ্ঠায়। আর তৃতীয়ে ব্যঞ্জনের একেবারে জামাই আদর এবং এ ঘটেচে প্রচাপের মারফতে। প্রতিক্ষেত্রেই ঘটেচে "ওজন-দৈর্ঘ্য"।[৫৪] সাধারণত স্বরবৃত্তে আছে স্বরভার; স্বনবৃত্তে ব্যঞ্জনভার; আর বলবৃত্তে বলভার। স্বন দৈর্ঘ্যভিত্তিক বলে কালশায়ী ও মাত্রাভিত্তিক; স্বর ও অনুনাদশীল বলে হয়েচে কালশায়ী ও মাত্রাভিত্তিক; আর বল ও শ্বাসবলে দীর্ঘ ও কালশায়ী এবং এ তাই মাত্রাভিত্তিক। এখানে মনে রাখতে হবে যে "প্রস্বন" বা "প্রচাপ" ও গুরুধ্বনি এক—এহলো একের অন্যে রূপান্তরণ।[৫৫]

৩১. ছন্দে মাত্রাই প্রধান, অক্ষর নয়।

এখানে স্মর্তব্য যে মাত্রা নিরেট ছন্দের স্বরূপ। তাই কিঙ্কিণীতে ঘুণ্টি কিভাবে ও কতসংখ্যায় সাজানো সে কথাটা গৌণ, তার ঝংকারের লয়টাই আসল কথা। এই অক্ষরের মাপে ছন্দোরচনা করলে মেলান শক্ত হয়ে ওঠে। যেমন, সাধু বাঙলায়,

১ ২ ৩
আজিকে তোমারে। ডাক দিয়ে বলি। শুন গো সখী,

৪ ৫ ৬
তোমার বীণায়। বাজে অপরূপ। ছন্দ ও কি ?

দেখা যাচ্ছে প্রথম পর্বে আছে ৬টি অক্ষর (syllable), দ্বিতীয়পর্বে ৫, চতুর্থপর্বে ৪ ও পঞ্চম পর্বে ৫। প্রাকৃত বাঙলায়ও দৃষ্টান্ত আছে, যথা,

। । । ।
শিবু ঠাকুরের। বিয়ে হবে। তিন কন্যে। দান।

প্রথম মেলে আছে ৫টি অক্ষর, দ্বিতীয়ে ৪, তৃতীয়ে ৩ এবং চতুর্থে ১। এখানে মেলের অক্ষরসংখ্যা অসমান। কাজেই রবীন্দ্রনাথ মনে করেন "মাত্রা নিয়েই ছন্দের স্বরূপ"। তিনি আরো বলেচেন : "প্রাকৃত ছন্দকে চার-চার সিলেব্‌ল্‌-এ ভাগ করাটা ঠিক বলে আমার মনে হয় না।"।[৬০]

কিন্তু আধুনিক অনেক ছান্দসিকই ছড়ার ছন্দ (বলবৃত্ত)-কে এই অক্ষর বা syllable এ নিবদ্ধ রেখেচেন। এর থেকে তাঁরা মাত্রায় নামতে পারেননি। এতে অবৈজ্ঞানিক মানসিকতার পরিচয় মেলে। যেমন প্রবোধ চন্দ্র সেন বলেচেন : "বাংলায় এক রীতির ছন্দে ধ্বনি পরিমিত হয় দলসংখ্যা অনুসারে। এ-রকম মাত্রাকে বলা হয় দলমাত্রা (syllabic unit)। আর একরীতির ছন্দে ধ্বনি পরিমিত হয় কলাসংখ্যা অনুসারে। এরকম মাত্রাকে বলা হয় কলামাত্রা (moric unit)। যেমন—সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে 'ছান্. দ. সিক্' তিন দলমাত্রা, আর বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে 'ছা-ন্. দ. সি-ক' শব্দে পাঁচ কলামাত্রা।"[৯] বলেচেন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় : "এরকম ছন্দে প্রত্যেক Syllable বা অক্ষর এক মাত্রার বলিয়া গণ্য করা হয়। শুধু কয়টি স্বরবর্ণের ব্যবহার হইয়াছে তাহা গণনা করিলেই অনেক সময়ে মাত্রার হিসাব পাওয়া যায়।"[১০] Syllable ও মাত্রা হওয়ায় উপরের 'শিবু ঠাকুরের। বিয়ে হবে। তিন কন্যে। দান'—এর মাত্রা সমকত্ব থাকেনা। কেননা, এতে যথাক্রমে ৫, ৪, ৩, ও ১ মাত্রার পর্ব গঠিত হয়েচে। তৃতীয়ত, মোহিত লাল মজুমদার বলেন : "এ ছন্দের রূপ—প্রতিপর্বে চারিটি স্বরান্তবর্ণ বা অক্ষর, এবং প্রতিপর্বে আদ্য-অক্ষরে একটি করিয়া ঝোঁক।"[১১] এও যুক্তিসহ নয়, "শিবুঠাকুরের" ছড়ার ছান্দসিক পরিপ্রেক্ষিতে। এখানে লক্ষণীয় যে অমূল্যধন মাত্রার কথা বললেও তিনি অক্ষরেই নিবদ্ধ রয়ে গেচেন। মাত্রান্তরে নামতে পারেন নি। আবার একটির একক কলা, অন্যটির অক্ষর—এরকম ভেদও অচল। কেননা, বিভিন্ন ছন্দোরীতির মধ্যে চাই একটি গরিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক এবং এ 'মাত্রা'ই দিতে পারে।

৩২. প্রস্বরণ, প্রচাপন ও উচ্চারণের বিউনী মিলনে ছন্দের সৃষ্টি ; আর এর স্বরূপ নির্ণয়ের চাবিকাঠি আছে সাধু ও প্রাকৃত বাঙলার যুক্তাক্ষর ও হসন্তের মাত্রা বিশ্লেষণে।

প্রস্বরণ, প্রচাপন ও উচ্চারণ হলো শব্দ সৃষ্টির প্রাথমিক উপাদান। এরা বিউনী মিলে গড়ে তোলে এককটি শ্বাস মেল, যার পরিচায়ক হলো স্বর, স্বন ও বল-ভিত্তিক তিনটি ছন্দোরূপ, যথা, স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্ত। প্রস্বর ও প্রচাপ যে আলাদা সে সম্বন্ধে অবহিত হওয়ার প্রয়োজন। অনেকেই এ-সম্বন্ধে সজাগ নন। এসবের কথা আগেই আলোচিত হয়েচে : (১.১৩) ও (৫.৩) দ্রষ্টব্য এবং (৬.৩)-এর (১২) ও (১৩) সংখ্যা। Accent কে প্রস্বন ধরে, pitch accent বা pitch কে বলা যায় প্রস্বর, আর stress accent বা stress কে প্রচাপ। শারীরবৃত্তীয় দিক থেকে এই পরিভাষাই গ্রাহ্য। এ-প্রসঙ্গে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের সুর বা স্বর (pitch) ও ঝোঁক (stress) উল্লেখ্য।[৩৪] তবে তাঁর "স্বরাঘাত" stress এর প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ যোগ্য নয়, যেমন তার respiratory accent। কেননা, এতে দুই-ই প্রায় এক হয়ে যায়। দুই-য়ের প্রকৃতিকে অভিহিত করেচেন Abercrombie chest pulse ও stress pulse বলে, অর্থাৎ উরসম্পন্দ ও চাপ (বল) স্পন্দবলে।[১৮] তাই গীতিপ্রস্বর (pitch accent) ও ঘাতপ্রস্বর (stress accent) সঠিক প্রতিশব্দ নয় শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ার দিক থেকে—এরা ইংরেজির অনুবাদ। দুই-য়ের পার্থক্য না বোঝায় এক প্রধান ছন্দোবিদ্ বলেচেন : "বাংলা ছন্দে গীতি প্রস্বরের কোনো ক্রিয়া দেখা যায় না, কিন্তু ঘাত প্রস্বরের যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়। তাই প্রস্বর বললে ঘাত প্রস্বরই বোঝায়।"[৯] অথচ তিনি বাংলা ছন্দের বিশিষ্টতা বোঝাতে রবীন্দ্রনাথের "শোষণ-শক্তি" বা "ভার-বহন শক্তি"র উল্লেখ করেচেন। এই শক্তিতো প্রস্বরের, কিন্তু প্রচাপের নয় অর্থাৎ তাঁর পরিভাষায় এ কাজ 'গীতি প্রস্বরের', 'ঘাত-প্রস্বরের' নয়। তাহলে তাঁর উক্তিটি স্ববিরোধী হয়ে দাঁড়ায়। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় অন্যদিকে প্রস্বরের দিকে ঝুঁকেচেন এবং তাই 'শ্বাসাঘাত' ব্যবহার করেচেন stress বোঝাতে।[১০] আগেই দেখান হয়েচে যে এই 'শ্বাসাঘাত'-এ chest pulse বুঝায়, strees pulse কে নয়। কেননা শ্বাসাঘাত ছাড়া বাক্-উচ্চারণই অসম্ভব। কাজেই তাঁর পরিভাষায় ব্যাপ্তিদোষ এসেচে অজ্ঞতার জন্যে। শ্বাসাঘাতের সম্প্রসারণে তারাপদ ভট্টাচার্য এতে সুরযোজনা করেচেন : "বলবৃত্তে সুতীব্রতা বর্তমান।"[৬১] বলাই বাহুল্য যে বলবৃত্তে বল বা প্রচাপ আছে ধ্বনিতে, কিন্তু সুর নেই। তবে মোহিতলাল এ-ব্যাপারে কিছুটা stress pulse এর কাছাকাছি এসেচেন তাঁর 'স্বরবিস্ফোরণ' তত্ত্বে, যদিও তা পুরোপুরি বৈজ্ঞানিক হয়ে উঠতে পারেনি। তাঁর মতে : "ঐ মধ্যস্থ হসন্ত আদ্য-অক্ষরের স্বরকে সংকুচিত বা প্রসারিত করে না,

তাহার ঝোঁক, বা উচ্চারণক্রিয়ার জোরকে বর্দ্ধিত করে মাত্র—ইহাতে accent বা স্বরবৃদ্ধি, stress বা ঠেস বলা যাইতে পারে।”[১১] এউক্তি সর্বাংশে গ্রাহ্য নয়।

আলোর পরিচয় তরঙ্গণায় (wavicle) অর্থাৎ তরঙ্গ ও কণায় প্রকাশিতব্য। তরঙ্গ হলো ঢেউয়ের রূপ, আর কণা হলো কণাবৃষ্টির রূপ। এরি যৌথরূপ ফুটে ওঠে তরঙ্গণায়। তেমনি বাঙলা ভাষারও দু'টি রূপ—একটি সাধুভাষার স্বরবর্ণবহুল তরঙ্গরূপ, অন্যটি প্রাকৃত ভাষার হসন্তবহুল কণারূপ। তাই সাধুভাষার ছন্দে ভদ্র বাঙালী **চল্‌তে** পারে না, তাকে **চলিতে** হয়, **বস্‌তে** তার নিষেধ, **বসিতে** সে বাধ্য। সাধুভাষার শব্দগুলি গায়ে-গায়ে মিলিয়ে গড়িয়ে চলে, তাদের ধ্বনিগুলি স্বরবর্ণের মধ্যবর্তিতায় আঁট বাঁধতে পারে না। যেমন—

শমন-দমন রাবণ রাজা, রাবণ-দমন রাম।

—কৃত্তিবাসী, 'রামায়ণ' কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড

অন্যদিকে প্রাকৃত বাঙলায় হসন্ত-প্রধান ধ্বনিতে ফাঁক বুজিয়ে শব্দগুলিকে নিবিড় করে দেয়। তাই পাত্‌লা, চাঁদ্‌নি প্রভৃতি শব্দগুলি সাধুভাষায় গুরুপাক। ফলে হসন্ত সম্বন্ধে ছন্দের নিয়ম এই যে, সাধুভাষায় হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে-গায়ে লেখা যাবে না অর্থাৎ বাঙলার স্বাভাবিক ধ্বনির নিয়ম এড়িয়ে চলবে, যথা, 'সতত হে নদ তুমি পড় মোর মনে' এখানে 'নদ' আর 'তুমি', 'মোর' আর 'মনে' হসন্তের বাঁধনে বাঁধা ; কিন্তু পয়ারে ওর বাঁধন আলগা করে দেয়া হয়েচে। তবে প্রাকৃত ছন্দে এরা একেবারে এঁটে গেচে। যেমন 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর'। এখানে পয়ার চোদ্দ বর্ণের সীমানা পেরিয়ে গেচে ; কিন্তু উচ্চারণে চোদ্দ অক্ষরের বেশি হবে না, যথা, 'এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা মধ্যিখানে চর'। দু'য়ের দ্বিতীয় তফাৎ, ঝোঁক বা প্রচাপে প্রাকৃত বাঙলায় স্বরের উচ্চারণ সব জায়গাতেই

।   ।

দীর্ঘ হয়। যেমন—ভা-রিতো পণ্ডিত, কে-বা কার খোঁজ রাখে। হসন্ত সম্পর্কে বাঙলার একটি নিজস্ব নিয়ম আছে এবং তাতে প্রাকৃহসন্ত স্বর দীর্ঘায়িত হয়, যদিও বাঙলা স্বরবর্ণ সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না। যেমন জল, চাঁদ। এ দুটি শব্দের উচ্চারণে জ-এর 'অ' এবং 'চ'-এর 'আ' আমরা দীর্ঘ করে টেনে পরবর্ত্তী হসন্তের ক্ষতিপূরণ করে থাকি। আবার 'টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে' পদটাতে টু-মু দুই অক্ষর, পরবর্ত্তী হসন্ত'স্'-ও এক অক্ষরের মাত্রা নিয়েচে পূর্ববর্ত্তী উ-কারকে সহজেই দীর্ঘ করে।[৬০]

প্রাকৃত বাঙলায় হসন্তের প্রাধান্য আছে বলেই যুক্তবর্ণের জোর তার মধ্যে আপনি এসে পড়ে। যুক্তবর্ণের পূর্ববর্ত্তী স্বর সংস্কৃতে দীর্ঘ হয় এবং স্বনবৃত্ত ছন্দেও এদীর্ঘতা সমানভাবে দেখা যায় শব্দের মধ্যে ও অন্তে। তবে স্বরবৃত্তে এ শুধু ঘটে অন্তে, মধ্যে নয়। এর কারণ সুরপ্রবাহে এই হসন্তের লোপ। তাই'

'সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি'-তে 'সম্মুখে'-র 'সম্+মুখ' এ হসন্ত 'ম্' টি লুপ্ত হওয়ার উপক্রম স্বরবৃত্তের তান বা সুরপ্রবাহে। তাই Varma বলেনঃ "দ্রুত বাক্-এ ব্যঞ্জনকাল স্বরকালের সঙ্গে মিশে যায়"।[৫৯] এ-সম্পর্কে কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়ের মত হলোঃ "ছন্দে হসন্ত বর্ণের কোন পৃথক মাত্রা নাই; উচ্চারণ সময়ে উহাতে কেবল জিহ্বা বা ওষ্ঠ সংলগ্ন হয় মাত্র। কাব্য ছন্দে উহা পূর্বস্থিত হ্রস্বস্বরের গুরুতা সম্পাদন করে।"[৬২] তাই 'ম্'-লোপে 'স'-এর 'অ'-কারের স্বর-সম্প্রসারণ সুরের প্রবাহে মিলে গেচে। এখানে মনে রাখতে হবে যে যুক্তাক্ষর উচ্চারণে ভেঙে হসন্তে বিভক্ত হয়ে যায়, যেমন, সত্তর=সৎ—তর্; জিহ্বা=জিউ্+হা, জিব্+ভা; বিহ্বল=বিউ্+হল্, বিব্+ভল্।

ব্যঞ্জনধ্বনিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—যুক্ত ও অযুক্ত। এখানে প্রথমের শক্তির লীলা লক্ষণীয়। যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি চার-প্রকারের—(i) 'অভিনিধান'-জাত, যেমন, 'প্‌ত' (প্ত), ব্‌দ (ব্দ) প্রভৃতি; (ii) এক-প্রয়াস-জাত যথার্থ যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি, যথা, স্থ ম্র, ত্র প্রভৃতি; (iii) দ্বিত্বপ্রাপ্ত, যথা, 'ন্‌ন', 'ত্‌ত' প্রভৃতি; এবং (iv) সমস্থানজাত, যথা, ঞ্চ, ঙ্গ, ন্ত প্রভৃতি। এদের প্রথমাংশের উচ্চারণে সংশ্লিষ্ট মাংশপেশী ক্ষণিকের জন্য অর্গলবদ্ধ হয়ে গিয়ে মুক্তিলাভের চেষ্টায় 'অন্তরিত পরাক্রমে' সংগ্রামে রত হয়। এজন্যে উচ্চারকদ্বয় উক্তধ্বনি উচ্চারণে অধিক সময় নেয়—ফলে ঐসব ধ্বনিগুলোর কালপরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এখানে প্রলম্বন ঘটে যুক্তব্যঞ্জনের প্রথমটিতে, স্বরধ্বনিতে নয়। এবার অযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির কথা, যেমন, 'আহ্লাদ' এর 'হ্ল' (ল্হ), 'জামা'র 'ম' প্রভৃতির কথা। অযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলোর সব ক'টিই শব্দের আদিতে পূর্ণতম উচ্চারণ পায়, শব্দমধ্যে দুর্বল উচ্চারণ এবং শব্দশেষে মাঝামাঝি উচ্চারণ। অর্থাৎ শব্দান্ত উচ্চারণটি শব্দমধ্য উচ্চারণের চেয়ে বেশি সময় নেয়। তাই পরিমাণের দিক থেকে শব্দান্ত অসংযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দীর্ঘতম সময় নেয়। দুই স্বরের মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন স্বল্পতম সময় এবং প্রথম ধ্বনিটি শব্দমধ্য ধ্বনির তুলনায় কিছু কম, কিন্তু দুইস্বরের মধ্যবর্তী ধ্বনির তুলনায় কিছু বেশি সময় নেয়।[৪৭] এখানে লক্ষণীয় যে স্বর ও বল স্বনকে প্রভাবিত করে।

৩৩. বাংলায় সংস্কৃতের মতো স্বরের হ্রস্বদীর্ঘতা না থাকলেও, কোন কোন স্থলে এ দেখা দেয় বিশেষ ভূমিকায়।

স্বরধ্বনির হ্রস্বতা বা দীর্ঘতা সম্পর্কে বাঙলা উচ্চারণে কয়েকটি বিশেষ নিয়ম আছে। গোটা শব্দ-দৈর্ঘ্যের সঙ্গে তার স্বর-ধ্বনির দীর্ঘতা বা হ্রস্বতা জড়িত। সাধারণত একাক্ষর শব্দ বা পদ (mono-syllabic) দীর্ঘ উচ্চারিত হয়, যেমন, 'জল'=জ+ল্ এর অ-কার দীর্ঘ; কিন্তু 'জলা'র অকার হ্রস্ব। এর কারণ প্রাক্‌হসন্ত স্বর দীর্ঘায়িত হয়। তবে একাধিক অক্ষরের পদে, অথবা এক

নিঃশ্বাসে উচ্চারিত বাক্যে স্বর এলে তা দীর্ঘ হতে হ্রস্ব হয়ে দাঁড়ায়। যেমন—দিন (দিবস), দীন (দরিদ্র), দিন (=দিউন, দান করুন), প্রভৃতিতে 'ই' একক-ভাবে দীর্ঘ, কিন্তু একাধিক অক্ষরে হ্রস্ব, যেমন দিন-কাল, দিন-দুনিয়ার মালিক। বাঙলা ছন্দে তাই স্বরের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা বাঁধা ধরা নয়—অবস্থাগতিকে একই স্বরধ্বনি হ্রস্ব বা দীর্ঘ দুই-ই হতে পারে। যেমন,

—সম্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামনি—

এখানে 'সম্মুখ' শব্দটিকে তিন অক্ষরের (সম্+মু+খ) মতো না পড়ে দুই অক্ষরের (সম্+মুখ) মতো পড়লে, 'মু'-এর উ-ধ্বনি খ-এর অ-কারের লোপ্ পূরণ কর্তে দীর্ঘ উচ্চারিত হয়।[৩৪]

৭.৩, ছন্দোপরিচিতি

এবার ত্রিধা বাঙলা ছন্দের পরিচিতি। আগেই বলা হয়েচে যে তিন প্রকারের ছন্দোরীতি বাঙলায় প্রচলিত। একেকটি বিশেষ ভিত্তিতে একেকটির উদ্ভব বলে এদের ভিন্ন ভিন্ন নাম—স্বরবৃত্ত ; স্বনবৃত্ত ; ও বলবৃত্ত। স্বরবৃত্তে বুঝায় এমন ছন্দকে যা স্বরভিত্তিক অর্থাৎ টান বা সুর যার বৈশিষ্ট্য। স্বনবৃত্তে প্রকাশ পেয়েচে স্বন বা ধ্বনির স্বরূপ। আবার বলবৃত্ত আদৌ বল বা চাপে উৎপন্ন। তবে এরা ভিন্ন ভিন্ন স্পন্দের হলেও এদের মূলে আছে 'মাত্রা'। অর্থাৎ মাত্রাই এদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বা গ. সা. গু। এতেই সপ্রমাণ যে এরা তিন হলেও এক গোষ্ঠীভুক্ত। এখানে স্মর্তব্য যে স্বরবৃত্ত ও স্বনবৃত্ত সাধুভাষার ছন্দ ; আর বলবৃত্ত প্রাকৃত ভাষার। এদের বৈশিষ্ট্য নিচে নির্দেশিত হলো—প্রথমে সাধারণ ব্যাখ্যায়, তারপরে গণিতীয় পরিভাষায়।

(ক) ঃ ব্যাখ্যান

I. স্বরবৃত্ত—বৈদিক ছন্দের স্বরসংগীত বা স্বরমণ্ডলনের সংগীতেই আছে এর জন্ম লগ্নে, যার আরেক নাম তান বা সুর। কাজেই বাঙলা স্বরবৃত্ত ছন্দ হলো বৈদিক স্বরসংগীতের উত্তর সাধক। এর চলন দুই বা দু'য়ের গুণিতকে। তবে সাধারণত এ ৪, ৬, ৮ ও ১০ মাত্রার পদক্ষেপে এগোয়। অর্থাৎ পদই এর বড়ো কথা। তাই এর প্রচলিত নাম 'পয়ার' বা পদ-চার। পদের গোড়াতেই একেকটি ঝোঁকালো শব্দ কাপ্তেনি করে এবং তার পিছন পিছন কয়েকটি অনুগত শব্দ সমানতালে পা ফেলে কুচ করে চলে যায়। একেকটি ঝোঁক-কাপ্তেনের অধীনে ক'টিকরে মাত্রা সেপাই থাকবে তা নির্ধারিত হয় ছন্দের নিয়মানুসারে। পয়ারটা চতুষ্পদ ছন্দ, যেমন,

মহাভারতের কথা। অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে। শুনে পুণ্যবান।

প্রতিটি চরণে ৮+৬ মাত্রা। তবে শেষের দ্বিতীয় ও চতুর্থ পদে যে ৬ মাত্রা দেখা যাচ্ছে তা ৮-এর সমান, কেননা চরণান্তে রয়েচে দু'টি ফাঁক। সুরে পড়লে 'মান' ও 'বান্' এর আকার দীর্ঘায়িত হয়ে ঐ দু'মাত্রার ফাঁক পূরণ করে।[৩৯] এই পদের বিরতি ঘোষণায় রয়েচে ছেদও। এখানে পদ ও ছেদ-এর নিরুক্তি দ্রষ্টব্য ঃ '(৬.৩) এর (৮) ও (৯) সংখ্যা'। এতে চৌপদী—ত্রিপদী হবে ৬+৬+৮ বা ৮+৮+১০ মাত্রায়।

দ্বিতীয়ত, এর গঠন প্রকৃতি সম্বন্ধে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বলেচেন ঃ

বিজোড়ে বিজোড় গাঁথ, জোড়ে গাঁথ জোড়।
আটে ছয়ে হাঁফ ছেড়ে ঘুরে যাও মোড় ॥
যুক্তাক্ষর চড়া পেলে হসন্তের লগি—
মারো ঝট্, ডিঙ্গা ভেসে যাবে ডগমগি।[৬৩]

অর্থাৎ ১+৩ বা ৩+১, বা ২+২ বা ২+৪ বা ৩+৩ প্রভৃতি মাত্রা সমাবেশ। এ সমমাত্রার ছন্দ এবং এর অর্থ এই যে দুই, চার, ছয়, আট, দশ প্রভৃতি দু'য়ের গুণিতক—এর পর ইচ্ছামতো যতিস্থাপন করা যায়। আর এখানেই এ-ছন্দের শক্তি। এ জন্যই এ-জাতীয় ছন্দে আঁজাঁব্‌মাঁ (enjambement) বা প্রবহমানতা চালানো সম্ভব। যেখানে দু'য়ের গুণিতক পাওয়া যায় সেখানেই থামতে পারা যায় বলেই প্রবহমান (run-on) পয়ার রচনা সম্ভব হয়েচে। রবীন্দ্রনাথ তাই মনে করেন এ-ছন্দে "অযুগ্মসংখ্যার পর যতি" দেওয়া চলে না। তাই তিনি মধুসূদনের চরণ-ডিঙানো,

বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে

—এই পয়ারের সমালোচনা করেচেন তিন মাত্রায়-'অকালে'-যতি স্থাপনের জন্যে। তাঁর মতে বীরবাহুর "অকালমৃত্যুর সংবাদটি যেন ভাঙা রণ পতাকার মতো ভাঙা ছন্দে ভেঙে পড়ল"। পরে তিনি 'অকালে'র পরে যতি কে "অবশ্য একরকম করে সমর্থনও করা যায়" বলেচেন ; কিন্তু, কারণ দেননি। তবে তিনি লক্ষ করেচেন পয়ার-পদের ধ্বনিভাগের বৈচিত্র্য ঃ "অমিত্রাক্ষর ছন্দে পয়ারের প্রবর্তন হয়েছে এই কারণেই। সে কোনো কোনো আদিম জীবের মতো বহু-গ্রন্থিল, তাকে নষ্ট না করেও যেখানে-সেখানে ছিন্ন করা যায়। এই ছেদের বৈচিত্র্য থাকতেই প্রয়োজন হলে সে পদ্য হলেও গদ্যের অবন্ধ গতি অনেকটা অনুকরণ করতে পারে। সে গ্রামের মেয়ের মতো ; যদিও থাকে অন্তঃপুরে, তবুও হাটে-ঘাটে তার চলাফেরায় বাধা নেই।"[৬০]

তৃতীয়ত, প্রবহমানতা হলো তান বা সুরের। এরি ফলে "হসন্তের লগি" "যুক্তাক্ষর চড়ায়" আটকে পড়লে সত্যেন্দ্রনাথের নির্দেশ হলো, "মারো ঝট্" অর্থাৎ

ডানা ঝাড়া দিতে হবে! এহলো স্বরপ্রবাহের ইঙ্গিত। হসন্ত ও যুক্তাক্ষরে তফাৎ এইখানে যে প্রথমটি হস্ (্) চিহ্নে লেখা হয়। আর দ্বিতীয়টি হস্‌কে যুক্তাক্ষরে পরিণত করে। যেমন, তন্ত্র=তন্+ত্র। এখানে তন্-এর হসন্ত ব্যঞ্জন 'ন্', যুক্তাক্ষরে হয়েচে 'ন্ত্র'। কাজেই যুক্তাক্ষরকে বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে পড়লে, পাওয়া যায় হসন্ত ; আবার হসন্ত ব্যঞ্জন সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে হয়ে যায় যুক্তবর্ণ বা যুক্তাক্ষর। তাই সত্যেন্দ্রনাথের উপদেশ হলো ঃ যুক্ত হসন্তের বেলার গুণটানা, আর অযুক্ত হসন্তের ক্ষেত্রে দাঁড় বাওয়া ঃ

ঠাঁই বুঝে গুণ টানো। ঠাঁই বুঝে দাঁড়।
যুক্তাযুক্ত হসন্তের পয়ার তাগাড় ॥

এথেকে দু'টি সূত্র পাওয়া যায়—এক, গুণ-টানা ; দুই, দাঁড়-বাওয়া। অর্থাৎ প্রথম পদ্ধতি যুক্ত হসন্তের বেলায়, আর দ্বিতীয়টি অযুক্ত হসন্তের ক্ষেত্রে। একটি টেনে উচ্চারণ, অন্যটি ঠেসে উচ্চারণ। তাই দু'টি সূত্র হবে এরূপ—

(ক) শব্দমধ্যে (যুক্ত হসন্তে) প্রস্বরণের গুণে ছন্দকে টানতে হবে অর্থাৎ যুক্তাক্ষর চলবে একমাত্রিক কদমে ;

(খ) শব্দান্তে (অযুক্ত হসন্তে) ছন্দকে দাঁড়ের সাহায্যে চালিয়ে নিতে হবে অর্থাৎ হসন্ত অক্ষর চলবে দ্বিমাত্রিক কদমে ; তবে 'গুণ' 'ও "দাঁড়ে"র প্রয়োগ হবে "ঠাঁই বুঝে"।

এখানে লক্ষণীয় যে প্রথম সূত্রটির প্রয়োগ হলে স্বরসংগীত এসে যাবে এবং তার ফলে যুগ্মধ্বনি চলবে একমাত্রার কদমে। রবীন্দ্রনাথের কথায় ঃ "কথাকে তার জড় ধর্ম থেকে মুক্তি দেবার জন্যেই ছন্দ। সেতারের তার বাঁধা থাকে বটে, কিন্তু তার থেকে সুর পায় ছাড়া। ছন্দ হচ্ছে সেই তাঁর-বাঁধা সেতার। কথার অন্তরের সুরকে সে ছাড়া দিতে থাকে। সুর পদার্থটাই একটা বেগ। সে আপনার মধ্যে আপনি স্পন্দিত হচ্ছে। কথা অর্থের মোক্তারি করবার জন্যে, সুর আপনাকেই আপনি প্রকাশ করে। বিশেষ সুরের সঙ্গে বিশেষ সুরের সংযোগে ধ্বনিবেগের একটা সমবায় উৎপন্ন হয়। তাল সেই সমবেত বেগটাকে গতিদান করে। ধ্বনির এই গতিবেগে আমাদের হৃদয়ের মধ্যে যে গতি সঞ্চার করে সে একটা বিশুদ্ধ আবেগমাত্র। তার যেন কোন অবলম্বন নেই। গানের সুরে আমাদের চেতনাকে নাড়া দেয় একেবারে অব্যবহিতভাবে।"[৬০] তাই "ছন্দে হসন্তবর্ণের উচ্চারণে কেবল জিহ্বা বা ওষ্ঠ সংলগ্ন হয় মাত্র"[৬২]—ফলে হসন্ত লুপ্ত প্রায় হয়ে যায় সুরের টানে বা রুদ্ধ শ্বাসে। এ-জন্যে যুক্তাক্ষর হয়ে যায় একমাত্রিক। অন্যদিকে শব্দান্ত হসন্তে আসে দ্বিমাত্রিকতা এবং এ 'দাঁড়ে'র অনুসরণে। এখানে লিভারের (lever) ক্রিয়া লক্ষণীয়—নৌকা চালনায় দাঁড় লিভার ক্রিয়াকে ব্যবহার করে জলের বিরুদ্ধে। এই যান্ত্রিক ক্রিয়াকে বলে যান্ত্রিক সুবিধা এবং এ নির্ভর করে দু'দিকের

বিপরীত শক্তির প্রয়োগ রেখার উপরে আলম্ব (fulcrum) থেকে অঙ্কিত লম্বদ্বয়ের দৈর্ঘ্যের উপর। এই দ্বৈত বা দ্বিমাত্রার সাম্য স্থাপন হলো এর কাজ। প্রাক্ হসন্ত স্বর তাই দ্বিমাত্রিক।

বস্তুত 'গুণ' ও 'দাঁড়ে'র এই পার্থক্য মনে রাখতে হবে। (ক) ও (খ) বিধান দুটি একটি অনুবিধি (proviso) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং সে হলো "ঠাঁই বুঝে"। অর্থাৎ কোন স্থলে প্রয়োগ হবে, কোন স্থলে হবে না, তার মাপকাঠি হলো ছন্দের প্রয়োজন। এ নির্ভর করে হসন্তের যুক্ত বা অযুক্ত হওয়ার পরে অর্থাৎ কিনা এর সংশ্লিষ্ট বা বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের উপর। তাই ⌣=একমাত্রা ও – =দুইমাত্রা হলে, বিকল্প ভঙ্গির স্থিতিস্থাপকতা দেখান যায় নিচে এভাবে—

চিম্‌নি ভেঙে গেছে শুনে গিন্নি রেগে খুন
ঝি বলে আমার দোষ নেই ঠাকরুণ।

এখানে 'চিম্' একমাত্রার, কিন্তু 'ঠাক্' দ্বিমাত্রিক। আবার

চিম্‌নি ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ,
ঝি বলে ঠাকুরুণ মোর নাই কোনো দোষ।[৬০]

এখানে 'চিম্' দুমাত্রার ; কিন্তু 'ঠাক্' এক মাত্রিক।

চতুর্থত, এই স্থিতিস্থাপকতা ছাড়াও আছে স্বরবৃত্তের "অসাধারণ শোষণ শক্তি"। যেমন "দুর্দান্ত পাণ্ডিত্য পূর্ণ দুঃসাধ্য সিদ্ধান্ত"। এ হলো "ভারবহন শক্তি", যাতে প্রকাশ পায় গাম্ভীর্য। মাইকেল অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি পদে-পদে ঝংকৃত করে পয়ারের একটানা চালের মধ্যে শক্তিসঞ্চার করে দিলেন এবং তার প্রমাণ "মেঘনাথবধ কাব্য"।[৬০] তারাপদ ভট্টাচার্য এই শোষণশক্তিকে অবৈজ্ঞানিক উক্তি বলে মন্তব্য করেচেন : "পৃথক তরল পদার্থকে আত্মসাৎ করাই হইতেছে যথার্থ শোষণ। ধ্বনি যে তরল ও ধ্বনিপর্ব যে কঠিন তাহা নহে, উভয়ে পৃথকও নহে। ধ্বনি ধ্বনিপর্বেরই অঙ্গ মাত্র। কাজেই পয়ার জাতীয় ছন্দের ধ্বনি শোষণ রূপ কল্পনার বৈজ্ঞানিক মূল্য নাই।"[৬১]

উপরের মন্তব্য যুক্তি-সহ নয়—এ বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের অজ্ঞতাই সূচিত করে। "ধ্বনির (শব্দের) শোষণ" বা absorption of sound একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। তরঙ্গ গতি হিসেবে ধ্বনি (শব্দ)র তীব্রতার হ্রাস পায় মাধ্যমের ভিতর দিয়ে গমনকালে এবং এর একটি সূত্র আছে, যা গণিতের ভাষায় প্রকাশ করা যায় এ-ভাবে :

$$I_x = I_0 e^{-\mu_x} \quad \ldots\ldots\ldots 30$$

যেখানে I_0=ধ্বনির মূলবিন্দুর তীব্রতা ; I_x=মূল বিন্দু হতে x-দূরত্বের তীব্রতা ; μ=মাধ্যমের শোষণ গুণাঙ্ক।[৬৪] রবীন্দ্র নাথ শোষণ শক্তির কথা বলেচেন

'পয়ারজাতীয়' ছন্দ সম্পর্কে, ধ্বনি সম্পর্কে নয়। অর্থাৎ কিনা ছন্দোলয়ের আছে ভার বহন শক্তি': ছন্দোলয় এখানে মাধ্যম যা এই বিশিষ্ট গুণে গুণান্বিত। এ তৈরি হয়েচে ধ্বনি ও ধ্বনিপদে (পর্বে নয়)। কিন্তু এর আছে স্বতন্ত্র এক তৃতীয় রূপ। অম্লজান ও জলজান বৈদ্যুদ আধানে জল-এ রূপান্তরিত হয় ; ছন্দোলয়ও তেমনি। এই পার্থক্য না বোঝার জন্যে এসেচে ভুল সিদ্ধান্ত।

II. স্বনবৃত্ত—ধ্বনি-পরিবৃত্তির সংগীত বা বর্ণসংগীতের অস্পষ্ট পদক্ষেপ দেখা যায় ত্রিষ্টুভের জগতী পংক্তির সম্প্রসারণে—জগতীর উপান্ত বর্ণটি সর্বদাই হ্রস্ব এবং ত্রিষ্টুভেরটি সাধারণত দীর্ঘ। জগতী পংক্তির শেষে হ্রস্ব ও দীর্ঘ বর্ণের একান্তরণ জাত সংগীত ক্রমে ক্রমে দ্বিতীয় ছান্দসিক ছেদেও ত্রিষ্টুভের অন্ত্য চার বা পাঁচ বর্ণেও বিস্তৃত হলো। জগতী পংক্তি তাই আয়াম্বিক স্পন্দের গীতিতে রূপান্তরিত হলো। বৈদিক এই পরিবর্তন ধ্রুপদী সংস্কৃতের বর্ণবৃত্তে ও পরবর্ত্তী মাত্রাবৃত্তেও সম্প্রসারিত হলো। ধ্বনি বা স্বনের মূল্যই এখানে স্বীকৃতি পেল হ্রস্ব-দীর্ঘ বর্ণের বিন্যাস ক্রমে। এরি পরিবর্তিত রূপ প্রাকৃত-অপভ্রংশের মধ্য দিয়ে পৌঁছিয়েচে বাঙলা স্বনবৃত্তে।[৩৮] এর মূলবৈশিষ্ট্য হলো ধ্বনি-পরিবৃত্তি বা হ্রস্ব ও দীর্ঘ ধ্বনির একান্তরণ। বাঙলায় এ যুক্ত হয়েচে বিলম্বিত লয়ের সঙ্গে—ফলে প্রতিটি ধ্বনি-ই পায় তার মর্যাদা। এ যেন স্বনের প্রজাতন্ত্র—এখানে "ছন্দব্যবসায়ীরা আর হসন্তের ষাটতোলা, স্বরান্তের আশি এবং সংযুক্তাক্ষরের একশ'তোলা—ছন্দেশ্বরীর ঠাটে বসে—তিনরকম বাটখারায় মিশিয়ে ইচ্ছামত ওজন দিয়ে চুক্তি-ভুক্তন করতে পারবেন না।" ছন্দময়ী তাই গেয়ে ওঠেন—

গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম জলে
মেলিয়া যুক্ত ডানা,
মঞ্জুমরাল বিহর হরষে
সঙ্গীত গাও নানা।[৬৩]

স্বরবৃত্তের সঙ্গে স্বনবৃত্তের তফাৎ এইখানে যে স্বনবৃত্তে উচ্চারিত অক্ষরের স্বন-পরিমাণই প্রধান। স্বরবৃত্তে যে-সুরের টান থাকে, এখানে তা অনুপস্থিত। কাজেই প্রথমের স্থিতিস্থাপকতা যেমন নেই দ্বিতীয়ে, তেমনি তার শোষণ শক্তিরও অভাব। এখানে প্রতিটি স্বন বা ধ্বনির হিসাব রাখতে হয়। তাই এখানে ঘটে যৌগিক অক্ষরের দীর্ঘীকরণ। স্বরবৃত্ত যেমন পুরুষালি ছন্দ, স্বনবৃত্ত তেমনি মেয়েলি। স্বনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় সংস্কৃত মাত্রাবৃত্তের লঘু-গুরুর কল্লোল কিছুটা সম্ভব এই ছন্দেই। তাই সত্যেন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা এগিয়েচে "ছন্দস্পন্দ" সৃষ্টি কর্তে: একে তিনি অভিহিত করেচেন "বিমান-বিহার পদ্ধতি" বলে। একে দিলীপকুমার বলেচেন "লঘুগুরু", [১৩] আর মোহিতলাল "হসন্তপ্রাণ মাত্রাবৃত্ত"[১১]। এর সূত্র হলো "শ্রুতবোধের" (২):

সংযুক্তাদ্যং দীর্ঘং সানুস্বারং বিসর্গ সংমিশ্রম্।
বিজ্ঞেয়মক্ষরং গুরু, পাদান্তস্থ বিকল্পেন চ॥

পার্শী, আরবী, গ্রীক, রোমকে যুক্তাক্ষর নেই, অথচ সেখানে ছন্দস্পন্দের প্রতিষ্ঠা হয়েচে দু'রকমে ঃ দীর্ঘস্বরের সাহায্যে, আর অক্ষরসংঘাতের বিন্যাসে। অর্ধোচ্চারিত বা আল্‌গোছ অক্ষরের পর, পূর্ণোচ্চারিত বা গোছালো অক্ষর বসলেই অক্ষর সংঘাত হয়। এই অক্ষর-সংঘাতের অব্যবহিত পূর্বে যে অক্ষর তাকে পার্শী, আরবী, গ্রীক ও রোমক ছন্দশাস্ত্রে দীর্ঘ বলেই ধরা হয়। এর কারণ, গায়ে গা না জুড়লেও বস্তুত এ যুক্তাক্ষরের সামিল। তাইতো 'প্রাকৃত পৈঙ্গলের' (১।২) নির্দ্দেশ ঃ "দীহো সংজুত্তপরো" অর্থাৎ সংযুক্তাক্ষরের পূর্বস্বর দীর্ঘ। যেমন 'মালিনী'—ছন্দের ঃ

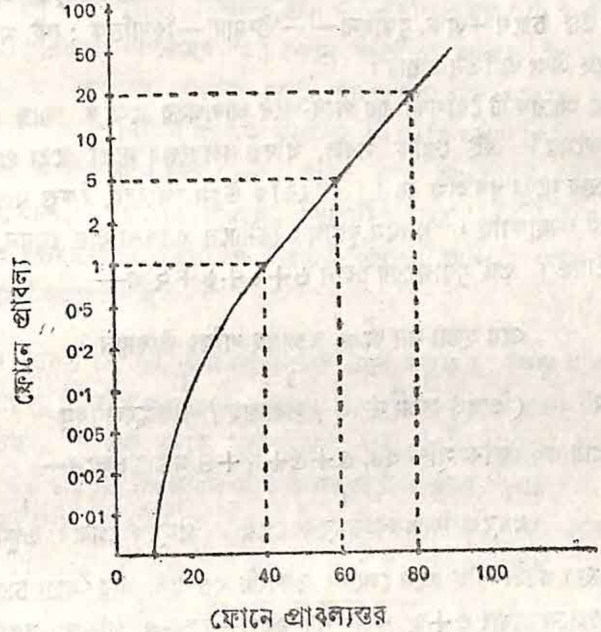
◡◡ ◡◡ ◡◡ – – – ◡ – – ◡ – –
উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্ । শূন্য ময় স্বর্ণপঞ্জর

(◡ =হ্রস্ব ; – =দীর্ঘ)—

উড়ে চলে গেছে বুল্‌বুল্। শূন্যময় স্বর্ণপঞ্জর,
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুণ, যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।৬৩

এই স্বন প্রাবল্যের সঙ্গে যুক্ত আছে। প্রাবল্য স্বনসংবেদনের এমন একটি দশা যার মারফতে স্বন বা ধ্বনিগুলো কোমল হতে প্রবল একটি মাপনীতে বিন্যস্ত হতে পারে। এ মস্তিষ্কের রায়, কাজেই এ ভৌত রাশি নয়। মনে রাখতে হবে যে প্রাবল্য ও তীক্ষ্ণতা এক নয়। প্রাবল্য নির্ভর করে তীক্ষ্ণতা ও কম্পাংকের উপর, যেমন ২০ db এর তীক্ষ্ণতাস্তর ও ১০০০ cps এর কম্পাংকের বিশুদ্ধ সুর শ্রব্য ; কিন্তু তীক্ষ্ণতা ঠিক রেখে কম্পাংক যদি ১০০ cps এ নামান যায়, তবে তা শোনা যাবে না। কান অবশ্য ঠিক-ঠিক মাপতে পারে না স্বনপ্রাবল্য ; তাহলেও তার রায় ব্যবহারিক দিক থেকে মোটামুটি শুদ্ধ ধরা যেতে পারে। একটি মানক স্বন-এ প্রাবল্য মাপা হয়, আর এই মানক স্বন হলো ১০০ cps এর সুর। স্বনস্তরের প্রাবল্য ১০০০ cps সুরের স্বন চাপস্তর। এর একক হলো ফন (phon)। নির্দেশ স্তর হলো ০·০০ ২ dyne/cm² এর বর্গমাধ্যমূলে (r.m.s) স্বনচাপ। এরি উপরে যদি মানক সুর n ডেসিবেল-এর হয়, তবে মাপের অধীনস্থ স্বন-এর প্রাবল্য হবে n ফন। কাজেই যেকোন স্বনের প্রাবল্যস্তর ফনে মাপলে দাঁড়ায় বিশুদ্ধ ১০০০ cps সুরের স্বনচাপস্তরের সমান ডেসিবেলে। অন্যদিকে প্রাবল্য-একক হলো সোন (sone)—এহলো শ্রাব্যতা সীমার ঊর্ধ্বে স্থিত ৮০ db-এর বিশুদ্ধ ১০০০ cps সুরের প্রাবল্য। এদের সম্পর্ক দেখান হলো ১৯-সংখ্যক চিত্রে ঃ প্রবল্য বনাম প্রাবল্য স্তর-এ ৬৫। এ-থেকে স্বন-এর স্বরূপ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা পাওয়া যাবে।

এ-ছন্দ পর্বচারী, পদচারী নয়। এ-প্রসঙ্গে স্মর্তব্য (৬.৩) এর (৯) ও (১১) অর্থাৎ পদ ও পর্ব এবং এরি সঙ্গে ছেদ ও যতি-(৮) ও (১৮), আর (৫.৪) এর ছেদ, যতি ও বিরাম। পদ ও পর্বের তফাৎ এখানে যে প্রথমটিতে আছে তান বা সুরপ্রবাহ ; আর দ্বিতীয়টিতে তারি অনুপস্থিতি। এর একটি কারণ, পদের



চিত্র : ১৯—প্রাবল্য বনাম প্রাবল্যস্তর

তুলনায় পর্ব হ্রস্বতর। পদের প্রকৃতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মরণীয় : "বাংলা রামায়ণ, মহাভারত, অন্নদামঙ্গল, কবিকঙ্কণ চণ্ডী প্রভৃতি সমস্ত পুরাতন কাব্য গানের সুরে ভরিয়া উঠিত ; সঙ্গে-সঙ্গে চামর দুলিত, করতাল চলিত এবং মৃদঙ্গ বাজিতে থাকিত।"৬০ এই জন্যে পদচারীর আরেক নাম স্বরবৃত্ত। কোনটি পদচারী, কোনটি পর্বচারী তা নির্ণয় কর্তে এই তানই সহায়ক। যেমন,

বসি তরু পরে / কলরব করে / মরি মরি, আহা মরি।

এবং

শুধু বিঘে দুই, / ছিল মোর ভুঁই / আর সবি গেছে ঋণে।

উপরের দু'টি চরণেই চলন ৬+৬+৮ মাত্রার। অথচ প্রথমটি স্বরবৃত্ত, দ্বিতীয়টি স্বনবৃত্ত। আর এ বোঝা যায় সুরের টান থেকেই। দু'য়ের আরেকটি পার্থক্য

ধরা পড়ে খণ্ডপর্বে। অর্থাৎ পদ-এ কোনখণ্ড পদ থাকে না। কিন্তু পর্বে এ ছন্দের চরণান্তিক অংশ। এতে ছন্দোবৈচিত্র্য দেখা দেয়। যেমন,

ডুব্‌বে পাহাড় বন। ডুবে যাবে চরাচর। ধরণীর উন্মাদ। নৃত্যে

৮+৮+ ৮ মাত্রায় এর চলন, যা থেমেচে তিনের খণ্ডপর্বে। স্বরবৃত্তের মতো এতে রয়েচে ৮ মাত্রার পদক্ষেপ, অথচ এ স্বরবৃত্ত নয়। এযে স্বনবৃত্ত তার 'দুটি প্রমাণ আছে উক্ত চরণে—এক, যুক্তাক্ষর——'উন্মাদ'—দ্বিমাত্রিক ; দুই, খণ্ডপর্ব—'নৃত্যে'—আছে এবং এ তিন মাত্রার।

স্বনবৃত্তের আরেকটি বৈশিষ্ট্য এর পর্বে-পর্বে আদ্যক্ষরে ঝোঁক আছে এবং তা বেশ বড় রকমের। এই ঝোঁক সবল, যদিও বলবৃত্তের মতো এতো প্রবল নয়, আবার স্বরবৃত্তের মতো দুর্বলও নয়। এই ঝোঁক উরস স্পন্দের, কিন্তু বলস্পন্দের না হলেও এর কাছাকাছি। ঘনঘন যুক্তাক্ষর বিন্যাসে এ দেখা যায় যেমন, তেমনি হসন্ত বহুলতায়ও। তাই যুক্তাক্ষরের চলন ৬+৬+৬+২ এ—

ওরে হত্যা নয় আজ, সত্যাগ্রহ শক্তির উদ্বোধন

অর্থাৎ (ওরে) হত্যা নয়াজ / সত্যাগ্রহ / শক্তির্‌দ্বো /ধন্

হসন্ত—বহুলায় এই ঝোঁক সৃষ্টি হয়, ৫+৫+৫+৪ মাত্রার চলনে—

ধম্‌কে দিয়ে। চম্‌কে চেয়ে। থম্‌কে গেল। তক্ষুণি

এঠিক বলবৃত্তের কাছাকাছি এসে গেচে। তফাৎটা খণ্ডপর্বে, যার মাত্রা চার। ছন্দ চলেচে বিষমচলনে অর্থাৎ ৩+২ করে পদক্ষেপে—তিন-এ গড়িয়ে যাচ্ছে, আর দুই-এ বাধা পাচ্ছে। শেষে একেবারে চার-এ চরণান্ত। কিন্তু বলবৃত্তে এর পদক্ষেপ ৬ মাত্রায়। (পাঁচ মাত্রায় নয়)—অর্থাৎ খেমটার ছ'মাত্রার তালে, যেমন,

বৃষ্টি পড়ে-/ টাপুর টুপুর / নদী-এলো / বান।

III. বলবৃত্ত—বৈদিক স্বরসংগীত সামবেদে পূর্ণতা লাভ করে পরবর্তী যুগে রাগ রাগিণীর সৃষ্টি করে। স্বরমণ্ডলনই এর বড়ো কথা। প্রাকৃত-অপভ্রংশের যুগে এলো তাল সংগীত অর্থাৎ কালনিয়ন্ত্রিত প্রচাপের সংগীত। এ তাল নিয়ন্ত্রিত হতো হাততালিতে বা ঢোলকের কাঠিতে। বস্তুত 'তাল' শব্দটি সংস্কৃত এবং সাধিত হয়েচে 'তড়্‌' ধাতু থেকে, যার অর্থ আঘাত করা। এখানে লক্ষণীয় যে এহলো জন সাধারণের সংগীত। ভারতীয় ছন্দে দুটি ধারার সাক্ষাৎ মেলে—একটি, সংস্কৃত অর্থাৎ শোধিত ; দুই, প্রাকৃত অর্থাৎ লৌকিক, সাধারণ। প্রথমে বর্ণ নিয়েচে প্রধান ভূমিকা, আর দ্বিতীয়ে মাত্রা বা ছান্দসিক বিচলনই এর প্রধান উপাদান।

আগেকার বৈদিক ছন্দ ছিল বর্ণ বা অক্ষরবৃত্ত। এখানে স্মর্তব্য যে মাত্রাবৃত্তে অক্ষরবৃত্তের চেয়ে বেশি স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু তালবৃত্ত মাত্রাবৃত্তের চেয়ে অধিকতর গীতল। ভেলাঙ্কর এই 'তালে'র সংজ্ঞা দিয়েচেন এ-ভাবে ঃ এ হলো "কাল উপাদানের সহায়তায় ছন্দপংক্তি (চরণ)তে আবর্তক বিরামের নিয়ন্ত্রণ প্রচাপ মারফতে। আর এই 'বিরাম—নিয়ামক প্রচাপ' নির্দেশিত হয় কণ্ঠ্য প্রস্বনে ; কিন্তু এ-ছাড়াও হাততালিতে, বা দেহের অন্য কোন প্রত্যঙ্গের অনুরূপ বিচলনে অথবা হাতঢোলক বা করতাল জোড়ার মতো কালরক্ষক বাদ্য যন্ত্রের আঘাতে"। তালবৃত্তে বিরাম আসে নির্দিষ্ট সংখ্যক কালবিচলন অর্থাৎ মাত্রার শেষে। তালবৃত্তের পংক্তি একাধিক তাল গণে বিভক্ত এবং এদের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে নির্দিষ্ট মাত্রা সংখ্যা, যা দুটি প্রচাপিত বিরামের মধ্যবর্ত্তী। আর প্রতিটি তালকে স্বতন্ত্র রাখতে হবে, যেন তারা পূর্ববর্ত্তী বা পরবর্ত্তী তালের সঙ্গে না মেশে। এখানে মৌন বিরামের গুরুত্ব সমধিক।[৬৬]

বাঙলা বলবৃত্ত ছন্দ এই তাল সংগীতেরই উত্তর সাধক। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ-সম্বন্ধে বাঙলা ছান্দসিকেরা এর তাৎপর্য ঠিক-ঠিক ধর্তে পারেন নি। তবে মৌলিক চিন্তার পরিচয় মেলে রবীন্দ্রনাথে, যখন তিনি বলেন ঃ "প্রাকৃত ছন্দ (বলবৃত্ত) কে চার-চার সিলেব্‌ল্‌ এ ভাগ করাটা ঠিক বলে আমার মনে হয় না। এ ছন্দে তিন মাত্রার ভাগটাই মূলকথা। সেই জন্যে তিনের ভাগে যেখানে কম পড়েছে সেখানে টেনে পুরিয়ে দিতে হয়। যতিকে বাটখারা স্বরূপ করে ছন্দের ওজন পূরণ বাংলা ছন্দ ছাড়া আর কোনো ছন্দে আছে কিনা জানিনে। যতিকে কেবল বিরতির স্থান না দিয়ে তাকে পূর্তির কাজে লাগাবার অভ্যাস আরম্ভ হয়েছে আমাদের ছড়ার ছন্দ থেকে। ছড়ার রীতি এই যে, সে কিছু ধ্বনি জোগায় নিজে, কিছু আদায় করে কণ্ঠের কাছ থেকে ; এ দুয়ের মিলনে সে হয় পূর্ণ।"[৬০] এতে দেখা যায় তালবৃত্তেরই অনুগামী বাঙলা বলবৃত্ত। ইংরেজ কবি Coleridge এর Christabel (১৮১৬) ছন্দের সঙ্গে এর মিল আছে প্রচাপ ও তার বণ্টন সম্পর্কে ঃ "Christabel এর ছন্দ এক নতুন নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, যথা, প্রত্যেক চরণে অক্ষর নয়, প্রস্বন গণনা। প্রতিটি চরণে দেখা যাবে মাত্র চারটি প্রস্বন"। মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক চরণে আছে চারটি বলস্পন্দ, কিন্তু প্রচাপিত অক্ষর নয়। অর্থাৎ আমাদের তৈরি থাকতে হবে কিছু মৌন প্রচাপের জন্যেও। চারটি

।   ।   ।
বলস্পন্দ আছে এ চরণে ঃ 'Tis the middle of night by the castle

।   ।   ।   ।
clock। আবার My sire is of a noble line—এ আছে তিনটি প্রচাপিত

অক্ষর, কিন্তু চারটি বলস্পন্দ, যার মধ্যে চতুর্থটি মৌন এবং sire ও is এর মধ্যে বর্তমান। মৌন হলেও অন্য তিনটির মতো ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য।[১৮]

বলবৃত্তে প্রথমেই নির্ণেয় ক'টি বলস্পন্দ আছে। তার পর এক বলস্পন্দ থেকে অন্য বলস্পন্দ পর্যন্ত যে বিভাগ তার নাম মেল এবং এ নিরূপিত হয় বিরামে। কাজেই স্পন্দ থেকে বিরাম পর্যন্ত যে-বিভাগ তাকেই বলে মেল। এ-সম্পর্কে দ্রষ্টব্য (৬.৩) এর (১৪) ও (১৭) সংখ্যা অর্থাৎ বিরাম ও মেল ; (৫.৩) ও (৫.৪)। মেল-এর উৎপত্তি বলস্পন্দে বা প্রচাপনে। তাই এর মধ্যে আছে গতি ও যতির লীলায়ন—প্রথমে চাপ-তীব্রতা, পরে চাপ-শ্লথন। এযেন বিষম মাত্রা ছন্দ—গতি ও বাধা। প্রথমভাগে গতি, দ্বিতীয় ভাগে বাধা। বস্তুত এ প্রচাপের বা বলের তরঙ্গ, যা তীব্রতা ও শ্লথনে বয়ে চলে। স্বভাবতই এ প্রচাপ প্রস্বর থেকে আলাদা। এখানে চাপ-তীব্রতা তরঙ্গের শীর্ষ এবং চাপ শ্লথন এর খাদ। বিরাম এখানে তালির কাজ করে—তাই মেল কাটা-কাটা এবং তালগণের সগোত্রীয়। মেলকে তালগণ বল্‌লেও চলে। ফলে মেল ও বিরাম এক নিবিড় বন্ধনে বাঁধা। যেহেতু এ বাদ্যযন্ত্রের তালের সঙ্গে যুক্ত, তাই একে অনুসরণ কর্তে হয় ঐ তালকে। বাঙলা বলবৃত্তে মাত্র দ্'টি তালকে রূপ দিয়েচে তার ছন্দে যার কথা আগে বলা হয়েচে (৬.৩) এর (১৭) সংখ্যক "মেল"—এ। একটি চারমাত্রার কাহারবা তাল ; অন্যটি ছ'মাত্রার খেমটা তাল। যেমন,

চারমাত্রা ঃ ছিপখানি / তিন দাড় / তিনজন / মাল্লা,

ছ'মাত্রা ঃ আমি যদি / জন্ম নিতেম / কালিদাসের কালে।

বলবৃত্তের মাত্রাসমস্যা একটি জট, যা এ-পর্যন্ত কেউ খুলতে পারেন নি। ফলে ছান্দোবিৎরা অনেকেই তাঁদের গবেষণা অক্ষর (syllable)-এ সীমিত রেখেচেন ; আবার কেউ কেউ একে মাত্রায় টেনে মাত্রাসাম্য বজায় রাখতে অপারগ হয়েচেন এবং ভিন্ন-ভিন্ন পরিমাপের কথা বলেচেন। অক্ষরকে 'দল' বলে যাঁরা এগিয়েচেন, তাঁরা মনে করেন যে 'দল'-ই এরি পরিচায়ক।[৯] তাঁরা বুঝতে পারেন নি যে 'দল' নয়, "দোলে" অর্থাৎ স্পন্দে আছে এর চাবিকাঠি। তেমনি মাত্রাসমর্থকেরাও গোলে পড়েচেন শব্দ পাপড়ি বা syllable অর্থাৎ অক্ষরের আমদানি করে। সত্যেন্দ্রনাথের মতে ঃ "যুক্তাক্ষর আর ঐ-কার, উ-কার প্রভৃতির ওজন দেড় ; যুক্তাক্ষরের প্রথমাংশ আধ, শেষাংশ এক, দ্'য়ে মিলিয়ে দেড়। ঐ-কার, ঔ-কারের প্রথমার্ধ এক ; শেষার্ধ আধ, দ্'য়ে জড়িয়ে ঐ দেড়ই দাঁড়াবে। কাজেই পুঁজি দাঁড়াচ্ছে পুরো আর আধলা, গোটা আর ভাঙ্‌টা।"[৬৩] কিন্তু এখানে উপেক্ষিত

হয়েচে বলস্পন্দ যা বলবৃত্তের ভিত্তি। তিনি নিজেই বলেচেন ঃ "ও হল বাংলা ভাষার প্রাণ পাখি—এ নিরক্ষরের ছন্দ"। অথচ নিজে 'নিরক্ষরের ছন্দ' ও 'প্রাণ পাখি'র মর্ম উপলব্ধি কর্তে পারেন নি। এ যদি নিরক্ষরের ছন্দ হয়, তবে স্বভাবতই সেখানে থাকে না অক্ষরের নিক্তি ওজন। যেমন দেড়, এক, আধলা। দ্বিতীয়ত, এ ছন্দ যখন বাঙলা ভাষার 'প্রাণপাখি', তখন ঐ 'প্রাণে'ই অর্থাৎ শ্বাস বা শ্বসন বলেই আছে এর চাবিকাঠি। এক কথায় এই-'প্রাণে' অর্থাৎ বলস্পন্দেই এর স্বরূপ ধরা পড়ে। তাই এরূপ ভগ্নাংশ মেপে মাত্রানির্ধারণ টেকে না। বলাবাহুল্য যে ছোট শিশু ছড়ার ছন্দে নেচে-নেচে সাড়া দেয় এই বলস্পন্দের জন্যেই—তার প্রয়োজন হয় না অক্ষরের সূক্ষ্ম হিসেবে এবং তা সে জানেও না। এখানে মেলের মাত্রাসংখ্যা নির্ধারিত হয় এক বলস্পন্দ থেকে অন্য বলস্পন্দ পর্যন্ত অর্থাৎ বিরাম অবধি কালের ব্যাপ্তিতে। আর এ-ব্যাপ্তি উচ্চারণ-নির্ভর এবং হরণে-পূরণে ব্যাপ্তি পরিমাণ ঠিক থাকে। মনে রাখতে হবে যে অক্ষরে বর্তমান থাকে একটি "ব্যাপ্তি পরিমাণ" (duration quantum) ; ফলে অন্ত্য ব্যঞ্জন হ্রস্ব হলে, স্বর দীর্ঘ হবে এবং তদ্বিপরীত ও।[২৯]

বলবৃত্তের প্রাণ পাখিকে ধরবার জন্যে প্রয়োজন দুটি জিনিসের—এক, প্রচাপ বা বল ও অক্ষরের সমীকরণ সূত্র ; দুই, বলের অভিক্রিয়া। প্রথমটি সম্পর্কে সূত্র দিয়েচেন রাজশেখর বসু ঃ "সাধারণত গুরুধ্বনি ও accent অর্থাৎ (stress) মিশে যায়। মাত্রাপূরণের জন্য স্থানে স্থানে যুক্তধ্বনিকে টেনে গুরু করা।"[৫৫] দ্বিতীয়টি সম্পর্কে অরবিন্দ বলেন যে বলে বা প্রচাপে আসে এক "খাড়া সংঘাতভার" (vertical ictus weight)—এ হলো হাতুড়ি ঘা-য়ের তুল্য। এতে কালদৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভারও আছে, যেমন স্বরভার বা অন্তর্ভার ও ব্যঞ্জনভার। বস্তুত এই ওজনে দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। মাত্রা নিরূপণে এরাই হলো উপাদান।[৫৪] এ-সম্পর্কে ব্যঞ্জনসংঘাত-এর অভিক্রিয়া আগেই বলা হয়েচে (৭.২) এর ৩২-সংখ্যক সূত্রে। তাই উচ্চারণকে সংশ্লিষ্ট (সংবৃত) ও বিশ্লিষ্ট (বিবৃত) ধরে এর মাত্রা বিচার চলে না, এমনকি 'যুক্ত দল' ও 'রুদ্ধদলের' দলাদলিতেও না।[৯] এ-ব্যাপারে এক প্রধান ছন্দোবিৎ পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদে এগুলেও তাঁর মানসিকতা 'চতুঃস্বর' পর্বের ; ফলে এই চার-স্বরের পর্বভাগে তিনি গোলে পড়েচেন, যেমন, 'গর্ গর্ গর্। গর্জে দেয়া। ঝর্ ঝর্ ঝর্। বৃষ্টি'র মাত্রা তথা স্বরের সমকত্ব নিয়ে। এখানে 'গর্-গর্ গর্'-এ তিন স্বর। আবার দু'স্বর আছে 'বাইরে শুধু। জলের শব্দ। ঝুপ্ ঝুপ। ঝুপ্'-এর 'ঝুপ্‌ঝুপ'-এ। তাই তাকে বলতে হয়েচে ঃ "স্বরবৃত্তে (অর্থাৎ বলবৃত্তে) ও কখন কখন colsed syllable-কে দুই মাত্রা ধরা হয়। সুতরাং বলিতে হয় যে, 'স্বরবৃত্ত' ছন্দেও আবশ্যক মতো syllable কে দীর্ঘ ধরিতে হয়।"[১০] অর্থাৎ তাঁর পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদ এবং চতুঃস্বর-পর্ব সূত্রের এখানে

হয়েচে ভরাডুবি। কিন্তু প্রচাপ বা বলসূত্রানুসারে এর ব্যাখ্যা অত্যন্ত সরল। একেকটি মেলে আছে খেমটা তালের ৩+৩ বা ছ'য়ের ঘরাণা। এই নির্দিষ্ট তাল ঠিক রাখার জন্যে তালি পড়চে ছ'য়ে-ছ'য়ে। ফলে 'গর্ গর্ গর্' ৬-মাত্রার মেল। তেমনি ঝুপ্ ঝুপ্' ও। প্রচাপে এখানে মাত্রা সম্প্রসারিত হয়েচে। এই সম্প্রসারণের তত্ত্ব নিহিত আছে পাণিনির 'অভিনিধানে', যার কথা আগেই বলা হয়েচে। তাই Vendryes বলেন ঃ "প্রতিটি স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনে তিনটি স্বতন্ত্র পর্ব আছে—সংবার বা অভিনিধান, হ্রস্বতর বা দীর্ঘতর কালব্যাপ্তির ধারণ ; ও মোক্ষ বা স্ফোট। যেমন, সাধারণ ব্যঞ্জন 'ট'-এর উচ্চারণে অভিনিধানের পরেই আসে স্ফোট এবং ধৃতি ক্বচিৎ-বোধ্য কালভগ্নাংশে পরিণত হয়। অপরপক্ষে এই তিনটি পর্বই চিহ্নিত হয় দ্বিত্বব্যঞ্জনে, কেননা এরা তো কেবলি দীর্ঘ ব্যঞ্জন যা হ্রস্ব ব্যঞ্জনের তুলনায় অধিকতর জোরে উচ্চারিত হয়।"[৬৭] তাই 'টুক্ টুক্ রঙ্গন/ কিংশুক ফুল্ল' / যথাক্রমে $৪ \times ১\frac{১}{২} = ৬$ মাত্রার এবং $৩ \times ১\frac{১}{২} + ১ = ৫$ মাত্রার নয়।[৬৩]

| | | |

এরা কাহারবা তালের চতুর্মাত্রিক, যথা টুক্‌টুক্। রঙ্‌গন্ ; ও কিংশুক। ফুল ল্। ব্যাপ্তি কোয়াণ্টাম অনুসারে এই তারতম্য।

(খ) গণিতীয় প্রতিরূপ

ভৌত ধারণা ও সিদ্ধান্তগুলিকে যদি মাপযোগ্য রাশিতে রূপান্তরিত করা যায় তবেই তাদের সার্থকতা। এ প্রসঙ্গে Lord Kelvin এর একটি উক্তি বিশেষ অর্থবহ। তিনি বলেন ঃ "যখন তোমার বক্তব্য মেপে তাকে সংখ্যায় প্রকাশ কর্তে পারো, তখন সে-সম্বন্ধে তুমি জানতে পার কিছুটা ; কিন্তু যখন তুমি তাকে সংখ্যায় প্রকাশ কর্তে পারো না, তখন তোমার জ্ঞান স্বল্প এবং তা সন্তোষ জনক নয়।"[৬৮] এরি পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিধাছন্দের ধারণাগুলিকে তুলে ধরা গেল গণিতীয় পরিভাষায় অর্থাৎ মেট্রিকস্ বা ধাত্রের প্রতিরূপে বা ব্যঞ্জনায়। এই ধাত্র (matrix) হলো সংখ্যাপদ্ধতি, যেখানে প্রত্যেকটি ধারণা একেকটি সংখ্যার সামিল। ছন্দ প্রত্যাশা-নির্ভর। অর্থাৎ স্বভাবিক বাক্-এর উপর এ চাপিয়ে দেয় এর ছাঁচ এবং এর পুনর্বৃত্তি সে আশা করে। এই পৌনঃপুনিকতা ঘটে কয়েকটি বৈশিষ্ট্য নিয়ে—এরাই ছন্দধাত্রের পদ। এ-জন্যেই একে বলা হয় "প্রত্যাশা ধাত্র"। এখানে উল্লেখ্য যে Karl Magnuson ও Frank Ryder এ-কাজে এগিয়েচেন তাঁদের "স্বতন্ত্র মুখশ্রী" মতবাদে—অক্ষরকে ধরা হয়েচে চারিটি গুণে গুণান্বিত, যথা, ± প্রবল ; ± দুর্বল ; ± শব্দাঘাত ; ও ± প্রাক্-প্রবল।[৬৯] বাঙলা ছন্দ অবশ্য ভাবিত হয়েচে অন্যভাবে।

সাধারণ বীজগণিতের সংকেত (notation) হলো সাঁট লিপি (short

hand)-র সুলভ পদ্ধতি—সংখ্যার যৌক্তিক সম্পর্ক প্রকাশের এক নিবিড় ও সুস্বাঙ্গীকৃত (well-adapted) সংহিতা (code)। ধাত্রের সংকেত হলো এই সাঁট লিপির পরবর্তী বিকাশ, যাতে পূর্ববর্তী পদ্ধতির সংকারণ ও ফলাফল অধিকতর সংকেতে প্রকাশক্ষম করা যায়। ধাত্র ও সারণিক (determinant) তত্ত্বের উদ্ভব দু'টি প্রয়োজনে—এক, সহ-রৈখিক সমীকরণের সমাধান ; দুই, নিবিড় সংকেতে একপ্রস্ত চলের অন্যপ্রস্তে রৈখিক রূপান্তরন। মেট্রিকস্ তাই একাধারে সংহিতা ও কলন (calculus)। ঊনবিংশ শতকে Cayley ও অন্যান্য বীজ-গণিতজ্ঞেরা এই সংকেতের উদ্ভাবক। n অজ্ঞাত সংখ্যায় m সহসমীকরণের সাধারণ সেট হলো

$$a_{11}x_1+a_{12}x^2+\cdots+a_{1n}x_n=y_1,$$
$$\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \text{(31a)}$$
$$a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=y_m$$

এবং এহলো m=সংখ্যক চল $y_1, y_2\cdots\cdots y_m$ কে n–সংখ্যক চল x_1, x_2, x_n এর রৈখিক ফলনে প্রকাশ কর্বার রৈখিক রূপান্তরন। সংকেত লিপি হলো

$$\begin{bmatrix} a_{11}a_{12}\cdots\cdots a_{1n} \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ a_{m1}a_{m2}\cdots\cdots a_{mn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \cdots\cdots \\ x_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \;\cdots\cdots\text{(31b)} \\ y_m \end{bmatrix}$$

এখানে চল xj থেকে সহজে a_{ij} এর আয়তক্ষেত্রীয় পরিকল্পকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েচে রৈখিক সমীকরণের প্রস্তের জন্যে। এ-রকম শৃঙ্খলিত সহগের পরিকল্প (scheme) চল $x_1, x_2, x_3\cdots\cdots x_n$ এর উপর সংকারকের (operator) কাজ কচ্ছে। আর m পংক্তি ও n স্তম্ভে বিন্যস্ত বিচ্ছিন্ন সহগ a_{ij} এর পরিকল্পকে n গুণিত m বা m×n এর কোটি (order)র মেট্রিকস্ বা ধাত্র বলে।[৭০]

বাঙলা ছন্দে এই ধাত্র প্রয়োগ করা যেতে পারে। ত্রিধাছন্দ অজ্ঞাত সংখ্যা—সরবৃত্ত ; স্বনবৃত্ত ; বলবৃত্ত। এদের অপেক্ষক বা ফলন (function) হলো পদ, পর্ব ও মেল, আর সহগ তিনপ্রস্থের, যথা (i) স্বরান্ত, হলন্ত ও হসন্ত অক্ষর ; (ii) উচ্চারণে প্রস্বরণ, প্রস্ফুটন ও প্রচাপন ; এবং (iii) হ্রস্ব, দীর্ঘ, ও গুরু (বল) মাত্রা। এখানে লক্ষণীয় যে পদ, পর্ব ও মেল-এ সংযুক্ত ছেদ, যতি ও বিরাম ; উচ্চারণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মধ্য, বিলম্বিত ও দ্রুত লয় অথবা সংবৃত্ত, বিবৃত ও প্রস্বনিত ; অর্থাৎ বিকল্প হিসেবেও এরা গ্রহণযোগ্য। তিনপ্রস্থ সহগ হলো বাক্ এর স্বরূপ ; এরি সঙ্গে ছন্দধাত্র যুক্ত হলে পাওয়া যায় চলনধাত্র, যেখানে চরণ

বিভাগ পদ, পর্ব ও মেল নামে পরিচিত। এহলো ছন্দের উপর বাক্-এর অভিক্রিয়া। গণিতের ভাষায়, বাক্‌ধাত্র × ছন্দধাত্র = চলনধাত্র। অর্থাৎ

$$\underset{\text{বাক্‌ধাত্র}}{\begin{pmatrix} \text{স্বরান্ত} & \text{প্রস্বরণ} & \text{হ্রস্ব} \\ \text{হলন্ত} & \text{প্রস্ফুটন} & \text{দীর্ঘ} \\ \text{হসন্ত} & \text{প্রচাপন} & \text{গুরু} \end{pmatrix}} \times \underset{\text{ছন্দধাত্র}}{\begin{pmatrix} \text{স্বরবৃত্ত} \\ \text{স্বনবৃত্ত} \\ \text{বলবৃত্ত} \end{pmatrix}} = \underset{\text{চলনধাত্র}}{\begin{pmatrix} \text{পদ} \\ \text{পর্ব} \\ \text{মেল} \end{pmatrix}} \cdots (32)\text{a}$$

যদি বাক্‌ধাত্র = S, ছন্দধাত্র = P ও চলনধাত্র = F হয়, তবে (32a)-সংখ্যক matrix হয়ে দাঁড়ায় $SP = F$ অর্থাৎ $P = S^{-1}F$ তাই (32a)-সংখ্যক মেট্রিক্স্ সমীকরণের সমাধান হবে—

$$\begin{bmatrix} \text{স্বরবৃত্ত} \\ \text{স্বনবৃত্ত} \\ \text{বলবৃত্ত} \end{bmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} \text{স্বরান্ত} & \text{হলন্ত} & \text{হসন্ত} \\ \text{প্রস্বরণ} & \text{প্রস্ফুটন} & \text{প্রচাপন} \\ \text{হ্রস্ব} & \text{দীর্ঘ} & \text{গুরু} \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} \text{পদ} \\ \text{পর্ব} \\ \text{মেল} \end{bmatrix} \cdots (32\text{b})$$

যেখানে Δ = সারণিক বা determinant আর 'স্বরান্ত'……'গুরু' প্রভৃতি প্রত্যেকেই একেকটি মেট্রিক্স্ বা ধাত্র। পদ, পর্ব ও মেল অবশ্য মেট্রিক্সের উপাদান হিসেবেই রয়েছে।

তৃতীয় পর্ব ঃ ছন্দসমীক্ষা

অষ্টম অধ্যায় ঃ ছন্দোমীমাংসা

ছন্দোবিজ্ঞান প্রতীপ অনুশীলন, কেননা খাঁটি কবিতায় এর প্রয়োজন কম-ই। আর এমন কোন কলা নেই যাতে কোন মনীষী কাজের উপাদান ও নিয়মাবলী সম্পর্কে এতটা অনবহিত হতে পারেন। চিত্রকরের অবশ্যই কিছু জানা চাই রঙ ব্যবসায়ীর রসায়ন; ভাস্কর উপেক্ষা করতে পারেনা; শিলা ও ধাতুর ধর্ম; গায়কের নিজের প্রশিক্ষণ চাই সামঞ্জস্যের জটিল গণিতে। কিন্তু কবির উপাদান আরো ঘনিষ্ঠভাবে সাধারণ জীবনের অংশ—কথিত শব্দের ধ্বনিগুচ্ছ এবং তাদের প্রয়োগের নিয়মাবলী সাহজিক। সূক্ষ্মকানই তার পথপ্রদর্শক। কবি সেবা ছন্দোবিজ্ঞানের কাজ নয়। অভিজ্ঞতা ছাড়া কোন কলাকৃতির সত্যিকার সম্ভোগ হতে পারে না—এতে জন্মায় অধিকার বোধ এই জেনে যে কেন আমরা উপভোগ করি এবং কেমনে শিল্পী মন ও ইন্দ্রিয়ের উপর তার প্রভাব বিস্তারে সমর্থ হন।

—ই, হ্যামার[১]

৮. ১. অনুধ্যানের রূপরেখা

I. বৈদিক—ভারতে বৈদিক যুগ থেকেই চলে আস্‌চে ছন্দোভাবনা। 'ছন্দ' উৎপন্ন হয়েচে √ ছদ্‌ থেকে, যার সাধারণ অর্থ 'আচ্ছাদন করা' (নিরুক্ত ৭।১২)। কিন্তু ঋগ্বেদে (১।১৩২।৬) √ ছদ্‌-এর আরেকটি অর্থ 'আবিভূর্ত হওয়া'। কবিচিত্তে ছন্দ উদ্ভাসিত হয়, ফলে এ-অর্থই সঠিক বলেচেন অনির্বান।[২] তাই তো তমসাতীরে ক্রৌঞ্চবিরহের বেদনায় বাল্মীকি ব্যাধকে যে অভিশাপ দিয়েচেন তা প্রকাশ পেল ছন্দে—শোক রূপান্তরিত হলো শ্লোকে। ছন্দের দৌত্যেই সম্ভব হলো এই রূপান্তর। তিনি অবাক হয়ে নিজেই নিজেকে প্রশ্ন করলেন ছন্দের এই আবির্ভাবে (রামায়ণ, দ্বিতীয় সর্গ, শ্লোক ১৬): 'কিমিদং ব্যাহৃতং ময়া ?' অর্থাৎ এ আমি কি বল্লেম ? তাই বলা হয়েচে ঃ 'ছন্দঃ পদ্যেচ বেদে চ'। ছন্দছাড়া পদ্যের অস্তিত্ব নেই ; আর বেদও ছন্দোময়। বেদভাবনায় তাই ছন্দ স্থান পেয়েচে। বেদবিদ্যার অনুশীলন থেকে হয়েচে বেদাঙ্গের উৎপত্তি এবং এর মূল রয়েচে বেদের ব্রাহ্মণে। ঋক্‌, যজুঃ, সাম ও অথর্ব বেদে বিধৃত আছে বেদবিদ্যা এবং এর সঠিক অনুধ্যানের জন্যে রয়েচে ছ'টি বেদাঙ্গ—শিক্ষা-ছন্দ, ব্যাকরণ-নিরুক্ত এবং জ্যোতিষ-কল্প। প্রথমেই আছে বেদাধ্যয়ন, যার বিশেষ নিয়ম হলো আচার্য বসবেন পূর্বোত্তরাস্য হয়ে এবং শিষ্যরা শুনবেন তাঁর কাছ থেকে। এর নাম পারায়ণ বা শিক্ষা, আর যে-শাস্ত্রে এই শিক্ষার বিষয় আলোচিত হয়েচে তাও

'শিক্ষা' নামে পরিচিত। এ-শিক্ষাকেই ইংরেজিতে Phonetics (ধ্বনিবিজ্ঞান) বলে। বর্ণ, স্বর, মাত্রা, বল, সাম, সন্তান-এর আলোচ্য বিষয়। প্রত্যেক বেদের পৃথক্ পৃথক্ শিক্ষা আছে, যেমন ঋগ্বেদের ও যজুর্বেদের 'পাণিনীয় শিক্ষা' প্রভৃতি। সংহিতা পাঠকে ভেঙে পদপাঠ। সংহিতা পাঠে যা 'অব্যাকৃত', পদপাঠে তা 'ব্যাকৃত'। এদের সম্পর্ক নির্ণয়ে হলো 'প্রাতিশাখ্য'—গ্রন্থের উদ্ভব। প্রত্যেক বেদেরই প্রাতিশাখ্য আছে, যথা খগ্বেদ প্রাতিশাখ্য, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য সূত্র, বাজসণেয়ী প্রাতিশাখ্য সূত্র ও অথর্ববেদ প্রাতিশাখ্য সূত্র প্রভৃতি। শিক্ষার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত 'ছন্দঃ'। ঋক্ ও অথর্বসংহিতার প্রায় সব মন্ত্রই ছন্দোবদ্ধ। গদ্যে রচিত যজুঃকেও ছন্দোবদ্ধ গণ্য করা হয় এবং পিঙ্গলের ছন্দঃ সূত্রেও বেদাঙ্গ। এর প্রথম চার অধ্যায়ের কিছুদূর পর্যন্ত আছে বৈদিক ছন্দের প্রসঙ্গ, তারপরেই লৌকিক বা গণছন্দের বিবরণ।[২] বেদের ছন্দ 'অক্ষর ছন্দ', গণ ছন্দ নয়। অর্থাৎ অক্ষর (Syllable) গুণে ছন্দ নির্ণয় কর্তে হয়। বেদে সাতটি ছন্দ দৃষ্ট হয়—গায়ত্রী, উষ্ণিকা, অনুষ্টুপ, বৃহতী, পঙক্তি, ত্রিষ্টুপ, ও জগতী। তাই 'ছন্দ' শব্দের অর্থ-এই ঃ ঋষিদের অর্থাৎ ধর্মকে সাক্ষাৎ দর্শন করেছিলেন যাঁরা তাদের (নিরুক্তি, ১।১) নিকট মন্ত্র যখন প্রকাশ হয়ে ছিল তখন তাঁরা যে হিল্লোল বা স্পন্দন অনুভব করেছিলেন সেই স্পন্দনের রূপই হলো ছন্দ।[৩] ছন্দতাই স্পন্দমিতি।

II. **সংস্কৃত-প্রাকৃত**—এখানে লক্ষণীয় যে প্রাচীন ছান্দসিকরা বুঝেছিলেন 'শিক্ষা' বা ধ্বনিতত্ত্বের গুরুত্ব ছন্দ—আলোচনায়। তাই তাঁরা শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য ও ছন্দ এই ত্রিবেণীর সন্ধান গুরুত ছন্দ আলোচনায়। তাই তাঁরা শিক্ষা, প্রাতিশাখ্য ও ছন্দ এই ত্রিবেণীর সন্ধান দিয়েচেন। এ ধারারই পরিবর্তিত প্রবাহ বয়ে চলেচে পিঙ্গলের 'ছন্দঃসূত্রে', ভরতের 'নাট্য শাস্ত্রে' (১৫-১৬শ অধ্যায়), ও কালিদাস বা বররুচির 'শ্রুতবোধে'। ১১শ শতকে ক্ষেমেন্দ্র লেখেন 'সুবৃত্তিতিলক', ১২শ শতকে হেমচন্দ্র সংকলন করেন 'ছন্দোঽনুশাসন', ১৫শ শতকে কেদারভট রচনা করেন 'বৃত্তরত্নাকর', ও ১৬শ শতকে নারায়ণ 'বৃত্তরত্নাকর'। এ-ভাবে সংস্কৃত-প্রাকৃতে চললো ছন্দানুশীলন। বাঙলার প্রথম ছন্দোসিক হলেন গৌড়দেশের বীরবতী-নিবাসী বৌদ্ধ রামচন্দ্র কবিভারতী এবং ইনি ১৫শ শতকের জীবিত ছিলেন। তাঁর 'বৃত্তমালা' ছন্দগ্রন্থ ও কেদারভটের 'বৃত্তরত্নাকর' গ্রন্থের টীকা 'বৃত্তরত্নাকর-পঞ্জিকা' সুধীসমানে আদরণীয় হয়েচে। ১৬শ শতকে 'বৃত্তমালা' লেখেন মরমানন্দ সেন কবিকর্ণপুর। এরপরে উল্লেখ্য পুরুত্তমভট্টের 'ছন্দো-গোবিন্দ'। তবে বহুল প্রচারিত গ্রন্থ হলো গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জুরী', যার প্রসিদ্ধি ঘটে ১৭শ শতকে। এঁরি অনুসরণে রচিত হয় রাধা দামোদরের 'ছন্দঃ কৌস্তুভ', যার ভাষ্যরচনা করেন তাঁর শিষ্য বলদেব বিদ্যাভূষণ ১৮শ শতকে। 'ছন্দোমঞ্জুরীর'

চারিখানি টীকা এর জনপ্রিয়তার নিদর্শন—জগন্নাথসেনের 'ছন্দোমঞ্জুরী—টীকা'; চন্দ্রশেখরের 'ছন্দোমঞ্জুরীজীবন'; রঘুনন্দন গোস্বামীর 'ব্যাখ্যামঞ্জুরী', ও কৃষ্ণ বলরামের 'ছন্দোমঞ্জুরী দীপিকা'। এ-ছাড়া চিরঞ্জীব ভট্টাচার্যের 'বৃত্ত রত্নাবলী' (১৭৩১)র নামও উল্লেখ্য।[৪]

III. বাঙলাঃ (ক) **উন্মেষ পর্ব**—বাঙলা দেশের ছন্দোশাস্ত্র রচনা দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত—সংস্কৃত ও প্রাকৃত। একটি সংস্কৃত বস্তু (matter of Sanskrit) অর্থাৎ সংস্কৃতের বিষয় বস্তুই এর উপজীব্য; অন্যটি প্রাকৃত বা বাঙলার বস্তু (matter of Bengali), যা বাঙলা কাব্যের বিষয় বস্তুর আলোচনায় এগিয়েচে। সংস্কৃত ধারার পরিচিতি আগেই দেওয়া হয়েচে। এবার দ্বিতীয় ধারার বাহকদের কথা। এ বিষয়ে পথিকৃৎ হলেন নরহরি চক্রবর্ত্তী। ১৮শ শতকের গোড়ার দিকে রচিত হয়েছিল তাঁর "ছন্দঃসমুদ্র" গ্রন্থখানি। পদ্যে তিনি রচনা করেচেন এ-গ্রন্থ ঃ 'নিজবোধ হেতু করি ভাষায় বর্ণন।' সংস্কৃত ও প্রাকৃত সূত্রের পাশাপাশি রয়েচে বাঙলা পদ্যের ব্যাখ্যা। বাঙলা ভাষার সহায়তায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত ছন্দোশিক্ষার পথ সুগম করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। কেদার ভট্টের 'বৃত্তরত্নাকর'ই যেন বাঙলায় রূপ ধরেচে 'ছন্দঃসমুদ্র'—এই নামকরণে। বস্তুত 'বৃত্ত' মানে 'ছন্দ', আর 'রত্নাকর' মানে 'সমুদ্র'। পিঙ্গলকেও স্মরণ করেচেন নরহরি। প্রাকৃত পৈঙ্গলম্ (১।৮) অনুসরণ করে তিনি লিখেচেন—

যদি দীর্ঘবর্ণ জিহ্বা লঘু উচ্চারয়।
সেই বিকল্পেতে লঘু কহিয়ে নিশ্চয় ॥
দুই তিন বর্ণ যদি পঢ়য়ে ত্বরিত।
এক করি জানো তাহা কহয়ে পণ্ডিত ॥

এবার হ্রস্ব-দীর্ঘ ও লঘু-গুরু বিচার আছে—

দুই মাত্রা দীর্ঘ, একমাত্রা হ্রস্ব হয়।
দীর্ঘ গুরু সংজ্ঞা, হ্রস্ব লঘু সংজ্ঞা কয় ॥
মাত্রা কলা একসংজ্ঞা, যৈছে ছন্দ বৃত্ত।
এ সঙ্কেত জানো, পুন কহি দেহ চিত্ত ॥

পরে যতির সংজ্ঞা নির্দিষ্ট হয়েচে—"জিহ্বা ওষ্ঠ বিশ্রামের স্থান, নাম যতি"। ১৮শ শতকের শেষের দিকে এলো ব্রাসি হ্যাল হেডের A grammar of the Bengali language (১৭৭৮)। এখানে তিনি একটি মূল্যবান কথা বলেচেন versification প্রসঙ্গে (পৃঃ ১৯৬)ঃ "The verses of the Bengalese are regulated by accent, and by the number of syllables in a line; no regard whatever being paid to quantity, but as it coincides with accent"। দু'টি উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ

—এক, বাঙলা ছন্দ accent অর্থাৎ প্রস্বন-নিয়ন্ত্রিত যেমন, তেমন অক্ষর-সংখ্যাত ; দুই, মাত্রার আলাদা অস্তিত্ব নেই, তবে এ accent-প্রসূত অর্থাৎ accentual quantity বা প্রস্বন-মাত্রিক। এই প্রস্বন দু'রকমের—একটি প্রস্বর (pitch) ; অন্যটি প্রচাপ বা বল। তবে ছন্দ অক্ষর-সংখ্যাত নয়। দ্বিতীয়ত, এই accent আর গুরুধ্বনি এক। যেটি ঠিক থাকে প্রত্যেক ছন্দ-বিভাগে তা হলো duration quantum বা ব্যাপ্তি পরিমাণ।[৪] এ ভাবেই ১৮শ শতক শেষ হলো।

১৯শ শতকে রামমোহন রায়ের ইংরেজি ও বাঙলা ব্যাকরণ উল্লেখ্য—Bengalee Grammar in the English Language (1826) ও 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ' (১৮৩৩)। এখানে অর্থাৎ বাঙলা ব্যাকরণে তিনি 'ছন্দ'কে সংজ্ঞিত করেচেন এ-ভাবেঃ "ছন্দঃ শব্দে তাহাকে কহি যাহার পাঠের দ্বারা পদ সকলের ধ্বনির পরস্পর লঘুগুরু ভেদে আনুপূর্বিক বিন্যাসের জ্ঞান হয়"। পরে লঘু-গুরু ভেদ নির্দ্দিষ্ট হয়েচে সংস্কৃত ছন্দশাস্ত্র অনুসারে। উল্লেখ্য হলো একটি পরিভাষা যার নাম "ধ্বন্যাঘাত"—এ সংখ্যায় নির্দ্দিষ্ট হয়েচে নিচের চরণদ্বয়ে, যথা,

১	২	৩	৪	৫	৬	৭
ডাক্	হাক্	ঢাক্	ঢোল্	মাল	সাট্	সার্।
১২৩	৪৫	৬৭	৮৯	১০১১১২		
বাকেতে	পর্বত	কিন্তু	কার্য্যে	তিলাকার।		

এরপরে নাম কর্তে হয় ভুবন মোহন রায় চৌধুরীর 'ছন্দঃ কুসুম' (১৮৬৪) এর—এ পদ্য ছন্দে বাঙলায় দিয়েচে সংস্কৃত ছন্দের পরিচয়। এ-দিক থেকে রামমোহনই প্রথম বাঙলা ছন্দের পরিচয় দিয়েচেন গদ্যে। পথিকৃৎ-এর সম্মান তাঁরি প্রাপ্য। পরবর্তী বই হলো মধুসূদন বাচস্পতির 'ছন্দোমালা' (১৮৬৮), যা তিনি তাঁর প্রিয় ছাত্র, রবীন্দ্রনাথকে উপহার দিয়েছিলেন। বর্ণিতব্য বাঙলা ছন্দের লক্ষণ এতে বিধৃত আছে।[৫] রামচন্দ্র কবিভারতী থেকে মধুসূদন বাচস্পতি পর্যন্ত প্রায় চারশো বছর হলো বাঙলা দেশে ছন্দ-উন্মেষের যুগ।

(খ) **বিকাশ পর্ব** ঃ বিংশ শতক হলো ছন্দ সমীক্ষার বিকাশের যুগ এবং এ শুরু হয় সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'ছন্দসরস্বতী' (১৯১৮)-তে। এতেই প্রথম ব্যাখ্যাত হয়েচে বাঙলা কবিতার কয়েকটি বিশেষ ছন্দ। কিছু কিছু মৌন উপাদান থাকলেও, এতে নেই বৈজ্ঞানিক আলোচনা। সমীক্ষা চলেচে প্রধানত কবির স্বকীয় বোধের ভিত্তিতে। তাই তিনি খেয়ালখুশি মতো পাঁচটি নাম দিয়েচেন—আদ্যাশ্রী ; হৃদ্যাশ্রী ; চিত্রশ্রী ; দৃপ্তশ্রী ; মঞ্জুশ্রী। প্রথম তিনটি হলো স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও লাচাড়ির নাম। দৃপ্তশ্রী 'ছন্দস্পন্দ' সৃষ্টি করেচে পার্শী, আরবী,

গ্রীক, রোমক প্রণালীতে অর্থাৎ দীর্ঘস্বর ও অক্ষর সংঘাতের বিন্যাসে। পুরো আর আধলা ওজনের অক্ষরে তৈরি হয়েচে মঞ্জুশ্রী। এর আগে অবশ্য ১৯১৬ সালে দশম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মেলনে রাখালরাজ রায় তিন প্রকার ছন্দের কথা বলেছিলেন —অক্ষম মাত্রিক ; মাত্রাবৃত্ত ও স্বরমাত্রিক। পরপর বেরোল বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রনাথের ছন্দ' (১৯২২), প্রবোধ চন্দ্র সেনের 'বাংলা ছন্দে রবীন্দ্রনাথের দান' (১৯৩১) ও অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়-এর 'বাংলা ছন্দের মূলসূত্র' (১৯৩২)। এঁদের মধ্যে শেষোক্ত বইখানি এক হিসেবে নতুনত্বের সন্ধান দেয় "পর্ব-পর্বাঙ্গ-বাদ" স্থাপনে। বস্তুত এ ছন্দের মৌল ভিত্তিতে প্রবেশ কর্তে চেষ্টা করেচে, কিন্তু পারেনি। এর কারণ অবশ্য ধ্বনি বিজ্ঞানের অজ্ঞতা আর ইংরেজি Beat-and-bar theory-র ঢালাও প্রয়োগ। কাজেই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের (পরিচয়, ১৩৪০ বৈশাখ) যুক্তিসহ নয় ঃ "অমূল্যধন বাংলা ছন্দের প্রকৃতি সম্বন্ধে যা বলেননি, তা বক্তব্যই নয়।" অমূল্যধন মেলাতে পারেননি তার 'বলবৃত্ত' ছন্দের স্বরসংখ্যা ; তাছাড়া তিনটি ছন্দের নামকরণও বিজ্ঞানসম্মত নয়। অধিকন্তু তিনি পদ, পর্ব ও মেলকে গুলিয়ে ফেলেচেন। তাই মোহিতলাল ঠিকই বলেচেন ঃ "বাংলা ছন্দের মূল সূত্ররূপে এই Bar and Beat তত্ত্বকে 'দণ্ড ও আঘাতের' মত আস্ফালন করিবার কোন হেতু নাই"[৬]। তবে প্রথম সত্যিকার ছন্দগ্রন্থ রবীন্দ্রনাথের 'ছন্দ' (১৯৩৬)। এখানে মৌলিক আলোচনা স্থান পেয়েচে। তাঁর এ গ্রন্থে (পৃঃ ১২৫) তিনি বলবৃত্তের যে-কথা বলেচেন তা খাঁটি কথা ঃ "প্রাকৃত ছন্দকে চার-চার সিলেব্‌ল্‌-এ ভাগ করাটা ঠিক মনে হয়না। এছন্দে তিনমাত্রার ভাগটাই মূলকথা"। তাছাড়া আছে সাধু ও প্রাকৃত বাঙলার পার্থক্য এবং ছন্দের চাল ও চলন-এর গুরুত্ব। বলা চলতে পারে এহলো ছন্দের আকরগ্রন্থ। কিন্তু এ-পর্যন্ত এই খনি থেকে কেউ-ই তেমন চেষ্টা করেননি হীরা তোলবার।

১৯৪০-এ বেরোল দিলীপ কুমার রায়ের "ছান্দসিকী"। পরে ১৯৬৮ এর দ্বিতীয় সংস্করণে তিনি প্রবোধ চন্দ্র সেনের "মূল ধারারই অনুবর্ণন" করেন এবং তারি স্বীকৃতি হিসেবে গ্রহণ করেচেন প্রবোধ চন্দ্রের ছন্দোনাম—দলবৃত্ত ; কলাবৃত্ত ; মিশ্রকলাবৃত্ত। ১৯৪৫-এ প্রকাশিত হয় প্রবোধচন্দ্রের 'ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ' এবং মোহিত লাল মজুমদারের 'বাংলা কবিতার ছন্দ'। শেষের বইখানিতে সাধু ও প্রাকৃত বাঙলা ছন্দের পার্থক্য নিরূপিত হয়েচে যেমন, তেমনি পদ ও পর্বের ভেদও। অধিকন্তু আছে অমিত্রাক্ষর ও ছড়ার ছন্দের (বলবৃত্ত) বিস্তৃত আলোচনা। এতে কিছু কিছু মৌলিক উপাদান আছে, যেমন বলবৃত্তে 'স্বর-বিস্ফোরণ' (explosion)। তবে implosion যাকে পাণিনি বলেচেন 'অভিনিধান' তার আলোচনা না থাকাতে এ বৈজ্ঞানিক হতে পারেনি। এরপরে তারাপদ ভট্টাচার্য্যের 'ছন্দোবিজ্ঞান' (১৯৪৮) প্রকাশিত হয়। কিন্তু এ বিজ্ঞান-ভিত্তিক

আলোচনা হয় নি। কেননা, এতে স্থান পায়নি ধ্বনিতত্ত্বের সিদ্ধান্তগুলি। 'ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন' (১৯৭১) তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত গ্রন্থ। তবে সুধীভূষণ ভট্টাচার্যের 'বাংলাছন্দ' (১৯৪৫) বলবৃত্তের সমালোচনায় কিছুটা এগিয়েচে সংগীতের সঙ্গে কাব্যছন্দের মিতালিতে। এরপরে আসে প্রবোধচন্দ্র সেনের 'ছন্দপরিক্রমা' (১৯৬৫-১৯৭৭)। এটি হলো গ্রন্থকারের সর্বশেষ পরিবর্তন। তিনি দাবি করেন : "এই গ্রন্থে ছন্দের উচ্চারণ জাত শ্রৌত প্রকৃতির সর্বাঙ্গীন পরিচয় দেবার প্রথম প্রচেষ্টা—বাংলা ছন্দ শাস্ত্রের শ্রৌত বিভাগের আদর্শ স্থাপনের ও প্রথম প্রচেষ্টা। বইটি ছন্দ সাহিত্যে অদ্বিতীয় এবং দিকপ্রদর্শক হিসাবে ইতিহাসে স্মরণীয়।"[৫] এ দাবি যে ঠিক নয়, তার প্রমাণ রয়েচে বর্তমান বইয়ের অর্থাৎ 'বাঙলা ছন্দোবিজ্ঞানে'র 'ধ্বনি তত্ত্বপর্বে'। হয়তো তাই প্রবোধ চন্দ্রের নিজের ও সংশয় প্রকাশ পেয়েচে : "কিন্তু বাংলা ছন্দের শ্রৌতশাস্ত্র রচনায় গ্রন্থকারের এই প্রচেষ্টা কতখানি সফল হয়েচে তা নিরূপনের সময় এখনও হয়নি। তা নিরূপিত হবে ভাবীকালে।"[৫] বৈজ্ঞানিক তথ্য তন্ময়, মন্ময় নয়। তবে বর্তমান কেন সে তথ্য যাচাই কর্তে পার্বে না, তা রহস্য-জনক বলে মনে হয়। অবশ্য তাঁর অক্লান্ত সাধনা সত্যি বিস্ময়কর এবং এ-বিষয়ে তিনি অদ্বিতীয়।

এরপরে নাম কর্তে হয় সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের। তিনি ছন্দোচিন্তার সম্প্রসারণ করেচেন তাঁর Origin and development of the Bengali language (১৯২৬, ১৯৭২), ছাত্রবোধ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৩৯), ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৪৫) ও সংক্ষিপ্ত ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৫৫) এ। বস্তুত শেষের গ্রন্থখানি-ই তাঁর সর্ব শেষ সিদ্ধান্তের পরিচায়ক-এতে আলোচনা অনেকটা বিজ্ঞান-ভিত্তিক হয়ে উঠেচে। নামগুলি মোটেই শ্রুতি সুখকর নয়—মিশ্র প্রকৃতির (স্বরবৃত্ত); বিস্তার প্রধান (স্বনবৃত্ত); ও বলপ্রধান (বলবৃত্ত)। প্রথমে বুদ্ধদল সংকুচিত ও প্রসারিত হয়, কিন্তু কেন হয় তার কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা নেই। রাজশেখর বসু ও 'বাংলা ছন্দের মাত্রা' (বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ কার্তিক) ও 'বাংলা ছন্দের শ্রেণী' (পরিচয়, ১৩৫২ কার্তিক) তে তাঁর চিন্তাধারার পরিচয় দিয়েচেন। মূলকথা তিনি বলেচেন; "ছন্দের ব্যঞ্জনা মুখে, ধারণা কাজে। মুখ আর কানের সাক্ষ্য নিয়েই সূত্র নির্ণয় করতে হবে।" আরো বলেচেনঃ "সাধারণত গুরুধ্বণি আর accent মিশে যায়"। ধ্বনি বিজ্ঞানের আলোচনা এখানে তেমন স্থান না পেলেও, বলবৃত্তের আলোচনা কিছুটা এগিয়েচে। রবীন্দ্রনাথের সিদ্ধান্ত অনুসরণ করে—"এই লক্ষণ মাত্রা পূরণের জন্য স্থানে স্থানে যুক্ত ধ্বনিকে টেনে গুরু করা।" আরো অনেকেই ছন্দ সম্পর্কে বই লিখেচেন, তবে তাঁদের উল্লেখ এখানে নিষ্প্রয়োজন, কেননা মৌলিক কোন চিন্তার খোরাক সেখানে নেই। গতানুগতিক ভুলই তাঁদের অনুসরণ করেচে।

IV. উপসংহার

রবীন্দ্রনাথের পরে ছন্দোসমীক্ষায় কিছু কিছু মৌলিকতার আভাস দিয়েচেন প্রবোধচন্দ্র, অমূল্যধন, মোহিত লাল ও সুধীভূষণ। এই পঞ্চজনেই স্থাপিত হয়েচে ছন্দ পঞ্চায়েত। তবে দুঃখের সঙ্গে স্বীকার করতে হয় যে এঁদের ছন্দ—আলোচনায় স্থান পায়নি ধ্বনিতত্ত্ব যা বৈদিক যুগেও প্রকাশ পেয়েছিল শিক্ষা ও প্রাতিশাখ্যে। এরি অভাবে মারাত্মক ভুল এসেচে বাঙলা ছন্দ-বিশ্লেষণে। এঁরা কেউ-ই বুঝতে পারেননি যে প্রস্বর (pitch) ও প্রচাপ (stress) আলাদা, প্রচাপ বা বলস্পন্দে মাত্রা দীর্ঘায়িত হয়, কালদৈর্ঘ্য বেড়ে যায় ব্যঞ্জন সংঘাতে এবং কেন শব্দমধ্য ও শব্দান্ত্য যুক্তাক্ষরের ধ্বনি সংকোচ ও ধ্বনি প্রসারণ ঘটে এবং আরো অনেক কিছু। বর্তমান বই ধ্বনি-তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে বাঙলা ছন্দকে বিজ্ঞান-ভিত্তিক করতে চেয়েছে। এদিক থেকে এ প্রথম পদক্ষেপ।

৮.২ অক্ষর বনাম দল

সম্প্রতি গোল উঠেচে 'অক্ষর' শব্দের ব্যবহার নিয়ে। বলা হয়েচে যে (Syllable) এর প্রতিশব্দ বাংলায় নেই এবং সেজন্য প্রয়োজন একটি পারিভাষিক শব্দের। দ্বিতীয়ত, এরি জায়গায় উদ্ভাষিত হয়েচে 'দল'।[৭] এ আলোচনার দাবি রাখে এবং একে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—এক, অক্ষর-সম্পর্কীয় ; দুই, 'দল'-বিষয়ক। অক্ষর সম্বন্ধে তিনটি আপত্তি তোলা হয়েচে। প্রথমত, "বাংলা বর্ণের কোন ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই ; তেমনি ইংরেজি syllable এর কোনো বাংলা বা ভারতীয় প্রতিশব্দ নেই। এই দুই শব্দ (syllable ও অক্ষর) অভিন্নার্থক নয়। একে অন্যের প্রতিশব্দ বলে গণ্য হতে পারে না"। দ্বিতীয়তঃ, "সংস্কৃত অক্ষর (অন্তত ছন্দোশাস্ত্রে) যার বাংলা অক্ষর ও সম্পূর্ণ অভিন্নার্থক নয়।" তৃতীয়ত, "সংস্কৃত অভিধানে, ব্যাকরণে ও ছন্দশাস্ত্রে অক্ষর ও বর্ণ অভিন্নার্থক বলে গণ্য হয়। আর দু'টোর অর্থ syllable এবং letter".

I. 'অক্ষরে'র বিরুদ্ধে

এবার প্রথম আপত্তির কথা। বর্ণ ও অক্ষরের ইংরেজি প্রতিশব্দ নেই, যেমন নেই ইংরেজি letter ও syllable এর প্রতিশব্দ। এ উক্তি ঠিক নয়। কেননা ঋগ্বেদে (১. ১৬৪. ৩৯) আছে syllable অর্থে অক্ষরের প্রয়োগ।

ঋচো অক্ষরে পরমে ব্যোমন্যাস্মিন্দে বা অধিবিশ্বে নিষেদুঃ,

এর অনুবাদ করেচেন R. T. H. Griffith : "upon what syllable of holy praise song, as 't were their highest heaven, the Gods repose them.[৮] ঋগ্বেদের (১. ১৬৪. ২৪) "চতুষ্পদাক্ষরেণ মিমতে সপ্তবাণীঃ" তে যে-অক্ষর শব্দটি আছে তার অনুবাদ Griffith করেচেন syllable

এবং এ সমর্থন করেছেন ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ঃ "with the *syllable* they measure out the seven i. e., the voices of the seven priests or the seven metres"[৯]। ঐতরেয় আরণ্যকে (২.২.২) ও syllable অর্থে 'অক্ষর' ব্যবহৃত হয়েছে ঃ তস্মাদক্ষর মিত্যাচক্ষত এতমেব সপ্তম"।

আবার letter অর্থে বর্ণ প্রযুক্ত হয়েছে ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (xxv.৭) ঃ "ত্রয়োবর্ণা অজায়ন্ত—অকার উকারো মকার ইতি"। ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এর ইংরেজি করেছেন ঃ "three sounds were born ঃ the letter a, the letter u, and the letter m"।[৯] A. B. Keith-ও উল্লেখ করেছেন যে কৌশীতকী ব্রাহ্মণে (xxxi .৫) 'পদ' ও 'বর্ণ' এর অর্থ যথাক্রমে 'word' ও 'letter'। পাণিনীয় "বর্ণ সামাম্নায়" এর ইংরেজি প্রতিশব্দ দিয়েছেন W. S. Allen ঃ "The Sanskrit alphabet"[১০]। এ থেকে বোঝা যায় যে 'বর্ণ' ও 'অক্ষর' এর ইংরেজি প্রতিশব্দ letter ও syllable।

দ্বিতীয় আপত্তি উঠেছে সংস্কৃত ও বাংলা অক্ষরএর বিভেদ নিয়ে। দেবনাগরী বর্ণমালা প্রথম সংস্কৃত ভাষার ধ্বনি নিয়ে গঠিত হয়েছিল। এখন সংস্কৃতের কয়েকটি ধ্বনি বাঙলা ভাষায় লোপ পেয়েছে সত্য ঃ কিন্তু ধ্বনিসূচক চিহ্ন অর্থাৎ বর্ণকে বাঙলা বর্ণমালা হতে বাদ দেওয়া হয়নি, যেমন ঋ, ৯, ণ, য। আবার সংস্কৃত ছিল না এমন কয়েকটি নতুন ধ্বনিও বাঙলায় এসেছে, অথচ এদের জন্য নতুন কোন বর্ণ গঠিত হয়নি। এসব ক্ষেত্রে পুরনো বর্ণ দিয়ে অথবা দু'টি বর্ণ মিলিয়ে নতুন ধ্বনি নির্দ্দিষ্ট হয়ে থাকে। যেমন, 'বাঁকা' এ=অ্যা বা এ্যা ; ড—এ বিন্দু 'ড়'। ফলে বাঙলা বর্ণমালায় ও ধ্বনিতে অর্থাৎ বাঙলা বানানে ও উচ্চারণে কিছুটা গরমিল আছে।[১১] এতে মূল বর্ণ-মালিক তত্ত্বের ব্যত্যয় ঘটেনি। তবে রবীন্দ্রনাথ ও যোগেশ চন্দ্র রায় স্বীকার করেছেন যে cat-এর a-উচ্চারণ অর্থাৎ 'এ্যা' বুঝাবার জন্যে প্রয়োজন একটি নতুন স্বরবর্ণের। রাজশেখর বসুর প্রস্তাব হলো ঃ

ab (act = a ক্ট, hat = হট)। রবীন্দ্রনাথ বর্ণ দু'টি পছন্দ করেছেন।[১২]

তাই বলেন W. D. Whitney ঃ "দেবনাগরী তত্ত্ব তথা অন্যান্য ভারতীয় লিখন পদ্ধতি আক্ষরিক (syllabic) ও ব্যঞ্জনাত্মক। অর্থাৎ এর লিখিত এককে ধরা হয় শুধুমাত্র ধ্বনি নয়, কিন্তু অক্ষর (syllable) এবং অধিকন্তু অক্ষরের সারাংশ হিসেবে স্বরপূর্ব ব্যঞ্জনও। এ থেকে দু'টি সূত্র পাওয়া যায় ঃ (ক) বর্ণমালিক পরিকল্পে প্রদত্ত স্বরবর্ণের রূপই কেবল ব্যবহৃত হয় যখন স্বরই স্বয়ং একটি অক্ষর (syllable) তৈরি করে অথবা পূর্ববর্তী ব্যঞ্জনের সঙ্গে যুক্ত হয় না অর্থাৎ যখন এ বসে আদিতে বা অন্য একটি স্বর থাকে এর পূর্বে। ব্যঞ্জন যুক্ত হলে প্রদর্শনের

অন্য পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়। (খ) যদি একাধিক ব্যঞ্জন স্বরের পুরোগামী হ'য়ে একটি একক অক্ষর (syllable) এ পরিণত হয়, তবে তাদের বর্ণগুলি মিলে একটিমাত্র যুক্তবর্ণ গঠন করে।"[১৩]

বলা হয়েছে যে "প্রাচীন ভারতীয় অক্ষর (হরফ) লিপিবিভাগ-সূচক, তাই অক্ষরের (হরফ) যুক্ত-অযুক্ত রূপের কথা মনে আসে। আর পাশ্চাত্য সিলেবল্ (syllable) উচ্চারণবিভাগ-সূচক, তাই যুক্ত-অযুক্তের প্রশ্ন মনে আসেনা।" বলা বাহুল্য এ বিশ্লেষণ গভীরে প্রবেশ করেনি, তাই এ বিচারসহ নয়। এখানে J. R. Firth এর উক্তি স্মর্তব্য, কেননা তিনি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য ধ্বনি বিজ্ঞানে বিশারদ। তিনি বলেনঃ "সংস্কৃতের জন্য ব্যবহৃত লিখন পদ্ধতি আক্ষরিক (syllabic) এবং সে ভাষায় ব্যবহৃত দেবনাগরী অক্ষরমালা (syllabary) ও ভারতের আধুনিক সংস্কৃত উপভাষায় ব্যবহৃত এর অন্যান্য রূপগুলি আজও ধ্বনিগত ও ধ্বনিতাত্ত্বিক উৎকর্ষের আদর্শ। শব্দ বিশ্লেষণ আক্ষরিক (syllabic) এবং সুস্পষ্টভাবে আক্ষরিক (syllabic) গঠনের প্রকাশ। এই কাঠামোর মধ্যে উচ্চারণ এমন কি ব্যঞ্জনের ধ্বনিবিজ্ঞান ও সম্পূর্ণভাবে সমালোচিত ও লিখনে উপস্থাপিত হতে পারে অক্ষর রোধকারী ছন্দোচিহ্নে। ধ্বনি মূলের ব্যবহার না করেও সংস্কৃতজ ভাষাগুলির জন্যে দেবনাগরী আক্ষরিক সংকেত দিয়ে আধুনিক ধ্বনিবিজ্ঞান, ধ্বনিতত্ত্ব ও ব্যাকরণের চাহিদা মেনে নিয়ে শব্দবিশ্লেষণকে আক্ষরিক ভিত্তিতে দাঁড় করান যেতে পারে। অবশ্য এ থেকে বাদ পড়ে ধ্বনিমূলের অন্তর্ভূত অক্ষর ও শব্দ। সংস্কৃতে আমরা পাই ধ্বনিভিত্তিক অক্ষরমালা এবং প্রতিটি বর্ণই অক্ষর-সূচক, যে অক্ষর (syllable) চরম, চিরস্থায়ী ও অবিনাশী"[১৪]

এবার যুক্তবর্ণের কথা চলিত বাঙলায় ধ্বনি মূলের সংখ্যা হলো আবশ্যক ৩৫টি ও অনাবশ্যক ৫টি। এরা আন্তর্জাতিক ধ্বনি বিজ্ঞান সংঘের (International Phonetic Association) সংকেতে প্রকাশক্ষম— p, b, t, d, ʈ, ɖ, k, g, c, ɟ, m, n, l, r, y, ʃ, s, ɦ, ŏ, ĕ, i, ɪ, e, ē, ae, ãe, a, ã, ə, ə̄, o, õ, u, ū, এবং f, v, F, ʋ, z এরি মধ্যে অনেক ধ্বনিমূলে আছে একাধিক ধ্বনি, যথা, n-ধ্বনিমূল l-ধ্বনিমূল ও ɦ-ধ্বনিমূল।[১৫] ধ্বনি

ও বর্ণ যে এক নয় তার প্রমাণ বাঙলার যুক্তবর্ণ। যুক্তবর্ণ রয়েচে প্রায় ২৫০টি ; কিন্তু যুক্ত ব্যঞ্জন (consonant cluster) শব্দের শুরুতে ৩৬টি, শব্দ মধ্যে ২৮টি। শব্দের আদিতে এই ৩৬টি ধ্বনির সংযুক্ততা অক্ষুন্ন থাকে। আবার শব্দ শেষে দোস্ত্, গোস্ত্, কার্ড, ব্যাংক প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী শব্দ ছাড়া বাঙলাতে কোন যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি নেই। কাজেই প্রশ্ন ওঠে শব্দমধ্য ব্যঞ্জনের উচ্চারণ নিয়ে। বাঙলা

লিখনে শব্দের মাঝখানে পাশাপাশি অবস্থিত দুটো ধ্বনি যুক্তবর্ণ নামে পরিচিত, যেমন—প্ত (সুপ্ত),—ক্ত (ভক্ত),—প্ন (স্বপ্ন) প্রভৃতি। দুটি ধ্বনির প্রথমটি স্পর্শধ্বনি হলে তার উচ্চারণ সংস্কৃত হলন্ত ব্যঞ্জনের মতো এবং তার আনুষঙ্গিক স্বরধ্বনি উচ্চারিত হয় না। পাণিনি প্রমুখ ধ্বনিবিদ্‌রা ব্যঞ্জন ধ্বনির এ-হেন উচ্চারণের নাম দিয়েচেন 'অভিনিধান'[১০]। এখানে স্পৃষ্টধ্বনির প্রথমটি তার উচ্চারণস্থান ও রীতি অনুসারে মুখবিবরের নির্দিষ্ট স্থানে বা ঠোঁটে ইংরেজি act (aekt), begged (begd) প্রভৃতি শব্দে k ও g ধ্বনির মতো গঠিত হয়, কিন্তু মুক্ত হয় না। ফলে তাদের উচ্চারকেরা (articulators) ধ্বনিটিকে তার স্বস্থানে গঠন ক'রে সেখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে ; কিন্তু তাকে পূর্ণরূপ দেবার জন্যে দ্রুত মুক্ত না হ'য়ে ঐ অবস্থায় থাকতে-থাকতে তার পরবর্তী ধ্বনির স্থান গ্রহণ করে এবং তার পূর্ণ রূপায়ণের জন্য তারা দ্রুত মুক্ত হয়ে যায়। এ-পরিবেশে প্রথম স্পর্শধ্বনিটি পরিমাণের (quantity) দিক থেকে কিছুটা দীর্ঘাকৃত হয়। যেমন পাগ্‌লা =পা+গ্‌+লা ; বাদ্‌শা=বা+দ্‌+শা। তবে 'মুশকিল' শব্দটি অন্য নিয়মের অধীন ঃ উষ্ম+অন্য ব্যঞ্জনধ্বনি। তাই মুশ্‌কিল=মুশ্‌+কিল। অর্থাৎ দুটি ব্যঞ্জনধ্বনির মধ্যকার প্রথমটি স্পৃষ্ট বা ঘৃষ্ট না হয়ে অন্য ধ্বনি হলে তারা স্বরহীন তথা হলন্ত অবস্থাতেও পূর্ণউচ্চারণ পায়, কিন্তু স্পৃষ্টধ্বনির মতো অতটা প্রচাপিত (stressed) বা পীড়িত হয় না। কাজেই 'বাদশা'র সঙ্গে 'মুশকিল' জুড়ে দেয়ায় এই পার্থক্য লোপ পেয়েচে।

আপত্তিকারক বলেচেন ঃ "যুক্তাক্ষর (যুক্তবর্ণ) স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত হয় না।" এ-উক্তি অবৈজ্ঞানিক। এখানে যুক্তবর্ণ ও যুক্ত ধ্বনির প্রভেদ লোপ পেয়েচে ; ফলে এ বেঠিক পথের নির্দেশ দিয়েচে। যুক্তবর্ণে লিখিত হলেও যে-সব ধ্বনি স্বতন্ত্রভাবেও উচ্চারকদের স্বতন্ত্র প্রয়াসে উচ্চারিত হয় তারা যুক্তধ্বনি নয়। অন্যপক্ষে নিশ্বাসের একই প্রয়াসে ও উচ্চারকদ্বয়ের সজোর পেশী সঞ্চালনে উচ্চারিত হলে তারা যুক্তধ্বনি রূপে পরিচিত হয়, যদিও তারা স্বতন্ত্র বর্ণ হিসেবে। ক্ত (কৃত) এবং 'প্ল-এই দুটি যুক্তবর্ণ বিশ্লেষণে এ স্পষ্ট হবে। 'ভক্ত' শব্দে 'ক্‌' ও 'ত' বর্ণ-চিহ্নিত ধ্বনি দু'টি যুক্ত, যেমন 'ক্ত' বা স্বতন্ত্র যেমন 'কৃত', তা সে যে কোন পদ্ধতিতে লিখিত হোক না কেন ; এরা উচ্চারকদের পেশী সঞ্চালনে উচ্চারিত হয়না। এরা 'sequential articulation' ঃ 'one-breath-articulation নয় অর্থাৎ ক্রমিক উচ্চারণ, কিন্তু এক-প্রয়াসী উচ্চারণ নয়। এখানে ক ও ত স্বতন্ত্র-এভাবে উচ্চারিত হয়। ক-ধ্বনিটি তার স্বরধ্বনি হারিয়ে 'অভিনিধান'-জাত উচ্চারণ পায় বলে তার উচ্চারকেরা পৃথক হয় না এবং বায়ুপথও উন্মুক্ত হয় না। কিন্তু 'প্লাবণ'-এ 'প্ল' ধ্বনিটি দুটি বর্ণের সাহায্যে লিখিত হলেও এবং তাদের পরস্পরের দু'টি স্বতন্ত্র উচ্চারণ স্থান থাকলেও তাদের উচ্চারকদের একটি সম্মিলিত সজোর

প্রয়াসেই তারা উচ্চারিত হয় ; তাই একটি মিলিত দ্যোতনা শোনা যায়। 'প্ল' ধ্বনি সংগঠনে এবং উচ্চারণে 'প' এর জন্যে দু'টি ঠোঁট এবং 'ল' এর জিভের ডগা একই সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে। এ হ'লো এক-প্রয়াস-জাত ধ্বনি।[১৬]

এখন তৃতীয় আপত্তির কথা ঃ অক্ষর ও বর্ণ অভিন্নার্থক। এতে বাচস্পত্য অভিধানের উক্তির আশ্রয় নেয়া হয়েচে ঃ "অক্ষরং বর্ণ নির্মানং, বর্ণমপ্যক্ষরং বিদুঃ।" আপত্তিকারক এর অর্থ করেচেন যে, "সিলেব্‌বল্‌ এর প্রতিশব্দ বর্ণনির্মাণ, যদিও বর্ণ বল্‌তেও অক্ষর বুঝায়"। এ ব্যাখ্যা ত্রুটিপূর্ণ। কেননা অভিধানকারের উক্তির এ হয়েচে অপব্যাখ্যা। এখানে লক্ষ্য কর্তে হবে কি-ভাবে ঘটবে 'অক্ষর' ও 'বর্ণের' সন্নিধি প্রথম ভাগে ও দ্বিতীয় ভাগে। দেখা যাচ্ছে প্রথম ভাগে অক্ষর আগে, বর্ণ পরে অর্থাৎ কারণ-এর পরেই কার্য। এর অর্থ হলো এই যে অক্ষরই বর্ণ নির্মাণের কারক ঃ আগে ধ্বনি পরে তার বর্ণ-রূপায়ণ। দ্বিতীয় ভাগে 'বর্ণ' আগে 'অক্ষর' পরে অর্থাৎ বর্ণই কারক অক্ষরের। এর অর্থ হলো বর্ণ অক্ষরের প্রতিরূপ বা প্রতিবিম্বন। কাজেই বর্ণ ও অক্ষর এক নয়।

প্রসঙ্গত বিভিন্ন বৈয়াকরণ ও ছান্দসিকদের মতামত তুলে ধরা হয়েচে এই কথা ব্যক্ত কর্তে যে অক্ষর আর syllable এক নয়। এখানে স্মর্তব্য যে মূল নীতির আলোচনাই মুখ্য, ব্যক্তির মতামত নয়। ব্যক্তিকে বাদ দিয়ে ধ্বনি তত্ত্বের শরণ নেয়াই কাম্য। ধ্বনিতাত্ত্বিক আলোচনায় এটা প্রমাণিত হয়েচে যে syllable এর প্রতিশব্দ অক্ষরই এবং এ চলে এসেচে বৈদিক যুগ থেকে। দ্বিতীয়ত, পাশ্চাত্ত্য ভাষাবিদেরাও অক্ষর-এর প্রতিশব্দ হিসেবে syllable কে গ্রহণ করেচেন। তাই মীমাংসিত তত্ত্বের পুনর্মীমাংসার প্রয়োজন নেই ঃ পরিভাষা যখন সঠিকভাবে নির্ধারিত হয়ে আছে, তখন কেঁচে গণ্ডূষ করার সার্থকতা নেই। এ পণ্ডশ্রমই বটে, যদিও আছে কিঞ্চিৎ আত্মশ্লাঘার আভাস ঃ "ওই যে বে-নজির ও বেয়াড়া খুদে শব্দটা (অর্থাৎ syllable এর প্রতিশব্দ 'দল') সমালোচকের তর্জনী কম্পনে ভীত হয়ে আপন দখল ছেড়ে পালাবে এমন কোন লক্ষণ এখনও দেখা যাচ্ছে না।"

II. 'দল' এর সপক্ষে

আপত্তিকারক 'অক্ষর'-কে নস্যাৎ করে তার জায়গায় আমদানি করেচেন 'দল'। এর কারণ তিনি দিয়েচেন প্রধানত তিনটি। প্রথমত, "ভারতীয় মনে open-closed নির্বিশেষে syllable এর কোন 'প্রত্যয়' ছিল না ; তাই ভারতীয় ভাষায় সিলেবল্‌-বোধক শব্দের কোন নজির থাকাই সম্ভব নয়"। দ্বিতীয়ত, 'দল'—শব্দের দ্ব্যর্থহীনতা। তৃতীয়ত, "দল—শব্দের ধাতুগত খণ্ড-অর্থ বজায় রেখে এবং শব্দের উচ্চারণ বিভাগ অর্থ গ্রহণ করে এই শব্দটির উপরে পারিভাষিকতার

আরোপ"। দেখা যাক এ-সব যুক্তিসহ কিনা। প্রথম কারণের আলোচনা আগেই করা হয়েচে। ভারতীর মনে open-closed syllable-এর 'প্রত্যয়' ছিল না—এ-উক্তি ঠিক নয়, কেননা এ অজ্ঞতা-প্রসূত। সংস্কৃতে স্বরধ্বনি হ্রস্ব-দীর্ঘ আর অক্ষর লঘু-গুরু। তাই তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ও ত্রিভাষ্যরত্ন (xxii. ১৪) এ বলা হয়েচে—

যদ্ব্যঞ্জনান্তং যদু চাপি দীর্ঘং সংযোগ পূর্বং চ তথানু নাসিকম্।
এতানি সর্বানি গুরূনি বিদ্যাচ্ ছেষান্য তো হ্ন্যানি ততো লঘূনি ॥

অর্থাৎ ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর, দীর্ঘস্বরান্ত, ব্যঞ্জনপূর্ব ও আনুনাসিক এরা সবাই গুরু, অন্যরা লঘু। তাই W. D. Whitney মন্তব্য করেচেন ঃ "অক্ষরের (syllable) লঘু গুরু প্রভেদ ছান্দসিক দৃষ্টি কোণ থেকে মূল্যবাণ। হ্রস্ব-দীর্ঘ গুণ আছে কেবল স্বরধ্বনিতে এবং সহগামী ব্যঞ্জন এতে মিশে গিয়ে এর স্বাভাবিক পরিমাণের অংশীদার হয়।"[১৭] Whitney আরো বলেচেন ঃ "ছন্দের প্রয়োজনে, অক্ষর (স্বর নয়) কে বৈয়াকরণগণ গুরু বা লঘু ভেদে ভাগ করেচেন। অক্ষর গুরু হয় যদি এর স্বর হয় দীর্ঘ অথবা হ্রস্ব এবং থাকে পরে একাধিক ব্যঞ্জন। অনুস্বার ও বিসর্গ ও পূর্ণ ব্যঞ্জন গুরু অক্ষর গঠন করে। পাদের শেষ অক্ষরকে গুরু বা লঘু ধরা হয়।"[১৩] এ-প্রসঙ্গে W. S. Allen এর Phonetics in ancient India (1953 pp. 79-83) এর Syllable structure ও Syllabic division দ্রষ্টব্য। সিদ্ধেশ্বর বর্মার সুচিন্তিত অভিমত হলো এই ঃ "ভারতীয় বৈয়াকরণদের স্বরভিত্তিক অক্ষরের (syllable) ধারণা সামগ্রিক ভাবে নিখুঁৎ। এ নিঃসন্দেহ যে ব্যঞ্জন ও পর্যাপ্ত উচ্চারিত প্রাধান্যে হলে হয়ে যায় স্বতন্ত্র অক্ষর। কেননা, অক্ষরের ভিত্তি হলো প্রাধান্য শুধুমাত্র অনুরণন নয়। এ-প্রাধান্যের আছে তিনটি উপাদান, যথা, দৈর্ঘ্য, শ্বাস-চাপ ও অনুরণন।"[১৮]

বাঙলা অক্ষরের প্রকৃতিও দু'প্রকার—মুক্ত (open), যথা আ, আ। টা প্রভৃতি ; এবং বদ্ধ (closed), যেমন বাক্, সন্। ধান। অর্থাৎ বাঙলা শব্দ মুক্তাক্ষর (open syllable) ও বদ্ধাক্ষর (closed syllable) নিয়ে গঠিত হয়। কাজেই open-closed এর পার্থক্য নেই এ-কথা বলা চলে না। শব্দগঠন একাক্ষরিক থেকে সপ্তাক্ষরিক হতে পারে। নিচে উদাহরণ দেয়া হলো—

(১) একাক্ষরিক শব্দ—যথা, এ ; গায়।

(২) দ্ব্যক্ষরিক শব্দ—যথা, জা। তি ; পা। ঠান্।

(৩) ত্র্যক্ষরিক শব্দ—যথা, এ। খা। নে ; প। রাক্। ক্রম্।

(৪) চতুরাক্ষরিক শব্দ—যথা; ধব। নি। গ। ত ; সং। যুক্। ত। তা।

(৫) পঞ্চাক্ষরিক শব্দ—যথা ধব। নি। সং। শ্লিষ্। ট ; অ। ভি। ধান্। লব্। ভ্য।

(৬) ষষ্ঠাক্ষরিক শব্দ—যেমন, অ। প। নির্। বা। চি ত।

(৭) সপ্তাক্ষরিক শব্দ—যেমন, অ। ন। তি। প। রি। চিত।[১৬]

এবার 'দল'—শব্দের দ্ব্যর্থহীনতা। আপত্তি কারক স্বীকার করেচেন যে 'দল'—শব্দের আদিম অর্থ 'খণ্ড'। তাই বীজের বা ফুলের দল বল্‌লে বুঝায় তার একেকটি ভাগ, রূঢ়্যর্থে বীজপত্র বা পাপড়ি। দ্বিতীয় অর্থ হলো গাছের পাতা, যেমন বিল্বদল। তৃতীয়ত, এতে বুঝায় অস্ত্রের ফলা, যথা অসিদল। চতুর্থত, এতে বুঝায়, গাছের ছাল, যেমন বাচস্পত্য অভিধানের 'দল নির্মোক'। এই যখন 'দল' শব্দের অবস্থা, তখন একে দ্ব্যর্থতাহীন বল্‌লে সত্যের অপলাপ করা হয়। কাজেই অক্ষর-কে যদি দ্ব্যর্থক বলা যায়, তবে দলও ঐ একই দোষে দুষ্ট এবং দোষ অরো বেশি। অতএব 'দল'—শব্দটি সুপ্রযোজ্য নয় এবং এতে বিভ্রান্তির সৃষ্টি অনিবার্য। এ থেকে মুক্তির জন্যে এতে "পারিভাষিকতা" আরোপিত হয়েচে। অক্ষর-কে যোগরূঢ় করলেও চল্‌তে পারে। আর তাতে নতুন শব্দের প্রয়োজনও নেই। ফলে 'দল'-শব্দে পারিভাষিকতার আরোপ ধোপে টেকে না, কেননা এতো যে কোন শব্দে হতে পারে।

III. কথা শেষ

Syllable কে 'অক্ষর' না বলে 'দল' বলায় প্রকাশ পেয়েচে ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বীয় জ্ঞানের অভাব। একদিকে ভারতের ঋগ্বেদ প্রাতিশাখ্য, তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য ও ত্রিভাষ্য রত্ন উপেক্ষিত হয়েচে। অন্যদিকে তেমনি বাদ পড়েচে পাশ্চাত্য সমালোচনা, যথা, Allen এর Phonetics in ancient India, J. R. Firth এর Sounds and Prosodies প্রভৃতি এবং প্রাচী-প্রতীচীর সমন্বয় কারক S. Varma র Critical studies in the phonetic observations of Indian Grammarians। ধ্বনিবিজ্ঞান (phonetics) এর অন্তর্ভুক্ত হলো ধ্বনির উচ্চারণ ও গড়ন, ধ্বনির শ্রুতি এবং ধ্বনির শুদ্ধ ও অশুদ্ধ উচ্চারণ সম্পর্কীয় তথ্য-উদ্‌ঘাটন। এ-ছাড়াও আছে ভাষার ধ্বনি নির্মাণের সোপান নির্ণয়। এরি সহায়তায় ভাষার ধ্বনি সমষ্টির উচ্চারণ পরীক্ষা করে স্বতন্ত্র অর্থ বোধক ধ্বনিমূল (phonemes) এর আবিষ্কার এবং তার অবস্থান ও ব্যবহার বিধির বর্ণনা পড়ে ধ্বনি তত্ত্ব বা phonology র অনুশীলন।[১৬] এরা উপেক্ষিত হয়েচে, তাই স্থান পয়েচে ব্যক্তির মতামত। দলে ব্যক্তি-প্রাধান্য জয়ী হয়েচে বিজ্ঞান প্রাধান্যের জায়গায়। এ-দৃষ্টি বিজ্ঞানসম্মত নয় অর্থাৎ অবৈজ্ঞানিক।

এরি ফল হিসেবে টেনে আনা হয়েচে রামমোহনের "ধ্বন্যাঘাত"-কে, শ্যামাচরণের compound letter ও syllable কে, মধুসূদনের double syllable কে, দ্বিজেন্দ্রলালের "মাত্রা"-কে, সত্যেন্দ্রনাথের "শব্দ-পাপড়ি"—কে,

রাখাল রাজের "সুর"-কে, রাজ শেখরের "ধ্বনি"-কে এবং কালিদাসের "পদ্যাংশ"-কে। এর কোন প্রয়োজন নেই, কেননা syllable এর প্রতিশব্দ 'অক্ষর' কিনা তার বিচার হবে ধ্বনি বিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্বের নিরিখে, কোন ব্যক্তির অভিমতে নয়। "দল"—এর অনুগামীদের দিয়ে দল গঠন চলতে পারে। কিন্তু syllable-এর প্রতিশব্দ নৈব নৈব চ। অথচ বলা হয়েচে ঃ "দল শব্দটি বাংলায় সিলেবল্ অর্থেই রূঢ় হয়েছে"। এ তথ্যের বিকৃতি ছাড়া কিছু নয়। প্রথমত, শব্দের শ্রেণী বিভাগে "রূঢ়" বলে কিছু নেই, কথাটি "রূঢ়ি"। যে শব্দের মুখ্য বা ব্যবহারিক অর্থতার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ থেকে ভিন্ন, নিরপেক্ষ, অর্থাৎ কেবল ব্যুৎপত্তি ধ'রে যে শব্দের অর্থবোধ হয় না, সেরূপ শব্দকে বলে "রূঢ়ি", যেমন হস্তী, জ্যাঠামো ইত্যাদি।[১৯] কাজেই "দল" "রূঢ়ি" নয়। সুতরাং আপত্তিকারকের উক্তিটি ভুল। এরি তুলনায় "অক্ষর" শব্দটি "যোগরূঢ়" অর্থাৎ কিনা এর ব্যবহারিক অর্থ ব্যুৎপত্তি গত অর্থ থেকে সংকুচিত বা বিশিষ্ট। ফলে যা কিছু অবিনশ্বর তাকে 'অক্ষর' বললেও, যোগরূঢ় শব্দ 'অক্ষর'-এ বুঝায় syllable-কে। তাই তো মহাভাষ্যকার বলেন ঃ "অক্ষরম্ ন ক্ষরম্ বিদ্যাৎ—ন ক্ষীয়তে ন ক্ষরতীতি বাক্স্বরম্"।[১০] দ্বিতীয়ত 'দল'-কে 'রূঢ়' বলে চালানোর পিছনে রয়েচে রমেশ চন্দ্রের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের উপদেশ ঃ "তুমি যাহা লিখিবে তাহাই ভালো বাঙ্গালা হইবে এবং লোকে তাহাই গ্রহণ করিবে"। এই প্রসঙ্গে আধুনিক লেখকদের প্রতি সুনীতি কুমারের উক্তি স্মরণীয় ঃ "অনেক লেখক-ই ভাষা-শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন। ভাষার প্রয়োগ সম্বন্ধে নিরঙ্কুশ। তাঁহাদের ভাবটা এইরূপ—দয়া করিয়া তাঁহারা মাতৃভাষায় পদার্পন করিয়াছেন। তাঁহারা যাহা লিখিবেন লোকে তাহাই মাথা পাতিয়া লইবে।"[১৯]

এখানে স্মর্তব্য যে বিজ্ঞান খেয়ালখুশি মতো শব্দের বা নিয়মের পরিবর্তন করেনা। শক্তি ও ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্রাবলী (law of conservation of energy and momentum) আজও রয়েচে অপরিবর্তিত। এর প্রয়োগ সম্ভব হয়েচে Sir J. Chadwick এর পক্ষে ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে নিউট্রন (neutron) এর আবিষ্কার।[২০] ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে Bothe ও Becker আল্ফা কণিকা (particles) দিয়ে বেরিলিয়ামের (beryllium) বিস্ফোরণ ঘটিয়ে মনে করেন যে গামা বিকিরণ (radiation) পাওয়া গেচে নিচের নিউক্লিন বিক্রিয়া (nuclear reaction) অনুসারে ঃ

$$\underset{4}{9\,\mathrm{Be}} + \underset{2}{4\,\mathrm{He}} \rightarrow \underset{6}{(13\mathrm{C})} \rightarrow \underset{6}{13\mathrm{C}} + h\nu \cdots (33a)$$

কিন্তু এ-সিদ্ধান্ত সনাতন শক্তি ও ভরবেগসংরক্ষণ পরিপন্থী। তাই Chadwick গামাবিকিরণ প্রকল্প পরিহার করে গ্রহণ করেন শূন্য আধানের (zero

charge) এক মৌল কণিকা। আর এ পরিচিত হলো 'নিউট্রণ' বলে ঃ ফলে উপরের সমীকরণটি রূপান্তরিত হলো এ-ভাবে—

$$ {}^{9}_{4}\mathrm{Be} + {}^{4}_{2}\mathrm{He} \rightarrow ({}^{13}_{6}\mathrm{C}) \rightarrow {}^{13}_{6}\mathrm{C} + {}^{1}_{0}\mathrm{n} \quad \cdots\cdots(33b) $$

প্রায় চার হাজার বছর ধরে 'বর্ণ' ও 'অক্ষর' চলে আস্চে letter ও syllable বুঝাতে। কাজেই এরা হয়েচে যোগরূঢ়। এর নড়বড় করে 'বর্ণে'র জায়গায় 'অক্ষর' এনে এবং 'অক্ষরের' জায়গায় 'দল' আমদানি করা বাহুল্য দোষে দুষ্ট। এখানে বিশ্বনিয়মের সূত্রটি মনে রাখতে হবে ঃ 'যতই এর পরিবর্তন ঘটে ততই এ রয়ে যায় একই জিনিস।[২১] তাই 'অক্ষর' অক্ষরই থাকুক, তাকে 'দলা'ঘাতে ক্ষয় করার কোন প্রয়োজন নেই।

৮.৩ ছন্দোরীতি ও মাত্রা

ছন্দের মুখ্য বিষয় হলো এর রীতিভেদ ও মাত্রাবিচার। এদের আলোচনা কয়েকটি বিশেষ ভাগে করা হলো—

I. নামবিচার

ছন্দের তিন রীতি, যথা স্বরবৃত্ত, ধ্বনবৃত্ত ও বলবৃত্ত। এদের পরিচিতি আগেই দেওয়া হয়েচে (৭.১) ও (৭.৩)-এ। মাত্রা সম্পর্কেও ব্যাখ্যা আছে (৬.৩) এর (১৬) সংখ্যায় অর্থাৎ 'মাত্রা' বিষয়ক আলোচনায়। 'মাত্রা'কে কেন 'কলা' বলা যায় না তাও দেখান হয়েচে।

II. ছন্দোরীতির চলন ও মাত্রা

ছন্দের আবর্তনে দুটি অঙ্গ আছে—একটি বড়ো গতি ; অন্যটি ছোটো গতি। অর্থাৎ কিনা চাল ও চলন—প্রদক্ষিণ এবং পদক্ষেপ। প্রথমটির নাম চরণ, যেখানে প্রদক্ষিণ শেষ হয়। দ্বিতীয়টি হলো কখনো পদ, কখনো পর্ব, কখনো বা মেল-এরা পদক্ষেপের পরিচায়ক। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "ছন্দের পরিচয়ের মূলে দুটি প্রশ্ন আছে। এক হচ্ছে তার প্রত্যেক পদক্ষেপে ক'টি করে মাত্রা আছে। দুই হচ্ছে, সে মাত্রা সম, অসম, না বিষম অথবা সম-বিষমের যোগ। আমরা যখন মোটা করে বলি, এটা চৌদ্দ মাত্রার ছন্দ, ওটা দশ মাত্রার তখন আসল কথাটাই বলা হয় না। তার কারণ চাল অর্থাৎ প্রদক্ষিণের মাত্রায় ছন্দকে চেনা যায় না, চলন অর্থাৎ পদক্ষেপের মাত্রায় তার পরিচয়।"[২২] কাজেই ছন্দোরীতি নিরূপণে দু'টি জিনিসের প্রয়োজন—এক চলন লক্ষণ ; দুই মাত্রাসূত্র। এবার এদের পরিচিতি—

(ক) **চলন লক্ষণ**

উচ্চারণে নিরূপিত হয় চরণ। এখানে আছে এর ত্রিধা রকমফের—দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত। এ আগেই আলোচিত হয়েচে (৪.৫)-এ। গোটা চরণ কয়েকটি শ্বাস মেলে ভাগ হয়ে যায় এ-উচ্চারণে। আর এ-ভাগেরও আছে তিনটি রকম—পদ, পর্ব, মেল। যেহেতু বিভাজন ঘটে শ্বাসের বিশ্রামে, তাই ভাগগুলিও তিনপ্রকারের—ছেদ ; যতি ; বিরাম। গতি ও যতি চরণের নির্ধারক অর্থাৎ ছন্দের বেলায় এরা যথাক্রমে একেকটি যুগল পদ-ছেদ, পর্ব-যতি ও মেল-বিরাম। এদের পরিচয় আগেই দেওয়া হয়েচে (৫.৩) ও তিন (৫.৪)—এ।

(১) **ব্যাপ্তি পরিমাণ**

(i) **দুই ও তিনের লীলা**

চরণের পদক্ষেপে অর্থাৎ পদ, পর্ব ও মেল-এ কতটা মাত্রা আছে এবং এদের বিন্যাস বা সমবায় জানারও প্রয়োজন। বস্তুত এখানেই প্রকাশ পায় পদক্ষেপ বা চলনের মাত্রা পরিমাণ। প্রতিটি পদে, পর্বে ও মেল-এ আছে একেকটি নির্দিষ্ট কাল বা ব্যাপ্তি পরিমাণ (duration quantum)। মাত্রা বিন্যাস ঘটে এরি পরিপ্রেক্ষিতে। মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথের স্মরণীয় উক্তিটি : "ধ্বনির দুই মাত্রা এবং তিন মাত্রা বাংলা ছন্দের আদিম এবং রূঢ়িক উপাদান। বলা যায় দুই এবং তিন সংখ্যাই বাংলার সকল ছন্দের মূলে। তারপরে এই দুই এবং তিনের যোগে যোগিক মাত্রার ছন্দের উৎপত্তি। চলিত ভাষার কাব্য, যাকে বলে ছড়া, তাতে বাংলার হসন্ত সংঘাতের স্বাভাবিক ধ্বনিকে স্বীকার করেছে। কিন্তু সাহিত্যিক কবুলতি পত্রে সাধু ভাষার অক্ষর এবং মাত্রা এক পরিমাণের—এই মাত্র রক্ষা হয়েছে যে সাধুভাষার পদ্য উচ্চারণ কালে হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে গায়ে লেগে যাবে না। অর্থাৎ বাংলার স্বাভাবিক ধ্বনির নিয়ম এড়িয়ে চলতে হবে।"[২২] তাই মধুসূদনের 'জুড়াই এ কান আমি ভ্রান্তির ছলনে', 'কান' আর 'আমি' এবং 'ভ্রান্তির' 'ছলনে' হসন্তের রীতিতে হওয়া উচিত ছিল যুক্তশব্দ, কিন্তু সাধু ছন্দের নিয়মে ওদের জোড় বাঁধতে বাধা দেওয়া হয়েচে। অপর পক্ষে ছড়ার ছন্দে যেমন 'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা মধ্যিখানে চর' এ যুক্তশব্দ এসেচে হসন্তের টানে, যথা 'এ পার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা'।

চরণের লয় দুই ও তিনের বিন্যাসে গড়ে ওঠে। আর এ-বিন্যাস হতে পারে তিনভাবে—প্রথমত দুই ও দুয়ের গুণকে অর্থাৎ ২, ২×২, ২×৩, ২×৪, ২×৫ প্রভৃতিতে ; দ্বিতীয়ত তিন ও তিনের গুণকে অর্থাৎ ৩, ৩×২, ৩×৩, ৩×৪ প্রভৃতিতে ; আর তৃতীয়ত, দুই ও তিনের মিশ্রণে অর্থাৎ ২+৩, ৩+৪ (২×২). ২+৩+৪ (২×২) প্রভৃতিতে। প্রথমটিকে বলা যায় সমচলনের ছন্দ।

দ্বিতীয়টিকে অসম চলনের ছন্দ ; আর তৃতীয়টিকে বিষম চলনের ছন্দ।[২২] এদের উদাহরণ যথাক্রমে স্বরবৃত্তের পয়ার জাতীয় ছন্দ অর্থাৎ এ পদচারী এবং এদের মাত্রা সংখ্যা ৬, ৮ ও ১০ এ সীমাবদ্ধ ; স্বনবৃত্তের পর্ববিহারী ও বলবৃত্তের মেলগামী ছন্দগোষ্ঠী। এখানে লক্ষণীয় যে স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্ত মাত্রা সাম্যের দিক থেকে অসম ও বিষম চলনের ছন্দের মধ্যে পড়ে। তাই অনেক সময়ে এদের পার্থক্য নির্ণয়ে অনেকে ভুল করেন। কিন্তু এদের মৌল বিভেদ ফুটে উঠেচে এদের বিশিষ্ট নামে—একে স্বনের প্রাধান্য, অন্যে বলের প্রাবল্য। আর বল ও স্বন এক নয়। পর্ব পদ থেকে ক্ষুদ্রতর বলেই এর মাত্রা সংখ্যা পদের মাত্রা সংখ্যা লঙ্ঘন করে না অর্থাৎ এ সাধারণত ৩, ৫, ৬, ৭, ও ৯ মাত্রার হয়। অপর দিকে মেল এর ব্যাপ্তি পরিমাণ দুই ও তিনের হয় অর্থাৎ ৪ ও ৬ মাত্রার—বলই এদের নিরূপক।

(ii) যুক্তধ্বনি ও হসন্ত

এবার অক্ষরের, বিশেষ করে যুক্তাক্ষর ও হসন্তের মাত্রা বিচারের সূত্র। অর্থাৎ এরা ত্রিধা ছন্দে—স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত, বলবৃত্ত-এ-কি-ভাবে মাত্রায় রূপান্তরিত হয় তার সূত্রনির্ধারণ। এখানে স্মর্তব্য যে যুক্তাক্ষর (দু'টি ব্যঞ্জন ধ্বনি) যুক্ত একটি বর্ণে লেখা হতে পারে আবার বিযুক্ত বর্ণদ্বয়েও। 'ভক্ত' শব্দে 'ক' এবং 'ত' চিহ্নিত ধ্বনি দু'টি যুক্ত যেমন 'ক্ত', বা স্বতন্ত্র যেমন 'কৃত'। আর হসন্ত দেখা দেয় বিযুক্তরূপে। এখানে যুক্ত বা বিযুক্ত যেভাবেই এরা লিখিত হোক না কেন, এরা একশ্বাসে উচ্চারিত ধ্বনি নয়। কিন্তু যুগ্মধ্বনি যুক্তাক্ষর নয়। অর্থাৎ এরা 'ক্রমিক উচ্চারণ' (sequential articulation), 'শ্বাসৈক উচ্চারণ' (one breath articulation) নয়। তাই 'ক্' ও 'ত' পৃথকভাবে উচ্চারিত হয়, যদিও যুক্তবর্ণে (ক্ত) লিখিত। তবে শব্দ মধ্যে 'ক্' ধ্বনিটি তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি বিবর্জিত অবস্থায় অসম্পূর্ণভাবে 'অভিনিধান'-জাত উচ্চারণ পায় বলে তার উচ্চারকেরা পৃথক হয় না ; ফলে বায়ুপথও উন্মুক্ত হয় না। কিন্তু 'প্লাবন' শব্দের 'প্ল' ধ্বনিটি দু'টি বর্ণের (প+ল) সাহায্যে লিখিত হলেও এবং তাদের দু'টি স্বতন্ত্র উচ্চারণ স্থান থাকলেও তারা উচ্চারকদের একটি সজোর প্রয়াসেই উচ্চারিত হয়। অর্থাৎ প-এর জন্য দু'টি ঠোঁট এবং 'ল'-এর জন্যে জিভের ডগা একই সঙ্গে সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'প'-উচ্চারণে ঠোঁট দু'টি আবদ্ধ হতে না হতেই 'ল'-এর জন্য জিভের ডগা দন্তমূলে সন্নিকৃষ্ট হয় এবং সেই মুহূর্তেই ঠোঁট দু'টি আল্‌গা হ'য়ে যাওয়ার ফলে একটি মিলিত ধ্বনির উৎপত্তি হয়। প্রক্রিয়াটি এতদ্রুত নিষ্পন্ন হয় যে ধ্বনি দু'টির উচ্চারণের পারম্পর্য অনুভব করা শক্ত। কাজেই এ হয়ে ওঠে শ্বাসৈক উচ্চারণ, ক্রমিক উচ্চারণ হয়। অর্থাৎ যুক্তধ্বনি ও যুক্তবর্ণে লিখিত, কিন্তু বিযুক্ত বর্ণে লিখিত যুগ্মধ্বনি নয়।[১৩] তাই যুক্ত বা বিযুক্ত ব্যঞ্জনের লীলায় নেই ছন্দো-

বৈচিত্র্য ও মাত্রার তারতম্য। আবার এ-লীলায়ন প্রভাবিত হয় প্রস্বর, প্রচাপ ও প্রস্ফুটনে যার কথা বলা হয়েচে (৫.৩)-এ।

(২) ধ্বনি বৃত্ত

প্রত্যেক ধ্বনিরই রয়েচে একটি বৃত্ত আর এই বৃত্তকে কেন্দ্র করেই ধ্বনি রচনা করে তার আপন বিহার ক্ষেত্র। মনে রাখতে হবে যে সব ধ্বনি ভাষার সব শব্দ তৈরি কর্তে পারে না। এ কাজ বর্তায় কতিপয় ধ্বনির উপর। তারাই মিলে তৈরি করে শব্দাবলী। তবে একই ধ্বনি সর্বত্র ব্যবহৃতও হয়না অর্থাৎ আদি, মধ্যে ও অন্তে। আর ব্যবহৃত হলেও তাদের উচ্চারণের তারতম্য ঘটে পরিবেশ অনুসারে। এবার স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির অবস্থানের কথা ঃ

(i) স্বরধ্বনির অবস্থান—স্বনধ্বনি চার প্রকারের ঃ মৌলিক ; দ্বৈতস্বরধ্বনি—নিয়মিত ; দ্বৈত স্বরধ্বনি—অনিয়মিত ; ও অর্ধস্বর।

(১) মৌলিক স্বরধ্বনি ৮টি—ই ; এ ; এ্যা ; আ ; অ ; ও ; অভিশ্রুত ও' ; উ। এরা আদি, মধ্য ও অন্তে অবস্থিত হতে পারে এবং ফলে উচ্চারণেরও তারতম্য ঘটে। বাঙলায় প্রতিটি ব্যঞ্জনের অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি হলো 'অ'। শব্দশেষে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে এটি উচ্চারিত হয় না ; সাধারণত ও-তে পরিণত হয়। লক্ষণীয় যে 'এ্যা' অন্তে উচ্চারিত হয় আ-রূপে, যেমন 'কন্যা', সন্ধ্যা প্রভৃতি। অভিশ্রুত 'ও' '-এর ব্যবহার অন্তে সীমাবদ্ধ। মনে রাখতে হবে যে বাঙলায় মূল স্বরধ্বনি হিসেবে কোন দীর্ঘস্বর নেই। তবে অর্থের গুরুত্ব অনুসারে অক্ষর-নির্ভর স্বরধ্বনি সাময়িকভাবে দীর্ঘ হতে পারে। স্বাভাবিক উচ্চারণে অন্ত্যাক্ষর (ultimate syllable)-এর স্বরধ্বনিটি দীর্ঘতম। একাধিক অক্ষরযুক্ত শব্দের হিসেবে দেখা যায় প্রথম থেকে শেষ অক্ষরে আসতে ওদের স্বরধ্বনিগুলোর পরিমাণ (quantity) উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়ে শেষেরটি হয় দীর্ঘতম। তাই বাঙলার স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য ধ্বনিমান গত (phonemic) নয়, কিন্তু উচ্চারণগত (phonetic)।

(২) নিয়মিত দ্বৈতস্বরধ্বনি (diphthong) ১৯ টি—ই-ই (অন্তে) ; ইউ (আদি-অন্তে) ; এই (আদি-অন্তে) ; এও (অন্তে) ; এউ (অন্তে) ; এ্যাও (অন্তে) ; এ্যায় (অন্তে) ; আই (অন্তে) ; আয় (আদি-অন্তে) ; আও (অন্তে) ; আউ (অন্তে) ; অয় (অন্তে) ; অও (অন্তে) ; ও-ও (অন্তে) ; ও-উ (আদি-অন্তে) ; ওই (আদি-অন্তে) ; ওয় (অন্তে) ; উই (আদি-অন্তে) ; উউ (অন্তে)। দ্বৈতস্বর-ধ্বনির দ্বিতীয় উপাদান একটি অর্থ স্বরধ্বনি, যার উচ্চারণ ও ব্যবহার হলন্ত ব্যঞ্জনের মতোই। কাজেই পিচ্ছিল (gliding) অনুরণন শোনা যায় শব্দের মাঝখানে, আদিতে বা অন্তে নয়। দ্বৈতস্বরের দ্বিতীয়

স্বরধ্বনিটি স্বয়ং সম্পূর্ণ নয় বলেই সংবৃততর উচ্চারণ পায়। ক্ষেত্রবিশেষে যৌগিক রূপ ভেঙে শ্বসনের দু'ই প্রয়াসেও উচ্চারিত হতে পারে এবং দ্বিতীয়টির উপর শ্বাসচাপ বেশি পড়ে। ফলে ওটি সংবৃত থাক্‌লে হয়ে যায় আরো সংবৃত বা সংবৃততর আর উচ্চারকদের পেশী নিষ্পিষ্ট হওয়ার জন্য পীড়িত বা কঠিন (tense) ও হ'য়ে পড়ে, যেমন, 'যা-ই'বলনা কেন।

(৩) অনিয়মিত দ্বৈত স্বরধ্বনি ১২টি—ইয়ে, ইয়া, ইয়ো, এয়া, এয়ো, এ্যায়া, অয়া, ওয়া, ওয়ে, উয়ে, উয়া, উয়ো। এদেরকে অনিয়মিত বলে এই জন্যে যে স্বাভাবিক বা সতর্ক উচ্চারণে দ্বৈত স্বরত্ব লোপ পায়। তবে দ্রুত ও অসর্তক উচ্চারণে এরা সংশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে দ্বিস্বরধ্বনি। তাই প্রথম স্বরটি উচ্চারিত হ'তে না হতেই পিচ্ছিল হয়ে ওঠে এবং দ্বিতীয়টি নিয়মিত দ্বৈতস্বরের দ্বিতীয়টির তুলনায় অনেকটা অস্পষ্ট হয়ে যায়। এর পরিচয় পাওয়া যায় কবিতার ছন্দমেলানে।

(৪) অর্ধস্বর ৩টি—অন্তঃস্থ 'য়' (y), 'ব' (w) ও 'ই' (i) এই তিনটি বাঙালায় অর্ধস্বর এবং প্রধানত শ্রুতিধ্বনি (glide)। অন্তঃস্থ 'য়' তিনভাবে ব্যবহৃত হয়। প্রথমত সম্মুখ স্বরধ্বনিগুলোর উচ্চারণ স্থান তথা জিভের সামনের ভাগ থেকে উত্থিত আন্তঃস্বরীয় (intervocalic) পিচ্ছিল ধ্বনি হিসেবে 'য়'—এর ব্যবহার,—'ই' ও 'এ'র মধ্যে, যথা, গিয়ে ; 'আ' ও 'এ'র মধ্যে, যথা, বয়েস, ইত্যাদি। দ্বিতীয়ত, এ্যায়্, আয়্ অয়্ এবং ওয়্ এ-চারটি দ্বৈতস্বরের শেষধ্বনি হিসেবে। এখানে দ্বিতীয় ধ্বনিটির উচ্চারণে জিভ অর্ধসংবৃত সম্মুখ স্বরধ্বনি 'এ'র দিকে দ্রুত এগিয়ে যায় ; কিন্তু সেখানে পৌঁছুবার আগেই দ্বৈতস্বরধ্বনি হিসেবে পূর্ণ হয়ে যায় এবং ফলে স্বয়ং সম্পূর্ণ ধ্বনি 'এ' গঠিত হয় না। তৃতীয়ত, চেয়ার, কেয়ার দ্ব্যক্ষরিক ও পেয়ালা, পেয়ারা ত্র্যক্ষরিক কৃত ঋণ শব্দে 'য়' স্বাভাবিক আন্তঃ স্বরীয় পিচ্ছিল ধ্বনি হিসেবেই উচ্চারিত হয়। তবে দ্রুত উচ্চারণে 'য়'-শ্রুতির সম্পূর্ণ উচ্চারণ লোপ পেয়ে, চ্যার বা প্যালা রূপে উচ্চারিত হতে পারে। 'ও' এবং 'আ', 'উ' এবং 'আ' পাশাপাশি স্বরধ্বনির মাঝখানে 'ব' (w) শ্রুতিরূপে নিঃসারিত হয়। তাই এ কখনো ঘর্ষণজাত ঘোষ ওষ্ঠ্য এবং দ্রুত সংলাপে ঘর্ষণহীন প্রলম্বিত ঘোষ ওষ্ঠ্য অর্ধস্বর রূপে উচ্চারিত হয়। যেমন, কুয়া, নোয়া প্রভৃতি। 'ই' (i) শ্রুতিধ্বনি 'ই' এবং 'উ', 'ই' এবং 'ই', ই এবং 'আ' প্রভৃতি মাঝখানে পিচ্ছিল অনুরণনে প্রতিভাত হয়, যেমন, শিউলি, দি-ই, প্রিয়া প্রভৃতি।

(ii) ব্যঞ্জন ধ্বনির অবস্থান

ব্যঞ্জনধ্বনি যুক্ত ও অযুক্ত এই দু'ভাগে বিভক্ত ঃ

(১) যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি—প্রায় ২৫০ এর মতো যুক্তাক্ষর আছে বাঙলায় ; কিন্তু যথার্থ যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি (consonant cluster) আছে মাত্র ৩৬টি। শব্দের

শুরুতে ২৮টির যুক্ততা অক্ষুন্ন থাকে। আর শব্দ শেষে দোস্ত, গোশত্‌, কার্ড ছাড়া বাঙালায় কোন যুক্ত ব্যঞ্জন নেই। কিন্তু মাঝখানে ৩৬টির ৮টি যুক্ততা হারিয়ে ফেলেচে এবং বাকি ২৮টি অযুক্ত ব্যঞ্জনের উচ্চারণ পেয়েচে। এরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত—(i) অভিনিধান—জাত ব্যঞ্জনধ্বনি, যথা, 'প্‌ত', 'ব্‌দ' প্রভৃতি; (ii) এক প্রয়াস—জাত যথার্থ ব্যঞ্জনধ্বনি, যথা, ক্র, দ্র, ম্র, স্ব ইত্যাদি; (iii) দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনধ্বনি, যথা ক্‌ক, ট্‌ট প্রভৃতি; (iv) সমস্থানজাত ব্যঞ্জন-ধ্বনি, যেমন, ম্প, ঙ্ক, ণ্ড প্রভৃতি। এদের প্রথমাংশের উচ্চারণের সংশ্লিষ্ট মাংসপেশী ক্ষণিকের জন্য অর্গলবদ্ধ হয় এবং মুক্তির জন্যে 'অন্তরিত পরাক্রমে' রত হয়। তাই এ-ধ্বনি উচ্চারণে অধিক সময় লাগে, যার ফলে ধ্বনিগুলোর কাল পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। এ-জন্যে যুক্তধ্বনির পূর্বস্বর গুরু বা দ্বিমাত্রিক হয়। এক্ষেত্রে কালপ্রলম্বন স্বরের তুলনায় বেশি হয় যুক্ত ব্যঞ্জনের প্রথমটিতে। ব্যঞ্জনধ্বনি যে প্রলম্বিত হতে পারে এ তারি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

(২) **অযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি**—কাল পরিমাণের দিক থেকে শব্দান্ত অযুক্ত হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি আপেক্ষিকভাবে দীর্ঘতম সময় নেয় এবং দুই স্বরধ্বনির মধ্যবর্তী ব্যঞ্জন ধ্বনিটি স্বল্পতম সময়ে উচ্চারিত হয়। আর প্রথম ধ্বনিটির উচ্চারণে শব্দান্তবর্তী ধ্বনির তুলনায় কিছু কম, কিন্তু দুই স্বরের মধ্যবর্তী ধ্বনির তুলনায় কিছু বেশি সময় লাগে। শব্দ শেষে অল্পপ্রাণ স্পর্শ ধ্বনিগুলো হলন্ত উচ্চারণ পায়; তবে শব্দমধ্যবর্ত্তী দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে অবস্থিত দুটি ব্যঞ্জন ধ্বনির প্রথম স্পর্শধ্বনির মতো সম্পূর্ণভাবে অভিনিধানপ্রাপ্ত কিংবা পরিপূর্ণ অমুক্ত থাকে না। এ-পরিবেশে অল্পপ্রাণ স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনধ্বনি গঠিত ও হলন্তরূপে উচ্চারিত হবার পরে উচ্চারকেরা স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার জন্যে পৃথক হয়ে যায়। ধ্বনিতাত্ত্বিকদের ভাষায় এহলো মুক্তি (release)। তবে এ-মুক্তি তার অন্তর্নিহিত বা পার্শ্বস্থিত স্বরধ্বনিযুক্ত নয়, এ সম্পূর্ণভাবেই স্বরধ্বনি বিবর্জিত। বাঙলার স্বর বর্জিত হলন্ত উচ্চারণের যে মুক্তি তাকে ধ্বনি তাত্ত্বিকেরা চিহ্নিত করেন VC ә (V=স্বর, C=ব্যঞ্জন, ә=মুক্তির চিহ্ন) রূপে। এ হলন্ত হলেও অভিনিধান প্রাপ্ত নয়। তারপর শব্দান্ত্য অযুক্ত মহাপ্রাণ স্পর্শধ্বনি ও হলন্ত উচ্চারণ পায়—মহাপ্রাণতার চারভাগের পৌনে চারভাগ লোপ পেয়েচে বাঙলায়।

(খ) **অক্ষরের মাত্রাসূত্র**

এবার দেখা যাক্ ত্রিধা ছন্দে ব্যবহৃত অক্ষরের মাত্রিক পরিণাম। বস্তুত এই মাত্রাসমকত্ব পাওয়া যাবে প্রতি পদে, পর্বে ও মেলে। একেকটি বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত হয়েচে একেকটি ছন্দ তথা স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত, ও বলবৃত্ত-এ। এবং এ-বৈশিষ্ট্য বিধৃত রয়েচে স্বর, স্বন ও বল-এ। অর্থাৎ উচ্চারণের প্রস্বরণ, প্রস্ফুটন ও

প্রচাপন হলো অক্ষরের মাত্রিক পরিণামের জন্যে দায়ী। নিচে তাই দেওয়া হলো এই মাত্রিক পরিণামের সূত্র।

(i) স্বরবৃত্ত—ছন্দে কাল পরিমাণের হ্রস্বতা—দীর্ঘতা স্বীকৃত। এই হ্রস্বতার নিরিখ হলো 'অ'—স্বরের মাপ। বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্যে (I. ৫৫-৫৭) উক্ত হয়েছে ঃ '"অমাত্র স্বরো হ্রস্বঃ; মাত্রা চ; দ্বিস্তাবান দীর্ঘাঃ" অর্থাৎ 'অ'-মাপের স্বরই হ্রস্ব এবং এ মাত্রাও, আর এর দ্বিগুণ কালস্থায়ী হলে তাকে বলে দীর্ঘ। পাণিনি (I. ২. ২৭) 'উ'-স্বরকে হ্রস্ব বলেচেন। তবে 'অ' বা 'উ' প্রায় এক ব্যাপ্তির দিক থেকে। বর্ণালি—লেখ-এ দেখা গেচে 'অ'-এর নারী-কণ্ঠীয় তিনটি প্রস্বরাবয়ব (formant) যথাক্রমে ৪০০, ১০০০ ও ৩০০০ চক্কর প্রতি সেকেণ্ডে ; আর 'উ'-এর ৪০৩ এবং ৮০০।[২৩] উভয়ে প্রায় তুলমূল্য এবং এরি দ্বিগুণ হলে বুঝাবে দীর্ঘমাত্রা। পরিবেশন কর্তার 'আমিষ না নিরামিষ' প্রশ্নে ভোজে বসা ব্রাহ্মণের জবাব ছিল, 'দ্বৌ কর্তব্যো'। কবির জিজ্ঞাসায় ছন্দের ও মাত্রা সম্পর্কীয় উত্তর ঐ একই ঃ দ্বৌ কর্তব্যো। আর এ প্রকাশ পায় যুগ্মধ্বনির মাত্রা গণনায় অর্থাৎ কিনা যুগ্মস্বর বা স্বরব্যঞ্জনে যুক্তধ্বনি অথবা হলন্ত-হসন্তের যুগ্মধ্বনির মাত্রা নির্ধারণে। এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "যুগ্মস্বরবর্ণ অথবা স্বরবর্ণের সঙ্গে যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ বাংলা ছন্দে মাত্রা গণনায় বিকল্পে এক বা দুই মাত্রার পরিমাণ পেয়ে থাকে। হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণের সঙ্গে ব্যঞ্জনবর্ণের যোগেও এই বিকল্পের উদ্ভব হয়। মাত্রা গণনার বাঁধা নিয়ম বাংলা ছন্দ বিচারে চলে না। তার স্থিতিস্থাপকতা বিচার করতে হয়।"[২২] এই বিকল্পের অবস্থান নির্ণয়ে জন্ম নেয় মাত্রাসূত্র যা নিচে দেওয়া হলো—

(১) শব্দান্ত্য যুগ্মধ্বনি সর্বদাই দ্বিমাত্রিক ; এবং

(২) শব্দমধ্য যুগ্মধ্বনি সাধারণত একমাত্রিক।

এই দু'টি মাত্রা সূত্রে নিয়ন্ত্রিত হয় স্বরবৃত্ত ছন্দ। এবার এদের পরিচিতি।

I. শব্দান্ত্য যুগ্মধ্বনি

যুগ্মধ্বনি যুক্তবর্ণে বা অযুক্ত বর্ণে লেখা হতে পারে। প্রথমটি এক প্রয়াসজাত—তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। যেমন 'ক্ত' (ক্ +ত) যুক্তবর্ণ হলেও এক প্রয়াস-জাত নয় ; অন্যদিকে 'প্ল' (প+ল) এক প্রয়াসজাত। অযুক্তবর্ণ হসন্ত নামেও পরিচিত। মনে রাখতে হবে যে শব্দ শেষে দোস্ত্, গোশত্, কার্ড, ব্যাংক প্রভৃতি কয়েকটি বিদেশী শব্দ ছাড়া বাঙলাতে কোন যুক্ত ব্যঞ্জন ধ্বনি নেই। কাজেই এদের হ্রাসবৃদ্ধির কোন প্রশ্নই ওঠে না। আধুনিক বাঙলায় শব্দান্ত্য 'অ'-কার ব্যঞ্জনবর্ণের গায়ে লীন হ'য়ে অদৃশ্য থাকে এবং অনুচ্চারিতও বটে। অর্থাৎ শেষ বর্ণটি হসন্তরূপে উচ্চারিত হয়, যেমন রাম, হাত, ইত্যাদি। ৫০০

বছর আগে এরূপ শব্দ স্বরান্তরূপে উচ্চারিত হতো, যেমন, রাম্ অ, হাত্ অ প্রভৃতি। এবং তৎ-সম শব্দে সাধারণত অন্ত অ-কারের লোপ হয়, যেমন, বিচার, ধীর ইত্যাদি।[১১] বাঙলা প্রতিটি ব্যঞ্জনধ্বনির বর্ণে একটি স্বরধ্বনি লুকিয়ে আছে ; আর এ ধ্বনিটি হলো 'অ'। যে কোন একটি ব্যঞ্জনবর্ণ (letter) কে শব্দের বাইরে উচ্চারণ কর্তে গেলেই তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি 'অ' আপনা থেকে উচ্চারিত হয়ে উক্ত বর্ণকে একটি পূর্ণ অক্ষরের মর্যাদা দেয়। বাঙলার লেখন পদ্ধতি বা বর্ণগুলি এরি সমর্থক। তাই ক, চ, ট, ত, প প্রভৃতি বর্ণের উচ্চারণে ঐ সব বর্ণের ধ্বনিগুলি এবং একটি অতিরিক্ত 'অ' উচ্চারণে একটি পূর্ণ অক্ষর গঠিত হয়, যথা, ক্+অ, প্+অ ইত্যাদি। বাঙলা ধ্বনি দ্যোতক বৈজ্ঞানিক বর্ণগুলি এ-কারণে অক্ষর-ভিত্তিক (syllabic)—এরা শুধু বর্ণই নয়, একেকটি অক্ষরও।

এখানে বাঙলা অক্ষর ও ছন্দের মাত্রা নির্ণয়ে বাঙলা স্বরধ্বনির শক্তির কথা ওঠে। ইংরেজী syllable-এর প্রতিশব্দ 'অক্ষর' এবং 'mora-র মাত্রা বা কাল-পরিমাণ। স্বরধ্বনি উভয়েরই নিয়ামক। তাই অক্ষর বা মাত্রার বেলায় স্বরধ্বনির একটি duration বা ব্যাপ্তি বা স্থিতিকাল আছে। এর অন্য নাম কালপরিমাণ। কাজেই অক্ষর ও মাত্রা এক হ'য়ে দাঁড়ায় ; অথচ পড়ার উপর নির্ভর করে অক্ষর কোথায় হ্রাস, কোথায় বা দীর্ঘ। এতে অক্ষর ঠিকই থাকে বটে, তবে অন্তর্নিহিত স্বর ধ্বনিটি উচ্চারণে হ্রস্ব-দীর্ঘ হয়ে যায়। এই হ্রস্ব-দীর্ঘতা ধ্বনির মাপের একক অর্থাৎ তার মাত্রা। তাই অক্ষর-নিহিত স্বরধ্বনি উচ্চারণের হ্রস্বতা-দীর্ঘতার বিচারে অক্ষরের শুধু প্রকৃতি বদ্‌লায় ; কিন্তু আকৃতির দিক থেকে একটি অক্ষরই থাকে, দুটো হয়ে যায় না। ফলে বদ্ধাক্ষর—যেমন বাক্, শাপ্ ইত্যাদি—তার অক্ষরের মাপ বদলায় না, অর্থাৎ অক্ষর থাকে একটি—ই ; তবে বিশ্লিষ্ট বা বিবৃত ভঙ্গিতে পড়তে গিয়ে তার অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনিকে প্রলম্বিত করা হয় এবং তাই তার মাত্রা সংখ্যা একের জায়গায় দুই-এ গিয়ে দাঁড়ায়।[১৬] এ-প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের উক্তি স্মর্তব্য ঃ "বাংলায় স্বরবর্ণ যদিও সংস্কৃত বানানের হ্রস্বদীর্ঘতা মানে না, তবু এ সম্বন্ধে তার নিজের একটি স্বকীয় নিয়ম আছে। সে হচ্ছে বাংলার হসন্ত শব্দের পূর্ববর্তী স্বর দীর্ঘ হয়। যেমন, জল, চাঁদ"।[২২]

প্রাচীন বাঙলায় অবশ্য ব্যঞ্জনান্ত শব্দের অন্ত্যস্বর ক্ষেত্র বিশেষে বর্তমান ছিল, পরে লোপ পায়। তবে উড়িয়াতে এখনও 'হাত^অ' 'কাজ^অ' উচ্চারণ আছে। বাঙলার এ-ধরনের স্বরবর্জিত হলন্ত উচ্চারণের যে মুক্তি, তাকে VC৩ (V=স্বর C=ব্যঞ্জন, ৩=মুক্তির চিহ্ন)-তে চিহ্নিত করা যায়। শব্দান্ত অযুক্ত অল্পপ্রাণ স্পর্শধ্বনি হলন্ত বটে, তবে তা অভিনিধান প্রাপ্ত নয়। ঐ একই অবস্থা মহাপ্রাণ

স্পর্শধ্বনির—শব্দান্ত মহাপ্রাণ হসন্ত ব্যঞ্জন চারভাগের প্রায় পৌনে চারভাগ মহাপ্রাণতা হারিয়েচে। স্পৃষ্টধ্বনির মতো শিস্‌ধ্বনি (শ, স), তরলধ্বনি (ল, র) এবং নাসিক্যধ্বনি (ন, ম, ঙ) স্বরবিহীন অবস্থায় হলন্ত উচ্চারণ লাভ করে; তবে তারা প্রলম্বিত বলে তাদের স্বরহীনতা স্পর্শধ্বনির মতো উচ্চারণস্থানে তাদেরকে আটকে দেয় না। তারা সংলগ্ন ও পৃথক হবার পরেই স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে ওঠে। তাড়ন-জাত 'ড়' ও 'ঢ়' ধ্বনির উচ্চারণও হলন্ত—এদের উচ্চারকেরা পরস্পরকে স্পর্শ করার পর সেখানে কিছু কাল আবদ্ধ থাকতে পারে না। ফলে 'আষাঢ়' মৃদু হয়ে 'আষাড়' হতে চলেচে।[১৬]

II. শব্দমধ্য যুগ্মধ্বনি

বাক্ প্রবাহে শব্দার্থের গুরুত্ব অনুযায়ী যে-কোনো অক্ষর (syllable) কিংবা ধ্বনি দীর্ঘায়িত হতে পারে। পড়তে গেলে একটির পর একটি বর্ণ আসে আর প্রত্যেকটি বর্ণের অন্তর্নিহিত ধ্বনি কালস্রোতে উন্মুক্ত হতে থাকে এবং এতে কিছু সময় নেয়। কাজেই প্রত্যেকটি ধ্বনিরই (স্বর কিংবা ব্যঞ্জন) ব্যাপ্তি (duration) বা স্থিতিগত একটি দিক আছে। দেখা গেচে স্বাভাবিক উচ্চারণে অন্ত্যাক্ষরের যে-কোনো স্বরধ্বনির উচ্চারণই কালের দিক থেকে দীর্ঘতম এবং তার পূর্ববর্তী অক্ষরের স্বরধ্বনিগুলোর দৈর্ঘ্য আপেক্ষিকভাবে হ্রস্ব হয়। ফলে শব্দের প্রথম অক্ষরের স্বরধ্বনি হয় হ্রস্বতম। স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্য যতটা সুস্পষ্টভাবে শ্রুতিগ্রাহ্য, অযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির ততটা নয়। তবে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণে দেখা যায় আন্তঃস্বরীয় (intervocalic) অযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির দৈর্ঘ্য স্বল্পতম—শব্দের আদিতে দীর্ঘতর, কিন্তু অন্তে দীর্ঘতম। অর্থাৎ শব্দ মধ্যে এ স্বল্পতম। তাই 'থাকুক' শব্দটির প্রথম ব্যঞ্জনধ্বনি 'থ', 'আন্তঃস্বরীয় 'ক' এবং শব্দান্ত হলন্ত ব্যঞ্জন 'ক্'-এর বিশ্লেষণে ঐ সত্য উদ্ঘাটিত হয়। 'ক' হলন্ত ব্যঞ্জন আপাত অযুক্ত বলেই উচ্চারকেরা কিছুক্ষণের জন্যে আট্‌কে থাকে এবং তাতেই কাল দৈর্ঘ্য বেড়ে যায়। আবার শব্দমধ্য অভিনিধানপ্রাপ্ত অযুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির তুলনায় শব্দান্ত হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দীর্ঘতর, যেমন 'উপ্‌টান' ও 'শাক্‌ভাত'-এর 'প্' ও 'ক্'-এর তুলনায় 'ন্' ও 'ত্' আপেক্ষিক ভাবে দীর্ঘতর।

শব্দমধ্য যুক্তব্যঞ্জনধ্বনিগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়—(১) 'র' ও 'ল' ফলা যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি তথা তরলধ্বনি-জাত যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো, যেমন, 'ক্র' (আক্রান্ত—আক্‌/ক্রান্ত), 'ব্র' (অব্রাহ্মণ—অব্‌/ব্রাহ্মণ), 'প্ল' (আপ্লুত—আপ্‌/প্লুত); (২) দ্বিত্বপ্রাপ্ত (geminated) ব্যঞ্জনধ্বনিগুচ্ছ, যথা, 'ক্ক' (পক্ক—পক্‌/কো), 'ত্ত' (সত্য—সত্‌/তো); (৩) সমস্থানজাত (homorganic) নাসিক্য ও বর্গীয় ব্যঞ্জনধ্বনিগুলো, যেমন, 'ঙ্ক' (ঝঙ্কার—ঝঙ্‌/কার), 'ম্প' (ঝম্প—

ঝম্/পো)। এখানে যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনি দুই অক্ষরে বিভক্ত হয়ে উচ্চারিত হয়—প্রথমভাগের ব্যঞ্জন প্রথম অক্ষরের সাথে যুক্ত হয়, আর দ্বিতীয়ভাগের ব্যঞ্জন পরবর্তী ধ্বনির সঙ্গে মিশে এক প্রাণজাত দ্বিতীয় অক্ষর গঠন করে। এ-প্রক্রিয়ায় প্রথমভাগ অর্গলবদ্ধ অমুক্ত উচ্চারণ পায় আর দ্বিতীয়ভাগ স্বতন্ত্রভাবে দীর্ঘতা লাভ করে। এখানে স্মর্তব্য যে অক্ষরগঠনে স্বরধ্বনি স্রষ্টা বলে মুক্তাক্ষর (open syllable) এ (যেমন আ, কি প্রভৃতি) স্বরধ্বনি-ই কাললিখ্ (time-marker) বা মাত্রার ধারক। অনুরূপভাবে বদ্ধাক্ষরে (closed syllable) (যেমন, কাজ, বুদ্‌ধি প্রভৃতি) শেষের ধ্বনি ব্যঞ্জনান্তিক এবং তাই তার পূর্বস্বরই হয়ে দাঁড়ায় কাল লিখ্ বা মাত্রাবাহক। মুক্তাক্ষরে তাই ব্যঞ্জনের পরবর্তী স্বরধ্বনি এবং বদ্ধাক্ষরে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনি ব্যাপ্তিকালের (duration) ধারক ও বাহক, যদিও ব্যঞ্জনের কিছুটা ব্যাপ্তিকাল আছে। অর্থাৎ স্বরই সব, ব্যঞ্জন কিছু নয়। কিন্তু এ-ধারণা ঠিক নয়, কেন না ব্যঞ্জন ধ্বনির অন্তর্নিহিত স্বরধ্বনি স-ব্যঞ্জন উচ্চারিত হয়। কালের দিক থেকে ব্যঞ্জন ধ্বনিরও ব্যাপ্তিকাল (duration) আছে ; আর এ ধরা পড়ে যুক্তব্যঞ্জনের প্রথমটিতে প্রথমভাগে।[১৬]

প্রশ্ন হলো শব্দমধ্য যুক্তব্যঞ্জনের কাল দৈর্ঘ্য নিয়ে। ভারতের প্রাচীন ধ্বনিবিদ্‌রা এ দিয়ে আলোচনা করেছেন। অধিকাংশের মতে (ঋক্ প্রাতিশাখ্য, I. ১৬ ; তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্য, I. ৩৭ ; বাজসনেয়ী প্রাতিশাখ্য, I. ৫৯) ব্যঞ্জন অর্ধমাত্রিক। এটা বিস্ময়ের যে হ্রস্বস্বরের মাত্রার চেয়েও ব্যঞ্জনের মাত্রা হ্রস্বতর, যদিও তরঙ্গলেখ (Kymograph)—এ ব্যঞ্জনের মাত্রা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হ্রস্বস্বরের সমান, এবং প্রায়ই দীর্ঘতর। দু'য়ের সামঞ্জস্য বিধানের জন্যে মনে রাখতে হবে যে প্রাচীন ধ্বনিবিদ্‌রা ব্যঞ্জন ব্যাপ্তিকে সনাক্ত করেছেন প্রকৃত শ্রাবণ মুহূর্তের সঙ্গে অর্থাৎ এরা তুল্যমূল্য এবং ব্যবহারিক দিক থেকে তাঁরা উপেক্ষা করেছেন (i) প্রাক্-শ্রুতি (onglide) ও (ii) স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনের সংযোগ স্তর। অধিকন্তু স্বর প্রলম্বিত ধ্বনি বলে স্পৃষ্ট বা তাড়িত ব্যঞ্জনের চেয়ে বেশি সময় নেয়। প্রকৃত শ্রাবণ মুহূর্তের সঙ্গে (i) ও (ii) যোগ করলে এ অথর্ববেদের উক্তির—ব্যঞ্জন একমাত্রিক—কাছাকাছি যায় এবং আধুনিক তরঙ্গলেখ্—এর অনুরেখের সঙ্গে মিলে যায়।[১৮] যুক্তব্যঞ্জনধ্বনি দ্বিখণ্ডিত হলে প্রথমভাগ অর্গলবদ্ধ উচ্চারণ পায় এবং তাই দ্বিতীয় ভাগের স্বতন্ত্র উচ্চারণের দ্বিগুণ হয়ে যায়—তরঙ্গলিখ্-এ এ দৈর্ঘ্য মাপা যায়।[১৬]

যুক্তব্যঞ্জনের পরিমাণ হয়ে দাঁড়ায় একচতুর্থাংশ—একথা আছে ব্যাস শিক্ষায় (xxvii. 8)। এর কারণ নিহিত আছে দু'টি ব্যঞ্জনে উচ্চারণের শক্তিবণ্টনে। যুক্তব্যঞ্জন ধ্বনির বিভাজনে এ ঘটে এবং তার সাক্ষ্য 'অভিনিধান'। 'সর্বসম্মত শিক্ষা'য় (পৃঃ ৯৪) বলা হয়েছে যে স্বরহীন ব্যঞ্জনের মাত্রা এক চতুর্থাংশ, কিন্তু স্বরের সঙ্গে উচ্চারিত হলে এ অর্ধমাত্রিক। ব্যঞ্জনকে অর্ধমাত্রিক ধরার কারণ

হলো এ প্রায়ই স্বরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কাজেই ব্যঞ্জনের অতিরিক্ত ½ মাত্রা পূর্ববর্তী বা পরবর্ত্তী স্বরের। এরি সঙ্গে মিলে যায় Roudet-এর মত ঃ স্বর ব্যঞ্জনের অনুবর্তী হলে উচ্চারণীয় বিচলনের একটি অতি ছোট ব্যাপ্তিকাল—এক সেকেণ্ডের ২ বা ৩ শতাংশ—উভয়ে লক্ষ্য করা যায় আর এ স্বরের জন্যে।[২৪] কাজেই ব্যঞ্জনমাত্রা ক্ষুদ্রতর আর 'সর্বসম্মত শিক্ষা'কার এই কথাই প্রকাশ করেচেন তার 'এক চতুর্থাংশ' সংজ্ঞায়। এরি সঙ্গে মিল আছে প্রাচীন ধ্বনিবিদ্‌দের ব্যঞ্জনমাত্রা ও প্রকৃত শ্রবণ ব্যাপ্তির অভেদস্থাপনে। পাণিনীয় শিক্ষায় (শিক্ষাসংগ্রহ, ১৮৯৩, পৃঃ ৫৫) তাই বলা হয়েচে যে উষ্মধ্বনি দীর্ঘস্বরের সমান। এই পরিপ্রেক্ষিতে শব্দান্ত্য ও শব্দমধ্য যুগ্মধ্বনির ভিন্ন-ভিন্ন আচরণের জন্যে দায়ী তিনটি কারণের উল্লেখ করা যেতে পারে—

এক। যেহেতু স্বরধ্বনি-ই কাললিখ্ (time-marker) অর্থাৎ মাত্রার ধারক ও বাহক, তাই স্বাভাবিক উচ্চারণে অন্ত্যাক্ষরের স্বরধ্বনিটি-ই দীর্ঘতম। ফলে বদ্ধাক্ষর বা যুগ্মধ্বনি হয়ে যায় দ্বিমাত্রিক।

দুই। প্রত্যেক স্পৃষ্ট ব্যঞ্জনে আছে তিনটি স্তর—অভিনিধান (implosion) ঃ অবধারণ (retention); ও স্ফোট (explosion)। 'ত'-এর উচ্চারণে অভিনিধানের পরেই আসে স্ফোট এবং অবধারণ ক্বচিৎদ্রষ্টব্য কালাংশে পরিণত হয়। অপরপক্ষে তিনটি স্তরই দেখা যায় দ্বিত্বপ্রাপ্ত ব্যঞ্জনে আর এরা হলো দীর্ঘায়িত হ্রস্ব ব্যঞ্জন ধ্বনি। এ-ছাড়া 'ক্ত'—ক্ +ত এ অভিনিধান প্রাপ্ত 'ক'-এর অবধারণশক্তি স্ফোট-প্রাপ্ত 'ত'-এর তুলনায় কম। এখানে দুটি বিপরীত প্রবণতা দেখা যায়। বক্তা 'ক'-এর উচ্চারণ বাদ দিয়ে তার জিভের ডগা 'ত'-এর স্ফোটে যেতে পারে।[২৫] এই অবধারণ হলো প্রকৃত শ্রাবণ মুহূর্ত্ত অর্থাৎ ব্যঞ্জনের ব্যাপ্তিকাল। ফলে শব্দ মধ্য যুগ্মধ্বনি একমাত্রিক হয়ে যায়।

তিন। গতানুগতিক ঐতিহ্যে নিরূপিত হয় ছন্দোমাত্রা। তাইতো 'বৃত্তমুক্তাবলিতরল'[১৮]-এ বলা হয়েচে ঃ "ঐতিহ্যগত রীতি অনুসারে দীর্ঘাক্ষরের পরিমাণ দু'মাত্রার। ঐ একই ভাবে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষরের পরিমাণ দ্বিমাত্রিক, যদিও ব্যঞ্জনের পরিমাণ অর্ধমাত্রিক। এই রেওয়াজ অনুসারে অক্ষর পরিমাণের বৃদ্ধি ঘটবেনা ব্যঞ্জনে।"

III. হসন্তমধ্য যুগ্মধ্বনি

বাঙলা ছন্দের বৈচিত্র্য নির্ভর করে হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বরের মাপের উপর। আর এই পূর্বস্বর তিনরকম অবস্থায় দেখা যায়—যুক্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বে, অযুক্ত হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির আগে, এবং দ্বৈত (diphthong) স্বরের শেষ স্বরধ্বনিটির

ব্যঞ্জনান্তিক ব্যবহারে। এ-ধরনের হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির পূর্বস্বরে টেনে পড়ার অবকাশ থাকে বলে এরি উপর নির্ভর ক'রে ছন্দো-বৈচিত্র্য সাধিত হয়। স্বনবৃত্ত ছন্দে হলন্ত ব্যঞ্জনজাত বদ্ধাক্ষর (closed syllable) কে মুক্তাক্ষরের (open syllable) তুলনায় বিশ্লিষ্টভঙ্গিতে পড়া হয় এবং তাই স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যকে দ্বিমাত্রিক ধরা হয়, আর মুক্তাক্ষরের স্বরধ্বনির দৈর্ঘ্যকে একমাত্রিক। দ্বিতীয়ত, স্বরবৃত্তে সাধারণত শব্দের শুরুতে এবং মধ্যে পড়ার সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে এসব ক্ষেত্রে এরা সবাই একমাত্রিক। তৃতীয়ত, বলবৃত্তে প্রচাপের ফলে যে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ হয় তাতে মাত্রা একমাত্রিক বা দ্বিমাত্রিক হ'য়ে ওঠে হরণে-পূরণে অর্থাৎ সংকোচনে ও সম্প্রসারণে। মাত্রার হিসাব সর্বত্রই স্বরধ্বনিকেন্দ্রিক—ব্যঞ্জনধ্বনির তেমন কোন আমল দেওয়া হয় না।[২৬]

(i) স্বরবৃত্ত—প্রাকৃত বাঙলায় হসন্তের ছড়াছড়ি—একেবারে জামাই আদর। দিশি হসন্তমধ্য বাঙলা শব্দে হসন্তের যুগ্মধ্বনি স্বরবৃত্তে কখনো একমাত্রিক, কখনো বা দ্বিমাত্রিক। তাইতো রবীন্দ্রনাথ বলেচেন ঃ "এই ছন্দ যুক্তধ্বনি ও অযুক্তধ্বনি উভয়কেই বিনা পক্ষপাতে একমাত্রারূপে ব্যবহার করবার সনাতন অধিকার পেয়েছে। আবার যুক্তধ্বনিকে দুইভাগে বিশ্লিষ্ট করে তাকে দুই মাত্রার ব্যবহার করার স্বাধীনতা সে যে দাবি করতে পারে না তাও নয়।"[২২] দিশি শব্দের মধ্যে হসন্ত থাকলে সে যুগ্মধ্বনিকে প্রয়োজন অনুসারে বাড়ানো—কমানো ছন্দসিদ্ধ অর্থাৎ কিনা সে কখনো একমাত্রিক, কখনো দ্বিমাত্রিক। যেমন—

চিম্‌নি ভেঙে গেছে দেখে গিন্নি রেগে খুন,

আবার চিম্‌নি ফেটেছে দেখে গৃহিণী সরোষ[২২]।

বলাইবাহুল্য, প্রথম চিম্‌নির 'চিম্‌' একমাত্রিক, দ্বিতীয়টির দ্বিমাত্রিক। একটিতে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণ, অন্যটিতে বিশ্লিষ্ট। এখানে উল্লেখ্য যে 'ৎ' ও 'ক' শব্দান্ত যুগ্মধ্বনি ও দ্বিরাচারী অর্থাৎ ছন্দে এরা কখনো এক মাত্রিক, কখনো বা দ্বিমাত্রিক। যথা—

পাৎলা করিয়া কাটো কাৎলা মাছেরে,

আবার পাৎলা করি কাটো প্রিয়ে কাৎলা মাছটিরে।

প্রথমটি দ্বিমাত্রিকতার উদাহরণ, শেষেরটি একমাত্রিকতার। ঐ একই ভাবে 'দিক্‌' —এর 'ক্‌' হসন্ত হওয়া সত্ত্বেও একমাত্রিক, যথা—

মনের আকাশে তার দিক্‌ সীমানা বেয়ে,

আবার দ্বিমাত্রিকও,

তব চিত্ত গগনের দূর দিক্ সীমা।

তবে এসব ক্ষেত্রে দ্বিমাত্রিকতা সাধারণ নিয়ম।

(ii) স্বনবৃত্ত—এ-ছন্দে 'স্বন'-এর স্বাতন্ত্র্য তুলে ধরতে হয় এবং সে-জন্যে প্রয়োজন বিশ্লিষ্টভঙ্গির উচ্চারণ অর্থাৎ যুগ্মধ্বনি সর্বদাই বিশ্লিষ্ট, তা সে শব্দের মধ্যেই হোক, বা শেষেই হোক। তাই যে—ছন্দে যুগ্মধ্বনি সর্বদাই বিশ্লিষ্টভঙ্গিতে অর্থাৎ টেনে উচ্চারিত হয়ে দ্বিমাত্রিক হয়, তাকেই বলে স্বনবৃত্ত। যথা—

কত ব্রহ্মের | গৈরিক বাসে | ধূসর হয়েচে | ধরা ০০০০

এখানকার চলন ছ'মাত্রার আর শেষে আছে চারমাত্রা উহ্য। এখানে উল্লেখ্য যে শুধু মাত্রায় ছন্দ বৈশিষ্ট্য চেনা যায় না ; তার জন্যে প্রয়োজন পদক্ষেপের গড়ন জানা অর্থাৎ পর্ব ও যতির জ্ঞান। যেমন, 'কত ব্রহ্মের গৈরিক বাসে ধূসর হয়েচে ধরা' স্বনবৃত্ত, আবার 'তব চিত্ত গগনের দূর দিক্সীমা', উভয়ক্ষেত্রে যুগ্মধ্বনি দ্বিমাত্রিক—তাসত্ত্বেও প্রথমটি স্বনবৃত্ত, দ্বিতীয়টি স্বরবৃত্ত। এই পৃথকীকরণ মাত্রাজ্ঞানে সম্ভব নয়, কিন্তু উভয়ের চলনজ্ঞানে। প্রথমটির চলন ৬ মাত্রার পর্বে, দ্বিতীয়টির ৮+৬ এর পদে। এই পদ ও পর্বজ্ঞানই ছন্দ দু'টির প্রকৃতি নির্ণায়ক।

(iii) বলবৃত্ত—বাঙলা সাধু ও প্রাকৃত এই দু'ভাগে বিভক্ত। সাধু বাঙলার ছন্দ দু'টি—স্বনবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত। আর প্রাকৃত বাঙলার ছন্দ হলো বলবৃত্ত। এদের মধ্যে স্বনবৃত্ত মন্থর বা বিলম্বিত উচ্চারণের বিশ্লিষ্ট ভঙ্গির উপর নির্ভরশীল ; এ তাই কৃত্রিমতম অর্থাৎ স্বাভাবিক নয়। এর চেয়ে কম কৃত্রিম বা বেশি স্বাভাবিক হলো স্বরবৃত্ত। আবার স্বরবৃত্তের চেয়েও বেশি স্বাভাবিক এবং মোটেও কৃত্রিম নয় এমন ছন্দ হলো বলবৃত্ত। তাইতো দ্বিজেন্দ্রলাল "আলেখ্য"—কাব্যের ভূমিকায় বলেচেন ঃ "এ-ছন্দ প্রচলিত (স্বরবৃত্ত) ছন্দের চেয়ে অধিক স্বাভাবিক। 'কোমল তরল জল' (পড়তে হবে) 'কোমল্ তরল জল্' (রূপে)"। অর্থাৎ সাধারণ কথাবার্তার উচ্চারণ এখানে কাম্য। তাই সত্যেন্দ্রনাথ বলেচেন ঃ "এ নিরক্ষরের ছন্দ ; সংস্কৃতের উল্কিতে এর চেহারা বদলে যায় নি ; সেই জন্যে ভাষার নিজস্ব রূপটি এতে বজায় আছে। এর বুকের ভিতর ঃ 'কত ঢেউয়ের টল্‌মলানি কত স্রোতের টান'।"[২৭] হসন্তের ঠুনোঠুনিতে এ-ছন্দ কল্লোলিত হয়ে ওঠে এবং এর পিছনে কাজ করে প্রচাপ বা বলের আঘাত। তাই শুধু স্বরের হিসেব এখানে মূল্যহীন।[২৮] এখানে প্রচাপ ও স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির মতো গ্রাহ্য অক্ষরের মাত্রা নিরূপণে। এই প্রচাপের ফলে একাধিক পরিবর্তনও লক্ষণীয়। প্রথমত হসন্তের টানে শব্দগুলি গায়ে-গায়ে লেগে যায়, যা সাধু বাংলার ছন্দে দেখা যায়না, যেমন,

'এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা' হয়ে যায় 'এপার্গঙ্গা ওপার্গঙ্গা'। দ্বিতীয়ত, হসন্ত নিজেই একটি অক্ষরে পরিণত হয় তার নিজস্ব মাত্রা নিয়ে। তাই রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "টুমুস্ টুমুস্ বাদ্যি বাজে' পদে টু-মু দুই সিলেবল্। পরবর্তী স্-ও এক সিলেবল্-এর মাত্রা নিয়েছে পূর্ববর্তী উ-স্বরকে সহজেই দীর্ঘ করে।"[২২] তৃতীয়ত, "গুরুধ্বনি আর accent (stress) মিশে যায় এবং বদ্ধধ্বনি (বদ্ধাক্ষর) সর্বত্র গুরু"। বদ্ধধ্বনিতে যদি accent পড়ে তবেই গুরু নতুবা লঘু।[২৯] চতুর্থত, "মুক্তধ্বনি কোথাও লঘু, কোথাও গুরু"[২৯]। তাইতো রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "গণনায় যেখানে যেখানে ফাঁক, পার্শ্ববর্তী স্বরবর্ণগুলি সহজেই ধ্বনি প্রসারিত করে সেই পোড়ো জায়গা দখল করে নিয়েছে।"[২২] পঞ্চমত, ক্ষেত্র বিশেষে মৌন বলস্পন্দও (silent stress pulse)—কিন্তু প্রকৃত প্রচাপিত অক্ষর (actual stressed syllable) নয়—লক্ষণীয়। তালবৃত্ত ছন্দ যেহেতু কয়েকটি নির্দিষ্ট বলস্পন্দে তৈরি হয়, তাই এখানে মৌন প্রচাপের উপস্থিতিও আছে। অর্থাৎ কিছু প্রচাপ মৌনীও হতে পারে।[৩০] যেমন,

বাইরে শুধু | জলের শব্দ | ঝুপ্ ঝুপ্ | ঝুপ্
দস্যি ছেলে | গল্প শুনে | একেকবারে | চুপ্।

উপরের প্রথম চরণের তৃতীয় মেল-এ প্রচাপের ফলে চারমাত্রা মেলে, কেননা দুটি বদ্ধাক্ষর—ঝুপ্, ঝুপ্—প্রচাপিত বলে চারমাত্রার। এখানে দু'মাত্রার উহ্য বা মৌন বলস্পন্দ রয়েচে এবং তাতেই ছ'মাত্রা পূর্ণ হচ্ছে। তাই উপরোক্ত চরণ দু'টি দাঁড়াবে এরূপ মাত্রা সমেত—

বাইরে শুধু— | জলের শব্দ | ঝুপ্ ঝুপ্— | ঝু—প্,
দস্যি ছেলে— | গল্প শুনে— | একেবারে— | চু—প্।

এখানে বদ্ধাক্ষর ও মুক্তাক্ষর দুই-ই প্রসারিত হয়েচে ; আর মৌন বলস্পন্দও রয়েচে।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বলবৃত্তের মাত্রা সূত্রটি হবে এরূপ—

(১) প্রচাপিত বদ্ধাক্ষর বা যুগ্মধ্বনি সর্বত্র দ্বিমাত্রিক আর প্রচাপিত না হলে একমাত্রিক ;

(২) মুক্তাক্ষর কোথাও একমাত্রিক কোথাও দ্বিমাত্রিক এবং এ প্রচাপের ফলেই ; ও

(৩) প্রকৃত প্রচাপিত অক্ষরের পরিবর্তে মৌন বলস্পন্দ থাকৃতে পারে।

IV. মাত্রানিরূপক ছক

মাত্রা মারফতেও ছন্দের ত্রিধা বিভাগ হতে পারে এভাবে ঃ

(১) যে ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র এক-মাত্রিক, কিন্তু বদ্ধধ্বনি কোথাও একমাত্রিক, কোথাও দ্বিমাত্রিক অর্থাৎ শব্দান্তে দ্বিমাত্রিক আর শব্দের আদি ও মধ্যে একমাত্রিক, তাকেই বলে স্বরবৃত্ত।

(২) যে-ছন্দে মুক্তধ্বনি সর্বত্র একমাত্রিক ও বদ্ধধ্বনি সর্বত্র দ্বিমাত্রিক তাকে বলে স্বনবৃত্ত।

(৩) যে-ছন্দে মুক্তধ্বনি কোথাও একমাত্রিক, কোথাও দ্বিমাত্রিক, কিন্তু বদ্ধধ্বনি সর্বত্র দ্বিমাত্রিক তাকে বলবৃত্ত বলে।

সারণীতে এর রূপ হবে এ-রকম[২৯]—

সারণী ঃ ৫—ছন্দের ত্রিধারূপ

বাঙলা ছন্দ
- স্হির মাত্রিক (স্বনবৃত্ত)
- বিকল্প মাত্রিক
  - সংকোচক (স্বরবৃত্ত)
  - প্রসারক (বলবৃত্ত)

এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য যে ছন্দোবিৎদের অনেকেই বলবৃত্তের স্বরূপ ধরতে না-পারায়, ত্রিধা ছন্দের মিলের জন্যে ভিন্ন-ভিন্ন রীতি অবলম্বন করেচেন। প্রবোধচন্দ্র সেন মহাশয় 'অক্ষরের' জায়গায় 'দল' আমদানি করে বলেচেন ঃ "এ-রীতিতে রুদ্ধমুক্ত নির্বিশেষে প্রত্যেকটি দলকেই একমাত্রা হিসাবে গণনা করা হয়।"[৭] এ-যে যুক্তি-সহ নয় তা আগেই দেখান হয়েচে। ভুলের মূল 'প্রচাপ' বা বলের অস্বীকারে। এখানে দ্রষ্টব্য (৫.৩) 'প্রচাপ, প্রস্বর ও মাত্রাবিচার'। এ-ভুল করেচেন অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় ও—তিনি 'শ্বাসাঘাত' (stress)-এর কথা বলেচেন, অথচ এতে যে বদ্ধাক্ষর-এর সম্প্রসারণ ঘটে তা বুঝতে পারেননি। তিনি বলেচেন ঃ "শ্বাসাঘাত (অর্থাৎ প্রচাপ) হলন্ত বা যৌগিক অক্ষরের উপরই পড়ে ঃ স্বরান্ত-অক্ষরের উপর শ্বাসাঘাত পড়িলে সেই স্বরটি একটু টানিয়া যৌগিক অক্ষরের সমান করিয়া লইতে হইবে।"[৩১] যেমন,

ধিনতা ধিনা | পাকা নোনা
ডাল্ ভাতে ভাত | চাঁড়িয়ে দেনা।

একে সত্যেন্দ্রনাথ বলেচেন "চারের ঘরানা ছন্দ, কিন্তু চারে থই পাচ্ছে না। পাকা নোনা হাল্কা হয়ে পড়েছে বলে ছেলেগুলো আপনা হতেই 'পাকা-নোনা' করে খুব

খানিকটা ঝোঁক দিয়ে টেনে উচ্চারণ করছে।"[৩২] অমূল্যধনও সত্যেন্দ্রনাথকে অনুসরণ করেচেন। এঁরা উভয়েই প্রচাপের অভিঘাত উপেক্ষা করেচেন যুক্তাক্ষরের উপর। উপরের চরণ দু'টি যে ত্রিমাত্রিক চলনে ছ'মাত্রার মেলে এগিয়েচে এটা কেউ-ই বুঝতে পারেননি, যদিও 'পাকা'-র দীর্ঘীকরণে এঁদের সায় আছে। 'পাকা-া' যেমন একটি মাত্রা বৃদ্ধি করেচে, তেমনি 'নোনা-া' ও। ফলে দু'টি মাত্রা বৃদ্ধি ঘটেচে। অথচ অমূল্যধন 'ধিনৃতা'য় যে মাত্রাবৃদ্ধি হয়েচে, তা ধরতে পারেননি। ফলে তাঁর হিসাব মতো 'ধিনৃতা ধিনা' হয়েচে চারমাত্রার মেল, অথচ 'পাকা নোনা'য় স্বীকৃত হয়েচে পাঁচ মাত্রার মেল। তারপরে এই হিসাব 'ডাল ভাতে ভাত'-এ একদম বেসামাল হয়েচে। এখানে ছ'মাত্রার মেল। এর কারণ তাঁর অবৈজ্ঞানিক উক্তি : "শ্বাসাঘাত যুক্ত হইলে যে কোন যৌগিক অক্ষরের হ্রস্বীকরণ হয়।"[৩১] বলা বাহুল্য এ-যে সঠিক নয়, তা বলেচেন রাজশেখর বসু : "গুরুধ্বনি আর accent (stress) মিশে যায়। বদ্ধধ্বনিতে যদি accent পড়ে তবেই নতুবা লঘু।"[২৯] অরবিন্দের মত ও এরি অনুকূলে : প্রচাপের ফলে স্বরের দীর্ঘয়ন হয়; ছন্দাঘাতে ও এমনকি ব্যঞ্জনের ঠ্‌নো ঠ্‌নিতেও।[৩৩] এ-কথা আগেই বলা হয়েচে (২.১৫) : 'ছন্দের পরিমাত্রিক সমীকরণ' ও (৫.৩) : 'প্রচাপ, প্রস্বর ও মাত্রাবিচার'-এ। সুধীভূষণ ভট্টাচার্যই কিছুটা প্রগতির পরিচয় দিয়েচেন 'খেমটা' ও 'কাহারবা' তালের উল্লেখে।[৩৪] এ-ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের দানই মৌলিক : "প্রাকৃত ছন্দকে (বলবৃত্ত) চার-চার সিলেবল্‌—এ ভাগ করাটা ঠিক বলে মনে হয় না।"[২২]

আরেকটি কথা স্মর্তব্য। Pitch accent বা প্রস্বর ও stress accent বা প্রচাপ এক নয়। প্রস্বর দেখা যায় সাধুবাংলার ছন্দে অর্থাৎ স্বরবৃত্ত ও স্বনবৃত্তে; আর প্রচাপ বা বল শুধু বলবৃত্তে। এ সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েচে (৫.৩)-এ। এর সম্যক অনুপলব্ধির জন্যে এসেচে রাজশেখর বসুর মন্তব্য : "বাংলায় accent থাকলেও ছন্দের বন্ধনে তা অবান্তর, সাধারণত গুরুধ্বনি আর accent মিশে যায়।"[২৯] এই বাক্যের প্রথম accent-এ বুঝায় প্রস্বর, আর দ্বিতীয় accent এ প্রচাপ। দুটিকে গুলিয়ে ফেলার জন্যে ঘটেচে সত্যের অবলোপ। তেমনি তাঁর আরেকটি উক্তিও যুক্তি সহ নয় : "ধ্বনির লঘুগুরুতার মূলে কোনও স্বাভাবিক বৈজ্ঞানিক কারণ নেই, তা প্রচল বা convention মাত্র, এবং ভাষাভেদে বিভিন্ন।"[২৯] উপরের বিশ্লেষণে দেখান হয়েচে ত্রিধা ছন্দের বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এবং মাত্রার বিজ্ঞান। এখানে উল্লেখ্য যে স্বনমাত্রাবিচিত্রায় শুধু যে স্বর ও ব্যঞ্জন ধ্বনি আছে তা নয়। এ-ছাড়াও আছে একটি মুক্ত সঞ্চার, তিনটি প্রচাপ, ও তিনটি প্রস্বর ও তিনটি বাক্‌ছেদ এই মোট দশটি। আর Gleason এদের স্থান দিয়েচেন তাঁর ভাষাতত্ত্বে।[৩৫] এর জন্যে দ্রষ্টব্য (১.১৫) : "স্বনমান বিচিত্রা"। কাজেই মাত্রা বিচারে এরা স্মরণীয় বাঙলা ছন্দে।

নবম অধ্যায় ঃ ছন্দোব্যাকরণ

ছন্দ ভাষার ধ্বনিচরিত্র গঠন করে। এ গদ্যস্পন্দকে সমকালীনতার কাছাকাছি এনে নিয়মিত করে এবং এ-ভাবে আক্ষরিক দৈর্ঘ্য গুচ্ছের সম্পর্ক সরল করে। অধিসুর বা স্বরের রঙ দেখানোর জন্যে এ স্বরের প্রলম্বনে লয়ের মন্থরতা ঘটায়। বাক্যের সুতান স্বরভঙ্গিকে এ সরল ও নিয়মিত করে। তাই শব্দপুঞ্জের বাস্তবায়ন হলো ছন্দের কাজ ঃ তাদেরকে আঙুল দিয়ে দেখার এবং তাদের ধ্বনির দিকে মনোযোগ নির্দেশ করে। সংকবিতায় শব্দের সম্পর্ক আরো জোরে ঘোষিত হয়।

অক্ষর, প্রস্বন ও মাত্রায় পদ্য প্রণালীর প্রচলিত শ্রেণী বিভাগ শুধু যে অপর্যাপ্ত তাই নয়, এ ভ্রান্তিকরও। কেননা তিনটি নীতিরই ভূমিকা আছে ফিনিশ মহাকাব্যে। আধুনিক গবেষণা প্রমাণ করেচে যে তথাকথিত বিশুদ্ধ মাত্রিক লাতিন ছন্দোবিজ্ঞান প্রকৃত পক্ষে প্রভাবিত হয়েছিল যথেষ্টভাবে প্রস্বন ও শব্দসীমায় মনোযোগ দেওয়ায়। স্পন্দ ভিত্তির উপাদান অনুসারে ভাষার বৈচিত্র্য ঘটে। ইংরেজি স্পষ্টত প্রচাপনিয়ন্ত্রিত, আর মাত্রা প্রস্বনের অধীনে এবং শব্দসীমাও স্পন্দবৃত্তির কাজ করে। চেকভাষায় শব্দ সীমাই স্পন্দের ভিত্তি, যার নিত্যসঙ্গী হলো আবশ্যিক প্রচাপ আর মাত্রা শুধু মাত্রা বৈচিত্র্য—কারক ঐচ্ছিক উপাদান। চীনা ভাষায়, প্রস্বর স্পন্দের প্রধান ভিত্তি ; কিন্তু প্রাচীন গ্রীক-এ মাত্রাই ছিল সংঘটনসূত্র আর প্রস্বর ও শব্দসীমা বৈচিত্র্য ঘটানো ঐচ্ছিক উপাদান।

—রেণী ওয়েলেক ও অষ্টিন ওয়ারেন[১]

৯.১. বাঙলা ছন্দ

রবীন্দ্রনাথ একটি মূল্যবান উক্তি করেচেন ঃ "ছন্দের নিয়মটা জানবার যোগ্য বিষয় বটে। কিন্তু ছন্দ ব্যবহার করবার কালে আরো বেশি কিছু আবশ্যক হয়, সেটা কাউকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় না। এর বেলাও খাটে 'ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন"।[২] অর্থাৎ ছান্দসিক হতে গেলে তাকে হতে হবে আদৌ কবি এবং দ্বিতীয়ত ভাষাবিৎ। এ দুয়ের মিল না হলে বিফল হবে ভাষ্য রচনা। বাঙলা ছন্দ নিয়ে এ-পর্যন্ত এ-বাধাই রয়ে গেচে। যাঁরা ছন্দ নিয়ে আলোচনা করেচেন তাঁরা কেউ-কেউ ভাষাবিৎ যেমন সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, রাজ শেখর বসু প্রভৃতি, কিন্তু কবি অর্থাৎ ছন্দ কারবারী নন। তাই এঁদের ছন্দালোচনা ব্যাহত হয়েচে। অন্যদিকে কেউ-কেউ কবি, যেমন মোহিত লাল মজুমদার কিন্তু ভাষাবিৎ নন। তাই তাঁদের আলোচনাও সঠিক পথের নির্দেশ দিতে পারেনি।

বস্তুত কবি ও ভাষাবিৎ-এর যৌথ প্রচেষ্টায় ছন্দ গম্য। এক কথায়, ছান্দসিক বা ছন্দোবিৎ-কে হতে হবে কবি ও ভাষাবিৎ এই দুই-ই।

বাঙলা ছন্দ সম্বন্ধে প্রশ্ন জাগে ঃ এ কি কি উপাদানে গঠিত। অক্ষর (syllable) নিয়ে গঠিত হলেও অক্ষরের মাত্রা পরিমাণই এখানে কাম্য। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেন ঃ "ছন্দে (কি) সিলেব্‌ল্‌ প্রধান অথবা মাত্রাপ্রধান। এসম্বন্ধে আমার মত এই যে, মাত্রা নিয়েই ছন্দের স্বরূপ। কিঙ্কিণীতে ঘুণ্টি কিভাবে ও কত সংখ্যায় সাজানো সে-কথাটা গৌন, আর ঝংকারের লয়টাই আসল কথা।"[২] আবার আছে প্রস্বন (accent), যা দু'রূপে বর্তমান—প্রস্বর (pitch) যেমন দেখা যায় স্বরবৃত্তে ; এবং প্রচাপ বা বল (stress) যা আছে বলবৃত্তে। আর এ দু'টির পার্থক্য জানাও দরকার। প্রস্বন, প্রস্বর ও প্রচাপ এতিনের ব্যবহার সম্বন্ধে সতর্ক থাকার প্রয়োজন। এরি ফলে এসেচে এই উক্তি ঃ "কেউ কেউ ব্যাপ্তি প্রস্বর (duration accent) অর্থাৎ ব্যাপ্তিময় প্রস্বরের অস্তিত্বও স্বীকার করেন। বাংলার তার প্রয়োজন নেই। বাংলা ছন্দে গীতি প্রস্বরের (pitch বা musical accent) কোন ক্রিয়া দেখা যায় না, কিন্তু ঘাত প্রস্বরের (stress accent) যথেষ্ট প্রভাব দেখা যায়।"[৩] গীতি প্রস্বর যে আছে তার প্রমান স্বরবৃত্তের টান বা vocal drawl। আর ঘাত ও প্রস্বর মেলানো যায় না। কেননা ঘাত হলো বলস্পন্দ, অন্যদিকে প্রস্বর হলো উরসস্পন্দ। এদের প্রকৃতিই আলাদা, যার বিস্তৃত আলোচনা আছে (৫.৩)-এ। এই প্রচাপ বা বলস্পন্দ দেখা যায় বলবৃত্ত বা ছড়ার ছন্দে। এসম্বন্ধে Anderson-এর উক্তি প্রণিধান-যোগ্য ঃ "সব ভাষায়ই বলের প্রস্বন (stress), ধ্বনি—উচ্চতার প্রস্বন (pitch) এবং মাত্রা এই তিনটি গুণাবলী অস্তিমান। যে-কোন ভাষার প্রশ্ন ঃ এসব গুণের মধ্যে কোন্‌টি মুখ্যত এত শ্রাব্য যে এ ছন্দের ভিত্তি হতে পারে? এদের একাধিক তাত্ত্বিক দিক থেকে এ ব্যবহৃত হতে পারে। ইংরেজি ছন্দ প্রচাপ বা বলের নিয়মিত পুনর্বৃত্তিতে তৈরি। এটা সুস্পষ্ট যে এ-ভাবে প্রচাপিত কিছু কিছু অক্ষর ও উদাত্ত স্বরে উচ্চারিত হয়। ফরাসীতে মুখ্য শ্রাব্য মাত্রাকে বলে সুরেলা প্রস্বন (accent tonique), যা মুখ্যত প্রস্বরবৃদ্ধি। উচ্চারিত অক্ষরে প্রচাপ বা বল (stress)ও থাকতে পারে।"[৪] বলা বাহুল্য যে বাংলায় এই দুই প্রকার প্রস্বন-প্রস্বর ও প্রচাপ—লক্ষণীয়। তাই ছন্দ-আলোচনায় অক্ষর, প্রস্বর ও মাত্রা এই তিনটিরই ভূমিকা আছে, যেমন আছে ফিনিশ মহাকাব্যে।[১]

অক্ষরের আছে তিনটি রূপ—স্বরান্ত, হলন্ত (যুক্তাক্ষর), হসন্ত। উচ্চারণের তিনটি প্রক্রিয়া হলো প্রস্বরণ, প্রস্ফুটন ও প্রচাপন। আর মাত্রায় বর্তমান হ্রস্ব, দীর্ঘ ও গুরু। এখানে মনে রাখতে হবে যে শব্দসীমার হিসাবও এখানে জরুরী। তাই পদ, পর্ব ও মেল এসে যায় চরণ বিভাগে এবং স্বভাবতই এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট

আছে ছেদ, যতি ও বিরাম। এখানে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি খুবই তাৎপর্যবহ। তাঁর মতে ঃ "দুই এবং তিন সংখ্যাই বাংলা সকল ছন্দের মূলে। তার রূপের বৈচিত্র্য ঘটে যতিবিভাগের বৈচিত্র্যে এবং নানা ওজনের পঙক্তি-বিন্যাসে। এই রকম বিভিন্ন বিভাগের যতি ও পঙ্‌তি নিয়ে বাংলায় ছন্দ কেবলি বেড়ে চলেছে।"[২] এরি পটে বাঙলা ছন্দকে সাজানো হয়েছে ধাত্ররূপে—(৭.৩) এঃ দ্রষ্টব্য (৩৯) ও (৪০) সংখ্যক সমীকরণ দু'টি। দেখান হয়েছে যে বাক্‌ ধাত্র × ছন্দধাত্র = চলনধাত্র। এদেরকে S, P ও F ধরলে, ছন্দোধাত্র বা $P = \overline{S}' F$। অর্থাৎ স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত ও বলবৃত্তের আলোচনায় জরুরী হলো অক্ষর, প্রস্বন, মাত্রা ও শব্দসীমার ভিন্ন ভিন্ন রূপ।

৯. ২. ছন্দোকৌশল

ছন্দোব্যাকরণ ভিন্ন ভিন্ন ছন্দোকৌশল নিয়ে আলোচনা করে। এ-ব্যাপারে ধ্বনির সংযোগ ও বিয়োগ, প্রস্বন ও হ্রস্ব-দীর্ঘতা, ছন্দোসন্ধি ও ছন্দোসমাস এবং মধ্যখণ্ডন প্রভৃতি আলোচনার বিষয়বস্তু। এদের কথা নিচে বলা হলো—

I. ছন্দোসন্ধি—সাধারণত মুক্তস্বর অক্ষর পূর্ববর্তী বা পরবর্তী শব্দের সঙ্গে মিলে উচ্চারিত হয়। যেমন, 'আজই' = আজ্‌ + ই = আজি, যার সঙ্গে মিল আছে 'পাজি'র ঃ

বলি তারে, "পাজি,। বেরো তুই 'আজই',। দূর করে দিনু। তোরে।"

—রবীন্দ্রনাথ ঃ কাহিনী, 'পুরাতন ভৃত্য'

তবে এ মুক্তস্বরের স্বতন্ত্র উচ্চারণও আছে, যথা,

শহরে শহরে। বিমানের হানা।
ট্রাম 'ও' বাসের। ভেঙে গেচে ডানা।

—অনিল বিশ্বাস ঃ উদ্বেগ উপকূলে, 'ভাঙ্গাবন্দর'

'ছন্দোসন্ধি তাকেই বলে যখন এ-সংকোচন ছাড়া ছন্দোরক্ষা হয় না, যথা—

হত্যা 'নয় আজ'। সত্যাগ্রহ। শক্তির উদ্বো। ধন

—নজরুল ঃ অগ্নিবীণা, 'কোরবাণী'

এখানে নয় + অজ = নয়াজ, শক্তির + উদ্বোধন = শক্তিরুদ্বোধন পড়তে হবে। আবার, 'সত্যাগ্রহ' কে পড়তে হয় বিশ্লিষ্ট ভঙ্গিতে অর্থাৎ সত্যাগ্রহ = সৎ + তিয়া + গ্রহ এ-ভাবে। কেননা, এ হলো যান্মাত্রিক স্বনবৃত্ত। ছন্দোসন্ধি তিনপ্রকারের হতে পারে,[৩] যথা—

(ক) স্বরে-স্বরে—রেতে মশা দিনে মাছি,
এই 'তাড়্য়ে' কল্‌কেতায় আছি।
—বঙ্কিমচন্দ্র : ঈশ্বর গুপ্তের জীবনচরিত

এখানে 'তাড়্য়ে'= তাড়াই+এ। আবার
পরিবার বুঝেছেন। হাড়ে-হাড়ে মর্মে,
যেথা যায়, 'যাইই' করি,। নই কো নো কর্মে।
—কিরণধন চট্টোপাধ্যায় : নতুনখাতা, 'উকিলের ওকালতী'

(খ) ব্যঞ্জনে-স্বরে—গন্ধমাদন,। গন্ধমাদন,। উপাড়িল যারে। বানর-বীর
বিরাট গর্ব। একটা সে যেন। 'মর্কট এবং'। মর্কটীর।
—সত্যেন্দ্রনাথ : হসন্তিকা, 'গন্ধমাদন'

এখানে মর্কট+এবং=মর্কটেবং।

(গ) ব্যঞ্জনে-ব্যঞ্জনে—এপার্গঙ্গা। ওপার্গঙ্গা। মধ্যিখানে। চর,
তারি মধ্যে। বসে আছে। শিবু সদা। গর।

এখানে এপার্গঙ্গা=এপার+গঙ্গা, ওপার্গঙ্গা=ওপার+গঙ্গা, এবং আছেশিবু= আছেন+শিবু। এখানে স্মর্তব্য যে এহলো প্রাকৃত বাংলার স্বভাব অর্থাৎ হসন্তে-হসন্তে ছন্দোসন্ধি হয়েচে।[৪]

II. ছন্দোসমাস—এ হলো আরেকটি কৌশল। যেমন—
গুরু গুরু গুরু। নাচের ডমরু। বাজিল 'ক্ষণে। ক্ষণে'
—রবীন্দ্রনাথ

এখানে 'ক্ষণেক্‌খনে' এ-ভাবে উচ্চারিত হয়। কাজেই 'ক্ষণে ক্ষণে'—কে ছন্দের প্রয়োজনে একটি সমাসবদ্ধ শব্দ গণ্য করা যেতে পারে অর্থাৎ 'ক্ষণেক্‌' যার-'নেক্‌' দ্বিমাত্রিক।[৫]

III. মধ্যখণ্ডন—ছন্দের প্রয়োজনে শব্দ—বিভাজন কাম্য হ'য়ে ওঠে। এ তিন প্রকার, যথা—(ক) স্বরবৃত্তে : ৮+৬ ভঙ্গিতে—

প্রথিত মানুষ আমি। বিজয়ীর বেশে,
ঢুকবো মগজে তোমা। দের আর আমি
নায়কে সক্রিয় হবো। তোমাদের 'বীজে'
—অনিল বিশ্বাস : উদ্বেগ উপকূলে, 'ফাঁসি দেওয়া লোকটি'।

এখানে, তোমাদের=তোমা+দের।

(খ) যুগ্মধ্বনির খণ্ডন—পুর সুন্‌। দরীদের। প্রশস্তি। বাদীরা
সুন্দরী বিভাজিত হয়েচে, সুন্‌+দরীতে।

(গ) শব্দমধ্যে খণ্ডন—হায়রে রূপ। কার

না হয় কারো করোনি উপ। কার।[৫]

এখানে, রূপকার=রূপ+কার; উপকার=উপ+কার।

IV. অধিছন্দ—এ সম্বন্ধে আগেই বলা হয়েচে (৬.৩): 'নিরুক্তি'র (৩)—সংখ্যায়। পর্বের বাইরে শব্দ থাকে, তাই ধ্বনিহিল্লোল সৃষ্টি হয়। যথা—

আজি) এমন চাঁ। দের আলো। মরি যদি। সেও ভালো।

সে মরণ। স্বরগ-স। মান।

—দ্বিজেন্দ্রলাল রায়।[৫]

V. মড্যুলান—একই চরণের রকমারি পর্বের ছন্দোবৈচিত্র্য ঘটলে তাকে বলে modulation বা মড্যুলন। ইংরেজিতে এর প্রয়োগ দেখিয়েচেন অরবিন্দ, যেমন,

All, eye / has seen / all that / the ear / has heard /

Is a pale / il lu / sion by / that gre / ater voice /

That might / ier vi / sion. Not / the sweet / est bird /

Nor the / thrilled hues / that make/ the heart/rejoice /

Cane / qual those / divi / ner ecs / tasies.

এখানে মূল ছন্দ iambic বজায় আছে প্রতি চরণের শেষের দিকে। অর্থাৎ ভিত্তি হলো iambus, কিন্তু প্রতি পর্বেই প্রায় আছে সবরকমের চলতি modulation। যেমন, All eye এবং all that হ'লো trochee: Is a pale হলো anapaest; i-er vi glide anapaest অর্থাৎ প্রথম অক্ষরটি পিছলে ছোট হলো; sion by, Nor the, sion not এবং ta-sies হলো pyrrhic; thrilled hues হ'লো spondee.[৫]

বাঙলায় ছন্দে স্বরবৃত্ত, ধ্বনবৃত্ত ও বলবৃত্তের মিশ্রণ ঘটিয়ে এ-মডুলন করা যেতে পারে, যেমন—

কালান্তরে উড়ে যায়। বিশ শতকী বৈশাখী ঝড়ে।

নীলপীতের। সাম্রাজ্য। ভগ্নকণা,

রুশ, চীন, হাঙ্গেরীর। মুঠো মুঠো ধুলি পরে।

বজ্রবাজে। আকাশ-ছোঁয়া। মেঘে—

বার শো কোথায়। কোথায়রে আজ। শত্রুদমন।

ধনলুণ্ঠন। পর পীড়নের। জয়োল্লাস।

—অনিল বিশ্বাস: উদ্বেগ উপকূলে, "চেঙ্গিস"

এখানে প্রথম ও তৃতীয় চরণ স্বরবৃত্তের ৮+১০ ও ৮+৮ পদে বিভক্ত। দ্বিতীয় ও চতুর্থ চরণ স্বনবৃত্তের ৫+৫+৫ ও ৫+৫+২ এর পর্বে বিভাজিত। পঞ্চম ও ষষ্ঠ চরণ দু'টি বলবৃত্তের ৩+৩+৩ এর মেলে খণ্ডিত।

VI. বিকল্প ধ্বনিমূল্য—ধ্বনির হ্রস্বদীর্ঘতার পরে ছন্দোবৈচিত্র্য নির্ভর করে। তাই কবিরা কখনো কখনো বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে হ্রস্বকে দীর্ঘ আর দীর্ঘকে হ্রস্ব করেন। তবে এ ঘটে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে। এবার এর উদাহরণ দেয়া হলে—[৩]

(ক) যুক্তবর্ণের বিচ্ছেদে মাত্রাবৃদ্ধি—

হারামণি যারা। খুঁজিয়া এনেছে। তাহাদেরও এ। ই লীলাস্থলী।

—সত্যেন্দ্রনাথ ঃ অভ্র-আবীর, 'স্বাগত'

এখানে 'লীলাস্থলী' বিচ্ছিন্ন হয়েচে এ-ভাবে ঃ 'লীলাস্+থলী' এবং তাতে মাত্রাবৃদ্ধি ঘটেচে।

(খ) ধ্বনিসংঘাতে মাত্রাবৃদ্ধি—

লাগিল দোল। 'জলে স্থলে',। লাগিল দোল। বনে,

—রবীন্দ্রনাথ ঃ গীতবিতান (প্রেম), 'ওগো কিশোর'

তবে ধ্বনি সংঘাত বর্জনে মাত্রা হ্রাসও হতে পারে, যথা,

'স্থলেজলে' আমি। হাজার বাঁধনে। বাঁধা যে গিঁঠাতে। গিঁঠাতে

—রবীন্দ্রনাথ ঃ উৎসর্গ, 'সব ঠাঁই মোর'।

(গ) দ্বিরাচারী 'ঋ'—ঋ-এর দু'টি উচ্চারণ আছে ঃ একটি সংস্কৃত ; অন্যটি প্রাকৃত। অর্থাৎ একটিতে এ স্বর বলে গৃহীত এবং এটাই একমাত্রিক ; অন্যটিতে এ ব্যঞ্জনস্বরের মিশ্রণ এবং ফলে এ দ্বিমাত্রিক। সংস্কৃতে এ ছিলো 'র়্'-ধ্বনি এবং অন্য কোন স্বরধ্বনির আশ্রয় না নিয়েই হোত উচ্চারিত, যেমন 'কৃত'—শব্দের উচ্চারণ, ছিল 'কৃর্+ত বা 'ক্র়্+ত'। এখানে 'কৃ' অর্থাৎ 'কৃর়্' একটি অক্ষর (syllable) যার ব্যঞ্জনধ্বনি হলো 'ক্' এবং এই 'ক়্' পরবর্তী 'র্'-কেই আশ্রয় করে দণ্ডায়মান। ব্যঞ্জনের আশ্রয়ীভূত স্বর বলে বৈয়াকরণগণ এই 'র়্'-এর জন্যে একটি পৃথক বর্ণ 'ঋ' স্থির করেচেন। তবে প্রাকৃত বাংলায় 'র'-নামীয় স্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। এর উচ্চারণ 'রি'—'র্'—এর সঙ্গে যুক্ত 'ই' ধ্বনি। এ হলো ব্যঞ্জন স্বরের উচ্চারণ। তাই বাঙলা ভাষায় বর্ণমালার বাইরে 'ঋ' বা 'র়্'-এর অস্তিত্ব নেই। তবে সংস্কৃত শব্দের বানানেই এ অস্তিমান।[৬]

সংস্কৃত উচ্চারণ ঃ কী 'অমৃত' তুমি। চাহ করিবারে। পান

—গীতাঞ্জলি, 'হে মোর দেবতা'

'জতুগৃহে' ওই। সন্ধ্যা জ্বলিল,। সাবধান যত। অসাবধানী

—যতীন্দ্রনাথ ঃ অনুপূর্বা, 'কৃষ্ণা'

প্রাকৃত উচ্চারণ ঃ মরে আছে যারা। তারা আজ তব। 'অমৃত' নাহি। পায়

—নজরুল ঃ আনন্দমেলা, 'কিশোর রবি'

'জতুগৃহেতে'। আগুন লেগেছে। জ্বলে দাউ দাউ। গালার ঘর

—সজনী কান্ত দাস, শনিবারের চিঠি
১৩৪৯ কার্তিক।

এখানে লক্ষণীয় সংস্কৃত উচ্চারণে 'অমৃত' 'অ.মৃত' ; কিন্তু প্রাকৃত উচ্চারণে 'অম্‌ম্‌ত'। অনুরূপভাবে 'জতু.গৃহ' ও 'জতুগ্‌ গৃহ'।

(ঘ) বিসর্গের ত্রিধারূপ[৬]—বিসর্গ ব্যঞ্জন বলে স্বীকৃত। ছন্দে অনুস্বারের কোন তারতম্য নেই। শব্দান্ত বিসর্গ সাধারণত অনুচ্চারিত এবং এতে মাত্রাবৃদ্ধি ঘটে না, যথা,

হে 'মাতঃ' বঙ্গ। শ্যামল অঙ্গ। ঝলিছে অমল। শোভাতে

—রবীন্দ্রনাথ ঃ কল্পনা, 'শরৎ'

তবে উচ্চারিত হলে শব্দান্ত বিসর্গ 'হ' ধ্বনি প্রকাশ করে, যেমন,

চারিদিকে ঝালাফালা,
'উঃ' কি জ্বলন্ত জ্বালা!

—বিহারীলাল ঃ বঙ্গসুন্দরী, 'উপহার'।

শব্দমধ্য বিসর্গ পরবর্তী ব্যঞ্জনকে দ্বিত্ব করে দেয়, যথা—

লুপ্ত করেছে। আমার ভুবন। 'দুঃস্বপনের'। তলে

—রবীন্দ্রনাথ ঃ পরিশেষ, 'প্রশ্ন'

(ঙ) একাধিক হসন্তের বদ্ধাক্ষর—দুটি হসন্তে বদ্ধাক্ষর তৈরি হলে সেখানে মাত্রা গণনা হবে এরূপ। প্রথমত, স্বর ও ব্যঞ্জনের বদ্ধাক্ষর—পৌষ=প উ্‌ষ ; গৌড়=গউ্‌ড়। যথা,

একাক্ষরিক ঃ কান্নাহাসির। দোল দোলানো। 'পৌষ'—ফাগুনের। পালা

—রবীন্দ্রনাথ ঃ গীতবিতান (পূজা), 'কান্নাহাসি'

দ্ব্যক্ষরিক ঃ 'পৌষ' তোদের। ডাক দিয়েছে। আয়রে চলে।

—রবীন্দ্রনাথ, গীতবিতান (প্রকৃতি), 'পৌষতোদের'

ত্রিমাত্রিক ঃ 'গৌড়' আজিকে। গৌরব-হারা। যশোহরে নাই। যশের আলো

—সত্যেন্দ্রনাথ ঃ অভ্রআবীর, 'স্বাগত'

চতুর্মাত্রিক ঃ 'পউষ' প্রখর। শীতে জরজর। ঝিল্লিমুখর। রাতি

—রবীন্দ্রনাথ ঃ চিত্রা, 'সিন্ধুপারে'

আবার অন্যরকমের প্রয়োগ, যথা—

'কেইন-হটাও'। আন্দোলন আজ। দেখুন না নব। রূপ ধরে

—অনিল বিশ্বাস ঃ 'কালী-কলি-কলিকাতা'

এখানে 'ইন' দ্বিমাত্রিক। স্বভাবতই মাত্রানিরূপণ নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট উচ্চারণের উপর। শব্দের আদিতে এ একমাত্রিক, যেমন,

'বৌদ্ধ' নহিস। হিন্দু নহিস। নবীন হওয়া। তোর ব্রত

—সত্যেন্দ্রনাথ ঃ অভ্র-আবীর, 'গঙ্গাহৃদি বঙ্গভূমি'

এখানে 'বৌদ্ধ' শব্দের বৌদ্‌=ব+উ্দ্‌ একমাত্রিক। আবার দ্বিমাত্রিক ও বিকল্পে যথা,

আর্য আমরা। খাঁটি ও সাচ্চা

কালো, ধলো, বুলু। 'ব্রাউন্‌' বাচ্ছা।

—সত্যেন্দ্রনাথ, বিদায় আরতি, 'পাতিলৃপ্রমাদ'

দ্বিতীয় শ্রেণীর বদ্ধাক্ষর দুটি হসন্তে বা যুগ্ম ব্যঞ্জনে গঠিত। সংশ্লিষ্ট উচ্চারণে এ একমাত্রিক, বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে দ্বিমাত্রিক—শব্দশেষে দ্বিমাত্রিক, শব্দারম্ভে একমাত্রিক। যথা,

চল বড্ডু, রস। তত্ত্ব শিখিব। 'পোসট'—গ্রাজুয়েট। ক্লাশে

—সত্যেন্দ্রনাথ ঃ বেলা শেষের গান, 'নাপ্পি—পীরিতি কথা'

তবে, ব্যতিক্রমও আছে, যেমন,

দো জোখ্‌ 'বেহেশ্‌ত্‌'। এক হয় দেখি,। জ্ঞান হারা হয়ে। যাই

—মোহিতলাল ঃ বিস্মরণী, 'নুরজাহান ও জাহাঙ্গীর'

আর এই বৈকল্পিক ব্যবহারে ছন্দোবৈচিত্র্য বাড়ে বই কমে না।

এ-ছাড়াও আছে তিন বা চার হসন্তের বদ্ধাক্ষর—এদের উচ্চারণ হয় বিশ্লিষ্ট এবং মাত্রা পরিমাণ তিনের অধিক নয়, যথা,

নীলরতনের। খৃষ্টান ছেলে। নাম হল তার। 'চাল্‌র্স্‌',

বেতন তাহার। টাকায় নয়কো। পাউ্‌ণ্ড্‌স্‌' দরেই। পায়।

—সজনীকান্ত ঃ শনিবারের চিঠি[৩]

এখানে স্মর্তব্য যে 'খৃষ্টান' বানানটি ঠিক নয়। এ হবে 'খ্রীষ্টান'।[৬]

(চ) তাড়নজাত ধ্বনি—শব্দের মধ্যে ও শেষে 'ড' ও 'ঢ' থাকলে, বাঙলাতে তাদের উচ্চারণ হয় 'ড়', 'ঢ়'। কিন্তু সংস্কৃতে 'ড', 'ঢ'-এর এরূপ উচ্চারণ-পরিবর্তন

হতো না, মূল উচ্চারণই সব ক্ষেত্রে অক্ষত থাকতো। বাঙলাতে যেখানে আমরা বলি 'পীড়া, মূঢ়', সেখানে সংস্কৃত উচ্চারণ দিল 'পীডা, মূঢ'। আধুনিক বাঙলাতে 'ড, ঢ'-এর পরিবর্তিত উচ্চারণ জানাবার জন্যে 'ড, ঢ'-এর নিচে বিন্দু যোগ করা হয়—'ড়, ঢ়'। বিন্দুযুক্ত 'ড়, ঢ়' বর্ণ দুটি বাঙলায় নতুন—প্রাচীন বাঙলায় ও তার পূর্বেকার বর্ণমালায় বা লিপিতে 'ড়, ঢ়' নেই।[৬] দু'য়ের উচ্চারণ স্থান এক, রীতি ও প্রায় একই। ধ্বনির দিক থেকে দুটিই ঘোষ ধ্বনি—পার্থক্য শুধু বায়ুর নির্গমন পদ্ধতিতে। অর্থাৎ 'ড়' স্বল্পপ্রাণ, আর 'ঢ়' মহাপ্রাণ—একটি ঘোষ অল্প-প্রাণ, অন্যটি ঘোষ মহাপ্রাণ। দু'টি ধ্বনির উচ্চারণে জিভের ডগার উল্টোপিঠ উপর-পাটি দাঁতের গোড়াকে স্পর্শ কর্তে না কর্তেই দ্রুত নেমে এসে নিচের পাটি দাঁতের উপর উছলে পড়ে। সম্পূর্ণ প্রক্রিয়াটি খুব দ্রুত সম্পূর্ণ হয় বলেই এর নাম তাড়নজাত। যে গুণে স্পৃষ্টধ্বনি বর্গীয় পর্যায়ে উন্নীত হয়েচে, এদুটি ধ্বনির মধ্যে সেই গুণ নেই বলেই এরা বর্গীয় হয় নি। এরি ফলে এদেরকে অর্ধবর্গীয় বা দন্তমূলীয় তাড়নজাত ধ্বনি বলেও অভিহিত করা হয়।

তাড়নজাত 'ড়' ও 'ঢ়' ধ্বনির উচ্চারণ হলন্ত। এদের ধ্বনি প্রকৃতির বৈশিষ্ট্য এমন যে এদের উচ্চারকেরা পরস্পরকে স্পর্শ করার পর সেখানে কিছুক্ষণের জন্যেও আবদ্ধ থাকতে পারে না। জিভের ডগার উল্টো পিঠ দন্তমূলকে ছোঁয়ার সঙ্গে সঙ্গে উছলে পড়ে দেখে 'বাড়্', 'ষাড়্', আষাঢ়' প্রভৃতি শব্দে এরা হলন্ত উচ্চারণ পেতে না পেতেই এদের উচ্চারকেরা পৃথক হয়ে যায়; ফলে এদের উচ্চারণ হলন্ত ব্যঞ্জনধ্বনির মতো ধীরাশ্রয়ী নয়, বরঞ্চ দ্রুত নিষ্পন্ন। মহাপ্রাণ 'ঢ়' অন্যান্য মহাপ্রাণ ধ্বনির মতোই তার মহাপ্রাণতা হারিয়ে স্বল্পপ্রাণতার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছেচে। এ-কালের 'আষাঢ়' তাই মৃদু হ'য়ে 'আষাড়' হ'তে চলেচে। মনে রাখতে হবে যে 'ড়' ও 'ঢ়'-এর অবস্থান শব্দের আদিতে নেই; দুই স্বরের মাঝখানে আছে, যেমন 'পড়া' ও 'দৃঢ়'; শব্দান্তে, যথা 'কাপড়্' ও 'আষাঢ়্'। বাঙলায় স্বরবর্জিত হলন্ত উচ্চারণের যে মুক্তি (release) তাকে ধ্বনিতাত্ত্বিকেরা VC ə (V=স্বরধ্বনি; C=ব্যঞ্জনধ্বনি ও ə=মুক্তির চিহ্ন) ভাবে চিহ্নিত করেন। এ প্রযোজ্য শব্দান্ত 'ড়' ও 'ঢ়' সম্বন্ধে। আর দুই স্বরের মাঝখানে 'ড়, ও 'ঢ়' পুরোপুরি উচ্চারিত হয়। ফলে তাদের অন্তর্নিহিত কিংবা পারিপার্শ্বিক স্বরধ্বনির সঙ্গে উচ্চারণ হয় বলেই তারা পূর্ণভাবে মুক্ত উচ্চারণ পায়।[৭] যেমন,

হয়তো আমার কথাগুলো লাগবে কানে 'রূঢ়',
কিন্তু দেখো চুল পেকেছে, হয়ে গেলাম বুড়ো।

কিরণধন : নতুন খাতা, 'দুনিয়াদারী'

'রূঢ়' এখানে 'উ' ও 'অ'য়ের মধ্যবর্তী হসন্তের পরিণাম নির্দিষ্ট করে। অর্থাৎ

'ঢ়' এখানে পুরোপুরি উচ্চারিত হয়েচে পরবর্তী 'অ'-কারের জন্যে। 'রূঢ়', তাই দ্বিমাত্রিক।

এখানে রবীন্দ্রনাথের মূঢ়, রূঢ় ও গূঢ় শব্দের ব্যবহারের কথা এসে পড়ে।[৩] যেমন,

'মূঢ়' বলিয়া। করতালি দিয়া। যাও মোরে সম্‌।—ভাষি

—আকাশপ্রদীপ, 'পঞ্চমী'

'রূঢ়' দীপের। আলোক লাগিল।

—কথা, 'অভিসার'

নিম্নমুখে অন্তরের। 'গূঢ়' অন্ধকারে

—কাহিনী, 'গান্ধারীর আবেদন'

এখানে প্রথমটিতে ও দ্বিতীয়টিতে 'ঢ়' দ্বিমাত্রিকতা পেয়েচে, কিন্তু তৃতীয়টিতে একমাত্রিকতা। শেষোক্তটির কারণ অবশ্য 'গূঢ়'-এর পরে স্বরের আবির্ভাব অর্থাৎ 'অন্ধকারের' 'অ'। 'মূঢ়' ও 'রূঢ়'-এর ত্রিমাত্রিকতার কারণ তিনটি বর্ণের উচ্চারণ, যথা মূ+ঢ়্+অ। তিন মাত্রায় পরিণত হয়েচে—মূঢ়+অ (উ)—এ প্রথম অক্ষরে দ২ মাত্রা ও শেষ স্বরে একমাত্রা। যেহেতু 'ঢ়' সাধারণ হসন্ত উচ্চারণ নয় এবং এখানে এসেচে VC ২, তাই এই মুক্তির জন্যে এসেচে স্বরধ্বনি ২ বা কিরণধনের 'ও'-উচ্চারণ। তাই এ-উক্তি কেমন যেন বিসদৃশ ঠেকে যখন রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে বলা হয়ঃ "দীর্ঘস্বরান্ত 'মূ' ও 'রূ' দলের (অক্ষরের) দীর্ঘতা অর্থাৎ দ্বিমাত্রিকতা মেনে নেওয়া হয়েচে। রবীন্দ্রনাথ 'মূঢ়', 'রূঢ়' শব্দের উচ্চারণ করতেন 'মূঢ়্‌হ', 'রূঢ়্‌হ' রূপে"[৩]

(ছ) স্বরকল্পধ্বনি (vowellikes)—এগুলি হলো l, m, n, r অর্থাৎ ল, ম, ন, র। এদের কে বলা হয় vowellike, কিন্তু sonant নয়।[৮] Sonant—এ-বুঝায় ঘোষধ্বনি—অল্পপ্রাণ গ, জ, ড, দ, ব ; এবং মহাপ্রাণ ঘ, ঝ, ঢ, ধ ও ভ। এ-ছাড়া নাসিক্য ধ্বনি হলো ঙ, ঞ, ণ, ন ও ম—'ন' দন্তমূলীয় আর 'ম' ওষ্ঠ্য।[৯] আর স্বরকল্পধ্বনি শব্দগতভাবে ব্যঞ্জনের চেয়ে স্বরই, যদিও তার প্রত্যঙ্গীয় গড়ন ব্যঞ্জনের অনুরূপ। অন্যাদিকে অর্ধস্বর শব্দগতভাবে ব্যঞ্জনই, যদিও তার প্রত্যঙ্গীয় গড়ন স্বরের অনুরূপ।[৮] তাই স্বরকল্পগুলিকে sonant বলা ঠিক নয়।[৩] স্বরকল্প ধ্বনি সংশ্লিষ্ট ও বিশ্লিষ্ট উচ্চারণে নিয়ন্ত্রিত হয়—কখনো একমাত্রিক, কখনো বা দ্বিমাত্রিক, যথা,

একমাত্রিক ঃ লেডীজ 'প্যাটার্ণ'। পুরুষগুলোকে। অসহ্য লাগে। দ্যাখা
(র্‌ণ্‌)
—অপরাজিতা দেবী ঃ আঙিনার ফুল, 'মনের মত'

দ্বিমাত্রিক ঃ পেয়ালায়, 'মডার্ণ'। রিভিয়ুতে চাপা
(র্‌ণ্‌)
—রবীন্দ্রনাথ ঃ আকাশ প্রদীপ, 'বেজি'

একমাত্রিক ঃ হুই্‌স্‌ল—ধ্বনি। যেন দৈত্যের। বাহু
(স্‌ল্‌) —সজনীকান্ত ঃ রাজহংস, 'হুইস্‌ল'

দ্বিমাত্রিক ঃ হুইস্‌ল দিল। প্যাসেঞ্জারে। সাঁৎরাগাছির। ড্রাইভার
(স্‌ল্‌) —রবীন্দ্রনাথ ঃ ছড়া, 'শ্রাদ্ধ'

(জ) মুক্তাক্ষরের হ্রস্বদীর্ঘতা—অক্ষরের হ্রস্ব-দীর্ঘতা উচ্চারণগত ; তাই প্রয়োজনানুসারে এ হ্রস্ব দীর্ঘ হতে পারে ; আবার দীর্ঘও হ্রস্ব। রবীন্দ্রনাথ বলেন ঃ "বাংলা ভাষায় স্বরবর্ণের ধ্বনিমাত্রা বিকল্পে দীর্ঘ ও হ্রস্ব হয়ে থাকে। ব্যবহারের প্রয়োজনে একটা সীমার মধ্যে তাদের সংকোচন-প্রসারণ চলে। লয়ের দাবী রক্ষা ছাড়া বাংলা ছন্দে মাত্রা বাড়িয়ে-কমিয়ে চলার আর কোনো বাধা নেই। হসন্ত শব্দ স্বরবর্ণের বাধা না পাওয়াতে পরস্পর জুড়ে যায়। তাতে যুক্তবর্ণের ধ্বনি কানে লাগে। চল্‌তিভাষার ছন্দ সেই যুক্তবর্ণের ছন্দ। সাধু ভাষার কবিতায় বাংলা শব্দের হসন্তরীতি যে মানা হয়নি তা নয়। কিন্তু তাদের পরস্পরকে ঠোকাঠুকি-ঘেঁষাঘেষি করতে দেওয়া হয় না।"[২] এখানে প্রকাশ পেয়েচে বদ্ধাক্ষর ও মুক্তাক্ষরের নিয়মাবলী। এরি পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করা যাক কয়েকটি উদাহরণ।[৩]

মুক্তাক্ষর স্বতন্ত্রভাবে দ্বিমাত্রিক উচ্চারিত হয়, যেমন,

কাক ডাকে কা কা,
আগে 'অ' পরে 'আ'।
—যোগীন্দ্রনাথ সরকার ঃ হাসিখুশি, ১ম ভাগ

বাটি হাতে 'এ ঐ'
হাঁক দেয় দে দৈ।
—রবীন্দ্রনাথ ঃ সহজপাঠ, ১ম ভাগ।

সংলগ্ন উচ্চারণে কিন্তু যুক্তাক্ষর হয়ে যায় একমাত্রিক, যথা,

'কখগঘ' গান গেয়ে
জলে ডিঙি চলে বেয়ে।
—রবীন্দ্রনাথ ঃ সহজপাঠ, ১ম ভাগ।

এখানে 'কখ' আর 'গঘ' সংলগ্ন এবং তাই এদের উচ্চারণ একমাত্রিক—দ্বিমাত্রিক দু'টি অক্ষর বলে। স্বতন্ত্র ও সংলগ্ন উচ্চারণের উদাহরণ একসঙ্গেও মেলে, যথা,

বল্‌ ছিন্ন বীণে, বল্‌ উচ্চৈঃস্বরে
না, না, না, মানবের তরে
আছে উচ্চলক্ষ্য, সুখ উচ্চতর
না সৃজিলা বিধি কাঁদাতে নরে।
—কামিনী রায় ঃ আলো ও ছায়া, 'সুখ'

দ্বিতীয় চরণের 'না' দ্বিমাত্রিক, কেননা এরা স্বতন্ত্রভাবে উচ্চারিত, অন্যদিকে চতুর্থ চরণের 'না' একমাত্রিক, যেহেতু এ সংলগ্ন হয়েচে পরবর্তী শব্দের সঙ্গে।

VII. **প্রচাপ বা বলের মাত্রা**—বাঙলা ছন্দে শুধু যে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষরের উচ্চারণই মাত্রা নির্ধারক তা নয়। এখানে প্রচাপ (stress) বা বলও মাত্রার নিয়ামক। এ বুঝতে না পারায় ছন্দোবিদরা স্বরের আশ্রয় নিয়েচেন—এথেকে নিচে নামেন নি। তাই প্রবোধ চন্দ্র সেন[৩] মাত্রা বা কলায় নেমেচেন সাধু বাঙলার ছন্দে, আর অক্ষরে (তাঁর ভাষায় 'দলে') রয়ে গেচেন প্রাকৃত বাঙলার ছন্দে। কাজেই বাটখারা ভিন্ন ভিন্ন হওয়ায় বাঙলা ছন্দের পরিচয়ে ব্যর্থকাম হয়েচেন। তিনি দ্ব্যক্ষরিক ও পঞ্চাক্ষরিক পর্ব (মেল)-এর সামঞ্জস করেচেন শুধুমাত্র দৃষ্টান্ত উল্লেখ করে। যেমন—

বাইরে কেবল। জলের শব্দ। ঝুপ্‌ঝুপ। ঝুপ্‌

—রবীন্দ্রনাথ ঃ কড়ি ও কোমল, 'বিষ্টি, পড়ে টাপুর টুপুর।

'মাসি গো মাসি'। পাচ্ছে হাসি। নিম গাছেতে। হচ্ছে সীম।

—সুকুমার রায় ঃ 'আবোলতাবোল'

তিনি কোন কারণ দিতে পারেননি ; তাই বলেচেন ঃ "এ-বিষয়ে আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়"। এই বৈচিত্র্যের সমন্বয় সাধিত হয়েছে [৮.৩]-এর 'বলবৃত্ত'-এ। এর প্রধান কথা এই যে বলবৃত্তের বলের অভিব্রিুয়ায় অক্ষরের মাত্রা-পরিবর্তন ঘটে। ফলে সংকোচন ও প্রসারণ আসে মাত্রায়। উপরে দু'টি দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে ছন্দের চলন ৩+৩ মাত্রায়। তাই 'ঝুপ্‌ঝুপ্‌'-এ মাত্রা বৃদ্ধি ঘটেচে, যেমন ঘটেচে 'মাসি'-তে। অর্থাৎ আগেরটিতে আছে দু'মাত্রা বৃদ্ধি ; আর শেষেরটিতে একমাত্রা বৃদ্ধি। এ বুঝানোর জন্যে পর্ব না ব'লে বলবৃত্তের ছন্দো বিভাগের নাম দেয়া হয়েচে 'মেল'।

VIII. **মিল**—কার্ল শ্যাপিরো কবি, কাব্য ও মিলের সম্পর্ক এভাবে নির্ধারণ করেচেন কবিতায় ঃ

গুণাগুণ-পরীক্ষার সমগ্র নির্দ্দেশ
মানে কবি ; কাব্য করে তথ্যের অপেক্ষা।
সভ্যতার ছেঁড়া-খোঁড়া প্রান্তে কাঁদে মিল
তথ্যগুচ্ছ মাঝে।[১০]

এই 'মিল'কে তিনভাবে দেখা যেতে পারে—গাণিতিক ; ভৌত ; আধ্যাত্মিক। গাণিতিক অর্থে মিল একটি ঘাতাঙ্ক—এ তিন, বা ছয় অথবা যুগ্ম n-এর সাংখ্যিক ঘাতাংকে—উন্নীত গদ্য, যা নির্ভর করে বিশেষ কালের সাহিত্যের প্রবণতা ও

বিশেষ কবির ঝোঁকের উপর। কাজেই এ একাধারে উন্নীতকরণ ও তীক্ষ্ণতার পরিমাপ অর্থাৎ মিল যদি R হয়, P=গদ্য, তাহলে $R=P^{2n}$। ভৌত অর্থে মিল হলো বাক্ ও গদ্যের কেন্দ্রকীয় ও প্রাণিক উপাদান—জিভের ঠিক্-ঠিক্ প্রোটো-প্লাজ্‌ম্ অথবা সেই জৈব বস্তু যা স্বয়ংসৃষ্ট গড়নের পরেও বেঁচে থাকে। শব্দরাজি জীবন, মৃত্যু ও পরিব্যাপ্তির (mutation) মতোই ; আর কবি জীবনের অনুসন্ধানে শেখেন মিলের জীববিদ্যা। আধ্যাত্মিক অর্থে মিল হলো প্রেতাত্মা, আর গদ্য ভাষাদীপ্তি।[১১] এহলো ভাষার সঙ্গে মিল-এর আনুপাতিক সম্পর্ক $R=P^{2n}$, যেখানে n=সাহিত্য-প্রবণতা+কবির ঝোঁক। অর্থাৎ গদ্যেরই একটি বিশিষ্টরূপ হলো মিল। গণিতের ভাষায়—

$$R=P^{2n} \quad \cdots \quad \cdots \quad (34)$$

এবার বাঙলা ছন্দে মিলের কথা। মিল বলতে সাধারণত দুই চরণের শেষ দুই শব্দের ধ্বনিসাদৃশ্য বুঝায়। পূর্বে দুটি শব্দের শেষ বর্ণটি এক হলেই তা মিল বলে গণ্য হতো, যেমন গানে=বরণে ; হৃদ=ছাদ। এ উঁচু স্তরের মিল নয়। খাঁটি মিলের জন্যে প্রয়োজন শেষ বর্ণের স্বরধ্বনির মিল, যেমন গানে=প্রাণে ; হৃদ=নদ ; চাহি=নাহি। অন্ত্য বর্ণটি হসন্ত হলে সেই হসন্তবর্ণসহ পূর্ব স্বরবর্ণের মিল হওয়া চাই, যথা চল্=ছল্ ; উদাস=বাতাস্ ইত্যাদি। এ হলো ন্যূনতম প্রয়োজন। ছ'ভাগে মিল-এর শ্রেণীবিন্যাস হতে পারে।[১২] যেমন—

(১) যমক মিল (rich rhyme)—এহলো ভিন্নার্থবোধক একই শব্দের মিল, যথা,

আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি।
অন্যলোকে ভুরা দেয় ভাগ্যে আমি চিনি।
—ভারতচন্দ্র

(২) ললিত মিল (feminine rhyme)—এ যুক্তাক্ষর ঘটিত মিল এবং শেষের শব্দগুলিতে দ্বৈত মিলের আদল রয়েচে। যথা—বন্ধ=গন্ধ=ছন্দ ; নন্দন=চন্দন=ক্রন্দন।

(৩) একাধিক অক্ষরের মিল—যথা, কামিনী=দামিনী ; নয়ন=শয়ন।

(৪) খণ্ডিত মিল—এর উদাহরণ বেশি নেই। যাহোক নিচে একটি দেওয়া গেল। যথা,

শ্রাবণে ডেপুটিপনা—এতকভু নহে সনা তনপ্রথা, এ যে অনা সৃষ্টি অনাচার।
—রবীন্দ্রনাথ

(৫) মধ্যমিল (sectional rhyme)—এখানে মিলের শব্দগুলি একই চরণের অন্তর্গত। যেমন,

কোথা হা হন্ত চির বসন্ত আমি বসন্তে মরি
—রবীন্দ্রনাথ

অনুপ্রাসের জন্যে এ মিলের ভিন্নরূপও আছে, যেমন,

পাইনু সরমা সই পরমা পীরিতি

—মধুসূদন।

(৬) বিলোম মিল (inverse rhyme)—মোহিতলাল একে 'জোড় মিল' বলেন। যথা—

যখন কেউ প্রবীনভণ্ড মহাষণ্ড পরেন হরির মালা

—দ্বিজেন্দ্রলাল।

এ-ছাড়া মিলের দোষও আছে, আর এ দেখা যায় এভাবে—

(i) চোখের (কানের নয়) মিল (eye rhyme)—যথা, দেখা=লেখা, তব=সব।

(ii) শুধু স্বরের মিল— কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ
কহিল, ওস্তাদ জি।
গানের মত গান শুনায়ে দাও,
এরে কি গান বলে, ছি!

—রবীন্দ্রনাথ

(iii) বৈঠিক উচ্চারণের মিল—যেমন 'তৃণ=লীণ'—এ প্রথমটি স্বরান্ত উচ্চারণ, কিন্তু দ্বিতীয়টি হলন্ত উচ্চারণ।

(iv) মিলের খাতিরে শব্দের বানান, ব্যাকরণ প্রভৃতি লঙ্ঘন—একে 'আর্ষ প্রয়োগ' বলে। যেমন—

মাগো, একবার ঝঙ্কারো বীণা,
ধরহ রাগিনী বিশ্ব-প্লাবিনা

—রবীন্দ্রনাথ ঃ সোনার তরী, 'পুরস্কার'

এখানে 'প্লাবিনী'র পরিবর্তে এসেচে 'প্লাবিনা', কারণ 'বীণা'র সঙ্গে মিলের প্রয়োজন।

এবার কয়েকটি নতুনত্বের কথা বলা গেল নিচে—

(১) খাঁটি ধ্বনি-সাদৃশ্যের মিল—যথা, খেয়াপার=কে আবার। দ্বিজেন্দ্রলালের একটি মিল স্মরণীয়,

পত্নীর চাইতে কুমীর ভাল—বলেন সর্বশাস্ত্রী।
কুমীর ধল্লে' ছাড়ে তবু, ধল্লে' ছাড়ে না স্ত্রী।

—হাসির গান

(২) টানা-মিল (tumbling rhyme)—এ মিল একাধিক অক্ষরে বিস্তৃত হয়, যথা, বৈয়াকরণ=লইয়া চরণ ; গোপন ঘরে=যতন করে।

(৩) দু'টি শব্দের মিলে, মিলরক্ষা হয় প্রথম দুটি যুগলে, দ্বিতীয় যুগলে একই শব্দ—যথা, দুলিয়ে দাও—ভুলিয়ে দাও।

(৪) বিউনি-মিল (terza rima)—তিন পংক্তির এ মিল ইতালীয় terza rima, যার ইংরেজি নাম interlaced rhyme। যথা,

কোথায় এলাম কোন মুলুকে, দেখচি কেন সর্ষের ফুল।
শ্মশান গোরে তৈরি কেন সারি সারি পায়রা—বাসা ?
কয়েদখানার পূরবে নাকি, ধরবে আমার ঝাঁক্ড়া চুল !
না-না-না- ভয় নেই তোর, দেখনা চেয়ে শিবির খাসা,
থাকতে দেবে ঐ না তাঁবু, জোগাবে তোর খানাপিনা।
বলিস্ কিরে ; কেম্নে হবে, কথা যে তোর সর্বনাশা—
চালচুলো নেই, হায়রে বাসা, বাতাস হ'লে বাজায় বীণা ;
বৃষ্টিবানের বেনো জলে, কাঁদায় শুধু কাদা মাটি ;
শোবার ঘরের একী ছিরি, ভাবতে তনু হয় যে ক্ষীণা !

—অনিল বিশ্বাসঃ বাঁকাজল, 'শিবির'

(৫) চতুষ্কে (quatrain) ঢ্যারা (cross) বা একান্তর (alternate) মিল—যেমন,

ব্যক্তি-ডাইনামো-উৎসারিত শক্তিক্ষরে সমাজে ধরায়,
নিজত্ব বিকায় শুধু সাম্যবাদের সমীকরণে,
দেশ কালের ব্যাপ্তিসত্তায়।
সামাজিক পরিণতি আসে মূল্যায়নে।

—অনিল বিশ্বাস ঃ পদধ্বনি, 'নিদান'

(৬) চতুষ্কে বেড়া মিল (enclosing rhyme)—যথা,

অচৈতন্যে বিশ্বডোবে। ওড়ে শত প্রাণন-বলাকা
বস্তুর অতীত লোকে, হায়েনা-হর্মোন ধর্ষকাম
হরফ-লেখনে লেখে যুরোপার নব পরিণাম
উনিশ্ শো চুরাশী সালে—যুযুধান মস্তিষ্কের পাখা।

অনিল বিশ্বাস ঃ বাঁকা জল, 'অতিবাস্তব স্বপ্ন'

৯.৩. চরণ ও কুলক

ছন্দের চাল ও চলনের কথা আগেই বলা হয়েচে—চলন হলো পদক্ষেপ ; চাল প্রদক্ষিণ। যেখানে প্রদক্ষিণের শেষ সেখানেই চরণ শেষ হয়। কাজেই চাল বা প্রদক্ষিণ হলো চলন বা পদক্ষেপের সমষ্টি। এই চাল-চলনের পার্থক্য নির্ণয় একটি গুরুতর বিষয়। যেমন—

সকাল বেলা। কাটিয়া গেল।
বিকাল নাহি। যায়।

এখানকার চলন এগিয়েচে ৫-মাত্রায় ; আর চাল হলো ১৭ মাত্রার অর্থাৎ ১৭-মাত্রায় এসে প্রদক্ষিণ শেষ হয়েচে। কিন্তু এখানে দুটি ভাগ আছে চরণের—৫+৫ এবং ৫+২-এর। কিন্তু যদি এমন হয়,

সকাল বেলা। কাটিয়া গেল,।
বকুলতলে। আসন মেল।

তবে এ দু'টি চরণ, কেননা এর চলন ৩+২ এ, আর চাল-এর মাত্রা সংখ্যা ৫+৫। দুটি চরণেই এই মাত্রাসংখ্যা ঠিক আছে।[১]

I. **চরণ**—এখানে মনে রাখতে হবে যে "ধ্বনির দুই মাত্রা এবং তিনমাত্রা বাংলা ছন্দের আদিম এক বুঢ়িক উপাদান। বলা যায় দুই এবং তিন সংখ্যাই বাংলার সকল ছন্দের মূলে।"[২] তাই এই দুই ও তিনের সমবায়ে গড়ে ওঠে চরণবিন্যাস। উদাহরণ দেয়া হলো নিচে—

(১) দ্বিমাত্রিক চলন ঃ তারা। গুলি। সারা। রাতি। কানে। কানে। কয়।
সেই। কথা। ফুলে। ফুলে। ফুটে। বন। ময়।
—রবীন্দ্রনাথ ঃ ছন্দ

(২) ত্রিমাত্রিক চলন ঃ নয়ন। ধারায়। পথ সে। হারায়।
চায় সে। পিছন। পানে।
—ঐ

(৩) চতুর্মাত্রিক চলন ঃ চকমকি। ঠোকাঠুকি। আগুনের। প্রায়।
চোখো চোখি। ঘটিতেই। হাসি ঠিক্‌। রায়।
—ঐ

(৪) পঞ্চমাত্রিক চলন ঃ তমাল বনে। ঝরিছে বারি। ধারা।
তড়িৎ ছুটে। আঁধারে দিশা। হারা।
—ঐ

(৫) ষড়্‌মাত্রিক চলন ঃ কত সাধনার। ফলার আঘাতে। দীর্ণ হয়েচে। মাটি
—অনিল বিশ্বাস ঃ পদধ্বনি 'উদগতি'।

(৬) সপ্তমাত্রিক চলন ঃ খাঁচার ফাঁকে ফাঁকে। পরশে মুখে মুখে।
নীরবে চোখে চোখে। চায়
—রবীন্দ্রনাথ

(৭) অষ্টমাত্রিক চলন ঃ গগনে গরজে মেঘ। ঘনবরষা
তীরে একা বসে আছি। নাহি ভরষা
—রবীন্দ্রনাথ, 'সোনার তরী'

(৮) নবমাত্রিক চলন ঃ গভীর গুরুগুরু রবে।
বাজিতেছে মেঘ—রাগিনী।
—রবীন্দ্রনাথ

(৯) দশমাত্রিক চলন ঃ হে নিস্তব্ধ গিরিরাজ। অভ্রভেদী তোমার সঙ্গীত।
তরঙ্গিয়া চলিয়াছে। অনুদাত্ত উদাত্ত স্বরিত।
—রবীন্দ্রনাথ

এখানে লক্ষণীয় যে (১) টির চাল ১৪-মাত্রার অর্থাৎ কিনা ১৪-মাত্রার চরণ ; (২) টি ২০-মাত্রার চরণ ; (৩) টি ১৪ মাত্রার ; (৪) টি১২ মাত্রার ; (৫) টি ২০-মাত্রার ; (৬) টি ২৩ মাত্রার ; (৭) টি ১৩ মাত্রার ; (৮) টি ১৮ মাত্রার ; এবং (৯) টি১৮ মাত্রার চরণ।

II. কুলক

কবিতার প্রতিটি পংক্তি এককেটি ছন্দে বিধৃত। এই পংক্তিকে চরণ বলা হয়। এরা আবার বিন্যস্ত হয় কয়েকটি চরণসংখ্যায়। কাজেই গোটা কবিতাটি এরকম চরণবিন্যাসে রূপ পায়। এ-রকম চরণবিন্যাসের নাম ইংরেজিতে stanza, যার জন্ম ১৫৮৮ সালে। এশব্দটি এসেচে লাতিন stantem বা stare অর্থাৎ দাঁড়ান থেকে ঃ জনপ্রিয় লাতিনে এ stantia। পরে ইতালীয় রূপে এর মানে দাঁড়ায় 'বিরতি স্থান, ঘর'। ছন্দশাস্ত্রে এর সংজ্ঞা হলো ঃ "পদ্যপংক্তি সমষ্টি (সাধারণত চার-এর কম নয়), যা পংক্তি সংখ্যা ও ছন্দ নিয়ামক নির্দিষ্ট কল্প অনুসারে বিন্যস্ত এবং সমিল কাব্যে মিলের পারম্পর্য ; ঐ একই কল্প অনুসারে তৈরি এ-রকম সমষ্টি শ্রেণীর কবিতা বা সংগীতের এক স্বাভাবিক বিভাগ"[১৩]। সংস্কৃতে এ বোঝাতে ব্যবহৃত হতো "কুলক" এবং এর অর্থ আপ্তের মতে ঃ "ব্যাকরণ সম্পর্কে চরণ সংখ্যা ৫ থেকে ১৫ সংখ্যক চরণ, যাতে একটি বাক্য সম্পূর্ণ হয়"।[১৪] এরি উদাহরণ হলো 'শিশুপালবধ'-এর I. ১-১০ শ্লোক ; 'কুমার সম্ভবের' I. ১-১৬ ; ও 'রঘুবংশ'-এর I. ৫-৯। কাজেই 'কুলক' শব্দটি stanza-র প্রতিশব্দ হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে ব্যাপকতর সাধারণ অর্থে। মনে রাখতে হবে যে 'কুলকে'র লক্ষণ হলো ছন্দগ্রন্থিলতা অর্থাৎ ছন্দ ও মিলের একটি বিশেষ গ্রন্থিবন্ধন। চরণ বিন্যাসের কৌশলে এখানে সৃষ্টি হয় একটি সামগ্রিক ছন্দ সংগীত। আর কবিতার মধ্যে এরূপ ছন্দোবিভাগে কাব্যের অখণ্ডতা নষ্ট হয়

না—'একটি মূলভাবকে ডোর করে তাতে এক একটি বিশেষ প্যাটার্নের ছন্দগ্রন্থি দিয়ে মালা গাঁথা।'[১২]

এবার এই কুলকের শ্রেণীবিভাগ নিরূপিত হচ্ছে। চরণ-সংখ্যা দুই থেকে দশ পর্যন্ত হতে পারে। দুটি চরণের 'কুলক' 'শ্লোক'-নামে অভিহিত। যথা,

নামটি খাসা সীতারামের নেই কো সীতার দেখা,
রামচন্দ্রতো নামেই আছেন বল্‌চে শাস্ত্রলেখা।

—অনিল বিশ্বাস ঃ পদধ্বনি, 'ছড়া (২)'

তিন চরণের কুলক, যার ইংরেজি নাম interlaced rhyme ও ইতালীয় নাম terza rima। যথা—

অতিক্রান্ত শতাব্দীর সাম্রাজ্য দ্রৌপদী, মনে পড়ে স্বয়ম্বর
সেদিনের রাজাদের ভিড়। অস্ত্রের ঝঞ্চনা, বিদ্যুদভিযাণ
তীরন্দাজ অভীপ্সার। কত শর ক্ষেপণের অক্লান্ত সফর?
নিষ্ফল প্রচেষ্টা প্রান্তে শরাসনে শক্তি পার্থ যেমনি দিল টান,
বীরভোগ্যা হ'লে কৃষ্ণা। সেই থেকে শুরু হ'ল তোমার ভ্রমণ
কালায়নে। যুগে যুগে জিনে নেয় পাঞ্চালীকে পাণ্ডুর সন্তান।

—অনিল বিশ্বাস ঃ পদধ্বনি, 'দ্রৌপদী'

চার চরণের কুলক-কে বলে চতুষ্ক (quatrain)-যথা, ক খ গ খ

কত ব্রহ্মের গৈরিক বাসে ধূসর হয়েচে ধরা,
সাধনা শুনেচে নির্বাণ মর্মর ;
খুলেচে দুয়ার স্বর্গরাজ্যে, মর্ত্ত্য পড়েচে ঢাকা,
জেগেচে নিছক দিক্‌হীন বালুচর।

—ঐ, 'স্বর্গ হ'তে বিদায়'

পাঁচ চরণের কুলক 'পঞ্চক' নামে অভিহিত, যথা,

লিয়ার বন্দী আজ হৃদয় দানে।
পোড়ো মাঠে মাথা কোটে ঝড়ে ও বানে।
আনাচে-কানাচে জোটে, রাজ্য তো তার লোটে,
বর্শাতো গণারিল, রিগানে হানে।
যন্ত্রী ডুকরে কাঁদে যন্ত্রটানে ॥

—অনিল বিশ্বাস ঃ বাঁকাজল, 'আধুনিক লিয়ার',

ছ'টি চরণের কুলক হলো 'ষড়ক'। এরি উদাহরণ মাইকেলের 'আত্মবিলাপ' ঃ কখ কখগক। সাতটি চরণের কুলক 'সপ্তক'—নামে অভিহিত। যথা,

একদিন প্রেম ছিলো, ছিলো ভালবাসা—
মেঘের আকাশী নীলে রৌদ্র বিচ্ছুরণ ;
রঙেরঙে রং-রেজিনী, সপ্ত রঙে রঙ্ ছুট খেলার উৎসব ;
পথে-পথে সুরভিত গোলাপী আঘ্রাণ।
অঘ্রাণের ধান খেতে বাতাস মন্থর,
আনন্দ হিল্লোলে হাওয়া নেচে নেচে যেত
ধরণীর শ্যাম স্নেহে।

—ঐ ঃ 'স্মৃতি'

আটটি চরণের 'কুলক'-কে বলে 'অষ্টক', যথা,

এক যে ছিলো পরমাণু পুরাকালের খেলোয়াড়।
খেলাধূলার জুড়ি খোঁজা বাই যে ছিল তার।
অনেক ভেবে দু'খান হলো, পুত্র কন্যা শেষে,
সার্কাসেতে জুড়লো তাদের ঘোড়-সওয়ার বেশে।
নিত্যই হয় খেলা ঘরে ভানুমতীর খেল—
হার জিতের দোলায় দোলে পাশ কভু ফেল।
ঘোড়া যখন লাগাম ছিঁড়ে চলে লাফের তালে,
পরিয়ে দেয় সে রঙের টিপ দর্শকের ভালে।

—অনিল বিশ্বাস ঃ পদধ্বনি, 'পরমাণু'

ন'টি চরণের কুলক হলো 'নবক'। এরি দৃষ্টান্ত হলো রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'—কবিতাটি। দশটি চরণের কুলক 'দশক'—নামে পরিচিত। যেমন,

জীবনও নিমেষের ; পাখি ক্ষণ-চারী।
যুগযুগ ধরে তাইতো ক্রন্দসী তুমি, হে মহাপৃথিবী।
একে একে জড় হয় শেষে তোমার কোলেতে
কতনা পাখির ঝাঁক, স্থান দাও, স্থান দাও, বলে।
তাদের আকুতি শোনো, ঊর্ধ্বে তোলো আপনাকে।
চাপো না নিজেকে নিচে, স্থান করে দাও তাকে।
মৃদু স্নেহে ঢেকে দাও আস্তরনে, যেমন সন্তানে মাতা
ঢেকে রাখে বস্ত্রাচ্ছাদে, জানো তুমি এ মহাজীবনে
সৎ নেই, নেই কো অসৎ ; মৃত্যু নেই, নেই কো অমৃত ;
জাগে শুধু নিরঞ্জন একক মহিমা।

—অনিল বিশ্বাস ঃ বাঁকাজল, 'মহাপৃথিবী'

মোহিত লালের 'প্রেম ও জীবন' (স্মরগরল) এই 'দশকে'-র উদাহরণ—এর মিল এরূপ ঃ কখ কগ গঘ ঙগ ঘঙ।

৯.৪ গদ্যিকা, গদ্যকাব্য ও মুক্তক

(৫.২)-এ গান, গদ্য ও পদ্যের আলোচনা হয়েচে। প্রথমেই স্পন্দের কথা। আমাদের প্রত্যেকেরই ধ্বনিক্রমের বিন্যাস ও বিভেদনের মন্ময় অভিজ্ঞতা আছে। এ ধ্বনিক্রম তৈরি হয় একই রকম বাস্তব ধ্বনিতে এবং তারা সম্পূর্ণভাবে নিয়মিত কালান্তরালে একটি আরেকটির অনুবর্তন করে। যেমন, ঘড়ির টিক্‌টিকানি টিক্-টিক্-টিক্-টিক্-এর জায়গায় আমরা শুনি টিক্-টক্-টিক্-টক্। এতে স্পন্দ ধারণা থেকে বাদ দেওয়া হয় নিছক নিয়মিত পুনর্বৃত্তিকে। এখানে লক্ষণীয় যে গুণগত ও পরিমাণগত ধ্বনির সম্পূর্ণ নিয়মিত অনুক্রম—বাস্তব স্পন্দশূন্য শ্রেণী—অধিকাংশ লোকের কাছে মনে হয় স্পন্দমান বা স্পন্দিত, যদি হার বর্তমান থাকে ০'৮ থেকে ০'১৪ সেকেণ্ডের সীমার মধ্যে। এর থেকে মন্থরতর হারে দু'য়ের বিন্যাস হবে, আর হার বাড়লে ৪ বা ৮-এর বিন্যাস হবে। ৩ ও ৬-এর বিন্যাসও আছে, তবে কখনো-কখনো ; এই সীমার বাইরে মন্হরতর হারে কোন বিন্যাসেই দেখা যায় না ; আর দ্রুততর হারে শ্রেণীতে শুধুই লক্ষণীয় এক পর্যাবৃত্ত, তীব্র পরিবর্তন।[১৫]

ভাষার সন্তত প্রবাহে আমাদের স্পষ্ট চেতনা বলন, শ্রবণ বা পঠন কালে নির্ভর করে দু'টি জিনিসের উপর—এক, স্পন্দমান আদর্শের লঘু বা গুরুকরণে আমাদের ব্যক্তিগত প্রবণতা ; দুই, বিশেষ অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আমাদের গুরুত্ব বোধ। স্পন্দ ধারণা তাই দৃশ্য কলার আকৃতি বা রূপের সমতুল্য। James Ward তাই মনে করেন ঃ "সরল বা জটিল যেমনই হোক না কেন, স্পন্দ জ্যামিতিক চিত্রের মতোই এক সত্যিকার স্বজ্ঞাত (intuitive) ঐক্য।"[১৫] বস্তুত এহলো অনুক্রমিক ধারণার গেষ্টাল্ট (gestalt), দৃশ্য রূপের তুল্য মূল্য, যার সামগ্রিকতা ও প্রত্যক্ষজ তাৎক্ষণিকতার উপর জোর দেন গেষ্টাল্ট মনোবিদ্‌রা। বাক্-এর স্পন্দমান এককের সঙ্গে তুলনীয় আকৃতি, যা আমাদের দৃশ্য পরিবেশকে ছাঁচে রূপায়িত করে। অর্থাৎ আমাদের দেয়াল-মেঝে, টেবিল-চেয়ার ও টেলিফোন-টাইপ রাইটার-এর দৃশ্যরূপায়নে আয়তক্ষেত্র, ত্রিভুজ, বিষমাকৃতি বহুভূজ, বৃত্ত, স্তবক ও উপবৃত্তগুলির মতোই বাক্-এর এককগুলি।[১৬]

I. গদ্য ও পদ্যের স্পন্দ

পদ্যের চরণ সমব্যাপ্তির মাপে বিভক্ত—প্রত্যেকেরই আছে একটি প্রধান প্রচাপ, যা একই কালান্তরালে আসে। এ-সব পর্যায়ের সমকালীনতা হলো স্পন্দের মৌল তথ্য—পদ্য-স্পন্দ কালশায়ী অক্ষর সংখ্যার সমতা বা সাদৃশ্য-জাত নয়, কেননা

অক্ষর সংখ্যা পরিবর্তনশীল এবং অনেক সময় মৌন বা বিরতি এক বা ততোধিক অক্ষরের স্থান নিতে পারে।[১৭] মনে রাখতে হবে যে পদ্যের ভিত্তি হিসেবে সমকালীন অন্তরালের অনুসন্ধান হলো আলেয়ার পিছনে ছোটা। এরি পশ্চাদ্‌পটে রয়েচে এই ভুল ধারণা যে স্পন্দ কালিক ঘটনার নিয়মিত পুনর্বৃত্তি। কিন্তু প্রকৃত তথ্য এই যে ধ্বনি বা বিচলনের রূপকল্পের নিয়মিত পুনর্বৃত্তিতে আমরা ছাঁচের দিকে আকৃষ্ট হতে পারি সত্যি, কিন্তু ছাঁচটি নিয়মিত পুনর্বৃত্তি-নির্ভর নয়। এই ছাঁচটি এর পুনর্বৃত্তির জন্যে অস্তিমান নয়, কিন্তু ঘটনাক্রম থেকে একটিকে সামগ্রিক প্রত্যক্ষ ধরে নেয়ায়। কাজেই বাক্‌-স্পন্দের সঙ্গে ছন্দের সম্পর্কে আছে আপাত বিরোধী দু'টি সম্ভাবনা। এক, চরণের ছন্দোবিন্যাস শব্দের দুই বা ততোধিক বাক্‌স্পন্দের মধ্য থেকে একটি নির্বাচন করে। দুই, শব্দার্থ বিভিন্ন স্পন্দ থেকে একটি বেছে নেয়, যা ছন্দের সঙ্গে খাপ খায়। উভয় ক্ষেত্রেই বাক্‌স্পন্দ মৌলিক ও অলঙ্ঘনীয়।

মধুসূদন সাধু বাঙলার সমতলকে ঝংকৃত কর্তে চেয়ে ছিলেন এবং তাই তিনি অমিত্রাক্ষর ছন্দে যুক্তবর্ণের ধ্বনি পদে-পদে ব্যবহার করে পয়ারের একটানা চালে শক্তি সঞ্চার করেচেন। ফলে 'মেঘনাদবধ'কাব্যের আরম্ভেই প্রকাশ পেয়েচে—

সন্মুখ সমরে পড়ি বীর চূড়ামণি
বীরবাহু চলি যবে গেলা যমপুরে
অকালে!

প্রাকৃত বাঙলার ছন্দে এ দাঁড়ায় রবীন্দ্রনাথের হাতে—

যুদ্ধ যখন সাঙ্গ হল বীর বাহুবীর যবে
বিপুল বীর্য দেখিয়ে হঠাৎ গেলেন মৃত্যুপুরে
যৌবনকাল পার না হতেই।

এই দু'টি—সাধু বাঙলা ও প্রাকৃত বাঙলা—বাক্‌স্পন্দ থেকে কবিকে একটি বেছে নিতে হয়। তবে বাক্‌স্পন্দই এখানে অব্যর্থ এবং এর ব্যত্যয় চলে না। তাই হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ বাঙলায় চালাতে গিয়ে দ্বিজেন্দ্রনাথ হাস্য রসের আমদানি করেচেন—

বিলাতে পালাতে ছটফট করে নব্য গউড়ে।[১৮]

এ হলো প্রথম সম্ভাবনার পরিচিতি।

এবার দ্বিতীয় সম্ভাবনার কথা। এ দু'য়ের ভিতর পার্থক্য আছে। প্রথমটি ছন্দের দিক থেকে বাক্‌-স্পন্দের দিকে ছোটে; দ্বিতীয়টি স্পন্দ থেকে ছন্দে যায়; আর একাজের সহায়ক হলো শব্দার্থ অর্থাৎ শব্দার্থই স্পন্দ-নির্বাচনের কাজ করে। প্রথমটিতে নির্বাচন করেচে ভাষার প্রকৃতি, সাধু বাঙলা বা প্রাকৃত বাঙলা।

ঢোলকের স্পন্দ, মাদলের স্পন্দ প্রভৃতির মধ্য থেকে একটি তাল অর্থাৎ খেমটা নির্বাচিত হলে তাতে থাকে তিনমাত্রার চলন। আর এই স্পন্দ মিলে যায় বলবৃত্ত ছন্দের ত্রিমাত্রিক চলনের সঙ্গে। যথা—

।　　　　　।　　　　　।　　　　।
টুমুস টুমুস। বাদ্যি-বাজে-। লোকে-বলে-। কী ০০
।　　　　　।　　　　　।　　　　।
শামুক রাজা-। বিয়ে-করে-। ঝিনুক রাজার। ঝি ০০[১৮]

গদ্যও নিয়ন্ত্রিত হয় একটি আদর্শে। এখানে শব্দাবলী দু'টি ছাঁচে বিন্যস্ত হয় এবং এ ঘটে দু'টি প্রণালীর যুগপৎ প্রয়োগে—এক, অর্থ ও পদক্রমের ছাঁচ ; দুই, ধ্বনি ও বিচলনের ছাঁচ। Munro ইব্‌সেনের 'বুনো হাঁসের' বিশ্লেষণে চিত্রের সাহায্যে দেখিয়েচেন নিলম্বনের (suspense) ওঠা-নামার ছাঁচ। আর এই রূপকল্পই স্পন্দের আনুরূপ।[১৯] গদ্যে এবং পদ্যেও প্রকাশক স্পন্দ শক্তি উৎপাদের একটি দিক। বিস্তার, আকস্মিকতা, ক্ষরণ হারের পরিবর্ত্তি, মসৃণ অনবচ্ছেদ বা বিরতি প্রভৃতি স্পন্দে দেখা দেয় শক্তিক্ষয়ের লক্ষণ হিসেবে, আর এরা প্রকাশ করে দেহ ও মনের অবস্থা, যেমন, শান্তি, অনিশ্চয়তা ও সংশয়, বিশ্বস্ত প্রতিশ্রুতি, নির্ধারণ, জোর, অবসাদ প্রভৃতি। স্বভাবত বাক্‌-ও-গদ্যে গ্রথনের (texture) অধিকাংশই আবেগের দিক থেকে উদাসীন। আর তা না হলে সব যোগাযোগেই আমাদের থাক্‌তে হতো চিরস্থায়ী উত্তেজনার মধ্যে। যখনই কোন বাক্যাংশ পৃথকীকৃত হয় বা এতে জোর দেওয়া হয় আর এর আবেগ মূল্য সংজ্ঞিত হয় স্বরভঙ্গি, কালায়ন, প্রচাপের বিভেদন মাত্রা এবং বাক-এর অন্যান্য গুণাবলীতে, তখনি এর স্পন্দ সামগ্রিক অভিক্রিয়াকে যথেষ্টভাবে প্রভাবিত করে। অধিকাংশ সময় এ অপ্রকট থাকে এবং কেবল প্রসঙ্গক্রমে এর কিছু অংশ অঙ্গভঙ্গিতে প্রকাশ পায়। এই প্রকাশের দিক্‌ ছাড়া আছে দ্বিতীয় একটি দিক্‌ নাম যার 'নান্দনিক'। অনেক সময় দুটি দিকই—প্রকাশক ও নান্দনিক—নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত হয়, যেমন Synge-এর রচনায়। এহলো ইংরেজি-আইরিশ-এর হেলান স্পন্দ।

গদ্য ও পদ্যের মধ্যে পার্থক্য হলো পংক্তি ঃ গদ্যে এ কেবল মুদ্রন প্রয়োজন জাত, যা পঠনে উপেক্ষিত ; পদ্যে এ হয়ে দাঁড়ায় স্পন্দের একটি একক আর পংক্তি শেষ হ'য়ে যায় 'চরণ'-এ যা যতিপ্রয়োগের বিশেষ রূপে মর্যাদা পায়। এই পংক্তি স্পন্দের ক্ষুদ্রতর এককে তৈরি, আর স্পন্দমান বিভিন্ন উপ-এককের পংক্তিতে থাকে ঈষৎ বিরাম বিন্দু বা ছেদ, যাতে চরণ দু'টি স্পন্দমান অংশে ভাগ হ'য়ে যায়। উপ-এককের রূপ কিন্তু স্বাভাবিক বাক্‌-স্পন্দের অনুরূপ। ছন্দিত পদ্যে ছন্দই বেছে নেয় সম্ভাব্য একাধিক বাক্‌-স্পন্দের মধ্যে কোনটি গ্রহণ যোগ্য। কিন্তু ছন্দ ও বাক্‌ স্পন্দের মধ্যে বিরোধ ঘটলে, বাক্‌ স্পন্দই অগ্রাধিকার পায়।

এ ফল যদি স্পন্দের দিক থেকে গ্রহণ যোগ্য হয়, তবে ছন্দোবিদ্‌রা ছন্দোবিচ্যুতিকে অনুমতি যোগ্য ছাড়পত্র দেন আর গ্রহণ যোগ্য না হলে বলেন ছান্দসিক ত্রুটি। উদাহরণে জিনিসটি পরিষ্কার হবে। মধুসূদনের "সম্মুখ···অকালে"-তে ঘটেচে যতিস্থাপনের ত্রুটি অর্থাৎ যুগ্ম মাত্রায় না পড়ে অযুগ্ম মাত্রায়, 'অকালে'র তিন মাত্রায়। কিন্তু এ বিচ্যুতি ছান্দাসিকের কাছে ছাড়পত্র পেয়েচে। তাই রবীন্দ্রনাথের উক্তি ঃ "এ ছন্দে অযুগ্ম মাত্রার পর যতি দেওয়া চলে না। মধুসূদন অবশ্য 'অকালে'র পর যতি দিয়েছেন। এটাকে অবশ্য একরকম করে সমর্থনও করা যায়।"[১৮] কিন্তু নিচের কবিতায়—

কঠিন বাঁধনে। চরণ বেড়িয়া।
চিরকাল তোরে। রব আঁকড়িয়া।
লৌহশৃঙ্খলের। ডোর।

'লৌহ শৃঙ্খলের'—এ ছ'মাত্রা লঙ্ঘিত হয়েচে। অর্থাৎ-স্বনবৃত্ত দুটি চরণের পরে, তৃতীয় চরণে এসেচে স্বরবৃত্তের ছন্দ। তাই এ বেখাপ্পাশুনায়। রবীন্দ্রনাথ নিজেই একে সমর্থন করেননি ঃ "মনে খট্‌কা লেগেছিল, কান প্রসন্ন হয়নি"।[১৮]

II. গদ্যস্পন্দ

এ প্রসঙ্গে (৬·৩) ঃ 'নিরুক্ত' দ্রষ্টব্য, বিশেষত (১০) সংখ্যা। এখানে স্মর্তব্য দোলন ও স্পন্দন। স্পন্দন (vibration) দোলনের (oscillation) একটি বিশিষ্ট রূপ। দোলন সম্পর্কে নিয়ম এই যে কণিকা যতবেশি তার সাম্যাবস্থা থেকে দূরে যাবে ততবেশি হবে এর প্রত্যানয়ক বল। কিন্তু স্পন্দনে প্রত্যানয়ক বল হবে সাম্যাবস্থা থেকে কণিকার দূরত্বের ঠিক-ঠিক সমানুপাতিক। স্পন্দন শক্তি হলো বিস্তার বর্গের সমানুপাতিক। ধ্বনির প্রস্বর (pitch) স্পন্দনের কম্পাংক-নির্ভর ঃ এ স্পন্দন প্রকৃতির উপর নির্ভর করে না। অর্থাৎ স্পন্দনের কম্পাংকই প্রস্বর নিয়ামক।[২০] কিন্তু স্পন্দ (rhythin) আরো নিয়মিত হলে এ রূপান্তরিত হয় ছন্দে (metre)। গদ্যে তাই আছে স্পন্দ, কবিতায় ছন্দ। ফলে গদ্য সম্পর্কে 'স্পন্দ'-ই প্রযোজ্য, 'ছন্দ' নয়। অথচ এদের ব্যবহার সম্পর্কে তেমন পার্থক্য করা হয় নি। ফলে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ ব্যাহত হয়েচে। অমূল্যধন বলেন "গদ্যের ছন্দ"।[২১] এমনকি রবীন্দ্রনাথও এথেকে মুক্তনন—তিনি ব্যবহার করেচেন "গদ্য ছন্দ"।[১৮] মোহিতলালও 'গদ্যছন্দ' শব্দটি ব্যবহার করেচেন।[১২] তারাপদ ভট্টাচার্যও এ-ভুল করেচেন।[২২] শব্দটি হবে গদ্যস্পন্দ, যা পদ্যছন্দ থেকে স্বতন্ত্র। এখানে উল্লেখ্য যে প্রবোধচন্দ্র সেন এই পার্থক্য ধরেচেন ঃ "'গদ্যের ছন্দ' কথাটাই স্ববিরোধী। পদ্যের ছন্দোবিন্যস্ত ধ্বনি সুনিয়মিত, সুপরিমিত ও সুনির্দ্দিষ্ট ; পক্ষান্তরে গদ্যের ধ্বনিবিন্যাস অনিয়মিত, অপরিমিত ও

অনির্দ্দিষ্ট—(একটি) 'অতিনিরূপিত', (অন্যটি) অনিরূপিত। কাজেই 'গদ্যছন্দ' কথাটি অনর্থক ও অবাস্তব।"[২৩] তাই পদ্যছন্দ ও গদ্যস্পন্দ আছে ভাষায়। এদিকে দৃষ্টি দেয়ার প্রয়োজন। গদ্যস্পন্দের একটি উদাহরণ দেয়া গেল নিচে—

"মা ! এই লও তোমার শুচি, (১)। এই লও তোমার অশুচি, (২)। এই লও তোমার ধর্ম, (৩)। এই লও তোমার অধর্ম, (৪)। এই লও তোমার পাপ, (৫)। এই তোমার পুণ্য, (৬)। এই লও তোমার ভাল, (৭)। এই লও তোমার মন্দ, (৮)।—আমায় শ্রদ্ধাভক্তি দাও (৯)।"[২৪]

উপরে একটি মাত্র বাক্য, যা বিভিন্ন স্পন্দে বিভক্ত হয়েচে। প্রথম স্পন্দভাগে আছে ১১ মাত্রা ; দ্বিতীয়ে ১০ মাত্রা ; তৃতীয়ে ১০ মাত্রা ; চতুর্থে ১১ মাত্রা ; পঞ্চমে ৯ মাত্রা ; ষষ্ঠে ৮ মাত্রা ; সপ্তমে ৯ মাত্রা ; অষ্টমে ১০ মাত্রা ; নবমে ১১ মাত্রা। এখানে বাক্যাংশগুলি বিভিন্ন মাপের। যথা ১১+১০+১০+১১+৯+৮+৯+১০+১১। তবে এস্পন্দ অনেকটা নিরূপিত বলে এসেচে ছন্দের কাছাকাছি। এ-বাক্যটি ৯টি বাক্যাংশে বিভক্ত হয়েচে এবং প্রত্যেকটিকে একটি বাক্যের সামিল ধরা যেতে পারে। এ স্পন্দমান গদ্য।

এ্যারিস্ততলও স্বীকার করেচেন গদ্যস্পন্দের কথা। প্রাচীন প্রসিদ্ধি অনুসারে সফিস্ট Thrasymachus গ্রীক গদ্যে আমদানি করেন সুচিন্তিত স্পন্দমান আদর্শ, যা পরে গদ্যকলায় প্রচলিত হয়। এ্যারিস্ততল চেয়েচেন অনিশ্চয়তা থেকে মুক্তি ও গঠনশৃঙ্খলা এবং এ-কাজে সহায়ক হলো সংখ্যা আর বাক্-এর সংখ্যা হলো স্পন্দ। তিনি মনে করেন যে গদ্যে সংখ্যার চরম বা অবম, অনবচ্ছেদ মাপ বা ছন্দ অনুপযোগী, কেননা এর সুস্পষ্ট কলা প্রতীতির অবনতি ঘটিয়ে বাগ্মিতার উদ্দেশ্য ব্যাহত করে। তাই তাঁর সুপারিশ হলো গদ্যে থাকবে কেবল একটি ছাঁচ বা রূপকল্প অর্থাৎ প্রথম বা চতুর্থ "পিয়ন" (paeon)—১ম,—⏑⏑⏑ ; ৪র্থ, ⏑⏑⏑ —)। তবে এ ছান্দসিক ক্রমের সঙ্গে অভিযোজিত হবে না। এরকম স্পন্দ পর্যায়ের প্রথমে ও শেষে আসবে এবং শেষেরটি এর উৎকৃষ্ট রূপ।[২৫] বাঙলায় গদ্য স্পন্দের একক হলো বাক্যাংশ বা বাক্-বিভাগ আর এর কয়েকটি মিলে গড়ে ওঠে বৃহত্তর স্পন্দ মেল বা বাক্য—এই বাক্যাংশ পদ্য পর্বের সগোত্রীয়, আর বাক্য চরণের অনুরূপ। বাক্যাংশ কিন্তু অর্থ মেল আর এ পৃথক্ হয়ে যায় ঊনবিরতি-তে (minor pause) ; অন্যদিকে বাক্য বিচ্ছিন্ন হয় অধিবিরতিতে (major pause)। উপরের অনুচ্ছেদ-এ কমাতে প্রকাশ পেয়েচে ঊনবিরতি, এবং দাঁড়িতে অধিবিরতি। বাক্-মেল সাধারণত ৬ ও ততোধিক মাত্রায় গঠিত হয়। স্পন্দবিচলন-এ দেখা গেচে যে এ-চার রকমের হতে পারে—

সমতলীয় ; উত্থানশীল ; পতনশীল ; তরঙ্গিত। স্পন্দমান গদ্য-বাক্যের প্রারম্ভে থাকে উত্থানশীল স্পন্দ, মাঝখানে তরঙ্গিত স্পন্দ এবং প্রান্তে পতনশীল বা সমতলীয় স্পন্দ। বাঙলায় এই চারটি স্পন্দ দেখা যায়। তবে এখানে আছে মাত্রার দৈর্ঘ্য—উত্থানশীল স্পন্দে মাত্রাসংখ্যা বেশি ; পতনশীল স্পন্দে কম ; তরঙ্গিত স্পন্দ তিনটি অক্ষরে তরঙ্গাকৃতি নেয় মধ্যস্ফীতিতে ; আর সমতলীয় স্পন্দে একই মাত্রার বাক্‌মেল দেখা যায়।[২৬] এই স্পন্দমান গদ্য অবশ্য ছন্দোরীতির অনুবর্তক ঃ প্রত্যেক অক্ষর একমাত্রিক, কিন্তু শব্দান্ত্য বদ্ধাক্ষর দ্বিমাত্রিক ; আর বলস্পন্দিত বদ্ধাক্ষর ঐচ্ছিকভাবে দ্বিমাত্রিক। এ-ভাবে স্পন্দ-লিপি করলে দেখা যায় যে বাঙলা গদ্যস্পন্দ অধিবৃত্তের আভাস দেয়। অর্থাৎ এখানে একটি অধিবৃত্তীয় পরিকল্প এসে যায়।[২৭] বাঙলা গদ্য তাই এ্যারিস্ত-তলের মন্তব্যই অনুসরণ করে অর্থাৎ "সর্বাঙ্গনিসই সংখ্যা দ্বারা নির্ধারিত"।[২৫] একটি উদাহরণ নেয়া যাক্‌, যেমন,

> "রসাত্মক বাক্যকেই। আলংকারিক পণ্ডিত। কাব্য সংজ্ঞা। দিয়েছেন॥ এই রসাত্মক বাক্য। পদ্যে বল্‌লে সেটা হবে। পদ্য কাব্য আর। গদ্যে বল্‌লে হবে। গদ্য কাব্য॥ গদ্যেও। অকাব্য কুকাব্য। হ'তে পারে, পদ্যেও। তথৈবচ॥ গদ্যে তার। সম্ভাবনা বেশি,। কেননা ছন্দেরই। একটা স্বকীয়। রস আছে॥"[১৮]

উপরের স্পন্দ বিশ্লেষণে দেখা যায় প্রত্যেক বাক্‌-বিভাগের বা বাক্যাংশের মাত্রাবিন্যাস এরূপ ঃ প্রথম বাক্য—১০+১০+৬+৪ ; দ্বিতীয় বাক্য—১০+১০+৮+৮+৬ ; তৃতীয় বাক্য—৪+৮+৮+৫ ; চতুর্থ বাক্য—৫+৭+৮+৬+৪। এ হলো স্পন্দমান গদ্য, যা আটপৌরে পদ্য থেকে আলাদা। এখানে তিনটির পৃথকীকরণের প্রয়োজন—পদ্য ; গদ্য ; ও আটপৌরে গদ্য। কেউই গদ্য বলতে পারেনা ; তাইতো জুর্দাঁর বিস্ময় জেগে ছিল যখন তাঁকে বলা হলো যে তিনি গদ্য বলেচেন। গদ্য মূলত এমন ভাষা যা দর্শনীয় করার জন্যে সংগঠিত। তবে সংবাদ ইস্তাহার কথিত গদ্য (spoken prose)। ফলে কথিত গদ্য ও সংলাপের মধ্যে পার্থক্য আছে। প্রথমত, কথিত গদ্যে আছে দ্যুতি সাম্য, আর সংলাপে দ্যুতি পরিবৃত্তি। দ্বিতীয়ত, প্রথমে বিরতি বাক্যের ব্যাকরণগত গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত ; দ্বিতীয়ে বিরতির আছে অন্য ভূমিকা—বাক্য শেষ সূচিত হয় স্বরভঙ্গিতে, বিরতিতে নয়। তৃতীয়ত, সংলাপে মৌন-এর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, যার কোন হদিশ মেলেনা কথিত গদ্যে। চতুর্থত, সংলাপে বাগ্‌ধ্বনির সংখ্যা কথিত গদ্যের তুলনায় অনেক বেশি। মনে রাখতে হবে যে 'সরব পঠন' ও স্বগতোক্তি সংলাপ হতেই উৎপন্ন হয়েচে।[২৮]

III. গদ্যিকা ও গদ্যকাব্য

উপরের দৃষ্টান্তে দেখা গেচে স্পন্দমান গদ্য পদ্যের কাছাকাছি যেতে পারে। তবে পার্থক্যও আছে এবং তাহলো এই যে বাক্‌বিভাগে একটি দীর্ঘাক্ষরের বিকল্প হিসেবে দু'টি হ্রস্বাক্ষর স্থাপনের পৌনঃপুনিকতা অধিকতর। গদ্য একই বাক্‌-বিভাগের পুনর্বৃত্তি আঁকড়ে থাকে না, কিন্তু পদ্যপর্ব পরিবৃত্তি স্বত্ত্বেও ফিরে-ফিরে আসে ঃ "ফিরে ফিরে আঁখিনীরে পিছুপানে চায়।" পদ্যের লক্ষণ এই বিকল্পহীন পর্ব ঃ আর গদ্যের লক্ষণ অবাধ প্রতিকল্পিত বাক্‌-বিভাগ। আধুনিক কবিতায় এই প্রতিকল্পন বা বিকল্পন বেড়ে গেচে এবং এ তাই গদ্যঘেঁষা হ'য়ে দাঁড়িয়েচে। পদ্য বেছে নেয় একটি স্পন্দমান ছাঁচ এবং চরণপ্রান্তে তাকে দেখা যায় ও তার ব্যত্যয় কমই ঘটে। অপরপক্ষে আদর্শ গদ্যে অস্তিমান স্পন্দ কাঠামো পুরোভাগে আসেনা, কিন্তু চেতনায় গৌণস্থান নেয়। গদ্য হলো ন্যায় ও যুক্তির স্পষ্টউক্তি মাধ্যম এবং এদের জন্যে চায় জোরের শ্রেষ্ঠ নম্যতা। ফলে প্রকাশ পায় প্রতিকল্পনের স্বাধীনতা ও পৌনঃপুনিকতা, অক্ষরের দ্রুতি বা মন্থরতা, এবং ছন্দোগতির সবটাই পরিহার। কাজেই গদ্য ও পদ্য হলো এক "অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলের" (continuous chain) দুটি প্রান্ত—এক প্রান্তে রয়েচে অক্ষর ও জোরের স্বাধীনতা, অন্যপ্রান্তে পর্বের কড়াকড়ি ও ছান্দসিক ছাঁচ। এই অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খলের চেহারা এরূপ।[২৯]

সারণী ঃ ঙ—অবিচ্ছিন্ন শৃঙ্খল

১	২	৩	৪
লাক্ষণিক গদ্য [আটপৌরে গদ্য]	স্পন্দমান গদ্য	গদ্যবলাক্রান্ত পদ্য	লাক্ষণিক পদ্য [কাব্য]
(i) পংক্তি প্রান্তে বাক্‌-বিভাগের প্রাধান্য বা পুনর্বৃত্তিহীন দণ্ডাঘাতের অবাধ প্রতিকল্পন।	(i) স্পন্দকে স্ফুটতর করার জন্যে ঈষৎ-অবাধ ও পৌনঃপুনিক প্রতিকল্পন।	(i) পূর্ববর্তী দণ্ডাঘাতে পর্বের পৌনঃপুনিক প্রতিকল্পন এবং শেষের দিকে প্রাসঙ্গিক।	(i) বিরল প্রতিকল্পন এবং চরণান্তে বিরলতম।
(ii) পংক্তি দৈর্ঘের পরিবৃত্তি	(ii) একই দণ্ডাঘাতযুক্ত পংক্তির পুনর্বৃত্তি-প্রবণতা।	(ii) চরণ দৈর্ঘ্য অনিয়মিত	(ii) একই দৈর্ঘ্যের চরণ অথবা আবর্তক আদর্শ বা ছাঁচ।

উপরের গদ্যবলাক্রান্ত পদ্য দু'টিরূপে প্রকাশ পায়—গদ্যকবিতা ও কাব্যিক গদ্য। এই শ্রেণীবিভাগ গদ্য ও পদ্যের মিশ্রণের উপর নির্ভর করে। দু'টির মধ্যে শেষেরটিই হলো প্রকৃতি নির্ধারক। অর্থাৎ মিশ্রণের প্রকৃতি হবে শব্দ জোড়ের দ্বিতীয়টির প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। তাই 'গদ্য-কবিতায়' জোর পড়ে 'কবিতা'র উপর, যেমন 'কাব্যিক গদ্যে' পদ্যের উপর। এরা গদ্য পদ্যের মাঝখানের বাসিন্দা। তাই দুই প্রান্তের চেহারায় এদের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে। কবির ভাষায় পদ্য ও গদ্যের চেহারা এরূপ—

পদ্য হলো সমুদ্র,
সাহিত্যের আদিযুগের সৃষ্টি।
তার বৈচিত্র্য ছন্দতরঙ্গে,
কলকল্লোলে।

গদ্য এলো অনেক পরে,।
বাঁধা ছন্দের বাইরে জমালো আসর।
গর্জনে ও গানে, তাণ্ডবে ও তরলতালে
আকাশে উঠে পড়ল গদ্যবাণীর মহাদেশ।

এতে চিরকালের স্তব্ধতা আছে,
আর চলতিকালের চাঞ্চল্য।

কবির উক্তিতে গদ্য ও পদ্যের বৈশিষ্ট্য ধরা পড়লেও, এদের অবস্থান নিয়ে আছে সংশয়। তাই গদ্যের নিবাস ধরা যায় ভূ-লোকে অর্থাৎ পৃথিবীতে ; পদ্যের নিলয় দ্যুলোকে ; আর মধ্যবর্তীদের আবাস অন্তরীক্ষে। এ-পরিপ্রেক্ষিতে শেষোক্তদের পরিচিতি পাওয়া যায়।

প্রথমেই গদ্য কবিতার কথা—এতে থাকতে পারে গীতিকার যে কোন গুণাবলী ; পার্থক্য শুধু একে মুদ্রণে দেখান হয় গদ্যরূপে। কাজেই এ কাব্যিক গদ্য থেকে আলাদা, কেননা এ ক্ষুদ্র ও সংহত ; মুক্তক (অবাধ পদ্য) থেকে স্বতন্ত্র যেহেতু এতে নেই চরণভাঙা ; ছোট গদ্য অনুচ্ছেদ হতে পৃথক, কেননা এতে সাধারণত অস্তিমান অধিকতর স্পন্দ, অনুনাদশীল অভিক্রিয়া, চিত্রকল্প ও প্রকাশের ঘনতা। এতে থাকতে পারে অন্তর্মিল ও ছান্দসিক প্রবহমানতা। এর দৈর্ঘ্য সাধারণত আধপাতা অর্থাৎ একটি বা দু'টি পরিচ্ছেদ থেকে তিন বা চারপাতা পর্যন্ত বিস্তৃত অর্থাৎ গড় গীতল কবিতার দৈর্ঘ্যের সমান। যদি এর চেয়ে দীর্ঘতর হয়, তবে টান ও সংঘাত লোপ পায় এবং গদ্য কবিতা রূপান্তরিত হয় কাব্যিক গদ্যে। গদ্যকবিতা বাইবেল থেকে আরম্ভ করে Faulkner এর উপন্যাস সম্পর্কে প্রয়োগ

করা হয়। কিন্তু এ ঠিক নয়; কেবলমাত্র সংজ্ঞাত শিল্পরূপ সম্পর্কে এর প্রয়োগ বিধেয়। পাশ্চাত্যে Aloysius Bertrand কে গদ্য কবিতার জনক বলা হয় এবং এর প্রথম উদাহরণ হলো তাঁর Gaspard de la nuit (১৮৪২)। গদ্য কবিতার ব্যাপকতর পরিচিতি ঘটল Baudelaire-এর Petits Poems en Prose (১৮৬৯)-এ। ঊনবিংশ শতকে এ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো—জার্মানীতে Stefan George ও Rilke-এ; ইংলণ্ডে De Quincey-তে; রাশিয়ায় Turgenyev-এ; মার্কিন মুলুকে Poe-এর ছোট-খাট রচনায়।[৩০]

বাঙলাভাষায় গদ্য কবিতাকে 'গদ্যিকা' নামে অভিহিত করেছেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর মতে ঃ "গদ্য বলতে বুঝি, যে ভাষা আলাপ করবার ভাষা; ছন্দোবদ্ধ পদে বিভক্ত যে-ভাষা তাই পদ্য। আলাপের মধ্যে তালটা বাঁধন ছাড়া হয়েও আত্ম বিস্মৃত হয় না। অর্থাৎ বাইরে থাকে না মৃদঙ্গের বোল, কিন্তু নিজের অঙ্গের মধ্যেই থাকে চলবার একটা ওজন। পদ্য ছন্দের প্রধান লক্ষণ পঙক্তি সীমানায় বিভক্ত তার কাঠামো। নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক ধ্বনিগুচ্ছে এক-একটি পঙ্‌ক্তি সম্পূর্ণ। সেই পঙক্তি শেষে একটি করে বড়ো যতি। গদ্যে এই নিয়মের শাসন নেই। গদ্যে বাক্য যেখানে আপন অর্থ সম্পূর্ণ করে সেই তার দাঁড়াবার জায়গা। পদ্য ছন্দ যেখানে আপন ধ্বনিসংগতিকে অপেক্ষাকৃত বড়ো রকমের সমাপ্তি দেয়, অর্থ নির্বিচারে সেইখানে পঙ্‌ক্তি শেষ করে। গদ্যে প্রধানত অর্থবান শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে কাজে লাগাই, পদ্যে প্রধানত ধ্বনিমান্ শব্দকে ব্যূহবদ্ধ করে সাজিয়ে তোলা হয়। গদ্যটি মাংস পেশল পুরুষ বলেই কিছু প্রাধান্য যদি নিয়ে থাকে তবু তার কলাবতী বধূ দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়ে উঁকি মারছে, তার সেই ছায়াবৃত কটাক্ষ-সহযোগে সমস্ত দৃশ্যটি রসিকদের উপভোগ্য। এর মধ্যে ছন্দ নেই বললে অত্যুক্তি হবে। ছন্দ আছে বল্‌লেও সেটাকে বল্‌বো স্পর্ধা। তবে কী বল্‌লে ঠিক হবে (তার) ব্যাখ্যা কাব্য রস দিয়েই।"[১৮] গদ্যকবিতা মূলত গদ্যই, তবে এতে আছে পদ্যের আদর্শ। গদ্যিকার বাটখারা আট পৌরে গদ্যেরই; কিন্তু এরা বিন্যস্ত হয় পদ্য ছাঁচে। কাজেই এখানে পদ্যের লক্ষণ বর্তমান থাকে। বাক্‌-বিভাগ এখানে দীর্ঘতর অর্থাৎ পদ্যের তুলনায়। এরি পরিচায়ক হলো বাইবেলের ইংরেজি প্রামাণ্য ভাষ্য—এখানে হিব্রু পদের স্পন্দ রূপায়িত হয়েচে ইংরেজি গদ্য কবিতায়। এ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ইংরেজি 'গীতাঞ্জলি'ও উল্লেখ্য। এই গদ্য কবিতা বা গদ্যিকার স্রষ্টা রাজকৃষ্ণরায়। এঁর প্রথম ব্যবহার হয় "রাজা বিক্রমাদিত্য" (১৮৮৪) নাটকে—এ আদ্যোপান্ত "পদ্যপংক্তি গদ্যে" রচিত। এতেই রচিত হয়েছিল "বর্ষার মেঘ" (১২৯১) নামধেয় গদ্য কবিতা এবং "বর্ষার গোলাপ" (১২৯২) এবং উভয়ই সংকলিত হয়েচে "অবসর-সরোজিনীর" তৃতীয়ভাগে (১২৯২)। "বর্ষার গোলাপ" সম্পর্কে "পদ্যপংক্তি গদ্য" এরূপ—

সাধের ফুল, । ভিজে গেছিস ?
তোর অধরে ও । টল টল কোচ্চে ।
সুধা ? । মধু ? ।
(আহা) বসন্ত সময়ে । তোকে দেখেছি
এখনও দেখছি, ।
কিন্তু সে-তুই । আর এ-তুই । যেন এক তুই নয় ।

একে এক সমালোচক কখনো বলেচেন "rhythmic prose", কখনো বা গদ্য কবিতা ।[৩১] এতে বুঝা যায় তিনি দুয়ের পার্থক্য ধরতে পারেননি । এ গদ্য কবিতাই বটে ।

কবিতা ও কাব্যের দ্যোতনা এক নয় । একটিতে বুঝায় ইংরেজির poem ; অন্যটিতে poetry । একটি বাক্‌, অন্যটি অবাক্‌ । এ-কথা রবীন্দ্রনাথ পরিস্ফুট করেচেন যখন তিনি বলেন ঃ "সংগীতের সমস্তটাই অনির্বচনীয় । কাব্যে রচনীয়তা আছে সে কথা বলা বাহুল্য । অনির্বচনীয়তা সেইটেকেই বেষ্টন করে হিল্লোলিত হতে থাকে, পৃথিবীর চার দিকে বায়ুমণ্ডলের মতো । এ-পর্যন্ত বচনের সঙ্গে অনির্বচনের, বিষয়ের সঙ্গে রসের গাঁঠ বেঁধে দিয়েছে ছন্দ । পরস্পরকে বলিয়ে নিয়েছে, 'যদেতদ্‌ হৃদয়ং মম তদস্তু হৃদয়ং তব' । বাক্‌ এবং অবাক্‌ বাঁধা পড়েছে ছন্দের মাল্য বন্ধনে । এই বাক্‌ এবং আবাক্‌-এর একান্ত মিলনেই কাব্য ।"[১৪] কবিতায় বাক্‌-এর দিকটাই বেশি প্রতিফলিত ; কাব্যে অবাক্‌-এর দিকটা । কোনো কোনো কাব্যে বাগ্‌দেবী স্থূল খাদ্যাভাবে ছায়ার মতো হ'য়ে পড়েন সেটা আধ্যাত্মিকতার লক্ষণ নয়, কিন্তু আধিভৌতিকতার অভাব । গদ্য আসে এই আধিভৌতিকতার অভাব পূরণের জন্যে, যেমন 'পুনশ্চ' (১৯৩২) । এহলো "গদ্যকাব্য" । এর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ বলেচেন ঃ "গদ্যকাব্যে অতি নিরূপিত ছন্দের বন্ধন ভাবাটাই যথেষ্ট নয়, পদ্যকাব্যে ভাষায় ও প্রকাশ-রীতিতে যে—একটি সমজ্জ সলজ্জ অবগুণ্ঠন প্রথা আছে তাও দূর করলে তবেই গদ্যের স্বাধীন ক্ষেত্রে তার সঞ্চরণ স্বাভাবিক হতে পারে । অসংকুচিত গদ্যরীতিতে কাব্যের অধিকারকে অনেকদূর বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব । "কোপাই" সম্বন্ধে তাঁর উক্তি—

বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে । লাগে মাতলামি
মহুয়া-মাতাল । গাঁয়ের মেয়ের । মতো,
ভাঙে না, । ডোবায় না,
ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে । আবর্তের ঘাঘরা ।
দুই তীরকে । ঠেলা দিয়ে দিয়ে ।
উচ্চ হেসে । ধেয়ে চলে ।

এখানে কাব্যত্ব আছে 'মহুয়া-মাতাল' রূপকে, 'ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আবর্তের ঘাঘরা'র চিত্রকল্পে, আর হাসি ও মাতলামি সমাসোক্তি অলংকারে। কবিত্ব সম্পর্কে এ্যারিস্ততলের উক্তি স্মরণীয় [কাব্য কলা, দ্বিবিংশ প্রকরণ] ঃ "সবচেয়ে বড়ো কথা রূপকের রাজা হওয়া।" আর চিত্রকল্প বিষয়ে পাউণ্ড বলেচেন ঃ "ক্ষণিকায় উপস্থাপিত এক বুদ্ধিদীপ্ত ও আবেগ-প্রবণ জটই হলো চিত্রকল্প"।

মনে রাখতে হবে যে গদ্য কাব্য বা কাব্যিক গদ্য হলো ইংরেজিতে যাকে বলে poetic prose। তবে এ স্পন্দমান বা স্পন্দিত গদ্য থেকে আলাদা। কেননা একটিতে জোর দেওয়া হয়েচে রসের উপর, অন্যটিতে স্পন্দের উপর। স্পন্দে রস উৎপন্ন হতে পারে। কিন্তু স্পন্দ আর রস এক নয়। কাজেই স্পন্দমান গদ্যের একটি বিশিষ্টরূপ হলো গদ্যকাব্য। আবার গদ্যকাব্য ব্যাপক। কিন্তু গদ্য কবিতা বিশিষ্ট। গদ্য কবিতা রসাল হয়ে কাব্যময় হতে পারে—তবে এর মৌথ আবেদন কবিতাছন্দের আভাসে। রবীন্দ্রনাথের 'লিপিকা' (১৯২২), 'পুনশ্চ' (১৯৩২), 'শেষ সপ্তক' (১৯৩৫), 'পত্রপুট' (১৯৩৫) ও 'শ্যামলী' (১৯৩৬) গদ্যকাব্যের অন্তর্ভুক্ত—মাঝেমাঝে অবশ্য গদ্যকবিতাও উঁকি মারে। টুর্গেনিভের 'গদ্যকবিতা'র সঙ্গে মিল আছে 'লিপিকা'র 'সন্ধ্যা ও প্রভাত'-এর—

> সূর্যদেব, । তোমার বামে এই সন্ধ্যা, । তোমার দক্ষিণে ঐ প্রভাত, । এদের তুমি মিলিয়ে দাও ॥ এর ছায়া ওর আলোটিকে । একবার কোলে তুলে নিয়ে । চুম্বন করুক । এর পুরবী ওর বিভাসকে । আশীর্বাদ করে । চলে যাক ॥

IV. গদ্যকবিতার নিয়মাবলী

গদ্যিকার কিছু-কিছু নিয়মাবলী বের করা হয়েচে।[২৭] তবে এ সম্বন্ধে আরো গবেষণার প্রয়োজন। এগুলি হলো—

(১) গোটা শব্দসমষ্টি নিয়ে বাক্‌-বিভাগ বা মাপনী তৈরী হয়। এ অনেকটা-কবিতার ছন্দোবিভাগের মতোই।

(২) দুটি অথবা তিনটি ধ্বনিস্থান নিয়ে গঠিত হয় এই মাপনী—প্রতিটি ধ্বনিস্থান একটি বা একাধিক শব্দের সমষ্টি।

(৩) ধ্বনিস্থানের দৈর্ঘ্য চারমাত্রার বেশি হতে পারে এবং প্রত্যেক মাপনীতে কেবলমাত্র একটি প্রচাপিত শব্দ থাকতে পারে।

(৪) ধ্বনিস্থান বিন্যাস স্পন্দিত গদ্যের মতোই এবং এ বহুবিধ—গাণিতিক অনুক্রমে নির্ধারিত হয় ধ্বনিস্থান সংখ্যা আর মাত্রার দিক থেকে মাপনী পর্যায় পরস্পর অসমান।

(৫) বৃহত্তর পংক্তিতে বাক্‌-পর্যায়ের (cursus) নিয়ম মানতে হয়।

V. মুক্তক

অনেক সময় মুক্তক (free verse) ও গদ্যিকা (prose verse) একই অর্থে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু এ ব্যবহার ঠিক নয়। এরা উভয়ই গদ্য ও পদ্যের মধ্যবর্তী শিল্পরূপ এবং উভয়ে পদ্যের কিছু কিছু লক্ষণ ত্যাগ করে, আর গদ্যের কিছু-কিছু গ্রহণ করে। তবে উভয়ের গ্রহণ ও বর্জনের বৈশিষ্ট্য এক নয়। মুক্তক-কে কেউ বলেন 'মুক্তবন্ধ'[২১] ; আবার কেউ 'স্বৈরবন্ধ'[২]—এ ঠিক নয়। 'মুক্ত' ও 'বন্ধ' মিলে কি বুঝায় ?—একদিকে মুক্ততা, অন্যদিকে তারি বদ্ধতা এবং ফলে মুক্তি আটকে যায় বন্ধে। কাজেই দ্যোতনা হয় বন্ধের, মুক্তির নয়। অর্থাৎ এ মুক্তকের উল্টোটাকেই বুঝায়। অন্যদিকে 'স্বৈরবন্ধ'-এর দ্যোতনাও ঐ একই। এ-ছাড়া নামটি সাংঘাতিক। দিলীপ রায়ের কথায় বলা যায়ঃ "প্রবোধবাবু যদি কবি হতেন তাহলে হতেনই কবির ব্যাথার ব্যাথী, এই ধরনের সাংঘাতিক নামকরণে তাঁরও কোমল হৃদয় ব্যথিয়ে উঠতই উঠত।"[৩২]

মুক্তক কথাটি পাশ্চাত্ত্যে লোকমুখে ব্যবহৃত হয় Walt Whitman এবং অন্যান্যদের কবিতা বুঝাতে ; তবে এ সঠিক ব্যবহার নয়। এ-সব কবির কবিতা নিয়মিত সঠিক মাপযোগ্য আদর্শের প্রস্বন পুনর্বৃত্তির উপর নির্ভরশীল নয়—এ নির্ভর করে বরং চিত্রকল্প, তাৎপর্যপূর্ণ বাক্যাংশ প্রভৃতির পরিবর্তনশীল পুনর্বৃত্তির অনিয়মিত স্পন্দমান লয়ের উপর। মিল সম্পর্কেও মুক্তক অনুরূপ স্বাধীনতা ও অনিয়ম অনুসরণ করে। এর উদাহরণ হলো Whitman-এর 'আমার সত্তার গান'—

> আমি আমার সত্তার। গুণগান করি ;।
> আমি যা ধ'রে নি,। তুমিও তাই ধরে নেবে ;।
> আমার প্রতি। পরমাণুর জন্যে,। সমভাবে তোমারও।
> কাল ক্ষেপণে ডাকি। আমার আত্মাকে ;।
> খুশিমতো হেলে। কাল কাটাই,।
> নিদাঘ-ঘাসের ফলক। দেখে দেখে।

মুক্তক সম্পর্কে দু'টি মত আছে—একটি একে স্পন্দমান গদ্যের সামিল করে ; অন্যটি এর "কাব্যিক" গুণাবলীর দিকে নজর দেয়। এ-দুইই খাটে মুক্তকের এ-সংজ্ঞায়। তবে একে আরো ব্যাপক করা যায় যদি লেখা যায়ঃ "যখনি চোখ বা কানের দৌত্য কবিতায় প্রতিষ্ঠিত হয় ছান্দসিক আদর্শের একটি অটুট অনিয়ম, তখনি তাকে যথার্থ মুক্তক বলা যেতে পারে।" রাজা জেমস্-এর "বাইবেলে"র "ভজন" (Psalms)-কে বলা হয় মুক্তক। এ-পর্যায়ে পড়ে Baudelaire ও Arnold-এর মুক্তক। তবে Whitman ও Hopkins আমেরিকা ও ইংলণ্ডে

রূপের দিকে ঝুঁকেচেন—প্রথমজন ফরাসী প্রতীকবাদীদের প্রভাবিত করেচেন, আর শেষোক্তজনের "হঠাৎ স্পন্দ" (sprung rhythm) মুক্তক ও ঐতিহ্যের মধ্যবর্ত্তী। মুক্তক-রচয়িতাদের মধ্যে আছেন রিল্কে, এ্যাপলিনেয়ারে, সন্ত জন পার্সি, এলিয়ট, পাউণ্ড ও উইলিয়াম কার্লস উইলিয়ামস্। মাপ নিয়েই এসেচে জটিলতা। মুক্তকে মাপনীকে শিথিল করা হয়েচে শব্দকোষ ও পদক্রমের লীলায়নের জন্যে। গতানুগতিক পর্বকে সম্প্রসারিত করে তার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েচে আরো অক্ষর, শব্দ ও বাক্যাংশকে। এই যে নতুন একক তৈরি হলো একে বলা যেতে পারে "পরিবর্তনীয় পর্ব" (variable foot), যাতে মিশেচে স্বাধীনতা ও শৃঙ্খলা। এ বর্জন করেচে প্রচলিত নির্দ্দিষ্ট পর্বের মানক আর প্রস্তাব করেচে মাপনীর উচিত বা গর্থ ও প্রত্যেক কবিতার স্বননশীলতার অনুসরণ। কাজেই বাক্-এর মতোই ছন্দোছাঁচের মূল্যায়ন হবে কার্যকরতা ও প্রকাশ ক্ষমতার মানদণ্ডে, কিন্তু যান্ত্রিক অক্ষর গণনায় নয়। প্রকৃত কবিত্বের কাব্য কখন-ই 'মুক্ত' হতে পারে না, তবে 'মুক্তপদ্য' বা মুক্তক 'পরিবর্তনীয় পর্বের' ভাষায় কবি ও তাঁর কৃতির মধ্যে মধ্যে অনেক বাধা সরিয়ে ফেলে।[৩০]

এরি আরেক ভিয়ান হলো যাকে বলা হয় verse libre—এ হলো মধ্যযুগের সৃষ্টি, সামিল আক্ষরিক পদ্য। এ প্রথম প্রকাশ পায় ফরাসী কবি Rimbaud-এর "দ্যুতি মালায়" (১৮৭৩)। হয়তো তিনি Whitman-এর "ঘাসের পত্রগুচ্ছ" (১৮৫৫) সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন। Gustave Kahn-এর La Vogue পত্রিকায় Rimbaud-র দুটি verse libre কবিতা প্রকাশিত হয়। Kahn-ও প্রকাশ করেন তাঁর নিজের কবিতা এবং Jules Laforgue তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতা। এঁরা সবাই নিজের এই শিল্পরূপের উদ্ভাবয়িতা বলে দাবি করেন। তবে প্রকৃত ঘটনা এই যে রূপটি নিজেই এঁদের মারফতে প্রকাশ পেয়েচে। এতে আছে চারটি স্তর—প্রথমে, কাব্যিক গদ্য ; দ্বিতীয়ে, গদ্য-কবিতা ; তৃতীয়ে verse libere ; এবং চতুর্থে, verse libre। শেষেরটির সংজ্ঞা এই যে এ এক ধরনের পদ্য যাতে অক্ষর বা ছন্দানুশাসন নেই, কিন্তু কেবল স্পন্দ বর্তমান। মিল থাকলেও তা উপেক্ষিত। প্রশ্ন হলো এই "স্পন্দ" কী ? হর্বার্ট রীডের মতে এর জবাব হলো : "নিয়মানুবর্তিতার জায়গায় সমানুপাত" প্রতিস্থাপন ; Edourard Dujardin মনে করেন যে এ এমন "একটি রূপ যা যুগপৎ নিজের স্পন্দীকরণ ও বিস্পন্দীকরণে সমর্থ"।[৩০] যেমন,

সেকালে চিঠি হতো। মেঘদূত,
প্রবাস রামগিরি,। আর আবাস অলকা।
হাওয়া বদ্‌লে গেচে।

আমি আজ। সংসারের। শৈল শৃঙ্গে,
কর্তব্য শাপে। নির্বাসিত ঃ
ডাকঘরের। দৌরাত্ম্যে
মেঘদূতের পাখা। কাটা গেচে,
মর্ত্যে ঘোরে। শুধু তারি। প্রেত ছায়া।
—অনিল বিশ্বাস ঃ উদ্বেগ উপকূলে, 'চিঠি'

এখানে লক্ষণীয় যে মুক্তক (verse libre), নিয়মিত পদ্য (verse regular) অর্থাৎ ধ্রুপদী ও খেয়ালী আলেক্‌জান্দ্রাইন (alexandrine) বা ষট্‌মাত্রা এবং মুক্ত পদ্য (verse libéré) থেকে স্বতন্ত্র। এই পার্থক্যের বৈশিষ্ট্য তিনটি—(১) প্রতিটি চরণের যথাবিধি অভ্যন্তরীণ ঐক্য ; (২) অক্ষরের নির্দ্দিষ্ট সংখ্যা থেকে মুক্তি ; ও (৩) মিল, যতি ও স্বরছেদের বিশেষ নিয়ম থেকে মুক্তি। ঐ তিনের ঐক্যসূত্র অবশ্য স্পন্দসৃষ্টিকারী নিয়মিত পৌনঃপুনিক প্রস্বনের উপস্থিতি। পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এ প্রমাণিত হয়েচে। এই প্রস্বনে পাওয়া যায় তিনটি উপাদান—প্রস্বর ; তিগ্মতা ; ব্যাপ্তি। ধ্বনিতাত্ত্বিক অনুসন্ধিৎসায় ধরা পড়েচে যে ব্যাপ্তি প্রস্বরই স্পন্দের নিয়ামক এবং এ তাই ফরাসী পদ্যের ভিত্তি। ফলে নিয়মিত পদ্য, মুক্ত পদ্য ও মুক্তক ফরাসী ঐতিহ্যশায়ী—এরা বিভিন্ন প্রস্বন-কল্পে শুধুমাত্র স্পন্দবিন্যাস করে। কবি তাই এথেকে যে-কোন একটি বেছে নিতে পারেন।[৩৩] বাঙলায় আছে স্পন্দমান গদ্য যেমন অবনীন্দ্র ঠাকুরের 'আলোর ফুলকি' (১৩৫৪)-র 'কুঁকড়ো'—

কিন্তু আমি গান গেয়ে চলি,
আকাশে কাগডিমে রঙ লাগে, তবু আমি গেয়ে চলি আলোর ফুল,
তারপর হঠাৎ চমকে দেখি
আমার বুক সুরের রঙে রাঙা হয়ে গেছে।

রবীন্দ্রনাথ গদ্য কাব্য লিখেচেন, যাকে অনেকে গদ্য কবিতা বলে ধরে নিয়েচেন। তাঁর 'বলাকা' মুক্তক নয়, কেননা এতে মিল আছে। তবে 'মানসী'র 'নিষ্ফল-কামনা' খানিকটা এরি কাছাকাছি এসেচে মিলহীনতায়। এরা যে মুক্তক নয় তার প্রমাণ, এখানে নেই "পরিবর্তনীয় পর্ব", যা পাওয়া যায় T. S. Eliot-এর The Journey of the Magi-তে এবং রবীন্দ্রনাথের "তীর্থযাত্রী" নামক অনুবাদে ঃ

মনে পড়ে। এ-সব ঘটেছে। অনেক কাল আগে,।
আবার ঘটে যেন। এই ইচ্ছে,। কিন্তু লিখে রাখো,।
এই লিখে রাখো,। এত দূরে যে। আমাদের টেনে নিয়েছিল।
সেকি জন্মের সন্ধানে। না মৃত্যুর ?।

"গৈরিশ ছন্দ" কে অনেকে মুক্তক বলেন। এছন্দ মধুসূদন ব্যবহার করেন "পদ্মাবতী" (১৮৬০) নাটকে। পরে ব্রজমোহন রায় এর প্রয়োগ করেন তাঁর "দানব বিজয়" পালায়। একে রামকৃষ্ণ রায় তাঁর "হর ধনুর্ভঙ্গ" (১৮৮১) ব্যবহার করেন এবং এর ভূমিকায় লেখেন ঃ "আমি ১২৮৫ সালে 'নিভৃত-নিবাস' নামে একখানি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ করি। তাহার দ্বিতীয় সর্গের কিয়দংশ এইরূপ ভাঙা অমিত্রাক্ষরে ছন্দে লিখিয়াছিলাম"। এরি অধিকতর প্রয়োগ হয়, গিরিশ চন্দ্রে ঃ তাই এর নাম "গৈরিশছন্দ"। তাঁর "রাবনবধ" (১৮৮১)-এর প্রয়োগ দেখান হলো—

শুনিয়া মিনতি। রঘুপতি করেছেন। দয়া ;
এ রাক্ষস-দেহভার। কত দিন ব'বআর,।
করি কটুবাক্যে,। উত্তেজিত রোষ।

বস্তুত এ মুক্তক নয়, কেননা এখানে নেই "পরিবর্তনীয় পর্ব"। মনে রাখতে হবে যে প্রবহমানতাই মুক্তকের মূলকথা নয়।

মনে রাখতে হবে স্পন্দ আছে পদ্যে ও গদ্যে—একটিতে এ নিয়ন্ত্রিত, অন্যটিতে অনিয়মিত। কাজেই মুক্ত পদ্য (verse libéré) ও মুক্তক (verse libre) এই উভয়েই স্পন্দ আছে। শেষেরটি ফাঁক, যতি ও মিল থেকেও মুক্ত। কাজেই নিশিকান্ত'র "পণ্ডিচেরীর ঈশান কোণের প্রান্তর" মিল থাকার জন্যে মুক্তক নয়—এ মুক্ত পদ্য অর্থাৎ এ পদ্য মুক্ত হয়েচে ফাঁক যতি প্রভৃতির বন্ধন থেকে—এরা পদ্যের মতো নিয়মিত নয়। বাক্‌-ছন্দেই এর প্রাণপ্রতিষ্ঠা। তাই মুক্ত পদ্য হয়েও এ মুক্তকের কাছাকাছি এসেচে। এই মুক্ত পদ্যের আরেকটি রূপ চোখে পড়ে সমর সেনের কবিতায়। নিশিকান্ত গদ্যকে করেচেন পদ্যের অধীন, আর সমর সেন করেচেন পদ্যকে গদ্যের অধীন। অর্থাৎ বাক্‌ স্পন্দ একজনে পদ্যবদ্ধ, অন্যজনে তা গদ্যবদ্ধ। যেমন,

মাঝে মাঝে,। সন্ধ্যার জলস্রোতে।
অলস সূর্য। দেয় এঁকে।
গলিত সোনার মতো। উজ্জ্বল আলোর স্তম্ভ,।
আর আগুন লাগে। জলের অন্ধকারে,। ধূসর ফেণায়।

মুক্তক এসেচে অমিয় চক্রবর্তীর 'বিয়াত্রিচে' কবিতায়, যথা,

এখনো ফিরেঞ্জে। তীর্থ-সুন্দর সহর। চেয়ে আছে,।
সেই সাঁকো। রয়েছে অটুট,।
যার কাছে কবে। দান্তে বিয়াত্রিচে।
দেখেছিল পরস্পর।

গদ্য কবিতার নিগড় পরলে তা হয় গদ্য কবিতা, যেমন প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'তামাসা' কবিতা,

বিধাতা ভাবেন ইলেকট্রনের গণিতে।
ছায়াপথ ছাড়িয়ে।
অসীম আকাশ জুড়ে,
নীহারিকা-পুঞ্জে তার অঙ্কের খেলা।

৯.৫. ছন্দো বিশ্লেষ

(৬.৩) ঃ "নিরুক্তি"-তে "(৭)"-সংখ্যায় "ছন্দোলিপির" পরিচয় দেওয়া হয়েচে। এবার উদাহরণ দিয়ে জিনিসটি-কে বোঝাবার চেষ্টা করা গেল। প্রথমেই শব্দের ঝঙ্কারে কান দিতে হবে। এতে চরণের লয় ধরা পড়বে। দ্বিতীয় কাজ হবে চরণ বিভাজন। তৃতীয়ত, প্রকাশ কর্তে হবে ছন্দের রীতি অর্থাৎ স্বরবৃত্ত, স্বনবৃত্ত বা বলবৃত্ত। চতুর্থত, দেখাতে হবে চলন—সম, অসম, না বিষম। পঞ্চমত, প্রয়োজন কুলক-পরিচিতির। আর সর্বশেষে বলতে হবে বিশেষ ছন্দের নাম (যদি থাকে) ও দেখাতে হবে মাত্রা-বিন্যাস। নিচে রইল উদাহরণ—

(১)

নিশার স্বপন সম। তোর এ বারতা।। =(৩+৩+২)+(৩+৩)
রে দূত! অমরবৃন্দ। যার ভুজবলে ।। =(৩+৩+২)+(২+২+৩)
কাতর, সে ধনুর্দ্ধরে। রাঘব ভিখারী।। =(৪+৪)+(৩+৩)
বধিল সম্মুখ রণে? ফুল দল দিয়া।। =(৩+৩+২)+(২+২+২)
কাটিলা কি বিধাতা শা। ল্মলী তরুবরে!।। =(৪+৪)+(২+২+২)

চরণ — দ্বিপদী
লয় — মধ্য
বিভাগ — ৮+৬-এ পর্দবিভাগ
রীতি — স্বরবৃত্ত
কুলক — অমিত্রাক্ষর ; সমপদী

(২)

অহিংসা তো। অন্ধকারে। আলেয়া আলো,। =৫+৫+৫
কখনো জ্বলে,। কখনো নেভে,। শ্রীরামপুরে ।ঃ =৫+৫+৫
দিশারী নয়,। কেবল সে যে,। পথ ভুলায়, =৫+৫+৫
ঈশান কোণে। আঁধি ঘনায়। =৫+৫

চরণ — ত্রিপর্বিক ; শেষে দ্বিপর্বিক
লয় — বিলম্বিত
বিভাগ — পঞ্চপর্বিক

রীতি — স্বনবৃত্ত
কুলক — অন্ত্যচরণ বাদে, সবগুলি সমপদী ; শেষ দু'টিতে মিল

(৩)

উসুখুসু চুলগুলি । চোখ থেকে তুলে দাও, =৮+৮
পায়ের নূপুর দু'টি । খুলে দাও— =৮+৪
সাজাও বালিশ শিরে । সুকোমল ছন্দে, =৮+৬
সুরভিয়া, । অগুরুর গন্ধে =৪+৬

চরণ — দ্বিপদী পয়ার
লয় — মধ্য
বিভাগ — পদে-পদে ঃ কখনো ৮, কখনো ৬, কখনো বা ৪ মাত্রায়
রীতি — স্বরবৃত্ত
কুলক — মিশ্রপদী ; দুই চরণে-দুই চরণে মিল

(৪)

। । । ।
দিন-দুপুরে, । বাদল রাতে-, । স্বপ্ন-ঘোড়ায় । চ'ড়ে- =৬+৬+৬+৩
। । । ।
ছুটচো কোথায় । ঘূর্ণিঝড়ে- । তেপান্তরের । মাঠে- =৬+৬+৬+৩
। । ।
কোন মায়ারীর । খোঁজে ঘোড় সও । য়ার- ? =৬+৬+৩

চরণ — মিশ্র-দুই মেল থেকে তিন মেল পর্যন্ত
লয় — দ্রুত
বিভাগ — ছ'মাত্রিক মেল ।
রীতি — বলবৃত্ত
কুলক — মিশ্র মেলক ঃ অমিল

(৫)

হে সম্রাট কবি, । = ৬
এই তব হৃদয়ের ছবি, । =১০
এই তব নব মেঘদূত, । =১০
অপূর্ব অদ্ভুত ছন্দেগানে । =১০
উঠিয়াছে অলক্ষ্যের পানে, । =১০
যেথা তব বিরহিণী প্রিয়া । =১০
রয়েছে মিশিয়া । = ৬
প্রভাতের অরুণ আভাসে, । =১০

ক্লান্ত সন্ধ্যা দিগন্তের । করুণ নিঃশ্বাসে, । ৮+৬
পূর্ণিমায় দেহহীন । চামেলির লাবণ্য বিলাসে ।- ৮+১০
ভাষার অতীত তীরে, । =৮
কাঙাল নয়ন যেথা । দ্বার হতে আসে ফিরে ফিরে । =৮+১০

চরণ — মিশ্রপদী—এক থেকে দুই
লয় — মধ্য
বিভাগ — ৬, ৮ ও ১০ মাত্রার পদ
রীতি — স্বরবৃত্ত
কুলক — মিশ্র ঃ সমিল পয়ার

(৬)

বাঁশির বাণী । চিরদিনের বাণী, । প্রতিদিনের । বুক বেয়ে চলেছে, । পথের ধারে দাঁড়িয়ে । বাঁশি শুনি, । আর মন যে কেমন করে । বুঝতে পারিনে ॥ সেই ব্যথাকে । চেনা সুখদুঃখের সঙ্গে । মেলাতে যাই, । মেলে না ॥

যখন মালাবদলের গান । বাঁশিতে বেজে উঠল । তখন এই কোনেটির দিকে । চেয়ে দেখলেম ।- তার গলায় সোনার হার, । তার পায়ে দুগাছি মল, । সে যেন কান্নার সরোবরে । আনন্দের পদ্মটির । উপর দাঁড়িয়ে ॥

সুরের ভিতর দিয়ে । তাকে সংসারের মানুষ বলে । আর চেনা গেল না ॥ সেই চেনাঘরের মেয়ে । অচিন ঘরের বউ হয়ে । দেখা দিলে ॥

বাঁশি বলে, । এই কথাই সত্য ॥

দ্রঃ এ গদ্য কাব্য । বাক্-বিভাজন চলেচে উচ্চারণ রীতির উপর নির্ভর করে ।

(৭)

মনে-করো-। যেন-বিদেশ । ঘুরে- =৬+৬+৩
মাকে-নিয়ে-। যাচ্ছি অনেক । দূরে- =৬+৬+৩
তুমি-যাচ্ছ । পাল্ কি তে মা-। চ'ড়ে- =৬+৬+৩
দরজা দুটো-। এক টুকু ফাঁক । ক'রে,- =৬+৬+৩
আমি-যাচ্ছি । রাঙা-ঘোড়ার । 'পরে- =৬+৬+৩
টগবগিয়ে-। তোমার পাশে-। পাশে-। =৬+৬+৩

চরণ — ত্রিমেলক
লয় — দ্রুত
বিভাগ — ৬+৬+৩ মাত্রায়
রীতি — বলবৃত্ত
কুলক — চরণে-চরণে মিল ; অন্ত্যচরণের মিল পরের দ্বিতীয় চরণের সঙ্গে

(৮)

নন্দলাল তো । একদা একটা । করিলে ভীষণ । পণ- =৬+৬+৬+২

স্বদেশের তরে, । যা’ করেই হোক, । রাখিবেই সে জীবন । =৬+৬+৬+২

চরণ — তিন পর্বে এবং একটি খণ্ডপর্বে গঠিত ।

লয় — বিলম্বিত

বিভাগ — ৬ মাত্রার পর্বে বিভক্ত

রীতি — স্বনবৃত্ত

কুলক — চরণে-চরণে মিল ঃ খণ্ডপর্ব এর বৈশিষ্ট্য

(৯)

প্রথম দিনের সূর্য । = ৮

প্রশ্ন করেছিল । = ৬

সত্তার নূতন আবির্ভাবে, ।- =১০

কে-তুমি ॥ = ৪ (কে=দ্বিমাত্রিক)

মেলেনি উত্তর ॥ = ৬

চরণ — পদ-চারী

লয় — মধ্য

বিভাগ — ৪, ৬, ৮, ১০ মাত্রার পদে

রীতি — স্বরবৃত্ত

কুলক — মিশ্রপদে গড়ে উঠেচে

(১০)

। । । ।

জাতের নামে । বজজাতি সব, । জাত জালিয়াৎ । খেলছে জুয়া ॥ =৬+৬+৬+৬

। । । ।

ছুঁলেই তোর । জাত যাবে ? জাত, । ছেলের হাতের । নয় তো মোয়া ॥

=৬+৬+৬+৬

চরণ — মেল-বিহারী

লয় — দ্রুত

বিভাগ — ৬+৬+৬+৬ মেলে

রীতি — বলবৃত্ত

কুলক — সমিল

দশম অধ্যায় ঃ বৈদেশিক ছন্দের রূপান্তর

কাব্যের তিন প্রকার ঃ (১) তানধর্মী (melopoeia)—যেখানে অর্থছাড়া ও শব্দাবলীতে আছে গীতিধর্ম বা সুর, যা অর্থের নিয়ামক ; (২) চিত্রধর্মী (Phanopoeia)-যা হলো দৃশ্য- কল্পনায় চিত্রস্থাপন ; (৩) ন্যায়ধর্মী (logopoeia)—'শব্দ মধ্যে বুদ্ধিনৃত্য'—অর্থাৎ এ শুধু অর্থনিয়ামক নয়, কিন্তু এর গণনায় আছে ব্যবহারের অভ্যাস, শব্দপ্রসঙ্গ, স্বাভাবিক সহবর্তণ, পরিচিত স্বীকৃতি ও ব্যঙ্গোক্তির লীলা। একভাষা থেকে অন্য ভাষায় (প্রথমটির) অনুবাদ ব্যবহারিক দিক থেকে অসম্ভব। অপর পক্ষে, (দ্বিতীয়টি) প্রায় অথবা সম্পূর্ণভাবে অনূদিত হতে পারে। (তৃতীয়টি) অনুবাদ-যোগ্য নয়, যদিও এর মনোভাব শব্দান্তরে প্রকাশক্ষম।

—এজ্রা পাউণ্ড[১]

১০.১ সনেট ও অমিত্রাক্ষর

অন্য সব সাহিত্যের মতোই বাঙলা সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়েচে বৈদেশিক উপাদানে। প্রথমেই চোখে পড়ে বহির্বিশ্বের ছন্দ বিচিত্রার প্রভাব এবং বিশেষত সনেট ও অমিত্রাক্ষরের অভিক্রিয়া। বস্তুত এরা এখন দেশী হয়ে গেচে। এদের বিবর্তনের রূপরেখা নিচে দেওয়া হলো ঃ

I. সনেট

'সনেট' শব্দটি এসেচে ইতালীয় Sonetto থেকে, যার অর্থ ছোটখাটো ধ্বনি বা গান। এ ১৪-চরণের কবিতা—ইংলণ্ডে পঞ্চমাত্রিক আয়াম্বিকে, ফ্রান্সে ষট্‌মাত্রিক আয়াম্বিকে—যা প্রচলিত সীমিত স্বাধীনতা সত্ত্বেও ব্যাপকভাবে পরিবর্তিত হয়েচে। এর তিনটি রূপ হলো এরূপ—(১) পেত্রার্কীয়, যার মিলকল্প, অষ্টকে (octave) কখখক-কখখক ; ষট্‌ক-এ (sestet) গঘঙ গঘঙ, বা গঘগঘগঘ, অথবা অন্ত্য যুগ্ম চরণ বর্জিত অনুরূপ সমবায় ; (২) স্পেন্সারীয়—কখকখ, খগখগ, গঘগঘ, ঙঙ ; ও (৩) শেকস্‌পীয়রীয় বা ইংরেজি—কখকখ, গঘগঘ, ঙচঙচ, ছছ। এখানে লক্ষণীয় যে ইতালীয় ধাঁচটি ব্যাপক ভাবে ব্যবহৃত। এতে চিন্তন দ্বিধাবিভক্ত —অষ্টকে আছে একটি সংহত ছাঁচ, এবং এর পরে চিন্তনের মোড় ফেরে বিচিত্র ষট্‌কে। অন্যদিকে স্পেন্সারীয় বা শেকস্‌পীয়রীয় ধাঁচে চিন্তাধারা তিনটি চতুষ্কে (quatrain) বিভক্ত এবং এ-ছাড়া আছে অন্ত্য যুগ্মচরণ। আদর্শবিচ্যুতি এসেচে এবং তাতে সনেট-বৈচিত্র্য প্রকাশ পেয়েচে।

(ক) ইতালীয় প্রারম্ভ

ইতিহাসের দিক থেকে সনেটের প্রারম্ভ সূচিত হয় ইতালীয় ধাঁচ ঘিরে। সম্ভবত দ্বি-চতুষ্ক সিসিলীয় Strambotto-তে ছ' পংক্তির অর্থাৎ দুটি ত্রিপদীর (tercet) দুনী ধুয়ার যোজনায় এর জন্ম। তবে প্রকৃত ইতালীয় ধাঁচের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় Giacomo da Lentino (১২১৫-১২৩৩)-র একাদশ অক্ষরীয় মিলকল্পে (rhyme-scheme): কখকখ-কখকখ গঘঙ-গঘঙ। তাঁর সমসাময়িকরা—Abbott of Tivoli, Ja Copo Mostacil, Pierro delle Vigne, Monaldo d'Aquino—এই ধাঁচ ব্যবহার করে স্থাপন করেন অষ্টক-ষট্‌ক বিভাগ এবং চতুষ্ক-ত্রিপদী উপবিভাগ। তবে Guittone d'Arezzo (১২৩০-১২৯৪)-ই স্থাপন করেন কখখক-কখখক অষ্টক, যা প্রচলিত হয় দান্তের 'নবজীবন' ও Canzoniere-এ আর পেত্রার্কের Canzoniere-এ। প্রথম তাত্ত্বিক আলোচনা করেন Antonioda Tempo তাঁর Summa Artis Rithimici (১৩৩২)-তে। বিয়াত্রিচের উদ্দেশে সনেট লেখেন দান্তে এবং পেত্রার্কও লাউরার প্রতি। এর শুরু প্রবল উক্তিতে এবং সঙ্গে সঙ্গেই কৃত্রিমতাও। কেননা এ নিষ্কাম প্রেমের পরিবৃত্তি-সঞ্জাত। ধাঁচের সঙ্গে এই কৃত্রিমতা ১৫-শ ও ১৬-শ শতকে পৌঁছায় সনেট সহ স্পেন, পর্তুগাল, ফ্রান্স, নেদারল্যাণ্ডস, পোলাণ্ড ও ইংলণ্ডে এবং পরে জার্মানী, স্কাণ্ডিনেভিয়া ও রাশিয়ায়। আরো পরে এ ছড়িয়ে যায় বিরাট বিশ্বে।

(খ) ইংলণ্ডে

সনেটের ফলপ্রসূ ইতিহাস দেখা যায় ইংলণ্ডে। Wytt (১৫০৩-১৫৪২) ইতালি থেকে ধাঁচটি আমদানি করেন, কিন্তু ষট্‌কে অন্ত্য যুগ্ম চরণ স্থাপন করেন। তিনি পেত্রার্কীয় অষ্টকের অবশ্য অনুবর্তন করেছেন। তবে Surrey (১৫১৭-১৫৪৭) প্রবর্তন করেন কখকখ, গঘগঘ, ঙচঙচ, ছছ মিলকল্প, কেননা এ-রীতি মিল-হীন ইংরেজি ভাষার বেশি উপযোগী। শেকস্‌পীয়রই একে শ্রেষ্ঠতা দেন। তবে স্পেন্সারের মিলকল্প ছিল কখকখ, খগখগ, গঘগঘ, ঙঙ, কেননা এতে স্পেন্সারীয় প্রথম ন'-পংক্তির সাদৃশ্য ধরা পড়ে। এ-কালে সিডনীর Astrophel ও Stella (১৫৮০), স্পেন্সারের Amoretti (১৫৯৫) ও শেকস্‌পীয়রের 'সনেট' (১৬০৯) রচিত হয়। এহলো 'সনেট পর্যায়' (Sonnet sequence)। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ধর্মবিষয়ক ড'নের "পুণ্য সনেট" (১৬১০)। এরপরে মিল্টন প্রকৃত ইতালীয় ধাঁচ প্রবর্তন করেন—পর্যায়ক্রমিক থেকে প্রাসঙ্গিক সনেটের প্রতিষ্ঠায় তিনি ঐক্যকে আরো সংহত করেছেন অষ্টকের ষট্‌ক-গমনের অনুমতি দিয়ে। গ্রথনকে তিনি সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর নীতির অনুসরণে অর্থাৎ "সঠিক

স্পন্দে, অক্ষরের উপযোগী মাত্রায় ও চরণ হতে চরণান্তরে অর্থের সম্প্রসারণে", যেমন ঘটেচে তাঁর অমিত্রাক্ষরে। একশো বছর পরে ঊনবিংশ শতকে ওয়ার্ডসোয়ার্থ প্রভাবিত হন মিল্টনের দ্বারা: তবে তাঁর ৫০০ সনেটের প্রায় অর্ধেকে আছে অষ্টকের কখখক-কগগক ভঙ্গি। কিন্তু কীট্স্-এ ব্যবহৃত হয়েচে শেকস্পীয়রীয় আদর্শ। এরপরে নাম কর্তে হয় ডি. জি. রসেটির The House of Life (১৮৮১) ও ই. বি. ব্রাউনিঙ্-এর Sonnets from the Portuguese (১৮৫০)-এর। বর্তমান যুগে এর উপযোগী সনেট অনেকেই সৃষ্টি করতে পারেন নি, যদিও W. H. Auden ও Dylan Thomas-এর নাম কর্তে হয়। অবশ্য একক কৃতি হিসেবে ইয়েট্স্-এর "Leda and the Swan" 'বিরল সৌন্দর্যমণ্ডিত।

(গ) মার্কিন মুলুকে

আমেরিকায় সনেট পৌঁছায় অষ্টাদশ শতকের চতুর্থাংশে Colonel David Humphreys-এর কৃতিতে। Longfellow (১৮০৭-৮২) একে আনেন ইংলণ্ডীয় স্তরে। পরে ধাঁচ ও বিষয়ে বৈচিত্র্য দেখা দিল Lowell, George Henry Boker ও Paul H. Hayne-তে। পরবর্তী যুগে এলেন E. A. Robinson, Merrill Moore, Allen Tate ও E. E. Cummings, যাঁরা বিশেষভাবে স্মরণীয়। Robinson বলেন সনেট-রচয়িতাদের সম্পর্কে—

এ'রা ক্ষুদ্র সনেটের লোক,
প্রস্তুত করেন যাঁরা কোন এক যান্ত্রিক কৌশলে
প্রাণহীন গানগুচ্ছ, একদিন যারা শুধু জ্ব'লে
অন্তর্হিত হয় রাত্রে, পৌঁছয়না যেখানে আলোক।

(ঘ) বর্তমান অবস্থা

সনেটের ব্যাপ্তি ঘটেচে বিষয় ও মেজাজ সম্পর্কে, যদিও প্রধান বিবর্তনধারা ঠিকই আছে। গঠন ঠিকই আছে; তবে এতে অনুপ্রবেশ করেচে আধুনিক কবিতার মুখ্য অভিক্রিয়া। তাই এতে প্রতিফলিত হয়েচে একদিকে যেমন হপকিন্স্-এর "হঠাৎ স্পন্দ" ও মুক্তক, অন্যদিকে এসেচে সঠিক মিলের জায়গায় প্রতিকল্প ও অধিকতর স্বাভাবিক বাগর্থ। সনেট তাই ইউরোপ ও আমেরিকায় নতুনত্ব দেখিয়েচে। এরি কয়েকটি নমুনা তুলে ধরা গেল—

(১) সপুচ্ছ (Caudal)—১৪ চরণের সঙ্গে যুক্ত হয় একটি বা দু'টি পুচ্ছ (tail)। এরি আবিষ্কর্তা Francesco Berni (১৪৯৭-১৫৩৬) এবং ব্যবহৃত হয় ব্যঙ্গার্থে, যেমন মিল্টনের On the New Forcers of conscience under the Long Parliament।

(২) সন্তত (Continuous)—একটি বা দু'টি মিলধ্বনি সর্বত্র বর্তমান।

(৩) শৃঙ্খলিত (Chained)—প্রত্যেক চরণ পূর্ববর্তী চরণের শেষশব্দ নিয়ে তৈরি।

(৪) প্রতীপগতি (Retrograde)—পশ্চাদ্বর্তীকে অগ্রবর্তীরূপে পঠন।

(৫) আন্তঃগ্রথিত (Interwoven)—মধ্য ও অন্ত্য মিলে গড়া।

(৬) সনেট মুকুট (Crown of sonnets)—এ সাতটি সনেটের সমন্বয়ে গঠিত—পূর্ববর্তী ৬টি সনেটের প্রত্যেকের অন্ত্যচরণ হবে পরবর্তী সনেটের প্রথমচরণ এবং ৭ম সনেটের অন্ত্যচরণ হবে প্রথমটির প্রারম্ভ চরণ। এর উদাহরণ John Donne-এর Holy Sonnets.

(৭) বিউনী মিলের সনেট (Terza rima sonnet)—মিলকল্প এরূপ ঃ কখক-খগখ-গঘগ-ঘঙঘ-ঙঙ, যেমন শেলির Ode to the West Wind।

(৮) চতুর্মাত্রিক (Tetrametric)—পঞ্চ মাত্রার জায়গায় চারমাত্রা।[২]

(ঙ) **বাঙলা সনেট**

১৮৬৬ সালে মধুসূদন দত্তের 'দতুর্দ্দশপদী কবিতাবলী' প্রকাশিত হয়—১৮৬৫-তে তিনি ছিলেন ফ্রান্সে, ভেসাঁই শহরে। এহলো ইতালীয় ধাঁচের সনেট-গুচ্ছ। এর নাম ঠিক হয়নি—সনেট রাখাই বাঞ্ছনীয়। কেননা, ঐ নামের দ্বারা ঐ কাব্য রচনার কোন পরিচয় পাওয়া যায় না—ফলে ইংরেজি শব্দটি অর্থাৎ 'সনেট'ই গৃহীত হয়েচে। মধুসূদন আদি সনেট রচয়িতা হলেও, তাঁর হাতে এ তেমন খোলেনি। মোহিতলাল তাই ঠিকই বলেচেন ঃ "মধুসূদনের সনেটগুলির ভাববস্তু যেমন প্রায়ই অকিঞ্চিতকর, তেমনই অতিশয় পদ্যগন্ধী ও নানা দোষ দুষ্ট, ছন্দও নিতান্তই স্রোতোহীন—পদগুলি অতিকষ্টে পা' ফেলিয়া চলে"।[৩] পরে দেবেন্দ্রনাথ সেনে এ খানিকটা এগিয়েচে—এর উদাহরণ 'অশোকগুচ্ছে'র (১৩০৮) 'রাক্ষসী' সনেটটি। এখানে ১৪ অক্ষর না হয়ে, চরণগুলি হয়েচে ১৮ অক্ষরের। অক্ষয় বড়ালও লিখেছেন 'সনেট'—তবে তেমন কোন অগ্রগতি নেই। এখানে লক্ষণীয় যে মধুসূদন তাঁর ১০৮টি সনেটের মধ্যে খাঁটি পেত্রার্কীয় পদ্ধতিতে মাত্র দু'টি সনেট রচনা করেছিলেন, যথা 'শ্মশান' ও 'কমলে কামিনী' এবং চরণের অক্ষর সংখ্যা ১৪। রবীন্দ্রনাথে "খাঁটি সনেট" নেই—তিনি সনেটের গড়ন বা মিলবিন্যাসের নিয়ম সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেচেন, যেমন 'কড়ি ও কোমলে' (১২৯৩)। অধিকাংশ সনেটই পয়ারে লেখা ; দু' একটি দীর্ঘতর ছন্দে। সনেটের আভাসটুকুও লুপ্ত হয়েচে 'নৈবেদ্য' (১৩০৮) ও 'চৈতালি' (১৩০৩)-তে। পর-পর সাতটি পয়ার শ্লোক আছে মাত্র। প্রমথ চৌধুরীর 'সনেট' পঞ্চাশৎ (১৯১৩) এ প্রসঙ্গে

স্মরণীয়, কেননা এতে তিনি ফরাসী সনেটের রূপ দিতে চেষ্টা করেচেনঃ কুলক-এর রূপ ঃ ৪+৪+২+৪। তবে এর ব্যতিক্রমও আছে। "জয়দেব" সনেটটির মিলকল্প হলো কখখক, কখখক, গগ, ঘ ঙ ঙ ঘ। মাঝের 'গগ' ফরাসী আদর্শে। তাছাড়া আছে "সনেট সপ্তক" বা crown of sonnets 'পদচারণ' (১৯১৯)-এ।

মোহিতলাল মজুমদারই 'সনেট' লিখেচেন কঠিন সংযমে, অথচ তাতে রসের ঘাটতি পড়েনি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য 'বিস্মরণী'র (১৯২৭) উৎসর্গ কবিতা, 'স্মরগরলে'র (১৩৩৬), 'ত্রিস্রোতা' ও 'হেমন্ত গোধূলি'র (১৯৪১) 'উপমা' সনেটগুলি। 'ছন্দ চতুর্দশী' (১৯৫১)ও স্মরণীয়। অজিত দত্তের 'কুসুমের মাস' (১৯৩০)-এ আছে আঠারো-অক্ষরের সনেট। প্রমথ বিশী, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত প্রভৃতিও সনেট রচনা করেচেন, কিন্তু এঁদের মধ্যে তেমন নতুনত্বের সন্ধান মেলে না, যা এসেচে সনেট ধাঁচে। এ প্রসঙ্গে অনিল বিশ্বাসের সনেট রচনার বৈচিত্র্য উল্লেখ্য। তিনি শেকস্‌পীয়রের সমগ্র সনেটের অনুবাদ করেচেন ঐ একই রীতিতে। তাঁর "শেকস্‌পীয়রের সনেট" (১৯৬৪)-এর চরণ ১৮ অক্ষরের (৮+১০)। এ হলো বাঙলা ভাষায় শেকস্‌পীয়রের সনেটের প্রথম রূপান্তর। এ-সম্পর্কে ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের উক্তি উল্লেখ্য ঃ "শেকস্‌পীয়রের সনেটের অনুবাদ এক দুঃসাহসিক অভিযান। বর্তমান অনুবাদক এই প্রচেষ্টায় সফলকাম হইয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ মূল হইতে ব্যতিক্রান্ত হয় নাই এবং ইহার মধ্যে মূলের সৌন্দর্য বিধৃত হইয়াছে।" এ ছাড়া সনেটে তাঁর নতুনত্ব নিচে তুলে ধরা গেল—

(১) অক্ষর সংখ্যা ৮+৬ থেকে ৮+১০ ও ১০+১০+৮ এ পৌঁছেচে ঃ বৃহত্তম এদিক থেকে তাঁর 'বিতক" সনেটটি (পদধ্বনি, ১৩৫৮)।

(২) মিল্টনীয় চরণ আছে অর্থাৎ অষ্টকের সম্প্রসারণ ষটকে, ফলে অষ্টকের সঙ্গে যুক্ত হয়েচে নবম চরণটি ঃ 'পদধ্বনি' "লালপাহাড়"।

(৩) অষ্টক ৮+১০ এ, কিন্তু ষটক ৮+৬ এ ; আবার এর উল্টোটা অর্থাৎ অষ্টক ৮+৬ এ, কিন্তু ষটক ৮+১০ এ। এক কথায় বড়ো থেকে ছোট এবং ছোট থেকে বড়ো আকৃতিতেই বৈশিষ্ট্য। এর উদাহরণ 'রবট' ও 'গড়মান্দারণ'। অষ্টক ও ষটকের মিশ্রণ এখানে দ্রষ্টব্য। যথা,

নীল রঙা জলে ভাসে।
দেয় না হদিস

অথবা,

বালিয়াড়ি, বালুচর।
হাজার কথার ঘুরপাকে

(৪) পরিবর্তনীয় পর্ব আমদানি ও মুক্তকের ব্যবহার, যেমন 'বিতকে"।

(৫) আজস্রাঁ বা প্রবহমানতা—অষ্টকের প্রবহমানতা নবম পেরিয়ে দশম পংক্তির মাঝামাঝি এসেচে, যেমন 'পলাশী' ('পদধ্বনি') তে।

(৬) বিউনী মিলের সনেট হলো 'শিবির' (বাঁকাজল, ১৩৬৯)-এ বলবৃত্তে রচিত এবং ২৪ মাত্রায়।

(৭) আধুনিক 'মূর্ত্ত কবিতা' সম্প্রসারিত হয়েচে 'পাঁচালি' ও 'চৈত্রের প্রার্থনা'য় (বাঁকাজল)—চরণকে ভেঙে সাজান হয়েচে দৃশ্য কাব্যের সম্যক উপলব্ধির জন্যে, যেমন,

মৃত্যু পারে
তাই, যম,
তোমাকে শুধাই,
অমৃতের পথ বলো। কোথা গিয়ে পাই ?

(৮) ব্যক্তিকতা পেরিয়ে সনেট পাড়ি দিয়েচে বিশ্বদর্শনায়নে "অতিবাস্তব স্বপ্নে", যথা,

থাইরয়েড ডেকে আনে বিজ্ঞানীকে অণুর খেলায়
ধর্ষণে ধরাকে ধরে, রচে বার্লি'ন ও হিরোশিমা ;
মুঠোমুঠো ধুলো ওড়ে, রচে শূন্যে আপনারি সীমা।
বোধিদ্রুমে ধ্যানমগ্ন রবটেরা শোনায় সন্দেশ—
অবিহীসা ভূতানাম্। দেশকাল সন্ততি হারায় ঃ
বস্তুঘন স্বপ্ন দেখে বিদেহী আত্মার গুড়াকেশ।

II. **অমিত্রাক্ষর**

(৬.৩) ঃ 'নিরুক্তি'-তে '৪'-সংখ্যায় এর আলোচনা আছে। মধুসূদন এর স্রষ্টা এবং একে ব্যবহার করেচেন 'মহাকাব্যে' অর্থাৎ 'মেঘনাদবধ'-এ। বর্তমান যুগে আর ঐ ধরনের মহাকাব্য রচিত হচ্ছেনা। তাই এ এখন নাটকে ও দু' একটি কবিতায় স্থান লাভ করেচে। নাটকে ব্যবহারের জন্য অবশ্য একে হতে হয়েচে 'ভগ্ন', অর্থাৎ 'ভাঙা অমিত্রাক্ষরে' নাটক রচিত হয়েচে গিরিশচন্দ্রে এবং অন্যান্যরাও এর অনুসরণ করেচেন। ফলে 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর' এখন 'গৈরিশ ছন্দ' নামে পরিচিত। মধুসূদনই 'ভাঙা অমিত্রাক্ষরে'র সূত্রপাত করেন তাঁর 'পদ্মাবতী' নাটকে। পরে একে রাজকৃষ্ণ রায় 'ভাঙা অমিত্রাক্ষর' বলে অভিহিত করে এর ব্যবহার করেন তার 'হরধনু ভঙ্গ' নাটকে। ব্রজমোহন রায়ও ব্যবহার করেন তাঁর 'দানববিজয়' নাটকে। তাই দেখা যায় এর বিবর্তন হয়েচে মধুসূদন থেকে ব্রজমোহনে, ব্রজমোহন থেকে রাজকৃষ্ণে এবং রাজকৃষ্ণ হ'তে গিরিশ চন্দ্রে। 'নল দময়ন্তী' ২য় অংক, ৩য় গভাংক থেকে গৈরিশ ছন্দের উদাহরণ দেয়া হলো—

কারে নাথ দাও হে বিদায় = ১০
আমি ছায়া তব = ৬
বরিয়াছি নল মম। প্রাণে শ্বরে, = ৮+৪
বরি নাই 'রাজানল'। = ৮

১০. ২ সংস্কৃত দন্দ

সংস্কৃত ও বাঙলা ভাষা স্বতন্ত্র, কেননা এদের উচ্চারণের তারতম্য আছে। 'শ্রুতবোধে' (২।৩) আছে যে অনুস্বার ও বিসর্গযুক্ত স্বরবর্ণ, সংযোগের পূর্ববর্তী হ্রস্বস্বর এবং দীর্ঘ স্বর—যথা, আ, ঈ, ঊ, ঋ, ঌ, এ, ও, ঐ, ঔ— গুরুবর্ণ বলে পরিচিত। কখনো কখনো শ্লোক পাদের অন্তঃস্থিত হ্রস্বস্বর দীর্ঘ হয়, আবার কদাচ হয় না। যা একপ্রযত্নে বা একমাত্রায় উচ্চারিত হয় তাকে হ্রস্ববর্ণ বলে, এবং দীর্ঘস্বর দু'মাত্রায় উচ্চারিত হয়, প্লুতস্বর তিনমাত্রায়। আর ব্যঞ্জনের অর্ধমাত্রা। এ হলো সংস্কৃতের উচ্চারণ বিধি। কিন্তু বাঙলায় এর অভাবই সূচিত হয়। তাই সংস্কৃতকে বৈদেশিক ভাষার সামিল মনে করতে হয় ছন্দসম্পর্কে। বাঙলায় সংস্কৃত ছন্দ আমদানি কর্তে হলে বাঙলা উচ্চারণকে সংস্কৃত উচ্চারণের উপযোগী করার প্রয়োজন। উদাহরণ সমেত এ বিষয় আলোচনা করা গেল।

I. বাঙলা রূপান্তর

সংস্কৃত ছন্দের বিভিন্ন বাঙলা রূপান্তর নিচে তুলে ধরা গেল ঃ

(১) তোটক—সংকেত হলো ঃ ⏑⏑—⏑⏑—⏑⏑—⏑⏑—।

এঁর অনুকরণে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত লিখেচেন চারে-চারে ভাগ করে, যথা,

⏑⏑ — ⏑⏑ — ⏑⏑ — ⏑⏑ —
এঁকি ভা। ওারে লুট। করে ধান। লোটা নো
এঁকি চাষ। দিয়ে রাশ। করে ফুল। ফোটা নো
এখানে চরণের অন্ত্য অক্ষরটির দীর্ঘ উচ্চারণ কৃত্রিম।

(২) তৃণক—সংকেত হলো ঃ —⏑, —⏑। —⏑, —⏑। —⏑, —⏑। —⏑, —।

ভারত চন্দ্র 'অন্নদামঙ্গলে' এর ব্যবহার করেচেন, যথা,

রাজ্য খণ্ড,। লণ্ড ভণ্ড,। বি ষ্ণু লি ঙ্গ। ছু টি ছে।
স্থূল স্থূল,। কূল কূল,। ব্রহ্ম ডিম্ব। ফু টি ছে।
দীর্ঘ উচ্চারণ এখানে আড়ষ্ট।

(৩) ভুজঙ্গপ্রয়াত—এতে প্রথম, চতুর্থ, সপ্তম ও দশম বর্ণ লঘু, বাকীগুলি গুরু, যথা,

১ ৪ ৭ ১০
অদূরে মহারুদ্র ডাকে গভীরে,
অরে রে অরে দক্ষ দে রে সতীরে।

(৪) **মন্দাক্রান্তা**

পিঙ্গল ছন্দঃ সূত্রে (VII. ১৯) মন্দাক্রান্তার লক্ষণ নিরূপিত হয়েচে এভাবে ঃ যার প্রতি পদে ম-গণ, ভ-গণ, ন-গণ, ত-গণ দ্বয় এবং গ-কার দ্বয় থাকে, তাকে বলে 'মন্দাক্রান্তা' ; এ-ছন্দে ৪, ৬, ও ৭ অক্ষরে যতি থাকে। সংকেত ঃ — — — —। ⌣⌣⌣⌣⌣— ৷ —, ⌣— —,⌣— —। এই তিনটি অসমান যতি বিভাগের মাত্রা-পরিচিতি এরূপ ঃ প্রথম বিভাগে ৪ অক্ষরে ৮ মাত্রা ; দ্বিতীয় বিভাগে ৬ অক্ষরে ৭ মাত্রা ; তৃতীয় বিভাগে ৭ অক্ষরে ১২ মাত্রা। বাঙলার রূপান্তর আছে কালিদাসের 'মেঘদূতে'র মন্দাক্রান্তার অনুবাদে। ২০ খানি বইয়ে এর বহর দেখা যায়। অধিকাংশই অক্ষম প্রচেষ্টা।[৪] এদের পরিচয় দেয়া হলো—

(ক) **স্বরবৃত্ত**

এখানে উল্লেখ্য দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মেঘদূতের' (১৮৬০) অনুবাদ—পূর্বমেঘ ৮+৬-এর পয়ারে ঃ আর উত্তরমেঘ ৮+৮+১০-এ ত্রিপদীতে। সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৮+১০-এ 'মেঘদূতে'র (১৮৯১) অনুবাদ করেচেন।

(খ) **বলবৃত্ত**

নরেন্দ্র দেব-এর অনুবাদ (১৩৩৬) এখানে উল্লেখ্য।

(গ) **স্বনবৃত্ত**

রবীন্দ্রনাথ দেখিয়েচেন দু'টি ছাঁচ—একটি ২৬ মাত্রার, অন্যটি ২৭ মাত্রার। অসিত হালদার, হিরন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়, প্যারীমোহন সেনগুপ্ত, কান্তিচন্দ্র ঘোষ ও বুদ্ধদেব বসু অনুবাদ করেচেন যথাক্রমে ১৩৫৪, ১৩৭১, ১৩৩২, ১৩৩৯, ও ১৩৬৪ সালে।

(ঘ) **বাঙ্‌লা মন্দাক্রান্তা**

বাঙলা মন্দাক্রান্তার প্রবর্তক সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'যক্ষের নিবেদন'-এ ('কুহু ও কেকা', ১৯১২)। তাঁর ধ্বনিবিন্যাস এ রকম ঃ — — — —।⌣⌣⌣⌣⌣ —।— ⌣ — —।⌣— —। অর্থাৎ চার-ছয়-চার-তিন অক্ষরের ভাগ। মাত্রার হিসেবে এ দাঁড়ায় ৮+৭+৭+৫-এ, যথা,

পিঙ্গল্ বিহ্বল্। ব্যথিত নভ তল্। কই্ গো কই্ মেঘ। উদয়্ হও্।

এঁর অনুসরণে অনিল বিশ্বাসের অনুবাদ এরূপ ঃ

কোন্ এক যক্ষের। নিজ কাজ ভুলের। জন্যে শাপ্ হয়। প্রভাবহীন,
কান্তার বিচ্ছেদ। সইতেই হবে তার। বর্ষাকাল দুখ। ভয়ংকর।

ইতিমধ্যে গোটা 'মেঘদূতের' অনুবাদ করেন যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার ১৩৭৫ সালে।[৫] দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। এ-সম্বন্ধে রাজশেখর বসুর ব্যঙ্গোক্তিই সংস্কৃতের বাঙলা রূপান্তরে প্রযোজ্য—

মন্দাক্রান্তায় রচিল কালিদাস কাব্য মেঘদূত চমৎকার-
বাংলায় তদ্রূপ লঘুগুরু বিভেদ নেই বলেই শক্ত একটু।
যুক্তাক্ষর তাই যত পার চালাও, আর দেদার দাও হসন্ত ;
ঠিকঠিক জায়গায় বসালে পাবে এই তক্রে কিঞ্চিৎ দুধের স্বাদ।[৬]

(৫) মালিনী

এর সংকেত হলো ঃ ৬ লঘু, ২ গুরুর পর যতি ; গুরু লঘু, গুরু গুরু, লঘু গুরু গুরু-র পরে যতি, যথা—সত্যেন্দ্রনাথের

◡ ◡ ◡◡ ◡◡ – – –◡– –◡ – –
উ ড়ে চলে গেছে বুল বুল্ শূন্য ময় স্বর্ণ পিঞ্জর,
ফুরায়ে এসেছে ফাল্গুন, যৌবনের জীর্ণ নির্ভর।

কিন্তু এখানে বাঙলা উচ্চারণকে কিছুটা বিকৃত কর্তে হয়েচে সংস্কৃত ছন্দের প্রয়োজনে।

II. মন্তব্য

আগেই বলা হয়েচে যে সংস্কৃত ও বাঙলা উচ্চারণ এক নয়। বাঙলায় সাধারণত সব স্বরই হ্রস্ব এবং হসন্ত অক্ষরকে দীর্ঘ ধরা হয়। ধ্বনির দিক থেকে এই হসন্তের দীর্ঘত্ব ও সংস্কৃত-এর দীর্ঘত্ব এক নয়। সংস্কৃতে সন্ধি আবশ্যিক, কিন্তু বাংলায় তা নয়। এছাড়া সংস্কৃতের চরণ হ্রস্ব ও দীর্ঘ অক্ষরের সমবায়ে গঠিত এবং তাতে যে ধ্বনি কল্লোল সৃষ্টি হয় তাই সংস্কৃত ছন্দের প্রাণ। আর সংস্কৃত ছন্দের উপাদান কয়েকটি গণ, যাতে চরণ গড়ে ওঠে ; কিন্তু এতে নেই শব্দ-গড়নের কোন সম্বন্ধ।[৭] সত্যেন্দ্রনাথ হসন্ত অক্ষরকে দ্বিমাত্রিক ধরে আমদানি করেচেন "হসন্ত-প্রাণ মাত্রাবৃত্ত"। এতে হসন্ত অক্ষরই গুরু, যথা তুম্, দের্, নার্ প্রভৃতি ; আর স্বরান্ত বর্ণই লঘু, যথা তা, কে, কি ইত্যাদি। উদ্দেশ্য সংস্কৃতের অনুকরণে মাত্রাবৃত্ত (ধ্বনবৃত্ত) ছন্দরচনা। এতে এক নতুন ছন্দধ্বনি উৎপন্ন হয়েচে বটে, কিন্তু এ "ছন্দ কৃত্রিম, তাহাতে খাঁটি কবিতা অপেক্ষা 'চিত্রকাব্য' রচনাই সম্ভব। কারণ, বাংলা বাক্যের উচ্চারণে, আদ্য ঝোঁককে কোন ক্রমেই আর কোথাও সরাইয়া লওয়া যায় না। এজন্য গুরুলঘু-স্বর সন্নিবেশকালে, সেই ঝোঁককে লংঘন করিয়া ছন্দের আবশ্যক মত, যেকোন স্থানে স্বরবৃদ্ধির ব্যবস্থা করিলে, তাহাতে ছন্দের কারুকলা বা কৃত্রিম ধ্বনি চাতুর্যই প্রধান হইয়া উঠে—কাব্যপ্রেরণার আন্তরিকতা ক্ষুণ্ণ হয়।"[৮]

১০.৩ ইংরেজি ছন্দ

ছন্দ (metre) বা স্পন্দমিতি শব্দ এসেচে গ্রীক্ থেকে, যেখানে এর অর্থ ছিল 'মাপ' (measure)। কাজেই অনুসন্ধানের একটি হলো কি মাপা হয়। এরি ভিত্তিতে চারটি ছান্দসিক পদ্ধতি লক্ষণীয়—আক্ষরিক (syllabic), প্রাস্বনিক

(accentual); প্রস্বনাক্ষরিক (accentual-syllabic); ও মাত্রিক (quantitative)।[২] বৈদিক ছন্দ আক্ষরিক অর্থাৎ অক্ষরগুণে নির্ধারিত। এরপরে সংস্কৃত হলো মাত্রিক, কেননা এ স্বরের ও বর্ণের লঘু ও গুরুর উপর নির্ভরশীল অর্থাৎ মাত্রিক। এ-থেকে উদ্ভূত বাংলা সাধু ছন্দ ও মাত্রিক, যেমন গ্রীক ও লাতিন ছন্দ ছিল। ইউরোপীয় ছন্দশাস্ত্রে আছে তিনটি পদ্ধতি—মাত্রিক, আক্ষরিক, ও প্রাস্বনিক। লঘু-গুরু ভেদেই প্রথমটির উদ্ভব। দ্বিতীয়টি মাত্রাকে বাদ দিয়ে মাত্রিক ছন্দ লেখনে উৎপন্ন হয়েচে। এর নিয়মাবলী হলো—

(১) চরণে অক্ষর সংখ্যা নিয়মিত ;

(২) অতিরিক্ত অক্ষর হিসাব বহির্ভূত ;

(৩) যে কোন অক্ষর হ্রস্ব বা দীর্ঘ হতে পারে ; এবং

(৪) বিকল্প প্রচাপের প্রবণতা। প্রচাপ (প্রস্বন) পদ্ধতিতে স্বাভাবিক প্রস্বনিত বাক্স্পন্দ মুখ্য ভূমিকা নেয়, আর আক্ষরিক পদ্ধতিকে হটিয়ে দিয়ে পদ্যের বা চরণের নিয়ামক হয়। এ প্রণালী প্রাচীন ধ্রুপদী পদ্যেও ব্যবহৃত হতো, তবে মাত্রিক স্পন্দের উপর। এই বাক্স্পন্দ শ্রেষ্ঠ কবির রচনায় দেখা যেত, যখন আক্ষরিক পদ্ধতিতে নিয়মকানুন শিথিল হয়ে পড়তো। তাই মিল্টনে বাক্স্পন্দ এলো, শুধু দু'টি মাত্র নিয়ম অনুসরণ করে—তবুও রইল তাঁর আক্ষরিক ছল (syllabic fiction), যাতে অক্ষরগুচ্ছ প্রথম দু'টি নিয়ম পালন করে এবং কয়েকটি আয়াম্বিকে বিভক্ত হতে পারে। পরে এই আক্ষরিক ছলটুকুও লুপ্ত হলো। ফলে প্রচাপস্পন্দ গীতি স্পন্দের কাছাকাছি এলো, আর ইংরেজী ছন্দ এই প্রচাপ-নির্ভর।[৭] অর্থাৎ এখানকার নিয়ম হলো চরণে ক'টি প্রচাপ আছে তার হিসাব নেওয়া।

এখন প্রশ্ন, বাঙলা ছন্দে এই প্রচাপ আছে কিনা। এ যে আছে তার প্রমাণ দেওয়া হয়েচে আগেই। ১৯৩১ সালে Taraporewala তাঁর Elements of the science of language (পৃঃ ১৪৭)-এ "প্রবল প্রচাপ-প্রবণতা" লক্ষ করেচেন। এবং এ ছন্দের নাম বলবৃত্ত। বলা বাহুল্য এ হলো বাংলা প্রাকৃত ছন্দ। প্রাকৃত বাংলা ও ইংরেজির সঙ্গে এখানে তাই মিল। রবীন্দ্রনাথ তাই বলেচেনঃ "চলতি ভাষার কথাগুলিও শুচিভাবে পরস্পরের স্পর্শ বাঁচাইয়া চলে না। ইংরেজী শব্দের মতো চালিবার সময় কে কাহার গায়ে পড়ে তাঁহার ঠিক নাই। বাংলা চলিত ভাষার ধ্বনিটা হসন্তের সাংঘাত ধ্বনি, এই জন্য ধ্বনিহিসাবে সংস্কৃতের চেয়ে ইংরেজির সঙ্গে তাহার মিল বেশি। বাংলা প্রাকৃতের (দৃষ্টান্ত) :

একলা পাগ্‌লা ফিরবে জঙ্গল,
মিট্‌বে সংকট, ঘুচবে ধন্দ।

ইহার সঙ্গে Edgar Allan Poe'র The Raven-

১ ২ ৩ ৪ ১ ২ ৩ ৪
Ah, distinctly । I remember, ।
It was in the । bleak December. ।

(উপরের) শ্লোকটি মিলাইয়া দেখিলে দেখা যাইবে ধ্বনির বিশেষ কোনো তফাত নাই।"[১০] অনেকেই এই বিষয়টি বুঝতে পারেননি ঃ তাঁরা জানেন না যে প্রস্বনের দুটি দিক আছে—একটি প্রস্বরণ (pitch); অন্যটি প্রচাপন (stress)। সাধু বাংলায় আছে প্রথমটি, আর প্রাকৃত বাংলায় দ্বিতীয়টি। কাজেই বাংলার ছন্দ পদ্ধতি প্রস্বন-মাত্রিক (accentual-quantitative), যা প্রস্বনাক্ষরিকের (accentual-syllabic) পরিণত রূপ।[২] অর্থাৎ সাধু বাংলায় ছন্দ নিরূপিত হয় অক্ষরের মাত্রায় ; আর প্রাকৃত বাংলা প্রচাপ (stress) বা বলের মাত্রিকতায়। স্বভাবতই তাই প্রচাপ মাত্রায় রূপান্তরিত হয়। বলবৃত্ত—আলোচনায় এ দেখান হয়েচে।

মনে রাখতে হবে বলবৃত্ত ইংরেজির অপূর্ণপদী চতুর্মাত্রিক ট্রকির (Trochaic tetrameter catalectic) অনুরূপ, কিন্তু সামিল নয়। তুলনা করলেই তা বোঝা যাবে, যেমন Montgomeryর—

Now in / deep and / dreadful / gloom,
Clouds on / clouds por- / tentious / spread,
Black as / if the / day of / doom
Hung o'er / Nature's / shrinking / head.

বাংলা লিপ্যন্তরে,

নাউ ইন। ডিপ এ্যাণ্ড। ড্রেডফুল। গ্লুম,
ক্লাউড্স অন। ক্লাউডস্ পর-। টেনসা'চ। স্প্রেড,
ব্ল্যাক এ্যাজ। ইফ দি। ডে অব। ডুম
হাঙ্গ ওর। নে চারস্। শ্রিঙ্কিং। হেড।

এরি পাশে নেওয়া যাক্ সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের 'দূরের পাল্লা'[১১]—

ছিপ্‌খান। তিন্-দাঁড়। তিনজন। মাল্লা

।   ।   ।   ।
চৌ পর । দিন-ভোর । দ্যায় দূর । পাল্লা ।
।   ।   ।   ।
লকৃলক্‌ । শরবন, । বক্‌ তায় । মগ্ন,
।   ।   ।   ।
চুপ্‌ চাপ্‌ । চার দিক্‌ । -সন্ধ্যার । লগ্ন ।

বাংলা ও ইংরেজি কবিতা দু'টি অনুরূপ, তাতে কোন ভুল নেই। তাই দু'য়ের সাদৃশ্য এই সীমিত ক্ষেত্রেই সম্ভব। তবে দুই ভাষার উচ্চারণ সীমার কথা মনে রাখতে হবে। তাই Shelleyর The cloud-এর তুলনা চলে না, কেননা এ হলো আয়াম্বাস, ট্রকি নয়। তেমনি এ তুলনীয় হতে পারে না Milton-এর Paradise Lost-এর চরণের সঙ্গে, যেমন Of man's first disobedience, and the fruit, কেননা এ iambus এ লেখা। এরকম তৌলন আলোচনা হাস্যকর—এতে বোঝায় যে সমালোচক দু'টি ছন্দোপ্রকৃতি সম্বন্ধে সজাগ নন।[৭]

বলবৃত্তের দ্বিমাত্রিক চলনের জায়গায় এবার নেয়া যাক ত্রিমাত্রিক চলন। এরি অনুরূপ হলো dactyl অর্থাৎ একটি প্রস্বনিত অক্ষরের পরে আছে দু'টি অপ্রস্বনিত অক্ষর। অর্থাৎ আগে trochee ও দু'য়ের চলনের জায়গায় এখানে আছে তিনের চলন। বলবৃত্তের দু'য়ের চলন দেখান হয়েচে আগেই—এ কাহারবা ঢঙের চতুর্মাত্রিক ছন্দ, যেমন "ছিপখান্‌ । তিন্‌ দাঁড়"। এবার ত্রিমাত্রিক চলনে আসে খেমটা ঢঙের ষন্‌মাত্রিক মেল, যা ইংরেজির dactyl এর অনুরূপ, কিন্তু সামিল নয়। Tennyson-এর

।   ।
Can—non to / right of them,
।   ।
Can—non to / left of them.

বাংলা লিপ্যন্তরে—

।   ।
ক্যানন টু । রাইট অব দেম,
।   ।
ক্যানন টু । লেফট অব দেম।

এবার বলবৃত্তের ষন্‌মাত্রিক (অপূর্ণপদী) নেয়া যাক—

।   ।
কে জানেরে । পোড়া দেশে ।
।   ।
বন্যা কেন । আসে ।

—অনিল বিশ্বাস ঃ পদধ্বনি-ছড়া (১)।

এবার পূর্ণপদী ষাণ্মাত্রিক বলবৃত্ত—

| |
ঘুরে ঘুরে। ঘুম্‌তী চলে,
ঠুম্‌রী তালে। ঢেউ তোলে।

—সত্যেন্দ্রনাথ ঃ 'বিদায়-আরতি', 'ঘুম্‌তী নদী'।

এই সীমিত ক্ষেত্রেই ইংরেজির অনুরূপ ছন্দ বাংলা বলবৃত্তেই সম্ভব। কেননা ইংরেজি প্রচাপ-আনা অন্যান্য ছন্দে, যেমন স্বরবৃত্ত বা স্বনবৃত্তে সম্ভবপর নয়। কাজেই সে সম্বন্ধে আলোচনা নিরর্থক।

১০. ৪ রকমারি রূপান্তর

এবার ছন্দ-সম্পর্কীয় বিভিন্ন দিকের রূপান্তর গুলির কথা। এখানে কার্যকর হয়েচে রবীন্দ্রনাথের একটি উক্তি ঃ

"পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার, সেথা হতে সবে আনে উপহার
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে, যাবে না ফিরে—
এই ভারতের মহা-মানবের সাগর তীরে"।[১২]

বাংলা কবিতা তাই ডানা মেলেচে বহির্বিশ্বে এবং সেখান থেকে সংগ্রহ করেচে তার পুষ্টি। এবার এই রকমারি পুষ্টির কথা বলা হলো নীচে—

I. বিভিন্ন ছন্দ

(ক) আরবী—আরবী ছন্দে কিছু কবিতা লিখেচেন নজরুল ইসলাম। তিনি বলেন ঃ "আরবী ছন্দ যেমন দুরূহ, তেমনি তড়িৎ চঞ্চল। প্রত্যেকটি ছন্দের গতি বিভিন্ন রকমের, কেমন যেন চমকে ওঠা ভাব। অনেক জায়গায় ধ্বনি একরকম শুনালেও সত্যি সত্যি এক রকমের নয়। অনেক জায়গায় তাল এক, কিন্তু মাত্রা আর, অনুমাত্রার বিচিত্র সমাবেশের জন্য তার এক আশ্চর্য রকমের ধ্বনি চপলতা ফুটে ওঠে।" এবার উদাহরণ দেওয়া গেল নীচে—

(১) হজয্‌ ঃ সূত্র হলো—'মফা আয় লুন্‌ মফা আয়লুন্‌'। যেমন,

কটির কিঙ্কিন্‌
চুড়ীর শিঞ্জিন্‌
বাজায় রিণ্‌ ঝিণ্‌
রিনিক্‌ রিণ্‌ রিণ্‌।[১৩]

বাংলা কাব্য এই ছন্দকে নিজের করে নিয়েচে নৌকার নীচের অথই জলের গানে, যেমন

ছলাৎ ছল্ ছলাৎ ছল্,
অধীর্ আজ্ নদীর্ জল্।
শোনায়্ গান্ জুড়ায়্ প্রাণ্,
পরাণ্ মোর্ সুচঞ্চল।

তবে মনে রাখতে হবে যে ৩য়, ৫ম ও ৭ম বর্ণ হসন্ত এবং হসন্তের একটু গোলযোগ ঘটলে 'আরবী নাচ থেমে যাবে'।[১৪]

(২) মন্ সরহ্‌ঃ সূত্র—'মফ্ ঊলাতুন্ মসৃতফ্ আলুন্'। যেমন—

শূন্য ঘর্ মোর্
নাই্ কেউ দোসর-
ঝুর্‌ছে বায়্, হায়্-
অন্তর তৃষিত্।[১৩]

(খ) জাপানী—জাপানী ভাষায় দীর্ঘস্বর নেই, আছে শুধু ৫টি স্বরবর্ণ এবং সবগুলিই হ্রস্ব। সেখানে বদ্ধস্বরও নেই। যেমন অই্, অউ্, অও্, আই্, ইউ্। তাছাড়া সব ব্যঞ্জনই স্বর, কোন শব্দেই অ-স্বরান্ত ব্যঞ্জন নেই, তাই ঐ ভাষায় নেই স্বরান্ত বা হসন্ত বদ্ধাক্ষর—মুক্তাক্ষরই একমাত্র সম্বল ছন্দ রচনায়। প্রস্বর আছে বটে, তবে তা অর্থবোধক, ছন্দ-নির্ধারিক নয়। এখানে তাই কবিতা রচনা সংক্ষিপ্ত বাক্-এ। রবীন্দ্রনাথ বলেনঃ "তিন লাইনের কবিতা আর কোথাও নেই। এদের হৃদয় ঝরণার জলের মত শব্দ করে না, সরোবরের জলের মত স্তব্ধ। ছবি দেখার কবিতা, গান গাওয়ার কবিতা নয়।"[১৫]

১। হাইকু (Haiku)—রবীন্দ্রনাথ বাংলায় রূপান্তর করেচেন এ-ভাবেঃ

পুরোনো পুকুর
ব্যাঙের লাফ্,
জলের শব্দ।

এ হলো ৫+৭+৫ মাত্রার ত্রিপদী। দেখা যায় বাংলা মাত্রা গণনায় এ ধরা গেল না। ছন্দ বাঁচিয়ে লিখলে রূপ হবে—

পুরনো ডোবা,
লাফিয়েছে দাদুরী,
জলেতে ধ্বনি।

২। তান্‌কা (Tanka)—৫+৭+৫+৭+৭ মাত্রার পঞ্চপদী। এ হাইকুর প্রসারিত রূপ অর্থাৎ এরি সঙ্গে ৭+৭ এর দুটি পদ যোগে তান্‌কা পাওয়া যায়। 'তান্‌কা'র 'ন্' বাংলার চেয়েও পূর্ণতর—এ একটি স্বতন্ত্র অক্ষর। সত্যেন্দ্রনাথ 'অভ্র-আবীরে' (১৯১৬) 'তান্‌কা-সপ্তক' লিখেচেন, কিন্তু তা জাপানী রীতি লঙ্ঘন করেচে। 'অশ্রুর' ও অশ্রু-সায়র'-এ ব্যবহৃত হয়েচে বদ্ধাক্ষর (অশ্, রুর্, য়র্) যা অচল। এরি জাপানী উচ্চারণ অর্থাৎ স্বরান্ত উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রবোধ চন্দ্র সেনও বাঙালী উচ্চারণ বিকৃত করেচেন, যেমন, 'কাঁদার' ও 'দুখের'। এখানে 'দার্' ও 'খের্' বদ্ধাক্ষর। বাংলায় তান্‌কা রচনা এক দুঃসাধ্য ব্যাপার। তাই সত্যেন্দ্রনাথ যা করেচেন তাকে 'বাঙলা তান্‌কা' বলাই সংগত মনে করেন প্রবোধ চন্দ্র সেন।[১০] এই 'বাঙলা তান্‌কা'র উদাহরণ মেলে অনিল বিশ্বাসের 'তান্‌কা' চতুষ্কে।[১৬]

বর্ষা এলো ঐ,
ঝম্ ঝম্ ঝম্ মল বাজে পায়,
ভাদ্র বৌয়ের সাজ।
ঝর্‌ঝর ঝর্ ঝরছে গলায়
কবিতা দেবীর ছন্দ।

৩। চোকা (Choka)—৫ ও ৭ মাত্রার অনির্দিষ্ট সংখ্যক যুগ্মপদের পরে এতে অতিরিক্ত একটি ৭ মাত্রার পদ যোগ করা হয়। তাই তান্‌কা—(৫+৭)×২+৭ মাত্রা ; চোকা—(৫+৭)×x+৭ মাত্রা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তটি এই—

সাহসী বীর
দেখেছি কত অরি
করেছে জয়।
দে খি নি তোমা সম
এমন ধীর-
জয়ের ধ্বজা ধরি
স্তব্ধ হয়ে রয়।[১০]

৪। সেদোকা (Sedoka)— এ হলো (৫+৭+ ৭)×২ মাত্রার ষট্‌পদী। 'সেদোকা'য় বুঝায় শিরোভাগের আবর্তক কবিতা। রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টান্তটি এরূপ—

সাগর তীরে
শোণিত মেঘে হ'ল
নিশীথ অবসান।

পূবের পাখি
পূরব মহিমারে
শুনায় জয়গান।[১০]

৫। ইমায়ো (Imayo)—৭+৫+৭+৫ মাত্রার চৌপদী। রবীন্দ্রনাথ লিখেচেন ৮ পদে—

গেরুয়া বাস পরি
ধর্মগুরু
শিখাতে গিয়েছিল
তোমার দেশে।
আজি সে শিখিবারে
কর্মনীতি
তোমার দ্বারে ধায়
শিষ্য বেশে।

(গ) ফার্সী ছন্দ—আরবী-ফার্সী ছন্দে বর্ণ ও বর্ণাশ্রিত ধ্বনি হলো ছন্দের ভিত্তি। আরবী ছন্দকে ফারসী কবিতার উপযোগী করে রচিত হয়েচে ফারসী ছন্দোশাস্ত্র। অক্ষরের হ্রস্ব-দীর্ঘতায় প্রতিষ্ঠিত এ ছন্দ। এখানেও আছে মুক্তাক্ষর ও বদ্ধাক্ষর। ৫ বা ৭ বর্ণে গঠিত হয় একেকটি পর্ব। ফার্সী ছন্দের সুরের অনুসরণে সত্যেন্দ্রনাথ রচনা করেচেন বাংলা রূপান্তর। তাঁর 'কবর-ই নূরজাহান' এর উদাহরণ। মূল ফার্সী ছন্দটি পঞ্চ বর্ণাত্মক ধ্বনিতে রচিত। এ-ভাবে লিখ্‌লে এর রূপ হবে ঃ "আজকে তোমা (য়)। দেখতে (এ) লাম। জগৎ আলো। নূরজাহান"। দেখা যায় যে অনেক পর্বে ৫টির বেশি বর্ণ ও ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েচে। যেমন বন্ধনীর মধ্যে 'য়' ও 'এ' তে বুঝায়।

II. ছন্দোরূপ

এবার বিভিন্ন রূপের কথা বলা হলো নীচে—

১। গাথা (ballad meter)—Ballad, ballade, ballet শব্দ তিনটি এসেচে লাতিন থেকে, বিশেষত ইতালীয় ballare হতে, যার অর্থ 'নাচ'। কাজেই বহুকাল গীতল কাহিনী এই নাচের সঙ্গে যুক্ত ছিল।[১৭] এতে মূল সুরটিকে তুলে ধরা হয়। ভারত ভূখণ্ডে এরি রূপ ধরা পড়েচে চারণ কবিদের মৌখিক গানে। মধ্য ভারতের গণ্ড ও পর্ধানদের মধ্যে এ প্রচলিত। মধ্যপ্রদেশে এই নৃত্যগীতির তিনটি অংশ থাকে—রাগ, টেক, আদ। প্রথমটি গৌরচন্দ্রিকার কাজ করে—

নৃত্যকুশলীরা জানতে পারে কোন সুর বা স্পন্দ ব্যবহৃত হবে। এতে থাকে একটি মাত্র বাক্যাংশ, যার পুনর্বৃত্তি হয় না। দ্বিতীয়টি গীত হয় নাচের সময় —পুনর্বৃত্তিতে এগিয়ে এ কোরাসের ভূমিকা নেয়। তৃতীয়টি ব্যবহৃত হয় নাচের অন্তরালে। এখানে ধ্বন্যাত্মক শব্দ, অনুপ্রাস ও অন্তর্মিলের ব্যবহার বেশি।[১৮] এরি বাংলা রূপান্তর করেচেন অনিল বিশ্বাস। যেমন,

জীবন মরণ জড়ায় বাহু অচিন নদীর জলে।
মেলামেশার অনুপাতে বাঁকের ধারা চলে ॥
শিশু যুবা বৃদ্ধের ঢেউ ওঠে আবর্তনে,
....................অচিন নদীর জলে।

ধুয়া হলো 'অচিন নদীর জলে' বা 'বাঁকের ধারা চলে'।

২। বালাদ (ballade)—ফরাসী ধারা ১৪শ ও ১৫শ শতকে একটি বিশিষ্টরূপ পায় এই 'বালাদ'-এ। এ তিনটি ৮-পংক্তি কুলকে রচিত, যার মিলকল্প এরূপ, ক খ ক খ খ গ খ গ এবং একটি চতুর্পংক্তি অন্ত্য কুলক যার মিলকল্প, গ গ গ গ।[২] বিষ্ণু দে এর আমদানি করেচেন তাঁর "বালাদ ঃ লুই আরা গঁর জন্য"-কবিতায়।

৩। কৌতুক কণা (limerick)-এ ৫-পংক্তির হাস্যরসাত্মক পদ্য, যার মিলকল্প, ক ক খ খ ক-এ জনপ্রিয় হয়েচে Edward Lear এর ঘুমপাড়ানী মিলে। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় বলেচেন ঃ "Ballad, limerick-এর প্রচলন আমাদের কাব্যে নাই"।[৭] এ-কথা ঠিক নয়। কেন্না অনিল বিশ্বাস এর আমদানি করেচেন। যেমন, তাঁর 'পদধ্বনির' (১৩৫৮) 'কৌতুক কণা'য়—

গণিতের প্রশ্ন শক্ত দেখে ছেলেরা সবাই
অসহযোগে বাইরে জ্বালে রোশনাই।
কেউবা জানায় অনশন,
কেউবা চেঁচায় আন্দোলন।
সরস্বতী বলে যাই, এসো রাজা ভাই।

৪। তেপাটি (triolet)—এ হলো ৮-পংক্তির সমিল কবিতা—মিল এ রকম্, ক খ ক ক ক খ ক খ, যার মধ্যে প্রথম, চতুর্থ ও সপ্তমটি পৌনঃপুনিক। প্রমথ চৌধুরী লিখেচেন তেপাটিগুচ্ছ তাঁর 'পদচারণ' (১৯১৯) কাব্যগ্রন্থে। এরি আরেক ভিয়ান আছে অনিল বিশ্বাসের 'তেপাটি' গুচ্ছে, যা সংকলিত হয়েচে তাঁর 'পদধ্বনি' (১৩৫৮) কাব্যে। যেমন,

তোরা সব জয়ধ্বনি কর।
ঐ যে আস্‌চে কণ্ট্রোল কিউ-
তেল নুন লকড়ি কাপড় ;
সবে মিলে জয়ধ্বনি কর,
সারি দিয়ে পেতে হবে বর।
তা না হলে ঘরে এসে মিউ,
ছিন্ন বস্ত্রে জয়ধ্বনি কর,
ঐ যে আস্‌চে কণ্ট্রোল কিউ।

৫। বিউনী মিল (tera rima)—এ দান্তের 'দিব্যহসন্তিকার' ছন্দ। তিনটি তিনটি চরণে এ এগোয় কখকখগখ........এই রীতিতে। উদাহরণ আছে প্রমথ চৌধুরীর 'খেয়ালের জন্ম' (পদচারণ) কবিতায় ও অনিল বিশ্বাসের 'শিবিরে' (বাঁকা জল)।

৬। **লৈখী (writing) মহাকাব্য**

এ বাংলা কাব্যে অভিনব। 'লেখ' শব্দ এসেচে ফরাসী 'এক্রিচার' বা ইংরেজি 'রাইটিং' থেকে। এ রীতি তাই 'লৈখী' নামে পরিচিত। শৈলী ব্যক্তির অস্তিত্বে অস্তিমান, লৈখী নির্বাচন-সাপেক্ষ। একটি সামাজিক এলাকা বেছে নিয়ে লেখক স্থাপন করেন তাঁর কৃতি। ইতিহাস ও ঐতিহ্যে এ আস্থাবান। তাই Ronald Barthes বলেন ঃ "ভাষা ও শৈলী অন্ধশক্তি ; লৈখী ঐতিহাসিক সংহতির ফল। ভাষা ও শৈলী বস্তু ; লৈখী অপেক্ষক—এ কৃতি ও সমাজের দ্বন্দ্বসমাস।"[১৯] এরি উদাহরণ হলো অনিল বিশ্বাসের 'কালী-কলি-কলিকাতা' (১৩৮০)।

মহাকাব্য বিবর্তিত হয়েচে তিনটি রূপে—প্রাকৃতিক ; সাহিত্যিক ; শৈল্পিক। প্রথমের উদাহরণ হলো 'মহাভারত' ও 'ইলিয়াদ' ; দ্বিতীয়ের 'হারানো স্বর্গ' ও 'মেঘনাদবধ' ; আর তৃতীয়ের এলিয়টের 'পোড়োজমি' ও 'কালী-কলি-কলিকাতা'। ভিন্ন-ভিন্ন ছন্দোবদ্ধ কুলকই বৈচিত্র্য এনেচে শেষেরটিতে। এ বাংলা কাব্যে নতুন।

৭। **ভিলানেল (Villanelle)**

এ ফরাসী ছন্দোবদ্ধ ঃ ৫টি ৩-চরণ কুলকে রচিত, যার মিলকল্প ক খ ক এবং শেষে চতুষ্ক। সব দুটি মিলে প্রতিষ্ঠিত। প্রথম ও তৃতীয় চরণ একান্তর ভাবে গড়ে ত্রিকে (tercet)র চরণগুচ্ছ এবং চতুষ্কের অন্ত্য গুচ্ছটি শেষ করে।[১৭] এর উদাহরণ মেলে বিষ্ণু দে'র 'নামরেখেচি কোমল গান্ধার' (১৯৪৬-৫৩) এর 'ভিলানেল'-এ ঃ

দিনের পাপড়িতে রাতের রাঙাফুলে
সে কার হাওয়া আনে নীল ভাষা।
জোগায় কথা তাই সোনালী নদীকূলে।

এতে আছে ১৯টি চরণ—৩ চরণের ৫টি কুলক আর চতুষ্ক। কুলক-এর মিল এরূপ : ৫× (ক খ ক)+ক খ ক ক।

৮। সেস্টিনা (Sestina)

৬টি কুলকে গঠিত এ ছন্দোবদ্ধ এবং প্রত্যেকে আছে ৬টি চরণ আর ৩ চরণের অন্ত্য কুলক। প্রথম কুলক—ক খ গ ঘ ঙ চ; দ্বিতীয়—চ ক ঙ খ ঘ গ; তৃতীয়—গ চ ঘ ক খ ঙ; চতুর্থ—ঙ গ খ চ ক ঘ; পঞ্চম—ঘ ঙ ক গ চ খ; ষষ্ঠ—খ ঘ চ ঙ গ ক। এছাড়া অন্ত্য কুলক হবে খ ঘ চ অথবা ক গ ঙ।[১৭] বিষ্ণু দে'র 'বারমাস্যা'-এ ছন্দে রচিত।

১০.৫ ছন্দোবন্ধ ও ছন্দোমুক্তি

কবিতার আশু উপলব্ধির জন্যে ছন্দোবিজ্ঞানের অনুশীলন আবশ্যিক নয়। মনে রাখতে হবে যে কবিতার দৃষ্টি ও তার পদ্যরূপের মধ্যে আছে এক নাড়ীর যোগ, এক প্রাণিক সম্পর্ক। শেষেরটি সর্বদাই প্রথমটির সক্রিয় সেবায় নিযুক্ত। এখানে পদ্যের অর্থ মিত ভাষা (metered language) অর্থাৎ এমন ভাষা যেখানে অক্ষরের কোন গুণাবলী, যেমন, প্রচাপ বা মাত্রা কঠোর বা আপেক্ষিক ভাবে বিধিবদ্ধ বা নিয়মিত করা হয়। এই নিশ্চিত আদর্শ বা ছাঁচকে স্পন্দমিতি বা ছন্দ বলে, আর উদ্ভুত কাব্যরূপ হলো পদ্য। কিছুকিছু মহত্তম কাব্য ছন্দোহীন হ'লেও, স্পন্দহীন নয়। যেমন বাইবেলের 'ভজন' (psalms)-এর জেমস্-ভাষ্য, অথবা হিব্রু মূল। সব মুক্তকই ছন্দ বিবর্জিত। কাজেই ছন্দের দিক থেকে কাব্য দু'ভাগে বিভক্ত—ছন্দোবদ্ধ পদ্য ও ছন্দোমুক্ত পদ্য বা মুক্তক। ছন্দ পদ্যের স্রষ্টা, কিন্তু কাব্যের নয়। কেননা এখানে পাটীগণিত ছাড়াও কবিতা বা কাব্য আরো বেশি কিছু দাবি করে।[২০] এবার ছন্দোবন্ধ ও ছন্দোহীনতার আলোচনা করা গেল নীচে।

I. ছন্দের প্রয়োজনীয়তা

ছন্দের নিম্নলিখিত ব্যবহার তুলে ধরা গেল :[২০]

(ক) অনুভূতির প্রকাশ—কাব্য সর্বদাই কোন-না-কোন অনুভূতি প্রকাশ করে। কাব্যের প্রাণ হলো প্রত্যক্ষ ও কল্পনা সমেত আবেগ ও মেজাজ। গীতল কাব্যের লক্ষণই এই আবেগ আতিশয্য। অবশ্য অন্যান্য কাব্যও, যেমন বর্ণনাত্মক, নাটকীয় ও মননশীল কাব্যে প্রবল কল্পনা ও অনুভূতি থাকতে পারে। এখানে ছন্দ বা স্পন্দমিতি 'নান্দনিক দূরত্ব' বা মানসিক দূরত্বে'র বাহক। এরি

ফলে আমরা বাস্তব জীবনের দুঃখ দুর্দ্দশা থেকে মুক্ত হয়ে যাই, যেমন 'রাজা লীয়ার' নাটকে রহস্য ও কূটভাস থাকে—ছন্দ একাধারে আবেগের শাস্তা ও প্রকাশক।

(খ) নিয়মনিষ্ঠা—পদ্য হলো ভাষার অত্যন্ত নিয়মনিষ্ঠ ব্যবহার—এর সংগঠন পূর্ণ ও অসাধারণ ; এবং শব্দ ও অক্ষরগুলি স্থাপিত হয় ধ্বনি, চাপ ও ভাব ব্যঞ্জক মান অনুসারে। মানুষের নিয়ম-মাফিক আচরণ প্রকাশ পায় পদ্যের বিধিবদ্ধ গড়নে।

(গ) মনোযোগ আকর্ষণ—ছন্দে আমরা অবিলম্বে আকৃষ্ট হই।

(ঘ) ইন্দ্রিয়জ সজীবতা—T. E. Hulme এর মতে কবিত্ব সময়-সময় দৈহ্য সংবেদন হাতে হাতে দিতে চায় এবং আমাদের বাধা দেয় বিমূর্ত্ত-প্রক্রিয়া-মধ্যগ চলনে। এ কাজের সহায়ক হলো ইন্দ্রিয়-পূরক মূর্ত্ত ভনিতি, স্পন্দ ও ধ্বনি এবং সজীব রূপক। ছন্দ নিজেই আরেকটি সহায়ক।

(ঙ) ঐক্য ও বৈচিত্র্য

বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য প্রত্যক্ষণে আমরা আনন্দ পাই। এতে ভারসাম্য বা টান লক্ষ্য করা যায় নির্দ্দিষ্ট ও পরিবর্তনশীল বিষয়ের মধ্যে। বাক্‌-এর ধ্রুপদ (fugue) এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—একই মটিফ বা প্রধান ভাব ঘুরে-ঘুরে আসে, কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন স্বরে, বিভিন্ন মানের সুরে বা বিপরীত ক্রমে। দুটি অনুরূপ কিন্তু স্বতন্ত্র নীতি এখানে ক্রিয়াশীল—ঐক্য ও বৈচিত্র্য। একটিতে বুঝায় সামঞ্জস্য প্রীতি, অন্যটিতে বৈসাদৃশ্য প্রীতি। এরি সুষ্ঠু উদাহরণ আছে শেকস্‌-পীয়রের 'ঝড়' নাটকে (IV.১) প্রস্পারোর উক্তিতে। ছান্দসিক একক—আয়াম্বিক পর্ব, পঞ্চ মাত্রিক—অন্য উপাদানের সঙ্গে মিশে সংগীতের মতো স্পন্দ সৃষ্টি করেচে। সুন্দর একটি দ্বন্দ্ব চল্‌চে। প্রথম দু'টি পর্ব এরূপ ঃ òur rév | els nów ; কিন্তু আমরা পাড় এভাবে ঃ our revels। now. ফলে ছন্দের যান্ত্রিক হাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

অনুরূপভাবে অনিল বিশ্বাসের 'সূর্যাস্ত' কবিতাটি—

সূর্য অস্ত যায়।
সবুজ দিগন্ত সাজে আল্‌তা-সিন্দুরে
লালের বন্যায়। উজ্জ্বল-ঝলমল
আলোর উল্লাস-রক্তের লাল
লালে লাল, তারি লাল অগ্নি-গুলাল।

এখানে প্রথম চরণে আছে স্বরবৃত্তের উচ্চারণ—শব্দমধ্য হসন্ত, যথা সূর্‌+য, ও অস্‌+ত। কেবল জিভ বা ওষ্ঠ সংলগ্ন হয় মাত্র, কিন্তু নেই তার পৃথক স্বীকৃতি। তেমনি 'দিগন্ত' ও 'সিন্দুরে' দ্বিতীয় চরণে ; কিন্তু 'আলতা'-র 'ল্‌' স্বতন্ত্র উচ্চারণ পাচ্ছে স্বনবৃত্তের মতো। আবার তৃতীয় চরণে 'বন্যায়' আছে শব্দমধ্য

হসন্ত লোপ স্বরবৃত্তের, কিন্তু 'উজ্জ্বল'-এর 'জ' স্বনবৃত্তের উচ্চারণ পাচ্ছে, যেমন 'ঝলমলে'র 'ল'। চতুর্থ চরণে 'উল্লাস' এ হসন্ত লোপ উচ্চারণ, কিন্তু 'রক্তের' উচ্চারণ স্বনবৃত্তীয়। পঞ্চম চরণে 'অগ্নি'রও স্বনবৃত্তীয় উচ্চারণ।

(চ) জোর বোঝাতে পরিবৃত্তি

ছন্দে চালু করে একটি প্রথা, এক স্বাভাবিক আদর্শ বা ছাঁচ, যাতে পরিবৃত্তি তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। এই নীতি নির্ভর করে বিস্ময় ও বৈসাদৃশ্যের মনস্তত্ত্বের উপর—অবিলম্বে আমরা নিয়মের রাজত্বে অনিয়ম লক্ষ্য করি এবং এই অনিয়ম আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ওয়ার্ডস্‌য়োয়ার্থ এর 'ওয়েস্ট মিনিষ্টার সাঁকোর উপর' যে কবিতাটি, তাতে আছে এই পরিবৃত্তি ঃ

Earth has not anything to show more fair :
Dull would he be of soul who could pass by
A sight so touching in its majesty.

এখানে প্রথম ও দ্বিতীয় চরণের প্রথম পর্বটি হলো ট্রকির প্রতিস্থাপন—ট্রকি জোর দিয়েচে Earth ও Dull এর উপর। তেমন রামপ্রসাদের—

আমি-কি-। আটাসে ছেলে—।
(ভয়ে) ভুলবো নাকো—। চোখ রাঙালে—॥

'আটাসে'র উপর জোর দেওয়ার জন্যে, প্রথম মেলের তিনমাত্রার সম্প্রারণ দ্বিতীয় মেলে এক মাত্রায় পরিণত হয়েচে। পরে আবার অতি-মেলক 'ভয়ে' আমদানি করে বলবৃত্তের স্পন্দন ঠিক রাখা হয়েচে।

(ছ) প্রত্যাশা পূরণ

ছন্দ ধ্বনিগত ভাবে মিল ও চরণ ব্যূহের আদর্শ নির্ধারক যেমন, তেমনি অর্থগতভাবে মূল ও রূপকল্পের স্রষ্টা এবং এ তাই সর্বদাই প্রত্যাশা বাড়ায় ও পূরণ করে। মন একটি ছাঁচ আশা করে—ছন্দ দ্রষ্টব্য বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

(জ) উদ্ভাবনী বৃত্তি

কবি তাঁর কাব্যে খুঁজচেন ঠিক-ঠিক শব্দটি, যা একাধারে, ধ্বনি ও অর্থের উপযোগী হবে। তিনি বর্জন করেন এমন শব্দ যা অর্থের পরিপূরক, কিন্তু স্পন্দের পরিপন্থী। ছন্দের জন্যে তাই কবিকে সবসময় থাকতে হয় অনুসন্ধানে লিপ্ত ঃ তাঁর কথা হলো, 'নিজে যা পারিনা দিতে, নিত্য আমি তারি খোঁজে।' শব্দ ও বাক্যাংশের আবিষ্কারে নিয়োজিত করে ছন্দ কবিকে।

(ঝ) যুক্তির শৃংখলা

রসোত্তীর্ণ কবিতায় কবি তুলে ধরেন একটি অভিজ্ঞতাবোধ—তিনি আমদানি

করেন একটি যুক্তি বা শৃঙ্খল যাতে তাঁর নিজের মেজাজ ও অনুভূতি বিষয় বা অভিজ্ঞতার সঙ্গে সাযুজ্য লাভ করে। কাজেই সৎকবিতা একীভূত ও সুসমঞ্জস্য, আর ছন্দের নিয়মানুবর্তিতা এ পরিকল্পনার সঙ্গে খাপ খায়।

(এ) স্মৃতিসহায়ক মূল্য—পদ্য গদ্য বা মুক্তকের চেয়েও মনে গেঁথে যায়। তাই শিশুদের বর্ণ শেখানোর জন্যে ব্যবহৃত হয় ছন্দোবদ্ধ ছড়া। যেমন,

কাক ডাকে কা কা,
আগে অ পরে আ।
—যোগীন্দ্রনাথ সরকার: 'হাসি খুশি', ১ম ভাগ।

II. ছন্দোমুক্তি

'ছন্দোবদ্ধ' ও 'ছন্দোমুক্ত' কথা দু'টি কাব্য সম্পর্কেই প্রযোজ্য। কাব্য ছন্দোবদ্ধ হলে এ পদ্যে রূপ নেয়, কিন্তু ছন্দোমুক্ত হলে এ হ'য়ে দাঁড়ায় স্পন্দমান অর্থাৎ কিনা অমিত। কাব্য তাই মিত ও অমিত—স্পন্দ নিয়মিত হয়ে হয় ছন্দ। আর অনিয়মিত থাকলে স্পন্দই থাকে। এই স্পন্দই গদ্য বা মুক্তকের ভিত্তি। তাই অমিত্রাক্ষর এর শিথিল রূপই 'ওয়েবষ্টারীয় পদ্য' নামে পরিচিত, আর এ নামটি এসেচে Webster-এর দুটি নাটক থেকে যথা, The White Devil ও The Duchess of Malfi। এ প্রায় গদ্য বা মুক্তকের সামিল। T. S. Eliot-এর কিছু কবিতা এই 'ওয়েবষ্টারীয়' পদ্যে'র সগোত্রীয়, যেমন Gerontion-এর প্রারম্ভিক পংক্তিগুলি, অথবা Arnold এর Philomela কবিতাটি।

মুক্তকের (free verse) ছন্দোবদ্ধ ও ছন্দোমুক্ত হওয়ার স্বাধীনতা আছে। তাই এর সংজ্ঞা নির্ণয় দুষ্কর। সামান্যীকরণ ও উদাহরণেই এ নির্দিষ্ট হতে পারে, কিন্তু বিধিবদ্ধ ভাবে নয়। এ কাব্য বটে, তবে যতটা নিয়মিত হলে একে পদ্য বলে ততটা নয়, কিন্তু এ যে-কোন সময়ে পদ্যের আঙ্গিক ব্যবহার কর্তে পারে, এমন কি মিল এবং ছন্দও। Whitman তার মুক্তক কবিতায়—'When lilacs last in the Dooryard Bloom'd'—ব্যবহার করেচেন ধ্বনি সাম্য, অনুপ্রাস, মিল ও ছন্দ। সৎ মুক্তক সর্বদাই বেশি সংহত আর গদ্যের তুলনায় কম প্রত্যক্ষ এবং কবিতার—গদ্যের নয়—একটি আঙ্গিক ব্যবহার করে অর্থাৎ চরণ। আদর্শ মুক্তক কবিতায় কোন বিধিবদ্ধ ছান্দসিক আঙ্গিক নেই এবং সর্বত্র মিলহীন। গদ্যে এর ছন্দোলিপি করা দুষ্কর, কোন দু'জনের ছন্দোলিপি এক হবে না। তবু আছে এর রূপ-শব্দ ও অক্ষরের বিন্যাস, চরণ দৈর্ঘ্য ও যতি বণ্টন প্রতিক্ষেত্রে অর্থের সঙ্গে মিলে যায়। এখানে স্মর্তব্য যে Whitman এর Leaves of Grass (১৮৫৫) আন্তর্জাতিক মর্যাদা পাবার পরে সক্রিয় ও প্রভাবশালী মুক্তক গোষ্ঠী তৈরি হতে লাগল—দেখা দিল ফ্রান্সে, জার্মানীতে এবং

পরে ইংলণ্ডেও। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় হলেন H. D, T. S. Eliot, D. H. Lawrence, Ezra pound, W.C. Williams প্রভৃতি। এলিয়ট আয়াম্বাসের পরিবর্তে এক নতুন স্পন্দনীতির সুপারিশ করলেন—এ আসবে পরিবর্তিত ভণিতি, বাক্-অভ্যাস ও ডিজেল ইঞ্জিনের স্পন্দে অভ্যস্ত কানের সহায়তায়। H. Monroe-র মতে মুক্তক চরণ ও দণ্ডের অভ্যন্তরে অধিকতার বিচলন স্বাধীনতার দাবি করে; R. Aldington মনে করেন যে এ অন্যের অনুসরণ না করে কবিকে স্বকীয় স্পন্দ সৃষ্টিতে উদ্বুদ্ধ করে। অবশ্য Bridges আক্ষরিক পদ্যের বাইরে যেতে পারেন নি; আর Eliot শিগ্গিরই বলতে বাধ্য হলেন যে কোন সৎ পদ্যই প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন নয়। মুক্তকে তাই কবিকে দেয় তিন রকমের স্বাধীনতা। প্রথমত, ছন্দের সঙ্গে ছন্দের খাপ খাওয়ানো যায় না এমন বহু অক্ষরমালার প্রয়োগ। দ্বিতীয়ত, ভাব ও রূপ কল্পের উপর থাকে এমন নিবিড় সংহতি যা থেকে মিল ও ছন্দ সংগীত মনোযোগকে বিচ্যুত কর্তে পারে না। তৃতীয়ত, চরণে থাকে অধিকতর নমনীয়তা—অতি সূক্ষ্মভাবে লয় মণ্ডলিত হ'তে পারে ও বল-প্রাবল্য সম্ভব; এবং সূক্ষ্মতম ও অতিমাত্রায় পরিবর্তনশীল স্পন্দ সম্ভবপর। এবার উদাহরণ মালা—

(i) বহু-আক্ষরিক শব্দ প্রয়োগ, যেমন,

রডোডেনড্রনে বাঁশী বাজে প্রেমের রঙিন অনুরাগে,
হিলিওট্রোপ শাড়ি চলে ইউ ক্যালিপ্টাস ছায়াতলে
—অনিল বিশ্বাস ঃ উদ্বেগ উপকূলে, 'পদধ্বনি'

(ii) ছন্দ বা মিল রূপকল্প থেকে দৃষ্টি ফেরাতে দেয়না, যথা,

সবজি মণ্ডীর হিজিবিজি ভিড়ের লোক, ডুবডুব
বাজায়, কেউ হাঁকে মূলো, শর্ষে ঝাঁকায়।
—অমিয় চক্রবর্ত্তী ঃ একমুঠো, 'সঙ্গৎ'

(iii) পরিবর্তনীয় স্পন্দ, যথা,

তবু ও এ দুঃসাহস। বসন্তের সবিতত সংগীত
* * * *
তুমি যেন এক পয়দায়-ঢাকা-বাড়ি
আমি অঘ্রাণ-শিশিরে-সিক্ত-হাওয়া
—বিষ্ণু দে ঃ চোরাবালি, 'ওফেলিয়া'

স্বরবৃত্তের পরে এসেচে স্বনবৃত্তের চরণ।

তবে মুক্তকের পরিসীমা (limitation)ও রয়েচে। প্রথমত, ছন্দের নিয়ম

ছাড়া বোঝা যায় না সঠিকভাবে কেমনে একটি নির্দ্দিষ্ট শব্দ বা অক্ষর প্রচাপিত বা মাত্রায়িত হবে। দ্বিতীয়ত, এতে নেই গীতল ও স্মারক গুণাবলী যা দেখা যায় সমিল পদ্যে। মুক্তক কবিতা শেক্‌সপীয়রের ১২৯-তম সনেটে যে বিমূর্ত ভণিতি আছে তার ব্যবহারে অক্ষম। শেক্‌সপীয়রের ব্যবহার এরূপ—

লজ্জার মরুতে দেখো বিদেহী আত্মার অপচয়,
কাম সেথা ক্রিয়াশীল ; অথচ ক্রিয়ার আগে ভাগে
কামতো মিথ্যুক, দোষী, মারাত্মক রক্ত করে ক্ষয়,
বর্ব্বর, চরম, রূঢ়, দয়াহীন, অবিশ্বস্ত জাগে।

তৃতীয়ত, সন্তত পরিবর্ত্তি যেহেতু মুক্তকের ধর্ম, তাই ছন্দোবিপর্যয় শব্দে যে জোর দেওয়া যায় তা এখানে আনা যায় না। চতুর্থত, সমিল গদ্যে যেমন সহজেই স্থান পায় অনুরণন ও অলংকৃতি, তেমনি মুক্তকেও আসে গদ্যিকতা। পঞ্চমত, বৈধ তাগিদমুক্ত হওয়ার ফলে এ কবিকে তাঁর নিজের পায়ে দাঁড়াবার ব্যবস্থা করে। কোন সুন্দর রূপকল্প বা ভাব স্মরণে আনার জন্য নেই কোন মিল, কোন ছন্দ নেই যা তাঁকে স্পন্দের নির্দ্দেশ দিতে পারে ও যাতে তিনি গন্তব্য স্থান স্পষ্টভাবে দেখতে পারেন।[২০]

III. কথা শেষ

বাংলা এখনো ছন্দ-ঐশ্বর্যে ইংরেজি বা ফরাসীর মতো ঋদ্ধিশালী হ'য়ে উঠতে পারে নি। রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথের পরে বর্ত্তমান শতকের তিরিশের কবিরা কিছু কিছু ছন্দ বৈচিত্র্য আমদানি করেচেন বিদেশ থেকে। এ আগেই দেখান হয়েচে। এর পর এলো ছন্দো-বিমুখতা ১৯৩১-এ, যা প্রকাশ পেয়েচে দিলীপ কুমার রায়কে লেখা বুদ্ধদেব বসুর এক চিঠিতে (১৯৩১, ডিসেম্বর ২৯): "রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে ছন্দগুলোকে আয়ত্ত করে সস্তা প্রাচুর্য ও চাতুর্যে তাঁরা (রবীন্দ্রোত্তর কবিরা) রঙীন খেলনার দোকান খুলেছিলেন। বাঙলা কাব্যের এ যুগটা বন্ধ্যা, একেবারে নিষ্ফল। আমাদের দেশে ছন্দ কুশলতাকে যে অতি প্রাধান্য দেওয়া হয়, সেই মূঢ়তাকে খণ্ডন করার সময় এসেছে।" এ প্রসঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ বলেচেন: "কবি জনোচিত পূর্ণতার জন্যে রূপের সৌন্দর্য বা উৎকর্ষকে হেয় করা বা তার একছত্র গুরুত্বকে উপেক্ষা করার কোন যুক্তি নেই। কাব্য একটি শিল্প এবং কবিকে হতে হবে শব্দ ও স্পন্দের শিল্পী, যদিও অন্যান্য শিল্পীদের ন্যায় তাকে অনিবার্যভাবেই হতে হবে তার চেয়েও আরো কিছু, এমন কি আরও বেশি। এ ছাড়াও প্রসিদ্ধ কবি হওয়া যায়, কিন্তু এই সব গুণাবলী চিহ্নিত করে মহত্তর অমর কবিদের।[২১] এ কথা হয় তো পরে মর্মে মর্মে

উপলব্ধি করেছিলেন 'বন্দীর বন্দনা'র কবি তাই তিনি বললেন: 'রবীন্দ্রঠাকুর কবি রূপে রহিবেন শতবর্ষ পরে। আমরা হারায়ে গেছি অসীমের জনারণ্যে'।

শুরু হলো 'ছন্দোমুক্তি' আন্দোলন। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের ঐ কথাতেই লুকিয়ে ছিল ছন্দোরিক্ততা। এতে আর যাই হোক কবিতা থাকে না, যদিও কাব্য বা কবিত্ব থাকতে পারে। স্পন্দের নিয়ন্ত্রণে আসে ছন্দ, আর এই নিয়ন্ত্রণ যদি চলে যায় তবে অনিবার্যভাবেই এসে যায় অনিয়ন্ত্রিত স্পন্দ অর্থাৎ স্পন্দমিতি বা ছন্দ দূরে যায়। তাই 'মুক্তছন্দ' ও 'ছন্দোমুক্তি' বিপরীত বিহারী—একদিকে আছে এর বদ্ধতা বা ছন্দ, অন্য দিকে মুক্তি। পদ্য মুক্ত বা ছন্দোবদ্ধ হতে পারে, কিন্তু ছন্দ কখনই মুক্ত নয়। প্রথম পর্বের ছন্দো-বিমুখতার জায়গায় এলো ছন্দোবোধহীনতা এবং এ শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই। ১৯৪০ থেকেই এ সরব হলো এবং এই 'ছন্দ-কানা' কবিরা ঘোষণা করলেন:

এখন মোরা বাঁধন ছেঁড়া ছুটছি, থামাও দেখি!
অর্থ যদি বুঝবে তবে কবিতা আর সে কি?[২২]

এরপরে এলো তৃতীয় পর্ব ১৯৬১ এর কাছাকাছি। হয়তো কবিরা আত্মস্থ হবার চেষ্টা কচ্চেন। এ পর্ব তাই চিহ্নিত হতে পারে 'ছন্দ সচেতনতা' নামে।[২৩] প্রশ্ন জাগে ছন্দের প্রত্যাবর্তন সম্পর্কে: হয়তো এ আর ফিরবে না, এবং যদি বা ফেরে থাকবে না তাতে জহুরীপনা। বাংলা কবিদের ভুল হয়েচে এখানে যে ছন্দে বিশিষ্টজ্ঞান হওয়ার আগেই তাঁরা ছন্দোরিক্ততার দিকে ঝুঁকেচেন। এখানে একটি কথা মনে রাখতে হবে: 'গান যেমন সুরে-তালে গাওয়ার শর্তে গান, কাব্যও তেমনি ছন্দের মাত্রার দোলাযুক্ত হলেই তবে তা কাব্য, মিল থাক বা না থাক। বিশিষ্ট রীতি মান্য করে গাওয়ার শর্তেই গান হয়, কাব্যের বেলায় তার ব্যতিক্রম (নয়)'।[২৪] এ-জন্যে পল ভ্যালেরি বলেচেন: কাব্য বীজগণিতের সগোত্র।[২৫] অর্থাৎ এখানে স্পন্দমিতির জ্ঞান আবশ্যিক।

I. টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

টীকা ও গ্রন্থনির্দেশ

* প্রথম অধ্যায় : ভাষা ও ছন্দ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—বিচিত্রা (১৩৬৮), পৃঃ ৫৩৫-৩৬ ঃ 'ভাষা ও ছন্দ'।

২। রবীন্দ্র রচনাবলী (২৬শ খণ্ড), পৃঃ ৩৭৫।

৩। Saussure (F. de)—Course in General Linguistics, p.14.

৪। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙলা ভাষা প্রসঙ্গে (১৯৭৫), পৃঃ ৫-৭, ৫৭।

৫। L. Bloomfield—Language (1963), pp. 22-32.

৬। J. D. O' Connor—Phonetics (Penguin, 1974), pp. 9-13.

৭। M. M. Ghosh—Pāninya Sikshā (C. U. 1938), pp. 1, 54.

৮। O'Connor—৬-সংখ্যা দ্রষ্টব্য—পৃঃ ১৬-৭।

৯। J. R. Firth—'Personality and Language in Society': *Sociological* Review, 42 (1950), p. 42.

১০। R. H. Robins—Proceedings of Durham Philosophical Society, Vol. I, Series B (Arts) No. 1 (1959), pp. 3-4.

১১। J. R. Firth—Sounds and Prosodies, T. P. S. (1948), pp. 137 ; 11-12.

১২। মুহম্মদ আব্দুল হাই—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৭৫), পৃঃ ২৫১-৬৯, প্রথম সংস্করণের ভূমিকা—পৃঃ ১১-২।

১৩। A. C. Gimson—An Introduction to the Pronunciation of English (1976) pp. 18, 56.

১৪। A. Efron—Sound (1968), pp. 28-30, 34-35.

১৫। H. A. Gleason—An Introduction to Descriptive Linguistics (1968), pp. 2-13.

১৬। A. Martinet—Elements of General Linguistics (1964), pp. 22-33.

১৭। G. N. Sastri—The philosophy of word and meaning (1959), pp. 102-103.

১৮। The Shorter Oxford English Dictionary (1959), p.1162.

১৯। Sphotavada of Nagesa Bhatta—ed. by V. V. Krishnamarya (1946), p-5.

২০। H. G. Coward—The sphota theory of language (1945), pp. 71, 77, 83.
আশুতোষদেব—নূতন বাঙ্গালা অভিধান (১৯৭৬), পৃঃ ১০৭২ ; Vakyapadiya of Bhartihari, ed. K. A. Subramanya Iyer, p. 182.

২১। D. Jones—The phoneme (1967), para-31.

২২। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—বাংলা ভাষার আধুনিকতত্ত্ব ও ইতিকথা (১৯৭৫), পৃঃ ৯৭।

২৩। gleason—১৫ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 40-50.

২৪। S. K. Chatterji—A Bengali Phonetic Reader (1928), p-9 ; মুনীর চৌধুরী—বাঙলা গদ্যরীতি (১৯৭৬), পৃঃ ১৩৬, ১৬৮-৯ ; আব্দুল হাই—ধ্বনি বিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৭৫), পৃঃ ৩১৩-১৪, ২৯৫, ৩০৯।

২৫। দ্বিজেন্দ্রনাথ-২২ সংখ্যা দ্রঃ—১২৮-১৩৩।

২৬। আব্দুল হাই-১২ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৩০৯-৩১০।

*** দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সঞ্চালক ধ্বনিবিদ্যা**

১। Pushkin—'Mozart and Salieri' (Penguin p, 1964) : J. Fennell পুশ্‌কিনের মনস্তাত্ত্বিক নাটক—রুশ ভাষার নাম, Motsart i Sal'eri (1831)—ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। নাটকটি রচিত হয় প্রচলিত উপাখ্যানের ভিত্তিতে ঃ Mozart কে Salieri বিষ দিয়ে হত্যা করেচে। তারই উক্তি উদ্ধৃত হয়েচে।

২। G. Anfilov—Physics and Music (1966), pp. 70, 105, 234, 243-44, 247.

৩। R. M. S. Heffner—General Phonitics (1952), pp. 10-12.

৪। R. H. Stetson and C. V. Hudgins—'Functions of the breathing movements in the mechanism of speech' : Archives Nearl, Phon Exp. V (1930), pp. 1-30.

৫। Heffner—৩-সংখ্যা দ্রঃ—pp. 12-14.

৬। J. C. Catford—Fundamental Problems in Phonetics (1977), pp. 1-7.

৭। L. F. Brosnahan and B. Malberg—Introduction to Phonetics (1970), p. 47.
৮। David Abercrombie—Studies in Phonetics and Linguistics (1971), pp. 16-18.
৯। মুহম্মদ আব্দুল হাই—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (৩য় প্রকাশ, ১৩৮২), পৃঃ ১৬৫-৬৭।
১০। H. A. Gleason—An Introduction to Descriptive Linguistics (1961), pp. 255-56.
১১। R. H. Stetson—Motor Phonetics (2nd edn, 1951), p. 200.
১২। A. C. Sen—Bengali Motor Phonetics (1949), pp. 7-8, 17-20.
১৩। L. H. Gray—Foundations of Language (1958), pp. 4-5, 15-18.
১৪। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়—সরল ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৭২), পৃঃ ১, ৮, ১০।
১৫। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়—ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা (১৩৫৬), পৃঃ ১৪০-১৪৩। এছাড়া আছে তাঁর 'ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ' (২য় সংস্করণ, ১৯৪২), পৃঃ ৩০-৩১।
১৬। A. C. Moorhouse—The Triumph of Alphabet (1953), pp. 76, 94, 98, 152.
১৭। আব্দুল হাই—৯ সংখ্যা-দ্রঃ—পৃঃ ১৭৫-৭৬, ৩২৭-২৮।
১৮। M. B. Emeneau—'The Nasal Phonemes of Sanskrit: Language, xxii. 86ff.
১৯। D. Abercrombie—Studies in Phonetics and Linguistics (1971), pp. 80-81, 84.
২০। Abercrombie—'What is a "letter"?': *Lingua*, II. 1.54ff.
২১। W. S. Allen—Phonetics in Ancient India (1953), pp. 13-16.
২২। J. R. Firth—The Word 'phoneme' in *Le Maitre Phonetigue*, April 1934, p. 44.
২৩। L. Bloomfield—Language (1963), pp. 79, 136.
২৪। D. Jones—The phoneme: its nature and use (1967),

pp. Preface vi, 12, 212-13, 216, 253 (Secs. 31, 649-50, 652, 657, App. I, para 2)
২৫। D. Jones and H. S. Perera—Colloquial Sinhalese Reader (1919) : Introduction—'Sounds and phonemes'—২৪-সংখ্যক বই—পৃঃ ২৬১-৬২।
২৬। Heffner – 3-সংখ্যা দ্রঃ—pp. 72-74.
২৭। The Shorter Oxford English Dictionary (1959), p.2107.
২৮। Webster's Seventh New Collegiate Dictionary (1969), p. 996.
২৯। Heffner—৩ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 76-88.
৩০। D. P. Raychowdhuri—Advanced Acoustics : the human vocal organ—speech sounds.
৩১। R. K. Bansal—An outline of general phonetics (1971), pp. 12-15, 17-18, 29.
৩২। Gleason—১০ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 364-65.
৩৩। A. C. Sen—১২ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 50-51.
৩৪। প্রবোধ চন্দ্র সেন—ছন্দ পরিক্রমা (১৯৭৭), পৃঃ ১০৮।
৩৫। E. Kruisingha—A Handbook of present-day English : Part I—English Sounds (4th edn. 1925), pp. 8-9, 11-2, 41, 64-5, 67, 69, 73, 84-5, 88-9.
৩৬। প্রবোধ চন্দ্র সেন—৩৪ সংখ্যা দ্রঃ-পৃঃ ৭
৩৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছন্দ (৩য় সংস্করণ, ১৯৭৬), পৃঃ ২৭।
৩৮। Benton in Paget's "Human speech", p. 28—উদ্ধৃত হয়েছে R. M. S. Heffner কৃত General Phonetics (1952), ২৩৭ পৃষ্ঠায়।
৩৯। S. K. Chatterji—A Bengali Phonetic Reader (1928), Para. 52 at p. 21.
৪০। A. C. Sen—১২ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 33-36.
৪১। আব্দুল হাই—৯ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৭২-৭৩।
৪২। S. Varma—Critical studies in the phonetic observations of Indian grammarians (1929), p. 55, fn. 4.
৪৩। Meillet—Langues Indo-Europeanes (3rd edn.) p. 106.
৪৪। Heffner—৩ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 87-88, 164-69.

৪৫। Gleason—১০ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 51-53.

৪৬। Heffner—৩ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 173-205.

৪৭। A. C. Sen—১২ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 29-32.

৪৮। আব্দুল হাই—৯ সংখ্যা দ্রঃ-পৃঃ ১৮৩-২৬৯।

৪৯। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—বাংলা ভাষার আধুনিকতত্ত্ব ও ইতিকথা (১৯৭৫), পৃঃ ১৩৪-১৮৪।

৫০। The Shorter Oxford English Dictionary—২৭ সংখ্যা দ্রঃ—Vol. I, p. 10 ; K. C. Chatterji-র Technical terms and technique of Sanskrit grammar (1964), Preface to the first edition, ixও দ্রষ্টব্য।

৫১। Heffner—৩ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 213, 224-26, 228-29.

৫২। D. Jones—An Outline of English Phonetics (1957), pp. 19, 23-4, 29-30, 53, 58, 245-46, 275, 297.

৫৩। D. Jones—The phoneme—its nature and use (1967), pp. 12, 60, 108, 114, 134-149.

৫৪। H. Rehn, A. B. Otis, L. E. Chadwick, W. O. Fenn—"The pressure-volume diagram of the thorax and lung" : Amer. J. Physics, 146, no. 6 (1946).

৫৫। Catford—৬ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 24-44.

৫৬। Catford—৬ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 15-19, 196-200.

৫৭। D. Jones—৫৩ সংখ্যা দ্রঃ pp. 12, 126, 152, 212.

৫৮। Sri Aurobindo—Birth Centenary Library, vol. 5 : "On quantitative metre", pp. 347-357.

৫৯। H. D. Velankar—"Apabhransa metres" : *Bharata Kaumudi*, vol II, p. 1066.

৬০। H. D. Velankar—"Sanskrit metres : their evolution and principles of division" in *The Cultural heritage of India*, Vol. V, chap. 19, pp. 303-311.

৬১। D. Abercrombie—Studies in Phonetics and Linguistics (1971), pp. 121-124.

৬২। E. A. Maxwell—The Methods of Plane Projective Geometry (1963), pp. 1-3, 11-13, 31.

৬৩। R. G. D. Allen—Mathematical Analysis for Economists

(1962), pp. 42-44, 523, 525-26.

৬৪। S. Chatman—A Theory of Meter (The Hague, 1964), pp. 104-5.

৬৫। M. Halle and S. J. Keyser—English stress: Its form, its growth, and its role in verse (1971).

৬৬। রবীন্দ্রনাথ—৩৭ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১২৬-৭, ১৮০।

৬৭। S. K. Chatterji—The Origin and Development of the Bengali language: Part I (1926), pp. 292-3; Part III (1972), p. 48.

৬৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (গবেষণা পরিষদ, বাংলা বিভাগ)—বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা: উক্তিটি প্রবোধ চন্দ্র সেনের, পৃঃ ২৬-৭।

৬৯। প্রাকৃত পৈঙ্গলম্ (১ম ভাগ)—সম্পাদক: ডঃ ভোলাশঙ্কর ব্যাস (১৯৫৯), ১।৮, পৃঃ ১০-১১।

৭০। রবীন্দ্রনাথ—৩৭ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৭২-৭৬, ১৬৬, ১৮৮।

৭১। মোহিত লাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২), পৃঃ ৫০।

৭২। বাংলা ছন্দ সমীক্ষা—৬৮ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ২০, ২২, ২৮।

* তৃতীয় অধ্যায়: শ্রুতি বিজ্ঞান

১। বিশ্বভারতী—রবীন্দ্ররচনাবলী (৭ম খণ্ড): কাহিনী—'গানভঙ্গ', পৃঃ ৯৫।

২। A. Gardiner—Speech and language (1969), pp. 62-3, 71-2, 79, 107, 201-3.

৩। ঈশোপনিষৎ, ৫।

৪। J. D. O'Connor—Phonetics (1974), p. 71.

৫। James Jeans—Science and Music (1961), pp. 29, 37.

৬। F. Williams—Language and Speech (1972), pp. 7-16.

৭। O'Connor—৪ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 73-81, 83-7, 92-3.

৮। Williams—৬ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 20, 22, 25.

৯। K. L. Pike—Phonemics (1947).

১০। A. C. Gimson—An Introduction to the Pronunciation of English (1976), pp. 27-8.

১১। D. Jones—An Outline of English Phonetics (1979), pp. 29-38; O'Connor—৭ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 50-52; S. K. Chatterji—A Bengali Phonetic Reader (1928), p. 11.

এখানে আরো উল্লেখ্য Md. Abdul Hai and W. J. Ball—The sound structures of English and Bengali (1961), pp. 6-9. এবং মুহম্মদ আব্দুল হাই—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৭৫), পৃঃ ২৫।

১২। H. J. Gray—Dictionary of Physics (1958), p. 106.

১৩। A. C. Sen—Bengali Motor Phonetics (1949), pp. 21-25, 37-39, 42.

১৪। আব্দুল হাই—১১ সংখ্যা দ্রঃ—ধ্বনিবিজ্ঞান ও ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৭৫), ০২ঃ ১৭৯-১৮২। O'Connor—৭ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 229-233.

১৫। J. Jeans—Science and Music (1961), p. 4.

১৬। A. Wood—The physics of music (1969), pp. 79-89.

১৭। D. P. Raychaudhuri and J. K. Mookherjee—Sound (1960), pp. 60-61.

১৮। Fletcher—Speech and Hearing, p. 176.

১৯। A. B. Wood—A textbook of sound (1957), p. 406.

২০। T. Mandal—A text book of sound (1935), pp. 42-44, 47-50.

২১। W. Watson—A text book of Physics, p. 375; J. W. Capstack—Sound (1954), pp. 145-6; T. Mandal—A text book of sound (1935), pp. 98-101.

২২। D. P. Raychaudhuri and J. K. Mookherjee—Sound (1960), pp 177-180; T. Mandal—A text book of sound (1935), pp. 95-98.

২৩। Mandal—২০ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 165-174.

২৪। R. Courant—Differential and Integral Calculus, Vol. I (1953), pp. 431-432.

২৫। Watson—২১ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 368-70, 418-21.

২৬। Raychaudhuri/Mookherjee—২২ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 162-63.

২৭। Glossary of acoustical terms and definitions, Pub. 661 (1936).

২৮। Wood—১৯ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 565, 572; D. P. Raychaudhuri —Advanced Acoustics.

২৯। Williams—৬ সংখ্যা দ্রঃ—p. 16.
৩০। H. Mol—Fundamentals of Phonetics (I), 1963, pp. 61-63.
৩১। J. W. Capstick—Sound (1954), pp. 144-145.
৩২। O'Connor—৪ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 111-124.
৩৩। I.A. Richards—Principles of Literary Criticisim (1924), p. 139.
৩৪। J. Barzun (ed)—The pleasures of music (1952), p. 173.
৩৫। D. Abercrombie—Studies in Phonetics and Linguistics (1971), pp. 19-20.
৩৬। J. C. Catford—Fundamental problems in phonetics (1977), p. 111.
৩৭। Jones—১১ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 12, 115, 121, 124-26, 134, 152, 212.
৩৮। S. Chatman—A theory of metre (The Hague, 1964), p. 104.
৩৯। S. K. Chatterji—The Origin and Development of the Bengali Language, Part I (1926), pp. 292-3 ; Part III (1972), p. 48.—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গবেষণা পরিষদ, বাংলা বিভাগ—বাংলা ছন্দ সমীক্ষা, পৃঃ ২০-২৮।
৪০। M. Halle and S. J. Keyser—English Stress : Its form, its growth and its role in verse (1971), pp. 171-2.
৪১। D. W. Harding—Words into rhythm, pp. 31-36.
৪২। J. B. Mayor—Chapters on English metre (1901).
৪৩। বাংলা ছন্দ সমীক্ষা—৩৯ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৭-১৭, ৪২। দিলীপ কুমার রায়ছান্দসিকী (১৯৬৮), পৃঃ ২৮৯।

*** চতুর্থ অধ্যায় : উচ্চারণ প্রক্রিয়া**

১। Daniel Jones—An Outline of English Phonetics (1957), p. 1.
২। P. Ladefoged—Preliminaries to linguistics (1973), pp. 2, 7, 33, 36, 81-2.
৩। A.C. Sen—Bengali Motor Phonetics (1949), pp. 7-9, 17.

৪। P. Ladefoged—Three areas of experimental phonetics (1967), pp. 3-6, 13-4, 20-21, 143-48, 162-72.
৫। R. M. S. Heffner—General Phonetics (1952), pp. 39-41, 72-78.
৬। R. H. Stetson—Motor Phonetics (1951).
৭। E. Kruisingha—A handbook of present-day English, Part I : English sounds (1925), pp. 11-2, 64-7.
৮। B. Bloch and G. L. Trager—Outline of Linguistic Analysis (1942) pp. 22-32.
৯। Language, vol 36, No. 1 (1960), pp. 39-42 : 'Phonemes of Bengali Language'.
১০। Kruisingha—৭ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 41, 65.
১১। আব্দুল হাই—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৭৫), পৃঃ ১৪১, ১৬৫-৬।
১২। A. C. Sen—৩ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 13-16.
১৩। Kruisingha—৭ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 11-12.
১৪। A. C. Sen—৩ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 17-20, 25-28.
১৫। অথর্ববেদ প্রাতিসাখ্যম্‌ ১।৯৩।
১৬। S. Varma—The phonetic observations of Indian grammarians (1929), pp. 55, fn. 4.
১৭। আব্দুল হাই—১১ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৭২-৩।
১৮। H. A. Gleason—An Introduction to Descriptive Linguistics (1961), pp. 255-6.
১৯। D. Abercrombie—Studies in phonetics and linguistics (1971), pp. 16-7.
২০। পরেশচন্দ্র মজুমদার—বাঙলা ভাষা পরিক্রমা (১ম খণ্ড, ১৩৮৩), পৃঃ ১৮৫-৮৮।
২১। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৪২), পৃঃ, ৪৫, ৮১-৮৬।
২২। Md. A. Hai and W. J. Ball—The sound structures of English and Bengali (1961), pp. 48-59.
২৩। S. K. Chatterji—A Bengali Phonetic Reader (1928), pp. 23-4, Para—60.

২৪। P. Ladefoged—২ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 81-2.
২৫। A. C. Sen—৩ সংখ্যা দ্রঃ—p. 43.
২৬। Prakrita-Paingalam, Part I, ed. Dr. B. S. Vyas (1959), p. 10.
২৭। R. H. Stetson—৬ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 67 ff, 102, 124f,
২৮। W. S. Allen—Phonetics in ancient India (1953), p. 94.
২৯। পাণিনি, I, ১.৭০.
৩০। ঋক্ প্রাতিশাখ্যম্ ১৩।৪৯।
৩১। S. Varma—১৬ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 170-71.
৩২। P. Ladefoged—২ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 55-6.

*** পঞ্চম অধ্যায় : বাক্ প্রবাহ**

১। A. C. Gimson—An Introduction to the Pronunciation of English (1976), p. 287.
২। A. Efron—Sound (1968), pp. 36-9.
৩। দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু—বাংলা ভাষার আধুনিকত্ব ও ইতিকথা (১৯৭৫), পৃঃ ১২৬।
৪। C. R. Sankaran—Process of speech (1963), pp. 13-15.
৫। E. A. Sonnenschein—What is rhythm? (1925), Chapter V.
৬। A. C. Sen—Bengali Motor Phonetics (1949), pp. 30, 33-5.
৭। A. C. Gimson—১ সংখ্যা দ্রঃ—p. 25.
৮। R. H. S. Heffner—General Phonetics (1952), pp. 204-205.
৯। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়—গীত সূত্রসার (১৩৮২), পৃঃ ১৬, ২৪-৫।
১০। A. Wood—The physics of music (1976), pp. 1-3, 15-6, 20, 33-4, 53.
১১। R. O. Morris—'An Introduction to Music': An outline of modern knowledge, ed. D. W. Rose (1931), pp. 1008-1010.
১২। Encyclopaedia Britannica (1949), Vol IV, p. 512.
১৩। B. C. Deva—An Introduction to Indian Music (1973), pp. 24-6.

১৪। কৃষ্ণধন—৯ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ২১৮, ২২২।
১৫। ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়—কথা ও সুর (১৩৪৫), পৃঃ ৪৪-৬, ৫০-৫৩, ৬২-৩।
১৬। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (১৯৬২), পৃঃ ২৯-৩১, ৯৫-৬।
১৭। মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২), পৃঃ ৬৪।
১৮। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—স্বগত (১৩৪৫), পৃঃ ১৯৩।
১৯। A. Preminger—Princeton Encyclopaedia of poetry and poetics (1975), pp. 885-6.
২০। দ্বিজেন্দ্রনাথ—৩ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১২৯।
২১। Md. A. Hai and W. J. Ball—The sound structures of English and Bengali (1961), pp. 57-9.
২২। A. Preminger—১৯ সংখ্যা দ্রঃ pp. 673-77.
২৩। S. K. Chatterji—A Bengali Phonetic Reader (1928), pp. 22-4.
২৪। Sven Öhman—Word and Sentence intonation: a quantitative model (1967), p. 47.
২৫। P. Ladefoged—Preliminaries to linguistic phonetics (1973), pp. 82-3.
২৬। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য—বাংলা ভাষা (১৩৮২), পৃঃ ১৮০-৮১।
২৭। Hai/Ball—২১ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 10, 58-9.
২৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছন্দ (১৩৮২), পৃঃ ৭৪-৫, ১০২-১০৩।
২৯। W. D. Whitney—Sanskrit Grammar (1962), Art. 79(a), p. 28.
৩০। পরশুরাম গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড (১৩৮৫), পৃঃ ৩৯৫-৬।
৩১। E. B. Uvasov, D. R. Chapman and A. Issacs—A dictionary of science (1971), p. 141.
৩২। মোহিতলাল—১৭ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৫০।
৩৩। মুহম্মদ আব্দুল হাই—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৭৫), পৃঃ ১১৯-২০।
৩৪। D. C. Sen—Vanga Sahitya Parichaya, Part I (1914), p. 82.
৩৫। দ্বিজেন্দ্রনাথ—৩ সংখ্যা দ্রঃ পৃঃ ১২৮।

৩৬। A. Wood—The physics of Music (1976), pp. 42-4.
৩৭। J. C. Catford—Fundamental Problems in phonetics (1977), pp. 110-11.
৩৮। P. Ladefoged—২৫ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 84, 89.
৩৯। J. D. O'Connor and G. F. Arnold—Intonation of Colloquial English (1961), pp. 1-3, 5, 7.
৪০। দ্বিজেন্দ্রনাথ—৩ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১২৯-৩২।
৪১। আব্দুল হাই—৩৩ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৩০৯-১২।
৪২। A. C. Sen—৬ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 16, 43-5.
৪৩। রাজনারায়ণ বসুকে লেখা চিঠি—মধুসূদন গ্রন্থাবলী (১৯৭৩), পৃঃ ৩২২।
৪৪। R. H. Stetson—'Functions of the breathing movements in the mechanism of speech': Archives Nearl, Phon. Exp. V (1930), 1-30.
৪৫। Heffner—৮ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 12-14.
৪৬। রবীন্দ্রনাথ—২৭ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৫৪।
৪৭। অনিল বিশ্বাস—উদ্বেগ উপকূলে (১৩৮৭), পৃঃ ৬৯।
৪৮। Catchpool and Satterly—A text book of sound (1931), p. 238.
৪৯। E. G. Boring—A history of experimental psychology (1969), pp. 287-89.
৫০। H. A. Gleason—An Introduction to Descriptive Linguistics (1970), pp. 255-6.
৫১। A. C. Sen—৬ সংখ্যা দ্রঃ—p. 7-9.
৫২। J. T. Shipley (ed)—Dictionary of world literature (1943), pp. 455-59.
৫৩। দ্বিজেন্দ্রনাথ—৩ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১২৮-২৯।
৫৪। আব্দুল হাই—৩৩ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ২৮৪-৮৮।
৫৫। A. Snell—Pause (1918).
৫৬। রবীন্দ্রনাথ—২৮ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৬৫।
৫৭। মোহিতলাল—১৭ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৭-১০, ২৪-৬, ৩০-৩১, ৩৭-৮।
৫৮। আব্দুল হাই—৩৩ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ২৮৪, ২৯৫।
৫৯। অমূল্যধন—১৬ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ২৬-৭।
৬০। P. Ladefoged—২৫ সংখ্যা দ্রঃ—p. 2.

৬১। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য—বাংলাছন্দ (১৩৬২), পৃঃ ২৮-৩১, ৪৪-৫০।
৬২। Sri Aurobindo—'On quantitative metre' : Collected poems—Birth Centenary Library, vol.5. pp. 352, 356.
৬৩। B. Chaitanya Deva—Psycho-acoustics of music and speech (1967), pp. 48, 286-290.
৬৪। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষা-প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৪২), পৃঃ ৮২-৩।
৬৫। আব্দুল হাই—৩৩ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ২৭৫-৬।
৬৬। C. L. Meader and J. H. Muyskens—Handbook of Biolinguistics, Part I, Sec. A. Toledo 2, Ohio, 1950, pp. 279-283.
৬৭। B. C. Deva—'The tonal structure of the Tambura' : *Sangit Kala Vihar*, 1960, p. 64.
৬৮। R. S. Wells—'De Saussure's System of Linguistics', *Word* 3, 1947, p. 2.
৬৯। E. Whittaker—From Euclid to Eddington 84 (1949).
৭০। F. Klein—Elementary Mathematics (1924), pp. 35-6, 218.
৭১। E. A. Sonnenschein—What is rhythm? (1925), Chaps. I/III.
৭২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী (১৯৭৩), পৃঃ ৪, টীকা (৪)।
৭৩। আব্দুল হাই—৩৩ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৩১৩-১৪।
৭৪। S. K. Chatterji—A Bengali Phonetic Reader (1928), p. 12. ধ্বনিতত্ত্বের বই হলো M. V. Trofimov/D. Jones—The Pronunciation of Russian (1923), p. 27 onwards ; G. Noel—Armfield—General Phonetics (1922). মূল স্বরের (Cardinal Vowel) দু'খানি অভিলেখ আছে—প্রস্তুতকারক His Master's Voice Gramophone Co. ও প্রাপ্তিস্থান 363, Oxford Street, London, W.I, এদের সংখ্যা B. 804 কোম্পানীর তালিকায়, আর দাম ৩ শিলিঙ ও ৬ পেন্স।
৭৫। ফের দৌস খাঁ—'হরফ সমস্যা' ঃ বাঙলা একাডেমী পত্রিকা, পৌষ-চৈত্র (১৩৬৪)। দ্রঃ মুনীর চৌধুরী—বাঙলা গদ্যরীতি (১৩৮৩),

পৃঃ ১৫৯-৬০। লেখকের পরিচালনাধীনে ঢাকা টিচার্স ট্রেনিং কলেজের পারুল হোম রায়, সোফিয়া খান এবং আলিমুন্নেছা বেগমকৃত 'বাংলার যুক্তাক্ষর সমস্যা' শীর্ষক থিসিস (১৯৫২-৫৩) দ্রষ্টব্য। ৯২৪৪ টি যুক্তাক্ষরের মধ্যে আদিতে ব্যবহৃত শব্দসংখ্যা হলো ১৬৭০ টি।

৭৬। আব্দুল হাই—৩৩ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ২৭৬-২৮১।

৭৭। রবীন্দ্রনাথ—২৮ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৫৭, ১৬০।

৭৮। প্রবোধচন্দ্র সেন—ছন্দ পরিক্রমা (১৯৭৭), পৃঃ ৪৮।

৭৯। Catford—৩৭ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৮১।

৮০। অমূল্যধন—১৬ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৩৪, পাদটীকা।

৮১। W. D. Whitney—The Taittiriya Pratisakhya and Tribhasyaratna (1973), p. 401. এ হ'লো xxii, ১৪ শ্লোকের উপর তাঁর মন্তব্য। শ্লোকে বলা হয়েচে যে ব্যঞ্জনান্ত অক্ষর, দীর্ঘ স্বরযুক্ত অক্ষর, ব্যঞ্জন সংযোগ—পূর্ব অক্ষর ও আনুনাসিক অক্ষর—এরা সবাই গুরু, অন্যান্যরা লঘু।

যদ্ব্যঞ্জনান্তং যদ্‌ চাপি দীর্ঘং সংযোগপূর্বং চ তথানু নাসিকম্‌
এতানি সর্বানি গুরূনি বিদ্যাচ শেষান্য তো অন্যানি ততো লঘ্‌ নি ॥xxii,১৪॥

৮২। W. S. Allen—Phonetics in ancient India (1953), pp. 86-7.

৮৩। G. Birkoff and S. M. Lane—A Survey of Modern Algebra (1954), p. 3.

৮৪। ইণ্ডিয়া অফিসে রক্ষিত পাণ্ডুলিপি সংখ্যা ১৭১৩ বি, পাতা (folio)। ১।

৮৫। S. Varma—Critical studies in the phonetic observations of Indian grammarians (1961), pp. 88, 90.

৮৬। L. F. Brosnahan and B. Malberg—Introduction to phonetics (1970), pp. 47-9.

৮৭। Allen—৮২ সংখ্যা দ্রঃ—p. 22.

৮৮। কৃষ্ণধন—৯ সংখ্যা দ্রঃ পৃঃ ১৭২-৭৩।

৮৯। Catford—৩৭ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 84-7, 91-2.; D. Abercrombie তাঁর (1964) A phonetician's view of verse structure: linguistics, 6-এ বলেচেন "সমকালীন মেল"-এর কথা। তাঁর মতে দ্রুতির পরিবর্তনে আসে সমকালীন মেলে স্থিতিকালের পরিবৃত্তি। M. A. K. Halliday বলেচেন তাঁর 1967-Intonation and

grammar in British English এ ঃ 'এক, দুই ও তিন অক্ষরীয় মেলের গড় স্থিতিকালের অনুপাত যন্ত্রে দেখায় প্রায় 5 : 6 : 7'.

৯০। The Golden Book of Coleridge (Everyman's library), ed. E. Rhys (1932), pp. 147, 149.

৯১। D. Abercrombie—Studies in phonetics and linguistics (1971), pp. 21-25.

৯২। আব্দুল হাই—৩৩ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১০৮-৯, ১১৪-১৫।

৯৩। Grammont—Traite de phonetique, p. 49 ; W. S. Allen তাঁর Phonetics in ancient India (1953)-তে এ'র উল্লেখ করেছেন ৭২ সংখ্যক পৃষ্ঠায়।

৯৪। D. Jones—An outline of English phonetics (1957), Sec 858 at p. 237.

৯৫। অমূল্যধন—১৬ সংখ্যা দ্রঃ পৃঃ ৪৪-৫, ১০৮।

৯৬। প্রবোধ চন্দ্র—৭৮ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৯, ১০।

৯৭। মোহিতলাল—১৭ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ii, ৫০-৫১।

* ষষ্ঠ অধ্যায় ঃ ছন্দোবিজ্ঞান

১। Robert Bridges—'A letter to a Musician on English Prosody' : Collected Essays, vols. II, XV. (1933), pp. 56-8, 64-5.

২। Birkoff—Aesthetic Measure (1933).

৩। R. Ghil—Traite du verbe (1886), p. 18.

৪। J. C. Ransom—The world's body (1938), pp. 95-7.

৫। Carl Stumpf—Die sprachlante (1926) ; Wolfgang Kohler—'Akustische untersuchungen' : Zeitschrift für Psychologie, LIX (1910), LVIII (1911), LXIV (1913), LXXII (1915).

৬। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—ছন্দ সরস্বতী ঃ অলোক রায় সম্পাদিত (১৯৭৪), পৃঃ ১৩।

৭। প্রবোধ চন্দ্র সেন—ছন্দ-পরিক্রমা (১৯৭৭), পৃঃ ১১-২, ৩৯।

৮। দিলীপ কুমার রায়—ছান্দসিকী (১৯৪০) ঃ ভূমিকা, পৃঃ ১৬-৭।

৯। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছন্দ (১৯৭৬) পৃঃ ২৪৯-৫০।

১০। কৃষ্ণধন বন্দোপাধ্যায়—গীতসূত্রসার (১৩৮.) : ১ম ভাগ, পৃঃ ১৯৪।
১১। রবীন্দ্রনাথ—৯ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৭৩, ৪২-৪।
১২। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (১৯৬২) : প্রথম সংস্করণের নিবেদন, পৃঃ ৷৵, ২৯, ২০১।
১৩। Bridges—১ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 73-4.
১৪। মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ (১৯৫২), পৃঃ ৬৪-৫।
১৫। S. K. Chatterji—The Origin and Development of the Bengali language (1926), Part I, pp. 292-93; Part III (1972), p. 48.
১৬। A. H. Foxstrangways—The music of Hindosthan (1914), pp. 200, 202.
১৭। H. Lanz—The physical basis of rime (1931).
১৮। V. Benussi—Psychologie der zeitanffassung (1913), pp. 215ff.
১৯। L. Abercrombie—The theory of poetry। এর উল্লেখ করেচেন মোহিতলাল মজুমদার তাঁর 'বাংলা কবিতার ছন্দে' (১৩৫২) : ভূমিকা ॥-
২০। তারাপদ ভট্টাচার্য—ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দো বিবর্তন (১৯৭১), পৃঃ ৮০-৮১।
২১। মুহম্মদ আব্দুল হাই—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৭৫), পৃঃ ৩৫২।
২২। S. K. Chatterji—A Bengali Phonetic Reader (1928); Md. Abdul Hai and W. J. Ball—The sound structures of English and Bengali (1961); Md. Abdul Hai—A phonetic and phonological study of nasals and nasalisation in Bengali (1960); A. C. Sen—Bengali Motor Phonetics (1949).
২৩। B. C. Deva—Psycho-acoustics of music and speech (1967), pp. 2-3, 48, 98, 272.
২৪। C. R. Sankaran—Process of speech (1963), pp. 66-7.
২৫। R. Wellek and A. Warren—Theory of literature (1966), pp. 158-173.
২৬। A. Preminger (ed)—Princeton Encyclopaedia of Poetry and Poetics (1975), pp. 453-55, 931-33.

২৭। Wellek/Warren—২৫ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 172-73.
২৮। রাখাল রাজ রায়—'বাংলার ছন্দ ও তাল' ঃ পরিচারিকা (নবপর্যায়), ১৩২৪ জ্যৈষ্ঠ (১ম বর্ষ, ৭ম সংখ্যা) পৃঃ ৪৫৭-৪৬৭।
২৯। প্রবোধ চন্দ্র সেন—৭ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৯-১০, ৩৮, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—বাংলা ছন্দ সমীক্ষা, পৃঃ ৫-৭।
৩০। দিলীপ কুমার—৮ সংখ্যা দ্রঃ—ভূমিকা, পৃঃ ১৬-৮, ২০-২১।
৩১। প্রবোধ চন্দ্র সেন—ছন্দ জিজ্ঞাসা (১৯৭৪), পৃঃ ৪৬১।
৩২। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত—স্বগত (১৯৪৫), পৃঃ ১৯৩-৪।
৩৩। মোহিতলাল—১৪ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৩।
৩৪। অমূল্যধন—১২ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৮৮, ৯৬-৭।
৩৫। রবীন্দ্রনাথ—৯ সংখ্যা দ্রঃ পৃঃ ৫৫।
৩৬। রাজশেখর বসু—চলন্তিকা (১৩৫৩), পৃঃ ২০৭।
৩৭। J. Schipper—A History of English Versification (1910), Chapter I.
৩৮। কৃষ্ণধন—১০ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৬২-১৭০।
৩৯। রবীন্দ্রনাথ—৯ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৫০-৫১।
৪০। আব্দুল হাই—২১ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৬৪-৫, ১৮৪।
৪১। Shorter Oxford English Dictionary (1959) p. 103.
৪২। J. R. Firth—Sounds and Prosodies, pp. 4-5, 11-2.
৪৩। R. H. Robins—'Aspects of Prosodic analysis' (1957) : Prosodic Analysis, ed. R. Palmer, 1970, pp. 191-2.
৪৪। আব্দুল হাই—২১ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ২৫৩।
৪৫। অমূল্যধন—১২ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৬, ১৭-৮, পাদটীকা।
৪৬। কৃষ্ণধন—১০ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ২১৮-১৯।
৪৭। B. C. Deva—An Introduction to Indian Music (1981), pp. 27-8.
৪৮। R. R. Menon—The sound of Indian Music (1976), pp. 60-64.
৪৯। Shorter Oxford—৪১ সংখ্যা দ্রঃ—p. 2146.
৫০। R. O. Morris—'An Introduction to Music' : An outline of modern knowledge (1931), pp. 1009-1010, 1012, 1025-28.

৫১। H. D. Velankar—'Apabhramsa metres': *Bharata Kaumudi*, Vol II, pp. 1066-67, 1072-3.
৫২। আশুতোষ দেব—নূতন বাঙ্গালা অভিধান (১৯৭৬), পৃঃ ৯৩৮।
৫৩। কৃষ্ণধন—১০ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৫৩, পাদ টীকা।
৫৪। Princeton Encyclopaedia—২৬ সংখ্যা দ্রঃ—p. 677.
৫৫। অমূল্যধন—১২ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৯২।
৫৬। রবীন্দ্রনাথ—৯ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ২০২।
৫৭। G. Saintsbury—Historical Manual of English Prosody (1930) p. 6. fn. 1.
৫৮। আব্দুল হাই—২১ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৬৪-৬৬, ১৭৩। এ প্রসঙ্গে পঠিতব্য হলো (১) H.A. Gleason—An Introduction to Descriptive Linguistics (1956), pp. 203-4, 255-6 ; (2) R.H. Stetson—Motor Phonetics (2nd edition, 1951), p. 200 ; (3) W. S. Allen—Phonetics in Ancient India (1953), pp. 79-83 ; (4) S. Varma—Critical Studies in the Phonetic Observations of Indian Grammarians (1961), pp. 55-60.
৫৯। Varma—৫৮ সংখ্যা দ্রঃ—p. 56.
৬০। D. Jones—An Outline of English Phonetics (1957), Secs. 100-101, 209-211 at pp. 23-4, 53.
৬১। The Concise Oxford Dictionary (6th edn), pp. 528-9.
৬২। জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান (১৯৩৭), পৃঃ ৩৭, ৩৯।
৬৩। মোহিতলাল—১৪ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৫৬।
৬৪। Concise Oxford—৬১ সংখ্যা দ্রঃ—p. 33 ; A Preminger—Princeton Encyclopaedia of poetry and poetics (1975), p. 33 ; B. Blackstone—Practical English Prosody (1974), p. 154.
৬৫। জ্ঞানেন্দ্র মোহন—৬২ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৪৭।
৬৬। Concise Oxford—৬১ সংখ্যা দ্রঃ—p. 12.
৬৭। প্রবোধ চন্দ্র সেন—ছন্দ পরিক্রমা (১৯৬৫), পৃঃ ১২৪, ১২৯।
৬৮। মধুসূদন রচনাবলী (১৯৭৩), পৃঃ ৩২২। রাজনারায়ন বসুকে লেখা চিঠির তারিখ ৩রা আগষ্ট, ১৮৬০। 'মেঘনাথ বধ কাব্যে'র মঙ্গলাচরণ লেখা হয় ২২শে পৌষ, সন ১২৬৭ সাল অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে

এবং এ দিগম্বর মিত্র মহাশয়ের উদ্দেশে ঃ 'এঅমিত্রাক্ষর ছন্দ এ দেশে ত্বরায় আদরনীয় হইয়া উঠিবেক।' এর আগে 'তিলোত্তমা সম্ভব কাব্যে'র (১৮৬০) যতীন্দ্র মোহন ঠাকুরের উদ্দেশ্যে মঙ্গলাচরণে কবি বলেন ঃ 'যে ছন্দোবন্ধে এই কাব্য প্রণীত হইল তদ্বিষয়ে পরীক্ষা বৃক্ষের ফল সদ্যঃ পরিণত হয় না। তথাপি আমার বিলক্ষণ প্রতীতি হইতেছে যে এমন কোন সময় অবশ্যাই উপস্থিত হইবেক, যখন এ দেশে সর্বসাধারণ জনগণ ভগবতী বাগ্দেবীর চরণ হইতে মিত্রাক্ষর স্বরূপ নিগড় ভগ্ন দেখিয়াই চরিতার্থ হইবেক।' দ্রষ্টব্য ঃ গ্রন্থাবলী, পৃঃ ২০২, ২৩৬-৪২।

৬৯। রবীন্দ্রনাথ—৯ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ২৩০, ২৩৩।

৭০। B. Blackstone—Practical English Prosody (1974), pp. 86-7.

৭১। মধুসূদন রচনাবলী—৬৮ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৩০৮।

৭২। রবীন্দ্রনাথ—৯ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১২৩।

৭৩। রাজেন্দ্রলাল মিত্র—বিবিধার্থ সংগ্রহ, শক ১৭৮২ অগ্রহায়ণ। নগেন্দ্রনাথ সোমের 'মধুস্মৃতি' পৃঃ ১২২ দ্রষ্টব্য।

৭৪। অমূল্যধন—১২ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১০২।

৭৫। মোহিতলাল—১৪ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৮৯।

৭৬। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্—বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৩৪২), পৃঃ ২৪৫।

৭৭। নকুলেশ্বর বিদ্যাভূষণ—বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৩৪৩), পৃঃ ৩৭৬-৭৭।

৭৮। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৪২), পৃঃ ৪৪৬।

৭৯। রবীন্দ্রনাথ—৯ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৩২, ৫৪, ১৪৮।

৮০। লালমোহন বিদ্যানিধি—কাব্যনির্ণয় (১৮৬২), পৃঃ ৮৯।

৮১। রামমোহন রায়—গৌড়ীয় ব্যাকরণ (১৮৩৩), পৃঃ ৪১১-১২।

৮২। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর—সমগ্র ব্যাকরণ কৌমুদী (১৯৭৩), দুর্গাচরণ সাংখ্য বেদান্ততীর্থ কর্তৃক সংশোধিত ও পরিবর্ধিত, পৃঃ ৩২।

৮৩। মধুসূদন রচনাবলী—৬৮, সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৩৬২।

৮৪। প্রবোধচন্দ্র—৬৭ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১২৫।

৮৫। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ (১৯৬৬) ঃ ১ম খণ্ড, ৮৯৯-৯০০।

৮৬। দিলীপকুমার—৮ সংখ্যা দ্রঃ—ভূমিকা, পৃঃ ২৪ ; বিধুশেখর শাস্ত্রী—'ছন্দঃ' ঃ বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ সাল, পৃঃ ২৯৯-৩০১।

৮৭। Oxford dictionary—৪১ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 1244, 1733, 1799; Webster's 7th New Collegiate Dictionary, p. 739.

৮৮। কৃষ্ণধন—১০ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৩২-৩।

৮৯। Hamlyn Encyclopaedic World Dictionary, ed. P. Hanks (1972), p. 1398.

৯০। Blackstone—৭০ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৪৮-৯

৯১। সুধীন্দ্রনাথ—৩২ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৯৫-৬।

৯২। মোহিতলাল—১৪ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৭-৮, ৬৪।

৯৩। ছন্দোমঞ্জরী (১৯৪০), সম্পাদক—অনন্তরাম শাস্ত্রী বেতাল, পৃঃ ২-৩।

৯৪। Concise Oxford—৬১ সংখ্যা দ্রঃ—p. 1293.

৯৫। Encyclopaedia Britannica (1949), vol. 23, p. 96.

৯৬। ঘনরাম চক্রবর্তি—ধর্মমঙ্গল (বঙ্গবাসী, ১৩০৮), পৃঃ ১৯।

৯৭। হরিচরণ—৮৫ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৭৬৬।

৯৮। জ্ঞানেন্দ্র—৬২ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৬৫০, ১২৬২, ১২৬৬।

৯৯। H. Read—English Prose Style (1968): Introduction, pp. ix-xi.

১০০। রবীন্দ্রনাথ—৯ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ২০১, ২১১, ২১৫।

১০১। মোহিতলাল মজুমদার—হেমন্ত গোধূলি—'গদ্য ও পদ্য'। উদ্ধৃত হয়েচে মোহিতলালে—১৪ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৯০।

১০২। জ্ঞানেন্দ্র—৬২ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১২৮৯।

১০৩। রবীন্দ্রনাথ—৯ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৪০।

১০৪। মোহিতলাল—১৪ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১০, ২৪, ৩০-৩২, ৪৯, ৫৩।

১০৫। প্রবোধচন্দ্র—৬৭ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১২৬-২৭।

১০৬। J. C. Catford—Fundamental problems in phonetics (1977), pp. 82, 91-2, 197.

১০৭। A. C. Sen—Bengali Motor Phonetics (1949), pp. 21-25, 50-56.

১০৮। H. J. Gray—Dictionary of physics (1958), pp. 378-79.

১০৯। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য—বাংলা ছন্দ (১২৬২), পৃঃ ৪৪-৫।

১১০। কৃষ্ণধন—১০ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৭৮।

১১১। Oxford dictionary—৪১ সংখ্যা দ্রঃ—p. 246. Samuel Johnson (1709-84)—তাঁর A Dictionary of the English language (1755) এ শব্দার্থ দিয়েচেন। 'স্বরপতনে'র প্রয়োগ হয় ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে।

১১২। E. A. Sonnenschein—What is rhythm? (1925), Chapter II : Rhythm in Music ; Chapter V : Rhythm in ancient Greek verse.

১১৩। A. Wood—The physics of music (1976), pp. 50-51.

১১৪। Gray—১০৮ সংখ্যা দ্রঃ—106, 526.

১১৫। Princeton Encyclopaedia—২৬ সংখ্যা দ্রঃ—p. 531.

১১৬। W. S. Allen—Phonetics in ancient India (1953), p. 83.

১১৭। প্রবোধচন্দ্র সেন—(i) ছন্দ-জিজ্ঞাসা, পৃঃ ৪২২, ৪২৬-৭ ; (ii) ছন্দ পরিক্রমা, পৃঃ ৩৭-৯, ২০৩ ; (iii) সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, কার্তিক-চৈত্র, ১৩৮২, পৃঃ ১৩।

১১৮। H. T. Colebrooke—Miscellaneous Essays, Vol II, p. 151.

১১৯। প্রবোধচন্দ্র সেন—বাংলা ছন্দ সমীক্ষা (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়), পৃঃ ৯-১০।

১২০। V. S. Apte—The Student's Sanskrit English Dictionary (1979), pp. 138, 434, 648.

১২১। প্রবোধচন্দ্র সেন—বাংলা ছন্দ চিন্তার ক্রমবিকাশ (১৯৭৮), পৃঃ ১৩৫ ঃ উদ্ধৃত হয়েচে নরহরি চক্রবর্তির উক্তিটি।

১২২। রবীন্দ্রনাথ—৯ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১১৩-১৪, ১২৫, ১৭৮-৮১।

১২৩। Sri Aurobindo—Birth Centenary Library, Vol 5 : "On quantitative metre", pp. 347, 352, 356-7.

১২৪। J. Vendryes—Language (Fourth Impression, 1952), pp. 23, 59.

১২৫। হরিচরণ—৮৫ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৮২৭।

১২৬। কাজী আবুল ওদুদ—ব্যবহারিক শব্দকোষ, পৃঃ ৮৬৯।

১২৭। Concise Oxford—৬১ সংখ্যা দ্রঃ—p. 83.

১২৮। D. P. Raychowdhury—Advanced Acoustics, pp. 159-165.

১২৯। কৃষ্ণধন—১০ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৬২-৩, ১৭১, পাদটীকা ; ১৭৪-৫, ১৮৮, ১৯৪।

১৩০। D. C. Sen—Vanga Sahitya Parichaya (1914), Vol I, pp. 81-4.

১৩১। D. Abercrombie—Studies in Phonetics and Linguistics (1971), pp. 16-7.
১৩২। S. Chatman—A theory of meter (1964), pp. 104-5.
১৩৩। জ্ঞানেন্দ্র—৬২ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৮০৭।
১৩৪। H. D. Velankar (ed)—Jayadaman : General Introduction, pp. 1-30। এ ছাড়াও দ্রষ্টব্য—H. D. Velankar—'Sanskrit metres : Their evolution and principles of division' in R. M. I. C's The Cultural heritage of India, Vol V, pp. 303-311.
১৩৫। Anundoram Borooah—Prosody (Reprint, 1975), pp. 153-54.
১৩৬। S. H. Kellogg—A Grammar of the Hindi Language (Reprint, 1965), $ 939 at p. 551.
১৩৭। Velankar—১৩৪ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ৩, ৪১, ৭২, ৯৪।
১৩৮। Apte—১২০ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 214, 452.
১৩৯। হরিচরণ—৮৫ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১৯৪৯।
১৪০। Monier Monier-Williams—A Sanskrit-English Dictionary (1899), p. 903.
১৪১। Shorter Oxford—৪১ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 246, 2146.
১৪২। J. T. Shipley—Dictionary of world literature (1943), p. 456 : "Prosody", pp. 455-460—দ্রষ্টব্য।
১৪৩। A. C. Gimson—An Introduction to the pronounciation of English (Reprint, 1976), pp. 19-21.
এখানে আরো দ্রষ্টব্য H. A. Gleason—An Introduction to Descriptive Linguistics (1970), pp. 358-369.

*** সপ্তম অধ্যায় : ছন্দের স্বরূপ**

১। K. Shapiro and R. Beum—A prosody handbook (1965), pp. 45, 60, 63-4, 70-71.
২। Philip Sidney—Astrophel and Stella (1591) : Sonnet No. 1. মূল হলো : 'Fool' said my Muse to me, 'look in thy heart and write'.
৩। Shapiro/Beum—১ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 1-3, 6-7.

৪। H. D. Velankar—'Sanskrit metres : Their evolution and Principles of division' in R. K. M. I. C'S The Cultural Heritage of India, Vol V, 1978, pp. 303-11.

৫। Shapiro/Beum—১ সংখ্যা দ্রঃ—p. 15.

৬। M. Monier-Williams—A Sanskrit-English Dictionary p. 1009.

৭। V.S. Apte—The Student's Sanskrit-English Dictionary, pp. 529-30, 648.

৮। The Concise Oxford Dictionary (6th edn.) pp. 528-9.

৯। প্রবোধচন্দ্র সেন—ছন্দ পরিক্রমা (১৯৭৭) পৃঃ ৫-১২, ৪৭-৯; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—ছন্দ সমীক্ষা পৃঃ ৩-১৯, ২৬-৭।

১০। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—বাংলা ছন্দের মূল সূত্র (১৯৬২), পৃঃ ৩০ পাদ টীকা, ৩০-৩২, ৪৩-৫, ৯১, ৯৭-১১১, ছন্দ সমীক্ষা, পৃঃ ৮৭।

১১। মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২), পৃঃ ১০-১৩, ৩৪-৫১, ৫৩, ৫৮-৯।

১২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—বাংলা ছন্দ সমীক্ষা, পৃঃ ৪২, ৪৪।

১৩। দিলীপ কুমার রায়—ছান্দসিকী, পৃঃ ১৭৩-৯৮, ২৮৯। দ্রষ্টব্য ঃ বাংলা ছন্দ সমীক্ষা, পৃঃ ৪২।

১৪। প্রবোধচন্দ্র সেন—ছন্দ জিজ্ঞাসা (১৯৭৪), পৃঃ ৪৫৪, ৪৬১।

১৫। W. D. Ross (ed)—'Posterior Analytics', in *Works*, Vol I (1928), p. 101[b].

১৬। M. R. Cohen and E. Nagel—An Introduction to Logic and Scientific Method (1964), pp. 235, 241-42.

১৭। James Jeans—Science and Music (1961), pp. 9, 29, 37.

১৮। David Abercrombie—Studies in phonetics and linguistics (1971), pp. 16-22.

১৯। R. M. S. Heffner—General Phonetics (1952), pp. 38-40, 73-74, 76.

২০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ছন্দ (তৃতীয়, সংস্করণ, ১৩৮২), পৃঃ ১০২, ১২৬, ২১০-১১।

২১। E. A. Sonnenschein—What is rhythm ? (1925), Chapter I : "Rhythm defined".

২২। S. Chatman—A Theory of meter (1964), pp. 104-105,

দ্রষ্টব্য Roulon Wells—Style in language ; M. Halle and S. J. Keyser—English Stress : Its form, its growth and its role in verse (1971), p. 166 ; ও D. W. Harding—Words into rhythm (1971-2), pp. 31-2.

২৩। শ্রী অরবিন্দ—দিব্যজীবন (Life Divine), ১ম খণ্ড, অনুবাদক, অনির্বাণ, পৃঃ ১১৩-১৪।

২৪। Ezra Pound—ABC of heading (1934), p. 92 ; Cassell's German-English and English-German Compact Dictionary, ed. J. H. Lepper (1960), pp. 54 and 41.

২৫। H. Read—English Prose Style (1968) : Introduction, pp. x-xi.

২৬। D. W. Harding—Words into rhythm (1971-2), pp. 154-5.

২৭। A. Preminger (ed)—Princeton Encyclopaedia of Poetry and Poetics (9175), p. 288.

২৮। E. Bullough—British Journal of Psychology, Vol V, June, 1912.

২৯। J. C. Catford—Fundamental problems in phonetics (1977), pp. 15-6, 84-5, 197.

৩০। A. C. Gimson—An Introduction to the pronunciation of English (1976), p. 9, footnote.

৩১। H. A. Gleason—An Introduction to Descriptive Linguistics (1961), pp. 255-56.

৩২। A. C. Sen—Bengali Motor Phonetics, pp. 16, 43-45, 50-51.

৩৩। Catford—২৯ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 93, 95, 97-8, 110-11.

৩৪। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষা প্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৪২), পৃঃ ৩৫, ৪২-৫, ৮১-৮৫।

৩৫। Webster's 7th New Collegiate Dictionary (1969), pp. 931, 996 ; The Shorter Oxford English Dictionary (3rd edn.) pp. 2208, 2368 ; Hamlyn Encyclopaedic World Dictionary (1972), pp. 1650, 1764.

৩৬। হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়—বঙ্গীয় শব্দকোষ (১৯৬৭), পৃঃ ২৩০৩,

২৩০৬ ; জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস—বাঙ্গালা ভাষার অভিধান, পৃঃ ২১১৪, ২১১৬।
৩৭। K. L. Pike—Phonemics (1947); D. Jones—The phoneme: its nature and use (1967), pp. 12, 121, 126, 152.
৩৮। H. D. Velankar—"Sanskrit Metres: their evolution and principles of division", in The Cultural Heritage of India, Vol 5, pp. 303-311.
৩৯। রবীন্দ্রনাথ—২০ সংখ্যা দ্রষ্টব্য—পৃঃ ৩২, ৩৪-৩৬, ৫৪-৫, ১৬৫।
৪০। Heffner—১৯ সংখ্যা দ্রঃ—pp. 12-14; R. H. Stetson and C. V. Hudgins—'Functions of the breathing movements in the mechanism of speech' in Archives Nearl. Phon. Exp. V (1930), 1-30.
৪১। T. L. Heath—A Manual of Greek Mathematics (Dover, 1963), p. 39.
৪২। Encyclopaedia Britannica, Vol, 18, p. 803.
৪৩। H.D. Velankar (ed)—Jayadaman: General Introduction, pp. 7-23.
৪৪। S. K. Chatterji—The origin and development of the Bengali Language (1926), Part I, pp. 292-93। পরে ওঁর দ্বিতীয় সংস্করণে, Vol 3 (1972), p. 48-এ তিনি পূর্বের 'বলবৃত্তের' জায়গায় এনেচেন 'স্বনবৃত্ত'।
৪৫। S. K. Chatterji—A Bengali Phonetic Reader (1928), $ 61, p. 24.
৪৬। R. H. Stetson—Motor Phonetics (1951).
৪৭। মুহম্মদ আব্দুল হাই—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৭৫), পৃঃ ১৩৪, ১৫৪, ১৭৪-৭৬।
৪৮। W. D. Whitney—Sanskrit Grammar (1962), $ 79, p. 28.
৪৯। E. B. Uvarov, D. R. Chapman and A. Isaacs—A Dictionary of Science (1971), pp, 236, 369.
৫০। A. Borooah—Prosody (Reprint, 1975), p. 4.
৫১। W. S. Allen—Phonetics in ancient India (1953), pp. 84, 86.

৫২। L. S. Stebbing—A modern Introduction to Logic (1961), p. 88.
৫৩। L. S. Dugin—Tables of Persian metres (1942), p. 5.
৫৪। Sri Aurobindo—Birth Centenary Library, vol. 5 : "On the quantitative metre", pp. 347, 352, 356-7.
৫৫। পরশুরাম গ্রন্থাবলী, ১ম খণ্ড (১৩৮৫), পৃঃ ৩৯৫-৬।
৫৬। শিক্ষা সংগ্রহ (বারাণসী সংস্কৃত সিরিজ), ১৮৯৩, পৃঃ ৪৩৬।
৫৭। বৈদিকাভরণ (তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যের), XXI, ১।
৫৮। Patanjali on Panini. 1.2.29 (Kielhorn's edition, 1880), Vol I, p. 206.
৫৯। S. Varma—Critical studies in the phonetic observations of Indian Grammarians (1961), pp. 55-56.
৬০। রবীন্দ্রনাথ—২০ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ২২, ২৭, ৩৬, ৫০-৫১, ৫৭, ৬৩, ৬৮, ৯৫, ১০৭-৮, ১১৬, ১২৩, ১২৫, ১২৭-২৮, ১৬০-৬১, ১৬৬-৭, ১৮২, ১৮৭-৮, ১৯৩।
৬১। তারাপদ ভট্টাচার্য—ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন (১৯৭১), পৃঃ ২০১, ২৩২।
৬২। কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায়—গীতসূত্রসার (১৩৮২), ১ম ভাগ, পৃঃ ১৭২-৭৩।
৬৩। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—ছন্দসরস্বতী (১৩৭৪), পৃঃ ২, ১২-৩, ১৫, ১৭, ২৬-৯ ৪৩-৪৪, ৭৫।
৬৪। H. J. Gray—Dictionary of Physics (1958), p. 6.
৬৫। D. P. Raychowdhuri—Advanced Acoustics, pp. 159-165.
৬৬। H. D. Velankar—Bharata Kaumudi, Vol. II, pp. 1065-1072 ; 'Apabhramsa metres' in Journal of the University of Bombay, Nov. 1933, pp. 32-35 ; 'Metres and Music' in Poona Orientalist, 1943 ; ৩৮ সংখ্যা দ্রঃ ; 'Apabhramsa and Marathi metres' in New Indian Antiquary, Vol. I, 1938-39, p. 215.
৬৭। J. Vendryes—Language (4th Impression, 1952), p. 23.
৬৮। D. S. Mathur—Elements of Properties of Matter (1960), p. 1, Lord Kelvin-এর উক্তিটি এখানে উদ্ধৃত হয়েছে।
৬৯। K. Magnuson and F. Ryder—"The study of English prosody : An alternative proposal", in *College English*,

31 (1970) ; "Second thoughts on English Prosody", in *College English* 33 (1971).

৭০। A. C. Aitken—Determinants and Matrices (1956), pp. 1-4, 55-6.

*** অষ্টম অধ্যায় : ছন্দোমীমাংসা**

১। E. Hammar—The metres of English poetry (1930): Preface.

২। অনির্বাণ—বেদ মীমাংসা, ১ম খণ্ড (১৯৬১), পৃঃ ২২৪, পাদটীকা, ১৫। দ্রঃ—পৃঃ ২২২-২২৫।

৩। যোগীরাজ বসু—বেদের পরিচয় (১৯৭৫), পৃঃ ৬৫-৮, ৮৫-৬, ৯৭।

৪। প্রবোধচন্দ্র সেন—বাংলা ছন্দ চিন্তার ক্রমবিকাশ (১৯৭৮), পৃঃ ৮-২০, ১২৪-২৫, ১৩৫।

৫। প্রবোধচন্দ্র সেন—আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য (১৯৮০), পৃঃ ৩, ১০০-১০১।

৬। মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২), পৃঃ ৬৪।

৭। প্রবোধচন্দ্র সেন—ছন্দ পরিক্রমা (১৯৭৭), পৃঃ ৯-১০, ১৮৫-২৩০।

৮। R. T. H. Griffith—The Hymns of the Rigveda (1971), p. 226.

৯। K. C. Chatterji—Technical terms and technique of Sanskrit Grammar (1964), pp. 210, 217.

১০। W. S. Allen—Phonetics in ancient India (1953), pp. 20, 71-2, 74, 81.

১১। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৪২), পৃঃ ৩১, ৩৩-৫।

১২। মনীন্দ্রকুমার ঘোষ—বাংলা বানান (১৩৮৫), পৃঃ ৯০ : রাজশেখর বসুর চিঠি।

১৩। W. D. Whitney—Sanskrit Grammar (1962), Secs. 8-9, pp. 3-4, Sec. 79, pp. 27-8.

১৪। J. R. Firth—Sounds and Prosodies, pp. 6-8.

১৫। S. K. Chatterji—A Bengali Phonetic Reader (1928), p. 9.

১৬। মহম্মদ আব্দুল হাই—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৭৫), পৃঃ ১০৮-৯, ১১২-১৫, ১১৯-২০, ১৩৪, ১৩৯-৪৯, ১৫৩-৫৭, ১৭৪-৭৫; ভূমিকা, পৃঃ ১১, ২৭২-৮১।

১৭। W. D. Whitney—The Taittiriya Pratisakhya and Tribhasyaratna (1973) p. 401.

১৮। S. Varma—Critical studies in the phonetic observations of Indian Grammar (1961), pp. 56, 89, 183-4.

১৯। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়—বাঙ্গলা ভাষা প্রসঙ্গে (১৯৭৫), পৃঃ ৫২-৩, ৬০।

২০। J. Yarwood—Atomic Physics, II (1960), pp. 404-405.

২১। A. S. Eddington—The nature of the physical world (1948) p. 239.

২২। রবীন্দ্রনাথ—ছন্দ (১৯৭৬), পৃঃ ৫৪-৫, ৫৯-৬০, ৮৯-৯০, ৯৪, ১০২, ১১৬, ১১৮, ১২৫, ১৬৫, ১৮৭-৮, ১৯৩, ২৪৯।

২৩। A. C. Sen—Bengali Motor Phonetics pp. 50-51.

২৪। Rondet—Elements de Phonetique Générale, p. 231.

২৫। J. Vendryes—Language (1952), pp. 23, 59.

২৬। অনিল বিশ্বাস—'আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দ' ঃ পূর্বাশা, মাঘ, ১৩৫৬, পৃঃ ৭০৩-১০।

২৭। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—ছন্দ সরস্বতী (১৩৭৪), পৃঃ ১৭-৮। 'কত ঢেউয়ের ……টান' রবীন্দ্রনাথের "ক্ষণিকার" 'যৌবনবিদায়' নামক কবিতা হইতে উদ্ধৃত।

২৮। অনিল বিশ্বাস—'বাংলাছন্দ' ঃ কবিতা (আশ্বিন, ১৩৫৩) দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, পৃঃ ৭০-৭২।

২৯। রাজশেখর বসু—'বাংলাছন্দের শ্রেণী' ঃ পরশুরাম গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড), ১৩৮৫, পৃঃ ৩৯২-৯৬।

৩০। D. Abercrombie—Studies in Phonetics and Linguistics (1971), pp. 20-22.

৩১। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (১৯৬২); পৃঃ ৪৪-৬।

৩২। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—ছন্দ সরস্বতী (১৩৭৪), পৃঃ ৪০।

৩৩। Sri Aurobindo—Birth Centenary Library, vol. 5 "On quantitative metre", pp. 347, 352, 356-7.

৩৪। সুধীভূষণ ভট্টাচার্য—বাংলাছন্দ (১৩৬২), পৃঃ ৪৫-৫০।

৩৫। H. A. Gleason—An Introduction to Descriptive Linguistics (1970), pp. 40-50 : "English stress and intonation".

*** নবম অধ্যায় : ছন্দোব্যাকরণ**

১। René Wellek and Austin Warren—Theory of literature (1956), pp. 172, 175.

২। রবীন্দ্রনাথ—ছন্দ (১৯৭৬), পৃঃ ২৫০। রবীন্দ্রনাথ প্রবোধ চন্দ্র সেনকে লিখেছিলেন এ চিঠি : ১৯৩৪ সেপ্টেম্বর ২। আরো দ্রষ্টব্য : ১৪-৫, ১০২, ১২৭, ১৩৩, ১৪৮, ১৬৫, ১৮৪-৮৫, ১৮৭।

৩। প্রবোধ চন্দ্র সেন—ছন্দ পরিক্রমা (১৯৭৭), পৃঃ ৭, ৭০-৮১, ৮৫-১১৮, ১৩৩-৫০, ১৫৬-৬১।

৪। D. C. Sen—Vanga Sahitya Parichaya (1914), Part I, pp. 83-4, footnotes. J. D. Anderson-এর উক্তি উদ্ধৃতি হয়েছে পাদ টীকায়।

৫। দিলীপ কুমার রায়—ছান্দসিকী (১৩৪৭), পৃঃ ১৩৩-৫৩, ২২৬-৭।

৬। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—ভাষাপ্রকাশ বাঙ্গালা ব্যাকরণ (১৯৪২), পৃঃ ৩৬-৮, ৫৯-৬০।

৭। মুহম্মদ আব্দুল হাই—ধ্বনিবিজ্ঞান ও বাংলা ধ্বনিতত্ত্ব (১৯৭৫), পৃঃ ৭৬-৭, ১৫৩-৫৭।

৮। E. Kruisingha—A handbook of present-day English (Part I) : English Sounds (1925), pp. 41, 65.

৯। A. C. Sen—Bengali Motor phonetics (1949), p. 21.

১০। K. Shapiro—Essay on rime (1945) : Quoted in The Penguin Book of Modern American Verse, ed. G. Moore (1954), pp. 265-6.

১১। K. Shapiro—'The ratio of rime to language' : A New Anthology of Modern Poetry, ed. S. Rodman, p. 433.

১২। মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২), পৃঃ ৬৫, ১২৬-৪৫, ১৮০-৯০।

১৩। The Shorter Oxford Dictionary (3rd edn). Vol II, p. 2001.

১৪। V.S. Apte—The Student's Sanskrit English Dictionary (1979), p. 115.
১৫। James Ward—Psychological Principles (1918), p. 228.
১৬। D. W. Harding—Words into rhythem : English speech rhythm in verse and prose p. 15। এ হলো The Clark Lectures 1971-72 ; cf. pp. 19, 22, 24-5, 133, 139-41.
১৭। M. W. Croll—The rhythm of English verse (1929).
১৮। রবীন্দ্রনাথ—২ সংখ্যা দ্রঃ—পৃঃ ১০৬, ১২৩, ১৬১-১৬২, ১৬৭, ১৭০-৭১, ১৭৬, ২০৩-৪, ২০৭, ২১১, ২১৫, ২২৭, ২৩৪।
১৯। C. K. Munro—Watching a play (1933).
২০। James Jeans—Science and music (1961), pp. 22, 29, 37.
২১। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (১৯৬২), পৃঃ ১৬৮-৮৭, ২১৯-২৪।
২২। তারাপদ ভট্টাচার্য্য—ছন্দতত্ত্ব ও ছন্দোবিবর্তন (১৯৭১), পৃঃ ১২৮-৪৯।
২৩। প্রবোধচন্দ্র সেন—ছন্দোগুরু রবীন্দ্রনাথ (১৩৫২), পৃঃ ১৭২।
২৪। শ্রীম—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত (১৩৫৮) ঃ তৃতীয় ভাগ, পৃঃ ২১৮। এ শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি।
২৫। Aristotle—Rhetoric, III, 8 ; J. T. Shipley—Dictionary of World Literature (1943), pp. 454-55.
২৬। O. Elton—'English Prose Numbers' : Essays and Studies, Vol 4 (1913), ed. English Association.
২৭। Amulyadhan Mukhopadhyaya—The rhythm of Bengali prose and prose-verse : Journal of the Dept. of Letters (C.U), Vol XXXII (1939), pp. 1-79.
২৮। D. Abercrombie—Studies in phonetics and linguistics (1971), pp. 2-8.
২৯। D. S. Mac Coll—"Rhythm in English Verse, Prose and Speech" : Essays and Studies, Vol. V (1914), ed. English Association.
৩০। A. Preminger and others (ed)—Princeton Encyclopaedia of Poetry and Poetics (1975), pp. 288-90, 664-66, 884-85.
৩১। সুকুমার সেন—বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (২য় খণ্ড, ১৩৫০), পৃঃ ৩৫১, ৪৫৮।

৩২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়—বাংলা ছন্দ-সমীক্ষা, পৃঃ ৯৮।
৩৩। J. T. Shipley—Dictionary of World Literature (1943), pp. 612-13.

* দশম অধ্যায়ঃ বৈদেশিক ছন্দের রূপান্তর

১। Ezra Pound—Literary Essays. ed. T. S. Eliot (Faber), p. 25.
২। A. Preminger and others (ed)—Princeton Encyclopaedia of Poetry and Poetics (1975), pp. 65, 108, 174, 497-99, 781-84, 848.
৩। মোহিতলাল মজুমদার—বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২), পৃঃ ১৪৬-৬৭।
৪। প্রবোধ চন্দ্র সেন—ভারতাত্মা কবি কালিদাস (১৯৭৩), পৃঃ ৩১-৪৮।
৫। যোগীন্দ্রনাথ মজুমদার—মেঘদূত (১৩৭৫)। প্রবোধ চন্দ্র সেনের ভূমিকাটি মূল্যবান।
৬। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৪৯ কার্তিক, পৃঃ ২৫৭।
৭। অমূল্যধন মুখোপাধ্যায়—বাংলা ছন্দের মূলসূত্র (১৯৬২), পৃঃ ১৮৮-২০০, ২৪৩।
৮। মোহিতলাল মজুমদার—আধুনিক বাংলা কবিতার ছন্দ (১৩৫২), পৃঃ ৫৮।
৯। R. Bridges—Collected Essays (1933), Vol II : XI—'Studies in poetry', pp. 66-75.
১০। রবীন্দ্রনাথ—ছন্দ (৩য় সংস্করণ), পৃঃ ৩৮-৯, ২৮২-৯১।
১১। সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—রচনাবলী, ৩য় খণ্ড ঃ "বিদায় আরতি", পৃঃ ২৩৯।
১২। রবীন্দ্রনাথ—সঞ্চয়িতা (১৩৫৩) ঃ গীতাঞ্জলি, "ভারততীর্থ"।
১৩। নজরুল ইসলাম—রচনা সম্ভার (১৯৮১) ঃ ৩য় খণ্ড, পৃঃ ২৪৪-৪৭।
১৪। সুনির্মল বসু—ছন্দের টুং টাং (১৯৩০)। উদ্ধৃত হয়েছে "প্রবোধ চন্দ্র সেন—আধুনিক বাংলা ছন্দ-সাহিত্য" (১৯৮০)-এ, পৃঃ ২৫২।
১৫। রবীন্দ্রনাথ—'জাপানযাত্রী' (১৩২৬) ঃ রচনাবলী, ১৯শ খণ্ড, পৃঃ ৩৩৮-৩৯।
১৬। অনিল বিশ্বাস—বাঁকাজল (১৩৬৯) পৃঃ ৩১-২
১৭। J. T. Shipley—Dictionary of World Literature (1943), pp. 63-4, 520, 615.
১৮। J. T. Shipley—Encyclopaedia of Literature (1946), Vol I, pp. 545-46.

১৯। Ronald Barthes—Writing Degree Zero (1967).
২০। K. Shapiro and R. Beum—A prosody handbook (1965), pp. 2-7, 68-82, 146-52.
২১। দিলীপ কুমার রায়—'অনামী' (১৩৪০), পৃঃ ৩৬৬-৬৮, ৪০০-০২।
২২। প্রভাত মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—'অতি-আধুনিক কবিতা' ঃ কথাসাহিত্য (১৩৮৩ ফাল্গুন)।
২৩। প্রবোধ চন্দ্র সেন—'বাংলা ছন্দচিন্তার প্রগতি' ঃ দেবতোষ বসুর 'বাংলা ছন্দের প্রগতি' (১৩৮৫, বৈশাখ)-র 'ভূমিকা', পৃঃ ১১-৩১।
২৪। সজনী কান্ত দাস—আমি যাঁদের দেখেছি (১. ১২. '৬৬) ঃ পরিমল গোস্বামীর উক্তি।
২৫। F. Scarfe—'The Liberation of Poetry' : Auden and after (1944), p. 203.

II. পরিভাষা

পরিভাষা

A

Abdomen—কুক্ষি
Abdominal—কুক্ষীয়
Absolute—পরম
Absorption—শোষণ
Abutting—প্রান্তযোজক, সংযুক্তক
Acceleration—ত্বরণ
Accent—প্রস্বন
Accented—প্রস্বনিত
Accentuation—প্রস্বনন
Acoustic—শ্রৌত, শ্রুতিমূলক
Acoustics—স্বনবিদ্যা
Acoustic energy—শব্দশক্তি
—phonetics—শাব্দ ধ্বনিতত্ত্ব বিজ্ঞান
—recorder—শাব্দ অভিলেখক
Action potential—ক্রিয়া বিভব
Actual—প্রকৃত, যথার্থ, বাস্তব
Acute—উদাত্ত, তীব্র,
Adapted—অভিযোজিত
Adaptive—প্রতিযোগ্য
Adjustment—সমন্বয়ন
Ad libitum—খুশি মতো
Aerodynamic phase—বায়ুসচল দশা
affricate / Affricative — ঘৃষ্ট
Airblast—বায়ুবেগ
Air medium—বায়ু মাধ্যম
Air stream—বায়ু প্রবাহ
Algorithm—আল্‌গরিদ্‌ম্‌
Aloga—অ-বাক্‌
Allophone—সহধ্বনি, সহস্বন
Alphabet—বর্ণমালা
Alphabetic—বর্ণমালিক
Alpha particle—আল্ফা কনিকা
Alternate—একান্তর
Alveoli—দন্তমূল
Alveolar retroflexed—দন্ত মূলীয় মূর্ধণ্য
Amplifier—বিবর্ধক
Amplitude—বিস্তার
Analogia—সাদৃশ্য
Analogue—প্রতিরূপ
Anatomy—শারীর স্থান
Anticipation—পূর্বানুমান
Anti-resonance—অননুনাদ, অননুরণণ
Anvil—নেহাই
Aperiodic—অপর্যাবৃত্ত, পর্যাবৃত্তিহীন
Apheresis—আদিস্বর লোপ
Apocope—অন্তস্বর লোপ
Applied force—প্রযুক্ত বল
Approach—প্রবেশ পথ
Approximant—সন্নিকৃষ্ট
Areal coordinates—ক্ষেত্র স্থানাঙ্ক
Arrest—অবরোধ
Arresting—রোধক
Articulation—উচ্চারণ

Articulatory closure—উচ্চারণীয় সংবার
—Organ—উচ্চারক প্রত্যঙ্গ
—phonetics— উচ্চার্য ধ্বনি বিজ্ঞান
—system—উচ্চারণতন্ত্র
As a rule—সাধারণত
Ascending Scale—ঊর্ধগমান
Aspirate—মহাপ্রাণ
Aspirated—মহাপ্রাণিত
Aspiration—মহাপ্রাণণ
Assumption—অঙ্গীকার
Asymmetry—প্রতিসাম্য
Asymmetrical—অসমমিত
At least—নিদেনপক্ষে
At right angle—সমকৌণিক
Audible—শ্রাব্য, শ্রব্য
Audito-kinaesthetic—শ্রুতিসঞ্চালিত
Auditory—শ্রৌত, শ্রাবণ
—Canal or meatus—শ্রুতিনালিকা
—Cortex—বহিঃস্তর
—phonetics—শ্রৌত বিজ্ঞান
Automation—স্বয়ংক্রিয়তা
Axis of curve—বক্রাক্ষ
Axon—স্নায়ু-উপাঙ্গ

B

Babble—অস্ফুট ধ্বনি
Back excursion—পিছট বিহার
—stroke—বিস্পন্দ, পিছট ঘা
Ballistic movement—ক্ষেপক বিচলন
—chest pulse—ক্ষেপক উরসস্পন্দ
Band—পটি
—of nerve tissue—স্নায়ু কলপটি
Base of the skull—করোটি ভূমি
Bar—দণ্ড
Bass —নিম্নতম পুরুষ কণ্ঠ
Beam of light—কিরণ পুঞ্জ
Beat—তাড়ন, বিস্পন্দ
—excursion—তাড়ন বিহার
—stroke—তাড়ন ঘা
Beating note—তাড়ন স্বর
Bellows—হাফর
Bending—বংকণ
Brain—মস্তিষ্ক
Breathed release—অঘোষ মোচন
Breath group—শ্বাসমেল
Breathy voice—শ্বাস ধ্বনি
Brightness—দ্যুতি
Brouchoscope—ক্রমশাখা দর্শী
Bumping—উত্তলন
Bundle—গুচ্ছ
Buzz—গুণগুণানি
Buzzing sound—গুণ্‌ গুণ্‌ ধ্বনি

C

Calculation—গণনা, হিসাব
Calibrated—অংশাঙ্কিত
Carbon dioxide—অঙ্গারিক দ্বাক্সাইড
Cardinal vowel—মূল স্বরধ্বনি
Cartesian coordinates—কার্ত্তেসীয় স্থানাঙ্ক

Cartilage—কোমলাস্থি
Cavity—বিবর, গুহিকা
Chain of three ossicles—
 ত্র্যাস্থিকাশৃঙ্খল
Chain reaction—শৃঙ্খল বিক্রিয়া
Cheiro-Kinaesthetic—হস্ত
 সঞ্চালিত
Chest pulse—উরসস্পন্দ, বক্ষস্পন্দ
Chord—স্বর মেল
 —major—গুরু স্বরমেল
 —minor—লঘু স্বরমেল
Chosen—বৃত
Chroneme—কালমান
Circuit—বর্তনী
 —difference—অবকলন বর্তনী
 —integration—সমাকলন
 বর্তনী
Click—শীৎকার
Classical—ধ্রুপদী
Clause—বাক্যাংশ
 —terminal—অন্ত্য বাক্যাংশ
Closed syllable—বদ্ধাক্ষর
Closure—সংবার
Clue—সংকেত, খেই বা সূত্র
Cochlea—কুণ্ডলিকা
Cochlear potential—কুণ্ডলীয়
 বিভব
Coiled—কুণ্ডলীকৃত
Coincidence—সমাপতন
Collinear—এক রেখীয়
Commencing—সূচক
Communication system—
 সমাযোজন তন্ত্র
Co-ordinates—স্থানাঙ্ক
Composite spectrum—
 মিশ্রবর্ণালী
Compound—যৌগ
—couplet—যৌগ যুগল
Compressed—সংনমিত
Compressive—সংনমনশীল
Compression—সংনমন
Concept—প্রত্যয়, ধারণা
Conceptualist—ধারণাবাদী
Concomitant—সহগামী
Concord—সঙ্গতি
Condensation—ঘনীভবন
Conduction—পরিবহণ
Cone—শঙ্কু
Configuration—বিন্যাস, বিগ্রহ
Conical shape—শঙ্কুরূপ
Conjunct letter—যুক্তবর্ণ
 —sound—যুক্তধ্বনি
Connective tissue—যোগকলা
Consonant—ব্যঞ্জন, সঙ্গত
 —cluster—যুগ্ম ব্যঞ্জন ধ্বনি
Consonantal weight—ব্যঞ্জনভার
Consonance—স্বরসঙ্গতি
Consonantoid—ব্যঞ্জনকল্প
Constant—নিত্য ধ্রুবক
Constituent partial tone—
 গীতিস্বরের অবয়ব সুর
Constriction—সংকীর্ণণ
Constricting—সংকীর্ণণী
Construct—গঠন
Context—প্রকরণ, প্রসঙ্গ
Continuant—প্রলম্বিত, প্রলম্বক

Continuous—সন্তত, অনবচ্ছেদ
Contralto—নিম্নতম নারীকণ্ঠ
Contrast—বৈসাদৃশ্য, তারতম্য
Control—নিয়ন্ত্রণ
Controlled movement—
নিয়ন্ত্রিত বিচলন
Conventionalisation—
প্রচলীকরণ
Convolution—কুণ্ডলী
Correlate—অনুবন্ধী
Correlation—নিত্যসম্পর্ক, সহসম্পর্ক
Correspondence—প্রতিবঙ্গ
Cortex—বহিঃস্তর (মস্তিষ্কের)
Counterpart—প্রত্যংশ
Cracking—স্বরভঙ্গ
Crank—বক্রমার্গ
Creative function—সৃজনীবৃত্তি
Cricoid—(n) বলয়, (adj) বর্তুল
Critical—ক্রান্তিক, ক্রান্তীয়
Cross-section—অনুপ্রস্থছেদ
Crucial—বিনিশ্চায়ক
Culminative—চূড়ায়মান
Cycle—চক্র, চক্কর
—complete—পূর্ণচক্র
Cylindrical—বেলনীয়

D

Damped—অবমন্দিত
Damping force—অবমন্দন বল
Decibel meter—ডেসিবেল মিটার
Defined—সংজ্ঞিত
Deflation—অবসার
Deforming force—বিকৃতি কারক বল
Dento lingual—দন্ত জিহ্বা মূলীয়
Detectable—অবেক্ষণীয়
Determinant—নির্ণায়ক, ছক
Determinative সীমা নির্ধারক
Diaphragm—মধ্যচ্ছদা
—rectus abdominis musculative—মধ্যচ্ছদা ঋজু-উদরীয় পেশীতন্ত্র
Diatonic—সপ্তসুর
Dichotomy—দ্বিধা বিভাজন
Difference—ভেদ
—tone—বিয়োজিত সুর
Differentiation Circuit—
অবকলন বর্তনী
Dimension—মাত্রা, আয়তন
Diphthong—দ্বিস্বর
Directional—দিশাত্মক
Discharge—ক্ষরণ
Discontinuity—ছেদ
Discord—বিসঙ্গতি
Discrimination—বিনিশ্চয়
Displacement—সরণ, স্থানচ্যুতি
Distraction—বিক্ষেপ
Divisible—বিভাজ্য
Doctrine of letters—বর্ণবাদ,
হরফ বাদ
Dome-shaped—কুম্ভাকৃতি
Double—যুগ্ম
—reed—দুনীনল
Doubling—দ্বিত্বীকরণ
Drainage tube—পরিবাহ নালী
Duration—ব্যাপ্তি, স্থিতিকাল
—quantum—স্থিতিমাত্রা

Dynamic displacement—গতীয় স্থানচ্যুতি

E

Ear drum—কর্ণপটহ

—training—কর্ণ প্রশিক্ষণ

Egressive lung air—নিষ্ক্রমণশীল ফুস্‌ফুসীয় বায়ু

Ejective—বহিষ্করণীয়

Elastic—স্থিতিস্থাপক

Electric impulse—তড়িতাঘাত

Electro-acoustical-optical converter—তড়িৎ-শব্দালো-পরিবর্তক

Electro-chemical—তড়িৎ-রাসায়নিক

Electro-myography—তড়িৎ-পেশীলেখ

Emphasis—জোর

Endolymph—অন্তঃর্লসিকা

Ending—সংহারণ

Energy—প্রৈতি

Entropy—এনট্রপি

Envelope—আচ্ছাদন

Epiglottis—অধিজিহ্বা, আল্‌জিভ্‌

Epoch—আদি যুগ

Equally spaced—সমস্থানিক

Equivalent—সমতুল্য

Essential—অপরিহার্য

Eustacian tube—ইউস্টেকীয় নালী

Exact—সঠিক

Excursion—বিহার

Expectancy—প্রত্যাশা

Expiration—নিঃশ্বাস

Explicit—স্পষ্ট

Explosion—বিস্ফোরণ

Extralong—প্লুত

F

Faculty of speech—বাক্‌শক্তি

Factor—কারক

Fading—ক্ষীয়মান

Feature rate of articulation—উচ্চারণের লাক্ষণিক হার

Feedback—পুনর্নিবেশন, প্রত্যাবৃত্ত পুষ্টি

—mechanism—পুনর্নিবিষ্ট ক্রিয়াবিধি

Figure—চিত্র

Filtering—পরিস্রুত

Fingerprint—অঙ্গুলাঙ্ক

Fissure—ফাটল

Fixed—বদ্ধ

—pitch theory—বদ্ধপ্রস্বরবাদ

Flap—তাড়ন

Flapped—তাড়ন জাত

Fluctuation—উচ্চাবচন

Forced—প্রণোদিত

Force transformation ratio—বল পরিবর্তনাংক

Foot—পর্ব, পদমিতি

Format—প্রস্বরাবয়ব

Form stress—বাচ্য প্রচাপ

Fortis—দৃঢ়, প্রবল

Forwarding function—প্রেরক বৃত্তি

Fourier analysis—ফুরিয়ে বিশ্লেষণ
Frame of reference—নির্দেশ কাঠামো
Frequency—স্পন্দাংক, কম্পাংক
—band কম্পাংক পটি
—range—কম্পাংক পরিসর
—variation—স্পন্দাংক পরিবৃত্তি
Fricative—ঘৃষ্ট
Friction—ঘর্ষণ
Function—ফলন
Functional—কার্মিক
Fundamental frequency—মূল কম্পাংক
Fusion—সংলাগ

G

Gamma radiation—গামাবিকিরণ
Generator—জনিত্র
Gennetically—ফলের দিক থেকে
Genus—বর্গ, গণ
Geochronometry—স্থান কাল মিতি
Geometrical progression—গুণোত্তর প্রগতি
Glandular—গ্রন্থিল
Glide—শ্রুতি
Gliding change—শ্রুতি পরিবর্তন
Gloss-Kinaesthic—জিভ্ সঞ্চালিত
Glottal—কণ্ঠনালিক
Glottis—শ্বাসরন্ধ্র
Grapheme—লেখমান, লেখচিত্র
Grave—অনুদাত্ত
Grouping of syllables—অক্ষর মেল

H

Hair Cell—কেশকোষ
Half width—অর্ধপ্রস্থ
Hammer—হাতুড়ি
Handle—হাতল
Harmonic—(n) সুরগুণিতক, সঙ্গত, উপসুর
(adj)—সমঞ্জস, সুসঙ্গত
—analyser—সমঞ্জস বিশ্লেষক
—motion—ভাজিত গতি
—simple (S. H. M)—সরল ভাজিতগতি
—partial—সুরগুণিতক স্বরাংশ
—series—বিপরীত শ্রেণী
Harmony—সুরগুণিতক, সঙ্গৎ
Hearer—শ্রোতা
Hearing—শ্রবণ
—function—শ্রাবণকৃত্তি
—process—শ্রাবণ প্রক্রিয়া
Heliotreme—কুণ্ডলান্তিকা
Hierarchy—স্তরক্রম
Hiss—ফোঁস ফোঁসানি
Horse power—অশ্বশক্তি
Hue—বর্ণালি
Hyoid unit—U-আকৃতির অস্থি একক
Hypothesis—প্রকল্প

I

Ictus—ছন্দাঘাত

—weight—সংঘাত ভার
Ideation—ভাবনা
Ideogram—ভাবলিপি
Image—প্রতিরূপ
Imageless awareness—বিমূর্ত বোধ
Immanent—পরিব্যাপ্ত
Impedance matching transformer—প্রতিবাধা উপযোগী পরিবর্তিত্র
Implicit form—অস্পষ্টরূপ
Implosion—অভিনিধান, আস্ফোরণ
Impressed—প্রযুক্ত
Impulses—ঘাত গুচ্ছ
Impulsive—ঘাত সূচক
Incident—আপতিত
Indicator—সূচক
Induced—আবিষ্ট
Inflation—উৎসার
Inferiorly—অধরিকভাবে
Infraglottal—অবশ্বাসরন্ধ্রীয়
Ingressive lung air—ফুস্‌ফুস্ প্রবেশক বায়ু
Inharmonic overtone—অসমঞ্জস অধিসুর, সুরগুণিতক রোধী
Initiation—উদ্বোধন
Initiator—উদ্বোধক
Innervation—স্নায়ু-সঞ্চারণ
Input—নিবেশ
Inspiration—প্রশ্বাস
Instantaneous—তাৎক্ষণিক
Integer—পূর্ণসংখ্যা
Integral multiples—বহু সমাকল
Integration circuit—সমাকল বর্তনী
Intellectualised—বুদ্ধীকৃত
Intelligilibity—বোধগম্যতা
Intended duration—ঈপ্সিত কাল
Intensity—তীব্রতা, তীগ্মতা
In tension—টানগ্রস্ত, বিতত
Interaction—মিথষ্ক্রিয়া
Interrupted surface—রুদ্ধপৃষ্ঠ
Intercostals—মধ্যপাঁজর
Interference—ব্যতিকরণ
Intermittent—সবিরাম
Inter phenomenon—মধ্যপ্রপঞ্চ
Intervocalic—আন্তঃস্বরীয়
Intonation—স্বরভঙ্গি
Intrasyllabic—আন্তরাক্ষরিক
Intuitive reaction—স্বজ্ঞাত প্রতিক্রিয়া
In unision—সমমেলস্থ
Inverse—বিপরীত মুখী
Inversely proportional—ব্যস্তানুপাতিক
Involuntary—অনৈচ্ছিক
Isochronous—সমকালীন
Isodynamism—সমগতীয়তা

J

Jaw movement—হনু বিচলন
Just noticeable difference (JND)—শুধুই লক্ষণীয় বিভেদ (শু, ল, বি)
Juxtaposition—সন্নিধি

K

Kinaesthetic—সঞ্চালক
Kinetic energy—গতীয় শক্তি
—(moving) stress— গতীয় বা চলমান প্রচাপ
Kymogrph—তরঙ্গ লেখ
—recording—তরঙ্গ মাপনী অভিলেখ

L

Labio-dental দন্তৌষ্ঠ
Labio-Velarization—পশ্চ জিহ্বোর্ধ্বী ভবন
Language—ভাষা
Langue—বানী
Laryngael—স্বর যন্ত্রীয়
Laryngoscope—স্বরযন্ত্রদর্পণ
Larynx—স্বরযন্ত্র
Laws of Conservation of energy and momentum —শক্তি ও ভরবেগ সংরক্ষণ সূত্রাবলী
Lenis—কোমল, দুর্বল
Length—দৈর্ঘ্য
Letter—বর্ণ, হরফ
—doctrine of—বর্ণবাদ
Level or static stress—চৌরস বা স্থিতীয় প্রচাপ
Light house—বাতিঘর
Liquid—তরল
Linear function—রৈখিক ফলন
Line-end marker—চরণান্ত নির্দেশক
Linking—সংযোজক
Lip movement—ওষ্ঠ্য বিচলন
Listening—কর্ণপাত
Longitudinal—অনুদৈর্ঘ্য
Logos—বাক্‌, যুক্তি
Lope—পালি
Loudness—প্রাবল্য
—level—প্রাবল্যস্তর
Lowest Common multiple—লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক
Lumbar vertebrae—কটিক-শেরুকা

M

Macro-chronic—দীর্ঘকালীন
Maintainable—পোষণীয়
Maintained—পোষিত
Matrix—ধাত্র
Mean—মধ্যক
—level—স্তরমধ্যক
Measure—মাপ, মাপনী
Mechanism—যন্ত্রকৌশল
Mel—মেল
Melody—সুতান, রাগ, সুস্বর
Membrane—ঝিল্লী
Membraneous reed—বিল্লীময়পত্রী
Metre—স্পন্দমিতি, ছন্দ, মাত্রাবন্ধ
Metrical—ছন্দোবদ্ধ, ছন্দোমাত্রিক
Metrics—ছন্দোবিজ্ঞান, মাত্রাতত্ত্ব
Metronome—মাত্রামান
Micro-chronic—অনুকালীন
—structure—অনুগড়ন
Minimum—অবম, নিম্নতম
Modulated—মর্চ্ছিত

Modulation—মডুলন
Momentary—অস্থায়ী, ক্ষণিক
Moneme—একমান
Monitoring—পরিধারণ
Morpheme—রূপমান
Morphemic—রূপমানীয়
Motor context—সঞ্চালক প্রসঙ্গ
—unit—সঞ্চালক একক
Movement—বিচলন
—of fixation—বদ্ধ বিচলন
—complex—বিচলনজট
—of the thorax—বক্ষ বিচলন
Multiple—গুণিতক
Musculative—পেশীতন্ত্র
Musical—গীতল
—colour—গীতবর্ণ
—interval—স্বরান্তরাল
—note—সু স্বর
—scale—স্বরগ্রাম
Mute—অঘোষ
Mutilated—কর্তিত
Myo-dynamic performance—পেশীসচল সম্পাদন বা কৃতি
Myo-elastic—পেশী নমনীয়
Myso-motor—পেশী সঞ্চালক

N

Nasal—নাসিক্য
Natural—স্বাভাবিক
Nearly incompressible—অসংনম্যপ্রায়
Negative—নেতিবাচক, ঋণাত্মক
Nerve—স্নায়ু
—cell—স্নায়ুকোষ
—impulse—স্নায়ুঘাত
Nervous pathway—স্নায়ুপথ
Net work—জালিক
Neuro-linguistic programming—স্নায়ু ভাষাতাত্ত্বিক কার্যক্রম
Neuro-muscular—স্নায়ু পেশীয়
Neutron—স্নায়ু কোষঙ্গণ
Noise—রব, অপস্বর
Noise-meter—রবমাপনী
Nomen—নাম
Nominalist—নামবাদী
Non-aspirate—অল্পপ্রাণ
Non-linear vibrator—অরৈখিক কম্পক
Non-syllabic—অনাক্ষরিক
Note—স্বর
Nuclear reaction—নিউক্লিয় বিক্রিয়া
Nucleus—মূলাধার, কেন্দ্রক
Numerically—সংখ্যাগতভাবে

O

Oblique—তির্যক
Occlusion—অন্তধৃ'তি
Occlusive—স্পর্শধ্বনি
Octave—সপ্তক
Omission—লোপ
One-breath articulation—একপ্রয়াসী উচ্চারণ
On and off switching of voicing—ঘোষীভবনের প্রারম্ভ ও শেষ

Ontological—তত্ত্ববিদ্যক
Open approximation—স্থূলমান
—syllable—যুক্তাক্ষর
Operational fiction—সংকারক ভাণ
Oral mechanism—মৌখিক ক্রিয়াবিধি
Orchestra—বাদিত্র স্থান
Organic-Aerodynamic—প্রত্যঙ্গীয়-বায়ুসচল
Orifice—রন্ধ্র
Orthography—বর্ণবিন্যাস
Oscillation—দোলন
Oscillograph—দোলন লিখ
Ossicle—অস্থিকা
Oval—ডিম্বল
Overlap—প্রাবরণ
Overtone—অধিসুর

P

Palatilization—তালব্যীকরণ
Parallel—সমান্তরাল
Parallalism—সমান্তরতা
Paradigmatic—পদ প্রকরণিক
Paradoxical—কূটাভাস মূলীয়
Parameter—পরিমাত্রা
Parametric Artificial Talker—পরিমাত্রিক নকল কথক (প.ন.ক)
Parole—বচন্
Partial—স্বরাংশ
—upper—উচ্চতর স্বরাংশ
Pattern—ধাঁচ,পরিপাটি
Percept—প্রত্যক্ষ
Perception—প্রত্যক্ষণ
Pelvis—শ্রোণীচক্র
Performer—রূপকার, অভিনেতা, সম্পাদক
Perlump—পরিলসিকা
Period—পর্যায়
Periodic alternation—পর্যাবৃত্ত একান্তরণ
—motion—পর্যাবৃত্ত গতি
—time—পর্যাবৃত্ত কাল
Periodicity—পর্যাবৃত্তি
Period of function—ফলনের কালপর্যার
Pharyngeal mechanism—গলনালীয় গতিবিধি
Pharynx—গলবিল
Phase angle—দশা কোণ
Phonation—স্বনন
—breath—শ্বাস স্বনন
—nill—শূন্য স্বনন
Phonatory function—স্বননবৃত্তি
—type control—স্বননজাতীয় নিয়ন্ত্রণ
—system—স্বনতন্ত্র
Phon—ফোন
Phone—স্বন, স্বর
Phoneme—স্বনমান
Phonemic—স্বনমানীয়
Phoneme-representing segment—স্বনমাণক বাগংশ
Phonetic empathy—ধ্বনিক সমানুভূতি
—transcription—ধ্বনিক প্রতিলিপ

Phonetics—ধ্বনি বিজ্ঞান
Phonogram—ধ্বনিলিপি
Phonograph—স্বনলেখ
Phonology—ধ্বনিতত্ত্ব
Physical—ভৌত
Physiological—শারীর বৃত্তীয়
Physiology—শারীর বৃত্ত
Phrasal movement—বাগাংশিক বিচলন
Phrase—বাগংশ
Phrased—বাগংশিত
Phrasing—বাগংশায়ণ
Pictogram—চিত্রলিপি
Picture writing—চিত্রলেখ
Piece-wise regular—খণ্ডশ নিয়মিত
Piezo-electric effect—চাপবৈদ্যুত ক্রিয়া
Pinna—কর্ণপত্রক
Pitch—প্রস্বর, মীড়, স্বরতীক্ষ্ণতা
—high—উদাত্ত (acute)
—interval—প্রস্বরান্তরাল
—low—অনুদাত্ত (grave)
—level—স্বরিত (circumflex)
Pleura—প্লুরা
Plosion—স্পর্শন
Plotted—চিহ্নিত
Plus or minus atmospheric pressure—যুক্ত বা বিযুক্ত বায়ুচাপ
Preumatic tube—গ্যাসদ্রোণী
Positive—ইতিবাচক, ধনাত্মক
Potential energy—স্থিতি শক্তি
Potestas—শক্তি, ক্ষমতা
Precision—যথাযথতা, স্পষ্টতা
Pressure equalizer—চাপ তুল্য কারক
—initiated—চাপ উদ্বুদ্ধ
Prismatic—প্রিস্মীয়, স্তম্ভাকার
Process—প্রক্রিয়া
Projection—অভিক্ষেপ
Projective Geometry—প্রক্ষেপ জ্যামিতি
Prominence—প্রাধান্য, গুরুত্ব
Propagation—বিস্তারণ
Proper—নিজস্ব
Property—ধর্ম
Prosody—ছন্দোবিজ্ঞান, ছন্দোবিচিতি
Proviso—অনুবিধি
Psychological Corrolate—মনস্তাত্ত্বিক অনুবন্ধী
Punctuation—যতিবিধান
Puff—দমক
Pulmonic mechanism—ফুস্‌ফুসীয় ক্রিয়া বিধি
Pulsation—স্পন্দন
Pulse-like—স্পন্দ কল্প
Pulse of breath—শ্বাস স্পন্দ
Pulse-reinforcing—স্পন্দ পোষক
Pure tone—বিশুদ্ধসুর

Q

Quality—গুণ
Quantity—মাত্রা, পরিমাণ
Quantum—পরিমাণ, কোয়াণ্টাম

Quasi-steady state—স্থিরকল্প অবস্থা

R

Radio—বেতার
Range—পাল্লা
Rapid speech—ত্বরিৎ বাক্
Rarefaction—তনূভবন
Rarefied—তনূকৃত
Rate of utterance—উক্তিহার
Rational ratio—মূলদ অনুপাত
Realist—বাস্তববাদী
Rebound—প্রতিক্ষিপ্ত হওয়া
Recognition—প্রত্যভিজ্ঞা
Recording—অভিলেখন
Rectifier—দিষ্টকারক
Rectus abdominis—ঋজু কুক্ষি
Reduction—ন্যূনীকরণ
Reference level—নির্দেশস্তর
Reflected wave—প্রতিফলিত তরঙ্গ
Refractory—দুর্গল
Register—নিবন্ধন
—chest—বক্ষ নিবন্ধন
—head—শির নিবন্ধন
Re-inforced—বলবৎকৃত, বলবত্তরিত
Re-inforcement—বলবত্তরণ
Relaxation—শ্লথন
Release—মোচন, মোক্ষ
Releasing—মোচক
Repetition—পুনবৃত্তি
Resistance—রোধ
—constant—রোধ ধ্রুবক
Resisted—প্রতিরুদ্ধ
Resolving power—বিভেদন ক্ষমতা, বিশ্লেষনী ক্ষমতা
Resonance chamber—অনুনাদ প্রকোষ্ঠ
—theory—অনুনাদবাদ
Resonant—অনুনাদী
Resonator—অনুনাদক
Resonatory—অনুরণনশীল, অনুনাদশীল
Respiration—শ্বসন
Respiratory activity—শ্বসন ক্রিয়া
—system—শ্বাসতন্ত্র
Response—সাড়া, প্রতিক্রিয়া
Rest-breathing—বিরাম-শ্বসন
Restoration—প্রত্যানয়ন
Restoring force—প্রত্যানয়ক বল
Restrospectively—ভূতাপেক্ষভাবে
Resultant—লব্ধ
Retarding force—প্রতিবন্ধী বল
Retinue—অনুচরবর্গ
Revolution—আবর্তন
Rhetoric—অলংকার
Rhythm—স্পন্দ
Rhythmic group—স্পন্দমেল
Rhythmicon—স্পন্দ শিক্ষক
Rib-Cage—পাঁজর পিঞ্জর
Ripple—লহরী
Rising—উদীয়মান
Round—বর্তুল
Root mean square—বর্গমাধ্যমূল

S

Saw-tooth wave—করাতদন্তীতরঙ্গ
Scala tympani—ঢাক খোলক
Scala Vestibuli—দেউড়ি খোলক
Sea level—সাগরাঙ্ক
Selective—বরণাত্মক
Self-combination tone—স্বযোজিত সুর
Semi-vowel—অর্ধস্বর
Sensation—বেদন
—of hearing—শ্রাবণ সুবেদিতা
Sensibility—বেদিতা
Sensitive—সুবেদী
Sensory—সংবেদজ
—input সংবেদ প্রসম্ভার
Sequence—অনুক্রম
Sequential circulation—ক্রমিক উচ্চারণ
Series—শ্রেণী
—of notes—স্বরক্রম
Shimmer—ঝিকিমিকি
Sign—চিহ্ন
Significant—সংকেতবাহক
Signified—সংকেতিত
Silence—মৌন, নৈঃশব্দ্য
Silent—মৌনী, নির্বাক
—breath—মৌন শ্বাস
—stress pulse—মৌন প্রচাপস্পন্দ (অনুচ্চারিত)
Simple harmonic motion—সরল সমঞ্জস দোলন
Single valued function—একমানী অপেক্ষক বা ফলন
Sinus—অস্থীয় কোটর
Sinusoid—সাইনবক্র
Sinusoidal vibration—সাইন-বক্রীয় স্পন্দন
Sliding—বিসর্পন
Slit—রেখাছিদ্র
Softness—কোমলতা
Sone—সোন
Sonant—সংঘোষ, অনুনাদশীল
Sonorous—অনুরণনশীল, অনুনাদী
Sound—ধ্বনি
—board—নাদপট
—continuum—স্বনসন্ততি
—curve—ধ্বনিচক্র
—image—শব্দে প্রতিরূপ
—intensity—স্বনতীব্রতা
—pressure —স্বনচাপ
—proof—ধ্বনিরোধী
—quality—ধ্বনিগুন
—spectrograph—ধ্বনি বর্ণালী লেখী
—spectroscope—ধ্বনি বর্ণালি দর্শী
—variation—ধ্বনি পরিবৃত্তি
Species—প্রজাতি
Spectral pattern—বর্ণালি ছাঁদ
Spectrogram—বর্ণালি চিত্র
Spectrum—বর্ণালি
Speech—বাক্
Speech-Circuit—বাগ্বর্তণী
—sound—বাগধ্বনি
Spinal Cord—সুষুম্না কাণ্ড
Spindle—টাকু

Spread—প্রসার
Spring factor (restoring force)—প্রত্যানয়কাংশ
Stability—সুস্থিতি
Standard—মানক
Standardised—প্রমিত
Static—স্থৈতিক
Steady—অপরিবর্ত্তী, স্থির
Sternum—উরঃফলক
Stimulus-response—উদ্দীপক সাড়া
Stirrup—পাদানি
Stopped release—স্পৃষ্ট মোচন
Strain—তিতি, বিকৃতি
Strength—সামর্থ্য, মাত্রা
Strengthened—বলবর্ধিত
Stress—প্রচাপ, বল
—group—প্রচাপ মেল
—process—বল প্রক্রিয়া
—producing—বলোৎপাদক
—pulse—বলস্পন্দ
—timed—চাপবৃত্ত, প্রচাপ-কালিক
Stressed—প্রচাপিত
—string—বিতত তার
Stringed instrument—ততযন্ত্র
Stromene—চাপমান
Structure—সংযুতি
Suction—চোষণ
Summation—সমাহার
—tone—যোজিতস্বর
Superimposed configuration—উপরিপাতিত বিন্যাস
Superposition—উপরিপাত
Supraglottal—অতিশ্বাসরন্ধ্রীয়
—laryngeal—অতিস্বর যন্ত্রীয়
—segmental—খণ্ডাতিগ, ছান্দসিক
Surd—অঘোষ
Surface—পৃষ্ঠ
—away from the—পৃষ্ঠাতিগ
—to the—পৃষ্ঠানুগ
Sustained—পোষিত
Syllabary—অক্ষরমালা
Syllabic—আক্ষরিক
Syllabication—অক্ষরীকরণ
Syllable—অক্ষর
—back stroke—অক্ষর পিছট
—beat stroke—অক্ষরতাড়ন বা বিস্পন্দ
—closed—বদ্ধাক্ষর
—open—মুক্তাক্ষর
—producing—অক্ষরোৎপাদক
—pulse—অক্ষর স্পন্দ
—process—অক্ষর স্পন্দ প্রক্রিয়া
—timed—অক্ষর বৃত্ত, অক্ষরকালিক
Symbol—প্রতীক
Sympathetic—সমবেদী
Symmetrical—প্রতিসম
Symmetry—সাম্মিতি
Syncope—স্বরলোপ
Synchronous—সমকালীন
Syntagmatic—বাক্ প্রবাহ ক্রমিক
Syntax—বাক্য রীতি
Systematics—রীতিবদ্ধতা

T

Table—সারণী
Tactile—স্পর্শযোগ্য, স্পর্শক্ষম
Tamper—ধ্বনির রূপ, কণ্ঠস্বর
Tape-recording—ফিতালী শব্দ গ্রহণ
Tapering—শুণ্ডায়মান
Tectorial membrane—ঝিল্লী আবরণ
Telecontrol—দূরনিয়ন্ত্রণ
Telephone—দূরভাষ
Tempo—দ্রুতি, লয়
Tenor—উচ্চতম পুরুষ কণ্ঠ
—voice—তারস্বর
Tension—টান
Terseness—কাঠিন্য
Tetanic—ধনুষ্টঙ্কারী
Texture—গ্রথন
Theorem—উপপাদ্য
Thoracic—বক্ষীয়
—cavity—বক্ষবিবর
—movement—বক্ষবিচলন
Threshold audibility—শ্রুতিসীমা, শ্রাব্যতাসীমা
—intensity—সূচক তীক্ষ্ণতা
Thus defined—এবং সংজ্ঞিত
Timbre—উপস্বন, স্বরবৈশিষ্ট্য
Time axis—কালাক্ষ
Tissue—কলা
To and fro—আগু-পিছু
Tone—সুর
Toneme—সুরমান
Tonetics—স্বরবিজ্ঞান
Tongue-body movement—জিভ্ শরীর বিচলন
Tongue-tip movement—জিহ্বাগ্র বিচলন
Tonic—প্রারম্ভসুর
—theory—স্বরতত্ত্ব
Trace—অনুরেখ
Trachea—শ্বাসনালী
Tracheotomised—শ্বাসনালী কর্তিত
Transcendent—তুরীয়, অতীন্দ্রিয়
Transformer—পরিবর্তিত্র
Transient—ক্ষণস্থায়ী
Transitive—সঞ্চালী
Transverse—অনুপ্রস্থ
Travelling wave theory—প্রগামী তরঙ্গবাদ
Treble—তেহাই
Triad—ত্রিক
Tune—সুর
Tuning fork—স্বনমূল
Turbulent—অনিয়ত
Two-dimensional—দ্বিমাত্রিক

U

Ultrasonic—শ্রবণাতীত
Unexploded closure—অস্ফোট সংবার
Undiminished—অন্যূনীকৃত
Unpredictable interference—অপ্রত্যাশিত ব্যতিচার
Unsymmetrical—অপ্রতিসম
Upper parietal lobule—উঁচুমধ্যকপালীয় গোল

Upper partial—উপর স্বরাংশ
Urals tune—উরালীয় সুর
Usual orientation—চলিত দিক্‌স্থিতি
Uvula—আলজিহ্বা

V

Vacuum—শূন্যস্থান
Valley—খাদ
Valve—কপাটক
Variable—চর, চল
Velic, Velaric—জিহ্বামূলীয়
—valve action—জিহ্বামূলীয় কপাটক ক্রিয়া
Velocity—বেগ
—particle—কণাবেগ
—wave—তরঙ্গবেগ
Venticular band—নিলয়পটি
Verbal image—শাব্দ প্রতিরূপ
Vertebrae of the neck—গ্রীবার কশেরুকা
Vertical ictus weight—খাড়া সংঘাত ভার
Vibrato—কম্পিকা
Vibrator—কম্পক
Vice versa—তাদ্বিপরীত
Viscera—অন্ত্র
Viscosity—সান্দ্রতা
Vocal cord—স্বরতন্ত্রী
—folds—কণ্ঠপাটি
—organ—স্বরযন্ত্র
—tract—কণ্ঠপথ
Vocaloid—স্বরকল্প
Voice—স্বর
Voiced—ঘোষ
Voice quality—বাচ্যগুণ
Voiceless—অঘোষ
—plosive—অঘোষ স্পর্শধ্বনি
Volley principle—শরবর্ষণ নীতি
Volume—ঘনমান
Vowellike—স্বরকল্প
Vowel weight—স্বর বা বাচ্যভার

W

Wave disturbance—তরঙ্গ বিক্ষোভ
—form—তরঙ্গ রূপ
—shape—তরঙ্গাকৃতি
—intensity—তরঙ্গ তীব্রতা
Weight of Voice emphasis—জোরাল স্বরের ভার
Whisper—ফিস্ ফিসানি
Wide band mechanical filter —প্রশস্ত ব্যাণ্ডের (পটীয়) যান্ত্রিক পরিস্রাবক
Wind instrument—সুষির যন্ত্র
—pipe—শ্বাসনালী

X

X-ray—এক্‌স্ রশ্মি

Z

Zero charge—শূণ্য আধান

III. নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

(ক) বাঙলা

হ

(খ) ইংরেজি

A

W

ড° অনিল বিশ্বাস এম. এ, এল্. এল্. এম পি. এইচ. ডি. একটি উল্লেখ্য নাম। এতে সংযোজিত হয়েচে আইন গবেষণার অনাথ নাথ দে সুবর্ণ পদক, সংস্কৃতের আনন্দরাম বড়ুয়া পদক এবং সাহিত্যের গ্রিফিথ স্মারক পুরস্কার। এক কথায় তিনি বিভিন্ন বিদ্যায় পারঙ্গম। এরি পরি চায়ক হ'লো বিভিন্ন বিদ্যায় বিজ্ঞানের উপস্থিতি এ দেখা যায় তাঁর বিভিন্ন রচনায়, যেমন The Calculus Poetics, The Metrics of Lega Philosophy, A Spiritual Calculus, বিশ শতকের বাঙলা সাহিত্য, From Justice to Welfare, A Book of Bengali Verse প্রভৃতিতে এ ব্যাপারে তিনি একক, নভোমণ্ডলে একটি তারার মতোই ভাস্বর।

পরিবর্তমান বিশ্বে পুরনো সঞ্চয়ে আর চলবে না। চাই নতুন-নতুন উদ্ভাবন ও আবিষ্কার। আর এখানে বিজ্ঞানের প্রয়োজন সর্বাধিক। বাঙলা ছন্দ এতদিন অপেক্ষা কচ্ছিল এরি জন্যে। ড° বিশ্বাস আনলেন এই আবিষ্কার বিজ্ঞানের সহায়তায়। এ-কাজ দুরূহ। ধ্বনিকে ভিত্তি করেই এগিয়েচেন তিনি, কেননা উচ্চারণে ধ্বনিই মুখ্য। বাক্‌ধ্বনি জন্ম নেয় ফুস্‌ফুস-নিঃসৃত বায়ুস্তম্ভের উপর কয়েকটি নির্দিষ্ট প্রত্যঙ্গের ক্রিয়ায়। এর প্রথমটির নাম শ্বাসরন্ধ্র (glottis), যা কণ্ঠমনির (Adam's apple) স্তরে অবস্থিত এ দু'টি পেশীয় ঝিল্লীতে তৈরি, যাদের নাম স্বরতন্ত্রী। ছান্দসিক তথ্যাবলীর ভৌত দিক থেকে তাই পাওয়া যায় একদিকে স্থিতি কাল, অন্যদিকে সুতান প্রস্বর ও উচ্চার্যশক্তি প্রত্যেক উচ্চারণের শুরু থেকে শেষ অবধি এর পরিবর্তনশীল। এরি ভিত্তিতে গড়ে উঠেচে বাঙল ছন্দ। তাই অন্যান্যরা যেখানে 'ছন্দোব্রতী সেখানে ড° বিশ্বাস 'ছান্দসিক'। অর্থাৎ ছন্দো জ্ঞানই তাঁর উপজীব্য, শুধু ছন্দোব্রত পাল তাঁর উদ্দেশ্য নয়। ফলে তাঁর জুড়ি নেই এখানে তিনি সত্যি অনন্য।